মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

১৬শ বর্ষ—১ম খণ্ড

(ফাল্গুন ১৩৩০—শ্রাবণ ১৩৩১)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৬।১-এ বিডন ষ্ট্রীট, "মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩৩১

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

(ফাল্গুন ১৩৩০—শ্রাবণ ১৩৩১)

বিষয় সূচী

লেখক সূচী

চিত্র সূচী



দেবী বীণাপাণি।

চিত্রকর—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়।

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ
১ম খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩০

১ম খণ্ড
১ম সংখ্যা

হিন্দুবীর হিমু

প্রবল-প্রতাপ আফগান সম্রাট্ শের শাহের পুত্র সেলিম শাহ সুর বা ইস্লাম শাহ নয় বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করিয়া ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র যে বিপ্লব এবং গৃহবিবাদ ভীষণ দাবাগ্নির মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তাহাতে সুর-বংশ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। শের শাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত মোগলগণও সেই সুযোগে তাহাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ১৫৫৪ হইতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অরাজকতা এবং বিপ্লব অবিরাম চলিয়া অবশেষে দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে সমাপ্ত হয়। এই দুই বৎসর কালের অবিশ্রান্ত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে যে হিন্দু বীরের তেজোদৃপ্ত উন্নত শির আমাদের মানস নয়নের সমক্ষে দেখিতে পাই, বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞার তীব্র বিষ উদ্গারণ করিয়াও মোগল-ঐতিহাসিকগণের লেখনী যাহার কীর্ত্তিভাতি ম্লান করিতে পারে নাই, তাঁহার নাম হিমু। কেবলমাত্র দুই বৎসরের জন্ত হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক গগনে একটি সমুজ্জ্বল গ্রহের মত আবির্ভূত হইয়া, হিমু আফগান এবং মোগলদিগকে স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে এই হিন্দু বীর হিমুই মোগলকেশরী কিশোর বয়স্ক আকবরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, আফগানগণ নয়।

দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের মুসলমান-যুগের ইতিহাসে হিমুকে তাঁহার যথোপযুক্ত স্থান দেওয়া হয় নাই। কোনও কবির কাব্যে কিংবা ঐতিহাসিকের ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত হয় নাই। রাজপুত-বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিতে করিতে গর্ব্বে আমাদের বক্ষ স্ফীত হয়, প্রতাপসিংহের গৌরব গাথা গাহিতে আমাদের রসনা শতমুখী হইয়া উঠে, কিন্তু আমরা অনেকেই হয়ত এই অদ্ভুতকর্ম্মা হিন্দু বীরের নাম ব্যতীত তাঁহার জীবনেতিহাসের আর কিছুই অবগত নহি। অথচ, মহত্বে না হউক, শৌর্য্যে এবং প্রতিভায় ভারতের মধ্যযুগে এই

হিন্দু বণিক কোন রাজপুত বীর অপেক্ষা হীন ছিলেন না। দিল্লীর শেষ হিন্দু অধীশ্বর বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

২

সেলিম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ফিরোজ রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া, দুই দিবস পর তাঁহার মাতুল মুবারিজ খাঁর হস্তে অতি নির্দ্দয়ভাবে হত হয়। কথিত আছে, মুবারিজ তাঁহার ভগিনীর অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া শিশু সম্রাটকে তাঁহার মাতৃ অঙ্ক হইতে ছিনাইয়া লইয়া স্বহস্তে নিধন করে। এই শিশুহন্তা, রাজ-রক্ত-রঞ্জিত হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়া মহম্মদ শাহ আদিল নাম পরিগ্রহণ করে। ইতিহাসে মুবারিজ খাঁ, মহম্মদ শাহ আদিল কিংবা আদালি নামে পরিচিত। আদিল নিরক্ষর, চরিত্রহীন এবং অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত আমীর ওমরাহদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্ব্বদা নীচজাতীয় অশিক্ষিত পার্শ্বচরগণ কর্তৃক পরিবৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার প্রিয়-পাত্রগণের জন্য এবং নিজের ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থতার জন্য রাজকোষ সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। রাজকার্য্যের সহিত তাঁহার বড় একটা সংস্রব ছিল না। বংশমর্য্যাদাহীন, হিন্দু বণিক হিমুর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। উচ্চবংশোদ্ভব হইলে হিমু হয়ত আদিলের প্রিয়পাত্র হইতে পারিতেন না। নীচবংশজাত হওয়াতেই যে তিনি আদিলের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইতে কিয়ৎপরিমাণে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মেওয়াট্ (১) অঞ্চলে 'রেওয়ারী' নামক স্থানে হিমুর পৈতৃক নিবাস ছিল। হিমু পূর্ব্বে সোরা ব্যবসায়ী ছিলেন; এবং কথিত আছে যে দিল্লীতে তাঁহার একটি দোকান ছিল। সেলিম শাহের রাজত্বকালে তিনি দিল্লীর হাট বাজার অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বংশগৌরব কিংবা শারীরিক সৌন্দর্য্য তাঁহার কিছুই ছিল না। জাতিতে তিনি নিম্নশ্রেণীর বণিক্ ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, তিনি কুৎসিত এবং খর্ব্বাকৃতি ছিলেন এবং এত দুর্ব্বল ছিলেন যে অশ্বারোহণের শক্তিও তাঁহার ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পাল্কীর ভিতর হইতে কিংবা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। অথচ এই স্বাস্থ্যহীন, নীচজাতীয় বণিক্, দিল্লীশ্বর আদিলের প্রধান মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন। মানুষকে যদি তাহার আকৃতি এবং অবয়ব দেখিয়া বিচার করিতে হয় তাহা হইলে সোক্রাটিস্ও সয়তান বলিয়া পরিগণিত হন। হিমুর রুগ্নদেহ এবং কুৎসিৎ আকৃতির অন্তরালে যে মানসিক তেজ ও অদম্য শক্তি লুক্কায়িত ছিল, সেই শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে তৎকালে ভারতবর্ষে কাহারও সামর্থ্য ছিল না। যে আবুল ফজল তাঁহাকে শঠ এবং বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তিনিই আবার তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন।

আদিলের অমিতব্যয়িতা এবং হিমুর উপর তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং অশেষ অনুগ্রহ, আফগান আমীরদিগের ভিতর যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছিল। আদিল এবং হিমুর বিরুদ্ধে চারিদিকে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। সেকেন্দর খাঁ নামক একজন আফগান যুবক একদা সম্রাটকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ছুরিকা হস্তে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। সম্রাটের পার্শ্বচরগণ ভাগ্যক্রমে আক্রমণকারীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহার প্রাণনাশ করতঃ আদিলের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। তাজ খাঁ কর্‌রাণী নামক অপর একজন আফগান আমীর সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এদিকে রাজধানীতেও আদিলের জীবন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। তাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া আদিল ও হিমু তাহাকে চুনারের নিকট পরাস্ত করিলেন। কিন্তু

(১) বর্ত্তমান মথুরা জিলা এবং ভরতপুর ও আলোয়ারের অংশবিশেষ।

সম্রাটের দিল্লী পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্যালক ইব্রাহিম খাঁ দিল্লী এবং আগ্রা দখল করিয়া বসিলেন। আদিল, ইব্রাহিমকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিতে অক্ষম হইয়া চুনার দুর্গে রাজধানী স্থাপন করিলেন। আফগান সাম্রাজ্যের কেবলমাত্র পূর্ব্ব প্রদেশগুলি আদিলের করতলগত রহিল।

৩

ইব্রাহিমের ভাগ্যে রাজ্যভোগ বেশীদিন ঘটল না। আহম্মদ খাঁ নামক শের শাহের জনৈক আত্মীয় সেকেন্দর শাহ নাম ধারণ করিয়া পঞ্জাবে নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং 'কারা' নামক স্থানে ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা হস্তগত করিলেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যচ্যুত মোগলসম্রাট হুমায়ুনের ভারত আক্রমণের সংবাদ পাইয়া, সেকেন্দর দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। এই সুযোগে ইব্রাহিম দিল্লী পুনরাধিকারকল্পে সসৈন্যে 'কাল্পী' পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এদিকে আদিলও তাঁহার হৃতরাজ্য উদ্ধারের আশায় একদল সৈন্য সহ হিমুকে চুনার হইতে দিল্লী অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কাল্পীতে হিমুর হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া ইব্রাহিম 'বায়না' নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং হিমুও ইব্রাহিমের পশ্চাদ্ধাবন করতঃ বায়না অবরোধ করিলেন। (২) কিন্তু হঠাৎ বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শা সুরের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া হিমু বায়না পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে চুনারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইতিমধ্যে হুমায়ুন ক্ষুদ্র একদল সৈন্য সহ কাবুল হইতে বহির্গত হইয়া ভারতাভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া হুমায়ুন তাঁহার প্রধান সেনাপতি বাইরাম খাঁকে জলন্ধরে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শতদ্রুর তীরে বাইরাম সেকেন্দরের সেনাপতিগণকে পরাস্ত করিয়া সারহিন্দ্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তথায় সেকেন্দর স্বয়ং এক বিরাট বাহিনীসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ইতিমধ্যে হুমায়ুন সপুত্র বাইরামের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মিলিত মোগল বাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া সেকেন্দর 'শিবালিক্' পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিলেন। দীর্ঘ পনর বৎসর নির্ব্বাসনের পরে জুলাই মাসে হুমায়ুন দিল্লীতে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া হুমায়ুন তাঁহার সহায়তাকারী প্রধান প্রধান মোগল সেনাপতিদিগকে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত করিলেন। বাইরাম খাঁ প্রচুর ধন সম্পত্তি পাইলেন। তার্দ্দীবেগ খাঁ দিল্লীর শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে হুমায়ুন বাইরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে তের বৎসরের বালক যুবরাজ আকবরকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, পলাতক আফগান নায়ক সেকেন্দর শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আকবর 'সারহিন্দে' উপস্থিত হইয়া সেকেন্দরের উদ্দেশে 'হারিয়ানা' নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। (৩) 'হারিয়ানা' হইতে কালানাউরের পথে তিনি তাঁহার পিতার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ২৫শে জানুয়ারী হুমায়ুনের ঘটনাসঙ্কুল বিচিত্র জীবনের শেষ হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকাগার 'শের মণ্ডলের' ছাদ হইতে নামিবার পথে হঠাৎ পদস্খলন হওয়ায় হুমায়ুন সিঁড়ির উপর পতিত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন এবং অল্প কয়েকদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া বাইরাম খাঁ অবিলম্বে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যুবরাজ আকবরকে 'কালানাউরে' রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।

(২) নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর ইব্রাহিম খাঁ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হন।

(৩) ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং পরে সম্রাট কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করেন।

৪

এদিকে আদিল এবং হিমু, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ শা সুরের বাহিনী 'কাপড় ঘাটার' যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া বঙ্গদেশ পুনরায় হস্তগত করিলেন। চুনারে প্রত্যাগমন করিয়া আদিল হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ত্রিংশসহস্র অশ্বারোহী এবং দেড় সহস্র হস্তী সহ হিমুকে আগ্রাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। বিরাট বাহিনীসহ হিমুর যুদ্ধ যাত্রার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মোগলগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। আগ্রার শাসনকর্ত্তা আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে আশ্রয় লইলেন। হিমু অক্লেশে আগ্রা অধিকার করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। দিল্লীর শাসনকর্ত্তা তার্দ্দীবেগ খাঁ পুরাতন দিল্লীর নিকট হিমুর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া 'সারহিন্দে' বাইরাম এবং আকবরের নিকট পলায়ন করিলেন। দিল্লী হিমুর করতলগত হইল।

দিল্লী এবং আগ্রার পতন সংবাদ শুনিয়া 'সারহিন্দে' মোগল সৈনিকগণ অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, তার্দ্দীবেগ দিল্লী রক্ষার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, হিমুর হস্তে দিল্লী সমর্পণ পূর্ব্বক 'সারহিন্দে' পলায়ন করিয়া তিনি যে মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার ফলে মোগলগণ অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। পাছে এই অবসাদ সৈন্তদিগের ভিতর বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করে, এই ভয়ে বাইরাম তার্দ্দী বেগকে হত্যা করাইয়া সৈন্তদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। (৪)

আকবর তার্দ্দী বেগের হত্যার ব্যাপার কিছুই অবগত ছিলেন না এবং তাঁহার অভিভাবক বাইরামও এই বিষয়ে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। তার্দ্দীর হত্যাকালে আকবর পক্ষী শিকারে ব্যাপৃত ছিলেন। শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া বাইরামের মুখে তার্দ্দীর শাস্তির কথা শুনিলেন এবং সামরিক প্রয়োজনে ঐ হত্যা সাধিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার অভিভাবককে ক্ষমা করিলেন। বাইরামের কার্য্যে অনুমোদন করা ভিন্ন আকবরের তখন যে অন্ত উপায় ছিল না তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অতঃপর ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্ম মোগল সেনাপতিদের এক সভা আহূত হইল। অনেকেই কাবুলে আশ্রয় গ্রহণ করার পরামর্শ দিল, কিন্তু বাইরাম খাঁ এই পরামর্শ কাপুরুষোচিত বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উপদেশ দিলেন। আকবর তাঁহার অভিভাবকের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। অবিলম্বে মোগলবাহিনী থানেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল।

৫

হিমু এদিকে দিল্লী এবং আগ্রা অধিকার করিয়া, রাজা বিক্রমজিৎ উপাধি ধারণ করিলেন এবং রাজার ন্যায় প্রজাশাসন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, তিনি স্বীয় নামে মুদ্রা পর্য্যন্ত প্রচলন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রভু আদিলের সহিত পত্রব্যবহারে তিনি তাঁহার রাজ্যাধিকারের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ করিতেন না, বরঞ্চ আদিলের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও আনুগত্যের কথাই পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিতেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই কারণে হিমুকে বিশ্বাসঘাতক ও প্রবঞ্চক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য প্রবঞ্চনা অপরাধ হইতে হিমুকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হিমু একজন নিষ্কামধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী অথবা আদর্শপুরুষ ছিলেন না। তাঁহাকে আমরা একজন রাজ্যলোলুপ, প্রতিভাশালী সৈন্যাধ্যক্ষ রূপেই দেখিব। হয়তঃ তিনি হিন্দু-

৪। কোনও কোনও ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে শুধু কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বাইরাম ঐ কার্য্য করেন নাই। মোগল সৈনিকদিগের মধ্যে তার্দ্দীবেগ খাঁ একজন প্রতিপত্তিশালী কর্ম্মচারী ছিল এবং সে বাইরামের প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল। কর্ত্তব্যের অজুহাতে বাইরাম এই সুযোগে তাহার প্রাণবধ করিয়া নিজে নিষ্কণ্টক হইলেন।

রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের তাৎকালীন অবস্থায়, ছলে বলে পররাজ্য অধিকার করা তেমন দুষণীয় ছিল না। তরবারিই তৎকালে ভারতের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা ছিল। হিমুর ন্যায় একজন শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি, আদিলের মত মূর্খ এবং অকর্মণ্য প্রভুর দাসত্ব ও আনুগত্য অধিকদিন স্বীকার করিতে পারে না।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী ও আগ্রায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হিমু দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের দুর্দ্দশার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, নিজের সৈন্যদিগের জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক বাদাউনী, হিমুর এই নিষ্ঠুরতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্রের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। হিমুর এই কার্য্যের পোষকতা না করিয়া আমরা একথা বলিতে পারি যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের দুর্দ্দশা মোচন করিতে গেলে তাঁহাকে সৈন্যবলের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইত। তিনি নিজে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ অধিকাংশই মুসলমান। এই মুসলমান বাহিনীর উপর একজন হিন্দুসেনাপতির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা বোধ হয় সহজসাধ্য ছিল না। হিমু এক বিশাল সাম্রাজ্য অধিকারের প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার পক্ষে তাঁহার সৈন্য বাহিনীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া অপরের দুঃখ মোচন করিতে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি একজন কামনাবর্জ্জিত সন্ন্যাসী বা মহাপুরুষ ছিলেন না।

ইতোমধ্যে মোগলবাহিনীসহ আকবর এবং বাইরাম, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাণিপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমু সসৈন্যে দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া পাণিপথের পশ্চিমে শিবির সংস্থাপন করিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাঁহার আবশ্যক অনেক অস্ত্র শস্ত্র মোগলের হস্তগত হইল। ক্ষতি খুব গুরুতর হইলেও হিমু নিরুৎসাহ না হইয়া, তাঁহার আফগান কর্ম্মচারীদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের বেতন ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। (৫) ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভারতের ভাগ্য পুনরায় পরিবর্ত্তিত হওয়ার আয়োজন চলিতে লাগিল। হিমু মোগলবাহিনার দক্ষিণ এবং বাম অংশ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার রণহস্তী-সমূহের সাহায্যে শত্রুপক্ষের মধ্যাংশ বিপুল বেগে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রিয় রণহস্তী 'হাওয়া'র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি নিজে সৈন্য-দিগকে পরিচালনা ও তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সহসা শত্রুপক্ষের একটি তীর সজোরে তাঁহার এক চক্ষু ভেদ করিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া ফেলিল। তিনি হাওদার উপর ঢলিয়া পড়িলেন। যে মুহূর্ত্তে হিমুর জয় প্রায় নিশ্চিত হইয়া আসিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার পতন হইল। তাঁহার পতনের পর তাঁহার সৈন্যগণ হতাশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মোগলগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল।

হিমুর রণহস্তী 'হাওয়া' তাহার অচেতন প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সা কুলী খাঁ মহরম কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আকবর এবং বাইরামের সম্মুখে আনীত হইল। বাইরাম খাঁ তরুণ সম্রাটকে, স্বীয় পবিত্র হস্তে বিধর্ম্মী হিমুর দেহ তরবারির দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া 'গাজী' উপাধি লাভ করিতে অনুরোধ করিলেন। আবুল ফজল এবং বাদাউনীর ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, আকবর এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। হতচেতন অর্দ্ধমৃত শত্রুকে তিনি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে অস্বীকৃত

(৫) ঐতিহাসিক বাদাউনী লিখিয়াছেন যে আফগানগণ হিমুর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই সময় তাঁহার পতন কামনা করিতেছিল। এমন কি নিজেদের অমঙ্গলকর কোনও পরিবর্ত্তনের জন্যও তাহারা প্রস্তুত ছিল। বাদাউনীর এই বিবরণের অন্য কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। হিমুর প্রশংসাসূচক একটি কথাও বাদাউনী লিপিবদ্ধ করেন নাই। বাদাউনী, ২য় খণ্ড,৮পৃঃ।

হইলে, বাইরাম স্বীয় তরবারির দ্বারা হিমুর মস্তক দেহচ্যুত করেন। (৬) কিন্তু কোন কোনও ঐতিহাসিক এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, আকবরই স্বহস্তে হিমুর দেহে তরবারি প্রবেশ করাইয়া তাঁহার অভিভাবকের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রখ্যাতনামা ইংরাজ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথও এই বিবরণ সমর্থন করিয়াছেন। (৭)

হিমুর মস্তক কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহার দেহ দিল্লীতে বধ্য কাষ্ঠদণ্ডের উপর প্রদর্শন করা হইয়াছিল। মোগলগণ তাঁহার ধনসম্পত্তি হস্তগত করিয়া, তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকেও হত্যা করিয়াছিল।

শ্রীবনওয়ারীলাল বসু।

(৬) বাদাউনী—২য় খণ্ড, ৯পৃঃ। আকবরনামা—২য় খণ্ড, ৬৬ পৃঃ।

(৭) "The official story that a magnanimous sentiment of unwillingness to strike a helpless prisoner already half dead compelled him to refuse to obey his guardian's instructions seems to be the late invention of courtly flatterers, and is opposed to the clear statements of Ahmad Yadgar and the Dutch writer, Van den Broecke, as well as to the probabilities of the case. At the time of the battle of Panipath, Akbar was an unregenerate lad, devoted to amusement, and must not be credited with the feelings of his mature manhood." —V. Smith's Akbar the Great Mogul, p. 39.

কৈলাস পর্ব্বত ও মান সরোবর দর্শন

হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান, ইহুদি, সকলেরই এক একটা স্বর্গ আছে, কিন্তু সেই স্বর্গ কোথায়, তাহা স্বর্গাধিপতি শ্রীভগবানই জানেন। শ্রীভগবান সকলেরই এক, কেবল নামে প্রভেদ। হিন্দু ছাড়া অন্য সকলের স্বর্গপ্রাপ্তি তাহাদের প্রলয়ের বিচার দিন শেষ না হইলে হয় না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম বলেন, জীবের কর্ম্মানুসারে স্বর্গ ও নরক প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে সপ্তস্বর্গের কথা শুনা যায় এবং কোন্‌টি কোথায় তাহার বর্ণনা পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সকলগুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। মহাযোগী কৈলাসনাথের কৈলাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং কোথায় সেই স্থান, শাস্ত্রাদিতে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই কলিযুগে যে সকল ধর্ম্মপুস্তক ও পুরাণ প্রচলিত আছে, সেই সকল গ্রন্থেই কৈলাস ও মানস সরোবরের ইতিহাস ও উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

স্কন্দপুরাণের মানস খণ্ডে কৈলাস বা মেরু পর্ব্বত হিমালয়ের উত্তরাংশে মানস সরোবরের সন্নিকটে অবস্থিত কল্পিত হইয়াছে। যদি ইহাই স্বর্গ হয়, তাহা হইলে কৈলাস ও সন্নিকটস্থ হ্রদদ্বয়, মানসরোবর ও রাবণ হ্রদ যাহা সকলে পবিত্র স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন, যাহা জগদ্‌বিখ্যাত, এবং পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের কাছে পরিচিত, দর্শন করা সম্ভব; যদিও সশরীরে স্বর্গবাস না করা যাইতে পারে, তথাপি ভগবৎ কৃপায় স্বর্গ দর্শন ও স্বর্গারোহণ হইতে পারে।

আমি উপরে "যদি স্বর্গ হয়" এইরূপ কথা লিখিয়া মনের সংশয় ও অবিশ্বাসের সূচনা করিলাম। এই বৈজ্ঞানিক সময়ে ও অবিশ্বাসের যুগে সকল কথাই একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিতে হয়, সেই কারণে ওরকম করিয়া লিখিয়াছি। অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই, কারণ, যখন হিন্দুধর্ম্ম কর্ম্মপ্রধান, তখন এই পৃথিবীতে আমাদিগকে কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করিতে হইবে।

কার্য্য কারণ ও কর্ত্তা যখন এইখানেই, তখন তাহার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এইখানেই। অতএব ভারতের উত্তরে হিমালয়ের পরপারে তিব্বত প্রদেশে শাস্ত্র ঋষি, ও জনগণ নির্দ্দিষ্ট কৈলাস ও মানস সরোবর যে আমাদের ঈপ্সিত স্বর্গ ইহাই বিশ্বাস হয়। হিমাচল যে স্বর্গপথের সিঁড়ি তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। যোগী, ঋষি, মুনিরা যে হিমালয়ে বাস করিতেন এবং ইহাই যে তাঁহাদের তপোভূমি ছিল, ইহাতেও যদি মনে কোনও রকম সন্দেহ থাকে তাহাও দূর হওয়া উচিত। হিমালয় দর্শনে যে সর্ব্ব-পাপ বিমোচন হয় ও মনে ভগবদ্ভক্তি ও শান্তি আসে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। হিমালয় অবশ্য হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্র স্থান, হিমালয় হইতে গঙ্গা যমুনা প্রবাহিত হইয়া ভারতকে শস্যশ্যামল করিতেছে, হিমালয়েই হিন্দুদিগের দেবাদিদেব কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণের মন্দির, হিমালয়ের প্রতি পর্ব্বত, প্রতি শিলা ও প্রতি নদী, হিন্দুদিগের এক একটি তীর্থস্থান। কিন্তু হিমালয়ের সৌন্দর্য্য এতই সুন্দর, ভগবানের লীলাভূমি এতই রমণীয় ও চিত্তাকর্ষণকারী যে, সুদূর ইয়োরোপ ও জাপান হইতে বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ, বিদ্বান্ পণ্ডিতেরা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া হিমালয়ে পরিভ্রমণ ও পরিক্রমণ করিতে আসেন। গৌরীশঙ্কর অভিযানে ডাক্তার স্বেন হেডিন ও কাওয়াগুচির পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিমালয় দর্শন হিন্দু ছাড়া অন্তধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও মনোমুগ্ধকারী। রামায়ণে বাল্মীকি বলিয়াছেন—"হিমাচল, যেখানে শিব সর্ব্বদাই বিরাজমান, ও যেখান হইতে গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে পদ্মমৃণালের ন্যায় প্রবাহিতা হইয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্ত্তন দেবতাদের এক শত যুগেও করিয়া শেষ করিতে পারা যায় না···সূর্য্যকিরণে যেমন তুষারবিন্দু শুষ্ক হয়, সেইরূপ হিমাচল দর্শনে মানবদিগের পাপ বিদূরিত হয়।"

আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতামত না শুনিলে প্রাচী যাহা বলিয়া গিয়াছে তাহা একবারে পাকা বলিয়া ধারণায় একটু সন্দেহ বোধ হয়। সেই কারণে, আলমোড়ার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর সেরিং সাহেব নিজের পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এইস্থানে একটু উল্লেখ করিয়া দিলে বোধ হয় রামায়ণের হিমাচল বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া ধারণা হইবে। সাহেব লিখিয়াছেন, "ইহা ভালরূপে বলা যাইতে পারে যে আমাদের জানিত সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যাহার সৌন্দর্য্য চির-তুষারাবৃত হিমালয়ের অতি রমণীয় সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হিন্দু ঋষি হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা কাল্পনিক নহে, এবং মনুষ্যের ধারণার অতীত বলিয়া তাহা অত্যুক্তিও নহে।"

সেই হিমালয়, সেই কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনের কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু ইচ্ছা হইলেই দর্শন হয় না, ভগবৎকৃপা ভিন্ন হইতে পারে না।

আমি অনেক দিন হইতে হিমালয় দর্শনের লালসা মনোমধ্যে পরিপোষণ করিয়া আসিতেছিলাম; সেই সঙ্গে যদি কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন হইয়া যায় ইহাও আকাঙ্ক্ষা করিতাম। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা কি সহজে পূর্ণ হয়? সময় না হইলে ও সময় মত কর্ম্ম না করিলে কোন ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হয় না। কেবল পুরুষকারে সকল কর্ম্ম হয় না, দৈব সাপেক্ষ।

আমার বয়ক্রম যখন ১০ বৎসর, সেই সময়ে আমি স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত রাওলপিণ্ডি গিয়া মারি পর্ব্বত হইতে কাশ্মীরের দিকে উঁকি মারিয়া, হিমাচলের সামান্য দর্শন পাইয়াছিলাম। আমি তখন বালক, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম সে কথা আজও মনে পড়ে। পরে যখন স্কুলে পড়িতাম, ভূগোলে হিমাচলের নক্সা দেখিতাম, গঙ্গা যমুনা সিন্ধু শতদ্রু প্রভৃতি নদ ও নদীর কোথায় উৎপত্তি-স্থান শিক্ষক মহাশয় যখন বুঝাইতেন, তখন মনে মনে ভাবিতাম, ভগবান কখনও কি এমন দিন দিবেন যে, আমি হিমাচল পরিভ্রমণ করিয়া, মান সরোবরের যে অংশ হইতে গঙ্গা শতদ্রুর উৎপত্তি হইয়াছে নিজে যাইয়া

দেখিয়া আসিতে পারিব ? পরে যখন কলেজে পড়িতে লাগিলাম, তখন যদিও ভূগোল বিশেষ করিয়া পড়িতে হইত না, তথাপি ইতিহাস শিক্ষার জন্ত—আর্য্যদিগের প্রাচীন বাসস্থান ও কেমন করিয়া কোথা হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিলেন পরিচয় করিবার জন্ত—ভূগোল ও ভূবৃত্তান্ত ভাল করিয়া শিখিতে হইয়াছিল। স্কুল ক্লাস হইতেই আমি ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলাম। ইহার অধ্যয়নে বড়ই আনন্দলাভ করিতাম ও পরে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলাম। সেই সময়েই মানসরোবর, কৈলাস ও হিমালয় সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতাম। কলেজে পড়িবার সময় আমরা গঙ্গার উৎপত্তি স্থান ও সিন্ধুর উৎপত্তিস্থান লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক করিতাম। মান সরোবর ও তাহার পার্শ্বস্থিত রাবণ হ্রদ কোথায়; মান সরোবর হইতে একটি প্রস্রবিনী প্রবাহিত হইয়া দুইটি হ্রদকে যোগ করিয়াছে, ইত্যাদিও সেই সময়ে বড় বড় পণ্ডিতদিগের বাচ্য ও বিবেচ্য ছিল। সিন্ধুনদ কৈলাসের নিকট হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ইহা কেবল কথিত ছিল, কিন্তু কেহই স্বচক্ষে দেখেন নাই। তখনও সেরিং সাহেবের মান সরোবর ও রাবণ হ্রদ সংযোগকারিণী, প্রস্রবিণীর তথ্য ও ফটো প্রকাশিত হয় নাই। ডাক্তার স্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা, শতদ্রু, গঙ্গা ও সিন্ধুনদের উৎপত্তি স্থান নির্ণয় বিষয়ও হেডিন সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া প্রচারিত হয় নাই। চাপলতা বশতঃ আমি ক্ষুদ্র ভারতবাসী এই সব বিষয় লইয়া অনেক রকম কবিকল্পনা গড়িতাম এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতাম যে, তিনি যেন আমাকে তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনের ক্ষমতা দেন ও প্রাকৃতিক স্থান সমূহ নির্ণয় করিবার সাহস দেন। ক্ষুদ্র ভারতবাসীর পক্ষে—আমার মত অনভিজ্ঞ গরীবের পক্ষে ইহা যে বামনের চন্দ্রাকাঙ্ক্ষা, তখন তাহা বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি। অন্যান্য সভ্যদেশের রাজসরকার ও জনগণ, ভূবৃত্তান্ত আবিষ্কারক ও পর্য্যটনকারী পরিব্রাজকদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। পুরাকালে যে বাদশাহেরা পরিব্রাজকদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন ও তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন তাহা আইন আকবরী পড়িলেই বোঝা যায়। সুইডেন দেশের রাজা ও জনগণ ডাক্তার স্বেন হেডিনকে এবং জাপান দেশবাসীরা কাওগুচিকে তাঁহাদের ভ্রমণের জন্ত কত অর্থ সাহায্য ও সহানুভূতি করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিদিত আছে। আমাদের ভারতে যদি এমন সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশীয় এক জন না একজন স্বেন হেডিন অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইত। সাহায্য ও সহানুভূতির কথা তো অনেক দূর, কোন বিশেষ আবিষ্কারকের এ দেশে যে একটু সম্মানও হয় না, স্যর জগদীশ বসু তাহার উদাহরণ। তিনি ভারতের বাহিরে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানিত হইয়াছেন, কিন্তু ভারতবাসী ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার জন্ত কিছুই করেন নাই।

সেই কারণে হিমালয় পরিভ্রমণ, কৈলাস ও মান সরোবর দর্শন বাসনা হৃদয়ের ভিতর বহুদিন লুক্কায়িত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু মানুষে সাহায্য নাই করুক, যাঁহার দর্শনের প্রেম দিনে দিনে হৃদয়ে বাড়িতেছিল, তিনিই সময়ানুসারে সেই প্রেম বলবতী করিয়া আমাকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কলেজ হইতে বাহির হইবার পর যদিও আমার ডাক্তার হইবার কথা, তথাপি অদৃষ্টক্রমে আমি উকিল হইলাম। ওকালতি ব্যবসা করিবার জন্ত আমি নেপালের সন্নিকটস্থ গোরখপুর নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলাম। ওকালতি করিতে করিতে, হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের আভা দেখিবার জন্ত নিকটস্থ স্থানগুলি—মসৌরি, নৈনিতাল সিমলা—ইত্যাদি দেখিবার অবসর করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু যতই সে সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম, ততই দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল। ইতোমধ্যে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইলাম—পেশোয়ার হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত প্রায় সকল সুন্দর সুন্দর স্থানগুলি দেখিয়া লইলাম।

সুদূর দক্ষিণে কন্যাকুমারীতে যখন সূর্য্যাস্ত দেখিলাম, ও কুমারিকা কন্যাদেবীকে শিব-মিলনের জন্য যুগ যুগ হইতে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম, তখন হইতেই আমিও কৈলাস শিখরের সূর্য্যোদয় ও দেবাদেব মহাদেবের রমণীয় স্বর্গভূমি কৈলাস ও মানস সরোবর দেখিবার জন্য আত্মহারা হইলাম।

কন্যাকুমারী হইতে নিজের কার্য্যস্থানে ফিরিবার পরই, হিমালয় মান সরোবর ও কৈলাস দর্শন জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। কোথায় কোন্ দিক দিয়া যাইতে হইবে, বা কোন্ পথটি সুগম তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। যাইবার পূর্ব্বে আমার ইহা ধারণা ছিল (ও বোধ হয় এখন অনেকেরই ধারণা) যে সরকার হইতে আজ্ঞাপত্র বা পাসপোর্ট না পাইলে তিব্বত দেশে যাওয়া যাইতে পারে না। পূর্ব্বে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা বিনা অনুমতিতে যাইয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন, ইহাও তিব্বত সংক্রান্ত পুস্তকে পড়িয়াছিলাম। মনে করিলাম যদি নেপাল হইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিলাম, তিব্বত দেশ হিমালয়ের উত্তরে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশ কাশ্মীর হইতে ভারতের উত্তর পূর্ব্ব-কোণ বর্ম্মা ও চীন দেশের সীমা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। হিমালয় যেন সমগ্র তিব্বত ও ভারতের মধ্যে উত্তর পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব্বকোণ পর্য্যন্ত একটি প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া দুইটি রাজ্যকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে—এই প্রাচীর অতিক্রম না করিলে ভারত হইতে তিব্বত কোন মতে যাওয়া যাইতে পারে না।

এই প্রাচীর ভগবান নির্ম্মিত ও তাঁহার ইচ্ছাধীন নির্দ্দিষ্ট পথে ভিন্ন তাঁহার প্রাচীরের পরপারে যাইবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই। পথগুলি অতি দুর্গম, হিমাচলের চিরতুষারাবৃত শিখরের মধ্য দিয়া একটি একটি ঘাট বা pass আছে। পরপারে যাইবার জন্য উচ্চ পর্ব্বত মধ্যস্থিত সংকীর্ণ পথকে ঘাট বা ঘাটি বলে। কাশ্মীরের উত্তরে একটি ঘাট আছে। সেই রাস্তা ও ঘাটি দিয়া লেহলদাক হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বাংশে দার্জ্জিলিং হইয়া গ্যাংটক, ও চুম্বিভ্যালি দিয়া তিব্বতে যাওয়া যাইতে পারে। এই দুইটি ঘাটির পথ খুব পরিচিত—কারণ ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যাহা কিছু ব্যবসা হয়, তাহার বেশীর ভাগ পণ্যদ্রব্যই এই পথ দিয়া যায়। কিন্তু কৈলাস দর্শনাভিলাষী যাত্রীদিগের পক্ষে ইহা যে কিছু দূর ও বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িবে তাহা মানচিত্র দেখিলেই বোঝা যায়। সিমলার নিকট হইয়া রামপুর ও বুষাহার দিয়া একটী পথ আছে, যাহাকে "হিন্দুস্থান তিব্বত রুট" বলে। এই রাস্তা দিয়াও যাইতে পারা যায়; কিন্তু ইহাও যাত্রীর পথ নয় ও বিশেষ বাণিজ্য-পথও নয়, সে কারণ ইহাও তত সুগম নহে। ভারতের গাড়োয়াল জেলা ও আলমোরা জেলা হইয়া তিনটী যাত্রী পথ ও ব্যবসায়ীদিগের পথ আছে। নেপাল হইয়া কয়েটী পথ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার কার্য্যস্থান ছিল নেপালের সন্নিকটস্থ গোরখপুর জেলায়। গোরখপুর হইতে হাঁটা পথে নেপালের পশ্চিমাংশ পালপা ও রিড়ি ইত্যাদি এবং তাহার উত্তরে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মুক্তিনাথ অধিক দূর নয়। মুক্তিনাথ হইয়া ছুরকাভোট দিয়া তিব্বতে অনেক যাত্রী যায়। গোরখপুর হইতে কয়েক ঘণ্টা রেলে যাইয়া রক্সাওল ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া নেপাল ও নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু যাইতে হয়। নেপাল কাটমাণ্ডুর অতি সন্নিকটে পশুপতিনাথের দর্শন হয়। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় প্রায় ৫০ হাজার লোক পশুপতিনাথ দর্শন করিতে গিয়া থাকে। নেপাল হইয়া কিরঙপাস দিয়া তিব্বত-যাওয়া যাইতে পারে। নেপালী পল্টন ভর্ত্তি করিবার গোরখপুর একটী কেন্দ্রস্থান, এখানে রেক্রুটীং ডিপো আছে; সেই কারণে গোরখপুরে প্রতিবৎসর শীতকালে সহস্রাধিক নেপালী আসিয়া থাকে। এই সুযোগে তাহাদের অনেকের সঙ্গে আমি আলাপ করিলাম ও নেপালী ভাষাও শিখিলাম। তাহাদের কাছে জানিতে পারিলাম, যদিও রাস্তা

সুগম নহে, তথাপি নেপাল হইয়া যাওয়াই সুবিধা, কারণ নেপাল হিন্দুরাজ্য ও হিন্দুধর্ম্মই তথায় রাজধর্ম্ম, তাই হিন্দু নেপালীরা যাত্রীদিগের যথেষ্ট সাহায্য ও অতিথিসেবা করিয়া থাকে। নেপালে এখনও খাদ্যদ্রব্যাদি খুব সস্তা এবং যাত্রীরা তাহা সহজে সংগ্রহও করিতে পারে। অন্যান্য কারণেও মনে মনে ভাবিলাম, নেপাল হইয়াই যাওয়া সুবিধা-জনক হইবে। খাস নেপালের একটী বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক কর্ণেল ইন্-চীফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার কাছেও নেপালের অনেকটা সন্ধান জানিতে পারিলাম। একবার নেপালে পৌঁছিলে যে তিব্বত যাইবার একটা কিছু বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে ইহা আমার খুব ভরসা হইল। নেপাল যাইলে যে হিমালয় দর্শন ও পশুপতিনাথ যাত্রা অবশ্যই হইবে তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না। কৈলাস দর্শন ও মানসরোবর যাত্রার সুযোগও হইতে পারে, ইহাও আশা করিতে লাগিলাম। নেপালে যাইবার জন্য দুই একটী সঙ্গীও প্রস্তুত ছিলেন। এই সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া নেপাল দরবারে পাসপোর্টের (আজ্ঞাপত্র) জন্য দরখাস্ত করিলাম। কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হইলাম। পরে জানিতে পারিলাম, শিবরাত্রির সময় পাসপোর্টের দরকার হয় না। অতএব ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিবরাত্রির সময় পশুপতি-নাথ দর্শনের জন্য নেপাল যাত্রা করিলাম। নেপালে পৌঁছিয়া পশুপতিনাথ দর্শন করিয়া, প্রায় ২১ দিন নেপালে থাকিয়া, তিব্বত যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন আবার পাসপোর্টের গোলমাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিনা পাসপোর্টে যাওয়া ভাল বিবেচনা করিলাম না। নেপালের পাসপোর্টকে 'লাল ছাপ' বলে। এই লাল ছাপ না থাকিলে যে তিব্বতে কালাছাপের কারায় পড়িতে হইবে তাই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ শরীরও অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিফল-মনোরথ হইয়া দুঃখিত মনে ভারতে প্রত্যাগমন করিতে হইল। যদিও সব বাঞ্ছা পূর্ণ হইল না, তথাপি হিমালয়ের অনেকটা দর্শন হইল ও পশুপতিনাথের দর্শন করিয়া বড়ই শান্তিলাভ করিলাম। সেখান হইতে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাও ভুলিবার নয়। নেপালীদিগের সৌজন্য ও নেপালাধিপতি মহারাজ স্যর সামসের জং বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার কৃপা অনুগ্রহ চিরদিন মনে থাকিবে।

নেপাল হইতে ফিরিয়া কিছুদিনের জন্য গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ইতোমধ্যে অন্য পথ দিয়া যাইবার চিন্তাও করিতে লাগিলাম। গাড়োয়াল জেলা, কেদার বদরীনারায়ণ রাস্তা হইয়া বদরীনারায়ণের আরও উপর বসুধারার কাছ হইয়া, মানাগ্রাম দিয়া মানা হইতে দুই দিনের পার্ব্বতীয় পথ অতিক্রম করিয়া মানা পাস বা মানা ঘাটি দিয়া হিমালয়ের উত্তরাংশে তিব্বতের থুলিং মঠ দিয়া প্রতি বৎসর দুই একজন সাধু সন্ন্যাসী কৈলাস গিয়া থাকেন। কিন্তু মানাঘাটি বড়ই দুর্গম, কারণ মানা হইতে থুলিং পর্য্যন্ত ছয় সাত দিনের রাস্তা। ও রাস্তায় এই ছয় সাত দিন জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন আশা নাই, কোনও রকম দ্রব্যও পাওয়া যাইতে পারে না। যদিও থুলিং ও সন্নিকটস্থ মাংনাং ও চাপরাংয়ে টোলছাগণ ব্যবসা করিতে যায়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প ও তাহাদের ব্যবসা অতি সামান্য। সেই কারণে মানাপথে লোকসমাগম হয় না, রাস্তাও প্রায় নাই। খুব ভাল করিয়া জানা না থাকিলে যাহারা দুই একবার গিয়াছে তাহারাও যে ভুলিয়া যাইতে পারে ইহাও শুনিলাম।

বদরীনারায়ণের নীচে যশিমঠ হইয়া বাম কাউনীতি হইয়া একটি রাস্তা আছে, তাহাকে নীতির ঘাটা বলে। এই রাস্তা দিয়া নীতির সন্নিকটস্থ গ্রামের মার্চ্ছাগণ তিব্বতস্থিত ডাবা শিবচিলম ও গারতোপ পর্য্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যায়। যদিও এই পথে লোক সমাগম হয়, কিন্তু ঘাটাটী বড় দুরূহ। আলমোরা জেলা দিয়া ও আলমোরা হইয়া দুইটি রাস্তা গিয়াছে। একটি যোহারি ভুটিয়াদিগের দেশ উটাহুরা পাস দিয়া। যোহারি ভুটিয়ারা অনেকটা হিন্দুদিগের মত, হিন্দু যাত্রীদিগকে যথেষ্ট

সাহায্য করে। কোন কোনও হিন্দু যাত্রী এই পথ দিয়া যাইতে বিশেষ সুবিধা বোধ করেন, কারণ যোহারি ভুটিয়ারা অনেকেই কৈলাস যাত্রা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন কাহারও ঘরে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণ গয়া কাশীতে গিয়া তাঁহার সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ যোহারি ভুটিয়াদিগের মধ্যে কেহ মরিলে তাহার আত্মীয় কুটুম্বাদি তাহার স্বর্গলাভ হেতু কৈলাসস্থিত গৌরীকুণ্ডে তাহার অস্থি নিক্ষেপ করিয়া, মান সরোবরতীরে তাহার শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। সেই জন্য ভারত হইতে প্রায় শতাধিক ভুটিয়া প্রতিবৎসর কৈলাস দর্শন ও মান সরোবর যাত্রা করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় ইহারাই একমাত্র ভারতবাসী কৈলাসযাত্রী, কেন না সাধু সন্ন্যাসী ছাড়া ভারত হইতে কয়জনা কৈলাস দর্শন ও মান সরোবর যাত্রা করিয়াছে তাহা নখাগ্রে গণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের ঘাটা, অন্য সকল ঘাটা অপেক্ষা দুর্গম, উটাধার ঘাটা পার হইতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুইটি উচ্চ শিখরস্থ ঘাটা (জয়ন্তী কিংবা কুমরি বিংরি) পার হইতে হইবে। এই তিনটি শিখরের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যেখানে রাত্রিবাস করা যাইতে পারে। সমস্ত পথই প্রায় তুষারাবৃত হওয়ায়, এক দিনেই তিনটি ঘাটা পার হইতেই হয়—সেই কারণে ইহা বড়ই সুকঠিন। আর একটি ঘাটা আছে, আলমোরা জেলার নীচে উত্তর পূর্ব্ব কোণে - যেখানে নেপাল, ভারত ও তিব্বতের সীমা আসিয়া মিলিয়াছে।—সারদা নদীর উৎপত্তি স্থান দিয়া লিপুলেক পাস। লিপুলেক পাশের রাস্তাটি খুব প্রশস্ত ও পথের চড়াইও বেশী নয়। পাসের উপরিভাগে বা ঘাটার মাথার উপর বেশী বরফ থাকে না; শীতের প্রায় দুই মাস পরেই বরফ গলিয়া রাস্তা খুলিয়া যায়। সেই কারণে এই রাস্তা দিয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা আছে। ১৯০৫ সালে সেরিং সাহেব এই রাস্তা দিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে এই রাস্তার বিবরণ ভাল করিয়া দেওয়া আছে। তাঁহার পুস্তক পড়িয়া এই রাস্তাটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম ও মনোনীত করিলাম। ইহাও জানিতে পারিলাম যে লিপুলেক হইয়া পিলিভিত জেলার সন্নিকটস্থ টনকপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নামিয়া হাঁটা পথ দিয়া চম্পাওত ও পিথোরা গড় দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহাই আমাদের শাস্ত্রকথিত রাস্তা। স্কন্দ পুরাণের মানসখণ্ডে মানস সরোবর যাত্রা ও কৈলাস দর্শনের পথ বিবৃত হইয়াছে; অন্যান্য পুরাণাদির মত স্কন্দপুরাণের মানসখণ্ডে ইহা উপাখ্যানের আকারেই বর্ণিত হইয়াছে। ঋষি দত্তাত্রেয় কৈলাস দর্শন ও মানস সরোবর যাত্রা করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসিলে, কাশীরাজ ধন্বন্তরী তাঁহাকে যাত্রাপথ জিজ্ঞাসা করিলে ঋষিবর দত্তাত্রেয় পথের নিরূপণ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রকথিত পথের বর্ণনা পড়িয়া অনেকগুলি স্থান সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। যদি প্রসিদ্ধ স্থানগুলি এবং বিশেষ করিয়া নদীগুলি নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা হইলে মানস সরোবর ও কৈলাস শিখরও নির্দ্দিষ্ট হইল। "ইহা মানস সরোবর নয়, ইহা মান তালাও" বলিয়া, মান সরোবর ও কৈলাসের কথা উড়াইয়া দিলে, কারণ না দেখাইয় সিদ্ধান্ত করা হয়। লিখিয়া বা লিখিয়া নদী যে গণ্ডকী ইহাতেও যদি সন্দেহ হয় তাহা একবার বিবেচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু সরযূ ও রামগঙ্গা নদী যে অন্য স্থানে নাই, এবং কালী ও গৌরীগঙ্গার সঙ্গমস্থান যে আস্কোটের কাছে, তাহাতে কোন মতেই সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

পথের বিষয় আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ ও রাস্তায় কি কি দরকার হইবে ও কেমন করিয়া, কেমন বেশে যাইলে সুবিধা হইবে, ইহারই একটা স্থির করা বাকী রহিয়া গেল। কিন্তু এগুলিও করিতে বেশী দেরী লাগিবে না। সারভে অব্ ইণ্ডিয়া আফিস হইতে বড় স্কেলের তিন চারি শীট ম্যাপ আনাইলাম। সেরিং সাহেব পুস্তকেও একটি সুন্দর ম্যাপ ছিল। হিমালয় পর্ব্বতের বহু পুরাতন কিন্তু অতি উত্তম ম্যাপ একখানি পূর্ব্বে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এইগুলির দ্বারা ভাল করিয়া পথটি বুঝিয়া লইলাম। জেলা গেজেটিয়ার, এটকি-

সন্ সাহেবের 'হিমালয়ান ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' ভাল করিয়া পড়িয়া লইলাম। ইহা দ্বারা পথের স্থানগুলি অবস্থাগুলি কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তিব্বত দেশে বড় চোর ডাকাতের ভয়। পার্ব্বতীয় প্রদেশে অনেক অসভ্য জাতির বাস, তাহারাই ভেড়া ইত্যাদি লইয়া মান সরোবর ও কৈলাসের নিকটস্থিত মুণ্ডি (বাজার) গুলিতে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে আসে, এবং অবসর পাইলে চুরি ডাকাতি করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করে না। বইগুলি পড়িয়া এই ধারণাটি আরও দৃঢ়মূল হইল। একবার মনে করিলাম সঙ্গে একটি বন্দুক, না হয় রিভলভারটি লইয়া যাই। কিন্তু, পরে ভাবিলাম, যদিও আমি লাইসেন্স বলে ভারতবর্ষে ঐ অস্ত্রগুলি রাখিতে পারি কিন্তু ভারতের বাহিরে সেগুলি লইয়া যাইলে অন্ততঃ অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে কায হইবে। তিব্বতের আপত্তি না হইলেও, ভারতবর্ষীয় আইন অনুসারে একটা আপত্তি হইবে। আরও ভাবিলাম, যদি সভ্য ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনাধীনে সহরে বাজারে হাজার হাজার লোকের সম্মুখে ডাকাতি হইতে পারে, তা হইলে তিব্বতের বর্ব্বর জাতিরা যে তাহা করিবে, সেটা কিছুই বিচিত্র নহে। এই সেদিন খবরের কাগজে পড়িলাম যে, কলিকাতা সাইকেল ক্লাবের কতকগুলি যুবক কলিকাতা হইতে পেশোয়ার অভিমুখে সাইকেলে দেশ পর্য্যটন করিতে বাহির হইয়াছিল; কাশী ও প্রয়াগ অঞ্চলে ডাকাইতদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কয়েকজন বিশেষরূপে জখম হওয়ায়, তাহারা যাত্রা পূর্ণ করিতে বিরত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অতএব আমি বিদেশে একা, বন্দুক কি রিভলভার লইয়া কি নিজেকে রক্ষা করিতে পারিব? অতএব অস্ত্রশস্ত্র লইতে বিরত হইলাম।

পোষাকের বিষয়—অনেকটা নেপালীর মত করা স্থির করিলাম। ভগবৎকৃপায় ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষাই—পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রীয়—সকল ভাষাই কহিতে শিখিয়াছি; নেপালীও বেশ বলিতে পারি; অতএব নেপালী সাজলে ভাল হয়, কারণ যে রাস্তা দিয়া যাইব, উহা ভারতের আলমোরা জেলা ও নেপালের সীমার ধারে গিয়াছে। এই পথে নেপালের পশ্চিমাংশের জেলা ডোটি ইত্যাদি হইতে অনেক নেপালী যাতায়াত করে। অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী কি কি লইতে হইবে তাহার জন্য আর বিশেষ ভাবিতে হইল না। এইবার একটা শুভ দিন দেখিয়া শ্রীহরি বলিয়া যাত্রা করিতেই হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

গোহদ দুর্গ

গোহদ স্বাধীনরাজ্য গোয়ালিয়রের অন্তর্গত তনবরগড় জেলার একটি পরগণা। তনবরগড় চম্বাল নদের দক্ষিণতীরবর্ত্তী এবং গোয়ালিয়রের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ইহারই উত্তরে অর্থাৎ চম্বালের উত্তর তীরে, পশ্চিমে ধোলপুর রাজ্য এবং পূর্ব্বে আগ্রা জেলা। গোয়ালিয়র ভিণ্ড রেলপথ (Gwalior Bhind State Light Railway) গোয়ালিয়র হইতে টেরগা বা গোহদ রোড ষ্টেশন ছাব্বিশ মাইল, তথা হইতে অশ্বযানে গোহদ সহর চারি মাইল মাত্র। গত বৎসর কার্ত্তিক মাসে গোয়ালিয়রে অবস্থান কালে আমার গোহদ দুর্গ দেখিবার সুযোগ জুটিয়াছিল। আজ এই প্রবন্ধে গোহদ দুর্গের অতীত কাহিনী ও বর্ত্তমান অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

গোহদের সহিত রাণা ভীম সিংহের স্মৃত আজিও বিজড়িত রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৭০৭ হইতে ১৭৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় বত্রিশ বর্ষকাল গোহদ, ভদৌরিয়া রাজপুতদিগের দ্বারা অধিকৃত ছিল। জাঠ রাণা ভীম সিংহ একদা রাজপুতগণ কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়া পেশবার নিকট কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অল্প দিনেই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। পেশবা বাজীরাও ভীমসিংহের কার্য্যকুশলতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে গোহদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত বত্রিশ বৎসরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ রাও কর্ত্তৃক গোহদ আক্রমণ। (ইনি পেশবা রঘুনাথ নহেন, এবং ইঁহার বিশেষ পরিচয়ও পাওয়া যায় না।) রঘুনাথ রাও গোহদ আক্রমণ করিলে রাণা তাঁহাকে তিনলক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পেশবাদিগের একচ্ছত্র হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে, পেশবা রাজশ্রী ক্রমশঃ তদীয় সামন্তগণের অধীন হইয়া ছিল। এই সময়ে সিন্ধিয়ারাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহাদজি সিন্ধিয়া, সেনাপতি দ'বোয়ানের (De Boigne) সহায়তায় রাজ্যবিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন। গোহদের তাৎকালীন রাণা লোকেন্দ্রসিংহ সেই অবকাশে গোয়ালিয়রের দুর্গ আক্রমণ করেন। তৎকালে গোয়ালিয়রের গিরিদুর্গ রাজাদিগের একটি লোভনীয় বস্তু ছিল এবং দুর্গের সহিত গোয়ালিয়রের ভাগ্যচক্রও নিয়ন্ত্রিত হইত। অনুমান চারি বৎসরকাল গোয়ালিয়র দুর্গ রাণার অধীন থাকে; পরে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মহাদজি সিন্ধিয়া রাণাকে যুদ্ধে পরাজিত ও দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মাধো রাও পেশবার মৃত্যুর পর পেশবার রাজতক্ত লইয়া যখন বিবাদ চলিতেছিল, তখন রঘুনাথ ওরফে রাঘোবা, রাজতক্তের দাবী করিলে, মহাদজি সিন্ধিয়া প্রথমতঃ হোলকা রর সহিত একযোগে রঘুনাথের সহায়তায় অগ্রসর হন, কিন্তু ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা উভয়েই পেশবাকে ত্যাগ করেন। রঘুনাথ অতঃপর ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ইংরাজদিগের সহিত কিছুদিনের জন্য সিন্ধিয়ারও বিবাদ হইয়াছিল। গোহদের রাণাও ঠিক এই সময়ে সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে ইংরাজদিগের সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় রাষ্ট্রকুশল হেষ্টিংস্ উদীয়মান মহারাষ্ট্র শক্তির খর্ব্বতাবিধান মানসে মেজর পপ্‌হামকে (Major Popham) অবিলম্বে গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের বিশ্বাস ছিল যে গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করিতে পারিলে সিন্ধিয়ার বিজয়-প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হইবে। এই ঘটনাকে তিনি বরাবর রাষ্ট্রীয় কূটনীতির একটি উত্তম দৃষ্টান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন; এমন কি, "ডিপ্লোম্যাসির" হিসাবে পলাশী ব্যাপারের নিম্নেই ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, কিরূপে পপ্‌হাম্ সাহেব স্তব্ধ নিশীথে রাণার কয়েকটি মাত্র বিশ্বস্ত লোকের সাহায্যে অত্যুচ্চ গিরিদুর্গ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দুর্গ অবরোধ করিতে সমর্থ হন, তাহার বিশদ বিবরণ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের "মিলিটারী ক্যালেণ্ডারে" প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত উক্ত ঘটনার সম্বন্ধ এই যে, গোহদের রাণার সহায়তা পাইয়াই ইংরাজগণ গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ উক্ত দুর্গ গোহদের রাণাকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ দেন এবং ঐ বৎসর যে মাসেই রাণা দুর্গ পুনরধিকার করেন। দুর্গ প্রাপ্ত হইলেও দুর্জ্জয় মহারাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষা অসম্ভব হইয়াছিল। পরবৎসরই সিন্ধিয়া গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। গোহদের রাণী (লোকেন্দ্রসিংহের পত্নী) এই সময়ে গোয়ালিয়র দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, শত্রুকর্ত্তৃক দুর্গ পরিবেষ্টিত দেখিয়া তিনি সহচরীদিগের সহিত গৃহের দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন।

অতঃপর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ সল্‌বাই এর সন্ধি উপলক্ষ্যে সিন্ধিয়া রাজের সীমান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই সন্ধি ভারত ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা।

সন্ধির চতুর্থ সর্ত্তে এইরূপ স্থির হয় যে, গোহদের রাণা যত দিন না ইংরাজদিগের সহিত সন্ধির পণ ভঙ্গ করিবেন ততদিন সিন্ধিয়াও রাণার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না। চতুর্থ সর্ত্তটি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল,—

"Fourthly, that whatever country of the Maharajah's shall have been taken possession of by the Company on this side of the Jamuna, Colonel Muir shall restore; and the Maharajah shall agree not to molest or disturb the country of Lokindar Rana Chatter Singh Bahadoor, Deleer, Jung, nor the Fort of Gwalior which is at present in his possession, so long as the Rana Saheb observes his treaty with the English."

উল্লিখিত সর্ত্তের অন্তর্গত country on this side of the Jamuna অর্থে যমুনা নদীর দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী ভূ-ভাগ বুঝাইতেছে। বলা বাহুল্য রাণা সন্ধির পণ রক্ষা করেন নাই এবং তজ্জন্য ইংরাজদিগের সাহায্য-লাভে বঞ্চিত হওয়ায় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর সিন্ধিয়া মহারাজ গোহদ আক্রমণ করিয়া উহা স্বরাজ্য-ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তদনন্তর আর একবার সিন্ধিয়া রাজার সহিত গোহদের বিবাদ হইয়াছিল। মহারাজ সিন্ধিয়া অম্বাজি ইংলেকে গোহদ রক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। অম্বাজি কিন্তু ইংরাজের বিজয়শ্রীতে আকৃষ্ট হইয়া গোপনে ইংরাজদিগের সহিত এক নূতন সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন ও তদনুসারে গোহদের দুর্গ তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। অম্বাজি এই সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী কার্য্য করেন নাই; ফলে, তিনি ইংরাজ-দিগের বিরাগভাজন হন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল হোয়াইটের (General White) আদেশক্রমে ক্যাপ্টেন্ ম্যাক্লিয়ড্ (Captain Macleod) রাত্রি:যাগে আটশত সৈন্যসহ গোহদ অবরোধ করতঃ অম্বাজিকে পরাজিত করেন। যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে শতাধিক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতঃপর, প্রায় এক বৎসর কাল গোহদ সিন্ধিয়া মহারাজের প্রাপ্য কি না, তাহা লইয়া গোল চলিয়াছিল, কিন্তু কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পূর্ব্বেই ইংরাজ সরকার উহা রাণাকেই ফিরাইয়া দেন। ইহা সিন্ধিয়ার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারেল্ লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া রাণার প্রতি সহানুভূতি উঠাইয়া লইবার আদেশ দিলে, সিন্ধিয়া আর একবার গোহদ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই হইতে গোহদ সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত আছে। ধোল-পুরের বর্ত্তমান রাণার পূর্ব্বপুরুষগণই গোহদের রাণা ছিলেন।

গোহদ দুর্গ রাণা ভীমসিংহ কর্ত্তৃক ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা সহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। উত্তরে শীর্ণকায়া বৈশালী নদী (চলতি নাম, বৈশ্লী) দুর্গের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকেই উচ্চ প্রাচীর, ও তৎপশ্চাৎ সুপ্রশস্ত পরিখা। দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে যাবতীয় প্রাচীর, তোরণদ্বার ও গম্বুজ সমূহ এবং অভ্যন্তরের গৃহাদি প্রায় সমস্তই আমূল প্রস্তরনির্ম্মিত। সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে পাহাড় কিংবা পর্ব্বতের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ রেলওয়ে স্থাপনের পূর্ব্বে কি প্রকারে যে এমন একটি বিশাল প্রস্তরদুর্গ গঠিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহলের পর মহল, প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ— এইরূপে দুর্গটি বহুখণ্ডে বিভক্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডের চতুর্দ্দিকে চকমিলান দ্বিতল ও ত্রিতল কক্ষশ্রেণী। সর্ব্ব-নিম্ন তলে প্রবেশদ্বারের পরেই বামপার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড দালান, অনেকটা আমাদের দেশের ধনীগৃহের পূজার দালানের মত। দুর্গের বহির্দ্দেশ, রক্ষী ও কর্ম্মচারী-বর্গের বাসের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত; প্রাচীরের গাত্র-সংলগ্ন কক্ষরাজির ভগ্নাবশেষ আজিও তাহার সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্দর-মহলে উপরে কতক-গুলি গৃহের নির্ম্মাণ-প্রণালী কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র রকমের। ঐ সকল গৃহের ও তৎসম্মুখস্থ দালানের প্রাচীর অপেক্ষা-কৃত মসৃণ ও কারুকার্য্য সম্পন্ন। কোন কোন অঙ্গনের

প্রাচীরেও প্রস্তর শিল্পের সামান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। ভিতরের দুইটি প্রবেশ দ্বারে দুই যোড়া বৃহৎ কাষ্ঠ-কবাট ব্যতীত আর কোনও গৃহে দরজা কিংবা জানালায় কবাট আছে বলিয়া বোধ হইল না। উত্তরের সর্ব্বপ্রথম প্রাচীরের ভিতর দিয়া একটি গুপ্ত পথ ও সিঁড়ি ক্রমান্বয়ে বৈশালীর গর্ভে গিয়া মিশিয়াছে। আমরা এই পথে একেবারে নদীর তীরে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। নদীর এক পারে সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাচীর উন্নত-শিরে দণ্ডায়মান, অপর পারে সুদূরবিস্তৃত হরিৎ শস্যক্ষেত্র। পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে পূর্ব্বদিকের দুর্গ-প্রাচীর তোরণ ইত্যাদি বহুস্থানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ এখন জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় শৃগাল ও সজারু প্রভৃতির আশ্রয়স্থল হইয়াছে।

এই দুর্গের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বেই একটি প্রশস্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকা, দূর হইতে ইহাকেও একটি ছোট-খাট দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহা "প্যালেস" নামে অভিহিত; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাণা ছত্রপতি সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বয়সে দুর্গাপেক্ষা এই প্রাসাদ আধুনিক এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অভ্যন্তরে সুপ্রশস্ত অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ত্রিতল কক্ষরাজি এবং উহার মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সমূহ সমান্তরাল ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। অনুমান হয় যে উৎসবাদির সময় ঐ সকল প্রকোষ্ঠ, বিশিষ্টা মহিলা দলের দ্বারা অধিকৃত হইত। বর্ত্তমানে প্রাসাদের সর্ব্বনিম্ন তলে পরগনার মুনসেফি, তহশিল অফিস ও খাজনাখানা বা ট্রেজারী প্রভৃতির কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সরকারী সভা-সমিতির অনুষ্ঠানও এই প্রাসাদে হইয়া থাকে। প্রাসাদের বহির্ভাগের চত্বরে সেকালের তিনটি পুরাতন কামান ও ভিতরের প্রাঙ্গণে ছোট বড় কতকগুলি গোলা আজিও রাণার পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। দুর্গের ন্যায় প্রাসাদটিরও পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক ব্রিটিশ ও মহারাষ্ট্র সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া এবং ফুটিয়া গিয়াছে। সেই সকল ভগ্ন অংশ অদ্যাপি দর্শকদিগের জন্য তদবস্থায় রক্ষিত হইতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে পরিখা-সংলগ্ন একটি দীর্ঘিকা ও তন্মধ্যে শ্বেত-প্রস্তরের একটি ক্ষুদ্র দেব-মন্দির সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গোহদের একটি আধুনিক দৃশ্য বৈশালী নদের বাঁধ। ইহা গোয়ালিয়র ইরিগেশন্ ডিপার্টমেণ্টের প্রস্তুত। নদীর সঞ্চিত জলরাশি জল-প্রপাতের ন্যায় দিগন্ত মুখরিত করিয়া সবেগে প্রায় বিশ ফুট নিম্নে পতিত হইতেছে। নদীর এই অংশ মৎস্যবহুল। পতনশীল জলোচ্ছ্বাসের ভিতর ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্যের উল্লম্ফন-দৃশ্য বড়ই মনোরম।

উপসংহারে আর একটি দৃশ্যের উল্লেখ করিতে চাই। রেল-পথের উত্তর পার্শ্বে দিগন্ত-প্রসারিত তৃণ ও শস্য ক্ষেত্রে ময়ূর ও কৃষ্ণসার যূথের নির্ভয় বিচরণ, এতদ্দেশে নবাগত বাঙ্গালী হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সৃষ্টি করে। গোয়ালিয়র ভ্রমণকারীর পক্ষে গোহদও যে একটি দর্শনীয় স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই।*

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

---

* এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক ভাগ কোন স্বতন্ত্র গবেষণার ফল নহে, বস্তুতঃ ইহা ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত Central India State Gazetteer Series এর অন্তর্গত Luard সাহেব-কৃত Gwalior Gazetteer নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে গোহদ বৃত্তান্ত গোয়ালিয়রের ইতিহাসের সহিত মিশ্রিত থাকায় প্রয়োজনীয় অংশগুলি বাছিয়া লইয়া ধারাবাহিকরূপে লিখিয়াছি। ইহাতে ঐতিহাসিক ক্রমবিন্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিলে তাহা মার্জ্জনীয়।—লেখক।

খাইবর পথে

আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, হিমাচলের তুষার কিরীট শৃঙ্গশ্রেণী সমন্বিত, মনোমুগ্ধকর ফলপুষ্প বৃক্ষরাজি শোভিত এবং উপলঘাতিনী কলনাদিনী বিতস্তার সুমধুর ধ্বনি মুখরিত জগতে নন্দনকানন তুল্য প্রকৃতির লীলাভূমি কাশ্মীর উপত্যকা বিষণ্ণচিত্তে ত্যাগ করিয়া আমরা শীতের প্রারম্ভে একদিন অপরাহ্নে রাউলপিণ্ডী নগরে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। সে রাত্রে পূর্ব্ব পরিচিত জনৈক বন্ধুর বাটীতে সুখ ভোজনে ও সুনিদ্রায় পথশ্রম দূর করিয়া পরদিবস প্রাতে আমাদের কয়েকটি সংযাত্রী গৃহে প্রত্যাগমন করিতে ব্যগ্র হইলেন। আমরা অবশিষ্ট তিন জন ইতিহাস-বিশ্রুত খাইবর গিরিসঙ্কট দেখিবার মানসে পেশোয়ার যাত্রা করিলাম। পথে দুইটি ছোট ছোট সুরঙ্গ পার হইয়া প্রায় মধ্যাহ্নে আটক ষ্টেসনে উত্তীর্ণ হইলাম। এই স্থানে স্নানাহার করিয়া সিন্ধুনদের সুবিখ্যাত সেতু দর্শন করিবার ইচ্ছায় গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। বিপুল সিন্ধুর বেগবান স্রোত সংযত করিয়া সেতুটি সুদৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা যদিও দৈর্ঘ্যে শোণ, পদ্মা, গোদাবরী প্রভৃতির সেতুগুলির অপেক্ষা অনেক ছোট, তথাপি নির্ম্মাণ কৌশলে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। স্রোতের প্রচণ্ড বেগঃহ্রাস করিয়া পুলটিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক স্তম্ভের সম্মুখে জলের উপর আর একটি করিয়া স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুটি দুর্গ বিশেষ; শত্রুর আগমন রোধ করিবার জন্য ছাদের উপর কামান স্থাপনের অনেকগুলি ছিদ্র আছে। পুলের চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরবর্ত্তী ট্রেণে পেশোয়ার যাত্রা করিলাম। পথে নাওসেরা ইত্যাদি কয়েকটি বৃহৎ সেনানিবাস লক্ষিত হইল। এদিককার বড় বড় ষ্টেসন গুলি প্রায় সমস্তই সেনা নিবাস; দেখিলেই প্রতীয়মান হয়, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইংরাজ রাজ কর্ত্তৃক কিরূপ সুরক্ষিত।

সন্ধ্যা অতীত হইলে আমরা পেশোয়ার ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। এখানে কমিসেরিয়টের তদানীন্তন বড় বাবু শ্রীযুক্ত বেণীমাধব গাঙ্গুলীর নামে রাউলপিণ্ডী হইতে একখানি পত্র আনিয়াছিলাম। ষ্টেসন হইতে টোঙ্গা যানে প্রায় রাত্রি ৮টার সময় তাঁহার বাটী উপস্থিত হইলাম। রাউলপিণ্ডীতে শুনিয়াছিলাম যে, পেশোয়ারে রাত্রিকালে পথভ্রমণ বিপজ্জনক; টোঙ্গা চালকের আকৃতিও ভীতিব্যঞ্জক ছিল। সেজন্য কিঞ্চিৎ অশান্ত চিত্তে আশ্রয় উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। বেণীবাবুর দর্শন পাইয়া আমরা আশ্বস্ত ও পরম আপ্যায়িত হইলাম। তিনি অতি সজ্জন ও অমায়িক; আমাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যাহাতে অতিথিদিগের কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

আমাদের পেশোয়ারে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য সুপ্রসিদ্ধ খাইবর পাস দর্শন। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে আপাততঃ দুই দিন ঐ পথে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। ভারতবাসীদিগের গতায়াতের জন্য সপ্তাহে কেবল দুইদিন নির্দ্দিষ্ট আছে। খাইবরের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশে আফ্রিদি, জাক্কাখেল, মামুদ প্রভৃতি যে সকল ভীষণ অসভ্য মুসলমান জাতিসমূহ বাস করে, তাহারা কাবুলের আমীরের বা ইংরাজরাজের বশ্যতা স্বীকার করে না। শুনিলাম, তাহাদের দলপতিগণ খাইবর যাত্রীদিগকে নিরাপদে গতায়াত করিতে দিবার জন্য বৃটিশ গবর্মেণ্টের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পায়, এবং এজন্য সপ্তাহে দুই দিন তাহাদিগকে নিঃশঙ্কায় গন্তব্য স্থানে যাইতে দেয়। অগত্যা বেণীবাবুর আশ্রয়ে আমরা দুই দিন থাকিতে বাধ্য হইলাম।

পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা বেণীবাবুর সহিত এখানকার প্রসিদ্ধ ধনী ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনর শ্রীযুক্ত লালা বালমুকুন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে



খাইবর গিরিসঙ্কট—কাফলা যাত্রা।
(মেসার্স বোর্ণ এণ্ড শেপার্ড কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে)

যাইলাম। ইঁহারই অর্থ সাহায্যে পেশোয়ারে হাঁসপাতাল ও একটি ঘটকা স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা ইঁহাকে বিশেষ সম্মান করেন। শুনিলাম, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর সময় ইনি গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন। বেণীবাবুর সহিত ইঁহার বিশেষরূপ পরিচয় থাকায়, আমাদের সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদের খাইবর পাস দেখিবার আগ্রহ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সীমান্ত প্রদেশের ইদানীন্তন সেনাপতি জেনারেল রস কেপেলকে (পরে ইনি নাইট হইয়া উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন) জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার কয়েকটি বন্ধু সেইদিন খাইবর পথে যাইতে পারেন কি না; কিন্তু যে উত্তর আসিল তাহাতে আমরা আপাতত দুই দিন যাইবার আশা পরিত্যাগ করিলাম। সৈন্যাধ্যক্ষ লিখিলেন যে, আমাদের যাইবার অনুমতি দিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু প্রাণের জন্য তিনি দায়ী হইবেন না; অসভ্য জাতির অনুগ্রহের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিবে। অতএব দুইদিন পরে যাওয়াই স্থির করিলাম।

লালা সাহেব আঙ্গুর বেদানা সরদা ইত্যাদি আনাইয়া আমাদিগকে খাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কাবুলের যে সকল ফল আমাদের দেশে বিক্রীত হয়, এখানকার সদ্য আনীত ফলের সহিত তাহাদের তুলনাই হয় না। কাবুল হইতে বড় বড় বাক্সে আঙুর আসে; পেশোয়ারের বাজারে ঐগুলি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট চারি পাঁচ বাক্সে রাখা হয় এবং তাহাই আমরা দেখিতে পাই। রেলে আসিতে ফলগুলি শুকাইয়া ছোট হইয়া যায়, অনেক পচিয়া

যায়। সরদা গুলি এখানে হরিৎ বর্ণ, দেখিলে বোধ হয় অপক্ক; কিন্তু আস্বাদনে এত মিষ্ট যে খাইয়া জলপান না করিয়া থাকা যায় না। যে মেওয়া গুলি পেশোয়ারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া যায়, সেগুলি এখানকার বাজারে অতি সামান্য মূল্যে বিক্রীত হয়; যে ফলগুলি উত্তম অবস্থায় আসে, সে সমস্ত ভারতের নানা স্থানের ব্যবসায়ীরা লইয়া যায়।

কিঞ্চিৎ জলযোগের পর লালা সাহেবের অনুচরের সহিত আমরা হরিসিংহের দুর্গ দেখিতে গেলাম। হরিসিংহ পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের অন্যতম সেনাপতি এবং এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তাঁহারই বাহুবলে অজিতপূর্ব্ব পাঠান রাজ্য কাবুল পর্য্যন্ত শিখদিগের হস্তগত হইয়াছিল এবং নাদিরশা কর্ত্তৃক অপহৃত কোহিনুর মণি আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমাদের দেশে রমণীগণ যেরূপ "বর্গী এল দেশে" বলিয়া শিশুদিগকে ভয় প্রদর্শন করে, আফগান রমণীগণ এখনও সেইরূপ হরিসিংহ আসিতেছে বলিয়া ছেলেদের ঘুম পাড়ায়। দুর্গটি ছোট এবং অধিকাংশ মৃণ্ময়। শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য উপরে কামান সাজাইবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সময়ে এরূপ দুর্গের কোন সামর্থ্য ও আবশ্যকতা না থাকিতে পারে। কিন্তু রণজিতের রাজত্ব কালে ইহার যে দৃঢ়তা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতঃপর আমরা শিখ ধর্ম্মশালা, মন্দির, বাজার ইত্যাদি দেখিলাম। বেণীবাবু তাঁহার আর এক সম্রান্ত শিখ বন্ধুর বাটীতে লইয়া গেলেন। সেখানেও সুস্বাদু কাবুলি ফলের বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিলাম। আমাদের দেশে বৈঠকখানায় যেমন তাম্রকূট সেবনের সরঞ্জাম থাকে এবং উহা দ্বারা আগন্তুকের অভ্যর্থনা করা হয়, এখানে তৎপরিবর্ত্তে টেবিলের উপর সুমিষ্ট কাবুলি ফল সজ্জিত থাকে এবং কোন ভদ্রলোক আসিলে তাহা দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

মধ্যাহ্নে আমরা প্রত্যাগমন করিয়া বেণীবাবুর বাটীতে স্নানাহার করিলাম। আমরা এখানে প্রথম দুম্বার মাংস খাইলাম। এরূপ উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু মাংস পূর্ব্বে কখনও খাই নাই। কলিকাতা নিউমার্কেটের প্রথম শ্রেণীর মটনও ইহার সহিত তুলনা হয় না। দুম্বা জাতীয় মেষগুলি বড় হইলে তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে খানিকটা মাংস ও চর্ব্বি বর্দ্ধিত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে, এই চর্ব্বি কাটিয়া লইয়া কাবুলিরা ঘৃতের ন্যায় ব্যবহার করে; এই বর্দ্ধিত অংশ কর্ত্তন করিলেও মেষ বাঁচিয়া থাকে ও ক্ষতস্থান কিছুদিন পরে শুকাইয়া যায়।

পর দিবস প্রাতঃকালে আমরা একখানি টোঙ্গা ভাড়া করিয়া পেশোয়ার হইতে নয় মাইল দূরে বারা নামক স্থানে পৌঁছিলাম; এই স্থানেই আফগানিস্থান ও ইংরাজ রাজ্যের সীমা। ইহার নিকটবর্ত্তী আমীরের অধিকারভুক্ত অন্যূন একশত বিঘা জমীতে পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। শুনিলাম এই চাউল বিক্রয় হয় না; আমীর ইহা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখেন এবং কিয়দংশ ইংলণ্ডেশ্বর, ভারতের রাজপ্রতিনিধি ইত্যাদিকে উপহার প্রেরণ করেন। অতঃপর নিকটবর্ত্তী জলের কল দেখিতে যাইলাম। কয়েকটি জলাশয়ের সুস্বাদু জল এই স্থান হইতে নল সহকারে পেশোয়ারে নীত হয়। বৈকালে পেশোয়ারের বৃহৎ বাজারগুলি পরিদর্শন করিলাম। চাউল, ডাল কড়াই প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন বাজার 'চাউল কা মণ্ডী' 'দাল কা মণ্ডী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদনন্তর এখানকার সুবৃহৎ সরাই দেখিলাম। কাবুলের ফল প্রভৃতি লইয়া যে সব ব্যবসায়ী পেশোয়ারে আসে, তাহারা এই সরাইয়ে অবস্থান করে এবং ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। তাহাদের ভারবাহী শতাধিক উষ্ট্রও তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছে; শুনিলাম আগামী কল্য উহাদের পৃষ্ঠে মাল বোঝাই করিয়া খাইবর পথে আফগানিস্থানে প্রত্যাগমন করিবে। এই সরাইয়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবসাদারেরা বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া কাবুলের ফল ক্রয় করিয়া দেশ দেশান্তরে চালান দেয়।

পেশোয়ারে কয়েকটি বঙ্গবাসীর সহিত আলাপ হইল। শুনিলাম, পূর্ব্বে তাঁহাদের সংখ্যা অনেক অধিক

ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃই হ্রাস হইতেছে। ইঁহারা এখানে একটি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; তথায় মধ্যে মধ্যে উৎসব হয়। কোন বঙ্গবাসী পেশোয়ারে উপস্থিত হইলে ইঁহাদের আদর ও অভ্যর্থনার সীমা থাকে না। বঙ্গ বিহারে এরূপ অতিথি সৎকার বিরল। অপরাহ্নে ইঁহাদের সহিত আমরা ভ্রমণে নির্গত হইতাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। এখানে দিবাভাগেও পথিমধ্যে লুটপাট ও খুন হয়; ভিক্ষুকদিগের হস্তেও এক একটি দেশী বন্দুক আছে এবং কথায় কথায় তাহা উত্তোলন করে। দুই জনে কলহ হইবামাত্র বলে "কেন আমার একটি 'কারতুজ' লোকসান করিবে?" মনুষ্যের প্রাণনষ্ট হওয়া অপেক্ষা কারতুজ নষ্ট ইহারা অধিক ক্ষতি মনে করে। পুলিস প্রহরীরাও রাত্রে তস্কর ও দস্যুদিগের সম্মুখীন হইতে ভয় পায়। প্রহরীদের জন্ম পথে মধ্যে মধ্যে উচ্চ মঞ্চ আছে, তাহাতে মই লাগাইয়া আরোহণ করিয়া রাত্রিকালে সিঁড়িটি উপরে উঠাইয়া লয়। একদিন বাজারে আমি কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার ইচ্ছায়, দোকানীর দর অপেক্ষা কিছু কম দিতে চাহিয়াছিলাম। সে এরূপ রাগান্বিত হইল যে, সঙ্গীরা তাহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত না করিলে আমার কি অবস্থা হইত বলা যায় না।

তাহার পর, খাইবর পথে যাইবার দিন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জনস্রোত অবিরাম যাতায়াত করিতে লাগিল। ভীতিজনক গিরিসঙ্কট আজ মনুষ্যের কোলাহলে, উষ্ট্রের ও অশ্বযানের শব্দে মুখরিত। আমরা অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। বেণীবাবুও আমাদের সহিত যাইবার জন্ম আফিস হইতে একদিনের ছুটি লইলেন এবং একখানি দ্রুতগামী টোঙ্গা আনাইয়া দিলেন। খাইবর পথে তিনটি ইংরাজ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; প্রথমটি ভারতবর্ষের সীমায় পেশোয়ার হইতে কয়েক মাইল দূরে, নাম জমরাদ; দ্বিতীয় আলি মসজিদ, গিরিসঙ্কটের মধ্যস্থলে, জমরাদ হইতে দশ মাইল দূরে; তৃতীয় লুণ্ডি কোটাল, খাইবরের শেষ প্রান্তে এবং আলি মসজিদ হইতে আবার দশ মাইল পশ্চিমে। লুণ্ডি কোটাল পর্য্যন্ত টোঙ্গায় যাইলে সে দিন আর প্রত্যাগমন করা যায় না; তজ্জন্য আমরা আলি মসজিদ পর্য্যন্ত যাইয়া প্রত্যাগমন করিব স্থির করিলাম। পূর্ব্বরাত্রে বেণীবাবু আমাদের জন্ম প্রচুর খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা সঙ্গে লইয়া আমরা টোঙ্গায় উঠিলাম। সহযাত্রী ম—বাবু শুনিয়াছিলেন যে, খাইবরের হিংস্র মুসলমানগণ কাফের দেখিলেই হত্যা করে; সে জন্ম তিনি মস্তকে এতদ্দেশীয় মুসলমানের ন্যায় পাগড়ী বাঁধিয়া লইলেন, এবং নাম জিজ্ঞাসা করিলে শেখ রহিম বলিবেন স্থির করিলেন। পেশোয়ার হইতে জমরাদ পর্য্যন্ত রেল আছে, কিন্তু আমরা সে পথে না গিয়া পেশোয়ার হইতেই টোঙ্গায় যাত্রা করিলাম। অতি সুন্দর সুপ্রশস্ত পথ, আমাদের অশ্বযান তীরবেগে ধাবিত হইল। কোন কোন স্থানে পার্ব্বত্য পথের ন্যায় 'চড়াই' ও 'উতরাই' আছে, কিন্তু তাহাতে অশ্বযান অক্লেশে উঠিতে ও নামিতে পারে। পথের দুই পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বতমালা সানুদেশে বহুশতাব্দীর কলহ ও বিষাদ কাহিনী ক্ষেপন করিয়া এখনও সমভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সেকেন্দর শাহ হইতে নাদির শাহ পর্য্যন্ত বিদেশীয় দস্যুরাজগণ এই পথে দুর্নিবার সৈন্স স্রোত প্রবাহিত করিয়া কতবার ভারতবর্ষের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছে! তাহাদের পদভরে এই পুরাতন পথ কতবার কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে!

গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আমরা একবার চতুর্দ্দিক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলাম। কত কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল ও হৃদয় কতভাবে উদ্বেলিত হইল!

পথের ধারে পর্ব্বতে উঠিতে অগ্রসর হইবামাত্র জনৈক পাঠান সৈনিক প্রহরী আমাদের নিষেধ করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে উর্দ্ধে কয়েকটী গুহা দেখাইয়া বলিল যে, যে সমস্ত অসভ্যজাতি ঐ গুলিতে বাস করে, এই পর্ব্বতশ্রেণী তাহাদের অধিকৃত; কেবল পথটী বৃটিশ গবর্মেণ্টের দখলে আছে। যদি কেহ

পথের বাহিরে যায় তাহার জীবন রক্ষার দায়িত্ব কাহারও নাই। গিরিরাজির সানুদেশে বৃক্ষলতাদিশূন্য পথ হইতে উপরে অনেকগুলি গুহা লক্ষিত হয়। শুনিলাম অনেকে সপরিবারে উহাতেই আজীবন বাস করে। সকলেরই নিকটে একটি দেশী বন্দুক আছে; বন্দুক ইহাদের এত প্রিয় যে, কেহ কেহ পুত্রকন্যাদের বিনিময়েও উহা ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের আকার হিংস্রজন্তুর ন্যায়, হঠাৎ দেখিলে আতঙ্ক হয়। টোঙ্গায় অগ্রসর হইয়া ইহাদের কয়েকখানি গ্রামও দেখিলাম। ঘরগুলি সমস্তই মৃণ্ময় ও তৃণাচ্ছাদিত; তথাপি প্রত্যেকটী প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত এবং এক একটী দুর্গবিশিষ্ট। ঐ মঞ্চে কয়েকটী ছিদ্র আছে তাহাতে বন্দুক স্থাপন করিয়া ইহারা শত্রুর প্রতি গুলি বর্ষণ করে। আজ সমস্ত পথটি 'খাইবর রাইফল' দলের পাঠান সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। সপ্তাহে দুইদিন ইহারা এইরূপ প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

আমাদের টোঙ্গা দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া ক্রমে 'কাফলার' নিকটবর্ত্তী হইল। আফগানিস্থানের ব্যবসায়িগণ স্বদেশীয় পণ্যদ্রব্য শত শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া পেশোয়ারে আগমন করে এবং উহা বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষীয় দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া যায়। এই শ্রেণীবদ্ধ ভারবাহী উষ্ট্র ও তাহাদের চালক ও রক্ষকদিগকে 'কাফলা' বা 'ক্যারাভান' কহে। ইহারা প্রত্যুষে পেশোয়ার হইতে বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই খাইবর অতিক্রম করে। উষ্ট্রগুলি ঠিক ভারতবর্ষীয় জন্তুদিগের ন্যায় নহে, বৃহৎ লোমে ইহাদের অবয়ব আবৃত। আমরা এই শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলাম। ক্রমশঃ ইহাদের অতিক্রম করিয়া আমাদের টোঙ্গা অগ্রসর হইল। গিরিসঙ্কট কোথাও বা সঙ্কীর্ণ কোথাও বা সুপ্রশস্ত, দুই দিকে উচ্চশির পর্ব্বতমালা কোথাও বা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, কোথাও বা দূরে চলিয়া গিয়াছে। পথে মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি সমাধি স্তম্ভ দেখিলাম, তন্মধ্যে কয়েকটিতে আফগান যুদ্ধে হত ইংরাজ সেনানীরও নাম খোদিত রহিয়াছে।

মধ্যাহ্নে আমরা দশ মাইল অতিক্রম করিয়া আলি মসজিদ গিরিদুর্গের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। টোঙ্গা হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রামার্থ কম্বল বিছাইতে উদ্যত হওয়ায় নিকটস্থ সৈনিক প্রহরী আমাদের একটি গুল্মের ঝোপ দেখাইয়া তাহার ভিতর বসিতে বলিল। বাহিরে থাকিলে কোনও গুহা হইতে বন্দুকের গুলি আসিয়া আমাদের প্রাণনাশ করিতে পারে। আমরা তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহারই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করত খাদ্যদ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিলাম। অতঃপর সঙ্গীরা দুর্গের উপরে উঠিতে উদ্যত হইলেন। প্রাতঃকাল হইতেই আমার শরীর কিছু অসুস্থ ছিল; পথশ্রমে জ্বর অধিক বোধ হইল; সেইজন্য দুর্গে উঠিতে আমি সাহস করিলাম না। ম—বাবু ও আমি ঝোপের ভিতর বসিয়া রহিলাম। দুর্গটি এক স্বতন্ত্র মন্দিরাকৃতি ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়ায় নির্ম্মিত। আরোহণ ও অবতরণ করিবার একটি মাত্র পথ আছে। পাহাড়টি স্বভাবতই যেন সুদৃঢ় গিরিদুর্গের জন্য সৃষ্ট; অল্প সংখ্যক সৈন্য সাহায্যে ইহাতে আত্মরক্ষা করা যায়। দুর্গের শিখর হইতে শত্রুদিগের গতিবিধি অনেক দূর পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। কামানগুলি উপরে এরূপ ভাবে সজ্জিত আছে যে, ক্ষণকাল মধ্যেই উহা হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে পারে।

সহযাত্রীরা প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে নানাজাতীয় পথিক আমাদের সম্মুখ দিয়া গতায়াত করিল। কাবুল হইতে আর একটি 'কাফলা' শতাধিক উষ্ট্রে মাল বোঝাই করিয়া পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের পৃষ্ঠের আঙুর ও অন্যান্য ফলের সুঘ্রাণে পথ আমোদিত হইল। সঙ্গীরা ফিরিয়া আসিলে আমরা আবার টোঙ্গায় উঠিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পেশোয়ারে পৌঁছিলাম। সেই রাত্রে আহারাদি করিয়া ডাকগাড়ীতে গৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া, দুই দিন পরে পাটনায় উপস্থিত হইলাম।

শ্রীমন্মথনাথ দে।

প্রাচীন য়ুরোপীয় নৃত্য প্রথা

(১৮৫৩ খৃঃ প্রকাশিত Read's Characteristic Dances of all Nations গ্রন্থ হইতে)



ফ্রান্স। "মিনুয়ে দ'লা কু" নৃত্য



ইটালী। নিয়াপলিট্যান নৃত্য



স্পেন। ফান্দাগো নৃত্য



গ্রীস। জাতীয় ওয়াল্টজ্ নৃত্য

মিলনপথে

(উপন্যাস)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক।—গোবিন্দ দাস একজন বৈষ্ণব, তাহার স্ত্রীর নাম রাসমণি। ইহাদের একমাত্র কন্যা মাধবী। গোবিন্দ কোনও সময় জমিদার অমৃতলাল রায়ের একটা বিশেষ উপকার করিয়াছিল, তাই রায় মহাশয় গোবিন্দকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; মাধবী জমিদার বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া অমৃতলালের পুত্র অশোক ও কন্যা উমার সহিত খেলা করিত। অমৃত বাবুর কৃপায় মাধবী তাঁর কন্যা উমার সঙ্গে রীতিমত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। অমৃত বাবু স্বয়ং উমা ও মাধবীকে গান বাজনা শিখাইতেন। মেয়ের এইরূপ শিক্ষাদীক্ষায় রাসমণি বড়ই চিন্তিত হইয়া উঠিত, কিন্তু গোবিন্দদাস, আনন্দে মেয়েকে উৎসাহ দিত। ৮ বৎসর বয়সে মাধবীর বিবাহ হইল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড়ী গেল। তিন দিন পরে সে ফিরিয়া আসিলে উমা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বর কেমন রে?" মাধবী বলিয়াছিল, "একটুও ভাল নয়। অশোকদা যদি আমার বর হত তা কি মজাই হত, তিনজনে মিলে সব সময় খেলা করতাম।"—দুর্ভাগ্য, বর কয়েক মাসের মধ্যেই পরলোকযাত্রা করিল, মাধবী নিশ্চিন্ত হইয়া উমা ও অশোকের সহিত খেলা এবং ক্রমে লেখাপড়ার চর্চ্চায় দিনযাপন করিতে লাগিল।

উমার বিবাহ হইয়া সে শ্বশুরবাড়ী গেল। রায় মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী পরলোক গমন করিলেন। মাধবী এখন যুবতী হইয়াছে, তথাপি সে সর্ব্বদা অশোকের বাড়ী গিয়া, তার ঘর গৃহস্থালীর সব কাযকর্ম্ম দেখে শোনে,—লেখাপড়ার চর্চ্চায় অশোকের সঙ্গে সময় কাটায়। ইহাতে গ্রামে নিন্দা হইল। কেশব বোষ্টমের সঙ্গে রাসমণি তাহার কন্যার মালা বদলের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু মেয়ের আন্তরিক আপত্তি জানিয়া গোবিন্দদাস ইহাতে অমত করিল। অশোক ও মাধবী পরস্পরের সঙ্গ কামনাকে প্রাণপণে দমন করিল। মাধবী আর অশোকের বাড়ী যায় না—অশোকও চট্টগ্রামে তাহার মুন্সেফ ভগিনীপতির নিকট চলিয়া গেল। গ্রামে একজন চিরকুমার বৃদ্ধ বৈষ্ণব ঠাকুর্দ্দা ছিলেন, তাঁহার মনটি ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, স্বভাবটি বড় মধুর। মাধবী তাঁহার কাছে সর্ব্বদা যায়; তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মনে একটু শান্তি পায়। মাধবীর পিতা মাতা, মাধবীকে এই ঠাকুর্দ্দার জিম্মায় রাখিয়া বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছেন। ওদিকে উমা অনেক দিন পরে তার দাদার সঙ্গে পিতৃগৃহে আসিয়াছে।]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"ঠাকুর্দ্দা!"

"কেন দিদি?"

"তোমার জন্তে আজ কি রাঁধব বল দেখি।"

"তোমার যা খুসী।"

"রোজই তো আমার খুসী মত রাঁধি, আজ তোমার খুসী মত রাঁধব। তোমার কি একটি দিনও নিজের ইচ্ছা মত খেতে সাধ হয় না ঠাকুর্দ্দা? নিজের ইচ্ছা-টাকে এমন ক'রে অন্তের ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে নেই। ঠানদিদি যদি থাকত, বা তোমার একটি মেয়ে থাকত, তাদের কাছে যেমন ক'রে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতে, আমার কাছেও তেমনি ক'রে অন্ততঃ একটা দিন তোমার নিজের ইচ্ছাটা প্রকাশ ক'রে বল দেখি।"

"মেয়ে থাকলে তাকে তোর চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারতাম কি না, তা তোর মত কে জানে দাদু? ভিখিরীকে পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে রাজার

সম্পদে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিস। কোনটা রেখে কোন্‌টা ভোগ করব; তা ঠিক করতে পারছিনে ব'লেই তোর খুসীর উপর নির্ভর করছি।"

"চমৎকার বক্তৃতাটা হলো তোমার! যাক্‌—শোন এখন কি রাঁধব। গাছে একটা মোচা পেয়েছি, দু'টো উচ্ছে, বেগুন, আর একটা ছোট কুমড়োও পেয়েছি। ডাল তো হবেই, তার সঙ্গে বেগুন ভাজা। আর মোচাটার ঘন্ট, একটু শুক্‌নি, আর—"

"রক্ষে কর দিদি! আর পেরে উঠব না।"

"হুঁ, রোজই তোমার পাতে পড়ে থাকে কত কিনা!"

"তুমি পড়ে থাকতে দাও কৈ দিদি? তোমার শাসন অমান্য করি, আমার এমন মনের জোর তো নেই-ই বোধ হয়, আর কারও নেই। দেবতারাও দেবীদের চোখ রাঙানি দেখে হতজ্ঞান হয়ে যান। তাই তো আমার ব্রজদুলালের মোহন চূড়া রাধারাণীর রাঙা পায়ের ওপর লুটে থাকে, তাই তো মা কালীর পায়ের নীচে ভোলানাথ পড়ে থাকেন। তোমাদের শক্তির যে সীমা নেই।"

"আমি আর এখন তোমার কথা শুনতে পারিনে,—বেলা হয়ে গেছে রাঁধতে যেতে হবে। চল্লাম এখন।"

"না, একটুখানি দেরী কর; তোমার জন্যে কিছু মাছ নিয়ে আসছি।"

"না, না, আমি মাছ খাবনা। নিরামিষই তো বেশ, নইলে তোমার গায়ে এত জোর হল কেমন করে? তুমি তো বুড়ো হয়ে গেছ।"

"দিন পনেরো তোমার মা বাবা বৃন্দাবন গেছে, এর মধ্যে তো একদিনও মাছ খাওনি তুমি। আজ খেতেই হবে।"

"আমি আর কক্‌খনো মাছ খাবনা, তোমার মত বৈষ্ণব হব।"

"বুঝেছি। কিন্তু আমি ভাবছি কি; তোমার মা বাপ এলে—"

"সে ভাবনা তোমার নয়, আমার। তুমি এখন চান করতে যাও; তোমার আহ্নিক করতে করতে আমার রান্না হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠাকুর্দ্দা, এবার এত লোক এখান থেকে বৃন্দাবন গেল, তুমি যে বড় গেলে না?"

"ইচ্ছা করলেই কি সেখানে যাওয়া যায় দিদি? যে দিন সময় হবে, সেদিন ঠাকুর নিজেই ডেকে নেবেন আমায়। তাঁর বাঁশী শুনলে আর কি কেউ ঘরে রইতে পারে?"

মাধবী জানিত, এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে ঠাকুর্দ্দার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে কেবলই কথা বাহির হইবে। তাই সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। অগত্যা ঠাকুর্দ্দাকেও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বলিতে বলিতে স্নানের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল।

পনেরো ষোল দিন হইল, রাসমণি ও গোবিন্দদাস বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছে। গোবিন্দ দাস নিজে তেমন পুণ্যলুব্ধ ছিল না, কিন্তু দুর্দ্দমনীয়া পত্নীটিকে বশে আনিতে না পারিয়া সুতরাং তাহাকে পুণ্য করিতে হইল। গ্রামের একদল বৈষ্ণব বৈষ্ণবী যখন বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল, তখন রাসমণিই পড়িয়া থাকিবে কেন? সেকি এত বড় পাপিষ্ঠা যে ঠাকুর দর্শন করিতে পাইবে না? একটি মাত্র মেয়ে মাধবী, সে তো সংসারী হইবে না। তাহার একগুঁয়ে বাপ কিছুতেই যোগ্য বর খুঁজিয়া পাইল না। মেয়েই যদি সংসারী হইল না, তবে সে কি লোভে কিসের আশায় সংসার আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে? মাঝে মাঝে তীর্থ ধর্ম্ম না করিয়া কি থাকা যায়? এতখানি বয়স হইল, মরণের আর তো বেশী দেরী নাই। পর-পারের জন্য কিছু পাথেয় তো সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হয়। নহিলে কি লইয়া সে পরলোকে যাত্রা করিবে? কিন্তু গোবিন্দ দাস অতশত বুঝিল না। তিন জনে বৃন্দাবন যাওয়ার মত তাহার টাকা নাই। রেলওয়ে কোম্পানিকে দক্ষিণা না দিয়া তো তীর্থ দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করা যায় না। কাযেই সে স্ত্রীর যুক্তির সারবত্তা, অনুনয় বিনয়, রোষ, রোদন,

কিছুতেই বিচলিত হইল না। পুণ্যলোভাতুরা মায়ের অবস্থা দেখিয়া মাধবীর ভারি দুঃখ হইল। সে ঠাকুর্দ্দার শরণ লইল। চিরদিন অন্যের প্রতি নির্ভর-পরায়ণা রাসমণিকে অত দূর দেশে যাইতে দেওয়া যায় না। তাহার সঙ্গে হয় মাধবীকে, নয় গোবিন্দ দাসকে যাইতেই হইবে। মাধবীকে অন্যের সঙ্গে পাঠান যায় না। তাই ঠাকুর্দ্দা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, তুমি বৌমাকে নিয়ে চ'লে যাও। আর আমি মাধবীর কাছে থাকব। তোমার কোন ভয় নেই।"

হায়, শুধু ভয়! ভয়ের জন্যই কি গোবিন্দ দাসের আপত্তি? কিন্তু এই অপত্যহীন বৃদ্ধকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে, মাধবীকে এক দিন ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে কত খানি! কিন্তু স্বামীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা বোধ হয় রাসমণির আদপেই ছিল না। সে দুই দিন শয়নে ও অনশনে থাকিয়া অবশেষে জয়ী হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিল। সেইদিন হইতে ঠাকুর্দ্দা গোবিন্দ দাসের বাড়ীতেই আছেন।

এখানে থাকিয়া থাকিয়া ঠাকুর্দ্দা একটু ভীতি অনুভব করিতেছিলেন। মাধবীর জন্য তিনি কি এই শেষ জীবনে 'মোহগর্ত্তে' 'মায়াগর্ত্তে' পড়িয়া গেলেন নাকি? এই চাঁদপানা মুখখানা কি তাঁহার রাধামাধবের মুখ ভুলাইয়া দিবে? না, যে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ের সৌন্দর্য্যের একটি কণা মাধবীকে এমন সুন্দর, এমন স্নিগ্ধ, এমন মধুর করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহারই প্রেম-বিন্দু মাধবীর ভিতর দিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে? এই যে সুখে দুঃখে, আনন্দে বেদনায় চির অম্লান হাসি, এই যে অক্লান্ত সেবা চেষ্টা, ইহা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাছাড়া কে লাভ করিতে পারে? মাধবীর দুঃখের গভীরতা আর যাহারই অবিদিত থাক, ঠাকুর্দ্দার তো নাই। কিন্তু এই বালিকা দুঃখের ভয়াল মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় পায় নাই, এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা মাত্র করে নাই, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া, জয় করিবার জন্যই অনবরত চেষ্টা করিতেছে। না জানি, ঐ ছোট বুক খানিতে ভরা কত বল লুকাইয়া আছে।

মাধবী বলিল, "হাঁ ঠাকুর্দ্দা, কোলের উপর বই খোলা রেখে কি ভাবছ আকাশ পানে চেয়ে, বল দেখি? তোমার ব্রজবল্লভের নীলকান্তি মনে পড়ে গেছে নাকি?"

মাধবীর কথায় ঠাকুর্দ্দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "তাই তো সম্ভব দিদি। তুমি যাকে ভালবাস, তার কোন সাদৃশ্য দেখলে, তাকে কি তোমার মনে পড়ে না মাধু?"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "না, তোমার মত অতটা প্রেম বা কবিত্ব আমার নেই। মা বাবাকে তো খুব ভালবাসি, কিন্তু কৈ, কিছু দেখে টেখে বিশেষ কিছু হয়না আমার; অম্‌নিই তাঁদের মনে হয়। তুমি ও কি বই পড়ছিলে? ওতে কি তোমার ঠাকুরের কথা আছে নাকি?"

"ঠাকুরের কথা ছাড়া কি কোন বই আছে নাকি? আমি গীতা পড়ছি, তুমি ব'সে শোন খানিকটা। এখন তো তোমার কোন কায নেই?"

"দোহাই ঠাকুর্দ্দা! চেষ্টা ক'রে আমার ধার্ম্মিক বানিয়ে তুলোনা। আমি তোমার পাথরের ঠাকুরের ভেতর কোন রস খুঁজে পাব না। আমার প্রাণ শুকিয়ে যাবে।"

কৃত্রিম কোপের সহিত ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "ছি! অমন কথা বলতে নেই। এখন থেকে তোমাকে মালা তিলক ধারণ করতে হবে, রোজ পূজো আহ্নিক করতে হবে। মালা তিলক ধারণ না করায় সবাই যে তোমার কত নিন্দে করে জান না?"

বৈষ্ণব সমাজের গৃহিণীদের মত মালা তিলক ধারণ করিয়া হরিনামাঙ্কিত দেহে আহ্নিক করিতে বসিয়া গিয়াছে, ইহা কল্পনা করিতেই মাধবীর খুব হাসি পাইল। সে হাসি চাপিয়া বলিল, "আমি খুবই জানি—আমার মুখের ওপর কত লোকে ব'লে যায়।

কিন্তু আমার মন কিছুতেই ও-সব করতে চায় না। আমি কি করব বল?"

"তোমার অত বড় হৃদয়ে ঠাকুরের জন্যে একতিল স্থানও কি নেই?"

"বল কি ঠাকুর্দ্দা! তুমি বলে থাক, ঠাকুর ব্রহ্মাণ্ড ব্যেপে আছেন। আমার হৃদয় কি ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া?"

ঠাকুর্দ্দা আর কোন কথা না বলিয়া শ্রীধরস্বামীর টীকায় মনোনিবেশ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

তুলসী তলায় সন্ধ্যার দীপ দিয়া প্রণাম করিয়া মাধবী সেইখানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এই যে প্রণাম, ইহা কি নিতান্তই নিরর্থক? নিতান্তই ভণ্ডামী? মাধবীর হৃদয়ে ভগবানের স্থান আছে কিনা, ঠাকুর্দ্দা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। মাধবী পরিহাস করিয়া যাহাই বলুক না কেন, ভগবান তাহার হৃদয় ব্যাপিয়া আছেন, এই উপলব্ধি কি সত্য সত্যই তাহার অন্তরে চিরজাগ্রত হইয়া আছে? অন্তরের মধ্যে তলাইয়া দেখিলে তো তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন। বিশ্বের ঠাকুর আজ যদি তাহাকে স্বয়ং ধরা না দেন, তবে এই অকূল পাথারে তাহার ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আর তো কিছুই দেখা যায়না। মাধবী যাহা দিয়া হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কি মূল্যহীন, একেবারে নির্ভেজাল মিথ্যা? তাই যদি হয়, তবে হে কাঙ্গালের ঠাকুর, হে অশরণের শরণ, তুমি ইহাকে সত্য কর, সার্থক কর। কিন্তু কাড়িয়া লইও না। কাড়িয়া লইলে হয়তো মরিতে হইবে। ছি ছি! চিত্তের এ কি দীনতা! মাধবী চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের সমস্ত রকম দীনতা সে যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ছোট আঙিনা খানি স্বচ্ছ তরল অন্ধকারে ভরিয়া যাইতেছিল। বেল, টগর, করবী প্রভৃতি ফুটন্ত ফুল গুলির মিশ্র গন্ধ স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ঘরের এক কোণে বসিয়া ঠাকুর্দ্দা জপ করিতেছিলেন। মাধবী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া জপনিরত বৃদ্ধের শান্ত আনন্দোজ্জ্বল মুখপানে একবার তাকাইয়া, আবার আঙিনায় আসিয়া পাইচারি করিতে লাগিল। ঐ শান্তি ঐ আনন্দ, এজীবনে বোধ হয় মাধবীর প্রাপ্য নহে। কিন্তু সে জন্য দুঃখই বা কেন? তাহার হৃদয় তো ভগবানই গড়িয়াছেন, সে নিজে তো গড়ে নাই। তাহার সুখ দুঃখ ভাল মন্দ, সবই তো তাঁহারই দান।

পরদিন অতি প্রত্যূষে তুলসীমঞ্জরী আসিয়া ডাকিল, "মাধবি!" মাধবী সাজি লইয়া ফুল তুলিতেছিল। সবিস্ময়ে বলিল, "এত ভোরে কেন মঞ্জরি?"

তুলসী সে প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "কাল রাত্রে বাবুর বাড়ী যাওনি?" তাহারা অশোকের প্রজা, বাবু অর্থে অশোক। প্রশ্ন শুনিয়া মাধবী ভীত হইয়া উঠিল। বলিল, "রাত্রে সেখানে যাব কেন? কি হয়েছে?"

তুলসী আশ্বাসের নিশ্বাস ফেলিয়া একটু স্থির হইল। তবে আজ নূতন খবরটাই সে মাধবীকে দিতে পারিবে, এত ভোরে ছুটিয়া আসা নিরর্থক হয় নাই। সে বলিল, "কাল রাত্তিরের গাড়ীতে বাবু দিদিঠাকরুণকে নিয়ে ফিরে এসেছেন যে। ওরা ইষ্টিসনে ছিল, দেখে এসেছে। রাণী বেশ বড় হয়েছে, আর কি সুন্দর হয়েছে। কোলের ছেলেটি যেন রাজ পুত্তুর। কি সুন্দরই হয়েছে! দেখলে নাকি কোলে না ক'রে থাকা যায় না। দিদিঠাকরুণের সোয়ামী তো হাকিম। ছেলেমেয়ে থাকে ভাল, খায় ভাল, যত্ন বেশী, সুন্দর হবেই বা না কেন? দিদি ঠাকরুণ কতদিন পরে বাপের বাড়ী এলেন। কিন্তু যা-ই বল, মা নেই, বাপ নেই, কে বা দেখে শোনে? বড়লোকের মেয়ে বটে, কিন্তু বাপের বাড়ীর সুখ নেই।"

তার পর একটু থামিয়া বলিল, "তুই যখন যাবি, আমাকে ডেকে নিয়ে যাস। দিদি ঠাকরুণকে দেখে আসব।"

মাধবী এতক্ষণে কথা কহিল,—"আমি আজ যেতে পারি কিনা সন্দেহ। ঠাকুর্দ্দা প্রায় সব সময়ে চোখ বুজে থাকেন। কা'র উপর বাড়ী ঘর ফেলে যাই বল।"

মাধবীর কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া তুলসীর বিস্ময় চরম সীমায় উঠিল। সে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল, তার পর উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিল, "এই দিদি ঠাক্‌রুণের সঙ্গে তোর গলায় গলায় ভাব ছিল। আজ কিনা বলছিস্, তোর দেখা করবার সময় হবে না! মেজো বাবু যে তোর জন্তে কতখানি করেছেন, তা কি দু'দিনেই ভুলে গেলি? এই কুঁড়ে ঘরে যদি সাত রাজার ধন এক মাণিক লুকিয়েই রেখে থাকিস, তা-ই বা দু'দণ্ডে কে চুরি ক'রে নিয়ে যেত? সাধে কি ভদ্দর লোকেরা আমাদের ছোট লোক ব'লে ঘেন্না করে?"

তুলসী আর দাঁড়াইল না, কিন্তু মাধবী স্তব্ধ হইয়া বিবর্ণ মুখে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি দশটার ট্রেণে অশোক উমাকে লইয়া বাড়ী পৌঁছিল। পূর্ব্বেই বন্ধু খবর পাইয়া যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিল। অশোকের পক্ষ হইতেও আদরের ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু তবু পিতৃহারা মাতৃহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া উমা কাঁদিয়া ফেলিল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া উমা আর একবার চোখের জল মুছিয়া বিশৃঙ্খল গৃহের শৃঙ্খলায় লাগিয়া গেল। অশোক রাণীকে লইয়া ছাদের উপর খেলা করিতে বসিল। বসিল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্তমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল।

এই অন্তমনা ভাবটা এতই স্পষ্ট যে, এক সময়ে রাণী বলিয়া উঠিল, "মামা বাবু, তুমি আজ খেলায় মন দিচ্ছনা কেন?"

অশোক সহসা দুই হাত বাড়াইয়া রাণীকে টানিয়া আনিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। রাণী অবাক হইয়া মামা বাবুর মুখ পানে চাহিয়া রহিল। অশোক বলিল, "এখন আর খেলা করেনা মা, তুমি তোমার ঝির সঙ্গে চান করতে যাও।"

"তবে তুমি আমার পুতুল গুলি গুছিয়ে বাক্সটা বন্ধ করে রেখে দিও।" বলিয়াই রাণী অশোকের বাহু বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। মামা বাবুর খেলায় মন নাই দেখিয়া, তাহারও খেলা ভাল লাগিতেছিল না।

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া উমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, মাধু তো একবারও এল না। সেকি আমার আসার খবর পায়নি?"

অশোক অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি তো তা জানিনে উমা।"

"ওবেলা বন্ধুকে তার কাছে পাঠাতে হবে" বলিয়া উমা বিশ্রাম করিতে গেল। ষ্টীমার ও ট্রেণে রাত্রি জাগরণ করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই যে ঘুমাইয়া পড়িল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর জাগিল না। যাক্, আজ আর মাধবীকে ডাকা হইবে না—অশোক যেন একটা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিনও উমা ভোরে উঠিয়া ঝি চাকরদের লইয়া যথানিয়মে কাযে লাগিয়া গেল। প্রতিবেশী দু'একটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে ইহারই মধ্যে রাণীর খানিকটা ভাব হইয়া গিয়াছিল। সে তাহাদের লইয়া নীচে কলরব করিতেছিল, আজ আর মামাবাবুর কাছে বড় ঘেঁসিতেছিল না। অশোক ছাড়া পাইয়া উপরের বারান্দায় আসিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল। এই যে সম্মুখে ছায়া-শীতল আঁকাবাঁকা পথটি পড়িয়া রহিয়াছে, অশোকের সুখ সুবিধা সম্পাদনের জন্ত ইহারই উপর দিয়া মাধবী দিনের মধ্যে পাঁচ সাত বার আনাগোণা করিত। আজ গাছের পাতার ফাঁক দিয়া ভোরের সুন্দর আলো সেই পথের উপর পড়িয়াছে। এই আলোছায়ার বিচিত্র লীলার মধ্যে আজ আর চির পরিচিত দু'খানি চরণ গতি ছন্দে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে না।

দিন দুই উমা আসিয়াছে, অশোকের সুখ সুবিধার প্রতি সে কিছু মাত্র উদাসীনও নয়। তবু অশোকের কেমনই মনে হইতেছিল, এই বিশাল বিশ্বে সকলেরই প্রয়োজন আছে, সকলেরই বৈশিষ্ট্য আছে; কেহ

কাহারও শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারে না। শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়ার এতটুকু আশা, এতটুকু সম্ভাবনাও ছিল না। এই উচিত! এই উচিত! কতবড় মূল্যে অশোককে সামাজিক সম্মান ক্রয় করিতে হইয়াছে। এই বহুমূল্য জিনিষটাকে সযত্নে রক্ষা করিতেই হইবে।

অশোক কেবল ভয় করিতেছিল, উমা কখন্ মাধবীকে ডাকিয়া বসে। উমাকে কি বলিয়া সে নিষেধ করিবে? ডাকিলেও মাধবী আসিবে না, সস্নেহ আহ্বানের অপমান করিলে উমা তো মাধবীকে ক্ষমা করিবে না। তাহারই জন্য এই দু'টি স্নেহবদ্ধা সখীর মধ্যে ব্যবধান কল্পনা করিয়া অশোক ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে অশোককে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দিয়া মাধবী আসিয়া উমার কাছে দাঁড়াইল। তাহাতে ক্রোধ বা অভিমানের কোন চিহ্নই ছিলনা, উজ্জ্বল হাসির আলোকে তাহার মুখ চোখ ঝল্মল করিতেছিল। ইচ্ছা সত্ত্বেও অশোক চলিয়া যাইতে পারিল না, তাহার পা দু'টা যেন কে অবশ করিয়া দিল। উমা অভিমানের সুরে বলিল, "এতক্ষণে তোমার সময় হল? আমি সকাল বেলা তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম তারই জন্যে তুমি এবেলা এসেছ। আমি না গেলে তুমি কখনো আসতে না।"

মাধবী বলিল, "রাগ কর কেন ভাই? খালি বাড়ী ছিল, তাই আসতে পারিনি। তা তুমি না হয় গরিবের কুঁড়ে ঘরে পদার্পণ করেছই একটিবার।"

"আঃ, কত ঢঙই শিখেছিস্!" বলিয়া উমা মাধবীর গালে মৃদু টোকা মারিল। তারপর মাধবীকে লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া বলিল, "আমি ভেবেছিলাম, তোর অসুখ করেছে। নইলে তুই আমার কাছে না এসে এতক্ষণ থাকতে পারলি কি করে?"

মাধবী কি যেন জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু এমন সময়ে রাণী আসিয়া মাধবীকে দেখাইয়া দিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এই কি আমার মাসী মা?" মুহূর্ত্তে এক ঝলক রক্ত আসিয়া মাধবীর মুখ লাল করিয়া দিল। অশোকের চোখে তাহা এড়াইল না। উমা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "না, তোর মাসিমা।"

মাধবী নত হইয়া সাদরে রাণীকে কোলে তুলিয়া লইয়া, অগ্রসর হইয়া অশোকের কাছে যাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তার পর তাহার সর্ব্বাঙ্গে চকিতে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিল, "তুমি যে অনেক খানি রোগা হয়ে গেছ দেখছি! কাশীতে থেকেও শরীর এত খারাপ হলো কেন?"

সুস্পষ্ট কণ্ঠের সহজ প্রশ্ন। সাধারণ ভাবে জবাব দিলেই হয়। অশোক জবাব দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা ফুটিল না। অশোকের অভিলষিত মুক্তি তৎক্ষণাৎ মিলিল। উমা মাধবীকে এক ঠেলা দিয়া বলিল, "দাদার সঙ্গে আলাপ করবার ঢের সময় পাবি। এখন আমার সঙ্গে চল্।" বলিয়া তাহাকে এক রকম টানিয়া লইয়া নীচে চলিল।

সেই দিন হইতে মাধবী আবার রোজ চার পাঁচ বার উমার কাছে আসা যাওয়া করিত। পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই সে রাণী ও খোকার সঙ্গে খুব ভাব করিয়া লইল। অশোক তাহাকে এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। দৈবাৎ যদি কখনও দেখা হইত, তবে মাধবী হাসি মুখেই তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিত। কিন্তু অশোক সেই হাস্যমুখীকে দেখিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত।

সেদিন মাধবী আসিয়া জানিল, উমা তাহার কাকার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। সে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বারান্দায় অশোক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পাশ দিয়াই মাধবীকে যাইতে হইবে। সে ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে অশোকের পানে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওখান থেকে উমাদি কখন ফিরবে জান?"

অশোক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না তুমি কি একটু বসতে পারবে? আমার একটা কথা ছিল।"

মাধবী অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাবে বলিল, "আমাকে আরও কিছু বলা বাকি আছে নাকি?"

অশোক এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, "হাঁ, বোস ওই খানে।"

মাধবী বসিয়া বলিল, "কি বলবে, তাড়াতাড়ি বল। আমার কায আছে।"

অশোক কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছুই বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার অপরাধ যে কতখানি হয়েছে, সে আমি জানি। তুমি আমায় কেন সাজা দিচ্ছ না? আমি তো এ সইতে পারছিনে।"

মাধবী বলিল, "আমি কেন তোমায় সাজা দিতে যাব? আমার মত লোকের কাছে, তোমার মত বড় লোকের কোন অপরাধই হতে পারে না।"

অশোক অত্যন্ত আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু বলবে আমায়?"

অশোক সে কথার উত্তর দিল না। কথাটা তাহার কাণে গেল কিনা, বুঝা গেল না।

মাধবী চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে উমা আসিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, "আমার একটু দেরী হয়ে গেছে ভাই, তাই রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিস নাকি?"

মাধবীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সহসা উমা শঙ্কিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "একি! দাদা, কি হয়েছে তোমার?"

অশোক তখনও আত্মস্থ হইতে পারে নাই। সে উমার পানে একবার চাহিয়াই ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। এই ব্যাপারে মাধবী মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। উমা মাধবীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার কি হয়েছে মাধু?"

মাধবী বলিল, "ওঁকেই জিজ্ঞেস কর, আমি কি ক'রে বলব?"

উমা অল্পকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "থাক্ তোর ব'লে কায নেই। ঘরে চল, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।" বলিয়া উমা মাধবীকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মাধবী হাসিয়া বলিল, "বন্দিনী নাকি আমি?"

উমাও হাসিয়া সুর করিয়া বলিল, "বন্দিনী তুমি মম হৃদি-কারাগারে।"

"কিন্তু তোমার কারাগারে ফণী বাবুর আর আমার এক সঙ্গে দু'জনের যায়গা হবে?"

"ওঁকে এখন মুক্তি দিয়েছি।"

"সত্যি নাকি ভাই?"

"এ বিষয়ে ছেলেমানুষ তুই, তোর সঙ্গে এসব আলাপ চলে না। বিয়ে হ'লে সব বুঝবি। আচ্ছা, একটা বিয়ে করনা ভাই।"

"করেছি তো।"

"কাকে লো? কে সে ভাগ্যবান?"

"যে আমাকে হৃদয় কারাগারে বন্দী ক'রে রেখেছে!"

"তামাসা এখন থাক্। কাযের কথা শোন।"

এই বলিয়া উমা চুপ করিয়া রহিল। মাধবীর অনুমান করিতে কষ্ট হইল না যে, উমা এখন কি ব'লবে। উমা এই মাত্র মহেন্দ্রলালের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আত্মীয় সম্ভাষণের প্রসন্নতা লইয়াও সে আসে নাই। প্রথমে মহেন্দ্রলালের রসনাতেই যে তাহার অন্তবিষয় সৃষ্টি হইয়াছিল, সে কথা মাধবীর অগোচর ছিল না। উমার মুখে সেই কথাটা শুনিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও তাহার বুক শুকাইয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "যা বলবার, ব'লে ফেল না। ইতস্তত করছ কেন?"

তবু উমা কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল। তারপর মুখ নত করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "গ্রামের লোকে তোর আর দাদার নাকি তারি নিন্দে করছে, সেজ কাকা আজ এই কথা বল্লেন।"

মাধবী কিছুকাল চুপ করিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "নিন্দেটা যে কত বড় মিথ্যা, সে তো তুমি জান।"

উমা এবার মুখ তুলিয়া বলিল, "জানি বৈকি। কিন্তু মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না মাধু। উচিত কাযও

সেটা নয়। সমাজে সুনামের মূল্যকে তো উপেক্ষা করতে পারা যায় না।"

মাধবীর মুখে যে জবাব আসিল তাহা সে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি করতে পারি? আমাকে কি করতে হবে, বল।"

"বিয়ে থা করে সংসারী হও না কেন মাধু?"

"তাতেই মিথ্যা মরে' সত্যের জয় হবে?"

"সম্ভব। আমার তো তাই মনে হয়।"

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি উমাদি, তোমাদের ভদ্র ঘরের কোন বিধবার নামে যদি এমনি মিথ্যা অপবাদ রটে যেত, সেকি বিয়ে করেই সব মুস্কিলের আসান ক'রে দিত?"

"আমি কোন দোষ ভেবে বলিনি ভাই, তোমাদের মধ্যে প্রথা আছে, তাই বলেছি।"

"আমাদের মধ্যে প্রথাটা আছে বটে, কিন্তু কেউ ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পাবে না, এমন প্রথাও তো নেই। আমরা সে রকম কিছু করলে, তোমাদের আপত্তি করবার কিছু আছে?"

"কিছু নেই। মাধু, তবে তুই এই ভাবেই থাকবি, ঠিক করেছিস?"

"হ্যাঁ।"

উমা আবার চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

উমা আর কিছু বলেনা দেখিয়া মাধবী বলিল, "সন্ধ্যা হয়ে এল, ঠাকুর্দ্দার খাবার তৈরি করতে হবে। আমি এখন যাই উমাদি?"

উমা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মাধু, কাল আবার আসবি তো? আমার ওপর রাগ ক'রে থাকবি না?"

মাধবী ম্লান হাস্যের সহিত বলিল, "না, রাগ করব কেন?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেল। মাধবী তেমন ভাবেই উমার কাছে যাতায়াত করিত। তাহার হাসি, গল্প রহস্যের বিরাম ছিল না। উমা মাঝে মাঝে ভাবিত, মাধবী একটা অদ্ভুত মেয়ে।

আজ মাধবী দুপুর বেলায় বসিয়া বই পড়িতেছিল। ঠাকুর্দ্দা কোথায় গিয়াছেন, তাই সে খালি বাড়ী ফেলিয়া উমার কাছে যাইতে পারে নাই। এমন সময়ে তাহাকে চমকাইয়া দিয়া উমাই আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল।

"এস দিদি, এস" বলিয়া সহাস্যে মাধবী উঠিয়া উমাকে বসিতে আসন দিল। কিন্তু শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত উমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া তাহার হাসি নিবিয়া গেল। উমা বসিয়া মাধবীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "মাধু, তোকে আমরা কোন দিনই ছোট মনে করতে পারিনি। তুই ছোট নোস্ ব'লেই তোর কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি। হয়তো তুই আমাকে হীন স্বার্থপর ব'লে ঘৃণা করবি। তা করিস। তবু, দু'জনেই যাঁকে ভালবাসি, তাঁর যদি কিছু মঙ্গল হয়, তবে সে ঘৃণা গায়ে বাধবে না।"

মাধবী বলিল, "ভূমিকা ক'রে আমার ভয়ই তো বাড়িয়ে তুলছ। আসল কথাটা বল না কেন?"

উমা অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বলিল, "তুমি বিয়ে কর ভাই, তোকে বিবাহিত না দেখলে দাদাও বিয়ে করবে না।"

উমার কথা শুনিয়া মাধবী স্তম্ভিত হইয়া রহিল। অনেক ক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দাদা কি এই কথা বলেছেন?"

"না, তিনি বলেন নি। তিনি তো সেজ কাকার মেজ জামায়ের সঙ্গে মাসে মাসে মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন, আর বাড়ী এসে বলছেন, পছন্দ হলো না। পছন্দ তাঁর কোন কালেই হবে না। শুধু সেজ কাকার মন রাখার জন্য মেয়ে দেখতে যাওয়া, তাকি আমি বুঝিনে?"

"আমি বিয়ে করলেই তিনি বিয়ে করবেন, এটা তুমি নিশ্চয় বুঝেছ?"

দুই বৎসর কাল সুন্দরী তরুণী মাধবীর সযত্ন সেবা

একান্ত সামীপ্য—সামাজিক অলঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও—অশোকের মনে একটা অন্ধ আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছে, মাধবী বিবাহ করিয়া দূরে থাকিলেই প্রবল আঘাতে সেই আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যাইবে, অশোক নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া বিবাহ করিয়া সুখী হইলে উমার পিতৃকুল বজায় থাকিবে, এ সম্বন্ধে উমার কোন সন্দেহ ছিল না। তাই সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "হাঁ।"

মাধবী বলিল, "আজকের দিনটা আমাকে ভাবতে দাও, কাল আমি তোমাকে বলব।"

উমা আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমার মনে হচ্ছে, তুই আমার কথায় রাজি হবি। তা হলে কি আহ্লাদই হয় আমার! তোকে সুখী দেখব, ভাগ্যবতী দেখব, তোর কোলভরা সোণার চাঁদ ছেলে মেয়ে দেখব। আর আমার বাবার ঘর তেমনি ভরা দেখব, আমার দাদা সংসারী হবেন, এ কি আমার কম আহ্লাদ! বিয়ে হলে বুঝবি' তোর মত শিশু বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনই একমাত্র ধর্ম্ম নয়।" বলিতে বলিতে উমার স্বামিসেবার সুখ, স্বামিস্নেহের কথা মনে পড়ায় চক্ষু দু'টি সিক্ত হইয়া উঠিল।

মাধবী কথা কহিল না, উমার কোলের ছেলেটি কোলে তুলিয়া লইল।

উমা বলিল, "ঠাকুর্দ্দা এলে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে যেতাম।"

মাধবী বলিল, "তিনি সন্ধ্যার সময় ফিরবেন, ব'লে গেছেন।"

"তবে আজ যাই আমি?"

"এস ভাই।"

উমা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ঠাকুর্দ্দা ফিরিয়া আসিয়া মাধবীকে স্তব্ধ ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "দিদি তোমার কি হয়েছে?"

"কিছু না। আমি বিয়ে করব"—বলিয়া মাধবী হাসিল।

সেই হাসি দেখিয়া ঠাকুর্দ্দা উৎকণ্ঠিত ভাবে মাধবীকে কোলের কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেঁয়ালী রাখ দিদি, আমায় সব খু'লে বল।"

মাধবী ঠাকুর্দ্দার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ঠাকুর্দ্দা দুই হাতে তাহার মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এমন নতুন সাধ কেন হ'লো মাধু?"

মাধবী বলিল, "তা বলতে পারছি না, কিন্তু বিয়ে আমাকে করতেই হবে। তুমি বাবাকে চিঠি লিখে কেশব বোষ্টমের সঙ্গে সব ঠিক কর। ওখানেই মার খুব ইচ্ছা ছিল।"

ঠাকুর্দ্দা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তার পর বলিলেন, "আচ্ছা, সে হবে। এখন তো আমার সন্ধ্যার যায়গা ক'রে দাও।"

মাধবী উঠিয়া সন্ধ্যার যায়গা করিয়া দিল। ঠাকুর্দ্দার সন্ধ্যা হইয়া গেলে, তাঁহাকে খাওয়াইয়া নিজে অভুক্তই শুইয়া পড়িয়া রহিল।

মাধবী ভোরে উঠিয়া ঘরের কায কর্ম্ম শেষ করিয়া উমার কাছে চলিয়া গেল। বারান্দায় উঠিতেই অশোকের সঙ্গে তাহার দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল। অশোক তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। দেখিয়া মাধবীর মন আবার কঠিন হইয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইতে চাহিল। কিন্তু সে নাকি আজ কাহাকেও ক্ষুব্ধ, কাহাকেও অসন্তুষ্ট রাখিবে না, মান অভিমান, সুখ দুঃখ, নিজস্ব বলিয়াও আর দাবী করিবে না, তাই সে অশোকের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাসি-মুখে বলিল, "পালিয়ে এলে যে? আমার মুখ আর দেখবে না, প্রতিজ্ঞা করেছ?"

অশোক গম্ভীর মুখে বলিল, "না। তেমন প্রতিজ্ঞা করা কি সম্ভব?"

সহসা মাধবী নত হইয়া অশোকের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, "আজ আমায় খুসী মনে মাপ কর।"

অশোক ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিতে যাইয়া

দেখিল, শ্রাবণের ধারার মত তাহার অশ্রুধারা বহিতেছে। সে মুহূর্ত্তে বিগলিত হইয়া উঠিল। অতীত, ভবিষ্যৎ, সব ভুলিয়া গেল। সে সাদরে সস্নেহে মাধবীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে বলিল, "পাগল আর কি? আমি সত্যি তোর উপর রাগ করে' থাকতে পারি?"

মাধবী আর মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াইল না। ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া একটু স্থির হইয়া চোখ মুখ ভাল করিয়া মুছিয়া উমার কাছে চলিল।

উমা রান্নাঘরে বঁটি পাতিয়া বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল। মাধবীকে দেখিয়া আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠিক হলো ভাই?"

মাধবী স্থির কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার কথায় রাজি।"

উমা আবেগে ছুটিয়া আসিয়া মাধবীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিল, "আজ যে তুই আমাকে কত সুখী, কত নিশ্চিন্ত করলি, তা অন্তর্যামী জানেন।"

মাধবী বলিল, "নিশ্চিন্ত কেন? আমা হ'তে কোন অনিষ্টের আশঙ্কাও করেছ নাকি?"

তাহার স্বরে বিদ্রূপের আভাস পাইয়াও উমা বিচলিত হইল না। বলিল, "ছি ছি! কি যে বলিস তুই! দাদা আর তুই সুখী হবি, একটা নির্ভরতার আশ্রয় পাবি, এজন্যে কি আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনে?"

মাধবী এ কথার জবাব না দিয়া বলিল, "তুমি তো রান্নাবাড়ার যোগাড় দেখছ, ওসব তো আমারও আছে। আমি এখন চল্লাম উমাদি।"

"আচ্ছা, এস বোন্।"

অশোক উপর হইতে শুনিল, মাধবী মৃদু গুঞ্জনে কি গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে অশোক বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলে উমা বলিল, 'দাদা, এই মাসের মধ্যেই বোধ হয় কেশব বোষ্টমের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হয়ে যাবে।" অশোক "হুঁ" বলিয়া ভ্রমণ পরিচ্ছদ খুলিয়া আলনায় রাখিয়া দিল। উমা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেশবকে চেন? সে তো মাধবীর অযোগ্য হবে না?"

অশোক সংক্ষেপে বলিল, "না।"

উমা অশোকের কাছে আসিয়া নিজের হাতের সোণার চুড়ি তাহাকে দেখাইয়া বলিল, "দাদা, এই প্যাটার্ণের চুড়ি আমাকে গড়িয়ে দেবে? বিয়ের সময় মাধুকে দেব। তুমি তাকে কি দেবে?"

"তুই যা বলিস, তাই দেব।"

"তুমি একটা হার দিও।"

"আচ্ছা, তাই দেব। ছাদে যাই, বড় গরম।"

অশোক বাহির হইয়া গেল। অশোক ছাদের অন্ধকারে বেড়াইতে লাগিল। মাধবী বিবাহ করিতে যাইবে বলিয়াই কি আজ সকল বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিয়া গেল? বেশ তো, সে সুখী হোক্। কিন্তু আজ তাহার ভাবী সুখের কল্পনায় অশোকের মন আহ্লাদে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে না কেন? অশোক যখন মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতেছিল, মাধবী তখন হাসিয়া হাসিয়া ঠাকুর্দ্দাকে বলিতেছিল, "হাঁ ঠাকুর্দ্দা, তোমার কেশব বোষ্টম রাজি হবে তো?"

ঠাকুর্দ্দা পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তোমার যে গরজ দেখছি, চলনা আজই তোমাকে সেখানে রেখে আসছি।"

"মা বাবা বাড়ী থাকলে আমার তাতে আপত্তি ছিল না।"

"সত্যি দিদি, এতে কি তুমি সুখী হবে?"

"সুখই কি সব ঠাকুর্দ্দা? সুখ ছাড়া জগতে আর কি কিছুই নেই? সত্যি বলছি, সুখ আমার বরদাস্ত হয় না। ও জিনিসটা ভগবান আমার জন্তে তৈরী করেননি।"

"তাই যদি হয়, তাতেও আমাদের আপশোষ করবার কিছু নেই। দুঃখের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই মানুষ সুন্দর হয়। এক এক সময়ে জীবনে দুঃখ আসে, ঠিক মেঘশূন্য প্রচণ্ড বৈশাখী মধ্যাহ্নের মত।

মানুষ যখন এই দুঃখের রূপ দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, অথবা একে দূর রেখে তরল সুখের সন্ধান করে; তখন সে একটা মস্ত ভুল ক'রে বসে। পরম জননীর স্নেহার্দ্র শাসনের মত যে এই দুঃখকে গ্রহণ করতে পারে, সে যে আনন্দ পায়, সে আনন্দের আভা তার দেহে মনে অফুরন্ত হাসির মত ঝলমল করতে থাকে।"

ক্রমশঃ

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ,
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে,
মিথ্যৈব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্বিনোদঃ কুতঃ॥

কালিদাস।

বাঙ্গলা ১২৯৭ সনে আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর হইতে আমি শিকার আরম্ভ করি। প্রথম বৎসরই মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, আমার পূজনীয় খুল্লতাত ৺রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের শিকারপার্টিতে যোগদান করি। তখন সেই পার্টিতে গোবরডাঙ্গার স্বনামখ্যাত জমিদার ৺জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ওরফে মনুবাবু শিকার করিতেন। তাঁহারা আমার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শিকার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শিকার সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না। ধরিতে গেলে আমার খুড়া মহাশয়ই, আমাকে শিকার শিখাইয়াছেন। বস্তুত কি শিকার সম্বন্ধে তিনি আমার গুরুস্থানীয়। আমার উপর তিনি যথেষ্ট স্নেহশীল বলিয়াই, অধিকাংশ শিকারেই নিজের স্বার্থের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া, আমার সুবিধা করিয়া দিতেন। তাঁহার ন্যায় সদাশয় মহাপুরুষ, আমি জীবনে কমই দেখিয়াছি। শিকার কেন, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার ন্যায় দেবচরিত্র লোক এতদঞ্চলে বিরল। স্বর্গগত মনুবাবুর সঙ্গেও এই শিকার উপলক্ষে প্রথম পরিচিত হইয়া, পরে বান্ধবতার দৃঢ়বন্ধনে এরূপ বাঁধা পড়িয়াছিলাম যে, তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্তও সেই শিকলে মরিচা ধরে নাই। তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে যে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিতে পারিয়াছিলাম এজন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। বন্ধুর ভালবাসা যে কি স্বর্গীয় জিনিস, ইহা আমি তাঁহার ভালবাসা হইতেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমার জীবনের অধিকাংশ শিকারই ইঁহাদের সঙ্গে একত্রে করিয়াছি। কোন কোন সময় কারণাধীনে আমি পৃথক শিকারও করিয়াছি।

আমাদের এই সুদীর্ঘ কালের সাধনার ফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা এক অসম্ভব বিরাট ব্যাপার। ইহার বহু ঘটনায় বিশেষ বৈচিত্র্য না থাকায় পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব না। তবে যে সব বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ও অবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় জন্তুর স্বভাব পরিস্ফুট হইয়াছে—"সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ"—এবং নিজেরা অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইয়াও কি উপায়ে মুক্ত হইয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। আশা করি ইহা দ্বারা পাঠককে কথঞ্চিত আনন্দ দান করিতে পারিব।

আমাদের এই সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী শিকারে যে কত স্থানে কত রকম অবস্থার মধ্য দিয়া, কত শিকার

করিয়াছি তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি। এ পর্য্যন্ত আমাদের পার্টিতে খুব কম হইলেও দুই শতাধিক বাঘ bagged হইয়াছে। আহত অনাহত বাঘও শতাধিক ফস্‌কাইয়া গিয়াছে। হরিণ ও মহিষ যে কত শিকার করা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ রেকর্ড আমরা আমরা রাখি নাই, রাখাও অসম্ভব।

লেপার্ড অধিকাংশ সময় আমরা দেশেই মারিয়াছি। তখন আমাদের মুক্তাগাছার নিকটবর্ত্তী স্থানে, চতুর্দ্দিকে দশ মাইলের মধ্যে, যথেষ্ট জঙ্গল ছিল। ইহার জন্ত কষ্ট করিয়া দূরে যাইবার আবশ্যক হইত না। তবে আমাদের পার্টিতেও যে লেপার্ড শিকার না হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু তাহার সংখ্যা বেশী নহে। প্রতি বৎসর আমরা বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়াই ১০।১৫টা করিয়া লেপার্ড মারিতাম। আমি নিজেও খুব কম পক্ষে ১০০।১৫০ লেপার্ড মারিয়াছি। আর এখন বোধ হয়, গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানে একটী লেপার্ডেরও সংবাদ শুনিতে পাই নাই। এ সবই পাটের মহিমা! দেশে পাটের আবাদ আসিয়া গ্রামে আর জঙ্গল নাই বলিলেই হয়।

হায়রে পাট! তোমার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, দেশের চাষারা রাতারাতি বড়লোক হইবার প্রলোভনে জঙ্গল সাবাড় করিয়া শিকার ত দুর্লভ করিয়াছেই; এককালে বাজারের মাছও দুর্ম্মূল্য করিয়াছিল। কয়েকদিন পাটের টাকার গর্ব্বে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া, চারি আনার মাছ এক টাকা দিয়াও তাহারা কিনিয়াছে; কিন্তু ঘরে যে এক সের চাউলও নাই, একবারও তাহা চিন্তা করিয়া দেখে নাই। ফৌজদারী কোর্টেও ইহার প্রভাব যথেষ্ট দেখা গিয়াছে। দেশের বন জঙ্গল সাবাড় হওয়ায় জ্বালানি কাঠের অভাবে কয়লার সঙ্গে সঙ্গে ডিস্‌পেপসিয়ারও আমদানী হইয়াছে। কিন্তু বিগত মহাসমরের সময় হইতে পাটের সে মোহিনী মূর্ত্তি আর নাই।

প্রথম কিছুদিন আমাদের শিকার পার্টিতে, ৺রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৺জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৺মহেশকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও আমি এই কয়জন ছিলাম। কিছুদিন পরে বরদা বাবু শিকার ছাড়িয়া দিলে, আমরাই কয়েক বৎসর শিকার করি। তাহার পর, আমার অনুজ ৺সুরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ও কুমার শ্রীমান জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী পর পর আসিয়া যোগ দেন। কিছুদিন পরে মহেশ বাবু, পরে আমার ভ্রাতা ও সর্ব্বশেষে মনুবাবু আমাদের ছাড়িয়া তাঁহাদের সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।"

হাওদা শিকার।

শিকার মাত্রই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিভিন্ন প্রণালীর শিকারের মধ্যে, 'হাওদা শিকার'ই অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসসাধ্য; কিন্তু ইহা রাজসিক। প্রাচীন যুগেও, রাজারা রথারোহণে মৃগয়া করিতেন। পরবর্ত্তী যুগে তাহাই বোধ হয়, হাওদা শিকারে রূপান্তরিত হইয়াছে।

হাতী ছাড়া হাওদা শিকার হয় না। বহু অর্থে হাতী ক্রয় করিয়া পালন করিতে পারিলে, হাওদা শিকার চলে; কাজেই ইহা এক বিরাট ব্যাপার। বড়লোক ছাড়া এই শিকার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে; কারণ ইহাতে আসবাবও যথেষ্ট দরকার হয়। এক একটী শিকার যাত্রায় তাঁবু, হাওদা, গদী, গাদলা, রেশন প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম সঙ্গে লইতে হয়। এক কথায় শিকারের সামগ্রী বাদে, সাংসারিক ছোট বড় অনেক জিনিষ এবং বিলাসিতার অনেক উপকরণও সঙ্গে থাকে। ইচ্ছা করিলে ইহাতে বিলাস সম্ভোগও যথেষ্ট করা যায়।

এই সব শিকার পার্টিতে হাতী, ঘোড়া, উট, গো মহিষের গাড়ী ও ইহাদের চালক এবং অন্যান্য নানা শ্রেণীর লোক সংখ্যা খুব কম পক্ষে ২।৩ শত থাকে। পার্টি আরও বড় হইলে, সংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়। ইহারা যে স্থানেই আড্ডা (Camp) করে, তাহাই যেন বিভিন্ন পল্লীযুক্ত একটী ছোট গ্রাম বিশেষ

হইয়া উঠে। দূর দূরান্তর হইতে ব্যবসায়িগণ, এই সকল লোকজনের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী, ঘোড়ার পিঠে বা নৌকায় করিয়া আনিয়া, ছোটখাটো রকমের একটি পল্লীহাট বসাইয়া বিক্রয় করে।

এক ক্যাম্পের কার্য্য অন্তে, যখন ইহারা সমস্ত জিনিষপত্র গুটাইয়া স্থানান্তরে ক্যাম্প করিবার জন্ম চলিতে থাকে, তখন গরু মহিষ হাতীর গলার ঘণ্টার শব্দ, লোকজনের কোলাহল এবং গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ মিশ্রিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উত্থিত হয়। শীত-কালে কর্ষিত ক্ষেত্র দিয়া চলিবার সময়, ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া, আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই দৃশ্যে এবং সেই সময় পল্লী-রমণীগণের অন্তরাল হইতে সলজ্জ কৌতূহল দৃষ্টিতে, নিম্ন শ্লোক দু'টী তখন আমার মনে প'ড়ত—

"রজোভিঃ স্যন্দনোদ্ধূতৈর্গজৈশ্চ ঘনসন্নিভৈঃ।
ভুবস্তলমিব ব্যোম কুর্ব্বন্ ব্যোমেব ভূতলম্॥"
"তয়োর্ন্যস্তৈর্বিভূষাণাং তেন কেরলযোষিতাম্।
অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণ প্রতিনিধীকৃতঃ॥"

[রঘুবংশ]

হাওদা শিকার সমতল ভূমি ছাড়া পাহাড়ে হয় না। আসাম, গারো হিল, শ্রীহট্ট, নেপাল, টেরাই ও ভুটান দোয়ারে, এই জাতীয় শিকার করা যায়। সুন্দর বনের অধিকাংশ স্থানে দাব্ অর্থাৎ দলদলে মাটি থাকায়, হাতী চলাচল করিতে পারে না বলিয়া, হাওদা শিকার চলে না।

যখন জঙ্গলের মধ্য দিয়া ৪০।৫০ কি আরও অধিক হাতী লাইন করিয়া যাইতে থাকে, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। সেই সময় শিকারীদের মনে, আশা ও উত্তেজনা মিশ্রণে, কি যে এক নূতন ভাবের উদয় হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে অনুভব করিতে পারে না।

অন্য যত রকম শিকার আছে, তাহার সবগুলিতেই, শিকারী, নিজকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, নিজ অস্তিত্ব শিকারকে জানিতে না দিয়া, শিকার করিয়া থাকেন। কিন্তু হাওদা শিকার ঠিক তাহার বিপরীত, ইহাতে যেন জানোয়ারকে "চ্যালেঞ্জ" করা হয়। কতকগুলি হাতী জঙ্গল বৃক্ষাদি হড়মড় করিয়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইতেছে, আর যেন বিপক্ষ পক্ষকে বলিতেছে—"আমরা তোমাদিগকে মারিব, পার তো আত্মরক্ষা কর বা পলাইয়া যাও।" ইহাতে সর্ব্বদাই জানোয়ারকে তাড়াইয়া শিকার করিতে হয়।

এই অসম যুদ্ধেও অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যাঁহাদের হাতীতে চড়া অভ্যাস নাই, তাহাদের পক্ষে হাওদায় শিকার করা কঠিন; কারণ, হাতীর পিঠে হাওদায়, গদীর উপর দাঁড়াইয়া শিকার করিতে হয় বলিয়া, হাতীতে দাঁড়াইতে না পারিলে শিকার করা একরূপ অসম্ভব।

সাধারণতঃ হাতী দাঁড় করাইয়া শিকার করাই নিয়ম; কিন্তু অনেক সময় হাতী চলিতে চলিতে, চকিতের মত জানোয়ার দেখিয়া, সেই অবস্থাতেই শিকার করিতে হয়। এই অবস্থায় অনেক সময়েই লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বেশী। কাযেই হাতী চড়ায় বেশী অভ্যস্ত না হইলে, হাওদায় শিকার করা কঠিন হইয়া উঠে।

খাঁচায় থাকিয়া শিকার করা হয় বলিয়া যদি হাওদা শিকারকে বেশ নিরাপদ মনে করা যায় তবে তাহাও অত্যন্ত ভুল। জঙ্গলের মধ্যে বহুস্থানে শুষ্ক কূপ, ফাটল, এবং গর্ত্ত থাকে। হাতী চলিবার সময় সর্ব্বদাই শিকারীকে বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয় বলিয়া, অনেক সময় এত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে হয় যে, হাতী চলিতেছে অথবা কি করিতেছে শিকারীর তাহা কিছুই খেয়াল থাকে না। সেই অবস্থায় হাতী চলিতে চলিতে হঠাৎ গর্ত্তে বা কূপে পড়িয়া গেলে, শিকারীকে ছিটকাইয়া পড়িয়া যাইতে হয়; সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকও পড়িয়া গিয়া আওয়াজ হইতে পারে। কোন কোন সময় পড়িয়া না গেলেও হাওদায় ধাক্কা খাইয়াও বন্দুক আওয়াজ হইয়া যায়। কাযেই এই সব অবস্থায় জন্ম শিকারীর সর্ব্বদাই সাবধানে থাকা উচিত। কোন

কোন সময় কাঁটা ও লতা বেষ্টিত গাছড়া জঙ্গলে বন্দুক আটকাইয়া পিছনের দিকে উল্টাইয়া পড়িয়া যায়; সেই সময় জঙ্গলে বাধিয়া নিজেকেই অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়; এর পর বন্দুক রক্ষা করা তখন অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। এই সব কারণে হাওদাতে সর্ব্বদাই এক খানা দা বা বড় ছুরি রাখা উচিত।

একবার আমরা বান্দামাটিয়া নামক স্থান হইতে শিকার করিয়া ফিরিবার সময় আমাদের একজন বন্ধু শিকারী, স্বর্গীয় ডাক্তার উমেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার হাতী সহ গর্ত্তে পড়িয়া হাওদা সমেত একেবারে উল্টাইয়া হাতীর পেটের তলায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। সৌভাগ্য যে, সেদিন তাঁহার হাওদা ভাগীরথী নাম্নী একটী অতি শান্ত হাতীর উপর ছিল বলিয়া তিনি দলিত হন নাই, নচেৎ হয় ত সেই দিন হইতেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের শিকার করার সৌভাগ্যের অবসান হইত।

এই সব কারণেই, হাতীতে চড়িবার পূর্ব্বে শক্ত করিয়া হাওদা কসা হইল কি না, দেখিয়া লওয়া উচিত। হাওদা বাঁধা ঢিলা হইলে, এইরূপ দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। মাহুতগণের অমনোযোগিতায়, অথবা হাওদার দড়ি নূতন হইলেও, অনেক সময় হাওদা ঢিলা হইয়া যায়।

আরও একটী বিষয়ে হাওদায় সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার। বনের স্থানে স্থানে ঘন ঝোপের মত মৌমাছির চাক থাকে। চলিবার সময় মাহুতের অসতর্কতায়, হঠাৎ তাহাতে ধাক্কা লাগিলে, তাহার ফল যাহা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এই জন্য সর্ব্বদাই হাওদায় কম্বল, র‍্যাগ কিংবা ওয়াটারপ্রুফ চাদর রাখা উচিত।

একবার আমাদের দেশে, বাড়ীর নিকটেই বাঁসাটি গ্রামে এক লেপার্ড শিকারের সময় পরলোকগত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের হাওদার পিছনে, অদ্বৈত বংশোদ্ভব কোন এক গোস্বামী প্রভু ছিলেন। হঠাৎ এক মৌমাছির চাকে ধাক্কা লাগিয়া, তাঁহার যা দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। শিকারী বাঁধা পোষাকের উপর কম্বল মুড়ি দিতে দিতে দুই চার কামড় খাইয়াই অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু গোঁসাইজী হাতী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উলঙ্গ হইয়া নৃত্য করিতে করিতেও অব্যাহতি না পাইয়া, অবশেষে নিকটস্থ এক পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে যাত্রায় রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহাকে পাল্কী করিয়া বাড়ী আনিতে হইয়াছিল।

তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জীব হিংসার আনন্দ উপভোগ করিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় প্রকারান্তরে মহাপ্রভু তাঁহার এই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি শিকারের নাম শুনিলে, তাহার ত্রিসীমানায়ও যাইতেন না।

বর্ষাকালে শিকারে মৌমাছি বেশী না থাকিলেও, বোল্‌তার উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। প্রায় প্রতি ঝোপেই বোলতার চাক থাকে, এবং প্রতিদিনই দশ পনের জনকে কামড়ায়। এমন অবস্থাও ঘটে যে শিকার সম্মুখে অথচ তখন বোলতার দৌরাত্ম্যে লাইন লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। ইহাতে এক এক সময় এত বিরক্তি বোধ হয় যে, তাহা আর বলিবার নহে। এই গোলযোগে পড়িয়া কোন কোন সময় সম্মুখস্থ জানোয়ারকে একেবারেই হারাইয়া ফেলিতে হয়। একবার হোমিওপ্যাথিক লিডম্‌প্যালচটার নামক ঔষধের মাদার টিন্‌চার ব্যবহারে অত্যন্ত ফল পাইয়াছিলাম। উহা সঙ্গে করিয়া হাওদায় লইয়া যাইতাম; কাহাকেও বোল্‌তা কামড়াইবা মাত্রই তুলা করিয়া একটু লাগাইয়া দিলে, আধ মিনিটের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা সব উপশম হইয়া যাইত। হাওদায় এই ঔষধটী রাখিতে আমি সকলকেই পরামর্শ দিই। ইহা ডেলা, বিছা প্রভৃতির কামড়েও বিশেষ ফলপ্রদ।

হাতী খুব শিকারী না হইলে হাওদা শিকার ভাল হয় না। হাতী স্বভাবতঃই ভীরু জন্তু; ইহাদিগকে শিক্ষা (Training) না দিলে শিকার করা কঠিন। হাতী ভয় পাইয়া পলাইতে আরম্ভ করিলে, সহজে ফিরান যায় না। বহু চেষ্টায় মাহুত গজবাগ্ (অঙ্কুশ) মাথায় মারিয়া ফিরাইতে সমর্থ হয়। কতক দূর পর্য্যন্ত ইহারা উচ্ছৃঙ্খল থাকে, পরে ক্রমাগত গজবাগের আঘাতে ফিরিতে বাধ্য

হয়। এই অবস্থায় অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনাই অধিক। বিশেষতঃ গাছড়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাতী ভয় পাইয়া পলাইলে যে কিরূপ বিপদ হয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। পলাইবার সময় ইহারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যে যেদিকে পারে ছুটিয়া পলায়। সেই সময় খানা ডোবা, কাঁটা জঙ্গল প্রভৃতি কিছুর প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করে না।

সকল হাতীই শিকারে ভাল হয় না। শিকার করিতে করিতে কোন কোন হাতী উৎরাইয়া যায়; কোন কোনটী এরূপ শিকারী হইয়া উঠে যে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে কিছুমাত্র ভয় করে না; এমন কি বাঘ লাফাইয়া মাথায় উঠিলেও কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। তখন যেন ইহারা মনে করে, "ভয় কি, আমার রক্ষাকর্ত্তা উপরে আছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন।" দুই একবার যদি কোন হাতী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাহার উপরিস্থিত শিকারীদ্বারা উহাকে নিহত হইতে দেখে, তাহাতেও ইহাদের সাহস বাড়িয়া যায়।

হাতী শিকারী হওয়া না হওয়ার আর একটী কারণ আছে। প্রথমতঃ মাহুত যদি সুদক্ষ ও সাহসী হয়, তাহা হইলে চলনসই হাতীও ক্রমে ভাল হইয়া উঠে, কিন্তু দক্ষতা ও সাহস শিকারীর যোগ্যতা-সাপেক্ষ। শিকারী আনাড়ি হইলে মাহুতের দিল ছোট হইয়া যায়। সুতরাং হাতীর শিকার-পাণ্ডিত্যে মাহুত ও শিকারীর পরস্পরের যথেষ্ট সংযোগ আছে। সাধারণতঃ হাতী একটু বয়স্থ হইলে, সাহসী হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। মানুষের ন্যায় ইহারাও ক্রমে দেখিয়া শুনিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পরিপক্বতা লাভ করে। কোন কোন হাতী আজীবনই বজ্জাত ও ঝগড়া থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ মেনা ও মেনী হাতীগুলি অধিকতর চঞ্চল হয়। ৭ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ 'নর' ও মাদী হাতীকে সচরাচর মেনা ও মেনী হাতী বলে।

হাওদার হাতী একটু উচ্চ হইলে শিকারে সুবিধা, কারণ অনেক সময় জঙ্গল এত উচ্চ হইয়া পড়ে যে, হাতী হাওদা শুদ্ধ তার মধ্যে ডুবিয়া যায়। তখন উচ্চ হাতী হইলে, অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, এবং এইরূপ ঘন জঙ্গল, হাওদা পিঠে করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

হাওদা শিকারে আর একটী বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া আবশ্যক। হাওদা শিকার কেন, সব রকম শিকারেই এইরূপ সতর্ক হওয়া উচিত। শিকার দেখিয়া অনেক সময়ই বন্দুক হাতে উঠাইয়া দুই ঘোড়া (double cock) তোলা হয়; কিন্তু কোন কারণে আওয়াজ করা না হইলে বন্দুক হাওদায় নামাইয়া রাখা হয়; তখন ঘোড়া নামাইয়া single cock বন্দুক করিয়া রাখা উচিত। ডবল কক্ তুলিয়া, নামাইয়া রাখিলে, অনেক সময় দুর্ঘটনা হওয়ার খুব সম্ভাবনা থাকে। হাওদায় বন্দুক রাখিবার ৪টী করিয়া স্থান থাকে তাহাদিগকে gun rest বলে।

হাতী লাইন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেই শিকারীকে বন্দুক হাতে করিয়া প্রস্তুত হইয়া হাওদার উপর দাঁড়াইতে হয়। হাতের গোড়ায় বন্দুক আছে, যখন ইচ্ছা তুলিয়া লইতে পারিব মনে করিলে তাড়াতাড়ির সময় বন্দুক উঠাইয়া কদাচ ফায়ার করা যায়।

হাওদা শিকারে বন্দুক সম্বন্ধে খুব সতর্ক না থাকিলে যে কিরূপ সাংঘাতিক বিপদ সময় সময় উপস্থিত হয়, তাহার দুইটী উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।

একবার আমরা নেপালে শিকার করিবার সময় শিকারান্তে একদিন তাঁবুতে ফিরিতেছি, মধ্যে প্রকাণ্ড কুশী (কৌশিকী) নদী, সকল হাতীই হাওদা ও গদী সমেত আরোহী লইয়া পার হইতেছে। কোন কোন স্থানে জল বেশী থাকায় হাতীগুলি সাঁতরাইয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা এলোমেলো ভাবে পার হইতেছিল। এক হাওদায় স্বর্গীয় মনু বাবু ও কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন। এই হাওদার পশ্চাতে, এক গদীর হাতীতে বাপুজী নামক এক বৃদ্ধ শিকারী ছিলেন। বাপুজী গদীতে চড়িয়া শিকার করিতেন বলিয়া তাঁহার হাতে সর্ব্বদাই একটী হেনরি মার্টিন রাইফল্ থাকিত। মনুবাবুর হাতীর পিছনেই, বাপুজীর হাতীও সাঁতরাইয়া পার

হইতেছিল। হাতী পার হইবার সময়, সেই আন্দোলনে বাপুজীর পক্ষে বন্দুক রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। খানিক পরেই আমরা দেখিতে পাইলাম, বাপুজী তাঁহার বন্দুকটী যোগেন বাবুকে হাওদায় রাখিতে অনুরোধ করিলেন। যোগেন বাবু বন্দুক লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন, বাপুজীও বন্দুক দিতেছেন, এই সময় ধাক্কা লাগিয়া বাপুজীর হাতেই বন্দুক আওয়াজ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই যোগেন বাবু দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন ও মনুবাবুর মাথার সোলাহাট্ উড়িয়া গিয়া জলে পড়িল। সেই সময় সকলেই কি হইল কি হইল বলিয়া গোল করিয়া উঠিল। গুলি যোগেন বাবুর মুখের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়া, মনু বাবুর টুপিতে লাগিয়াছিল। বারুদের আগুনের হুঁকাতে যোগেন বাবুর গোঁফ ও মুখ, স্থানে স্থানে পুড়িয়া গিয়াছিল।

এই ঘটনার পর, বাপুজী কয়েকদিন গুম্ হইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মগ্লানির মাত্রা কিছু কমিয়া আসার পর, তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছিলেন। যদি পূর্ব্বেই বন্দুক হইতে গুলি খুলিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আর এরূপ দুর্ঘটনা হইত না।

আর একবার গুলি মাটিতে লাগিয়া, পিছলাইয়া গিয়া, এইরূপ একটি বিপদ ঘটিয়াছিল। সেও আজ ১২।১৪ বৎসর আগেকার ঘটনা। আমরা গারো পাহাড়ের নীচে আরালিয়া নামক স্থানে, ক্যাম্প করিয়া শিকার করিতেছিলাম। একদিন সংবাদ পাইলাম, বাটসামের বাথানে একটি জংলী মহিষ বা বয়ার আছে। বাটসাম একটি প্রকাণ্ড হাওর বা বিল। এই স্থানে অনেকেই মহিষ পোষে এবং অনেক সময় সেখানে ২।৩টি বাথানে ৪৫ শত মহিষও থাকে। বাথানিয়ারা ও কতকগুলি গোয়াল, একদিন আসিয়া জানাইল যে, বয়ারের উৎপাতে ওখানে বাথান রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং গোয়ালরা দুধের জন্য, বাথানে যাতায়াত করিতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় উহারা এত আগ্রহের সহিত আমাদের শরণাগত হইয়াছিল। মহিষটা ক্রমাগত দৌরাত্ম্য করিতে করিতে এত বদমায়েস হইয়া উঠিয়াছিল যে মানুষ তো দূরের কথা, হাতী দেখিয়াও প্রায় ভয় পাইত না।

আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে হাওদায় না গিয়া, মাত্র ৩।৪টি গদীর হাতী লইয়া, আমরা ২।৩ জন শিকারী যাইব। পরদিন প্রত্যুষে মনু বাবু, রাজা জগৎকিশোর ও আমি, তিন হাতীতে তিনটি রাইফল লইয়া বাহির হইলাম। খানিক দূর গিয়াই, একটা প্রকাণ্ড বন তুলসীর জঙ্গলে, বয়ারটিকে, ২।৩টী পালিত মহিষীর সঙ্গে দেখিতে পাইলাম। দূর হইতে যদৃচ্ছা গুলি না করিয়া, যতদূর সম্ভব নিকটে গিয়া মারিব স্থির করিয়া, তিনজন তিন দিক হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমরা খানিক অগ্রসর হইতেই, পালিত মহিষকয়টী চলিতে আরম্ভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্দিষ্ট বয়ারও চলিতে লাগিল। ক্রমেই দূরে যাইতেছে দেখিয়া গুলি করা হইল। সৌভাগ্য যে, প্রথম গুলিতেই উহার ডান পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাজা পা লইয়া দৌড়াইতে লাগিল। আমরাও উহার পাছে পাছে দৌড়াইয়া গুলি বৃষ্টি করার পর, উহাকে নিধন করিলাম। আমরা যখন ক্রমাগত গুলির পর গুলি করিয়া মহিষকে নিস্তেজ করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ একটি গুলি গাছের একটা সরু ডালে লাগিয়া পিছলাইয়া বোঁ বোঁ শব্দে মনু বাবুর পায়ের খানিক চামড়া ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। আর একটু হইলেই পা খানা, বাটসামের হাওরে রাখিয়া, কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া কাঠের পা লাগাইয়া, দুধের স্বাদ ঘোল দিয়া মিটাইতে হইত। যদিও ইহা আমাদের স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, তথাপি আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

শিকারে, সময় সময় এইরূপ নানা অবস্থার মধ্য দিয়া, নিজেকে ও অপরকে বিপন্ন করিয়া, ইহা আমার বেশ ধারণা হইয়াছে যে, বন্দুক ও গুলি বারুদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। এই সব বনে, অনেক সময়ই লোকে বন কাষলা বা নলখাগড়া ইত্যাদি কাটে; কেহ কেহ বা বিলে মাছও ধরে। খুব সতর্ক হইয়া গুলি না চালাইলে, সর্ব্বদা না হইলেও, মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা হওয়ায়

সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন সময়, হাতী দৌড়ের মধ্যে গুলি করিলে, গুলি গাছে বা মাটিতে লাগিয়া পিছলাইয়া উঠিয়া যায়; তখন তাহার গতিবেগ বাড়িয়া জোর অত্যন্ত বেশী হয়।

হাওদা শিকার তিন প্রণালীতে হইয়া থাকে।

(১) জঙ্গলভাঙ্গা হাতী (Beater) ও হাওদার হাতী এক সঙ্গে লাইন করিয়া যাওয়া।

হাওদার হাতীকে, সর্ব্বদা লাইনের হাতী অপেক্ষা, ২।১ হাত অগ্রে রাখাই কর্ত্তব্য। এইরূপ লাইন করিয়া সব হাতী সমভাবে গেলেও, অনেক স্থানে বনের তারতম্যে, হাতীগুলি অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া পড়ে। তখন আগের হাতীকে দাঁড় করাইয়া, পাছের হাতীর জন্ম অপেক্ষা করা উচিত। ইহা লক্ষ্য না করিলে, হাওদা শিকার হইতেই পারে না।

কোন কোন সময় হাতী ২।৩ লাইন হইয়া পড়িলে, মাহুতদিগের তাহা বড় লক্ষ্য থাকে না; কারণ, তাহারা অনেক সময়ই বনের মধ্যে প্রায় ডুবিয়া যায়। এজন্ম শিকারীরই তাহা লক্ষ্য রাখা উচিত। কোনও স্থানে লাইন ডাইনে কি বাঁয়ে ঘুরাইতে হইলে, একটি একটি করিয়া হাতী ক্রমে না ঘুরাইয়া, সবগুলি এক সঙ্গে ঘুরাইবার চেষ্টা করিলে, লাইন নষ্ট হইয়া যায়। লাইনের উভয় প্রান্তের হাতী দুইটাতে দুইটী নিশান থাকিলে, উহা দেখিয়া লাইন পরিচালনা করার সুবিধা হয়। অনেক সময় ঘন বনে মাহুতেরা 'সোরগোল' করিয়া যাইতে থাকে; সেই শব্দেও লাইন ঠিক্ রাখা যায়। কিন্তু যতই চেষ্টা করা হউক না কেন, ঘন বনে লাইন ঠিক রাখা বড়ই কঠিন।

কোন জানোয়ার সম্মুখে পড়িলে, কোন শিকারীরই লাইন ছাড়িয়া একা বা সঙ্গে আরও ২।১টী হাতী লইয়া, উহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া অত্যন্ত অন্যায়। ইহা শিকার বিধির বিরোধী; ইহাতে শৃঙ্খলা (discipline) একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। সেই সময় অন্ম শিকারীর সম্মুখে কোন শিকার পড়িলে, তাহার শিকারের বিঘ্ন ঘটে; নিজেরও সাফল্যের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। আমাদের পার্টিতেও কোন কোন বন্ধুর, এই অভ্যাসটী অত্যন্ত প্রবল ছিল; কিছুতেই তাঁহাদিগকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করা যাইত না। তবে কাহারও শিকার জখম হইলে, অবস্থা বিবেচনায় ২।১ স্থলে ঐরূপ করিতে হয়।

লাইন করিয়া যাওয়ার সময়, কাহার সম্মুখে জানোয়ার বাহির হইবে, তাহা অনিশ্চিত। একের সম্মুখের শিকারকে, পার্শ্ববর্ত্তী অন্ম কোন শিকারীর গুলি করা, বা আগু হইয়া তাহার সম্মুখে যাইয়া পড়া অত্যন্ত অসভ্যতা। হয় তো সম্মুখস্থ শিকারী, জঙ্গলের অবস্থায় জন্ম শিকার দেখিতে পান নাই, অথবা দেখিতে পাইয়াও ভাল মারিবার অপেক্ষায় আছেন, এই অবস্থায় অপরের এইরূপ ব্যবহার একেবারে নীতিবিরুদ্ধ। তবে কোন সময় যদি এরূপ অবস্থা ঘটে যে, সম্মুখস্থ শিকারী কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না; অথচ ক্ষণমাত্র বিলম্বে শিকার হাতছাড়া হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, তখন অপর শিকারীর উহা মারা দোষাবহ নহে।

স্থূল কথা এই যে, প্রত্যেক শিকারীরই নিজ নিজ সম্মুখস্থ শিকার মারা নিয়ম। কিন্তু কেহ কোন শিকারকে জখম করিয়া দিলে, অন্ম শিকারী যদি তাহা সম্মুখে পাইয়াও না মারেন, তবে আর একত্র শিকার করা চলে না। অন্যের শিকার মারিতে যাই কেন, এইরূপ হিংসামূলক বুদ্ধি হইতে, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ শিকার মারিতে হইবে, এই নীতি অনুসরণ করিলে, বার আনা শিকারও 'ব্যাগ্' করা যায় না।

(২) দ্বিতীয় প্রণালীর হাওদা শিকারে শিকারীকে স্থানে স্থানে হাওদাসহ Stopএ (নাকায়) দাঁড়াইয়া, beater হাতী যায় জঙ্গল ভাঙ্গাইতে হয়। [যে সকল স্থান দিয়া জানোয়ারের পালাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে নাকা বলে।] আর একটী কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত, যে সকল শিকারীর উপর বেশ নির্ভর করা যায়, তাহাদিগকেই 'নাকায়' দাঁড়াইতে দেওয়া সঙ্গত। কোন জঙ্গলে ২।১টী মাত্র 'নাকার' স্থান থাকিলে, সেই কয়েকটী শিকারীকে তথায় দাঁড়াইয়া,

অবশিষ্ট শিকারীদিগকে লাইনের সঙ্গে যাইতে হয়। এই জাতীয় 'নাকায়' দাঁড়াইয়া শিকার, বাঘ শিকারের সময়ই ভাল হয়। যদি বাঘ, মরি (kill) করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় এবং জঙ্গল না হয়, তবে অনেক সময় লাইনের শব্দে দূর হইতেই বাঘ, বিস্তৃত জঙ্গলে সরিয়া পড়ে; এই অবস্থায় সুবিধামত 'নাকায়' স্থান গ্রহণ করিতে পারিলে, খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। যে সব শিকারী 'নাকায়' থাকিবেন তাঁহাদের জঙ্গল বা গাছের আড়ালে দাঁড়ানই বিধেয়। কারণ, শব্দ পাইয়াই লাইনের হাতী পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বে, 'নাকায়' সম্মুখে, শিকার আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা আসিয়াই যদি নাকার হাতী দেখিতে পায়, তবে ফিরিয়া যায়—অথবা বিপদে বাহির হইয়া পড়ে। আবার কোনও সময় ফিরিয়া গিয়া, লাইনের হাতী ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। যে স্থানে লুকোচুরি, সেই স্থানেই বিপদ আশঙ্কা করিয়া, প্রকাশ্য শত্রুর সম্মুখীন হইতে দ্বিধা বোধ করে না। হাঁটা বা মাচা শিকারে এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। নাকার হাতীতেও শিকারীকে খুব সাবধানে বন্দুক লইয়া সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়; কারণ কোন্ সময় অবসর পাওয়া যাইবে তাহা অনিশ্চিত এবং তাহা একবার হারাইলে আবার পাওয়া কঠিন।

(৩) নেপাল টেরাইতে কর্ণেল খড়গজঙ্গের নেতৃত্বে, আমরা অন্য এক প্রণালীতে হাওদা শিকার করিয়াছি। Beater হাতী দ্বারা লাইন রচনা করিয়া, হাওদার হাতীগুলি লাইনের ৫০.৬০ গজ সম্মুখে সমদূরবর্ত্তী হইয়া, সমস্ত লাইন জুড়িয়া, আগে আগে চলিতে থাকে, লাইন পিছনে পিছনে আইসে। এই প্রণালীর শিকারে আমরা বিশেষ ফল পাই নাই। ইহা আমি মোটেই পছন্দ করিতাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

অবতার প্রসঙ্গ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অর্থাৎ সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন কল্পে আমি যুগে যুগে জন্ম পরিগ্রহ করিব। ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে এই বচনের সত্যতা উপলব্ধ হয়। ইহুদি জাতি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইতে থাকায় যীশুখৃষ্টের জন্ম হইয়াছিল। ঘোর তমসাচ্ছন্ন আরব জাতিকে ধর্ম্মালোক প্রদানের নিমিত্ত মহম্মদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কি উপায়ে মানব জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে তাহাই শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ মতের "নির্ব্বাণ" ও বেদান্তের "মোক্ষ" এ দুটির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ "নির্ব্বাণ" শব্দের এক অদ্ভুত অর্থ করিয়া শূন্যবাদে উপনীত হয়েন। তাহার ফলে, বহু সংখ্যক লোকের মন হইতে ধর্ম্মভাব অপনীত হইবার উপক্রম হওয়ায়, পুনর্ব্বার ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রয়োজন হয়। সেই সময়ে শঙ্করাচার্য্য রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ পূর্ব্বক "অধিকার ভেদ" জ্ঞান ও ভক্তি মার্গ প্রদর্শন করতঃ হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। শঙ্করের উদ্যম ও কার্য্যতৎপরতার ফলে ভারতের প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরগুলি পুনঃসংস্কৃত এবং অনেকগুলি নূতন মন্দির

নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি বেদান্ত প্রচারের নিমিত্ত হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সংখ্যাতীত মঠ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দ যাবৎ ভারতবাসী সেই মহাপুরুষের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে পর ভারতে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হয়। মুসলমানেরা পাশব বলের সাহায্যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হওয়ায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। সেই দুর্দ্দিনে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। তিনি সময়ের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করাইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্মবিদ্বেষ নিবন্ধন উভয় জাতির মন যেরূপ মোহাচ্ছন্ন, তাহাতে জ্ঞান মার্গ প্রচারে কোন ফল হইবে না; সেই জন্য, উভয় জাতিকে ভক্তি পথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রযত্নে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এরূপ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে যে কতকগুলি মুসলমানও তাঁহার শিষ্য হইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কয়েক শতাব্দ এই ভাবে চলিলে পর দেশের ধর্ম্মভাব পুনর্ব্বার শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্য দেবের উচ্চ আদর্শ বিস্মৃত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর বৈষ্ণবেরা "নেড়া নেড়ির" দলে পরিণত হইয়া উঠে। যিনি জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সংসারের সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাঁহার পুরবর্ত্তী কালের শিষ্যগণের চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে ব্যথিত হইতে হয়। কিন্তু ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এযাবৎ যে সমস্ত মহাপুরুষ পৃথিবীতে নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার মর্ত্তে আগমন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের কি পরিণাম ঘটিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যীশুখৃষ্ট ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে যে মন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত জাতি আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন, তাঁহারা কি যথার্থই সেই মন্ত্রের সাধক? তাঁহারা "স্বর্গরাজ্যে" প্রবেশের নিমিত্ত বাইবেলের উপদেশ গুলির মধ্যে কোন্‌টি পালন করিয়া থাকেন? কালের প্রভাবে, খৃষ্টান ধর্ম্মের যেরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মেও যে সেইরূপ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। "নেড়ানেড়ী"গণের কিরূপ নৈতিক অধোগতি হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত গান দুইটি হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন:—

নেড়ীর গান

"এই পূজোতে ঝুমকো দিবি তবে ঘরে র'ব।
নইলে তোর মুখেতে দিয়ে কালী বাঘনাপাড়ায় যা'ব॥
উপর কানে কানবালা নীচের কানে দুল,
খোঁপায় লাগাব চুল ফুল।
আবার ভারী দামের ডায়মন কাটা চার গাছি মল নিব॥"

নেড়ার উত্তর।

"ঝুমকো চেটি পর নোড় কেন তোরে দিব।
আমি পাঁচ সিকে খরচ ক'রে কত নেড়ী পাব॥"

চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের কয়েক শতাব্দ পরে নেড়া নেড়ী দলের সৃষ্টি ভিন্ন হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের আরও একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বৃটীশ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হওয়ায় ইংরাজ রাজনীতিক ও মিসনারি সম্প্রদায় সেই সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, প্রথা পদ্ধতি সমস্তই তীব্র ভাবে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, ভারতবাসীর অতীত গৌরবের কিছুই নাই; তাহাদের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান-যুগের অনুপযোগী; ষড়্‌দর্শন, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি দর্শন ও শাস্ত্রনিচয় অসভ্য জাতির অপরিমার্জ্জিত ভাবরাশির অভিব্যক্তি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থ সমূহ পিতামহীর উপকথা। ভারতবাসী যদি ঐহিক মঙ্গলের কামনা করে, তাহা হইলে অতীতের স্মৃতি বিস্মৃতি-জলে ফেলিয়া দিয়া প্রতীচ্যের পদানত হওয়া তাহাদের কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় যুবকবৃন্দ এই প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায়

তাহাদের সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, জঘন্য পৌত্তলিকতাই হিন্দুগণের ধর্ম্ম তাহাদের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সভ্য জগতের ঘৃণা-উদ্দীপক। এইরূপ সংস্কারের ফলে অনেকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল; কতকগুলি হিন্দু, খৃষ্টান ধর্ম্মের অনুকরণে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল; বহু সংখ্যক ইংরাজি-শিক্ষিত যুবক মিল্, কোমত প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে করায় ভগবান সিংহাসনচ্যুত হইবার উপক্রম হইলেন। এইরূপ ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় পুনর্ব্বার "ধর্ম্ম সংস্থাপনের" প্রয়োজন হইল। সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া, প্রিয়শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের সাহায্যে এক অভিনব সত্যের অবতারণা করিলেন। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার সন্দেহ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত প্রচার করিলেন যে, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ঈশ্বর লাভের ভিন্ন ভিন্ন উপায় মাত্র। এই সত্যটি তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় সমূহকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন:—

"আন্তরিক হ'লে সব ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাইবে. শাক্তরাও পাবে, বেদান্ত বাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান, খৃষ্টানরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে।"

পরমহংস দেবের পূর্ব্বে এরূপ সত্য কথনও জগতে প্রচারিত হয় নাই। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ প্রটেষ্ট্যান্ট দিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রটেষ্ট্যান্টগণ রোমান ক্যাথলিকদিগের পাকস্থলী বিদীর্ণ করিয়া প্রাণসংহার করিয়াছিল; মুসলমানেরা হিন্দুদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির চূর্ণ করিয়া তরবারির সাহায্যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারের প্রয়াস পাইয়াছে; হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়াছে; খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকেরা হিন্দু ধর্ম্মের ছিদ্র অন্বেষণ এবং হিন্দু। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়াছে—কিন্তু কেহই এযাবৎ এরূপ কথা বলে নাই "তোমরা অনর্থক বিবাদ করিতেছ কেন? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি সকল ধর্ম্মই সত্য, অন্তরের সহিত ভগবানকে ডাকিলে সকলেই তাঁহাকে পাইবে।" এরূপ সত্য অমূল্য, ইহা অবতার পুরুষেরই মুখ হইতে নিঃসৃত হইবার উপযুক্ত। এরূপ সত্য কয়েক শতাব্দ পূর্ব্বে প্রচারিত হইলে, ধর্ম্মবিদ্বেষ নিবন্ধন পৈশাচিক নাট্য অভিনীত হইয়া পৃথিবীর ইতিহাস কলঙ্কিত হইত না।

সাকার, নিরাকার ও অবতারবাদীগণের বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ঈশ্বর সাকার নিরাকার উভয়ই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানব দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন একথাও সত্য, আবার ভক্তগণের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত দেব দেবীর মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাদিগকে দেখা দেন ইহাও সত্য। বেদান্তের পরব্রহ্মও যিনি, কালীও তিনি। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিলে তিনি ব্রহ্ম: আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কার্য্য করেন তখন তাঁহাকে কালী বলি।

এইক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের স্বরূপ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা কি অভ্রান্ত সত্য, অথবা বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? তাঁহার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় সাধু পুরুষ বহুকাল যাবৎ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তাঁহার পবিত্র জীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সমস্ত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকৃষ্ট করিয়াছিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় যোগীপ্রবর পাহাড়ী বাবা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া জানিতেন। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী ধর্ম্মবীরগণ তাঁহার শিষ্য হইতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাগ্মীবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দার্শনিক প্রবর ব্রজেন্দ্রকুমার শীল ও কলিকাতার হোমিওপ্যাথি সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার, তাঁহার শিষ্য না হইলেও তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। ইউরোপের সুবিখ্যাত মনীষী অধ্যাপক

মক্ষমূলার তাঁহার অমূল্য উপদেশ গুলি ইংরাজিতে মুদ্রিত করিয়া তাহা সভ্য জগতে প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল টনি ও জেনেরল এসেম্‌ব্লি কলেজের (বর্ত্তমান স্কটিস চার্চ্চ) তদানীন্তন প্রিন্সিপাল হেষ্টি ও কুক নামক অপর একজন ইংরাজ তাঁহার অলৌকিক ভাবে মুগ্ধ হইয়া সংবাদপত্রে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। এরূপ মহাপুরুষ উন্মাদের ন্যায় কতকগুলি উক্তি করিয়া গিয়াছেন, ইহা উন্মাদ ভিন্ন কেহই মনে করিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। আমেরিকার সুবিখ্যাত অধ্যাপক জে, এইচ, রাইট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সে দেশের সমস্ত অধ্যাপক একত্র হইলেও বিবেকানন্দের সমকক্ষ হয়না। (১) সেই বিবেকানন্দ কিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিব। যুবক নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেছিলেন। তৎকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীয় ভবনে কতিপয় যুবককে বেদান্ত সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেন। নরেন্দ্রও সেই স্থানে গমন করিতেন। কিন্তু তিনি কোন কালেই "সুবোধ বালকের" ন্যায় শিক্ষকের নিকট যাহা শুনিতেন তাহাই গলাধঃকরণ করিতেন না। শিক্ষক কোন একটা উক্তি করিলে নরেন্দ্র, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের প্রয়াস পাইতেন। একদিন মহর্ষি ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে যুবক নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?" এই প্রশ্নে মহর্ষি একটু সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় নরেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি হতাশ্বাস হইলেও তাঁহার জ্ঞান পিপাসা পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন, ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে দেখিব, আর যদি না থাকেন তবে সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে জনৈক বন্ধুর পরামর্শে দক্ষিণেশ্বর যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে আসিয়াই তিনি ব্যগ্রতা সহকারে পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তোমাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহা অপেক্ষাও ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখিয়াছি। আমি তোমাকেও দেখাইতে পারি।" এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল না। দ্বিতীয় দিবস নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আসিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর তুমি কি করিলে, আমার যে মা বাপ আছে।" নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবিলেন, নরেন্দ্র এখনও সর্ব্বোচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হয় নাই। তখন অঙ্গুলি দ্বারা পুনর্ব্বার গাত্র স্পর্শ করিলেন—তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। নরেন্দ্র যতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র সমস্তই আকাশের সহিত মিশিয়া পরব্রহ্মে লয় হইতেছে। সেই ঘটনার স্মৃতি অবলম্বনে স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গালা ভাষায় যে সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার এক পদ মাত্র প্রবন্ধলেখকের স্মরণ আছে। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, শশাঙ্ক সুন্দর"—

সঙ্গীতটি বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইয়া "ব্রহ্মসত্য—জগৎ মিথ্যা"—বেদান্তের এই সর্ব্বোচ্চ সত্যটি জগতে প্রচার করিতেছে।

(১) "Here is a man who is more learned than all our professors put together"—J. H. Wright.

উপরিউক্ত ঘটনায় নরেন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি হামলেটের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক বস্তু আছে যাহা দর্শনশাস্ত্র কখনও কল্পনাও করে নাই। তথাপি তিনি পরমহংস দেবের সমস্ত উক্তি অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার দেহত্যাগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ক্রটি করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ কালে নরেন্দ্র ভাবিতেছিলেন, "ইনি যদি এই সময়ে বলেন, আমি অবতার, তাহা হইলে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোর এখনও সন্দেহ আছে। যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রামকৃষ্ণ; কিন্তু এটা বেদান্ত মতে নহে।" স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইবার কিছুকাল পরে জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যে কে তাহা আমি এখনও বলিতে পারি না। ঈশ্বরের অবতার বলিলে, তাঁহাকে নিম্ন আসনে প্রদান করা হয়।" (২)

শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সাধনা পূর্ব্বক অনুভূতি লাভ করিয়াই বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম লইয়া তোমরা বিবাদ কর কেন? সমস্ত ধর্ম্মই সত্য।" তিনি ভগবানকে কখনও কালীরূপে, কখনও কৃষ্ণরূপে, কখনও মহম্মদের বেশে, কখনও যীশুখৃষ্টের অবয়বে দৃষ্টি করিতেন; কখনও বা কখনও ইহুদি মহাপুরুষ মোজেসের ন্যায় ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন। আবার যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি হইত, তখন ঈশ্বরের সহিত তাঁহার কোন প্রভেদ থাকিত না। তিনি পৃথিবীর ধর্ম্ম সমন্বয়ের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কার্য্য অবসানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার আবির্ভাবে ভারতবর্ষের যে কি উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ সঞ্জীবিত হইলেও ভারতের বৈদেশিক শত্রুগণ অদ্যাপি ছত্রভঙ্গ হয় নাই। ভারতবাসী কোন কালে স্বায়ত্ত শাসনের উপযোগী হইতে পারিবে না, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, তাহারা হিন্দুগণের ধর্ম্ম ও প্রাচীন সভ্যতার উপর পুনর্ব্বার খড়্গহস্ত হইয়াছে। আর্চার নামক সুপ্রসিদ্ধ লেখক তৎপ্রণীত "ভারতবর্ষ এবং ভবিষ্যৎ" নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষকে একটি বর্ব্বর দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পৃথিবীর বর্ব্বর জাতি সমূহের মধ্যে যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম তদপেক্ষাও নিম্ন শ্রেণীর। যোগ সাধনার প্রতি উপহাস করিয়া আর্চার বলিয়াছেন যে এরূপ পদ্ধতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই সম্ভবপর। গাফ নামক জনৈক ইংরাজ সমালোচক উপনিষদগুলিকে বর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক প্রবর জনাষ্টান বলিয়াছেন "হিন্দুধর্ম্ম ভীতিসঞ্চারক স্বপ্নমিশ্রিত আবর্জ্জনা রাশি। যতদিন ভারতবাসী এই ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে, ততদিন ইংরাজ জাতি ভারতে যদৃচ্ছা শাসন প্রচলিত রাখিতে অধিকারী।"

এই সমস্ত সমালোচনার চূড়ান্ত উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা ঈশ্বর অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তোমরা অজ্ঞান বশতঃই হউক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত হউক, যাহা বলিতেছ, ভারতবাসী তাহাতে বিচলিত হইবেনা; তাহাদের ধর্ম্ম ঈশ্বর অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দুধর্ম্ম যে প্রকৃতই ঈশ্বর অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত ইহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইনি এখনও সুপরিচিত না হইলেও, কালক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় ইঁহারও নাম চিরস্মরণীয়

---

(২) The Life of the Swami Vivekanand, published at the Adwaita Asram

হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহার নাম শ্রীঅনুকূল চক্রবর্ত্তী। ইনি পদ্মা নদীর কূলস্থিত হেমাইতপুর গ্রামের অধিবাসী। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অনুকূল ঠাকুরও বালকস্বভাব-সম্পন্ন। ইঁহার সমাধি অবস্থার ভাববাণী গুলির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের সৌসাদৃশ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় ইনিও বলেন, পৃথিবীর কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত ঈশ্বর লাভের ভিন্ন ভিন্ন উপায় মাত্র। তবে ইঁহার মতের বিশেষত্ব এই যে, ইনি বলেন শব্দব্রহ্মের সাধনা দ্বারা যত শীঘ্র অনুভূতি হয়, অন্যান্য সাধনা প্রণালীতে তত শীঘ্র হয় না।

শব্দব্রহ্মের সাধনা পদ্ধতি নূতন নহে। ধর্ম্ম জগতে এরূপ কোন সত্য প্রচারিত হয় নাই যাহা ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ জানিতেন না। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই:—

"ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ"

"প্রজাপতির্বৈ ইদম্ আসীৎ তস্য বাক্ দ্বিতীয়া আসীৎ।" —অর্থাৎ, আদিতে এক ব্রহ্ম ছিলেন এবং তাঁহার দ্বিতীয়া বাক্ বা শব্দ ছিল। উক্ত উপনিষদ আরও বলেন—

"বাগ্‌বৈ পরমং ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ বাক্ বা শব্দই পরব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন :—

"বাগক্ষরম্, প্রথমজা ঋতস্য, বেদানাং মাতা,
অমৃতস্য নাভি।"

অর্থাৎ বাক্ অক্ষর (অবিনাশী) পরব্রহ্ম হইতে প্রথম জাতা, বেদ সমূহের জননী এবং অমৃতের নাভি অর্থাৎ কেন্দ্র।

উদ্ধৃত বচনগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাক্ বা শব্দ, ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। বৃহদারণ্যক আরও বলেন যে এই দুইয়ের সম্মিলনে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। যে শব্দময়ী চৈতন্যধারা হইতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই জীবজগতের একমাত্র কারণ। সেই ধারাই "রাধা" নামে অভিহিত হইয়া সর্ব্বভূতে বিশেষতঃ মানব দেহে প্রবাহিত। সেই জন্যই বেদান্ত বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক নহে। কিন্তু ঋষিগণ অনুমানের সাহায্যে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। কিরূপে সেই পরব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিরূপে ক্ষুদ্র "আমি" সেই বিরাট "আমির" সহিত একত্ব অনুভব করিবে, তৎসম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকগণ কতকগুলি পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন :—

"বাচৈব ব্রহ্ম জ্ঞায়তে"

অর্থাৎ বাক্ বা শব্দের দ্বারাই ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই শব্দযোগী ছিলেন। তদীয় বংশীনিঃসৃত "রাধা রাধা" ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত হইত।

প্রকৃত পক্ষে, রাধা বৃন্দাবনবাসিনী গোপাঙ্গনা ছিলেন না; শ্রীকৃষ্ণ বংশীর সাহায্যে "রাধা" নাম-ধারিণী শব্দময়ী চৈতন্য ধারার জপে নিমগ্ন থাকিতেন। প্রমাণ স্বরূপ, আমরা ব্রহ্মসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিলাম—

"শব্দ ব্রহ্মময় বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।"

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, তিনি "রাধা" নাম জপ করিবেন কেন? ইহার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—

"শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম, তিনিও রাধা যন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন।"

"রাধা যন্ত্র কুড়িয়ে পাওয়া" ও শব্দময়ী চৈতন্য ধারার অনুভূতি লাভ করা একই কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থানান্তরে বলিয়াছেন :—

"রাধা চিচ্ছক্তি, আদ্যাশক্তি, বেদান্তের ব্রহ্ম।"

যোগীরা অহর্নিশি এই নাম জপ করিতে করিতে অনাহত শব্দ শ্রবণ করে, পরিশেষে পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। অনাহত শব্দ সম্বন্ধে পরমহংসদেব বলিয়াছেন :—

"অনাহত শব্দ সর্ব্বদাই এমনি হচ্ছে প্রণব ধ্বনি। পরব্রহ্ম থেকে আসছে। যোগীরা শুনতে পায় ; বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।"

শব্দব্রহ্ম সাধনার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে অতি শীঘ্র অনুভূতি হয়। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাধক ধ্যানস্থ হইয়া স্বীয় সংস্কার অনুসারে নানাবিধ ঈশ্বরীয় রূপ এবং পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, আকাশ, মেঘ প্রভৃতি যাবতীয় জড় পদার্থ দর্শন করেন। তদ্ভিন্ন জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, বিজলী, অতি ক্ষুদ্র হইতে বিরাট জ্যোতিঃ ও নানাবিধ বর্ণ তাঁহার মানস নয়নে পতিত হয়। কিছু কাল সাধনা করিলে প্রথমতঃ ঝিল্লীরব, তৎপর দূরে অবস্থিত ষ্টীম এঞ্জিনের শব্দ, তৎপরে মেঘ গর্জ্জন ও পরিশেষে বংশীধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় উপনীত হইয়া তিনি দৈববাণীও শ্রবণ করেন ; তখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। ইহার পরে তিনি বেদান্তের চরম অনুভূতি লাভ করিয়া পরমাত্মার সহিত একত্ব অনুভব করেন।

অনুভূতি প্রসঙ্গে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা শুনিয়া ভারতবর্ষীয় সাধকমণ্ডলী বিস্মিত হইবেন না ; কারণ, তাঁহারা জানেন যে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশ অনুসারে নিয়মিত ভাবে কার্য্য করিলে, নানাবিধ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ও শব্দ শ্রবণ অবশ্যম্ভাবী। তবে, সাধারণ পাঠকবর্গ এই সমস্ত কথা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন বলিতে পারিনা। তাঁহাদের প্রতি প্রবন্ধ লেখকের এই অনুরোধ যে, তাঁহারা পূর্ব্বলব্ধ সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণে আধ্যাত্মিক সত্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হউন ; তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, হিন্দুশাস্ত্রের অনেক কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। জড় জগতের অন্তরালে অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

জীবন বাবুর পরলোকগমন

(গল্প)

শীতকাল। বেলা প্রায় দুইটা বাজে। 'আর্য্য প্রতিভা' সম্পাদক সুবিনয় বাবু আফিস ঘরে বসিয়া প্রুফশীট সংশোধন করিতেছেন। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাশীকৃত চিঠি, প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি, নানাবিধ সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র পড়িয়া আছে। ছাপাখানার লোক প্রুফ ফেরত লইয়া যাইবার জন্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল, সুবিনয় বাবুর প্রুফ দেখা শেষ হইল। তিনি ছাপাখানার ভৃত্যের হস্তে প্রুফগুলি প্রদান করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটি সিগার বাহির করিয়া ধূমপানে রত হইলেন।

মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। 'আর্য্যপ্রতিভা' এবারে বোধ হয় কিছু বিলম্বেই প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে একবার দেশে যাইতে হইবে। সেখান হইতে সংবাদ আসিয়াছে তাঁহার ছয় বৎসর বয়স্কা একটি কন্যা ক্রমগত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছে। তাহার চিকিৎসার একটা সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। যদি সম্ভব হয় ত কলিকাতাতেই তাহাকে আনিবেন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর সুবিনয় বাবু পাণ্ডুলিপির তাড়াটি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। 'আর্য্য-প্রতিভা'র নিয়মিত প্রবন্ধ-লেখক জীবন বাবু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন গত কয়েক মাস লিখিতে পারেন নাই। সেই জন্ত একটি ভাল প্রবন্ধের প্রয়োজন। তাড়াটি ইতঃপূর্ব্বেও তিন চারিবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তেমন মনোমত প্রবন্ধ পান নাই। তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা ও গল্পেই তাড়াটি ভারী হইয়া আছে।

উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাবে, তিনি নিজেই কিছু লিখিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময় বন্ধু যামিনীনাথ কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে কথোপকথনের পর যামিনীনাথ বিদায় লইলেন। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া যামিনী বাবু ফিরিয়া বলিলেন, "ও হে, শুনেছ? আমাদের জীবন বাবু মারা গিয়েছেন।"

সুবিনয় বাবু চমকিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি? কবে?"

যামিনী বাবু বলিলেন, "তা'ত জানি না। সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে আশু একখানা পোষ্টকার্ডে অন্ত কথার সঙ্গে শুধু লিখেছিল—শুনেছ বোধ হয় জীবন বাবু মারা গিয়েছেন। কি হয়েছিল, কবে মারা গেলেন, কিছুই জানিনা। তবে শুনেছিলাম তিনি ডিস্পেপ্‌সিয়াতে ভুগ্‌ছিলেন অনেকদিন, কোথায় না কি চেঞ্জে যাবেন।"

"হাঁ তা'ত শুনেছিলাম। কিন্তু অমন শরীর এত শীঘ্র যে তিনি আমাদের ছেড়ে যাবেন এ ত স্বপ্নেও ভাবি নি।"

"আজকাল ঐ রকমই হয়েছে ভাই। মানুষের আর জীবনী-শক্তি নেই। আজ যে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, কাল শুন্‌ছি সে আর নেই! ওঃ তিনটা বেজে গেছে যে। আজ চলি ভাই, আর একদিন আসব।"

যামিনী বাবু বিদায় লইলেন। সুবিনয় বাবু আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। জীবন বাবুর মৃত্যুসংবাদে তিনি সত্য সত্যই ব্যথিত হইয়াছিলেন। জীবন বাবুর সহিত তাঁহার সাত আট বৎসরের আলাপ। এই মাসিকপত্রের সূত্রেই উভয়ের প্রথম পরিচয়। জীবন বাবু প্রধানতঃ এই পত্রেই প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার রচনাগুলি সুবিনয় বাবুর বড় ভাল লাগিত এবং তাঁহার উৎসাহের ফলে জীবন বাবু প্রায় প্রতিমাসেই 'আর্য্যপ্রতিভা'র লিখিতেন। ইদানীং জীবন বাবু বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

জীবন বাবুর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার স্মৃতির প্রতি নিজ কর্ত্তব্যের কথা মনে পড়িয়া গেল। জীবন বাবুর জীবনবৃত্তান্ত সংবলিত মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধ পড়িবার জন্ত বাঙ্গলার পাঠক সম্প্রদায় 'আর্য্যপ্রতিভা'র পৃষ্ঠাগুলিই সর্ব্বপ্রথমে অন্বেষণ করিবে। আগামী সংখ্যাতেই সেই প্রবন্ধ ছাপিতে হইবে। সময় অধিক নাই। অথচ এরূপ লেখাও সহজ নহে। কারণ যদিও সুবিনয় বাবু সাত আট বৎসর জীবন বাবুর সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার জীবনের ঘটনাদি সম্বন্ধে তিনি প্রায় কিছুই জানেন না। জীবন বাবু লোকটি অল্পভাষী ছিলেন এবং তাঁহার আত্মাভিমান মোটেই ছিল না। এরূপ লোকের জীবনের ইতিহাস সুবিনয় বাবু কিরূপে জানিবেন? জীবন বাবু 'আর্য্য-প্রতিভা' আফিসে আসিয়াছেন, প্রবন্ধ দিয়া গিয়াছেন, প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন, সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন, সম্পাদকের অনুরোধমত কোনও বিশেষ বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও ত আত্মপরিচয় দেন নাই! অথচ যদি 'আর্য্যপ্রতিভা'য় তাঁহার বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে লেখা না হয় এবং অন্ত কোনও মাসিক পত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা বড় ভাল দেখায় না।

সম্পাদক মহাশয় অকূল পাথারে পড়িলেন। কার্য্যাধ্যক্ষ মণিমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের কোনও উপায়ই দেখিতে পাইলেন না।" সচরাচর জীবন বাবুই এইরূপ জীবনবৃত্তান্ত লিখিতেন, এবং সেই প্রবন্ধগুলি পাঠকসমাজে আদৃত হইত। এক্ষণে জীবন বাবুর বিষয় কাহাকে দিয়া লেখাইবেন?

তিনি স্বয়ং প্রবন্ধের সূচনাটি লিখিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাহা তাঁহার মনোমত হইল না। কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ছিন্নপত্রের ঝুড়িতে রাখিয়া তিনি সেদিন সকাল সকাল বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

২

ইহার পর তিন চারি দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। জীবন বাবুর মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধটি সম্পাদক মহাশয় এখনও ধরিতে পারেন নাই, যদিও গত কয়েক দিবসই তিনি ঐ বিষয় লইয়াই চিন্তা করিতেছেন।

সেদিন আফিসঘরে বসিয়া সুবিনয় বাবু যেরূপেই হউক একটা প্রবন্ধ লিখিবেন স্থির করিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছেন, এমন সময় সেই ঘরে একটি ভদ্রলোক ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সুবিনয় বাবু তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "কোত্থেকে এলেন ম'শায়? যা' ভাবিয়ে তুলেছিলেন আমাকে!"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ভাবিয়ে তুলিয়েছিলুম? সে কি রকম?"

"আর মশায়, সে দিন যামিনীবাবু এসে বল্লেন, আশু তাঁকে চিঠি লিখেছে আপনি মারা গিয়েছেন। আমি ত মহাসঙ্কটে পড়েছিলুম।"

জীবন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যামিনীবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর একটু ভুল হয়েছিল। আশু লিখেছিল আমি সারা গিয়েছি, তিনি পড়েছিলেন মারা গিয়েছি। তা যাই হোক, আপনার আর সঙ্কটটা কি? বাঙ্গালা দেশে মাসিকপত্রেরও অভাব নেই, লেখকেরও অভাব নেই। বরঞ্চ আমাদের মত প্রবন্ধ লেখক দুই একটার পরিবর্ত্তে, আর্টমূলক ঔপন্যাসিক দুই একটা সংগ্রহ করলে আপনার কাগজটার শ্রীবৃদ্ধি হয়। আজকালকার কলেজের ছাত্রেরা শুন্‌ছি এই রকম সব উপন্যাসের মক্স করছে।"

"না, সত্যি বল্‌ছি জীবন বাবু, আপনি আমাকে যথার্থই মহাসঙ্কটে ফেলেছিলেন। আমাদের কাগজে আপনিই কত লোকের জীবনের আলোচনা করেছেন, অথচ আপনার একটা জীবনবৃত্তান্তের জন্য কোনও উপকরণই আমাদের দিয়ে যান নি।"

জীবনবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শুনেছি বিলাতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত অনেক সাময়িক পত্রের আফিসে মজুদ থাকে, তাঁদের মৃত্যুসংবাদ পাবামাত্র সেই সকল কাগজে সেটা ছাপা হয়। তা আমারও একটা না হয় আপনার আফিসে রাখবেন, মৃত্যুসংবাদ পেলেই ছেপে দেবেন।"

সুবিনয় বাবু বলিলেন, "ভগবান করুন আপনি দীর্ঘজীবী হয়ে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করুন। কিন্তু এ ক'দিন আমাকে এমন ভাবিয়ে তুলেছিলেন যে, আমার মনে হয় আপনার একটি জীবনচরিত আমার নিকট থাকাই উচিত।"

জীবনবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে দিন কাগজে দেখলাম, আমেরিকার এক বৃদ্ধ দম্পতী জীবিত-বস্থাতেই তাঁদের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করে' আত্মীয় বন্ধুগণকে ভোজ দিয়েছেন। মুসলমান বাদশাহেরা জীবিতাবস্থাতেই তাঁহাদের সমাধিসৌধ নির্ম্মিত করিয়ে রাখতেন। তা বেশ, আমি ছুটীতে পুরী যাচ্ছি। সেখানে কায কর্ম্ম নেই, বসে বসে ভাল করে' নিজের মৃত্যুবিষয়ক একটা প্রবন্ধ নিজেই লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর জীবন বাবু বিদায় লইলেন।

৩

আরও কয়েকদিবস অতীত হইয়া গিয়াছে। বাটী হইতে জরুরী টেলিগ্রাম আসায় সুবিনয় বাবু কার্য্যাধ্যক্ষকে মাসিকপত্র প্রকাশসম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। কার্য্যাধ্যক্ষ মণিমোহন বাবু সম্পাদকীয় আরাম কেদারায় উপবিষ্ট হইয়া, পদোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত ছাপাখানার লোকদিগকে উপদেশ

দিতেছেন, বা তাগিদ করিতেছেন। এমন সময় অন্যান্য পত্রাদির সহিত পুরী হইতে সম্পাদকের নামে একখানি চিঠি এবং একখানি পাণ্ডুলিপির প্যাকেট আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্পাদকের উপদেশমত পত্রখানি মণিমোহন বাবু তৎক্ষণাৎ সম্পাদক মহাশয়ের দেশের ঠিকানায় রিডাইরেক্ট করিয়া দিলেন এবং পাণ্ডুলিপির প্যাকেটটি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যামিনী বাবু যেদিন জীবন বাবুর মৃত্যুসংবাদ দিয়া যান, সেই দিন সম্পাদক মহাশয় জীবন বাবুর জীবন সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার জন্য কিরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা মণিমোহন বাবু জানিতেন। জীবন বাবু যখন আসিয়াছিলেন তখন মণিবাবু আফিসে উপস্থিত ছিলেন না। জীবন বাবুর মৃত্যুবিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধটি যে 'আর্য্য প্রতিভা"য় ছাপা হইবেই তাহাতে মণিমোহন বাবুর সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাণ্ডুলিপির উপর জরুরি লিখিয়া ছাপাখানায় পাঠাইয়া দিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জীবন বাবুর একটি প্রবন্ধের সহিত তাঁহার একটি প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই হাফটোন ব্লকটিও অনেক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলেন। মণিমোহন বাবু রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া প্রবন্ধটি মুদ্রিত করাইয়া দপ্তরীর বাড়ী কাগজ পাঠাইয়া দিলেন।

৪

পুরীতে সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গলায় একটী পুরুষ ও একটী রমণী, বাটীর সংবাদের জন্য ডাক হরকরার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যথাসময়ে হরকরা আসিয়া পুরুষটীর হস্তে কয়েকখানি পত্র, মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র দিয়া গেল।

পুরুষটী মাসিকপত্রের মোড়ক খুলিয়া 'হো হো হো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। রমণী ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গো, ও রকম করছ কেন?"

পুরুষটী আমাদের জীবন বাবু, রমণী তাঁহার স্ত্রী—সরলা। জীবন বাবু যখন কৃত্রিম ক্রন্দনের সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওগো, কি হবে গো, আমার স্ত্রী যে বিধবা হল গো—"

"তুমি কি পাগল হয়েছ না কি?" বলিয়া সরলা তাঁহার হস্ত হইতে মাসিকপত্রটি কাড়িয়া লইলেন। যে পাতা খোলা ছিল, তাহাতে মোটা ব্ল্যাক বর্ডার দেওয়া, প্রবন্ধের শিরোভাগে লিখা ছিল "পরলোকগত জীবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

দেখিয়া সরলাও হাসিলেন। কারণ, তাঁহার স্বামীকে সম্পাদকের অনুরোধে কয়দিন হইল তিনি এই প্রবন্ধটি লিখিতে দেখিয়াছিলেন।

জীবন বাবু তখন কৃত্রিম শোকের সুরে বলিলেন, "ওগো, আমি মরে গেলুম, তুমি কোন্ প্রাণে হাস্‌ছ গো?"

সরলা বলিলেন, "ছাপাখানার ভূতেদের সঙ্গে অনবরত কাজ করলে সে আর মানুষ থাকে না, ভূতই হয় বটে। দেখ, তোমার ছবিটাও কালির পোঁচড়া দিয়ে কি রকম ভূতের মত করে দিয়েছে।"

জীবন বাবু তখন অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি খুলিয়া পড়িতে বসিলেন। আর্য্যপ্রতিভার অনুসরণে সকল কাগজেই তাঁহার মৃত্যুসংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনেকেই মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি দিয়াছে; দুই একটা কাগজের সম্পাদক এই উপলক্ষে তাঁহার রচনাপদ্ধতি 'সেকেলে' এবং তাঁহাকে সতীত্ববায়ুগ্রস্ত, মনস্তত্ত্বে আনাড়ী ইত্যাদি বলিয়া কটাক্ষপাত করিতেও ছাড়ে নাই। এই সকল মন্তব্য জীবন বাবু যখন উপভোগ করিতেছিলেন, তখন সরলা নিজ নামাঙ্কিত একখানি লেফাফা খুলিয়া একটি দীর্ঘ পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া সজল নয়নে তাহা স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন।

সে পত্রখানি পাইয়া জীবন বাবুর নয়নদ্বয় আর্দ্র হইল। সে পত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত। বহুদিন হইতে কোন বিষয় লইয়া তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ফলে দুই ভ্রাতা পৃথগন্ন হন। তাহার পর

সময়ের সহিত উভয় পরিবারের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছিল। জ্যেষ্ঠতাতের দুর্ব্যবহার পিতার অকাল মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া, জীবন বাবু কখনও ধনী জ্যেষ্ঠতাতের সাহায্য ভিক্ষা বা স্নেহ প্রার্থনা করেন নাই। তিনি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিপত্নীক শ্যামসুন্দরের একমাত্র অকৃতদার পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর, তাঁহার মনের যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, জীবন বাবু সে সংবাদ জানিতেন না। মৃত্যুর এই অলীক সংবাদ সত্য মনে করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি শ্যামসুন্দরের রুদ্ধ স্নেহ কিরূপে সকল সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, এই পত্রে জীবন বাবু তাহার পরিচয় পাইলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তাঁহার অতুল সম্পত্তি সরলা ও তাহার পুত্রদিগকে দান করিয়া, কাশীতে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইবার সঙ্কল্প সেই পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

পরদিন জীবন বাবু সুবিনয় বাবুর একখানি পত্র পাইলেন। সেই পত্রে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে ভুলক্রমে তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধটি 'আর্য্য প্রতিভা'য় প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া সুবিনয় বাবু অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

৫

কয়েক দিবস পরে জীবন বাবু সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। বহুদিন পরে দৈব ঘটনাক্রমে হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইলে লোকে যেরূপ আনন্দ অনুভব করে, শ্যামসুন্দর বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই আনন্দ অনুভব করিলেন।

একদিন জীবন বাবু মহাসমারোহে তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুগণকে ভোজ দিলেন। কোনও বন্ধু, কি উপলক্ষে খাওয়ান হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর, আত্মার সদ্গতির জন্য নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করিতেছেন, সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির জলপান। সেই ভোজে প্রায় সকলেই উপস্থিত হইলেন, কিন্তু বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও কেহ মণিমোহন বাবুকে তথায় লইয়া যাইতে পারিল না। তাঁহার ভুলের জন্যই জীবন বাবু প্রকৃত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন একথা বলা সত্ত্বেও, তিনি লজ্জায় বহুদিন জীবন বাবুর সম্মুখীন হন নাই।

শ্রীবিভাবতী ঘোষ।

শেষ পরী

(ফরাসী হইতে)

১

আমি ১৬ বৎসর পার হইয়াছি—যখন তাহাকে প্রথম দেখিলাম। আমার মনে পড়ে, বৈশাখের কোন সুন্দর সায়াহ্নে এই সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। আমি নগর হইতে একা বাহির হইয়া লক্ষ্যহীন হইয়া, স্বপ্নদর্শীর মত মাঠ ময়দান দিয়া চলিতে লাগিলাম—কেন চলিতেছি তাহা জানি না। কিছুকাল এইভাবে ছিলাম। বিজনতা আমার ভাল লাগিত।

আমি দেখিলাম, কনক-রঞ্জিত নীল সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্য ডুবিয়া গেল. উপকূল হইতে নামিয়া ছায়াগুলা সমতল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িল, নীল আকাশে তারাগুলা একে একে ফুটিয়া উঠিল। সরোবরের ধারে

ভেকেরা ডাকিতে লাগিল; মাঝে মাঝে নাইটিঙ্গেলের গীতি-লহরী উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। মৃদু মন্দ অনিল হিল্লোলে তরুপল্লব শিহরিয়া উঠিল, তৃণপুঞ্জ নুইয়া যাইতে লাগিল। চন্দ্রমা দিগন্তে সমুদিত—শুভ্র ও দীপ্তিমান,—জলদ-পর্য্যঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; চন্দ্রের রজত কিরণ বিভাবরীর স্কন্ধে ঝড়িয়া পড়িতেছে। কবোষ্ণ বায়ু প্রাণ উন্মাদক সুগন্ধে ভরা; কুসুমিত ঝোপঝাড়ের মধ্য হইতে নীড়শায়ী পক্ষীদিগের আদর-ভরা মৃদু কাকলী শোনা যাইতেছে।

এই সব মধুর শব্দ, মধুর গন্ধ উপভোগের জন্ম প্রাণের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম কতকগুলি তরুণী হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সহরে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহারা বসন্তের গান, প্রেমের গান সমস্বরে গাহিতেছে। সুপ্ত মাঠ ময়দানের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহাদের তরুণ কণ্ঠস্বর যেন দূরস্থ জল প্রপাতের শব্দের মত অনুরণিত হইতেছিল। আমি ঝোপ্‌ঝাড়ের পিছনে লুকাইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। যে-সব শুভ্র ছায়া রাত্রিতে লঘু নৃত্যের জন্ম সরোবরের চারিদিকে একত্র সমবেত হয়, এবং ঊষার প্রথম আলোকের উন্মেষেই তিরোহিত হয়, উহারা দেখিতে কতকটা সেই রকম। তারার আলোকে, আমি উহাদের শ্যামবর্ণ অথবা গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাদের পরিচ্ছদের খস্‌-খস শব্দ শুনিতে পাইলাম। যাত্রা-পথে তাহারা তাহাদের গাত্রনিঃসৃত যে এক অপূর্ব্ব সুরভিশ্বাস রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা আমি দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিলাম। সায়াহ্নের সেই সৌরভ-ভরা প্রাণ-উন্মাদক অনিল-উচ্ছ্বাস অপেক্ষাও এই সৌরভের আঘ্রাণে আরও যেন প্রমত্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

উহারা যখন অন্তর্হিত হইল, তখন কি একটা অননুভূতপূর্ব্ব ব্যাকুলতা আসিয়া আমার চিত্তকে অধিকার করিল; ময়দানের কিনারায় একটা ঢিবি ছিল, সেই ঢিবির উপর আমি বসিয়া পড়িলাম—আমার সম্মুখে বিস্তীর্ণ ময়দান যেন হরিৎপুঞ্জের সমুদ্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দুই হাত দিয়া কপাল ঢাকিয়া, আমার ভিতরে যে কম্পন হইতেছিল, তাহার শব্দ শুনিতে-শুনিতে, তাহার কি-অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে, একটা গভীর স্বপ্ন-কল্পনার মধ্যে নিমজ্জিত হইলাম।

যাহা অনুভব করিলাম, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। একটা দারুণ বেদনায় হৃৎপিণ্ডটা যেন ফাটিয়া যাইবে এইরূপ মনে হইল। হৃদয়ে যেন একটা উৎস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে যেন বাহির হইবার একটা পথ খুঁজিতেছে; যেন একটা বন্দী তরঙ্গ কারা ভাঙ্গিয়া বাহিরে প্রসারিত হইতে চাহিতেছে। আমি কাঁদিতে লাগিলাম—অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলাম। এই অশ্রুর মধ্যেও কি যেন একটা বিলাসিতা প্রচ্ছন্ন ছিল।

কিছুকাল এই ভাবেই ছিলাম। তার পর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দেখিলাম, কয়েক-পা দূরে আমার সম্মুখে এক স্বর্গের দেবতা আবির্ভূত হইয়া আমাকে দেখিতেছেন, আর, মৃদু-মৃদু হাসিতেছেন। পদ্ম অপেক্ষাও শুভ্র একটা লম্বা জামা, ভাঁজে ভাঁজে সুন্দরভাবে তাঁহার দেহ হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং মার্ব্বেল পাথরের মত সাদা পা-দুখানি "ছোঁয় কি না ছোঁয় মাটি" ভাবে ঘাসের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তাঁহার সোনালী কেশগুচ্ছ যথেচ্ছভাবে তাঁহার কাঁধের চারিদিকে উড়িতেছে। যে কুসুম-কিরীটে তাঁহার মস্তক বিভূষিত ছিল, সেই কুসুমেরই মত তাঁহার গাল দুটি বেশ টাট্‌কা তাজা ও উজ্জ্বল। তাঁহার "দুধে আল্‌তা" মুখমণ্ডলে, বৈশাখের প্রথম চুম্বনে বরফের উপর বিকসিত পেরিউইঙ্কল পুষ্পের মত তাঁর চোখদুটি জ্বলিতেছে। তাঁহার বাহুদ্বয় নগ্ন; একটি হাত তাঁহার বক্ষের উপর ন্যস্ত এবং আর একটি হাত দিয়া যেন আমাকে আহ্বান করিতেছেন।

আমি কিয়ৎকালের জন্ম, মূক, হইয়া, নিশ্চল

হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। নিশ্চয়ই উনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। কেননা তাঁহার সৌন্দর্য্যের ভিতর, পার্থিব ললনা-সুলভ কোনও সৌন্দর্য্যই ছিল না; ভাস্বর বস্ত্রের মত, তাঁহার চারিদিকে একটা বায়ুমণ্ডল যেন কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল। অবশেষে ব্যাকুলভাবে হস্তপ্রসারণ করিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম—"কে গো তুমি?"

নৈশ বায়ু অপেক্ষাও মৃদুমধুর স্বরে তিনি উত্তর করিলেন:—"বন্ধু! আমি পরী,—আমাদের রাজা তোমার জন্মকালে, তোমার বুকের ভিতর আমায় নিদ্রা যেতে আদেশ করেছিলেন; তোমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে যে একটা আকুলতা এসেছিল, সেই আকুলতার বেগে আমি জেগে পড়লাম। আমার জীবন তোমার জীবনের দ্বারাই গঠিত। আমি তোমার ভগিনী; আমি তোমার সঙ্গিনী; জীবনের অর্দ্ধপথ আমরা এক সঙ্গেই চলব। তার পর শুক্‌নো ফল যেরূপ বৃন্ত হতে বিচ্ছিন্ন হয়, আমিও একদিন সেইরূপ মধ্য পথে তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হব। দেখ ভাই, সেই দিন আর বেশী দূরে নাই। যে গোলাপের আয়ুকাল একটা প্রভাত মাত্র, তারই প্রতিরূপ আমার নিয়তি। আমাকে ভালবাসবার সময় এ কথাও মনে রেখো আমাকে একসময় হারাতে হবে; আমার যখন প্রাণবিয়োগ হবে, তখন হাজার কাঁদো হাজার দুঃখ কর, আমাকে বাঁচাতে পারবে না। সত্বর প্রস্তুত হও। আমার হাতে মায়া-দণ্ডও নাই, সম্মোহন দণ্ডও নাই। আমার চুলের এই পুষ্প-ভূষণই আমার সমস্ত সাজসজ্জা। কিন্তু আমি তোমাকে এত ধন ঐশ্বর্য্য দান করব, যা' কোন রাজপুত্রের জন্মকালে, রাজপুত্রকে কোন বদান্য পরী দান করে নি। তোমার মাথায় এমন একটা মুকুট পরিয়ে দেব যে, অনেক রাজাই তাদের মুকুটের মূল্যে, তোমার ঐ মুকুট কিন্‌তে পারলে আপনাদের ভাগ্যবান মনে করবে। তোমার জন্য এরূপ অনুচরবর্গ নিযুক্ত করব, যা রাজপ্রাসাদে ও রাজ-দরবারে দেখা যায় না। আমি অদৃশ্য হয়ে বরাবর তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব। সর্ব্বত্রই তুমি আমার ফলপ্রসূ প্রভাব অনুভব করবে। যে সব জায়গা দিয়ে তুমি চল্‌বে, সেই সব জায়গা আমি বিভূষিত করব। রাত্রে তোমার শয্যা আমি সুরভিত করব। তুমি জেগে উঠলে প্রত্যেক প্রভাত তোমার নিকট যাতে হাস্যময় হয় এই উদ্দেশে সমস্ত প্রকৃতিকে আমার অন্তরাত্মা দান করব। আ! আমরা কত সুন্দর সুন্দর উৎসব উপভোগ করব! কেবল, যে সব ধনসম্পদ তোমার কাছে আমি আন্‌ব, বন্ধু, সেগুলিকে চিন্‌তে শেখা চাই। তোমার হাত থেকে পালাবার আগেই দৃঢ়মুষ্টিতে এদের ধরে ফেল্‌তে হবে। পরিম্লান না করে' কোন জিনিস কিরূপে স্পর্শ করতে হয়, নিঃশেষ না করে' কিরূপে উপভোগ করতে হয়—তা জানা চাই। আমাকে ছেড়ে যে অর্দ্ধাবশিষ্ট পথ তোমায় একা চলতে হবে—পূর্ব্ব হতেই তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দেখ বন্ধু, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, আমি খুব অল্প দিনই বাঁচিব, কিন্তু আমার এই ক্ষণভঙ্গুর মূল্যবান জীবনকে আরও একটু দীর্ঘ করা না করা তোমার উপর নির্ভর করছে। আমি সেই সব দুর্লভ চারা গাছের মত, যাদের যথাপরিমাণে সূর্য্যের আলো ও বৃষ্টি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আমার পদদ্বয় বড় সুকুমার, তোমার অনুসরণে তাদের ক্লান্ত করে' ফেলো না। আমার কপোলের লাবণ্য-প্রভা পদ্মের চেয়েও কোমল, যদি তাকে শুকিয়ে ফেল্‌তে না চাও, তা হলে অনন্ত বাসনা অনলের মধ্যে আমাকে নিয়ে যেও না—নিবিড় ছায়ার মধ্যে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি চলে গেলে তুমি যে দারুণ কষ্ট অনুভব করবে, দেখো যেন তা বিষাক্ত না হয়ে ওঠে। আমার স্মৃতিটা তোমার যেন সুখের স্মৃতি হয়; তোমার জীবনকে আমি আর কিরণধারায় সমুজ্জল ও প্রদীপ্ত করতে পারব না সত্য, কিন্তু আমি চলে' গেলে তার পরেও, অনেক দিন পর্য্যন্ত যেন তোমার হৃদয়ে তার একটি মধুর প্রতিবিম্বচ্ছটা রেখে যেতে পারি।"

এই কথা বলিয়া, শিশুর রক্ষা-দেবতা যেরূপ শিশুর শয্যা দোলার উপরে ঝুঁকিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার দিকে তিনি তাঁর শুভ্র মুখটি নোয়াইলেন; এবং আমার ললাটদেশে তাঁর ওষ্ঠযুগলের সস্নেহ স্পর্শ অনুভব করিলাম—সেই ওষ্ঠযুগল, উৎস-প্রান্তস্থ তাজা পুদিনার গন্ধে যেন সুরভিত। তাঁকে ধরিবার জন্য আমি হাত বাড়াইলাম কিন্তু তখন সেই শুভ্র ছায়ামূর্ত্তি স্বপ্নের মত অন্তর্ধান করিয়াছে।

বস্তুত এটা কি স্বপ্ন নয়? আমি মাঠ ময়দানের উপর দিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম; কখন বা উন্মাদের ন্যায় ছুটিতেছি; কখনও বা ঘাসের উপর শুইয়া পড়িয়া ঘাসকে অশ্রুজলে সিক্ত করিতেছি। কখনও বা ভূর্জ্জ-বৃক্ষের গাত্র-নিঃসৃত সরু বৃন্তটিকে আমার বুকে চাপিয়া ধরিতেছি; এবং মনে করিতেছি, আমার উন্মাদের লক্ষণ দেখিয়া সেও শিহরিয়া উঠিতেছে, কম্পিত হইতেছে; কখনও বা তারকাগণের দিকে হাত বাড়াইয়া প্রেমমুগ্ধ হৃদয়ে তাহাদের সহিত কথা কহিতেছি; কখনও বা পুষ্পগণের সহিত, কখনও বা তরুগণের সহিত, কখনও বা তৃণগুল্মের সহিত কথা কহিতেছি। আমি অনুভব করিতেছি যেন আমার ভিতরে একটা রসের প্রবাহ ছুটিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গকে রসে প্লাবিত করিয়াছে এবং উহা আমার অন্তর ছাপাইয়া উঠিয়া প্রকৃতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে. বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, উৎসটি শৈলগাত্রকে বিদ্ধ করিয়াছে। আমি হাসিতে লাগিলাম, কাঁদিতে লাগিলাম; একপ্রকার অনির্ব্বাচ্য সুখ ও নামহীন আনন্দের অসীম সাগরে যেন ভাসিতে লাগিলাম।

যখন প্রাচী একটু শুভ্র হইয়া উঠিল. আমার মনে হইল যেন সৃষ্টির জাগরণ এই সর্ব্বপ্রথম আমি দেখিতেছি। আমার বুক ভরিয়া উঠিল; আমি গর্ব্বভরে নিঃশ্বাস লইতে লাগিলাম; ক্ষণেকের জন্য আমার মনে হইল যেন আমার আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া, মুক্তভাবে, লঘুভাবে আকাশের ভিতর দিয়া উড়িয়া যাইবে; এবং উদীয়মান সূর্য্য যে-সব ক্ষীণ বাষ্পরাশিকে উপকূল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, সেই বাষ্পরাশির সহিত একেবারে মিশিয়া যাইবে। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া, সেই উর্দ্ধদেশ হইতে বিজয়ীর দৃষ্টিতে সমস্ত দিগন্তদেশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; আমার মনে হইল যে পৃথিবী এই সবেমাত্র আমার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং আমিই পৃথিবীর প্রভু।

২

আর একবার তিনি আমার নিকট আবির্ভূত হইলেন—তখনও আমার ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। আমার মনে পড়ে, আশ্বিনের এক সায়াহ্নে এই ঘটনাটা হইয়াছিল। আমি নগর হইতে একাকী বাহির হইয়াছিলাম। লক্ষ্যহীন, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইয়া মাঠ দিয়া চলিতেছিলাম—যদিও স্বভাবতঃ আমি বিজন স্থানের অনুরাগী নই।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; একটা কনকনে বাতাস, গাছগুলার শেষ ডালপালার উপর ঝাপট মারিতেছে। গুল্মের বেড়াগুলা কতকগুলা ছোট ছোট বীজাকার ফলে বিভূষিত মাত্র। দূরস্থ ক্ষেতবাড়ী-নিঃসৃত কুকুরের ঘোর বিষাদময় ঘেউ-ঘেউ রব, ডালপালার মধ্য দিয়া সমুত্থিত সূক্ষ্ম পরিমাণ একটু নীল ধোঁয়া—ইহাই এই উজাড় পল্লী-প্রদেশের জীবনের একমাত্র নিদর্শন। তথাপি, কতকগুলা পাখী ভীতি-বিহ্বল হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া বসিতেছে; কালো-কালো দাঁড়কাকের অধিষ্ঠানে মাটির উপর যেন কতকগুলা কালো দাগ পড়িয়াছে। সায়াহ্নের ধূসর আকাশে সারস-বৃন্দ দলে দলে সারিবন্দি হইয়া ধীর-গতিতে উড়িয়া চলিয়াছে।

এই শোকাচ্ছন্ন প্রকৃতির সহিত আমার অন্তরাত্মাকে মিশাইয়া আমি চলিতে লাগিলাম। সুন্দর দিনের অবসানে মনের উপর যে একটা ঠাণ্ডা বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসে, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইরূপ বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি যে পত্রহীন ঝোপ ঝাড়ের তলায় বসিয়াছিলাম, সেইখানে দেখিলাম, আমার পাশ দিয়া দুইজন রমণী ধীরপদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে—প্রত্যেকেই কাঁটা গাছের বোঝা মাথায় করিয়া একটু নুইয়া

পড়িয়াছে। এই শীত কালের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশে কুটীরে লইয়া যাইতেছে।

অদ্ভুত স্মৃতি! অদ্ভুত সান্নিধ্য! বহু পূর্ব্বে ঠিক এই সময়ে কোন এক বৈশাখ-সায়াহ্নে, ঠিক এই জায়গা দিয়া একদল তরুণী হাত ধরাধরি করিয়া গান গাইতে গাইতে যাইতেছে দেখিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর, আর তখন এই ঝোপঝাড় পুষ্পভূষিত ছিল।

তখন আমি হাত দিয়া মুখ ঢাকিলাম এবং সেই বৈশাখ-সায়াহ্ন হইতে এই কার্ত্তিক সায়াহ্ন পর্য্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা লইয়া মনে মনে ক্রমাগত আন্দোলন করিতে লাগিলাম। তাহার পরেই একটা বিষাদময় গভীর অবসাদে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলাম।

তাহার পর উঠিয়া দেখিলাম,—কয়েক-পা দূরে, আমার সম্মুখে একটি পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি—বিষাদ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। রমণী এতটা বদলিয়া গিয়াছে যে অতিকষ্টে চিনিতে পারিলাম। তাহার প্রথম আবির্ভাবে, যে জ্যোতির্ম্ময় বায়ুমণ্ডল তাহার চারিদিক ঘিরিয়া ছিল, তাহা আর দেখিতে পাইলাম না। তাহার ছিন্ন জামার ভিতর হইতে তাহার পেঁতলানো সুন্দর স্তনযুগল দেখা যাইতেছে, তাহার পদদ্বয় রক্তাপ্লুত, তাহার নির্জীব বাহুদ্বয় তাহার শীর্ণ পঞ্জর-পার্শ্বে শিথিলভাবে পড়িয়া আছে। তাহার চোখের নীলিমা অস্তমিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে; অশ্রুধারা তাহার সীসা-নীল গালে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়াছে। হতভাগিনী অতি কষ্টে দেহ-ভার বহন করিতেছে; ভগ্নবৃন্ত শুষ্ক পদ্মের মত মাটির দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি চাও?"

"বন্ধু! আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবার সময় এসেছে। আর ত দেখা হবে না, এই শেষ-বিদায় নেবার জন্য আমি এসেছি।" এই কথা বৃদ্ধা শোক-সন্তপ্তকণ্ঠে, শীত-বায়ু অপেক্ষাও বিষাদময় স্বরে—মৃদু গুঞ্জনে বলিল। আমি বলিয়া উঠিলাম—"দূর হ! দূর-হ এখান থেকে! মিথ্যাবাদিনী, তুই আমার জন্য কি করেছিস? যে ঐশ্বর্য্য আমাকে দিবি বলেছিলি—সে সব ঐশ্বর্য্য কোথায়? আমার যাত্রাপথে অনেক খুঁজছি, কিছুই পাই নি। যে রত্ন-ভাণ্ডার আমার পায়ে সমর্পণ করবি বলেছিলি সে রত্নভাণ্ডার কোথায়? দৈন্য ছাড়া আমি ত আর কিছুই পাইনি। আমার ললাটে যে মুকুট পরিয়ে দিবি বলেছিলি তার কি হ'ল?—আমার মাথায় এখন কাঁটার মুকুট ছাড়া ত আর কিছুই নাই। যে জমকালো অনুচরবর্গ আমাকে দিবি বলে অঙ্গীকার করেছিলি, সে অনুচরবর্গ কোথায়? অনুচরের মধ্যে নৈরাশ্য ও বিজনতাই ত আমার একমাত্র অনুচর। তুই বলছিস আমাদের মধ্যে এখন বিচ্ছেদ ঘটবে—তুই যদি দুঃখের অপদেবতা হোস্,—তা হলে বিচ্ছেদ হলেই বা কি? যদি আমার সমস্ত জীবন তোরই প্রভাবের বশবর্ত্তী হয়ে থাকে, তা হলে দূর হ তুই, জাহান্নামে যা তুই—কারণ তুই অমঙ্গলের অপদেবতা!"

বৃদ্ধা বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল:—

"আমি অমঙ্গলেরও অপদেবতা নই, দুঃখেরও অপদেবতা নই; আমাকে হারাবার পর মানুষ আমাকে আর চিন্‌তে পারে না—আমি যে সব সুখে তাকে সুখী করেছিলুম, তার মূল্য এখন সে আর বুঝ্‌তে পারে না—কেন না, এখন সে সব সুখ আর উপভোগ করচে না;—মানুষের নিয়তিই এই। তোমার ভাইদের মত, বন্ধু, তুমিও অকৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে অপরাধী করচ—আমি তোমাকে অনুকম্পা করচি। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তুমি আমাকে চিন্‌তে পারবে; তখন প্রথম বারে আমাকে যে রকম দেখেছিলে, একদিনের জন্য আমাকে আবার একবার দেখ্‌বার জন্য তুমি ইচ্ছুক হবে—এমন কি তোমার সমস্ত অবশিষ্ট পরমায়ুর মূল্যেও এই অভিলাষ পূর্ণ করতে চাইবে। তুমি কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করছ,—কোথায় সে সব সুখ-সম্পদ যা আমি অঙ্গীকার করেছিলুম? কিন্তু যে সব সুখসম্পদ তোমাকে আমি মুক্তহস্তে দান করেছিলুম, তুমিই ত সে সব অবজ্ঞা

করলে? মুকুটের কথা বলছ?—আমি ত তোমার ললাটে বসন্ত-প্রভাতের নবীনতা উজ্জ্বলতা ও প্রশান্তির মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলাম। অনুচরবর্গের কথা বলছ?—আমি প্রেম, বিশ্বাস আশা ও মোহনতা—এই সব অনুচর তোমাকে দিয়েছিলাম। তোমার দৈন্যদশাকে এমন হাস্যময়ী ও সুন্দর করে তুলেছিলাম যে, অনেক প্রতাপান্বিত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি তার প্রাসাদ, ধন ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে সেই দারিদ্র্যকে লাভ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হতে পারত। তোমার বিজনতাকে ত আমি মোহনস্বপ্নে পূর্ণ করেছিলাম। তোমাকে দিয়ে তোমার নৈরাশ্যকেও ভাল বাসিয়েছিলাম; তোমার অশ্রু দিয়ে তোমাকে এতটা মাতিয়ে তুলেছিলাম যে, এখন থেকে তোমার হাজার বিপদ হলেও তুমি আর অশ্রুপাত করবে না। তুমি যখন পথ দিয়ে চলতে, তখন তোমার রক্ষণের জন্য মমতা ও দয়াকে আমি জাগিয়ে রাখতাম। তুমি তখন সুহৃদের দৃষ্টি ও ভ্রাতৃ হস্ত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতে না আকাশ হাসিমুখে তোমার পানে চেয়ে থাকত পৃথিবীও তোমার পদতলে পুষ্পিত হয়ে উঠত। এখন বল দিকি, আমি মুক্তহস্তে এত যে তোমাকে দান করলাম, তুমি সেই দানের জিনিসগুলো নিয়ে কি করলে?—সেই সব ধনসম্পদের মধ্যে কিছুই কি রক্ষা করতে পেরেছ? তোমার যাত্রাপথের দুইধারে এত যে সুখের বীজ বপন করেছিলাম, এখন তার অবশিষ্ট কি-আছে? তুমি যদি কিছুই রক্ষা করে না থাক, তার জন্য কি আমি দায়ী?—তুমি যদি তা উপভোগ করতে না পেরে থাক, —সে দোষ কি আমার?"

এই কথাগুলির পর, একটা আলোকে আমার সমস্ত সত্তাটা আলোকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল যেন একটা আবরণ আমার চক্ষু হইতে সরিয়া গেল এবং আমার নিজের হৃদয়ের ভিতরটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া, ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িলাম আমি অনুচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলাম ওগো "তুমি দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—চলে যেও না। যে ধনসম্পদকে আমি অবজ্ঞা করেছিলাম, তা আমাকে ফিরিয়ে দাও; প্রকৃত আলোকে আমার চোখ খুলে যাক্। আমার প্রেমকে আমার মোহকে ফিরিয়ে দাও। আমার বিশ্বাসকে আমার আশ্বাসকে ফিরিয়ে দাও। যেন শুধু একটি দিন ভালবাসতে পারি, শুধু একঘণ্টাকাল বিশ্বাস করতে পারি এইটি তুমি করে দেও—তাহলে তুমি যেই হও না কেন, আমি মরতে মরতেও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব।"

সে বলিল:—

—"হায়! আমারই যে মৃত্যু আসন্ন। তুমি কি দেখতে পারচ না? আমার দিকে চেয়ে দেখ; আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি; আমার আর কিছুই নেই, আমার ছায়ামাত্র অবশিষ্ট আছে। দেখ, অনেক দিন থেকে একটা অজ্ঞাত রোগ আমাকে দগ্ধ করছে; একটা সর্ব্বগ্রাসী শ্বাসবায়ু আমার অস্থিগুলাকে শুকিয়ে ফেলেছে; আমার বুকের জীবন-উৎসগুলিকে নিঃশেষ করে ফেলেছে। আমার হৃৎপিণ্ডে আর রক্ত এসে পৌঁছে না, আমার হাত ছুঁয়ে দেখ,—মৃত্যুর হিম ঠাণ্ডা অনুভব করবে। তথাপি, যদি তুমি ইচ্ছা করতে, আমি আরও অনেক বৎসর বাঁচতে পারতেম। নিষ্ঠুর! আমার অকাল-মৃত্যু তুমিই ঘটিয়েছ। তোমাকে অনুসরণ করতে আমার সমস্ত বল ক্ষয় করেছি আমার পা দুটাকে ক্ষতবিক্ষত করেছি। আমি তোমার কাছে কত ক্ষমা চাইলাম, কিন্তু সব ব্যর্থ হল; তুমি বলে' উঠলে—"চল! চল!"—আমি চলতে লাগলাম। শ্রান্ত অবসন্ন হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে রাস্তার কাঁটাগাছে আমার পরিচ্ছদ ছিঁড়ে গেল; মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উত্তাপে আমার কপাল পুড়ে যেতে লাগল। আমার কটিবন্ধটাতে গ্রন্থি দিয়ে যে আবার এঁটে পরব, আমার মুকুটের ম্লান ঝরা ফুলগুলি যে আবার তুলব—সে সময়টুকুও তুমি আমাকে দেওনি। কোন একটা কুসুম-শোভিত সুন্দর আশ্রম—কোন একটা রহস্যময় মরু কানন দেখতে পেয়ে তোমাকে যখন বলতাম:—বন্ধু, সুখ-

শান্তি ঐখানেই আছে.—ঐখানেই আমাদের তাঁবু গাড়তে হবে !—তুমি কিছুতেই থামতে না—গোঁ ধরে' বরাবর চলে যেতে এবং আমাকে নির্দ্দয়ভাবে মরুভূমির বালুরাশির মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে। কোনও অত্যাচার হতে আমাকে কি রেয়াৎ করেছ ? বড় উঠ্‌লে আমার মাথা কি কখনও বাঁচিয়েছ ? শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন ও হতাশ হয়ে কতবার তোমাকে ছেড়ে যাব বলে স্থির করেছিলাম, কিন্তু অকৃতজ্ঞ, আমি যে তোমাকে ভালবাসতাম। আমি তোমার কাছে আর নেই অনুভব করে যখন তুমি আশ্চর্য্য হতে, আর তার পর আমার কাছে ফিরে এসে ইসারা ইঙ্গিতে কিংবা করুণস্বরে আমাকে ডাকতে, তখন আর আমি থাক্‌তে পারতাম না, আমি উঠে তোমার কাছে আবার আস্‌তাম। কিন্তু আজ সব শেষ হয়ে গেছে বন্ধু, আর আমি পারি না ! আমার রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে আসছে; আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে, আমার পা টল্‌ছে। এসো, বাহু দিয়ে তোমার বুকে আমাকে একবার চেপে ধর; তোমার বুকের ভিতরেই আমি প্রাণলাভ করে'ছলাম, তোমার বুকের উপরেই আমি মর্‌তে চাই।

তাকে গ্রহণ করিবার জন্য আমার দুই হাত বাড়াই য়া বলিয়া উঠিলাম—"না, তুমি মর'বে না তোমাকে মর্‌তে দেব না; কিন্তু অজানা পথিক, আমাকে বল দিকি তুমি কে ?"

সে বলিল,—"আমি এখন আর নেই কিন্তু একসময় ছিলাম—তোমার যৌবন।"

যখন সে এই কথা বলিল, আমি তাহাকে ধরিতে ইচ্ছা করিলাম—কিন্তু তার আগেই সে অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল দেখিতে পাইলাম, তাহার জায়গায় তাহার কেশ-চ্যুত কতকগুলি ফুল পড়িয়া আছে; আমি সে সমস্ত তুলিয়া লইলাম, কিন্তু সেই ফুলে আর কোন সুগন্ধ নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভাবে

অভাবে হায় পড়বে যত
তত্তই তুমি যাবে নেমে,
হৃদয়ের সুর উচ্চ গ্রামে
বাজবে না আর—আসবে থেমে।
পিশাচ এসে নামিয়ে দেবে
তোমার প্রাণের ইষ্টদেবে —
থাকবে না আর উদার নীতি,
কিংবা প্রীতি বিশ্বপ্রেমে।

বারেক মাথা করলে নীচু
ক্রমেই তাহা পড়বে নুয়ে—
ওঠাতে আর পারবেনাক
শেষে এসে ঠেক্‌বে ভুঁয়ে।
মান অপমান থাকবে না বোধ
তুচ্ছ নিয়ে করবে বিরোধ
হায় রে, মনুষ্যত্ব তোমার
কোথায় উড়ে যাবে ফুঁয়ে !

তোমার প্রাণের পাপড়িগুলি
ফুটবে না আর সুবাতাসে-
হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলি
পুড়ে যাবে হা হুতাশে !
শুকিয়ে যাবে বক্ষখানি,
নির্ভয়ে না সর্‌বে বাণী,
দেখলে পরের রক্ত আঁখি
কুঁচে হয়ে কাঁপবে ত্রাসে।

বিবেক রবে মূকের মত
কইবে না সে কোন কথা—
গুমরে মরাই সার হবে তার
লয়ে অসীম ব্যাকুলতা।
মনটি তোমার একটু হয়ে
আসবে ক্রমে সয়ে সয়ে
হবে পাষাণ—থাকবে না তার
একটুখানি কোমলতা।

ভাববে তখন দানব দানার
রচনা এ বিশ্বভূমি—
—অধর্ম্মেরি জয়পতাকা
উড়চে কেবল আকাশ চুমি!
মনের আঁধার ঘনিয়ে এসে
দেবদ্বেষী করবে শেষে—
ইহকাল ত কেঁদেই গেল,
পরকালেও কাঁদবে তুমি।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কলঙ্কিনী

(গল্প)

পীতাম্বর চক্রবর্ত্তী যশপুরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন পল্লীগ্রামে সম্মান সর্ব্বত্র অর্থের অনুগামী। কিন্তু পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর সম্মান শুধু অর্থের উপর নির্ভর করিত না; তিনি বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের সমস্ত মামলা মোকদ্দমা সুচতুর পীতাম্বরের পরামর্শে চালিত; যে পক্ষ পীতাম্বরকে ধরিতে পারিত তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। তার উপর পীতাম্বরের তেজারতী কারবার ছিল। তেজারতী অর্থাৎ টাকা কর্জ্জ দিবার একটি সুবিধা এই যে, লোকে সুদের হার চড়া বলিয়া যতই ওজর আপত্তি করুক না, যতই সেজন্য লোকে মহাজনকে ঘৃণা করুক না, কেহই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। কারণ, কবে কাহাকে টাকার দায়ে পড়িতে হইবে, আর শেষে ঐ পীতাম্বর ঠাকুরের কাছেই হয়ত হাত যোড় করিতে হইবে; সেই জন্য গ্রামের সকলেই পীতাম্বরের বশ্যতা স্বীকার করিত। গ্রামে যে সব দলাদলি হইত, পীতাম্বর তাহার জনক ছিলেন, আবার যখন সে সকল মিটিয়া যাইত, তখন পীতাম্বরের দ্বারাই মিটিত। পীতাম্বর নিজে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইলেও তিনটি কন্যাকে কুলীনের হস্তে সম্প্রদান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণও এজন্য পীতাম্বরকে কতকটা মান্য না করিয়া পারিতেন না।

এইরূপে নানা প্রকারে প্রতিষ্ঠা ও মান অর্জ্জন করিয়া পীতাম্বর যশপুরের সামাজিক জীবন প্রবাহকে আপনার ইচ্ছামত পরিচালিত করিতেছিলেন, তারপর একদিন যখন তিনি শেষ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন তখন যে যশপুরের পল্লীজীবন ভগ্ন বাঁধ স্রোতস্বিনীর মত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আর বিচিত্র কি? যাঁহারা এতদিন পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর জন্য পসার করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অপূর্ব্ব সুযোগ পাইলেন। দলাদলিতে যাঁহারা এতদিন পীতাম্বরের জন্য খাটো হইয়া ছিলেন তাঁহারা শির উর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পীতাম্বরের শ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া তাহার শিশুপুত্রটিকে বিপন্ন করিবার পথ আবিষ্কার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।

এতদিন পীতাম্বর যাহাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করিয়াছেন, সৎ পরামর্শ দিয়াছেন তাহারা তাঁহারই খাতক দিগকে পরামর্শ দিল যে, "পীতাম্বরের পাওনা টাকা শোধ দিবার কিছু প্রয়োজন নাই, শিশুপুত্র বড় হইয়া যখন নালিশ করিবে তখন আমরা সকলে সাক্ষী দিব যে খত জাল; কিছু ভয় নাই, আপাততঃ কিছু বাজার খরচ ও গাছের আম কাঁঠাল আমাদিগকে দিলেই চলিবে।"

পীতাম্বরের পারিবারিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। পত্নী জগদম্বা সংসারের আবর্ত্তে পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। জমাজমি যাহা কিছু আছে, তাহা দেখিবার লোক নাই। তেজারতীর টাকা আদায় করিবার লোক নাই। গোমস্তা একজন আছে বটে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে হিসাব বুঝিয়া লইবার মত কেহই নাই। তিনটি কন্যা সৎপাত্রে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু শিশুপুত্রের অভিভাবক যে নাই। দুইটি কন্যা শ্যামা ও কামিনী শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছে; কনিষ্ঠা যামিনী বিবাহের সময় মাত্র শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, তার পরে সে মায়ের কাছেই রহিয়াছে। বেচারা যখন তাহার কল্পনার তুলিকায় স্নেহপ্রীতি করুণার রঙ ফলাইয়া শ্বশুরবাড়ীর সম্মোহন চিত্র আঁকিতে-ছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। কাযেই তাহার আশার গগনে চারিদিক হইতে মেঘ উঠিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে তাহার কপোল বহিয়া বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রু বহিত।

গ্রামের লোকের অত্যাচার, উপকৃতের অকৃতজ্ঞতা, কুটুম্বদিগের অতিমাত্র ঘনিষ্ঠতা জগদম্বাকে ভীত ত্রস্ত ও বিড়ম্বিত করিয়া তুলিল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার বড় জামাইকে সংবাদ দিলেন। শ্যামার স্বামী শিবশঙ্কর সপরিবারে যশপুরে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। নামে মাত্র শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করিয়া শিবশঙ্কর পীতাম্বরের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে মন নিবিষ্ট করিলেন। ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও যখন শ্যামা বা শিবশঙ্কর নিজ বাড়ীতে যাওয়ার নামও করিলেন না, তখন জগদম্বা একটু চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কুলীন জামাইকে কিছু ত বলা চলে না। শিবশঙ্কর কথায় কথায় শাশুড়ীকে শুনাইয়া দিতেন যে, কেবল তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি স্বীয় বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া যশপুরের মত কদর্য্য স্থানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। জগদম্বা মনে মনে খতাইয়া দেখিলেন যে মঙ্গল তাঁহার একার নহে। ছেলেটি পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়াছে গুরুমহাশয়ের বেতন শোধ হয় না। খতের টাকা আদায় হয়, তাঁহার হাতে পৌছে না। জমির ধানে বছর খরচ চলিত, এ বছর জমিদারের লোক ধান বেচিয়া খাজনা শোধ করিয়া লইয়া অবশিষ্ট যাহা ছাড়িয়া দিল, তাহাতে তিন মাস খাবার সংস্থান হওয়া দুর্ঘট। এইরূপ ভাবে দিন কাটিতে লাগিল; শিবশঙ্করের পরোপকার-ব্রতে জগদম্বার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। শ্যামা বলিত, "মা, তোমার আর কি? দিনান্তে দুটি শাকভাত হলেই তোমার ক'টা দিন চলে যাবে। সব্বার জন্য যা করতে হয়, উনিই করবেন, সে জন্য তুমি কিছু ভেব না।" বাস্তবিক সেদিকে ভাবনার কিছু ছিল না।

২

জগদম্বার ভাবনা সে জন্য বড় নয়। তাঁহার ভাবনা যামিনীর জন্য। কারণ তিনি জানিতেন যে, সন্তোষের যাহাতে ভাল হয়, তাহা শিবশঙ্কর করুন আর না করুন, তাঁহার নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই। গ্রামে শত্রু প্রবল, তাহাতে তিনি মেয়েমানুষ হইয়া কতকাল তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন? জামাই কৃপা করিয়া যাহা করেন, সে-ই লাভ। সন্তোষের ভাল না হয়, শিবশঙ্করের ত হবে। শিবশঙ্কর না থাকিলে যে বারো ভূতে লুটিয়া খাইবে।

জগদম্বা যামিনীর জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন। যামিনী পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে অধিকদিন পিতৃগৃহে রাখা ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ যামিনী

যে আজকাল বড় বেশী বধর্ব ও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে. ইহা মাতার চক্ষু এড়ায় নাই। তাই তিনি যামিনীকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জামাই কুলীন; বিবাহের পর কন্যা প্রথম পতিগৃহে যাইবে, তাহার উপযুক্ত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা জগদম্বার সাধ্যাতীত। শিবশঙ্করকে বলিলে, তিনি চক্ষু বুজিয়া থাকেন (শিবশঙ্কর অহিফেন সেবী)। শ্যামাকে বলিলে সে সমবেদনা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। "আহা ওর শ্বশুর কি লোক গা? মেয়ে সোমত্ত হ'ল, অথচ নেবার নামটি নেই? লোকের কি জাত মানেরও ভয় নেই?"

জগদম্বা বলেন, "তাদের কি, বাছা? কুলীন মানুষ একটার জায়গায় পাঁচটা বিয়ে করলেও ত কিছু বল্‌বার যো নেই।"

শ্যামা গর্জিয়া উঠিল "কেন, তারা একাই কি কুলীন? আর কেউ কুলীন নেই, বুঝি? এই ত এঁরা সবে পাঁচ পুরুষে ভঙ্গ এঁদের মুখের কথায় লোকে পায়ের কাছে মেয়ে নিয়ে লুটোয়, তবু ত বই এক। ছেড়ে আর একটা বিয়ে করুক দেখি।"

জগদম্বা দেখিলেন এ তর্কে অভীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাই তিনি মেয়ের হাত ধরিয়া চোখের জল অঞ্চলে মুছিয়া বলিলেন—

"মা, সবাই কি সমান হয়! আমার শিবুর মত শত্তুকে গোটা মেলা ভার। মা অন্নপূর্ণা বাঁচিয়ে রাখুন। তুই মা তাকে বলে' ক'য়ে যামিনীকে শ্বশুরবাড়ী যাবার মত গুছিয়ে দিতে বল, আমি তাঁদের পত্র লিখি।"

শ্যামা সে ভার অগত্যা গ্রহণ করিল। জগদম্বা যামিনীর শ্বশুর অন্নদা মুখুয্যেকে চিঠি লিখিলেন— জামাই আসিয়া মেয়ে লইয়া যাউন; অগ্রহায়ণ মাস প্রায় শেষ হয় এই মাসের মধ্যে যে দিন ভাল থাকে, সেই দিনেই তিনি মেয়েকে তুলিয়া দিতে রাজি আছেন।

অন্নদা মুখুয্যে পীতাম্বরের বেয়াই; পীতাম্বরের মতই চতুর। তিনি বুঝিলেন যে, ছেলেকে পাঠাইলে সে শাশুড়ীর মায়া কান্নায় ও যুবতী বধূর কটাক্ষে ভুলিয়া যাইবে, পাওনা গণ্ডা আদায় হওয়া কঠিন হইবে। বেয়াই জীবিত নাই, এ অবস্থায় তিনি নিজে গেলে কোন যদি ধরিয়া পড়ে, তবে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করা কঠিন হইবে। সুতরাং যথাকালে তিনি উত্তর দিলেন যে, বধূকে এতদিন পাঠান উচিত ছিল; এখন যে দিন খুসী পাঠাইলেই ত হয়। এর জন্য আবার ইস্তাহার জারির প্রয়োজন কি?

জগদম্বা আশ্বস্ত হইলেন। তিনি ত আর কৃপার ভিখারী নন। তিনি বুঝিলেন যে, পাছে পাওনার বিষয় লোকসান হয়, এই জন্যই বেয়াই এই চাল চালিয়াছেন। জগদম্বা সেই দিনই হারুর মা ও হারুকে বলিয়া রাখিলেন যে যামিনীকে ঘোষপুরে রাখিয়া আসিতে হইবে। দিন দেখা হ'লে, শিবশঙ্কর হাটবাজার করিয়া জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন; তাহাতে তাঁহারও নিতান্ত লোকসান হইল না। খরচ-সাপেক্ষ যে কোনও কাযে শিবশঙ্করকে একবার লাগাইয়া দিতে পারিলেই হয়।

নৌকা আসিল। হারু ও তাহার মাকে ডাকিয়া পাঠান হইল, শিবশঙ্কর এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোনও খোঁজ করেন নাই। তাহারা যখন যাত্রার সজ্জা করিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে চক্রবর্ত্তীগৃহে আসিয়া হাজির হইল, তখন তিনি চটিয়া লাল। শ্যামাকে তখনই তলব হইল; "শ্যামা, ব্যাপার কি? আমি কি কেউ নই নাকি? হারুর মা যাবে, আর ঐ হতভাগা পাজি বিটকেল হারুটা যাবে, অথচ আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করা হল না। এসব কি কাণ্ড? তোমার মাকে গিয়ে বল এ সব হবে টবে না। হারুর মত চোঁয়াড় বদমায়েসের সঙ্গে যামিনীকে আমি কিছুতেই যেতে দেবো না।"

শ্যামা ভয়ে ভয়ে একবার বলিল, "তা যাক্ না কেন ওরা, তোমারই বা কি মাথা ব্যথা? মা যা হয় করুন গে। আর হারুর মাও যখন যাচ্ছে—"

শিবশঙ্কর বলিলেন, "সে আমি কিছুতেই হতে

দেব না, ওরা লোক অতি পাজি। কুটুম বাড়ী অমন লোক পাঠাতে নেই, তারা হারুর সঙ্গে অমন একটি ডবকা মেয়েকে দেখলে কি বলবে বল দেখি? আমি হরিকে বলে দিচ্ছি, ঐ গিয়ে রেখে আস্‌বে এখন।"

আসল কথা শিবশঙ্কর প্রকাশ করিলেন না। হারুও তাহার মা চক্রবর্ত্তী পরিবারের একান্ত অনুগত। এদের অন্নে ওদের শরীর। পীতাম্বর চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভিটায় যখন শ্যামা ও শিবশঙ্কর-রূপ জোড়া ঘুঘু চরিতে আরম্ভ করিল, তখন ওরাই কেবল জগদম্বার অশ্রুতে নীরবে অশ্রু মিশাইয়াছে। জগদম্বার আদেশ তাহারা প্রাণপাত করিয়াও পালন করিত। শিশুর জন্য খেজুর বকুল আম জামরুল সংগ্রহ করিতে তাহাদের আলস্য ছিল না। যামিনীর জন্য দূরের হাট হইতে শাঁখা চিরুণী কিনিয়া আনিত ওরাই; শিবশঙ্কর বা শ্যামার কথা উহারা একেবারেই শুনিতে চাহিত না; উহারা যে তাঁহাদের ভাল চোখে দেখিত না, সে কথা শিবশঙ্কর জানিতেন কিন্তু তাহা ত প্রকাশ্যে বলা যায় না।

জগদম্বা বুঝিলেন। কিন্তু জামাইয়ের উপর কথা কহিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। বিধবা বিশেষতঃ হিন্দু বিধবা যে বাঁচিয়াও মরিয়া থাকে। তাহার সাধ আশা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সবই স্বামীর সঙ্গে পুড়িয়া শ্মশানে ছাই হইয়া যায়। একবিন্দু অশ্রু অজ্ঞাতে সঞ্চিত হইয়া জগদম্বার দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিল মাত্র।

হারু ও হারুর মার যাওয়া হইবে না, তাহা তিনি বুঝিলেন। হরির সঙ্গে পাঠাইতেই বা আপত্তি কি? হরি জগদম্বার আত্মীয়; কিন্তু সেরূপে হরি এ অসময়ে দেখা দেন নাই। হরি শিবশঙ্করের মামাতো ভাই। উভয়ের একই বয়স, উভয়েই প্রৌঢ়; উভয়েই সংসারের জুয়াখেলায় প্রবীণ পরিপক্ক খেলোয়াড়। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর বে-ওয়ারিশ সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ-কল্পে শিবশঙ্কর যখন যশপুরে আসিলেন, তখন তাঁহারই দোসর বা মোসাহেব হিসাবে হরিও আসিয়া জুটিলেন। জগদম্বা মাসির সহিত পূর্ণ প্রীতি রাখিয়া চলাই হরির প্রথম লক্ষ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য হরি প্রকাশ্যতঃ নির্লিপ্ত ভাবেই চলিত। দু'বেলা দুটি খাওয়া, শিবশঙ্করের আজ্ঞা পালন করা এবং বিকালে প্রতিবেশীর পুকুরে মাছধরা অথবা তাহাদের বৈঠকখানায় পাশা ও তামাকের আড্ডায় যোগ দেওয়া হরির প্রধান কায ছিল। পরিশ্রমের যত কিছু কায সে সবই শিবশঙ্কর হরির দ্বারা করাইত। ক্ষেতের ধান বাড়ীতে আনা, বাগানের ফল পাড়ানো প্রভৃতি কায হরি আপনার জনের মতই করিত। শিবশঙ্কর জগদম্বাকে বুঝাইতেন একজন লোক রাখিতে হইলে মাহিয়ানা দিতে হইত; হরি শুধু পেটে দুটি খায় বই ত নয়। হরি তাঁহাকে বলিত, "মাসি, দুদিন পরেই ত তোমার জামাই পাততাড়ি গুটাবে, তখন দেখে নিও, হরিচরণ শর্ম্মা একাই তোমার সংসার কি করে' ঠেকিয়ে দেয়।" হরির কথায় জগদম্বার প্রাণে আশ্বাসের সঞ্চার হইত।

হরি জগদম্বার মন যেরূপ সহজে ভিজাইতে পারিয়াছিল, তাহার শিশু পুত্রটি বা যামিনীর মন সেরূপ পারে নাই। সন্তোষ কোনও মতেই হরিদাদার সঙ্গ পছন্দ করিত না। হরির আদর সে কিছুতেই সহিতে পারিত না। যামিনীর প্রতি হরি প্রথম প্রথম বড়ই পক্ষপাত দেখাইয়াছিল. কিন্তু যামিনীর বিদ্রূপবাণে তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিত। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে যামিনী সংসারকে একটু আধটু চিনিতে শিখিয়াছে। যামিনী যখন রান্নাঘরে রাঁধিতে যাইত, হরি সে ঘরের বারান্দায় গিয়া রামপ্রসাদী ভাঁজিতে বসিত। যামিনী তাহাকে বলিত, "হরিদাদার গানে গাছের পাতা ঝরে' পড়ে, যেমন আলুনী হয়, আর বোবা বউয়ের বোঝা বাড়ে।" হরির মস্তকের টাক লইয়াও সে নানাপ্রকার রহস্য করিতে ছাড়িত না। ইহার ভিতরে যে একটু অবজ্ঞার ভাব ছিল, তাহাতে হরিচরণের ঘনিষ্ঠতা-প্রবৃত্তির পথে কণ্টক দিয়া দিত। হরি বুঝিত, ওদিক না মাড়ানোই ভাল।

সেদিন হারুর মা যখন জগদম্বার দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার স্কন্ধে কাচা কাপড়ের পুটুলিটি লইয়া ঘরের দাওয়া হইতে নিঃশব্দে উঠিয়া গেল, তখন

যামিনীর মনটা খাঁচার পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে করিবে কি? তাহার ত কোনই হাত নাই নিজে যে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবে, মায়ের মুখের দিকে চা'হয়া সে সাহসও তাহার চলিয়া গেল। পাছে হরি দাদার সঙ্গে যাইতে আপত্তি করিলে তাহার পতিগৃহে যাইবার পক্ষে বাধা পড়িয়া যায়, সেই আশঙ্কাক্রমে সে কিছুই বলিতে পারিল না। অপরাহ্ণে সে কাঁদিয়া কাটিয়া বিদায় লইয়া নৌকায় উঠিল।

৩

যামিনীকে লইয়া একাকী নৌকারোহণে কোথায়ও যাইতে হইবে, ইহা হরিচরণ কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এমন একটি অসম্ভব ব্যাপার যে কখন কি ভাবে অকস্মাৎ সম্ভব হইয়া পড়িল তাহা বুঝিতে হরিচরণের কিছু সময় কাটিয়া গেল। অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ সূর্য্য কিরণের মধ্য দিয়া নৌকাখানি পালের সাহায্যে তর তর করিয়া যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখনও হরিচরণের চমক ভাঙ্গে নাই। সে ছাপ্‌পরের বাহিরে পালের বাঁশে ঠেস দিয়া নিবিষ্ট ভাবে সেই কথাই ভাবিতেছিল, যামিনীর সঙ্গে সে আজ একা।

যামিনী ষোড়শী, তাহার রূপ উছলিয়া পড়িতেছে; তাহার আয়ত নয়নের আর্দ্র পক্ষ্মপংক্তি আরক্ত গণ্ডস্থলের উপর ভ্রমরের পংক্তির মত নিবিড় ভাবে রহিয়াছে। সেও যেন চিন্তাভারনত। যতক্ষণ তাহার গ্রামের ঘাট, পল্লীবাট, সূর্য্যকরচুম্বিত বৃক্ষাগ্র তাগ দেখা যায়, ততক্ষণ সে এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ছিল। তার পীন বক্ষস্থল, নিরুদ্ধ ক্রন্দন বেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে-ছিল। হরিচরণ তাহার চোখের কোণ দিয়া মাঝে মাঝে একবার যমিনীকে দেখিয়া লইতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন তীরস্থিত বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যে ক্রমশঃ জমাট বাঁধিতেছিল, তেমনই একটা অন্ধকারময় অভিসন্ধি হরিচরণের বক্ষপঞ্জরের মধ্যে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল।

হরিচরণ চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছিল। যামিনীর রূপের নেশা হরিচরণকে যে আজ হঠাৎ উন্মত্ত করিয়া তুলিল, তাহা নহে। যামিনীর ক্রমবিকশিত যৌবনের উচ্ছলিত লীলাতরঙ্গ তাহাকে অনেক দিন হইতে মোহিত করিয়াছিল। কিন্তু যামিনী কখনও ভুলিয়াও হরিচরণের ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দেয় নাই, বরং সময়ে সময়ে নির্ম্মম ভাবে তাহার সে প্রবৃত্তিকে উন্মেষেই লাঞ্ছিত করিয়া দিয়াছে। আজ তাহাকে এমন ভাবে অসহায় অবস্থায় পাইয়া হরিচরণের মন ঝড়ের নৌকার মত অস্থির ও দিগ্‌বিদিক শূন্য হইয়া উঠিল। তাহার মন তাহাকে বুঝাইল যে এই সুযোগ। কিন্তু আশঙ্কা পাছে ব্যর্থ হয়। কারণ হরিচরণ জানিত যে যামিনী তাহার প্রতি পক্ষপাতী নহে। তাহাকে কৌশল করিতে হইবে। সে যদি এমন কোনও মন্ত্র জানিত, যাহার দ্বারা মানুষের মন চট্‌ করিয়া বশ করা যায়, তাহা হইলে তাহার অভীষ্ট সাধনপক্ষে সুবিধা হইত। বল প্রয়োগ অসম্ভব, কেন না মাঝিরা জানিবে। মাঝি-দের যদি কোনও উপলক্ষে কোথায়ও কিছু সময়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে?—কিন্তু কি বলিয়া সে প্রস্তাব করা যায়? অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বশ করা যাইতেও পারে কিন্তু সে পরিমাণ প্রচুর অর্থ কোথায়? হরিচরণ ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেছিল না আর শয্যাকণ্টকগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

রাত্রি যতই গভীর হইতে লাগিল, হরিচরণের লালসা ততই তীব্র হইয়া আসিল। অন্ধকার রাত্রি; ছোট নদীর মধ্য দিয়া নৌকা অলস গতিতে চলিয়াছে। মাঝিরা দাঁড় ফেলার তালে তালে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে-ছিল। ঝিঁঝির অবিরাম রবে সে গুঞ্জনগীতির সুরে সুর মিলাইতেছিল। আকাশের তারাগুলি অন্ধকারের মধ্যে যেন ভয়ে ভয়ে চাহিয়া ছিল। নদীর ধারে ছোট বড় গাছের মধ্যে জোনাকীর মেলা বসিয়া গিয়াছিল। দাঁড়ের শব্দে, ঝিঁঝির রবে, মাঝির গানে নদীর তরলতা ও তারার ক্ষীণ দীপ্তি মিশিয়া এমন একটা নিস্তব্ধ

বিকল শান্তি আনিয়া দিতেছিল যে চোখের পাতা আপনি বুজিয়া আসে। কিন্তু হরিচরণের চোখে ঘুম নাই। তাহার বুকে আজ যে দেবতা বাসা বাঁধিয়াছেন, তাঁহার বিলাস লীলায় আজ তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুত্তরঙ্গ ছুটিতেছে। সে কেবলই এপাশ ওপাশ করিতেছিল, কখনও উঠিয়া বসিয়া নদীর জলের দিকে, তীরের তরুপুঞ্জের দিকে নিষ্ফল ব্যাকুলতায় তাকাইয়া ছিল। সমস্ত মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া সে একটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না—কেমন করিয়া সে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। মাঝিরা জানিতে না পারে, অথচ কার্য্য সিদ্ধি হয় এমন কোনও কৌশলই সে উদ্ভাবন করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না! কিন্তু উপায় যতই আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল, ততই তাহার কামনার উত্তেজনা বাড়িয়া গেল।

যামিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল নৌকার ভিতরে অল্প পরিসর স্থান; সে যেখানে শুইয়া ছিল তাহারই অতি নিকটে হরিচরণের শয়নের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঘুমের ঘোরে কতবার যে যামিনীর পদযুগল হরিচরণের অঙ্গে লাগিয়া তড়িত সঞ্চার করিয়াছে তাহার অন্ত নাই। রূপসী তরুণীর এই ঘুমন্ত স্পর্শে হরিচরণের যেটুকু চৈতন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাও লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল।

মাঝিরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর নৌকার সম্মুখে পাটাতনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নৌকা তীরে বাঁধা রহিয়াছে পারের গ্রামগুলি অদূরে নিস্তব্ধতায় মগ্ন। গভীর নিশীথের গম্ভীর ঝিল্লীরব নৌকার দু'ধারে নদীর জলের কল কল ছল ছল শব্দ আর মাঝিদের কর্ম্মক্লান্ত সুপ্ত দেহ মন্থন করিয়া যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছিল, তাহার শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ সে প্রদেশে ছিল না। স্রোতের ঈষৎ দুলুনীতে নৌকা থাকিয়া থাকিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। হরিচরণ যামিনীর কাছে ঘেঁসিয়া শয়ন করিল। সেই অন্ধকারেও তাহার সর্ব্বাবয়বের সরল সুস্থ পরিপূর্ণতা হরিচরণকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। সে অতি সন্তর্পণে যামিনীর একখানি হস্ত নিজের উভয় হস্তে লইয়া চাপিল। এক দিকে আশঙ্কা অন্য দিকে তীব্র লালসা তাহাকে যেন কেমন এক রকম করিয়া ফেলিল।

যামিনী সেই মৃদু স্পর্শেও চমকিয়া উঠিল এবং হরিচরণকে আপনার অতি নিকটে শয়ান দেখিয়া, হরি দা হরিদা বলিয়া ডাকিল। হরিচরণ প্রথমটা সাড়া দিল না। তখন যামিনী একেবারে উঠিয়া খাড়া হইয়া বসিল এবং হরিচরণের গায়ে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা দিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

হরিচরণ উঠিল না, কিন্তু পুনরায় যামিনীর হস্ত গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। এবারে যামিনী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। সে প্রথমটা মনে করিয়াছিল যে হরিদা বোধ হয় ঘুমের ঘোরে গড়াইতে গড়াইতে তাহার বিছানায় আসিয়াছে। যামিনীর নিজেরও ঘুমের ঘোর তখন ভাল করিয়া কাটে নাই। ঘুমের অবস্থায় সহসা কোনও বিপদ ঘটিলে অনেক সময়ে মতিবিভ্রম ঘটে ঘুমের প্রভাব যতই কমিয়া যাইতে, লাগিল ততই সে হরিচরণের মনোভাব বুঝিতে পারিল। সে প্রবল বেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "একি হরি দা, তোমার এই ব্যবহার?"

হরিচরণ তাহাকে চাপা স্বরে ধমক দিয়া বলিল, "চুপ কর বলছি। নইলে ভাল হবে না।"

যমিনী অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল, "কেন, চুপ করবো? এই জন্যে তোমরা হারুর মাকে আসতে দিলে না! এখন আমি তোমাদের মতলব বুঝতে পেরেছি। এক্ষুণি যদি তুমি উঠে গিয়ে না শোও তোমার যায়গায়, তাহলে আমি চেঁচিয়ে মাঝিদের জাগিয়ে দেবো।"

"তা দে'না আমার ত ভারি বয়ে যাবে। কলঙ্ক হতে তোরই হবে।"

যামিনী ভয় পাইল। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিল, "হরি দা, আমি তোমার বোন্। তোমার পায়ে পড়ি, উঠে যাও।"

হরিচরণ মনে করিল যামিনী নরম হইয়াছে। তখন সে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল—

"দেখ, যামিনী, অনেক দিন থেকে আমি এই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করছি। তোদের বাড়ীতে যে আমি এত দিন পড়ে আছি, আর মুটে মজুরের মত খাটছি সে কেবল তোর জন্যে। এখন তুই যদি আমাকে এমন করে অপমান করিস ত তোর ভাল হবে না। আমি তা হলে তোর শ্বশুরবাড়ী যাওয়া ঘুচিয়ে দেবো। দেখ, আমি যদি এখন এই নৌকা থেকে নেমে যাই, তা হলে সাত জন্মেও তোর শ্বশুরবাড়ী স্থান হবে না। লোকে বল্‌বে মোছলমান মাঝির সঙ্গে ওর জাত গেছে।"

হরিচরণ অনর্গল বলিয়া গেল। যামিনী ভাবিতে লাগিল, কোন্ অশুভ লগ্নে সে আজ পা বাড়াইয়াছে। আজ তাহার পিতার কথা মনে হইল। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে সাধ্য কি, কেহ এমন অপমান করে। তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া আসিল। কিন্তু সে স্থির অবিকম্পিত ভাবে বলিল:—

"ভাগ্যে আমার যাই থাক্, হবে। কিন্তু তুমি আবার যদি ও কথা আমায় বলো, ত আমি এখুনি জলে ডুবে মরবো।"

"বেশ। আমি যাচ্ছি, তুই দেখে নিস্ কি হয়।"

যামিনী ভয় পাইল না অসহায়ের যে সাহস, সেই সাহসে বুক বাঁধিয়া সে অটল রহিল; এবং যখন দেখিল যে হরিচরণ সত্য সত্যই নিঃশব্দে নৌকা হইতে নামিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, তখন সে যেন একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন হইতে পরিত্রাণের শান্তি অনুভব করিল। বুঝিল না যে, তাহার অদৃষ্টাকাশের কোণে ঝড়ের মেঘ উঠিল।

যামিনী এক একবার মনে করিল যে হরিচরণ তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্যই নামিয়া গিয়াছে; আবার হয়ত কিছুক্ষণ বাদে অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। সে জাগিয়া অবশিষ্ট রজনী পোহাইল; কিন্তু হরিচরণ আর ফিরিয়া আসিল না। উষার বাতাসে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন সে চক্ষু মেলিল, তখন ভোর হইয়াছে। মাঝিরা ঘোর থাকিতে নৌকা খুলিয়াছিল। হরিচরণ যে নৌকায় নাই, তাহা প্রাতঃকালে তাহারা লক্ষ্য করে নাই। যখন লক্ষ্য করিল, তখন তাহারা অনেক পথ আসিয়াছে। যামিনী উঠিতেই তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিল যে অন্ধকার থাকিতে বাবু হয়ত কোনও প্রয়োজনে কূলে নামিয়াছিলেন; তাহারা তাঁহাকে ফেলিয়াই আসিয়াছে। নিতান্ত অপরাধীর মত তাহারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু যামিনী যখন কোনই প্রশ্ন করিল না তখন মাঝি জিজ্ঞাসা করিল:—

"ঠাইরেন, আপনার ভাই গেল কোই?"

যামিনী উত্তর করিল:

"কি জানি, বাবা?"

মাঝি সভয়ে কহিল:—

"নাও ফিরায়্যা লইমু?"

"তোমরা ঘোষপুর চেন?"

"চিনি মা ঠাইরেন। মুখুজ্জাদের বারীতে যাইবা ত?"

যামিনী "হাঁ" বলিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মাঝি তাহা দেখিল। হরিচরণ যে স্বেচ্ছায় তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে, এমন একটা সন্দেহ তাহার মনে হইল। কেন না, যদি তাহারাই ভুলক্রমে তাহাকে ফেলিয়া আসিত, তাহা হইলে সে ত ডাঙ্গাপথে অনায়াসে তাহাদের ধরিয়া ফেলিতে পারিত। ইচ্ছা থাকিলে এখনও ত সে আসিতে পারে। মাঝি তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেলা যেমন বাড়িতে লাগিল, তাহার সে সন্দেহও ঘনীভূত হইল। যামিনী যে পুনঃ পুনঃ বসনে চক্ষু মুছিতেছে, তাহাতেও তাহার মনটা সেই সন্দেহের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল।

সে বলিল:—

"মা ঠাইরেন, তোমার কোনও ভয় নেই। আমরা মুখুজ্জাদের বারীত আপনারে উঠায়্যা দিয়া, তবে যাইমু।"

জোয়ারের জলে নৌকা তর তর করিয়া চলিল। মধ্যাহ্নে ঘোষপুরের ঘাটে গিয়া মাঝিরা যখন নৌকা

ভিড়াইল, তখন সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ স্নান করিতেছিল। তাহাদের সকলেরই দৃষ্টি প্রথমে নৌকা ও পরে আরোহিণীর দিকে বক্রভাবে অর্পিত হইল। একাধিক কণ্ঠে প্রশ্ন হইল ;—

"কোথাকার নৌকা রে, মাঝি ?"

"বশপুরের নাও, মুখুজ্জ্যাদের কুটুম বারীত্তে আস্‌ছি।"

যামিনী দেখিল, স্নাতকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া উপবীত হস্তে ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যপ্রণাম করিতে ব্যস্ত হইলেন। বধূগণ অবগুণ্ঠন আরও অবনমিত করিয়া তাহার অন্তরাল হইতে যামিনীকে দেখিতে লাগিল, যামিনী সে কটাক্ষ সহিতে না পারিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল। একজন মাঝি নৌকা হইতে নামিতেছে দেখিয়া জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কোথায় যাও, বাপু ?"

মাঝি উত্তর করিল :—

"মুখুজ্জ্যাবারী।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন :—

"তোমাদের নৌকায় ত দেখছি, একটি বউ এসেছে। আর সঙ্গে কেউ আসে নি ?"

"আজ্ঞা, আস্‌ছিল ঠারইনের এক ভাই না কি জানি হয়। তা সে লাইমা গেছে পথে কোন্‌খানে টাার পাই নেই।"

"নেমে গেছে, না রাত্রে তোমরা জোর করে তাকে নামিয়ে দিয়েছ ?"

"হেই কি কন্ করতা ? আমরা বার বচ্ছর এই অঞ্চলে মাঝিগিরি কাম করতে আছি—আমরা কি এমন কাম করতে পারি, আজ্ঞা ?"

"সে আমরা আজ সকালে সব শুনেছি। তোমরা ও মেয়েটিকে নিয়ে সেই গাঁয়ে ফিরে যাও। তারা যা হয় করুক গে। রাধামাধব! রাধামাধব!"

মাঝি বুঝিল। চলিতে যেন তাহার পা সরিতেছিল না। তবুও সে আস্তে আস্তে গ্রামের পথ ধরিয়া চলিল।

যামিনী সকলগুলি কথা শুনিল. মাঝির চলিবার ভঙ্গী হইতে সে বুঝিল যে সে বেচারীর মনে ভয় হইয়াছে। হরি দা আসিয়া এরি মধ্যে এতখানি কাণ্ড করিয়া যাইবে, ইহা সে তেমন ধারণা করিতে পারে নাই। তাহার বালিকা হৃদয় চতুর্দ্দিক হইতে ঘনায়মান নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও আশার রজমশাল জ্বালিয়া মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া লইতেছিল। কিন্তু ঘাটে আসিয়া নৌকা বাঁধিতেই তাহার সমস্ত আশা ভরসা লোপ পাইল; তাহার হস্তপদ ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণ ও মাঝিতে যখন কথাবার্ত্তা হয়, তখন সে তাহার সকলেন্দ্রিয় কর্ণে নিয়োজিত করিয়া তাহা শুনিতেছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি বাক্য, প্রতি বর্ণটি যেন অগ্নিশিখার মত দগ্ধ করিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তাহার ক্ষুদ্র জীবনে এত তীব্র যন্ত্রণা কখনও তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। পিতৃহীনা হইয়াও সে এতদিন মায়ের বক্ষনীড়ে আদরে যত্নে পালিত হইয়াছিল, আজ তাহার অন্তরাত্মা নীড়ভ্রষ্ট পক্ষিশাবকেরই ন্যায় ছটফট করিয়া উঠিল।

গতরাত্রের ঘটনা দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। হরিচরণ যখন নিরুদ্ধ ক্রোধে তাহাকে ফেলিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যায়, তখন তাহার নিস্তব্ধ মৌন রুদ্র মূর্ত্তি অন্ধকারেও যেন বিভীষিকার মত দেখাইয়াছিল। সেই বিভীষিকার মূর্ত্তি আরও শতগুণ বীভৎস রূপ ধারণ করিয়া এখন তাহার মনে আসিতেছিল। তাহার মনে পড়িতেছিল, সেই চাপা গলার তীব্র ভর্ৎসনা "তুই দেখে নিস্, দেখে নিস্ কি হয়।" অদৃষ্টের অভিসম্পাতের মত সেই কথা কয়েকটি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার বক্ষপঞ্জরের প্রতি অস্থিতে নির্ম্মম ভাবে আঘাত দিতেছিল। হরি দা তাহাকে সেই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অপরিচিত মাঝিদের দয়ার উপর ফেলিয়া গিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না—তাহার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়া তাহার উভয় কূলে কাঁটা দিয়া ছাড়িয়াছে। যদি শ্বশুরবাড়ীতে তাহাকে না লয়, মা তাহাকে কেমন

ক'রয়া লইবেন? মা, মা আমি আর তোমার স্নেহ কোলে ফিরিতে পাইব না! এই জন্যই কি মেয়েকে এত সাজগোজ করিয়া শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলে, মা?

এইবার তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে অনেকক্ষণ ফুপাঁইয়া ফুপাঁইয়া কাঁদিল। মাঝি ফিরিয়া আসিয়াছে। সে হুঁকা কলিকা লইয়া তামাকু প্রস্তুত ক'রতে যেন ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক সে কোনও কাযই করিতেছিল না। বেচারী একটিও কথা কহিতে পারিতেছে না। তাহার কপোল বাহিয়া দুই চারি বিন্দু চক্ষের জল রুক্ষ দাড়ীতে আসিয়া চক্ চক্ করিতেছিল। এতক্ষণ অপর মাঝিটি নৌকার পাটাতনে ডাল ও ভাত রন্ধন করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু খাইবার কথা কাহারও মনে নাই। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা কেহ জলস্পর্শও করে নাই। যামিনী চোখের জল নিরুদ্ধ করিয়া মাঝির মুখের দিকে চাহিল। মাঝি হুঁকা লইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত টানিতে লাগিল। কলিকায় যে আগুন দিতে বাকী আছে, তাহা সে ভুলিয়া যায় নাই। কিন্তু দরিদ্র, অশিক্ষিত মুসলমান মাঝির প্রাণের গোপন কোণে কোথায় একটি কোমল স্থান ছিল, আজ তাহা এই নিরাশ্রয়া ব্রাহ্মণ বালিকার দুঃখে শত বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার দিকে চাহিতেও পারিতেছিল না। যামিনী চোখের জল মুছিয়া, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া, তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সে প্রশ্ন যামিনীর কণ্ঠেই মিলাইয়া গেল। মাঝি তাহার প্রশ্ন না বুঝিতে পারিলেও এটুকু বুঝিল যে একটা কিছু সত্য মিথ্যা বলা প্রয়োজন; তাই সে উত্তর করিল :—

"মুখুজ্যা মশায় বারীতে নেই, মা ঠা'রণ। আবার খানিক পরে যাইয়া দেখমু হানে।"

এ আশ্বাসে যামিনী ভুলিল না। তাহার চোখ দু'টি ছল ছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। মাঝির মুখ দেখিয়া আর বুঝিতে কিছু কি বাকী আছে?

মাঝি আসল কথা বলিল না। মুখুয্যে মশায় বাড়ীতে ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রও উপস্থিত ছিলেন। মাঝি যখন তাঁহার সম্মুখে গেল, তখন তিনি প্রথমতঃ যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া পুত্রবধূর চতুর্দ্দশ পুরুষের সৎকার করিলেন; তার পর মাঝির পুরস্কার স্বরূপ খড়ম ফেলিয়া তাহার পায়ের দু'টি অঙ্গুলি রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছেন। পরে, রাগে গরগর করিতে করিতে নগ্নপদেই তিনি অন্য প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিয়াছেন। মাঝি অনেকক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া নৌকায় ফিরিয়াছে। মাঝির মনের ভাব যে মুখুয্যে মহাশয়ের রাগ একটু কমিয়া আসিলে তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, তখন সে একবার হাতে পায়ে ধরিয়া দেখিবে।

৫

অগ্রহায়ণের অপরাহ্নে নদীর বাঁকের শেষ বৃক্ষ-পুঞ্জের সবুজ আস্তরণের উপর সূর্য্যদেব শংনাচুমকীর আসন রচনা করিয়াছেন। মাঝি আবার মুখুয্যে বাড়ী গিয়াছে। যামিনী তাহার পথ নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া আছে। অশ্রুজল তাহার দৃষ্টি শক্তিকে মাঝে মাঝে বড়ই বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। এমন সময় একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক একটি শূন্য মাটীর কলসী-কক্ষে নৌকার উপর উঠিল এবং একটু নীচু হইয়া যামিনীর দিকে তীব্র ঘৃণা মিশ্রিত বিদ্রূপের কটাক্ষ হানিয়া বলিল :—

"কিগো, পীতাম্বর চক্কত্তীর মেয়ে, এখনও যে ঘাটে লাললডিঙ্গি বেঁধে হাওয়া খাওয়া হচ্ছে? কেলেঙ্কারীর কি শেষ হয় নি?"

যামিনী ভয় পাইল। সে আস্তে আস্তে এক কোণে গিয়া জড়সড় হইয়া বসিল। আগন্তুক রমণী কোনও জবাব না পাইয়া বলিল :

"ওগো ভাল মানষের মেয়ে, এই যে গাঁ ঢিঢি শব্দ পড়ে গেছে খবর রাখ কি? এখনও বল্ছি ভালয় ভালয় বিদেয় হও।"

যামিনী নিজের চিন্তায় প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল :—

"কোথায় যাব, মা ?"

"কেন যমের বাড়ী নেই কি বাছা ? বামুনের মেয়ে মরতে জান না ? এতক্ষণ গাঁজর ভেঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গাঁয়ের অকল্যাণ না ক'রে, ঐ খানটায় ডুবে মরলে ত জঞ্জাল যেত গো ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ বলে যাব কোথা ? চুলোয় যা, চুলোয় যা !"

বলিতে বলিতে রমণী কলসীটি আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিলেন ও দ্রুতপদে নৌকা ত্যাগ করিলেন।

যামিনী অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, অলস। রমণী ঘাট হইতে অনবরত বকিতে বকিতে যখন চলিয়া গেলেন, তখন সে ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মাঝিকে বলিল নৌকা কূল হইতে একটু সরাইয়া বাঁধিতে, যাহাতে সহসা কেহ নৌকায় না চড়িতে পারে। ঘাটে অনেক লোক আসিল, তাহার দিকে চাহিয়া কত কথাই কহিল, কত ইঙ্গিত বিদ্রূপ করিল, তার পরে গাত্র মার্জ্জনা করিয়া জলের কলসী কক্ষে লইয়া দেহ দোলাইতে দোলাইতে চলিয়া গেল। শেষে যামিনী আর তাহাদের পানে চাহিল না। যে মাঝি গাঁয়ের মধ্যে গিয়াছে, তাহার প্রতীক্ষা করিতেও বিরত হইল। সে নৌকার জানালা দিয়া জলের দিকে অনিমিখে চাহিয়া রহিল। পরপারে চাষারা গরুবাছুর লইয়া নদী কিনারের পথ বাহিয়া চলিয়াছে, সে দিকে তাহার দৃষ্টিরেখা প্রসারিত হইল না। সে জলের খেলা দেখিতেছিল, কি চিন্তার দোলায় দোল খাইতেছিল, তাহা বুঝা গেল না। নৌকার যে দিক্‌টায় সে বসিয়া ছিল, সে দিকে নৌকা ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়াছিল। মাঝি সেই জন্ত তাহার উলটা দিকটায় গিয়া বসিয়া নৌকার পাল্লা সমান করিয়া লইল।

দিক্‌চক্রবালের কিনারে রবির রশ্মি ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিয়াছিল, কালো জলে কালো অন্ধকার নিবিড় ঘন নীড় বাঁধিতেছিল। ছোট ছোট ঢেউগুলি চলৎ ছলৎ করিয়া নৌকার গায়ে খেলা করিতেছিল। যামিনী জলের দিকে চাহিয়াই আছে, কিন্তু কিছুই সে দেখিতেছে না ; ভাবনার রাশি এলোমেলো হইয়া তাহার হৃদয়ে তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়াছে। সে ত কখনও ভাবিতে শিখে নাই ; আজ সহসা ভাবনার অতিরিক্ত ভারে সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কপোল বহিয়া অবিরল-ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। ভাবিতেছিল, এইখানটায় অ-থই জল। এখানে ডুবিলে বোধ হয় কেহ উঠিতে পারে না। এই কালো জল, এর ভিতরেও বোধ হয় খুব আঁধার। কিন্তু খুব ঠাণ্ডা বোধ হয় ! সব জ্বালা জুড়িয়ে যায় একবার ডুবতে পারলে। কিন্তু ডোবা কি যায় ? বড় ভয় করে। এই জানালা 'দয়ে স্বচ্ছন্দে জলে নামতে পারা যায় ; কিন্তু বড় ভয় করে। আর যাবই বা কোথায় ? মা ! মা ! সে মায়ের কথা মনে হইতেই "মা-মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল।

"ভয় কি, যামিনী !"

যামিনী চমকিয়া উঠিল। এ কার স্বর ? এ যে চেনা সুর। ঐ ক'টি কথায় তাহার সমস্ত হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সে মুখ ঈষৎ বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই স্বামী। নৌকার অপর দিকে লঘু হস্তে নৌকার কাঠ অবলম্বন করিয়া তাহার স্বামী তাহাকে সম্ভাষণ করিতেছে। সে বিবাহের সময়ে ও পিতৃগৃহে অবস্থিতি কালে যে কয়েক দিন 'বর'কে দেখিয়াছিল, তাহাতেই সে চিরসুন্দর মূর্ত্তি তাহার হৃদয়-পটে চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়াছিল। আজ শ্যামায়মান সন্ধ্যার কালো জলে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া সে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

আজ সমস্ত দিন এবং গত রজনীতে সে জলস্পর্শ করে নাই। কলঙ্কগ্লানিতে তাহার বালিকা-হৃদয় অসহ দুঃখ ও ব্যথায় অরুণিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সব সে ভুলিয়া গেল। তৃষিতের মত অনিমেষ নয়নে সে তার স্বামীর দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্বামী সাঁতার কাটিয়া নিজের মস্তকটি কেবল জলের উপরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। নৌকার বিপরীত দিকে থাকায় অপর কেহ তাহাকে দেখিতে

পাইল না। কিছুক্ষণ সেও স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে মুখে সে এমন কিছু খুঁজিতেছিল যাহাতে এই রহস্যের একটা মীমাংসা হয়। তাহার বয়স মাত্র উনিশ কি কুড়ি বৎসর হইবে। কুলীনের ছেলে, অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহাকে বালকের মত দেখাইতেছিল না। সে বড়ই গম্ভীর। সংসারে তাহার কথা কে শুনিবে? তাহার পিতার ব্যবহার দেখিয়া সে বুঝিয়া লইয়াছে যে যামিনীর পক্ষে তাহাদের গৃহের কবাট জন্মের মত বন্ধ। কিন্তু দোষ কার? এইটুকু শুধু সে বুঝিতে চাহে। অনেকের মুখে আজ বিকালে সে শুনিয়াছে যে চোখের জলে বধূর বুক ভাসিয়া যাইতেছে। আবার তাহার বিরুদ্ধে কত বিদ্রূপও শুনিয়াছে। তাই একবার ঘাট জনশূন্য হইলে, দূর হইতে সাঁতার কাটিয়া, ডুব মারিয়া সে নৌকার অপর দিকে আসিয়া নৌকা অবলম্বন করিয়া ভাসিতেছিল। শেষে বালকের মত সে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল:—

"হরি দা নৌকো থেকে নেমে গিছলো কেন?"

অন্য সময় হইলে যামিনী লজ্জায় স্বামীর কথার জবাব দিতেই পারিত না। কিন্তু আজ তার সকল লজ্জা ছুটিয়া গিয়াছে। সে বলিল—

"হরিদার কথা শুনিনি বলে। তার মতলব……" —আর সে কিছু বলিতে পারিল না, উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

মাঝি একটু ঝিমাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মা ঠা'রণ কাঁদেন কেন; কাঁদেন না। হে আল্লা!"

যামিনীর স্বামী যামিনীকে বলিল; "আমি আবার আসব। তুমি জেগে থেক।"

জলের একটু শব্দ হইল। আর তাহাকে দেখা গেল না।

৬

মাঝি যে কখন ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা যামিনী জানিতে পারে নাই। যে মাঝি নৌকায় ছিল সে কখন নৌকা কূলে ভিড়াইয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করে নাই। মাঝি মুখুয্যেদের বাড়ী হইতে শুধু প্রত্যাখ্যানের দুরন্ত অপমানের বোঝা মস্তকে লইয়া ফিরিয়াছে। তাহার কর্ত্তব্যের একটু মাত্র শেষ রাখিয়া সে ফিরে নাই। কাকুতি মিনতি, হাতে পায়ে ধরা সে নিরক্ষর মাঝির শক্তিতে যতদূর কুলায়, তাহার ত্রুটি সে করে নাই। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের শৈলসম মর্য্যাদা কি শুধু তাহাতে প্রবোধ মানে? সে প্রত্যুত্তরে শুধু শক্ত কথা শুনিয়া গালাগালি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

"অখন কি করমু, করতা?" এবং তাহার উত্তরে যখন শুনিল—

"ঘরে নিয়ে গিয়ে নিকা কর গে হারাম যাদা।"

তখন তাহার ধৈর্য্য আর টিকিল না। সে আপন মনে বকিতে বকিতে নৌকায় ফিরিয়া আসিল। সমস্ত দিবসের ক্লান্তির পরে সে ভাল করিয়া একবার তামাক খাইল এবং সঙ্গীকে ডাকিয়া ভাত বাড়িতে বলিল। তাহার চেষ্টার যে ত্রুটি হয় নাই, শুধু এই ধারণাটুকুতে তাহার মন কতকটা হালকা হইয়াছিল এবং নৌকায় ফিরিয়া যখন সে কেরোসিনের কুপের আলোকে দেখিল যে মা ঠাকুরাণীর চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে—তখন সে মনে কিঞ্চিৎ বল পাইল। বলিল:—

"ভাত কয়ডা খাইয়া লই, তার পরে নাও খুলিয়া দিমু হ্যাগো?"

যামিনীর যেন চমক ভাঙ্গিল। সে যে দুরন্ত বিষাদের মধ্যেও একটু শান্তির স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা যেন টুটিয়া গেল। সে ত্রস্তব্যস্তভাবে বলিল:—

"না না মাঝি, আমি আজ রাত্রে কোথাও যাব না। কাল ভোর বেলা নৌকো খুলে দিও, বাবা।"

মাঝি অবাক হইল। ভাবিল, বোধ হয় সে কাল সকালবেলা নিজে একবার উঠিয়া চেষ্টা করিবে কি না, ভাবিতেছে। তা মন্দ কি? সে শুধু সঙ্গীকে বলিল, "নাও বার দে।"—অর্থাৎ বাহির জলে নৌকা বাঁধিতে বলিল।

মাঝিরা খাওয়া দাওয়া করিয়া, কাপড় মুড়ি দিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

জল স্থল সব নিস্তব্ধ। বাতাসের গতিও যেন রুদ্ধ হইয়াছে। মাঝে মাঝে তালে তালে দাঁড় ফেলিয়া দুই একখানা নৌকা এদিকে ওদিকে যাইতেছে। যামিনী ঘুমায় নাই। সে ভাবিতেছিল, এমন জনমানবশূন্য স্থানে, এই গভীর রাতে, তাহার স্বামী কি আসিবেন? যামিনীর বড় ভয় করিতেছিল। যদি তিনি না আসেন; তাঁহার বোধ হয় আসিতে ভয় করিবে। তবে তিনি ত আর তার মত অসহায়া, অবলা নহেন; পুরুষ মানুষের বোধ হয় ভয় করে না। এইরূপ কত কথাই সে ভাবিতেছিল। পঞ্চমীর চন্দ্র অস্ত যাইবার জন্য আকাশের গায়ে তাহারক্ষীণ দেহখানি হেলাইয়া দিয়াছেন। তারাগুলি যেন ভয়ে ভয়ে ঢেউয়ের সিঁড়ি বাহিয়া নদীর জলে নামিতে নামিতেছে। যামিনী তীরের দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছিল। কোনও কিছুর শব্দ হইলেই ভাবিতেছিল, এইবার তিনি আসিতেছেন। শব্দ না হইলেও মনে করিতেছে, বুঝি ঐ শব্দ পাওয়া যাইতেছে। আবার ভাবিতেছে, গুরুজন যদি জাগিয়া থাকেন, তবে ত তিনি আসিতে পারিবেন না। বোধ হয় তাঁহার আসিতে কোন বাধা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তবে বলিয়া গেলেন কেন "জেগে থেকো আমি আবার আসবো।" ঐ কটি কথা সন্ধ্যা হইতে যে সে কতবার মনের মধ্যে দারুণ আবেগে চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার সমস্ত সত্তা যেন ঐ কয়েকটী কথার মধ্যে আজ সন্ধ্যাবেলা হইতে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

যামিনী তীরের দিকে খেজুর গাছের পুঞ্জের মধ্যে অন্ধকারময় পথে তাহার স্বামীর দেহচ্ছায়া খুঁজিতেছিল। কতক্ষণে এই পথে পদধ্বনি হইবে সে উৎকর্ণ হইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। কেরোসিনের আলোকটি সে অনেকক্ষণ নিবাইয়া দিয়াছে, নৌকায় আলোক থাকিলে বাহিরের জিনিস লক্ষ্য হয় না। তাহার উৎকণ্ঠিত হৃদয়েরই মত নৌকাখানি মাঝে মাঝে দুলিয়া উঠিতেছিল। একবার মনে হইল যেন নৌকা এক দিকে কিছু হেলিয়া পড়িল। যামিনী নদীর দিকে ফিরিল। দেখিল জানালায় হাত দিয়া তাহার স্বামী। জল হইতে মাথা তুলিয়া সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি অভ্যস্ত হইয়াছিল বলিয়াই সে এত সহজে পারিল। তথাপি ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর যেন হিম হইয়া গেল।

তাহার স্বামী জিজ্ঞাসিল, "ঘুমাও নি?"

যামিনী অতি কষ্টে বিকৃত কণ্ঠে বলিল "জলে কেন? অসুখ করবে যে! উঠে আসবে না?"

অগ্রহায়ণ মাসের রাত। রাত্রিতে যথেষ্ট ঠাণ্ডা বোধ হয়। এমন গভীর রাতে কি কেউ জলে থাকিতে পারে? তবে বুঝি নৌকায় আসিতে বাধা আছে। সে যে কলঙ্কিনী, তাহার নৌকায় উঠিলে পাছে জাতি যায় বলিয়াই কি এই হিমের রজনীতে এত কষ্ট করিয়া দেখা দিতে আসা? যামিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল।

তাহার স্বামী বলিল, "কাল যশপুরে কখন পৌঁছুবে?"

"কি জানি? যশপুরে যাব না।"

"কেন? মায়ের কাছে যাও। এখানে এরা তোমায় নেবে না।"

"ওগো আমার অপরাধ কি?"—যামিনীর চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল।

উত্তর হইল, "তা কি জানি?"

"না, বলো। তোমার দুটী পায়ে পড়ি। আমি ত কারু মন্দ করি নি।"

"তোমার জাত গেছে। মাঝিদের ভাত খেয়েছ—তাদের জাত দিয়েছ।"

"তুমি কি বিশ্বাস কর?"

"না।"

"তবে আমায় এত কষ্ট দাও কেন? আমি মরি যে।"

"আমি কি করব, বল!" কণ্ঠস্বরে বিষাদের আভাস ছিল।

"এখন আমিই বা কি করি।"

যামিনী কাঁদিতেছিল। সে সরিয়া জানালার নিকট গিয়াছিল। তাহার গায়ে তাহার স্বামীর নিঃশ্বাস অনুভূত হইতেছিল। বড় ইচ্ছা যে অঞ্চল দিয়া সে তাঁহার সিক্ত মুখখানি মুছাইয়া দেয়। ভাল করিয়া ত দেখিতে পাইতেছিল না। একটু স্পর্শের দ্বারা সে অভাব পূরণ করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু পাছে তাহার অপবিত্র স্পর্শে স্বামী সংকুচিত হন, এই ভয়ে সে পারিতেছিল না।

স্বামী বলিল, "তুমি তোমার মায়ের কাছেই যাও।"

যামিনী উত্তর করিল, "তিনিই কি আমায় আর ঘরে নেবেন?"

"আমিও তাই ভাবছি।"

"ওগো বল, এখন আমি কি করব।"

"তুমি কিছু ভেবেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কি ভেবেছ?"

"মরব।"

"পারবে?"

"কেন পারব না?"

"ভয় করবে না?

"বামুনের মেয়ে মরতে ভয় করবে? আমার যে কোনও কূলেই দাঁড়াবার স্থান নেই!"

"দূর! মরতে নেই।"

"তবে কি করব? বল, তোমার পায়ে পড়ি। আমায় পায়ে রাখ; আমায় বাঁচাও।"

"আমি যা বলি পারবে?"

"হাঁ পারব।"

"ভয় করবে না?"

"না।"

"ঠিক বলছ?"

"হাঁ ঠিক বলছি।"

"তবে নেমে এস আমার সঙ্গে। তোমায় নিয়ে আমি এক যায়গায় চলে যাব।"

"কোথায়?"

"সে অনেক দূর।"

"আমি যে সাঁতার জানি নে।"

"আমি খুব ভাল জানি। এখনি পার হতে হবে; শীঘ্র এস। মাঝিরা জাগলে আর হবে না। বুঝলে?"

যামিনী আর ভাবিল না। ভাবিয়া ভাবিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আর ভাবিবার সময়ও তাহার ছিল না। সে কাপড়খানি কোমরে শক্ত করিয়া জড়াইয়া লইল, পরে জানালা দিয়া পা গলাইয়া দিল। জলের শীতল স্পর্শে তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর অনাবৃত দেহের আলিঙ্গনে সে নিজের দেহ সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দিল। যামিনীর স্বামী তাহাকে পিঠের উপর তুলিয়া, নিজের গামছার দ্বারা উভয়ের কোমরে বেশ করিয়া জড়াইল। তার পরে তাহারা তারার আলোর মাঝখান দিয়া ভাসিয়া চলিল।

* * *

পরদিন প্রভাতে কৃষকেরা দেখিল, চরের উপর দুইটি প্রাণী নিবিড় আলিঙ্গনে চিরশান্তিতে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

উচ্চশিক্ষা ও মধ্যবিত্ত সমাজ

কয়েক বৎসর হইল আমাদের দেশে এক মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে তাহা সমাজের পক্ষে সাধারণ ভাবে উপযোগী হইতেছে না। সুতরাং উচ্চশিক্ষা যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করা মধ্যবিত্ত সমাজের লোকের কর্ত্তব্য। এমন কি যে পূজ্যপাদ

আচার্য্য চিরকুমার-ব্রত গ্রহণ করতঃ প্রায় সমস্ত জীবন উচ্চশিক্ষা প্রচারে ও মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপুষ্টি করে অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহারও অভিমত এই যে, বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যুবক উচ্চশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মাড়োয়ারীদের ন্যায় বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করুক। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সমস্ত জাতির প্রত্যেকটির মধ্যে আভিজাত্য, মধ্যবিত্ত ও সাধারণ এই তিন সামাজিক স্তর বিদ্যমান। প্রচলিত ইংরাজী ভাষাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সমাজের মেরুদণ্ডরূপে কল্পনা করা হইয়া থাকে। মানুষ বার্দ্ধক্যের কত নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাহার মেরুদণ্ড পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মানবের মেরুদণ্ড সরল না থাকা যেমন তাহার দেহের ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, সেইরূপ দুর্ব্বল মধ্যবিত্ত সমাজ সমস্ত জাতির পক্ষেই অশুভচিহ্ন-বিজ্ঞাপক।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, এই সম্প্রদায় সরস্বতীকে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে স্থান দিয়াছেন। ইংরাজীতে যাহাকে culture বলা হয়, তাহা এই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ান্তর্গত এক ব্রাহ্মণই তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন যে, তিন্তিড়ী বৃক্ষের পত্র থাকিতে অন্ন গ্রহণে কখনও ব্যঞ্জনের অভাব হইবে না এবং এই শ্রেণীস্থ পতিগরবে মহীয়সী এক রমণীই কৃষ্ণনগরাধিপের মহিষীর নিকটে দরিদ্রতা-ব্যঞ্জক স্বীয় লৌহ গাত্রাভরণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। অনাড়ম্বর ভাবে জীবনযাপন ও উচ্চ বিষয়ের আলোচনার (Plain living and high thinking) আদর্শ এই দেশে যে ভাবে অনুসৃত হইয়াছিল, অপর কোনও দেশে যে সে ভাবে হয় নাই তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। "রাজা স্বদেশে পূজা পাইয়া থাকেন, কিন্তু বিদ্বানের পূজা সর্ব্বত্র, এই ভাবের শ্লোক যে দেশের সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারে, সে দেশের লোকের নিকট যে বিদ্যা ও জ্ঞানের সম্মান ধনের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষা-সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা হয়, তাহাতে অনেক সময়ে মনে হয় যে আমরা শিক্ষা বিষয়ে আমাদের প্রাচীন আদর্শ হইতে অনেক দূরে চলিয়া যাইতেছি। যদি আমরা শিক্ষার উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া গিয়া অর্থোপার্জ্জনকেই শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান সোপান বলিয়া মনে করি, তাহা জাতির ও দেশের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইবে।

সংসারে থাকিতে হইলেই যে অর্থের প্রয়োজন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বোধ হয় আমাদের দেশে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, অর্থোপার্জ্জন ও জ্ঞানের অনুশীলন এই দুইটীর পৌর্ব্বাপর্য্য কি ভাবে সূচিত হইবে? অর্থাৎ এই দুইটীর মধ্যে কোনটীর জন্য আমাদের শক্তি আমরা বিশেষভাবে নিয়োজিত করিব? যদি বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকসম্প্রদায়ের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় অধিকাংশ যুবকই অর্থোপার্জ্জনকে জ্ঞানানুশীলনের পূর্ব্বে স্থান দিবে। আমার এই অনুমান সত্য হইলে, ইহা যে অতিশয় ভয় ও ভাবনার কথা তাহার সন্দেহ নাই।

বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের আর্থিক অবস্থা যে ক্রমশঃ অত্যন্ত মন্দ হইয়া যাইতেছে তাহাও ঠিক। রোগ ঠিক বটে, কিন্তু ইহার প্রতিকারের জন্য কোনও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইলে রোগের নিদান ভাল করিয়া জানা কর্ত্তব্য। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণতঃ সমাজের এই অবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহাতে আলোচকগণ এইভাবে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অর্থকরী নহে, সুতরাং এই শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিতে হইবে; এবং তাহা হইলেই আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর হইবে। এই মত সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, যাঁহারা মনে

করেন যে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী আমাদের দারিদ্র্যের কারণ, তাঁহাদের কথা আমি বিনা আপত্তিতে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমার মনে হয় যে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের কারণ দ্বিবিধ:—স্বজাত ও তুলনামূলক। এই কথাটি একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে আজকাল সমাজের যেরূপ অবস্থা হইতেছে তাহাতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতে হইলে বিশেষ ভাবে শিক্ষার আবশ্যক। ভোগের ও সুখের এত নূতন নূতন উপায় প্রত্যহ আবিষ্কৃত হইতেছে যে, যাহারা নিজ মনোবৃত্তি উপযুক্তরূপে দমন করিতে না পারে তাহাদের জীবন অত্যন্ত দুঃখময় হইয়া পড়ে। আমাদের দেশ খুব ধনী নহে। এই দেশে সংসারে প্রবেশ করিবার সময় যে অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থ অপর দেশের যুবকের প্রয়োজনীয় অর্থ অপেক্ষা যে কম তাহাতে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু ইহাও অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত যুবক জ্ঞানের অনুশীলনকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রধানতঃ অর্থের অনুসন্ধানে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছেন। এইরূপ অবস্থার কারণ কি? আমার বোধ হয় দুর্দ্দমনীয় অর্থোপার্জ্জন-স্পৃহাই এই অবস্থার প্রধান কারণ। দেশে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে একদল ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত যুবক এই সমস্ত ধনীকে তাঁহাদের আদর্শ বলিয়া মনে করেন, এবং সেই আদর্শের তুলনাতে, নিজদিগকে আদর্শ হইতে অনেক দূরে দেখিয়া বিশেষ কষ্ট অনুভব করেন এবং সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব ভাবে আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। কোনও সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়েন। তখন জ্ঞানানুশীলন পশ্চাতে পড়িয়া যায়, আত্মোন্নতি ও লোকশিক্ষার কথা মনে থাকে না, কি ভাবে নিজের ও পরিবারের আর্থিক উন্নতি হইবে তাহাই ভাবনার বিষয় হইয়া পড়ে। আমার মতে, আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে তুলনামূলক যে দরিদ্রতা বর্ত্তমান আছে ইহা তাহাই। এই প্রকার দারিদ্র্য ব্যতীত আমাদের সমাজে আরও একপ্রকার দরিদ্রতা দেখা দিয়াছে, যাহার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী এবং যাহা দূর করিতে হইলে আমাদের সামাজিক সংস্কার বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। আমার বোধ হয় যে বর্ত্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে যে অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে উপার্জ্জনে অক্ষম ব্যক্তির বিবাহই তাহার মধ্যে প্রধান। পূর্ব্বে যখন প্রতিবৎসর ৬০ কি ৭০ জন করিয়া এম-এ উপাধিধারী যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া বাহির হইতেন, তখন অর্থোপার্জ্জনে তাঁহাদের যতখানি সুবিধা ছিল, বর্ত্তমান সময়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকগণের ততখানি সুবিধা নাই তাহা ঠিক। কিন্তু এখনও দেশের এমন অবস্থা হয় নাই, বা বোধ হয় কোনও সময়ে এরূপ অবস্থা হইবে না, যাহাতে একজন শিক্ষিত যুবক নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পায় যে, তাহার উপর এক পরিবারের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহাতে সে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আশা, উদ্যম ও সাহস তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায়। সে নিজের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কোনও নূতন কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে না। সমাজের এই অবস্থা যতদিন থাকিবে ততদিন সমাজ হইতে দারিদ্র্য দূর হইবে না। সুতরাং সমাজকে যদি শক্তিশালী ও কার্য্যপটু করিতে হয়, তাহা হইলে সমাজের এই সমস্ত গ্লানি দূর করা কর্ত্তব্য। সমস্ত গ্লানি দূর হইলে সমাজে আবার সুখ ও শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। রোগের প্রকৃত কারণ না বুঝিয়া যদি যুবকদিগকে উচ্চ শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হইবে না। আমাদের সমাজের যে অনেক দোষ আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই সমস্ত দোষ যাহাতে

সমাজ হইতে লোপ পায় সেই জন্ত আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। দেশের আশা ও ভরসাস্থল যুবকদিগকে শিক্ষিত ও চরিত্রশালী করিতে হইবে। তাহাদিগকে জ্ঞানের অনুশীলন ও লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানাং ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

সদাচার

কোন মার্কিণ মনীষী বলেন—"সুন্দর মুখ অপেক্ষা সুন্দর গঠন ভাল, আবার সুন্দর গঠন অপেক্ষা সুন্দর আচার ব্যবহার ভাল। ভাস্কর-খোদিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি বা সুন্দর ছবি দেখিলে মনে যে আনন্দ হয়, উহাতে তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে।" ইহা প্রাচীন হিন্দুরা বিলক্ষণ বুঝিতেন। সূর্য্যচন্দ্র-সমন্বিত তারকাখচিত সুবিস্তৃত ও সমুজ্জ্বল আকাশের ন্যায় তাঁহাদের শাস্ত্র সকলের সমক্ষে পড়িয়া আছে। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে পড়িয়া এক প্রকার অন্ধ হইয়া আছি। আমাদের দেহ মন আত্মা কলুষিত হইয়াছে। পিতৃমাতৃ ভক্তি, দাম্পত্যপ্রীতি, স্বজন-প্রীতি, বন্ধু-প্রীতি প্রভৃতি যে সব সদাচারের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, আমরা সে সব একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; শুদ্ধ তাহা নহে—মন হইতে ঐ সকল ধুইয়া মুছিয়া কেবল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র "আমিত্ব" টুকু লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা সদাচার-ভ্রষ্ট হইয়া লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি। "দশ শ্রোত্রিয় অপেক্ষা এক আচার্য্য, দশ আচার্য্য অপেক্ষা এক উপাধ্যায়, দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা এক পিতা এবং দশ পিতা বা সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা এক মাতা গুরুতর বলিয়া গণনীয়া হন। মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই।" (মহাভারত) আমরা আর এখন আমাদের পিতা মাতাকে ঐরূপ চক্ষে দেখি না। "পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং অন্যান্য গুরুজনের সেবায় ব্রহ্মলোক পরাজিত করা যায়। * * * যাঁহারা উঁহাদিগকে সমাদর না করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত কার্য্যই বিফল হয়; এবং তাঁহারা কি ইহলোক কি পরলোক কোন স্থানেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন না।" (মহাভারত)—আমরা এখন এ সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি।

"ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধন সময়ে একমাত্র সহায়। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরমধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। ভার্য্যার তুল্য পরমবন্ধু আর কেহই নাই। ধর্ম্ম সংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই পুরুষের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া থাকে।" (মহাভারত)—আমরা আর এখন আমাদের স্ত্রীকে এরূপ চক্ষে দেখি না।

"স্ত্রী জাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, উপবাস, কিছুই অনুষ্ঠান করিতে হয় না। উহাদের স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম। তাঁহারা সেই ধর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারেন।" (মহাভারত) "যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পিতা, মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহই নাই। পতিই স্ত্রীর পরম দেবতা।" (রামায়ণ)

—এখন স্ত্রীজাতি আর স্বামীকে শ্রদ্ধা[illegible]ক দেখে না।

"এখন ধর্ম্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন ধার্ম্মিক বৃদ্ধ সভাসদ্‌গণ ধর্ম্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলে যুবকগণ তাঁহাদের প্রতি উপহাস ও ঈর্ষা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট যুবকগণের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ অভ্যুত্থান, ও অভিবাদন দ্বারা তাঁহাদের সম্মান করে না। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্র প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অনেকে বেতন ব্যতীত দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক নির্লজ্জ হইয়া আপনাদের নাম প্রখ্যাপিত করিতেছে এবং ধর্ম্মহীন গর্হিত কার্য্যদ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। * * পুত্র পিতার ও স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা অতিক্রম করিতেছে। সকলেই সন্তান পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। মাতা, পিতা, গুরু, বৃদ্ধ, আচার্য্য ও অতিথিদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। ভিক্ষা প্রদান এবং দেবতা, অতিথি ও গুরুদিগের সৎকার না করিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের পাচকেরা সর্ব্বদা অশুচি হইয়া পাক করে। ও তাহারা গুরুজনের নিষেধ না শুনিয়া পাত্রনিবদ্ধ ও অনাচ্ছাদিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের ধান্য সমুদয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ ও দুগ্ধ অনাবৃত হইয়া কাক ও মূষিকের উচ্ছিষ্ট হইতেছে। তাহারাও উচ্ছিষ্ট হস্তে ঘৃত স্পর্শ করে। তাহাদের গৃহিণীগণ কুদ্দাল, দাত্র, পেটক, কাংস্যপাত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ সমুদয় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ থাকিলেও তৎসমুদয় উপেক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীর বা গৃহ ভগ্ন হইলেও কেহই আর তাহার সংস্কার করে না। সকলেই পশুদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে তৃণজল প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয় এবং ভৃত্যবর্গ ও সম্মুখস্থ বালকদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষ্যবস্তু ভোজন করে। তাহারা বৃথা মাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স পিষ্টক প্রভৃতি পাক করাইয়া থাকে। সূর্য্যোদয় হইলেও কেহই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে না। তাহাদের প্রতি গৃহে দিবারাত্র কলহ হইতেছে। উপবিষ্ট মান্য ব্যক্তিকে কেহই আর সম্মান করে না। * * শৌচানুষ্ঠানে কাহারও আস্থা নাই। সকলের মধ্যেই জাতি-সঙ্করের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইতেছে। দাসীগণ দুর্জ্জনাচরিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া হার বলয়াদি বিবিধ আভরণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ বেশ ও পুরুষেরা স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া বিহারাদিতে মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। কাহারও কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে, সে অতি বিশ্বাসের পাত্র, মিত্রের উপর সন্দিহান হইয়া তাহারে সেই দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। অনেকে অতি অল্প মাত্র ধনদ্বারা সমুদ্রসমুত্থানে প্রবৃত্ত হইয়া মিত্রগণের অপরিমিত ধন অপহরণ করিতেছে। * * শিষ্যেরা গুরুসেবায় পরাঙ্মুখ হইয়াছে। গুরুগণ শিষ্যের সহিত সখাব্যবহার করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা মাতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব প্রদর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদের নিকট দীনভাবে আহার প্রার্থনা করিতেছেন। * * * কুলবধূরা শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমক্ষেই ভৃত্যগণের শাসন ও স্বামীকে আহ্বান পূর্ব্বক গর্ব্বিত ভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করে। পিতা অতি যত্ন সহকারে পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। অনেকে ক্রোধভরে ধন বিভাগ পূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অতিকষ্টে অবস্থান করিতেছেন। কোন ব্যক্তির ধন রাজা বা তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত বা অগ্নিদাহে দগ্ধ হইলে তাহার বন্ধু বান্ধবগণও বিদ্বেষ প্রভাবে তাহার প্রতি উপহাস করে। বিশেষতঃ সমুদয় লোকই কৃতঘ্ন, নাস্তিক, পাপাত্মা, অভক্ষ্য ভক্ষণে অনুরক্ত, নিয়ম বিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।" (মহাভারত)—লোকে এইরূপ অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়াতে, ভগবতী লক্ষ্মী, পুরাকালে দানবদিগকে যেমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাদিগকেও সেইরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাও তদনুরূপ হইয়াছে। তাহা উপরেই বর্ণিত হইল।

অসাধু, কদাচার ও দুর্ম্মুখ। সাধু ব্যক্তিরা সুশীল ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। মানবগণ কেবল সদাচার বলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান ও যশস্বী হয়। স্বীয় মঙ্গল কামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ।

সদাচার মানব হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গুণের ছায়া। সদাচার চরিত্র সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি। সদাচার আমাদের কর্ম্মের ভূষণ। ইহা দ্বারা আমাদের অতি সামান্য কার্য্যও অতি সুন্দররূপে সংসাধিত হয়। ইহা আমাদের জীবনের কর্ম্ম সকল নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিতে প্রচুর সহায়তা করে এবং আমাদের সামাজিক জীবন সুমিষ্ট করিয়া তুলে। ইহা আমাদিগকে জগতে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের পথে লইয়া যায়। অকপট, প্রীতিময়, কমনীয় ব্যবহার আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে শ্রেষ্ঠতম সহায়। উহার অভাবে অনেকেই জীবনে কোন বিষয়ে কোন প্রকার সাফল্য লাভ করিতে পারেন না। রূঢ় ও কর্কশ স্বভাব, মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। সদয় ও সদ্ব্যবহারে মানব হৃদয়ের অর্গল-বদ্ধ দ্বার সকল সময়েই স্বতঃই খুলিয়া যায়। সে ব্যক্তি তখন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলের হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়।

সদাচার মানুষের চরিত্র দেখাইয়া দেয়। উহা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির বাহ্যিক নির্দ্দেশক বৃত্তি। উহা তাঁহার রুচি, তাঁহার অনুভূতি, তাঁহার মনের গঠন ও তিনি কিরূপ সংসর্গে অভ্যস্ত তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়।

সদাচারের মাধুর্য্য ও কমনীয়তা মানব মনের ভাবা-বেগ হইতেই অনুপ্রাণিত হয়। মার্জ্জিত হৃদয় মানবের পক্ষে ভাবাবেগ প্রবণতা উপেক্ষার বিষয় নহে। উহা তাঁহার ধীশক্তি, বিদ্যা বা জ্ঞানের ন্যায় সমান প্রয়োজনীয়। উহা তাঁহার রুচি ও চরিত্রের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করে।

সমানুভূতি অন্যের হৃদয় খুলিয়া দেয়। ইহা মানবকে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে। ইহা বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিরোভূষণ।

ভদ্রতা, শিষ্টতা, সহৃদয়তা সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। অপরের প্রতি আমাদের আন্তরিক সম্মান অকপট ভাবে বাহিরে দেখানই ভদ্রতা। অকৃত্রিম ভদ্রতা সারল্য-ব্যঞ্জক। উহা হৃদয়োদ্ভূত না হইলে কাহারও চিত্তাকর্ষক হয় না।

প্রকৃত শিষ্টতা মানব হৃদয়ের সদয় ভাব। উহা অন্যের হৃদয়ের সুখ বর্দ্ধন করে। উহা প্রীতিকর ও মধুর বন্ধুভাবাপন্ন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা ধনী বা জ্ঞানী বা সমধিক সমুন্নত ইহা কদাচ অপরকে দেখান না বা কোন প্রকার ভাণ করেন না। তাঁহার পদমর্য্যাদা, তাঁহার জন্ম, বা তাঁহার স্বদেশ লইয়া কোন প্রকার গর্ব্ব প্রকাশ করেন না। তাঁহার মত অনন্যসাধারণ সুবিধা বা খ্যাতি পান নাই বলিয়া অপরকে কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না; বা কথা কহিবার সময়েও তাঁহার কোন অবদান লইয়া কোন প্রকার দর্পোক্তি করেন না। পক্ষান্তরে যাহা তিনি বলেন, বা করেন, তাহাতেই তিনি ধৃষ্টতা বা দাম্ভিকতা-শূন্য ও বিনীত। অন্যের অনুভূতির প্রতি অনাদর স্বার্থ-পরতার পরিচায়ক, ইহা নিতান্ত কঠোর ও রূঢ়—ইহা তিনি বিলক্ষণ জানেন।

সদাচার সম্পন্ন সাধু সত্যের আধার। আপনার কার্য্যে আপনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি কোন ব্যক্তির, বা কাহারও মতামতের অধীন না হইয়া নিজের ব্যবহারেই আপনাকে প্রকাশ করেন। ঐ ব্যক্তি-গত শক্তি ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসিতেছে; আজও উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সৎ সমাজের চলন্ত জনতার মধ্যেও সেই নির্ভীক সত্ত্ববান পুরুষকে সকলেই চিনিতে পারে; তিনিও তাঁহার প্রকৃত স্থানে গিয়া উঠিয়া বসেন। তিনি যেখানেই থাকেন, তথায় তাঁহার বিধি প্রচলিত হয়। যুদ্ধস্থলে কর্ম্মপ্রবীণ, অভিজ্ঞ সেনাপতিকে অতিক্রম করেন। সমাজে বা

কর্ম্মস্থলে বিনয় ও শিষ্টাচারে অধিকতর প্রভা বিকীর্ণ করেন। তিনি বিবৎ সমাজের সভ্য হইতে, দস্যু পর্য্যন্ত সকলেরই উৎকৃষ্ট সহচর। তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। তিনি সকলেরই অন্তঃকরণে গুপ্ত ভাবে প্রবেশ করেন; তিনি কখনই চাতুরী খেলেন না। সর্ব্বদা অকপট ভাবে সোজা পথেই চলিয়া থাকেন।

শিষ্টাচার জীবন যাপনের বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দিয়া তাহাকে সহজ করিয়া তুলে এবং মানবহৃদয় নির্ম্মল করিয়া তাহাকে উন্নমশীল করে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একদা ঐশ্বর্য্য ও শৌর্য্যের লীলা-নিকেতন দিল্লীতে গিয়া পহুঁছিলাম, কিন্তু আবাস স্থান খুঁজিয়া লওয়া এক দায় হইয়া উঠিল। ইংরাজী কেতার হোটেল সে দিনেও অনেক কয়টি সহরে ছিল, কিন্তু নানা কারণে তথায় যাওয়া কেহই সঙ্গত বোধ করিলেন না। ষ্টেশনের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম; অনেক হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া, দিল্লীর বাঙ্গালী ডাক্তার প্রসিদ্ধ হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে যাইবার কথা বলিল। এলাহাবাদে একবার গুডম্যান কোম্পানীর বাবুদের অতিথি হইয়া "পরস্মৈপদে" কয়দিন কাটান গিয়াছিল। ব্যাকরণে পরস্মৈপদী ধাতু রূপ করার ক্লান্ত ইলও সহজ বটে, কিন্তু সর্ব্বথা এবং সর্ব্বদা ইহা করণীয় কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাই হেমবাবুর শরণাপন্ন হওয়া সঙ্গত মনে হইল না। একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম, ষ্টেশনের নিকটেই মৌর সরাই নামক একটি সরাইখানা এবং সেখানে ভদ্রলোক থাকিবার মত ব্যবস্থা আছে এবং নিজেরাই আহারাদির অনুষ্ঠান করিয়া নিজের পাচক দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। সুপকার ঈশান এবং অনুচর নবীন যাহার সহায়, তাহার নিকট মৌর সরাই ভীতিপ্রদ হইবার কোন কারণ নাই, সুতরাং আমরা সেইখানেই গেলাম। কুলিরা জিনিষপত্র—হিন্দুস্থানীরা যাহাকে "সামান্" বলে—সে সমুদয় সরাইয়ে লইয়া গিয়া, যথা-সম্ভব সত্বরতার সহিত বাহির করান হইল। পশ্চিমের প্রায় সর্ব্বত্রই তরী তরকারী ফল মূলের অসদ্ভাব নাই, পর্য্যাপ্তই পাওয়া যায় এবং বাঙ্গালা দেশের ঐ সকল সামগ্রী অপেক্ষা পশ্চিমের ফল মূল, তরকারীর স্বাদও অপেক্ষাকৃত ভাল। নবীন ও ঈশান হাট বাজার করা এবং রন্ধন ব্যাপার সমাপ্ত করিল; আমরা স্নান শেষ করিয়া জঠরস্থ অগ্নি দেবতার তৃপ্তিহেতু, উদরের হোমানলে আহুতি প্রদান করিয়া ভ্রমণার্থ সত্বর প্রস্তুত হইয়া লইলাম।

আজ দিল্লী সহরে ভদ্র মোটরকারের অভাব নাই, পর্য্যাপ্ত টেক্সির নিয়ত বিষাণ ধ্বনি লোককে ক্ষণে ক্ষণে চমকাইয়া তুলিতেছে, কিন্তু সে দিনে বদ্ধ গাড়ী-বা কষ্টে সংগৃহীত দুই একখানি ভিক্টোরিয়া ছাড়া এবং সেই বহু পুরাতন সনামখ্যাত একা ব্যতীত আর কিছুই মিলিত না; আমরা কষ্টে একখানি ভিক্টোরিয়া সংগ্রহ করিলাম। প্রাসাদ দুর্গ বা কেল্লা দেখিতে হইলে "পাসের" প্রয়োজন হইত, এবং সেকালে পাস দিতেন দিল্লীর শেষ বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের দূর-সম্পর্কিত একটি অভিজাত

মুসলমান ভদ্রলোক। প্রাচীন মুসলমান সৌজন্য যে কিরূপ ছিল তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন আমি সেই দিনে প্রথম পাইয়াছিলাম। আমাদের শকটচালকই আমাদের পথ-প্রদর্শক এবং সেই আমাদিগকে পাসের জন্য মুসলমান ভদ্রলোকের বাটীতে লইয়া গেল। সদর দরজায় গাড়ী রাখিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে ভৃত্যের উদ্দেশে ডাকিতে লাগিলাম—"নওকর কোই হ্যায়?" কিছুকাল পরে একটি ভৃত্য আসিয়া মুসলমানী কায়দায় অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। আমার উর্দ্দু ভাষায় যে পরিমাণ অধিকার, তাহারই সাহায্যে কোন প্রকারে আমাদের আগমনের কারণ তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম; সে পুনরায় অভিবাদন করিয়া, অতি পরিষ্কার কণ্ঠে বিশুদ্ধ উচ্চারণে খাস দিল্লীর উর্দ্দুতে আমাকে গৃহপ্রবেশ করিতে অনুরোধ করিয়া, বিনীত ভাবে অগ্রে অগ্রে পথ প্রদর্শন করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল এবং বাহিরের একটি সজ্জিত কামরায় আমাকে বসাইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অপরাপর মুসলমান-প্রধান স্থানের উর্দ্দুর সহিত বহুল পরিমাণে ফার্সী শব্দ মিশ্রিত থাকে এবং সেইজন্য ঐ সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তিহীন বাঙ্গালীর পক্ষে উহা সময়ে সময়ে দুর্ব্বোধ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দেখিলাম দিল্লীর উর্দ্দু তেমন নহে, হিন্দী কথা এবং অনেক সময়ে সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ শব্দ অনেক উহাতে মিশ্রিত থাকায় সাধারণের পক্ষে উহা দুর্ব্বোধ্য হয় না—দিল্লীর উর্দ্দুর নাকি ইহাই বৈশিষ্ট্য। একথা সত্য কিনা আমি জানি না, আমার ইহা শুনা কথা। যাঁহারা ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং বহুবার দিল্লী লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার মীমাংসার যোগ্য পাত্র। যাহা হউক, কিছুকাল অপেক্ষা করিতেই, একটি অসামান্য রূপবান যুবা পুরুষ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সহাস্য বদনে আমাকে অভিবাদন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, আমার পার্শ্বে আর একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। দেখিলাম যুবকের গণ্ডদ্বয়, ললাট, চিবুক পদ্ম কিংবা গোলাপের আভা বিশিষ্ট, করতল হইতে যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এবং বর্ণ, স্বর্ণকেও পরাজিত করিয়াছে। পুরুষ এত সুন্দর হইতে পারে পূর্ব্বে আমার সে ধারণা একেবারেই ছিল না। ভদ্রলোকের কথা কহিবার কি সুন্দর ভঙ্গী, ভাষায় কি অবাধ লীলায়িত গতি, কণ্ঠস্বরেরই বা কি মিষ্টতা! খাস দিল্লীর উর্দ্দুতে তিনি কথা কহিতেছিলেন, আমার মনে হইতেছিল যেন অতি মধুর সঙ্গীতধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। ফরাসী ভাষা আমি জানি না, শুনিয়াছি ফরাসী দেশে ভদ্রলোকের আলাপ শুনিলে শ্রোতার মনে হয় যেন সে সঙ্গীত শুনিতেছে। আমি তাহা শুনি নাই, কিন্তু অভিজাত বংশের মুসলমান ভদ্রলোকের মুখে দিল্লীর উর্দ্দু যাহা শুনিলাম, সে ভাষা হয়ত ফরাসী ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট না হইতে পারে। তদবধি আজ পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোকের কথোপকথন শুনিয়াছি। এই ভাষার সাহায্যে বিনয়, শিষ্টাচার, নম্রতা প্রভৃতি যেরূপ প্রকাশ করা যায়, আবার ক্রোধ প্রকাশ করিতে হইলে কিংবা শ্রোতার মনে বীর-ভাবের উদ্দীপনা করাইতে হইলেও এভাষা অতুলনীয়; বোধ করি ভারতবর্ষের অন্য কোন ভাষাই ঐরূপ প্রয়োজনে ইহার সমকক্ষ নহে। আমি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মোহমুগ্ধের ন্যায় সেই সম্ভ্রান্ত মুসলমানের কথা শুনিতেছিলাম, তাঁহাকে আমার আগমনের প্রয়োজন জানাইতে প্রায় বিস্মৃতই হইয়া গেলাম। আমার যখন কথা কহিবার সময় আসিল, তখন বেহারী ও পুরবিয়া বেহারার নিকট হইতে শিক্ষা করা আমার হিন্দী তাঁহার সমক্ষে বাহির করিতে বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছিল। কিন্তু উপায় নাই। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, বাঙ্গালা বুঝিবেন না, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আমার কদর্য্য ও ভ্রমপূর্ণ এবং অশুদ্ধ উচ্চারণের হিন্দীই বলিতে হইল। না ছিল তাহাতে শুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, না ছিল তাহাতে ব্যাকরণ, কোন প্রকারে কর্ত্তক বা কথায় কর্ত্তক বা মুখভঙ্গী এবং

হস্ত পদাদির চেষ্টায় মনের আভপ্রায় তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম আনাইয়া কার্ডতে কি লিখিয়া দিলেন। বলিলেন, ইহা প্রাসাদ-দুর্গের দ্বারদেশে রক্ষী সিপাহীকে দিলেই সে যথাকর্ত্তব্য করিবে, আমাকে আর কোন বেগ পাইতে হইবে না। বিদায় কালে তিনি দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন এবং দিল্লীতে যদি আর কিছু প্রয়োজন সাধন করিয়া দিতে পারেন তবে বড়ই আনন্দিত হইবেন, ইহা তাঁহার অনন্নুকরণীয়, অনিন্দ্য উর্দ্দুতে এবং সহজাত শিষ্টতার সহিত আমাকে বারংবার জানাইলেন। আমি অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলাম। দুর্গনাথ সংযোজিত শকট আমাকে লইয়া দুর্গদ্বার অভিমুখে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, আমার কর্ণকুহরে শেষ নরপতি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের বংশোদ্ভব সম্ভ্রান্ত যুবকের মুখোচ্চারিত দিল্লীর দেওয়ান খাস রঙ্গমহলের অতি বিশুদ্ধ উর্দ্দুর মধুর সঙ্গীত যেন তখন ধ্বনিত হইতেছিল।

প্রাসাদ দুর্গের দ্বারদেশে গাড়ী পহুঁছিবার পূর্ব্বেই চুড়িদার পায়জামা ও আচকান পরিহিত একটি অর্দ্ধবয়স্ক মুসলমান, কোচমানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল "Want a guide, sir?" আমি দেখিলাম লোকটির মস্তকে শুভ্র পাগড়ী অতিসুন্দর করিয়া বাঁধা, সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রবস্ত্রে আবৃত এবং তাহার গুম্ফ শ্মশ্রুও বহুল পরিমাণে শুভ্র হইয়াছে; মুখ দেখিলে বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়। আমি তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম "Yes, of course." সে অবিলম্বে গাড়ীর কোচবাক্সে উঠিয়া বসিল এবং পাস খানি আমার নিকট হইতে চাহিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিল। বিনা আয়াসে গাইড পাইয়া আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম, কারণ এই সকল বাদশাহী কেল্লার বিরাট পাষাণ স্তূপের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইলে ঐ সকল স্থানের মোটামুটি ইতিহাস জানে এমন একজন পথপ্রদর্শক অতি আবশ্যক, এ জ্ঞান আমার আগ্রার এবং ফতেপুরে হইয়াছিল। মীর-খাঁ গাইডকে না পাইলে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে, সেকেন্দরায় এবং ফতেপুরে আমি নিঃসহায় অবস্থায় কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে বা জানিতে পারিতাম না।

গাড়ী দুর্গদ্বারে পহুঁছিলে দেখিলাম সসজ্জীন আগ্নেয়াস্ত্র স্কন্ধে স্থাপন করিয়া গোরা সৈন্য বিশাল তোরণ সম্মুখে সদর্পে পাদচারণ করিতেছে। গাইড নামিয়া গিয়া তাহার হস্তে পাসখানি দিল, সে হস্তের ইঙ্গিতে পাশের একটি ক্ষুদ্র কামরা দেখাইয়া দিলে, গাইড সেই দিকে চলিয়া গেল; সেখানে একজন কেরাণী গোছের মুসলমান ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তিনি ঐ পাস লইয়া গাইডকে কি বলিলেন জানি না, গাইড ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল "Come, sir." আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিশাল তোরণদ্বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

দিল্লীর এই প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে মানসিংহ জয়সিংহ প্রভৃতি রণকুশল রাজপুত নৃপতির, দিলীর, ডাহবার প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতির হৃৎকম্পন উপস্থিত হইত। যে প্রবেশ পথে শিবাজীর ন্যায় ছত্রপতি সম্রাটেরও পদক্ষেপ মন্থর হইয়া পড়িত, খসরু, খুরম্ প্রভৃতি রাজকুমারগণ সভয়ে যে পথে প্রবেশ করিতে কম্পিত কলেবর হইত, কালবশে আজ সামান্য সৈনিক তাহার হস্তের ইঙ্গিতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ব প্রকার মনুষ্যকে অনায়াসে তথায় প্রবেশাধিকার দিতেছে দেখিয়া আমার মনে তখন কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা কি প্রকাশ করিয়া বলা যায়? এই ভারতবর্ষে পৃথু অম্বরীষ মান্ধাতা, যযাতি, যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ রঘু, রামচন্দ্র, রাবণ প্রভৃতি বহু রাজচক্রবর্ত্তীর সাম্রাজ্যের পতন অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। জগৎ সংসারের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এবং ভারতীয়গণের অন্তরে অন্তরে এই পরিণামের কথা পাষাণে অঙ্কিত লেখার ন্যায় গভীর রূপে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। পুরাণ বর্ণিত এই সকল প্রাগৈতিহাসিক যুগের বসুন্ধরাধিপ-গণের কথা ছাড়িয়া দিলে, ঐতিহাসিক যুগের মোগল পাঠান বংশের দিল্লীশ্বরগণের পতনের ন্যায় পতন-বার্ত্তার

উদাহরণ ইতিহাস খুঁজিয়া দ্বিতীয় আর একটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পাঠানের তিনশত বৎসরের সুদৃঢ় সিংহাসন বাবরের এক ফুৎকারে পাণিপথে কাটিয়া গেল। সেই বিজয়দৃপ্ত বাবরের পুত্র হুমায়ুন কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বিতাড়িত হইয়া ভারতসীমার বাহিরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আকবর শাহের প্রাণপণ চেষ্টায় যে বিশাল উত্তরাপথ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, যে মোগলের গৌরব গরিমা ধনৈশ্বর্য্য ও শৌর্য্য বীর্য্যের কথা উপন্যাসের কাহিনীর মত সমগ্র জগতে একদিন প্রচারিত হইয়াছিল, আকবর শাহের পরে তিন পুরুষ গত হইতে না হইতেই বাহ্লিক হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য ধূলি-মুষ্টির ন্যায় কোথায় উড়িয়া যাইতে লাগিল, এবং ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট দিল্লীশ্বরগণের বংশধরগণ আততায়ী শত্রুর হস্তে উৎপাটিত-চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া কিরূপ দীনভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন সে কথা ভাবিলে এমন ভারতবাসী নাই যে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে। নামমাত্রাবশিষ্ট দিল্লীশ্বরগণের যে নামটুকু ছিল, কুক্ষণের সিপাহী হাঙ্গামায় তাহাও গেল; দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ বাহাদুরের পলায়নপর কুমারদ্বয় সামান্য সেনানীর হস্তে প্রকাশ্য রাজপথে কুক্কুরের ন্যায় নিহত হইবার সময়ে তাহাদের রক্ষাকল্পে দিল্লীর জনসঙ্ঘের মধ্যে একজনের একখানি হস্তও উঠিল না। অথচ একদিন ছিল, যখন এই হতভাগ্যদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের এক ইঙ্গিতে বহুলক্ষ তরবারি সূর্য্যকিরণে ঝলসিয়া উঠিত। কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টচক্রের এরূপ পরিবর্ত্তনই সংঘটিত হয়। সেই জন্য

"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

ইত্যাদি মহাবাক্যগুলি ভারতবাসীর অন্তরের স্তরে স্তরে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। অতীতের অযোধ্যা মথুরা ও মায়াপুরী কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারাবতী আজ কোথায়? সে দিনের রাজাধিরাজগণ এবং তাঁহাদের রাজ্যের সে ধন সম্পদ, গৌরব গরিমা, শৌর্য্য বীর্য্য ও জনবল আজ কাল-সাগরে জল বুদ্বুদের ন্যায় কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! আবার বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা সৌভাগ্য সমন্বিত জাতি সমূহের বিলয়ের ইতিহাস ভবিষ্যতে কি ভাবে লিখিত হইবে, তাহা যিনি সর্ব্বলোকের, সর্ব্বজনের ও সর্ব্ববিষয়ের ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তিনিই জানেন। মানুষের সুদূর কল্পনারও যাহা অতীত, তাহাই ঘটিয়া থাকে। কি সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বনে একের অভ্যুদয় এবং অপরের পতন ঘটিয়াছে বা ঘটিবে তাহা কেহই পূর্ব্বে বুঝিতে বা দেখিতে পায় না। তরায়ণের বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে পৃথ্বীরাজের দেহের ও রাজ্যের অবসান হইবে তাহা স্বপ্নাতীত ছিল; পাণিপথে বাবরের সৌভাগ্যোদয়ও সেইরূপই কল্পনাতীত ব্যাপার। পাঠানের দিল্লীনগর ও টোগলকাবাদ যে জীর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? এবং শাজাহানের রক্ত-পাষাণ প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাসাদ দুর্গের মর্ম্মর নির্ম্মিত বিচিত্র কারু-খচিত সৌধাবলী যে সপ্তসাগর বেষ্টিত ধরণীর সর্ব্ব প্রকার মানব মানবীর দর্শন-কৌতূহল মাত্র নিবারণের জন্য কোন মতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাই বা কবে কে চিন্তা করিয়াছে?

এইরূপ নানা ভাব-তরঙ্গ মনের মধ্যে আসিয়া তোলপাড় করিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে আমার গাইডের সঙ্গে কেল্লার অভ্যন্তরস্থ সৌধাবলী দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দিল্লী আগ্রার প্রাসাদে দর্শনীয় বস্তু প্রচুর রহিয়াছে। রক্ত পাষাণ এবং শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত সৌধ সমূহের প্রত্যেকটিই দেখিবার সামগ্রী। বর্ত্তমানে যাহা আছে, তদপেক্ষা শুনিতে পাই আরও ছোট বড় অসংখ্য ইমারত ছিল। জাঠগণের লুটের সময়ে এবং নাদির শাহের আক্রমণ কালে নাকি বহু সুন্দর সুন্দর সৌধ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দিল্লীর দুরন্ত গ্রীষ্মতাপ নিবারণের



দেওয়ান-ই-খাস্, দিল্লী

জন্ত না'কি প্রাসাদ চত্বরে এবং ঘরে ঘরে সওয়া লক্ষ জলযন্ত্র (ফোয়ারা) ছিল, এককালে সেই সমস্ত জলযন্ত্র হইতে উৎসারিত জলধারা শুনিয়াছি দুঃসহ গ্রীষ্মতাপকে প্রশমিত করিয়া প্রাসাদ দুর্গকে বাদশাহের বাসযোগ্য করিয়া দিত। "শাওন ভাদো" (অর্থাৎ শ্রাবণ ভাদ্র) নামক একটি শ্বেত-মর্ম্মর নির্ম্মিত ঘর দেখিলাম, তাহার ছাদ স্তম্ভ ও গৃহতল সমস্তই উৎকৃষ্ট মাকরাণা মর্ম্মরে প্রস্তুত। শুনিলাম নিদাঘে শ্রাবণের ধারাপাতের শৈত্য অনুভব করিবার জন্ত যমুনার জল কৌশলে সৌধশিরে তুলিয়া, যন্ত্র সাহায্যে বর্ষার ধারার ন্যায় গৃহের চতুর্দ্দিক দিয়া তাহাকে ফেলান হইত এবং ছাদের উপরে একরূপ কৃত্রিম



দেওয়ান ই-খাস ও ময়ূর সিংহাসন, দিল্লী

শব্দ হইবার বন্দোবস্ত ছিল, যাহা মেঘ গর্জ্জনের অনুরূপ বলিয়া মনে হইত। ধনৈশ্বর্য্য এবং জনবলে সেকালে শারীরিক সুখ সম্ভোগ যতদূর হইতে পারিত, মোগল বাদশাহগণ তাহার চরম করিয়াই গিয়াছেন। দিল্লীর "দেওয়ানে খাস্" ও "দেওয়ানে আম"-এর বহু বর্ণনা বহু স্থানে রহিয়াছে এবং ঐ দেওয়ানে খাস্ ও দেওয়ানে আম যখন সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ ছিল তখন যাঁহারা স্বচক্ষে ঐ সকল দেখিয়াছেন, সেইরূপ ভ্রমণকারী এবং ভিন্ন দেশীয় রাজদূতগণের বর্ণনায় যাহা আছে, তদ্রূপ বর্ণনা আজ অসম্ভব। সৌধশীর্ষ সংলগ্ন স্বর্ণখচিত রৌপ্যের চন্দ্রাতপ, তাহাতে মুক্তার ঝালর, বহুমূল্য প্রস্তর খচিত এবং বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত শ্বেত মর্ম্মরের স্তম্ভ সারি এবং অপরূপ কারুসৌন্দর্য্য-সমন্বিতগৃহ কুট্টিম, শ্বেত মর্ম্মরের উচ্চ বেদিকার

উপরে জগৎপ্রসিদ্ধ এবং ধরণীর বিস্ময় স্বরূপ "তক্তে তাউস্," তদুপরি বিচিত্র বেশভূষা-সমন্বিত, ওমরাহ পরিবেষ্টিত, স্বর্ণ-রত্ন একাতপত্র অধীশ্বর দিল্লীপতি শাহানশাহ বাদশাহ সমাসীন,——দেওয়ানে খাসের গৃহতলে বসিয়া মুদ্রিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন হইয়া মানস চক্ষে এই দৃশ্য কতক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছিলাম তাহা আমার মনে নাই। গাইডের ডাকে আমার ধ্যানভঙ্গ হইল।

দিল্লী দুর্গের শ্বেত-মর্ম্মর বিনির্ম্মিত গৃহাবলী বাদশাহ শাহজাহানের কীর্ত্তি। অতি অল্পসংখ্যক ইমারতই আকবর বা জাহাঙ্গীরের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজীব বাদশাহ সৌন্দর্য্য এবং বিলাসের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়াই ইতিহাসে কথিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার সময়ে দিল্লীর দুর্গাভ্যন্তরস্থ এক "মোতি মস্‌জিদ" ব্যতীত অন্য কোন শ্বেত প্রস্তরের গৃহসৌধ, প্রকোষ্ঠ, কক্ষ, মিনার বা মসজিদ হয় নাই এবং দিল্লীর এই মোতি মসজিদও আয়তনে এবং সৌন্দর্যে আগ্রা দুর্গের মোতি মসজিদ অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। তুলনায় হীন হইলেও, যাঁহারা আগ্রার মর্ম্মর সৌধাবলী দেখেন নাই, তাঁহারা দিল্লীর মোতি মসজিদ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই মসজিদের তিনটি মাত্র গুম্বজ, কিন্তু এই গুম্বজ গুলির আয়তন এবং গঠন সৌন্দর্য্য বড়ই মনোহর এবং এই গুম্বজত্রয়ের শোভাতেই সমগ্র মোতি মসজিদটিকে শোভান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। চত্বরের পরে চত্বর, প্রকোষ্ঠের পরে প্রকোষ্ঠ, কক্ষের পরে কক্ষ, এমন কত চত্বর, কত প্রকোষ্ঠ এবং কত কক্ষ যে অদ্যাপি দুর্গের মধ্যে বর্ত্তমান আছে তাহার অন্ত নাই। "দর্শন দরওয়াজা," "শীস মহল," "রঙ্গ মহল," এমন কত কি আরও দর্শকের চক্ষুকে বিভ্রান্ত এবং মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলে। যে "দর্শন দরওয়াজা"র "ঝরোকায়" সূর্য্যোদয় কালে শাহানশাহ বাদশাহ ক্ষণেকের জন্য আবির্ভূত হইয়া, নিম্নে যমুনা তীরাস্থত প্রকৃতিপুঞ্জকে দর্শন দিতেন, আজ আপামর সাধারণের সেখানে অব্যাহত গতিবিধি; অসূর্য্যম্পশ্যা বেগমগণের যে "রঙ্গমহলে" বায়ু ধীর গতিতে প্রবেশ করিত, দিনদেবতার রশ্মিজাল, নানা আবরণ ভেদ করিয়া মৃদুভাবে যে অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ, (শুনা যায় মকরকেতন মন্মথ, হয়ত অনঙ্গ বলিয়াই, যেখানে অবাধ প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিলেন) সেই রাজাধিরাজ-গণের শুদ্ধান্তে আজ সকলেই নির্ব্বিবাদে গতায়াত করিতেছে এবং রাজান্তঃপুরচারিণীগণের পান ভোজন ক্রীড়া শয়নের নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলির বৃত্তান্ত গাইডদিগের মুখে শুনিয়া, নিজ নিজ বিচার বিবেচনা অনুসারে নানা-বিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে তাহারা দ্বিধা বোধ করিতেছে না। "কালস্য কুটিলা গতি!"

মুসলমান ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ মোগল বাদশাহগণের রঙ্গমহলের যে বর্ণনা রচিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে মনে হয় যে ধরণীর যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, যাহা কিছু উপভোগ্য, তাহা সমগ্র পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দিল্লী আগ্রার প্রাসাদস্থ রঙ্গ মহলে আনা হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য এবং সম্ভোগ একত্রে একস্থানে কোথায় রক্ষিত, এ প্রশ্ন সেদিনে কেহ করিলে হয়ত সেকালের লোক দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর দিত—"দিল্লীর বাদশাহের রঙ্গমহলে।"

শাহানশাহ শাহজাহান "দেওয়ানে আমের" ভিত্তি গাত্রের মর্ম্মরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

আগর ফিরদওস বরুরুই জমীন্ অস্ত
হমীন অস্ত, ওয়া হমীন অস্ত, ওয়া হমীন অস্ত।"

—এ পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তবে এখানে, তাহা এখানে, তাহা এখানে।

মনে হয় এই শ্লোক কেবল দিল্লীর দেওয়ান খাসে নহে, মোগলের প্রাসাদদুর্গের অভ্যন্তরস্থ রঙ্গমহল এবং অপরাপর অনেক ইমারতের সম্বন্ধেই ইহা সঙ্গত ভাবে প্রযোজ্য।

রঙ্গমহলের গৃহ কুট্টিমে মর্ম্মরের জলযন্ত্র হইতে গোলাপের গন্ধবারি যে দিনে উৎসারিত হইয়া অন্তঃ-

পুরের মন্দ বায়ুকে নিয়ত ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত, মুক্ত-ভেনার মদগন্ধে রঙ্গমহলের অধিবাসিনীগণের অন্তর যে দিনে মৃদু মত্ততায় বিভোর থাকিত, সারেঙ্গ এবং সেতারের নিক্কণ ও কলকণ্ঠী গায়িকার কণ্ঠধ্বনি এবং নূপুর শিঞ্জনে রঙ্গ মহল যে দিনে নিয়ত মুখর হইয়া উঠিত, সে দিনের রঙ্গমহল ত দেখি নাই; মহাতাপ জ্বালাইয়া ভিত্তি সংলগ্ন লক্ষ মুকুরের যে শোভাটুকু দেখিয়াছিলাম তাহাতেই মনে হইল, জীবন্ত রঙ্গমহল না জানি কি সামগ্রীই ছিল!

প্রাসাদ দুর্গ ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুর্গ ত্যাগ করিবার নিয়ম, সুতরাং গাইডের সঙ্গে বাহির হইয়া, জগদ্বিখ্যাত জুম্মা মসজিদের দিকে চলিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

জীবনসন্ধ্যায় লক্ষ্মীবাঈ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ ভারতেতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ,—সে আমাদের বড় দুর্দ্দিনই গিয়াছে।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈকে মারীদস্যু, যেয়ে বোম্বেটে ইত্যাদি বলিয়াছেন। কিন্তু এই বীরবালার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয়ে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই। লক্ষ্মীবাঈ ইংরাজের বিরুদ্ধে কেন অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, এক পত্রে তিনি নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন;—"মী অর্দ্ধা সের তাম্বুলাচী ধনীন, মজলা রাওসাহেবস্ বিধবা ধর্ম্ম সোড়ূন হা উদ্যোগ করণ্যাচী কাঁহীজরুর নব্হতী। পরন্তু হিন্দুধর্ম্মাচা অভিমান ধরুন হৈয়া কর্মাস্ প্রবৃত্ত ঝালে, ব হৈয়াজ-কারিতা বিত্তাচী, জীবতাচী সর্বাচী আশা সোডলী। আমচ্যা পদরী পাতকচ ফার মহমুন আম্হাস্ ঈশ্বর যশ দেত নাহী। চরখারীবর মোঠি লড়াই ঝালী, পরন্তু আম্হাস্ যশ আলো নাহী। কল্পীবরহী ইংগ্রজ চালুন এত আহে তেথে থোড়ক্যাতচ জয় হোইল, জে অদৃষ্টাস্ লিহিলে অসেল তে হোইল।"—বিদ্রোহী পেশবা নানা ধন্দুপন্থকে লিখিত রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের অপ্রকাশিত পত্রের একাংশ। (১)

অর্থাৎ—আধসের চালই আমরা অমূল্য সম্পত্তি, বিধবা ধর্ম্ম ছাড়িয়া অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধায়োজনে আমার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া, উহা পালনে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং ইহার জন্য রাজ্য, আত্মীয় স্বজন ও জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি। জন্মান্তরার্জ্জিত পাপের ফলে ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ। চরখারী যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও জয়লাভ করিতে পারিলাম না,—কাল্পীতে আবার যুদ্ধ করিব, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে।

ইংরাজি ১৮৫৩ সালে ঝাঁসীরাজ গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্রাদি ছিল না; লক্ষ্মীবাই ইঁহারই পত্নী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত গঙ্গাধর রাওয়ের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অধিকার রাজা ও তাঁহার পত্নীর

১। পূজনীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আদেশ ও অনুরোধ ক্রমে, ১৩২৮ সালে উত্তরভারতের নানা স্থানে আমি ঐতিহাসিক দলিল পত্রাদি অনুসন্ধান করিতেছিলাম। সেই সময় কাল্পী হইতে রাণী লক্ষ্মীবাঈ লিখিত, নানা সাহেবের নামে কয়েক খানি পত্র পাই এবং ঐ বৎসর মহাপূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া ঝাঁসি গিয়াছিলাম, সেখান হইতেও বিঠঠিনী সম্বন্ধে কয়েক খানি মূল্যবান পত্র পাই। পত্রগুলি সমস্তই আমার নিকট আছে; যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেখিতে পারেন।—লেখক।



রণাঙ্গণে লক্ষ্মীবাঈ

ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া, তাহাকে রাজ্যাধিকার দিবার জন্য লক্ষ্মীবাঈ লর্ড ডালহাউসীর নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু লর্ড ডালহাউসী রাণীকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। তাঁহারা ঝাঁসী রাজ্য গ্রহণ করিয়া, মাত্র ঝাঁসীনগর রাণীর শাসনাধীনে রাখিলেন। কোম্পানী মাস কয়েক রাণীকে একটা বৃত্তি দিয়াছিলেন, পরে উহা বন্ধ হইয়া যায়। এই অর্থদৈন্যে রাণী কর্ম্মচারিগণের বেতন কমাইয়া দিতে বাধ্য হন। মহালক্ষ্মীদেবীর পূজার্চ্চনাদির জন্য দুইখানি গ্রাম রাণী দেবত্র সম্পত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কাতর অনুনয় ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও, কোম্পানি এই গ্রাম দুখানি বাজেয়াপ্ত করিলেন। ঝাঁসী রাজ্য পরিচালন করিবার জন্য কলিকাতায় মন্ত্রণাসভা হয়, সভায় উপস্থিত থাকিবার বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও কোম্পানীর দিক হইতে রাণীকে কোন সংবাদই দেওয়া হয় নাই। ইহাতে রাণী নিজেকে অপমানিত মনে করেন। কলিকাতায় ঝাঁসী রাজদূত, কোম্পানীর ঝাঁসী গ্রহণের বিরুদ্ধে কাউন্সিলে আন্দোলন ও তীব্র মন্তব্য উপস্থিত করিবার অনুমতি চাহিয়া রাণীকে পত্র লেখেন। ক্রুদ্ধা রাণী সে পত্রের উত্তর দেন নাই। বিধবা রাণী মস্তক মুণ্ডনের জন্য, কোম্পানীর নিকট প্রয়াগ যাইবার আদেশ চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা রাণীর এ প্রস্তাবও বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিবার ছল বুঝিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীবাঈ তখন বিদ্রোহের নিশান তুলিয়া ধরিলেন। তিনি ঝাঁসীদুর্গ সংস্কার করিলেন, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন ভারত-ভাগ্যাকাশে এক মহা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে।



জিয়াজী রাও সিন্ধিয়া

ভূতপূর্ব্ব পেশবার পোষ্যপুত্র, ধন্দুপন্থ তখন বিদ্রোহের চেষ্টা করিতেছেন। (২) লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লী:তেও ধীরে ধীরে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঠিক এই সময় রাণী কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন, কাজেই সহযোগীর অভাব তাঁহার হইল না। দুর্দ্ধর্ষ মারাঠ বীর তাঁতিয়া টোপী রাণীর সহিত যোগ দিলেন, নানা ধন্দুপন্থ পত্রে রাণীকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এতদিন যে আগুন কেবল ধূম উদ্গীরণ করিতেছিল, সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া অনুকূল বাতাসে তাহা জ্বলিয়া উঠিল। ঝাঁসী, কাল্পী প্রভৃতি স্থানে

২। "মানসী" আষাঢ়, ১৩২৮, "আজীমুল্লা খাঁ" প্রবন্ধে ধন্দুপন্থ কেন বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়াছি। মাস কয়েক পূর্ব্বে যেখানে ধন্দুপন্থ মারা গিয়াছেন, তাঁহার শেষ জীবনের বৈচিত্র্য পূর্ণ ইতিহাস শীঘ্রই পাঠকগণকে উপহার দিব:—লেখক

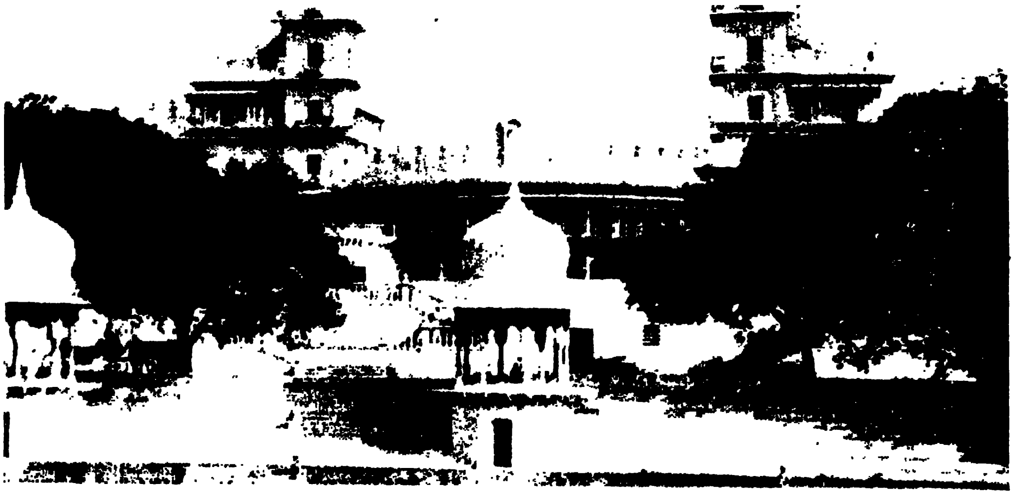


দিনকর রাও রাজবাড়ে (সিন্ধিয়া-মন্ত্রী)

রাণীর সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ফলাফল ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

২২শে মে, ১৮৫৮ সালে কাল্পীর যুদ্ধে সার হিউ রোজ কর্তৃক রাণী পরাজিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন রাওসাহেব, বাঁদার নবাব প্রভৃতি। (৩) ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণকে লইয়া রাণী, তাঁতিয়া টোপী প্রভৃতি গোয়ালিয়র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ৩০শে মে সন্ধ্যার সময় সকলে মুরার নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং আবার যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। গোয়ালিয়র-অধীশ্বর জিয়াজী সিন্ধিয়ার নিকট রাণী চারি লক্ষ টাকা কিংবা যুদ্ধ, দুইটির একটি চাহিয়াছিলেন। মন্ত্রী দিনকর রাও রাজবাড়ের পরামর্শে টাকা না দিয়া, সিন্ধিয়া-রাজ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১লা জুন দিনকর রাও রাজ-

৩। "Here, Sir Hugh (Lord Strathnairn) again defeated a large force of about 12,000 under the Rani of Jhansi, Rao Saheb and the Nawab of Banda, who then fled to Gwalior."—Holme's Indian Mutiny.



গোয়ালিয়র—মোতিমহল রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে রাণী লক্ষ্মীবাঈ কয়েকদিন ছিলেন।

বাহ্নের সহিত মহারাজ সসৈন্যে মুরার নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। রাণী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ রাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইল না। এদিকে রাণীর আদেশে বিদ্রোহীদল গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। দেওয়ান রাজারাওের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও সিন্ধিয়া-সৈন্য যুদ্ধ করিল না। তখন মহারাজ ও দেওয়ান ঘোড়া হইতে নামিয়া তোপ চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই তোপের মধ্যে কাহারা বাজরা ভরিয়া দিয়াছিল, কাজেই তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। দেওয়ান সহ ভীত মহারাজ আগ্রা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাণী ও তাঁহার সহযোগিগণ গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া, প্রসিদ্ধ উদ্যান ফুলবাগের মোতিমহলে থাকিবার বন্দোবস্ত করিলেন। রাজধানীতে লুঠ তরাজ আরম্ভ হইল। পরদিন রাণীর আজ্ঞায় "মুক্তদ্বার" অর্থাৎ ধুমধামের সহিত ব্রাহ্মণভোজন আরম্ভ হইল। এই ব্রাহ্মণ ভোজন ও আমোদোৎসব একপক্ষকাল সমভাবে চলিয়াছিল।

তাঁহারা টাকা কড়ি ঘোড়া অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। ঝাঁসী ও কাল্পীর বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম স্যর হিউ রোজ ১৬ই জুন মুরার হইতে পাঁচ মাইল দূরে বাহাদুরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নেপিয়ার সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দেন। কালবিলম্ব না করিয়া রোজ বিদ্রোহিদলকে আক্রমণ করিলেন। সেদিন যুদ্ধে কোন পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বিদ্রোহীদল অল্প দূর পিছনে সরিয়া আসিয়া এক শুষ্ক জলপ্রণালীর মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। মারাঠা ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন সেদিন জয়পরাজয় অনিশ্চিত থাকিয়া যায়; কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন, কোম্পানির সৈন্য এদিনেও বিদ্রোহীদলকে পরাজিত করিয়াছিল। পরদিন প্রত্যূষে (১৭ই জুন) ব্রিগেডিয়ার স্মিথ আঁতরী হইতে

সসৈন্যে আসিয়া বিদ্রোহীদলকে পিছন দিক হইতে আক্রমণ করিলেন।

চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিদ্রোহীদল প্রথমে ভীত হইয়াছিল কিন্তু রাণী তাঁতিয়া টোপী প্রভৃতির উৎসাহে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা স্থির হয় এবং দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করিতে থাকে। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদল প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে; এই সময়ের মধ্যে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে তাহাদের পদে পদে অসুবিধা হইতেছিল, তাহারা প্রাণপণে নালা হইতে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের এ চেষ্টা প্রতি বারই ব্যর্থ হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে লোকক্ষয়ও হইতেছিল। রাণী লক্ষ্মীবাঈ অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহিদলের প্রাণান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইতে চলিল। ইংরাজ সৈন্য ধীরে ধীরে তাহাদের চাপিয়া ফেলিতেছিল। অল্পপরিসর জলপ্রণালীর মধ্যে থাকিয়া বিদ্রোহীদল সাধ্যমত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে রাণী সারাদিন আশ্চর্য্য বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন এভাবে যুদ্ধ করিলে জয়াশা ত নাই-ই, অধিকন্তু মৃত্যু অনিবার্য্য। লক্ষ্মীবাঈ উন্মত্তের মত যুদ্ধ করিতে করিতে নালার উপরে উঠিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিল। নালার বাহিরে আসিয়া সৈন্যগণ সহ রাণী কোম্পানির সৈন্যের মাঝে পড়িলেন। সৈন্যসহ রাওসাহেব ও তাঁতিয়া বাহিরে আসিলেন, পিছন দিক হইতে স্যর হিউ রোজ সসৈন্যে নালার মধ্যে নামিয়া পড়িলেন। রোজ মনে করিয়াছিলেন, আবার দুইদিক হইতে আক্রমণে বিদ্রোহিগণ বিধ্বস্ত হইবে, কিন্তু তাহা হইল না। রাওসাহেব ও তাঁতিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া রোজকে আক্রমণ করিলেন আর সম্মুখে ব্রিগেডিয়ার স্মিথকে আক্রমণ করিলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। অশ্বপৃষ্ঠে রাণী লক্ষ্মীবাঈ দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার অসি অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণে ঝলসিয়া উঠিল, হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদল রাণীর দ্রুত-চালিত তরবারি মুখে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, লেফটেনাণ্ট নীভ সাংঘাতিক আহত হইলেন।(৪) লক্ষ্মীবাঈ বিজয়গর্ব্বে ব্রিটিশ-বাহিনী দলিত মথিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। রাণীর শক্তি ও গতি রোধ করা অসম্ভব বুঝিয়া কোম্পানির সৈন্য তাঁহার বিনাশ চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, সমস্ত সৈন্যের লক্ষ্য হইলেন—রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

রাণী যুদ্ধ করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার বাম বাহুতে গুলি লাগিল, হাতের অসি খসিয়া পড়িল (রাণী যুগল হস্তে তরবারি চালনা করিতেছিলেন)। তাঁতিয়া দূর হইতে রাণীকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বলিলেন। সূর্য্যদেব তখন রক্তচক্ষু দিক্‌চক্রবালের অন্তমুখে ছুটিয়া চলিয়াছেন; আর কিছুক্ষণ এই ভাবে যুদ্ধ চলিলে জয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রাণী যুদ্ধ ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এক হাতেই দ্রুত অসি চালাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে কর্ণেল হিক্‌সের অতর্কিত তরবারির আঘাতে রাণীর দেহ অশ্বপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।(৫) নিমেষ মধ্যে সিংহবিক্রমে তাঁতিয়া রাণীর পাশে আসিলেন, চারিদিক হইতে মৃত্যুপথযাত্রিণীর রক্ষার্থে সকলে অগ্রসর হইল। কয়েকজন সাবধানে রাণীর মৃতদেহ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে চলিল। (১৭ই জুন ১৮৫৮, সন্ধ্যার সময় রাণীর মৃত্যু হয়।) এই বিশৃঙ্খলার পর যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, কাহারা জয়লাভ করিয়াছিল, তাহা না লিখিলেও চলে। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক কিন্তু কর্ণেল হিক্‌সকে নির্দ্দোষ বলিয়া, এক সাধারণ সৈন্যের স্কন্ধে লক্ষ্মীবাঈয়ের হত্যাপরাধ চাপাইয়াছেন।

৪। "Here they maintained a desperate hand to hand struggle with the British. The 71st Highlanders suffered severely, Lieutenant Neave, whilst leading them, falling mortally wounded."—Malleson's Mutiny, 1896.

৫। "ইকডে লড়্‌তে ঝাঁসীবালীস্‌ বন্দুকীচী গোলী লাগলী তথাপি থাবিলে নাহি, তেথে হাতে তরবারীনী ধার বাহিলা লাগলা।"—গোয়ালের এখীল বক্তাটী বোধিব, ১৫ পৃঃ।

"When inch by inch the British troops pressed through the pass, and when reaching it's summit, Smith ordered the hussars to charge, the Rani of Jhansi boldly fronted the British horsemen. When her comrades failed her, her horse, in spite of her efforts, carried her along with the others. With them she might have escaped, but that her horse, crossing the canal near the cantonment, stumbled and fell. A hussar close upon her track, ignorant of her sex and her rank, cut her down She fell to rise no more."—Sir Hugh Rose, by an Officer of the Bengal Staff Corps, 1866.

উপসংহারে ইহা প্রকাশ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমার পূজ্যপাদ মাতামহ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেশচন্দ্র অনেকগুলি ইংরাজ পরিবারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং গুপ্তভাবে তাঁহাদের নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বিদ্রোহিগণ দুই ভ্রাতার জীবন নাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। দাদা মহাশয় প্রাণভয়ে গোয়ালিয়র হইতে আগ্রা পলায়ন করেন এবং বড়দাদামহাশয় (মহেশ বাবু) তাঁহার ছাত্র সামন্ত সর্দার বাবাসাহেব ঝিন্সীওয়ালার গৃহের পাতকুয়ায় দিন কয়েক লুকাইয়া থাকিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের না পাইয়া "কেষ্টা" নামে বাড়ীর ভৃত্যকে বিদ্রোহিগণ অকর্ম্মণ্য ও অঙ্গহীন করিয়া গিয়াছিল। কেষ্টা বেচারী তাহার "নুলো" হাত পা আমার মা ও মামাদের দেখাইয়া, বিদ্রোহের সময়ে গোয়ালিয়রের ভীষণ অবস্থার কথা বর্ণন করিত।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়।

বিরহ

বিরহেরে শত্রু পরম কেমন করে' বল্‌ব ওরে?
প্রণয়ে সে সরস রাখে, বাঁধে নূতন নূতন ডোরে।
পরিণয়ের অপূর্ব্বতা
হারায় নাক জীবন-লতা
নূতন নূতন গাঁইতে সে ফুটায় কুসুম জোড়ে জোড়ে।

দুটী ধারার মধ্য পাষাণ, যৌবনের এই গিরির গায়ে,
বন্ধুর পথ দীর্ঘ করে দেবদারু শালবনের ছায়ে।
ঘুচায় দিয়ে উপলব্যথা
পাগলা ঝোরায় উদ্দামতা
কস্তুরীময় মনঃশিলায় মিলায় পুন নূতন করে';

দিনের ক্ষুধা রাতের সুধায় করে আরো রোচন স্বাদু,
সুপ্ত প্রেমে জাগবে তাই বাবধানের মোহন যাদু,—
প্রেমের জিঞ্জির, মর্ম্মজ্বালায়
গড়া, তাহার কর্ম্মশালায়
গাঁথ্‌ছে সে যে নর্ম্মমালায় মিলনফুলে সূচের ফোঁড়ে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের চুম্বক—

কলিকাতাবাসী হেমচন্দ্র কর ও কিশোরীমোহন নাগ দুই বন্ধু, উভয়েই অবিবাহিত। হেম কোনও ইংরাজ সওদাগরী অপিসের কেশিয়ার এক বিলাত-ফেরৎ সিবিলিয়নের নিকট আত্মীয় এবং অত্যন্ত সাহেবী-ভাবাপন্ন। কিশোরী একজন কবি, তাহার মা বাপ নাই, দাদা পশ্চিমে চাকরি করেন, পৈতৃক কিছু সম্পত্তি আছে, তাহারই উপসত্বে কিশোরী কলিকাতায় কাটায়। জুন মাসে, এক মাসের ছুটি লইয়া হেম দার্জ্জিলিঙ যাইতেছিল, কিশোরীও তাহার সঙ্গ লইল। হেমের উপদেশে সম্পূর্ণ সাহেব সাজিয়া, নিজ প্রিয় কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া, কিশোরীও বন্ধু সহ দার্জ্জিলিঙে গিয়া স্যানিটোরিয়মে বাসা করিল। মিষ্টার ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার; তাঁহার স্ত্রীও, সত্যবালা বা সতী ও বর্ণা নাম্নী দুইটি যুবতী কন্যাকে লইয়া দার্জ্জিলিঙে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বাবধিই হেমের বন্ধুত্ব হেমের সহিত কিশোরী সর্ব্বদা "ঘোষ-ভিলায়" যাতায়াত করিতে লাগিল। সত্যবালাও একজন গোপন কবি; এই প্রকাশ্য-কবি কিশোরীর সহিত অচিরাৎই তাহার খুব মনের মিল হইয়া গেল। ক্রমে ঘোষ সাহেব, তাঁহার বন্ধু যুবক সিভিলিয়ন মল্লিক সাহেবকে সঙ্গে লইয়া দার্জ্জিলিঙে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের খুব ইচ্ছা, মল্লিকের সঙ্গে সত্যবালার বিবাহ হয়—মল্লিকও এবিষয়ে ব্যগ্র। কিন্তু সত্যবালা কিছুতেই রাজী হইল না, যখন তাহার পিতা মাতা বুঝিলেন, কিশোরীকেই সতী মনে মনে পতিরূপে কামনা করে; বুঝিয়া কিশোরীকে তাঁহারা "বাড়ী বন্ধ" করিলেন। হেম বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, কিশোরী রহিল। ইহার পর মাঝে মাঝে পথে ঘাটে সতীর সহিত কিশোরীর সাক্ষাৎ হইত। ক্রমে তাহাদের প্রণয় গভীর ভাব ধারণ করিল—তাহারা স্থির করিল, তিন আইন অনুসারে তাহারা গোপনে বিবাহ করিয়া, তার পর বাড়ীতে জানাইয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিবে। তদনুসারে একদিন তাহারা রেজিষ্ট্রারকে নোটিস দিয়া আসিল, তিন সপ্তাহ পরে বিবাহ হইবে। মল্লিক ইতোমধ্যে কাছারি গিয়া সেই নোটিস দেখিতে পাইল এবং বাড়ীতে ফিরিয়া সতীর মাকে বলিয়া দিয়া খুব একটা গণ্ডগোল বাধাইল। ফলে সতীর একা বাহির হওয়া, এবং কিশোরীর সহিত গোপন সাক্ষাৎ বন্ধ হইয়া গেল। কিশোরী একদিন সতীর সহিত দেখা করিবার চেষ্টায় ঘোষ ভিলায় গিয়া মল্লিক কর্ত্তৃক অপমানিত হইল। বিবাহের তখন তিনদিন বাকী। সতী কিশোরীকে ডাকে চিঠি লিখিল সে যেন রাত্রি ১২টার সময় ঘোষ ভিলার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায়; সতী সেখানে আসিয়া, তাহাদের বিবাহের বিষয় স্থির করিবে। কিশোরী গিয়াছিল, সতীর সঙ্গে দেখাও করিয়াছিল, কিন্তু পাশের বাংলায় বাসকারী মল্লিক তাহাদের দেখিতে পায়। পরদিন কিশোরী রেজিষ্ট্রারের সহিত দেখা করিয়া, বিবাহের স্থান ও সময় স্থির করিয়া, রাত্রি ১২টায় আবার ঐস্থানে আসিয়া সতীকে লইয়া যাইবে স্থির ছিল। এদিকে মল্লিক, প্রতি রাত্রেই উহাদের ঐরূপ গোপন মিলন হয় মনে করিয়া, কিশোরীকে ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। যথা সময়ে কিশোরী আসিল; মল্লিক নিজে যাইতে সাহস না করিয়া, তাহার ভৃত্য মংলুকে, ধরিবার জন্য পাঠাইল। মংলুর সহিত কিশোরীর ধস্তাধস্তিতে, অবশেষে মংলু রাস্তা হইতে গড়াইয়া, "বাপরে বাপ জান গিয়া" চীৎকার করিতে করিতে, গভীর খদে গড়াইয়া পড়িল। একটা খুন হইয়া গেল, মল্লিক এখনি পুলিস আনাইয়া কিশোরীকে ধরাইয়া দিবে, এবং বিচারে তাহার ফাঁসি হইবে, এই আশঙ্কায় কিশোরী, দার্জ্জিলিঙ ত্যাগ করা স্থির করিল। সেই রাত্রেই সতীর সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে এ কথা বলিল, এবং অনুরোধ করিল কাল সকালে সতী যেন স্যানিটোরিয়মে গিয়া, তার হিসাব মিটাইয়া দিয়া, তার জিনিষপত্র ও কুকুরটিকে লইয়া আসে। কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়া থাকিয়া, এ সব গোল-মাল মিটিয়া গেলে সে ফিরিয়া আসিবে এবং তাহাদের বিবাহ হইবে।

পার্ব্বত্য পথে উত্তরদিকে চলিয়া, পরদিন পূর্ব্বাহ্নে

কিশোরী বৃটিশ রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া সিকিম রাজ্যে প্রবেশ করিল। মিটোগাং গ্রাম হইতে ভাষা-শিক্ষক ও গাইড ফুরচিংকে এবং কুলি সাইদাকে সংগ্রহ করিয়া, লামা বেশে, তিন সপ্তাহ চলিয়া কাম্পাচেন গ্রামে আসিল। জ্বর হইয়াছিল, গ্রামে আশ্রয় মিলিল না, গ্রাম হইতে কিছুদূরে এক বৌদ্ধমঠে তিন জনে গিয়া আশ্রয় লইল। এই মঠের লামা এখন মৃত, তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয়া কুমারী কন্যা, তিব্বতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রে বিদুষী নিনা এখন মঠের অধিকারিণী। নিনা সেবাশুশ্রূষা করিয়া কিশোরীকে আরোগ্য করিল, কিন্তু ঐ বালিকার মনে এই অতিথির প্রতি প্রেমসঞ্চার হইল। সত্যবালার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইতে পারে না এই স্থির করিয়া, এই নিষ্ফল প্রেমের যন্ত্রণা হইতে নিনাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কিশোরী মঠ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল; বলিল, তিব্বতের তাসিলংপু মঠে গিয়া কিছুদিন সেখানে সে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। নিনা বলিল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কিশোরী মানা করিল, কিন্তু নিনা শুনিল না। সাইদা ও ফুরচিংকে, তীর্থযাত্রার্থ গ্রামান্তরে ঘোড়া কিনিতে পাঠাইয়া, রাত্রি ১০ টার সময় নিনা কিশোরীকে বলিল, এই মঠের লামাগণের বংশানুক্রমে সঞ্চিত বহু ধনসম্পত্তি একস্থানে লুকাইত আছে, এখন আমিই সেই সমস্ত ধনের অধিকারিণী; তীর্থপথে আমার যদি মৃত্যু হয়, আমার আর কেহ নাই, সে সমস্ত ধন তোমাকে আমি দিলাম তুমি আসিয়া লইবে, দেখিবে চল। নিনা এই কথা বলিয়া, নিজ শয়নকক্ষের পশ্চাৎস্থিত গুহার মধ্যে কিশোরীকে লইয়া গিয়া, মেঝের উপর হইতে একখানা বড় পাথর তুলিয়া ফেলিয়া সিঁড়িযুক্ত একটা প্রকাণ্ড গহ্বর দেখাইল; এবং কিশোরীকে অনুসরণ করিতে বলিয়া প্রদীপ হস্তে সিঁড়ি নামিতে লাগিল।]

দ্বিতীয় খণ্ড

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গিরিগহ্বরে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামিবার পরেই, খানিকটা সমতলক্ষেত্র পাওয়া গেল—নিনার পশ্চাতে তদুপরি নামিয়া দাঁড়াইয়া কিশোরী দেখিল, সম্মুখ ভাগে একটি সুরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে—কতদূর গিয়াছে, কিছুই বোঝা গেল না। সুরঙ্গ উর্দ্ধে ও প্রস্থে কোনও দিকে তিন হাতের অধিক হইবে না—প্রবেশ করিতে হইলে একটু 'গুঁড়ি মারিয়া' চলিতে হয়। নিনা বলিল, "এই সুরঙ্গের মধ্য দিয়া এখন আমাদের যাইতে হইবে—তোমার ভয় করিবে না ত?"

কিশোরীর সত্যই ভয় করিতেছিল,—কিন্তু পুরুষ হইয়া, এই বালিকার সমক্ষে কোন্ লজ্জায় সে তাহা স্বীকার করিবে? তাই সে বলিল, "না, ভয় করিবে কেন? কতদূর যাইতে হইবে?"

"বেশী দূর না—এস মাথাটি বেশ করিয়া নোয়াইয়া এস, যেন উপরের পাথরে ঠুকিয়া না যায়।"—বলিয়া প্রদীপ হস্তে নিনা অগ্রসর হইল। কিশোরী অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিল। পদনিম্নে প্রস্তরময় পথটি, এবং উভয় দিকের ভিত্তিগাত্র সুমসৃণ, যেন বহু যত্নে বহু পরিশ্রমে সেগুলি চাঁচিয়া ছুলিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। কিন্তু উর্দ্ধভাগ সেরূপ নহে—বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রেরই মত আকার-বিশিষ্ট। কালো কালো ছোট বড় পাথরের চাঙড়—দুই খণ্ডের সংযোগ স্থান কোথাও সুমিলিত, কোথাও বা যেন মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। বাহিরে এত যে শীত ছিল, এখানে তার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। প্রথমে কিশোরীর ভাবনা হইতেছিল যে বোধ হয় ভিতরে গেলে, নিশ্বাস লইবার মত প্রচুর বায়ু পাওয়া যাইবে না; কিন্তু দেখিল যে সে বিষয় কোনই বিঘ্ন হইতেছে না। চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "অচ্ছা নিনা, এই স্থানের যেখানে মুখ, তাহা ত বন্ধ; এখানে বায়ু চলাচল করে কেমন করিয়া?"

নিনা বলিল, "আর খানিক অগ্রসর হইলেই তুমি দেখিতে পাইবে।"—বলিয়া সে চলিতে লাগিল।

সুরঙ্গটি সরল রেখার মত নহে; মাঝে মাঝে আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। একস্থানে আসিয়া নিনা বলিল, ঐ সম্মুখে উপরের দিকে চাহিয়া দেখ, ঐ যে মস্ত ফাটল দেখা যাইতেছে, উহা উর্দ্ধে উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। ঐ স্থান দিয়া বায়ু প্রবেশ করিয়া

থাকে। ঐ স্থানের নিয়ে আমি পৌঁছিলে তুমি দেখিতে পাইবে, আমার হস্তের এই প্রদীপ-শিখাটি কাঁপিতে থাকিবে।"

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "যদি নিবিয়া যায়?"

নিনা বলিল, "আমি সঙ্গে আলো জ্বালিবার উপকরণ আনিয়াছি। যখনই এই গহ্বরে প্রবেশ করি, তখনই এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকি।"—বলিয়া সে অগ্রসর হইল। সেই স্থানের নিয়ে পৌঁছিয়া কিশোরী দেখিল, দীপশিখা যথার্থই কাঁপিতে লাগিল। নিনা নিজ বস্ত্রাবরণে দীপটি সুরক্ষিত করিয়া, ক্ষিপ্রচরণে সে স্থান অতিক্রম করিয়া গেল।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, 'যে পথ দিয়া বায়ু প্রবেশ করে, সে পথে সাপও ত নামিয়া আসিতে পারে?"

নিনা বলিল, "উপরে যেখানে মুখ, সেখানটার চতুর্দ্দিকে এক প্রকার গুল্মের ঘন জঙ্গল আছে। সে গাছের গন্ধ সাপেরা সহিতে পারে না, তাই সাপ আসে না।"

কিশোরী ভাবিল, বাঙ্গালা দেশে যাহা "ইষা" নামে খ্যাত—ঐ গুল্ম বোধ হয় সেই জাতীয়; ইষার মূল ঘরে রাখিলে সাপ আসে না এই প্রবাদ সে শুনিয়াছে বটে। হয়ত বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, যে লামা এই গহ্বরে তাঁহার ধনরত্ন লুকাইত রাখিবার প্রবন্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই বোধ হয় উপরের ঐ রন্ধ্রমুখের চতুর্দ্দিকে ঐ গুল্মের আবাদ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে নিনাকে সে কোনও প্রশ্ন করিল না; বলিল, "আর কতদূর যাইতে হইবে?"

নিনা ফিরিয়া দাঁড়াইল। হস্তস্থিত দীপালোকে কিশোরীর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ? এখানে একটু বসিবে কি? আর কিন্তু বেশী দূর নাই।"

কিশোরী বলিল, "বসিব না, চল।"

চলিতে চলিতে কিশোরী দেখিল, উত্তর দিকের ভিত্তিগাত্র আর পূর্ব্বের ন্যায় মসৃণ নহে— বন্ধুর প্রস্তরগঠিত। কিশোরী নিনাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, সে বলিল, "বাবা বলিতেন এক এক লামা তাঁহার জীবনকালে উত্তর দিকে দশ হাতের বেশী দেওয়াল খুঁড়িয়া যাইতে পারেন নাই। ইদানী লামারা বোধ হয় আর সে কষ্ট স্বীকার করিতেন না, তাই এইখান পর্য্যন্ত হইয়া, আর হয় নাই।"

আর দুইটা বাঁক পার হইবার পর কিশোরী দেখিল, সুড়ঙ্গের আয়তন ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নিনা বলিল, "এই আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। ঐ দেখ, সম্মুখে এই মঠের কোষাগার।"—বলিতে বলিতে নিনা সেই স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

কিশোরী দেখিল, স্থানটি দীর্ঘে প্রস্থে দশ বারো হাত পরিমিত হইবে। ভিত্তি গাত্রের কাছ ঘেঁষিয়া চারিটি কালো কালো বড় বড় সিন্দুক স্থাপিত রহিয়াছে। প্রত্যেকটিই তালা দিয়া বন্ধ। দেওয়ালে এক স্থানে একটা কুলঙ্গীর মত খানিকটা স্থান কাটা ছিল, নিনা প্রদীপটি সেইখানে রাখিয়া, সিন্দুক গুলি দেখাইয়া বলিল, "এগুলির মধ্যেই আমার সমস্ত ধনরত্ন রক্ষিত আছে।"

কিশোরী একটা সিন্দুকের কাছে গিয়া, ডালার উপরে আঙুলের গাঁঠের টোকা মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি লোহার নির্ম্মিত?"

নিনা বলিল, "না, লোহার নয়। পিতার নিকট শুনিয়াছি যে, এগুলি খুব পুরাতন ও পাকা নেপালী শাল কাঠের তৈরী—প্রায় লোহার মতই মজবুদ। কতকাল এখানে এই ভাবে রহিয়াছে, দেখ কোথাও একটু টসকায় নাই। তবে, বাবা বলিতেন, ভিতরে ইস্পাতের যে কল কব্জা প্রভৃতি আছে, তাহা মাঝে মাঝে বদলাইতে হয়—তাও, দুই তিন পুরুষ অন্তর একবার বদলাইলেই চলে।"

কিশোরী সবিস্ময়ে বলিল, "দুই—তিন—পুরুষ অন্তর! আচ্ছা নিনা, কতকাল এগুলি এখানে আছে তাহা কি তুমি জান?"

নিনা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখ—ঐ সর্ব্বশেষে যে সিন্দুকটি, উহার ভিতর প্রাচীন পুঁথি ও কাগজপত্র বোঝাই আছে। সেই সঙ্গে, যে লামা এই এই ধনভাণ্ডার সর্ব্বপ্রথম স্থাপনা করেন, তাঁহার হস্ত-

লিখিত একটি পুঁথিও আছে। বাবা একদিন আমায় সে পুঁথি দেখাইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, সাত শত বৎসর পূর্ব্বে উহা লিখিত হইয়াছিল; সেই সময় এই ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়। ঐ পুঁথি আমি পড়িয়াও দেখিয়াছিলাম। তাহাতে লেখা আছে, প্রত্যেক লামা, তাঁহার যে শিষ্যকে মঠের উত্তরাধিকারী লামা নির্ব্বাচিত করিবেন, তাহাকে গোপনে এই ধনভাণ্ডার দেখাইয়া দিবেন; এবং বলিয়া থাকিবেন, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ঐ সকল ধনরত্ন যেন ব্যয় করা না হয়, যথাসাধ্য সঞ্চয়ে ধনবৃদ্ধি করাই পূর্ব্বপুরুষ লামাগণের আদেশ। আমার পিতা, নিজ উত্তরাধিকারী স্বরূপ কোনও শিষ্যকে লামা নির্ব্বাচন না করিয়া, আমাকেই এ সমস্ত দান করিয়া গিয়াছেন; এবং তাঁহার স্বহস্ত লিখিত সেই দানপত্রও, ঐ সিন্দুকটির মধ্যেই রক্ষিত আছে।"

সেই অতল গিরিগহ্বরে সমাহিত হইয়া, জগৎসংসার হইতে বহু—বহু দূরে—কিশোরী বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, নিনার মুখনিঃসৃত এই অপূর্ব্ব কাহিনী শ্রবণ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল; ইহা যেন বিংশ শতাব্দী নহে—ইংরাজ যেন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছে না,—অশোক বা বিম্বিসার যেন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে অবস্থিত।

নিনা বলিল, "রাত্রি বাড়িতেছে। যে কাযের জন্য তোমায় এখানে আনিয়াছি, তাহা শেষ করি। দেখ, প্রত্যেক সিন্দুকটি তালা দিয়া বন্ধ করা আছে। তাহার চাবিগুলিও এই কক্ষের নিকটেই লুকানো থাকে—মঠে তাহা লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ। চাবি কোথায় থাকে দেখিবে এস।"—বলিয়া নিনা প্রদীপটি হাতে করিয়া, কক্ষ হইতে নির্গত হইল। বলিল, "তোমার প্রতি-পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে এস।" —বলিয়া নিনা আগে আগে চলিল। কিশোরী মনে মনে এক দুই করিয়া গণিতে গণিতে, তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ক্রমে নিনা দাঁড়াইয়া, পিছু ফিরিয়া বলিল, "এক, দুই, তিন—ব্যস। তোমার ক' পা হইয়াছে?"

কিশোরী বলিল, "বাইশ।"

"আমার সাতাইশ হইয়াছে। আমি স্ত্রীলোক, তাই, আমার পদবিক্ষেপের দূরত্ব-পরিমাণ কিছু অল্প, সেই জন্য তোমার চেয়ে বেশী হইয়াছে। তোমারও পদক্ষেপ লামাদের চেয়ে ছোট—কারণ পুঁথিতে লেখা আছে, কক্ষপ্রান্ত হইতে উনবিংশতি পদক্ষেপে যে স্থান আসিবে, উহাই চাবি লুকাইবার স্থান।"—বলিয়া কিশোরীর হাতে প্রদীপটি দিয়া নিনা সেইখানে বসিয়া পড়িল। দেওয়াল সংলগ্ন একটা পাথরের টুকরা টানাটানি করিতে, উহা খসিয়া খুলিয়া আসিল। নিনা ভিতরে হাত দিয়া, ধাতুনির্ম্মিত একটি ছোট চৌকোণা বাক্স টানিয়া বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "এই বাক্সের মধ্যে চাবি থাকে।" ডালাটি খুলিয়া, গুচ্ছটি তুলিয়া বলিল, "এই দেখ, চারটি রহিয়াছে। এখন চল, সিন্দুকগুলির ভিতর কি আছে তোমায় দেখাইব।"

কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম সিন্দুকের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া, সিন্দুক খুলিয়া নিনা বলিল, "ইহাতে কেবল রূপার টাকা থাকে।" কিশোরী দেখিল, বাক্সটির প্রায় অর্দ্ধেক খালি। একটা টাকা তুলিয়া, প্রদীপের আলোকে সে পরীক্ষা করিতে লাগিল। নিনা বলিল, "বেশীর ভাগই ইংরাজী আর নেপালী টাকা। নীচের দিকে কিছু চীনা ও মুসলমানী টাকাও আছে। তোমার হাতের ওটা কি? ইংরাজি?"

"হাঁ"—বলিয়া কিশোরী ঠং করিয়া টাকাটি গাদায় ফেলিয়া দিল।

"চীনা টাকা দেখিবে?"—বলিয়া নিনা মাঝখানে দুই হাত দিয়া টাকার গাদা উভয় পাশে সরাইতে লাগিল। সেই ঝন ঝন ঝণৎকার শব্দে, রুদ্ধ কক্ষখানি ভরিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন একটা উত্তেজনা অনুভব করিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শুনিতে লাগিল। গাদার ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া, মুঠা মুঠা টাকা তুলিয়া নিনা বাছিতে লাগিল। ক্রমে একটি চীনা রৌপ্য-মুদ্রা পাইয়া কিশোরীর হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ।"

কিশোরী টাকাটি দেখিয়া নিনার হাতে ফেরৎ দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি যে বলিয়াছিলে, এখন আমার নিকট টাকা নাই, কাল তোমার ৫০৲ শোধ দিব, এই সিন্দুক হইতেই তুমি টাকা লইয়া যাইতে ত ?"

নিনা হাসিয়া বলিল, "নহিলে আর কোথায় পাইব ? আমি ত লামা নই, ভিক্ষাও করি না, কোনও ভক্ত আসিয়া আমাকে প্রণামীও দিয়া যায় না ;—এই টাকা লইয়াই ত আমি খাই পরি। বাবার মৃত্যুর সময় এ সিন্দুক একেবারে ভর্ত্তি ছিল না বটে কিন্তু এমন আধখালিও ছিল না ; আমিই ক্রমে ইহাকে খালি করিতেছি।"—বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিশোরী বলিল, "সে, তুমি বেশ করিতেছ। তোমার টাকা, তুমি কেনই বা খরচ করিবে না ? কিন্তু সেজন্ত ও কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি নাই। তুমি আমায় বলিয়াছিলে টাকা দিতে তোমার দুই চারি দিন দেরীও হইতে পারে। তোমার শয়ন ঘরের লাগাও এই টাকার রাশি রহিয়াছে, তবে দেরী হইবে বলিয়াছিলে কেন ?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া নিনার মুখের হাস্যজ্যোতি নিবিয়া গেল—তাহার মুখখানি যেন গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। একবার কিশোরীর পানে চাহিয়া, সে অবনত মুখী হইয়া, নিম্নস্বরে বলিল, "তোমাকে আর দুই চারি দিন এখানে আটকাইয়া রাখিবার জন্তই আমি এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, আর কেন ?"

কিশোরী বলিল, "আমাকে আটকাইতে চাহিয়াছিলে কেন ? তাতে তোমার লাভ ?"

নিনা ভারি গলায়, "কি লাভ, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না ? যাও, ও সব কথায় দরকার নাই। এখন, তোমায় যা দেখাইতে আনিয়াছি, তাহা দেখিবে এস।"—বলিয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বিতীয় সিন্দুকটির দিকে অগ্রসর হইল। সেই প্রদীপের সামান্ত আলোকেই কিশোরী দেখিতে পাইল, নিনার চক্ষু দুইটি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চক্-চক্ করিতেছে।

কিশোরীকে প্রদীপ ধরিতে বলিয়া নিনা দ্বিতীয় সিন্দুকটির সম্মুখে বসিল। খুলিয়া, ডালা তুলিয়া বলিল, "এতে সব সোণার টাকা।"

কিশোরী দেখিল, সিন্দুকটির অর্দ্ধভাগের উপর স্বর্ণমুদ্রায় বোঝাই। এত সোণা একত্র কিশোরী জীবনে কখনও দেখে নাই ; সে অবাক্ হইয়া সেই বিপুল ধনরাশির পানে চাহিয়া রহিল। মুদ্রাগুলি সমান আকারের নহে, ছোট বড় মিশানো। নিনা বলিল, "ইংরাজের মোহর ইহার মধ্যে খুব কমই আছে। চীনা মোহর কিছু আছে আর বেশীর ভাগই মুসলমানী আমলের মোহর।"—বলিয়া সে দুই হাতে মোহরের গাদা দুই পাশে সরাইতে সরাইতে, কয়েকটি নির্ব্বাচন করিয়া তুলিয়া কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী দেখিল, কতকগুলিতে ফার্সী অক্ষরে কি সব লেখা রহিয়াছে,—পড়িতে পারিল না ; কতকগুলিতে, কি ভাষার অক্ষর তাহাও নির্ণয় করিতে পারিল না। মোহরগুলি নিনার হাতে ফিরাইয়া দিল। সেই সমুজ্জ্বল স্বর্ণরাশির পানে লুব্ধনেত্রে চাহিতে চাহিতে কিশোরী ভাবিল, এ সমস্তই আমার হইতে পারে, যদি আমি এই নিনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হই ; আমি তাহা হইলে অতুল ধনের অধীপতি হইতে পারি—চিরজীবনের জন্ত আমার দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়।—কিশোরীর মাথার ভিতর যেন আগুনের হল্কা দিতে লাগিল।

সিন্দুক বন্ধ করিতে করিতে নিনা বলিল, "বাবার মৃত্যু সময়ে ইহাতে যতগুলি মোহর ছিল, এখনও তাহাই আছে। আমি ইহার একটিও খরচ করি নাই।"—কিন্তু কথাগুলি কিশোরীর কাণে গেল কি না সন্দেহ, তাহার মন তখন এতই উদ্‌ভ্রান্ত।

অতঃপর নিনা তৃতীয় সিন্দুক উদ্ঘাটন করিয়া বলিল, "এদিকের এগুলি রূপা, ওদিকের ওগুলি সোণা।"—কিশোরী দেখিল, স্বর্ণকারেরা যাহাকে "বাট" বলে, এগুলি তাহাই ; রূপারগুলি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে ; সোণার গুলিও ময়লা পড়িয়া ঔজ্জ্বল্য হারাইয়াছে। নীচে দিকের বাটগুলি মোটা এবং বড় ;

উপরেরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট—কিন্তু সিন্দুকের তলদেশ হইতে উপরের কিনারা অবধি ঠাসা। কত মণ সোণা এভাবে সজ্জিত রহিয়াছে এবং প্রতিমণ সোণার মূল্যই বা কত ইহা কিশোরী মনে মনে হিসাব করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক-যন্ত্র তখন এমন বিকল হইয়া গিয়াছে যে, কোনও অনুমান করিতে সে সমর্থ হইল না। কেবল এই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, আমি যদি ইহাকে বিবাহ করি, তবে এ সমস্তই আমার—সমস্তই আমার। একটা রাজার ঐশ্বর্য্য—সমস্তই আমার হইতে পারে।

কিশোরীর চক্ষু দুইটী তখন রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, দৃষ্টি বিভ্রান্ত সেই চোখেই তবুও সে দেখিতে পাইল, দুই থাকের মধ্যে খানিকটা ব্যবধান, তাহার মধ্যে একটি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বড় বাক্স বসানো রহিয়াছে। নিনা সেটি তুলিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বলিল, "এতে খালি পাথর। বাবা বলিতেন এগুলি খুব দামী পাথর।"—ছোট বড় নানা আকারের লাল, শাদা, নীল, পীত রত্নরাজি—হীরা মোতি, চুনি, পান্না, নীলা পোখরাজ কত কি! সেগুলি যেরূপ ঔজ্জ্বল্য-বিশিষ্ট, তাহাতে কিশোরীর স্পষ্টই ধারণা জন্মিল যে সেগুলি ঝুটা নহে—পরন্তু মহা মূল্যবান। পেটকস্থিত সেই উজ্জ্বল রত্নরাজির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিশোরীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তাহার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হাতের প্রদীপ পড়িয়া গিয়া সেই গহ্বরগহ্বর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া গেল—কিশোরী সশব্দে সেখানে পড়িয়া গেল।

নিনা চমকিত হইয়া আন্দাজে কিশোরীর নিকটে আসিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিল, "কেন কেন দাদাবাবা? তুমি পড়িয়া গেলে কেন?"

কিশোরী বলিল, "চল চল নিনা, এখান হইতে চল—বদ্ধ বায়ুতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে। একটু—তাজা হাওয়া—উঃ!"—বলিতে বলিতে সে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। ইহা বুঝিয়া, নিনা তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া ফেলিল; বলিল, "বেশ ত—ওঠ—চল আমরা ঘরে ফিরিয়া যাই।"

কিশোরী কিন্তু কথা কহিল না। তাহার সংজ্ঞা তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শয়ন গুহায়।

নিনা তাড়াতাড়ি চকমকি ঠুকিয়া, গন্ধকের শলাকা জ্বালাইয়া দেখিল, প্রদীপটি উল্টাইয়া পড়িয়াছে; আলো জ্বালিবার উপায় নাই। সে তখন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। জল নাই যে রোগীর মুখে চোখে ছিটা দিবে; পাখা নাই যে বাতাস করিবে; জানালা নাই যে খুলিয়া দিয়া ঘরে তাজা বাতাস আমদানী করিবে। এখনই ইহাকে মঠে লইয়া যাওয়া আবশ্যক—সে কার্য্যে একা মানুষ সহায় পর্য্যন্ত নাই;—ফুরচিং; সাইলা আজ মঠে থাকিলেও, তাহাদিগকে এ গুপ্ত ভাণ্ডারে লইয়া আসা চলিত না।

নিনা কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিল। তাহার পর, সে নিজ কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া লইল। চকমকি দীপশলাকা প্রভৃতি প্রথমে সাবধানে পেট-কাপড়ে বাঁধিয়া লইল। তার পর কিশোরীর সম্মুখে, নিজে পিছু ফিরিয়া বসিয়া, তাহার হাত দুটিতে নিজ গলদেশে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, আপন ওড়না দিয়া হাত দুটিকে শক্ত করিয়া বাঁধিল। তাহার পর, নিজ বাহুদ্বয় পশ্চাতে প্রসারিত করিয়া, কিশোরীর উরুদেশ চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া বিপুল চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া, কিশোরীর পদদ্বয় আপন কোমরে জড়াইয়া সম্মুখে আনিয়া, উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া, সেই কোষাগার হইতে বাহির হইল। এবং ধীরপদক্ষেপে সুরঙ্গ পথে ফিরিয়া চলিল। চাবির গুচ্ছ প্রভৃতি সব সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

ঘোর অন্ধকার। কিন্তু নিনা কিছুমাত্র ভীত হইল না। এ সুরঙ্গ পথ তাহার পরিচিত—অভ্যস্ত। তবে

মুস্কিল এই যে, পথটি আগাগোড়া সরল নহে ; মাঝে মাঝে মাঝে বাঁক আছে। প্রথম বাঁকে আসিয়াই, পাথরে নিনার মাথা ঠুকিয়া গেল—কিন্তু তাহা সে গ্রাহ্য করিল না। সেই গুরুভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া, বহু ক্লেশে, ক্রমে সে নিজ শয়ন-গুহায় আসিয়া পৌঁছিল। আন্দাজে আন্দাজে কিশোরীকে আপন শয্যায় শোয়াইয়া দিয়াই, শয়নগুহা হইতে অপরকক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বাহিরের কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিল। অমনি হুহু করিয়া হিমালয়ের রাশি রাশি ঠাণ্ডা তাজা হাওয়া ভিতরে ছুটিয়া আসিল।

নিনা অতঃপর অগ্নি উৎপাদনের উপকরণগুলির সাহায্যে প্রদীপ জ্বালিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া, তাহার নাসারন্ধ্রের নিকট অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া দেখিল, নিশ্বাস বহিতেছে। তখন সে উন্মাদিনীর মত বলিয়া উঠিল—"হ্লা সোল! হ্লা সোল!"—দেবতাদের নিকট নিজ কৃতজ্ঞহৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল; কারণ নাজালামা এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে কি না, এ বিষয়ে তাহার মনে বিষম সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

এখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতে হইবে। কলসী হইতে, বরফের মত কনকনে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া লইয়া, নিনা কিশোরীর মাথায় থাবড়াইয়া দিতে লাগিল। মুখ ও কাণ দুটী জলসিক্ত করিয়া দিয়া, তাহার ওষ্ঠে, গণ্ডে, মস্তকের কেশে, পাগলিনীর মত চুম্বন করিতে লাগিল। অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল "জাগ, জাগ প্রিয়তম! তুমি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে, আমার জগৎ যে অন্ধকার হইয়া যায়!" কিন্তু ইহাতেও কিশোরীর চেতনা ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, অবশেষে তাহার আলখাল্লা উন্মোচন করিয়া ভিতরের জামাগুলির বোতাম খুলিয়া দিয়া, গলা ও বুকের উপর নিনা জলের ঝাপ্টা দিতে লাগিল। হাতপাখা ছিল না—ও জিনিষের সেখানে প্রয়োজনই বা কি? তবে রাঁধিবার সময় আগুন ধরাইবার জন্ত চেরা বাঁশের একখানা চৌকা পাখা ছিল, তাহাই লইয়া নিনা কিশোরীর মাথায় মুখে বুকে ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এইরূপে হাওয়া করিবার পর, কিশোরী একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, পাশ ফিরিয়া শুইল। নিনা তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া, ভগ্নকণ্ঠে ডাকিল, "নাজালামা!"

"অ্যাঁ?"—বলিয়া কিশোরী চোখ খুলিয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া, নিনার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

নিনা বলিল, "এখন কেমন আছ নাজালামা? আর কোনও কষ্ট আছে কি?"

"হাঁ। আমার বড় শীত করিতেছে।"

নিনা উঠিয়া গিয়া বাহির কক্ষের দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। নিজ বস্ত্রাঞ্চলে কিশোরীর মাথা মুখ ও বুক সযত্নে মুছাইয়া দিয়া, অঙ্গবস্ত্রগুলি আবার আঁটিয়া দিল। কিশোরী ক্ষীণস্বরে বলিল, "বড় পিপাসা!"

নিনা জল আনিয়া দিল। পানান্তে কিশোরী কষ্টে বলিল, "আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, না?"

"হাঁ।"

"এখন মনে পড়িতেছে—তোমার সেই কোষাগারে আমার ভয়ানক গরম বোধ হইতেছিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। সেখান হইতে আমি আসিলাম কিরূপে?"

নিনা বলিল, "আমি তোমায় পিঠে করিয়া আনিয়াছি।"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "অ্যাঁ! তুমি আমায় বহিয়া আনিয়াছ?"—বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল, পাহাড়ী মেয়েরা, কত বিষম ভারী ভারী জিনিষ পৃষ্ঠে বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে পথ অতিক্রম করে; ইহা সে দার্জ্জিলিঙে দেখিয়াছে। নিনাকে নীরব দেখিয়া বলিল, "আহা, তোমার ত বড় কষ্ট হইয়াছে নিনা! কেন অত কষ্ট করিলে? সেইখানে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে বোধ হয় আবার আমার চেতনা ফিরিয়া আসিত।"

নিনা বলিল, "তুমি যে তাজা হাওয়া চাহিয়াছিলে; সেখানে তাহা আমি কেমন করিয়া যোগাইতাম?"

কিশোরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "ঠিক। তাজা হাওয়ার জন্ত আমার প্রাণটা বড়ই ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল—তাহা বেশ স্মরণ হইতেছে। মনে হইতেছিল, আমার সমস্ত দেহের রক্ত যেন সোঁ

সোঁ করিয়া মাথায় উঠিতেছে।”

নিনা বলিল, “এখনও তোমার চোখ দুট লাল রহিয়াছে। একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর না কেন?”

কিশোরী বলিল, “হাঁা ঠিক বলিয়াছ। আমি তোমার বিছানাটি দখল করিয়া, দিব্য আরামে গল্প করিতেছি—আমি এমনি স্বার্থপরই বটে। আমি তবে ও ঘরে গিয়া শুই; তুমি এবার বিশ্রাম কর।”—বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল।

নিনা বলিল, “না না, আজ তোমার ও ঘরে শুইয়া কায নাই; আজ আমি তোমায় একা ছাড়িয়া দিতে পারিব না? যদি রাত্রে আবার অসুখ বাড়ে, তখন তোমায় দেখিবে কে?”

কিশোরী বলিল, “কিন্তু নিনা, ভাবিয়া দেখ—”

“সে আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি!”

কিশোরী বলিল, “কোনও তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত নাই—”

নিনা বাধা দিয়া বলিল, “এই রাত্রে এখন আমি তৃতীয় ব্যক্তি কোথায় পাই বল? একটা গড়িব?”

কিশোরী বলিল, “লোকে যদি—”

নিনা বলিল, “লোক কোথায়? প্রতিবেশীর মধ্যে কতকগুলি চমরী হরিণ, আর নীল গাই—তা, এই অর্দ্ধরাত্রে, পরকুৎসার উপকরণ খুঁজিতে তারা বাহির হইবে না—ঐ উপত্যকা মধ্যে নিজ নিজ গহ্বরে আরামে নিদ্রা যাইতেছে। তুমি বড় তর্কবাগীশ হইয়াছ। তর্ক কাল করিও, আজ এখন ঘুমাও। আমি ঐ ঘরে গিয়া শুইতেছি।”—বলিয়া নিনা, গুহাপ্রান্তস্থিত কাষ্ঠাধার হইতে খানকতক কম্বল বাহির করিয়া, অপর কক্ষে প্রবেশ করিল। তথায় নিজ শয্যা রচনা করিয়া, গুহামধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, অস্ত্রাধার হইতে চক্‌চকে একখানা ছোরা এবং একটি বন্দুক বাহির করিয়া বন্দুকটি ভরিতে লাগিল। কিশোরী তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এত রাত্রে এসব কি হইতেছে?”

নিনা বলিল, “আমার বিছানার নিচে থাকিবে। এ কাছে না থাকিলে আমার ঘুম হয় না। অনেক দিনের অভ্যাস যে!”—বন্দুক ভরা হইলে অস্ত্র দুইটি ও-ঘরে রাখিয়া নিনা আবার ফিরিয়া আসিল। প্রদীপের পলিতায় আবশ্যক মত সংস্কার করিয়া, একটি বাঁশের চোঙা হইতে তেল ঢালিয়া দিয়া বলিল, “সমস্ত রাত এই আলো এখানে জ্বলিবে। যদি আবার শরীর অসুস্থ বোধ কর, কিংবা কোনও জিনিষের তোমায় আবশ্যক হয়, তখনই আমায় ডাকিতে যেন দ্বিধা করিও না। আর একটি কথ। আমার এই শয়নগুহা মধ্যেও একটি রত্ন আছে—তাহা তোমায় দেখাই নাই। এই দেখ।”—বলিয়া নিনা সরিয়া গিয়া, ভিত্তিগাত্রের এক অংশ হইতে, পশুলোম-রচিত একটি পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল। কিশোরী সবিস্ময়ে দেখিল, সেই কৃষ্ণ পাষাণে একটি কুলুঙ্গি খোদিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে, প্রায় দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত একটি ধ্যানীবুদ্ধ-মূর্ত্তি।

নিনা সেই স্থানের নিম্নে, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, সেই মূর্ত্তির পানে নিজ ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, করযোড়ে, কিশোরীর দুর্ব্বোধ্য ভাষায়, কি মন্ত্র অথবা স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা কিশোরী বুঝিল না। অল্পক্ষণেই তাহা শেষ হইল; নিনা দেবতাকে প্রণাম করিতে লাগিল। প্রণামান্তে উঠিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া বলিল, “প্রভুর আচ্ছাদনখানি আজ আমি খুলিয়া রাখিলাম। আমি উঁহার নিকট ভিক্ষা মাগিয়াছি—আজ সারা রাত তিনি তাঁহার সর্ব্বভয়হারী দৃষ্টি তোমার প্রতি স্থাপিত রাখিবেন; দেব কি দানব, যক্ষ কি কিন্নর, ভূত কি মানুষ কেহই তোমার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। মাতৃবক্ষে শিশু যেমন নিদ্রা যায়, ভগবান তথাগতের প্রসন্ন দৃষ্টিতলে তুমিও তেমনি নিঃসঙ্কোচে নিদ্রা যাও। আমি এক্ষণে তোমায় শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিতেছি।”—বলিয়া সে অপর কক্ষমধ্যে অদৃশ্য হইল।

কিশোরী, সেই বুদ্ধমূর্ত্তির পানে কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া, করপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কাশীতে সরস্বতীপূজা

(বারাণসী বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর সারস্বত সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ)

শ্রীপঞ্চমী—১৩৩০, মাঘ।

কলিকাতা ছাড়িয়া যখন কাশী আসি তখন আর যাই কিছু মনে থাক্, নেশার কথাটা যে মনে ছিল না, এ কথা নিশ্চিত। যে দায়ে পড়িয়া সে দিন বাংলা-মায়ের কাছে বিদায় নিয়াছিলাম, সে কথা তুলিয়া বান্ধবজনকে আজ বেদনা দিব না, তবে সঙ্গে সঙ্গে তীর্থদর্শন বা স্বাস্থ্যলাভের লোভও যে কিছু মাত্রছিল না, সত্যের খাতিরে সে কথাও বলিতে পারিব না। আসল কথা যাহা সেদিন মনের মধ্যে জাগিতেছিল, তাহা বারাণসীর বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বেশ্বরের বারাণসী। শিবের সঙ্গে শান্তির সম্বন্ধ—সেই শান্তিই সেদিন এ দুর্ভাগ্যের পরম কাম্য ছিল।

আসিলা দেখিলাম, বিশ্বনাথ যুগযুগান্তর ধরিয়া যেমন, তেমনি বিরাজমান। সর্ব্বভূতসাক্ষী মহামহেশ্বর আশুতোষ দেশদেশান্তর-মিলিত তীর্থাগত ভক্তের ভক্তির অর্ঘ্য তেমনি নিঃশব্দেই গ্রহণ করিতেছেন; পূর্ব্বশিরে জটাবিহারিণী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মন্দাকিনী উত্তরবাহিনী রূপে নিখিল জনের দেহমনের তাপ-ক্লান্তি-মালিন্য নাশে চঞ্চল চরণে চিরব্যস্ত—অমৃতোপম ক্ষীরনীর পরিবেষণে মুক্তহস্ত। অন্নপূর্ণা তাঁহার অন্নের থালি বহিয়া মোক্ষ বুভুক্ষুর ক্ষুন্নিবৃত্তিতৎপরা।

কিন্তু মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণার যে অন্ত নাই; অন্নপূর্ণার পরমান্নেও তাহার সকল ক্ষুধা মেটে না। শঙ্করমৌলিনিবাসিনী অমৃতনিঃস্যন্দিনী মন্দাকিনীও বুঝি তাহার নিখিল তৃষ্ণাহরণে অসমর্থা—মনের পেট তার এমনি বড়, আর এমনি বিচিত্র! আদি কেশব হইতে আরম্ভ করিয়া নরনারায়ণেশ্বর পর্য্যন্ত কত-না দেবতার চরণধূলা মাথায় তুলিয়া লইলাম; বিশ্বেশ্বর হইতে কেদারেশ্বর পর্য্যন্ত কত-না বিগ্রহেরই পাদোদক পান করিলাম, কত দুর্গাবাড়ীর দুর্গা, কত মণিকর্ণিকার আনন্দময়ীর মহাপ্রসাদই না গ্রহণ করিলাম, কিন্তু সরস্বতীর পদ্মবনের মধুমদিরার যে বিষম নেশা বাল্যকাল হইতে আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, সেই নেশাটা মাঝে মাঝে চিত্তকে এমনি উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিত যে, এই শান্তিময় শিবপুরীতে মনটা থাকিয়া থাকিয়া ভারি অশান্ত হইয়া উঠিত।

শুনিয়াছি, যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—তাই সেদিন যখন সন্ধ্যার পর গঙ্গাতীর হইতে দশাশ্বমেধের পথে ঘরে ফিরতেছি, সহসা দেখি, সেই চিরাভ্যস্ত নেশাটারই আয়োজন লইয়া কয়েকটি দেশীয় বন্ধু তাঁহাদের রসের দোকানে পিপাসার্ত্তকে আহ্বান করিতেছেন। নেশাখোরকে নেশার আমন্ত্রণ—আর দেখে কে? নিমেষের মধ্যে দলে ভিড়িয়া পড়িলাম। তার পর যাহা ঘটিল, বোধ করি, তার আর সাক্ষ্য আবশ্যক করিবে না। সুদূর প্রবাসী এই অতি ক্ষুদ্র নগণ্য লেখক, আতিথ্যগৌরববলে আজ আপনাদের সম্মুখে যে আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে, তাহা যেমন অসঙ্গত, তেমনি-বা অশোভন! কিন্তু নেশাখোরের যদি সেই কাণ্ডজ্ঞানই থাকিবে, তবে আর তাহাকে নেশা বলিবে কেন? নেশার ঘোরে সকলে মিলিয়া যাহাকে রাজাসন দিয়া ফেলিল, সে যে সত্যকার রাখাল, তাহা দলের লোকে ত বিশ্বাস করিবেই না, আপনারাও যাঁরা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দলে যোগ দিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁরাও বোধ করি মানিয়া লইতে চাহিবেন না। তথাস্তু বলিয়া তাই সেও সেই উচ্চাসনে উঠিয়া বসিল, অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, কারণ দলের যিনি পাণ্ডা, তিনি

এমনি নাছোড়বান্দা যে বাধা দিতে গেলে হয়ত-বা রক্তারক্তি হইয়া যাইত।

আজকার এই পুণ্যমঙ্গ শ্রীপঞ্চমীতিথি সাহিত্য-রস-পিপাসুর বড় আনন্দের দিন—একেবারে মহামহোৎসব। বিশ্বারাধ্যা বীণাপাণির বরমন্দিরযাত্রী পথিক বৎসরান্তে আজ তাঁহার দর্শিতদ্বারে সমাগত। সংসারের সকল সার্থক পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা যে সুদুর্গম পথের যাত্রিক, সেই দুস্তর পন্থা তাঁহার দীর্ঘ ক্লেশাবসানে তাঁহাদের চিরকাম্য বরমন্দিরে আজ অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে। সম্মুখে আজ যে দিব্যমূর্ত্তি বিরাজিত, তাঁহারই অমল-চরণ কমলগন্ধে চিত্ত-ভ্রমর তাঁহাদের চির উন্মুখ।

যা কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা যা শ্বেত-পদ্মাসনা,
যা বীণা বরদণ্ড-মণ্ডিত-ভুজা যা শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা,
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,

—সেই বিশ্বারাধ্যা বাগ্দেবী তাঁহার দুগ্ধশুভ্র শুচিশান্ত মূর্ত্তিমধ্যে ভক্তের আহ্বানে আজ প্রাণপ্রতিষ্ঠিতা।

'যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই আমার প্রাণ রে'—তেমনি 'যেজন সারদা ভজে সেই আমার প্রাণ'—তাই সেই অন্তরঙ্গতায় মায়ের অখিল ভক্তজন আজ পরস্পরকে বক্ষে জড়াইয়া কৃতকৃতার্থ। বৎসরান্তে মধুমিলন যজ্ঞ এই সারস্বত সম্মিলন, সাহিত্য-সঙ্গীত-সরস্বতীর পাদপদ্ম পূজার এই শুভ পুণ্যাহ তাঁহাদের বাণী সাধনার অন্যতম পরম পুরস্কার।

যুগযুগান্তর সংখ্যাতীত জনগণসেবিত মর্ত্তধামের মধ্যমুকুটমণি মহাপবিত্র এই কাশী; বিশ্বরাজ বিশ্বেশ্বরের আনন্দলীলা-নিকেতন অনন্ত উদার এই বারাণসী সকল তীর্থের পরম তীর্থ, তীর্থসারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সকল জাতি সম্প্রদায়, সকল ধর্ম্মপথ লোকমত, সকল সাধনমার্গ ভজনপর্ব্ব, বরুণা অসীর এই শুভসঙ্গমে এই পঞ্চগঙ্গায় চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা,
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত সাগর লহরী সমানা।

তেমনি কাশীর এই পুণ্যপূত বক্ষে মর্ত্তধামের যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ যাহা-কিছু পবিত্র, যাহা-কিছু সৎ ও যাহা-কিছু মহৎ, সাগর লহরী সমান উদিত মুদিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। কাশীখণ্ডের দেব দেবতা মুনিঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া কত ব্যাস তুলসী, কত বুদ্ধ চৈতন্য, কত ধ্রুব প্রহ্লাদ, কত দিবোদাস হরিশ্চন্দ্র, কত শঙ্করাচার্য্য প্রকাশানন্দ, কত অহল্যা ভবানী, কত ভাস্করানন্দ বিবেকানন্দ, কত রণজিৎ প্রতাপাদিত্য চৈৎসিংহ উঠিয়াছে—ফুটিয়াছে—টুটিয়াছে,—ন তুয়া আদি অবসানা। নিত্যকাল সাক্ষী মহাকালরূপী মহাদেবই তার একক দ্রষ্টা। কত যজ্ঞ কত সমাধি, কত তপস্যা কত দান, কত সাধনা কত জ্ঞান, কত ভক্তি কত ধ্যান, এই মহাতীর্থের প্রত্যেক ধূলিকণাকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে, সেই পরম পুরুষ বিশ্বনাথ ব্যতীত, তাহারই বা ইয়ত্তা করিবে কে?

যেমন ধ্যানের তেমনি জ্ঞানেরও পরম পীঠ এই কাশী। যিনি শিব, তিনিই সরস্বতী। শিবরূপাং সরস্বতীং বৃন্দাং বৃষভবাহিনীং চিরসত্য শাস্ত্রবাক্য—তাই জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের মহামিলনভূমি এই বারাণসী যোগবাণীর যুক্তবেণী-সঙ্গম। যুগে যুগে কালে কালে ইহা এমনি নিত্য প্রত্যক্ষ যে ভারতের অখিল জাতি সম্প্রদায় চিরদিন ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এই-খানেই ত বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়। কাশীরই নগরোপকণ্ঠে সারনাথের মৃগকাননে জ্ঞানীবুদ্ধের প্রথম ধর্ম্ম প্রচারকার্য্য সমারব্ধ হইয়াছিল, অসংখ্য স্তূপে স্তূপে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। যাগযজ্ঞের নির্দ্দয় পশুঘাত অহিংসা মন্ত্রে নিবারিত হইয়াছিল। আবার এই খানেই জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য সেই ভুবন-বিশ্রুত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিয়া 'সোহহং শিবোহহং' অদ্বৈতবাদে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইখানেই মহামনীষী প্রকাশানন্দ একদিন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের নিকট পরাজিত হইয়া জ্ঞানমার্গ পরিহার পূর্ব্বক ভক্তিমার্গান্বেষণে প্রবোধানন্দ

নামে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও কতদিনের কথা!

তারপর, অধুনাতনকালের নবধর্ম থিয়সফিও স্থান-মাহাত্ম্যে এইখানেই প্রসারলাভ করিয়াছিল। পরমহংস দেব রামকৃষ্ণের নরনারায়ণরূপী লোক-সেবাধর্ম্মও এই খানেই বিশেষ করিয়া মহাসার্থকতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। নব অভ্যুদিত ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলেরও প্রতিষ্ঠা এই কাশীতেই। তাই বলিতেছিলাম, সকল ধর্ম্মমতের সমন্বয় ভূমি এই বারাণসী, তাই বলিতেছিলাম নিখিল ধর্ম্মরাজি তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত সাগর লহরী সমানা। তাই বলিতেছিলাম, হে কাশী, ন তুয়া আদি অবসানা।

আজ যে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় এই কাশী সীমান্তে সরস্বতী-সেবাকল্পে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্থানমাহাত্ম্যে তাহা একদিন জ্ঞানগৌরবভূয়ান্ নালন্দা তক্ষশিলার শ্রেষ্ঠতর সংস্করণরূপে অখিল-বিদ্যামন্দির যাত্রীর অভিনব তীর্থ হইয়া উঠিবে, একথা আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি।

জাতীয় এই অভ্যুত্থান-দিনে চিরজ্ঞানগরীয়ান্ পুণ্য-পীঠ এই বারাণসীতে বঙ্গবাসীর এই বাণীপূজা বিশেষ করিয়াই আমাকে আনন্দদান করিতেছে। আজ যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা জানেন, কাশীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা কত অধিক। কি সহরে, কি সহরের বাহিরে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে—সর্ব্বত্র বঙ্গবাসী আজ প্রসার লাভ করিয়াছে। সকলকে আহ্বান করিয়া যুক্তকরে আমি আজ তাঁহাদের অনুরোধ জানাইতেছি, যেন তাঁহারা মাতৃভাষার চর্চ্চার এই মহা অবসর হেলায় না হারান। ক্ষেত্রহিসাবে আজ সে অনুশীলনে "আবাদ করলে ফলবে সোনা" এ কথা নিশ্চিত।

যে কাশী অখিল দেব দেবতার পুণ্যপীঠ, সেই কাশীতে তাঁহাদের বঙ্গ-বাণী-জননীর সুযোগ্য বরঃবর্দ্ধী দিনে দিনে যেন প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। সে পুণ্য-মন্দির নির্ম্মাণ যে আপনাদেরই হাতে, এ কথা যেন আপনারা ভুলিয়া না যান। এমন কোন্ বাণীসেবক আছেন যিনি তাঁহার চিরকাম্য দেবতার পুণ্যমন্দির প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ-ম্মন্য না মানিবেন? এমন কি কেহ আছেন যিনি সেই শুভচেষ্টাকে জীবনের পরম প্রার্থনীয় বলিয়া মনে না করিবেন? সে দিনও বিশ্ববরেণ্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আপনাদেরই আহ্বানে এইখানে আসিয়া বঙ্গবাণীর চরণে তাঁহার অর্ঘ্য দিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর প্রমথনাথ প্রমুখ বাগ্দেবীর বহু বরপুত্র আপনাদেরই আহ্বানে এই কাশী-সরস্বতী সেবায় আজ সমাগত; আপনারা তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া আজ কৃতার্থ। প্রবাসজ্যোতি, বঙ্গসাহিত্য ও অলকা আজ মায়ের যে জয় গান গাহিতেছে, তাহা যেন তাঁহারই উপযুক্ত হয় এই প্রার্থনা। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া সেই বাণী-বন্দনায় যোগদান করি। আসুন, সেই ত্রিভুবন বরেণ্যা বাগ্দেবীর পুণ্যপূজায় আজ আমরা অগ্রসর হই। আসুন, সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে সারদাকে ডাকিয়া আজ বলি—

বারাণসীতে বাণীপূজা

তব নামাঙ্কিত এই পুণ্যাসক্তি পঞ্চমীর দিনে,
তোমারি চরণাঙ্ক চিনে'
এসেছি তোমারি দ্বারে, অর্চ্চিবারে, হে বাঙ্ময়ী বাণি
ধ্বনির নূপুর-পরা ওই তব চরণ দু'খানি,
বহু ভাগ্য মানি;
শিবরূপা সরস্বতী লহ আজি ভক্তের আরতি
জনানি ভারতি!

বিশ্বারাধ্যা শক্তি আদ্যা তুমি বাণি, প্রণব ওঙ্কার,
সৃজনের প্রথম ঝঙ্কার!
তব সুরে সুর বাঁধি ভ্রাম্যমান সূর্য্য চন্দ্র তারা
নক্ষত্রাদি তরাজত; সিন্ধুবক্ষে তব ছন্দধারা
নাচে আত্মহারা;
সপ্তস্বরা তব বীণে সপ্তলোক উঠে শিহরিয়া
আনন্দে ভরিয়া।

কুন্দেন্দুতুষারশঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্য্যের রাশি,
মূর্ত্তিমাঝে উঠে বীণাপাণি ;
সিতবাসা স্মিতহাসা, শ্বেতশতদল শোভে পায়ে ;
হাসে পঞ্চমীর শশী, নন্দনের চন্দন ছিটায়ে
ধরিত্রীর গায়ে।
গুঞ্জরে নিখিল বিশ্ব: ভৃঙ্গসম ঘেরি দলে দলে
পাদপদ্মতলে।

সঙ্গীতের মধুচ্ছন্দা, জ্ঞানের অমৃত নিঃস্যন্দিনী
প্রণমামি চরণে জননি,
কি দিয়ে করিব পূজা, শ্বেতভুজা, কোন ছন্দডোরে,
কোন্ শব্দ-পুষ্পে গাঁথি কোন মাল্য পরাইব তোরে
শিখায়ে দে মোরে।
আজন্ম কাঙাল আমি, প্রসীদ মা পূজারী সন্তানে
তব জয়গানে।

কাঁদিছে তোমারে বেড়ি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী—
হ'তে চায় চরণ কিঙ্কিণী ;
জ্যোতির্ম্ময় নীহারিকা বরকণ্ঠে বরমাল্য দানে
যুগ যুগ ঘুরে মরে শূন্যোপরে সুযোগ-সন্ধানে
চাহি' মুখপানে ;
বিচ্ছুরিত সূর্য্যকর, সেতারের তার রচিবারে
ফিরে বারে বারে।

ছন্দের ইঙ্গিতে তব পঞ্চমেতে গাহিল কোকিল,
কুহুস্বরে ভরিয়া অখিল ;
মধুগন্ধে মধুমাস মাতে ওই মন্দ সমীরণে,
প্রমত্ত মঞ্জরীমেলা মেলে আঁখি মুগ্ধ আম্রবনে
ধরণী প্রাঙ্গণে ;
পলাশের কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জ পুঞ্জ অলক্তক রেখা
তব জয়-লেখা।

বছর ঘুরিয়া গেল, দেখা তব পাই নাই দেবি,
বড় সাধ শ্রীচরণ সেবি ;
আজি এই গঙ্গাতীরে শিব-পুরে বহুভাগ্য ফলে
যদি বা মিলিল দেখা, লহ অর্ঘ্য পাদপদ্মতলে
নয়নের জলে।
যত ভুল, ফুল হয়ে আজি তব ফুটুক চরণে
বরণে বরণে।

এস দেবী, এস মাতা, এস বিদ্যা, এস মা কল্পনা
এস বুদ্ধি বিবেক-বসনা !
এস মা করুণাময়ি, আবাহন করে ভক্তদল,
ফুটাও এ চিত্তসরে সাধনার শ্বেত শতদল
পবিত্র নির্ম্মল।
হে বাণি, তোমার বাণী সবাকার মন্ত্র হোক আজি
কণ্ঠে কণ্ঠে বাজ।

ফুকারি প্রাণের শঙ্খ সাধনার যুগ্ম করে ধরি'
বন্দি তোমা ত্রিভুবনেশ্বরি !
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ মন্ত্র যাঁর নিত্য জপ করে
ব্রহ্মা যাঁর বেদ বহে, বিষ্ণু যাঁরে পূজিছে অন্তরে,
কোটি কল্প ধরে'—
প্রণমি তাঁহারি পদে ; ষষ্ঠাঙ্গের পূর্ণ সেই নতি
লহ ভগবতি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

গ্রন্থ-সমালোচনা

অরুণিমা

কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত। ৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, ধন্বন্তরি প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ নন্দী কর্তৃক বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৩৯ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ৷৵০

পুস্তকখানি পাঠে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ছন্দের লঘুগতিতে, ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্যে কবিতাগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 'ফিরে পাওয়া' কবিতার শেষাংশ—

পরাণে জমে ওঠে কত না হারাধন,—
কত না হারা গান
হারানো কলতান
হারানো পরিচয়, হারানো সে মিলন।"

—বেশ লাগিল। 'উতল বরিষণে', 'বর্ষামিলন', 'নারী', 'নবাগতা', 'অতীত ভারত', 'রামায়ণ ও মহাভারত', 'মা', 'পাণ্ডু ও মাদ্রী' প্রভৃতি কবিতাগুলিও খুব ভাল হইয়াছে।

———

কবি গোবিন্দদাস।

সচিত্র জীবনী। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা মণিকা প্রেসে মুদ্রিত, রংপুর হইতে শ্রীপরেশমোহন হালদার কর্তৃক প্রকাশিত। ৩১৩ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲

আমরা সাগ্রহে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছি, পড়িতে পড়িতে চোখের জল রাখিতে পারি নাই। দাস কবির দৈন্যভরা, দুঃখময় জীবনকথা উপন্যাস অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাঙ্গালী বাংলার এই উজ্জ্বল রত্নটিকে যে কতখানি উপেক্ষা অনাদর করিয়াছে, তাঁহার প্রাণে কি আঘাত দিয়াছে, তাহা জানিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়। বাংলা সাহিত্যকে আজ আমরা বিশ্বসাহিত্যের উচ্চ আসনে বসাইয়াছি, অথচ যে সব শিল্পী বুকের রক্তে সে সিংহাসনের বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, দেশবাসীর উপেক্ষায়, অন্নাভাবে আমাদেরই ঘরে নিতান্ত পরের মত তাঁহারা মরণকে বরণ করিয়াছেন, এ কলঙ্ক কালিমা আমরা কেমন করিয়া মুছিব? গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন দুঃখের কবি, জন্মিয়াই তিনি দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন; দুঃখের কোলেই আজীবন প্রতিপালিত হইয়া তিনি মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। দীর্ঘ জীবনপথে চলিতে চলিতে দুঃখদৈন্য-পীড়িত কবি, অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে নিজের দুরবস্থার কথা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার চোখের জল মুছিয়া দেয় নাই। তাই বড় দুঃখে—অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন্মৃত কবি লিখিয়াছিলেন, "ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি ম'লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?"—কিন্তু তাই বা কৈ? তাঁহার চিতায় মঠও উঠে নাই—তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটা সাধারণ সভাও হয় না! জীবনী লেখককে দাস কবি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারি না, দুধ মাছ কি করিয়া খাইব? একদিন একটা কবিতা লিখিলে পাঁচদিন মাথা ঘোরে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে। যা হউক, একদিন মরিতে হইবেই, তাহার জন্য চিন্তা কি?" (১৭৯ পৃষ্ঠা) কত দুঃখে যে তিনি এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। দৈন্য কবির চিরসহচর ত ছিলই, তাহাও কিন্তু দুর্দ্দশার চরম হয় নাই। যে জন্মভূমির বর্ণনায় তিনি বলিয়াছিলেন,—

"শত স্বর্গ কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,—
অই যে অন্নপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হ'তে ভাই, পুণ্যতোয়া এ চিলাই,
কতঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার।
তাহারে ভুলব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে—"

সেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমি হইতে, একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চেষ্টায় কবি নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহার দোষ কে বলিবে?

গোবিন্দ দাস বাংলার কি ছিলেন, বাঙ্গালীর কে ছিলেন, সাহিত্যে তিনি কি দিয়াছেন, বর্ত্তমানে এ খবর অনেকে রাখেন না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মণিকোঠায় সাহিত্যপ্রিয় অতিথির দল যে দিন তাহার সম্পত্তি দেখিতে আসিবে, সেদিন আমরা দাস কবির মণি-মাণিক্য গুলি সাগ্রহে সগর্ব্বে তাহাদের সামনে ধরিয়া দিব।

গোবিন্দ দাস আজ নাই, কিন্তু এই সাহিত্য-শিল্পীর প্রতি কি আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই? মহত্ত্বের স্মৃতিপূজা করিয়া আজও কি বঙ্গ না মহত্ত্বের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবে? এই জীবনী রচনা করিয়া হেমবাবু বঙ্গসাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। মিত্র মহাশয়ের ভূমিকাটিও বেশ উপযোগী হইয়াছে।

দাস কবির প্রতি বিশিষ্ট ব্যক্তির আচার ব্যবহার ও মনোভাবের বর্ণনায় জীবনীখানি উপন্যাসের চেয়েও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কয়েকখানি ছবিতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়াছে। অর্থব্যয় করিয়া বাজে গল্প উপন্যাস অনেক পড়িয়া থাকেন, আমরা প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে এই বইখানি পড়িবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

———

মর্ম্মবাণী

কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত কালচাঁদ দালাল প্রণীত। বীরভূম শান্তি নিকেতন প্রেসে মুদ্রিত ও শান্তিপুর-নদীয়া হইতে শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ৩৬ পেজি, ৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০

প্রায় সব কবিতাই ব্যক্তি-বিশেষের উদ্দেশে লিখিত বলিয়া, খুব ভাল না হইলেও, চলনসই হইয়াছে।

———

কবির স্বপ্ন

আলোচনা গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস প্রণীত ও তাঁহার দ্বারা পাবনা রজনীকান্ত পাঠাগার হইতে প্রকাশিত। ৩১ পৃষ্ঠা মূল্য ।০

লেখক রবীন্দ্রনাথের "খেয়া" কাব্যের ভাব সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ছোট বইখানি অন্তঃ-সৌন্দর্য্যে বেশ ভারী হইয়াছে। কাব্যরসপিপাসুগণ পাঠে তৃপ্ত হইবেন।

"কান্তি।"

আমাদের কথা

আজ এই নববসন্তের শুভ্র প্রভাতে, "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র নববর্ষে, আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও সহকর্ম্মী লেখকবর্গকে আমাদের অভিবাদন জানাইতেছি।

কাগজের বাজার যখন খুব চড়িয়া গিয়াছিল, তখন আমরা, পত্রিকার মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু কমাইয়া দিয়াছিলাম। এখন কাগজের বাজার কিছু নামিয়াছে (যদিও যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহা দর ছিল, এখনও তাহার প্রায় তিনগুণ আছে)। তাই আমরা এ বর্ষ হইতে এক ফর্ম্মা বাড়াইয়া দিলাম—অর্থাৎ প্রতিমাসে ১০৪ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা প্রকাশ করিব।

"শ্রুতি-স্মৃতি" অনেক দিন বন্ধ গিয়াছিল—তজ্জন্য বহু গ্রাহক ও পাঠক আমাদিগকে বিস্তর অনুযোগ করিয়াছিলেন। এই সংখ্যা হইতে, শ্রুতিস্মৃতি পুনঃপ্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল; এখন ইহা পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিমাসেই প্রকাশিত হইবে। "শ্রুতিস্মৃতি" প্রথম ভাগ গ্রন্থাকারে প্রকাশ জন্য যন্ত্রস্থ হইয়াছে। আশা করি উহা বৈশাখ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

চৈত্র সংখ্যায়, অন্যান্য রচনা মধ্যে, নিম্নলিখিত রচনাগুলি ছাপা হইতেছে—

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—"শিবাজী মহারাজের পর্ত্তুগীজ অপবাদ।"

রায় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর—

"কুট্টালম্" (সচিত্র ভ্রমণ)

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়—

"সুলোচনার ডায়েরি" (গল্প)

শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্য—"দুঃখের শেষ" (গল্প)

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—

"পোষ্ট মাষ্টার" (গল্প) ইত্যাদি

—তা ছাড়া ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনাগুলি ত থাকিবেই। শ্রুতিস্মৃতিতে চৈত্রে দিল্লী বর্ণনা শেষ হইবে।

কলিকাতা
১৪এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



নীলাম্বরী।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ মজুমদারের সৌজন্যে।

মানসী

মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ
১ম খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩০

১ম খণ্ড
২য় সংখ্যা

শিবাজী মহারাজের পর্টুগীজ অপবাদ

যুরোপীয় লেখকদিগের বিশ্বাস—সাহস, রণকৌশল এবং সামরিক প্রতিভা শ্বেতজাতিরই একচেটিয়া। তাই কৃষ্ণচর্ম্ম মনুষ্যেও কখনও কখনও এই সকল গুণ দৃষ্ট হইলে তাঁহারা বিস্মিত হইয়া কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হন। এই প্রকার গবেষণার ফলে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হয় তাহা বাস্তবিকই অভিনব ও 'চমকপ্রদ' এবং তাহা সত্যের হিসাবে যতই তুচ্ছ হউক না কেন, কল্পনার চমৎকারিত্বে বাস্তবিকই অতুলনীয়। শিবাজী সামান্য অবস্থা হইতে মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া এক বিরাট রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন; তাঁহার প্রতাপে মুঘল সাম্রাজ্য কম্পিত হইয়াছিল, বিজাপুরের শক্তি চূর্ণ হইয়াছিল, দক্ষিণের ছোট ছোট সামন্ত নরপতিরা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। শিবাজীর শক্তি বিশেষভাবে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল যুরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের মনে। তাহারা আসিয়াছিল এই কল্পবৃক্ষের দেশে—তাহার শাখা নাড়িয়া অজস্র স্বর্ণ-মুদ্রা কুড়াইয়া লইবার অভিলাষে। শিবাজীর উপদ্রবে তাহাদের কেনাবেচা ব্যবসা বাণিজ্যের বড়ই ক্ষতি হইতে লাগিল। সুতরাং ইংরাজ, ডাচ এবং ফরাসী বণিকেরা বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহাদের অসন্তোষের ছায়া সেকালকার চিঠিপত্রে বিশেষ ভাবে পড়িয়াছিল। যুরোপীয় জাতিদের মধ্যে পর্টুগীজেরাই বাণিজ্য ব্যপদেশে সর্ব্বপ্রথম এদেশে আসেন। তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম ছলে বলে কৌশলে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এক সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপন করেন। শিবাজীর অভ্যুদয়ের সময়ে পর্টুগীজ শক্তির পতন আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে পর্টুগীজদিগের সহিত শিবাজীর সেনাগণের সামান্য সংঘর্ষও হইয়াছিল। সেকালের ইংরাজ ও ফরাসী লেখকেরা শিবাজীর কথা তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। পর্টুগীজ ভাষাতেও শিবাজীর সমকালীন জীবনচরিত আছে। গ্রন্থকারের নাম কসমে ডা গর্ডা। তাঁহার নিবাস গোয়ার অন্তর্গত মোরমুগাঁও, তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল পর্টুগালের রাজধানী লিসবন নগরে, খ্রীষ্টীয় ১৭৩০ সালে।

শিবাজীর সভাকবি ভূষণ, মনিবের শক্তির প্রাবল্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ফিরিঙ্গী অর্থাৎ পর্টুগীজেরা তাঁহার ভয়ে থর থর কম্পিত হইত। পর্টুগীজেরাও শিবাজীর শক্তিমত্তা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহাদের সমস্যা—কৃষ্ণ দেহে এত বল কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর গার্ডা দিয়াছেন। তাঁহার মতে শিবাজী জনসমাজে আদিলশাহের সেনাপতি শাহজীর কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া পরিচিত হইলেও, তিনি আসলে বাসিন সন্নিহিত ভিরার গ্রামের পর্টুগীজ জমিদার ডম ম্যানুয়েল ডি মেনিজিসের জারজ পুত্র ছিলেন। এই অসম্ভব কথা লইয়া পরবর্ত্তী আর একজন পর্টুগীজ লেখক আরও মাথা ঘামাইয়াছেন। তিনি বলেন, মেনেজিস পরিবার নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান, তাঁহাদের বংশে বিধর্ম্মীর জন্ম অসম্ভব। মেনেজিসেরা পর্টুগালের রাজভক্ত প্রজা, তাঁহাদের বংশে বিদ্রোহীর জন্ম হইবে কেন? কিন্তু শিবাজী যে সাহস ও বিক্রমের অধিকারী ছিলেন, তাহা মেনেজিস বংশেই সম্ভব। শেষোক্ত লেখকও গার্ডার মত সেকালের লোক, সুতরাং তাঁহার জল্পনা কল্পনাও না হয় ক্ষমা করা গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একালের পর্টুগীজেরাও গার্ডার সাক্ষ্যের জোরে শিবাজীকে তাহাদের ঘরের ছেলে বলিয়া দাবী করিতেছেন। এ দাবী ইতিহাসের আদালতে প্রমাণ হইলে পর্টুগীজদিগের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

ডাক্তার জেমসন ডা কুন্‌হা পর্টুগীজ-ভারতের লোক হইলেও বোম্বাই নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ে চিকিৎসক ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সভ্য ও অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই সভার জন্যই তিনি Origin of Bombay নামক এক বিরাট প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করেন। গার্ডার প্রচারিত কুৎসিত কাহিনীর বলে এই গ্রন্থে তিনি শিবাজীকে আপনার 'জাতভাই' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সেকালে ফিরিঙ্গির ভাষায় লিখিত কোনও কেতাবে শিবাজী মহারাজকে কি গালি দেওয়া হইল, মহারাষ্ট্রের লোকেরা তাহার খোঁজ রাখিত না; কিন্তু একালের ইংরাজী শিক্ষিত মহারাষ্ট্রবাসী রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার সহকারী সভাপতির সঙ্কলিত ইংরাজী গ্রন্থ উপেক্ষা করিতে পারেন না। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে, ডাকুন্‌হার জবাব একটু তীব্রভাবেই সাতারার সরস্বতী মন্দিরে দিয়াছিলেন।

তখন কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, এই বিতণ্ডার এইখানেই শেষ হইবে, ইহার কারণ গার্ডা শিবাজী সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই প্রমাণিত হয়। তিনি শিবাজী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —Dom Manoel de Menezes শিবাজীর পিতা ছিলেন, যদিও তিনি সাধারণ্যে আদিলশাহের সেনাপতি শাহজীর দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত (Era senhorio desta Aldea Dom Manoel do Menezos e nao faltou quem dissesse era Sevagi seu filho, Valna a verdade. Mas foy sempre tido pelo menor de dez[e] filhos de Sagy, Capitao do Idalcao, que morreu de velho, governador dos Reynos de Madure etc.)

সকলেই জানেন জিজাবাইর গর্ভে শাহজীর মাত্র দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাইর গর্ভে মাত্র এক পুত্র জন্মিয়াছিল —তাঞ্জোরের রাজা একোজী বা ব্যাঙ্কাজী। তিনিও আবার বয়সে শিবাজী অপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং গার্ডার কথা একেবারেই অবিশ্বাস্য।

কিন্তু সম্প্রতি গোয়া নিবাসী জোসে জোয়াকিম ফ্রাগোসো নামক আর একজন পর্টুগীজ ডাক্তার আবার এই অসম্ভব আখ্যায়িকার পুনঃ প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পর্টুগীজ ভাষায় শিবাজী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ গোয়া নগরীতে প্রকাশিত

করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থের নাম "আবদুল খাঁ বিজেতা শিবাজী মহারাজ।" (Sivaji Maharaja, vencedor de Abdul Khan!) এই গ্রন্থে তিনি গার্ডার মতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ডাক্তার ফ্রাগোসোর মতে গার্ডার গ্রন্থে (উদ্ধৃত অংশে) doze filhos de Sagy (শাহাজীর দ্বাদশ পুত্র) মুদ্রাকর প্রমাদ মাত্র। Doze (দ্বাদশ) এর স্থানে dois (দুই) হইবে।

ফ্রাগোসোর পর্টুগীজ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বৃটিশ ভারতে তেমন প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু গোয়ার অধ্যাপক পাণ্ডুরঙ্গ পিস্সুরলেঙ্কর মহাশয় একখানি ছোট (পর্টুগীজ) পুস্তক লিখিয়া ফ্রাগোসোর মত সম্যক ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। ফ্রাগোসোর যুক্তিগুলি এমন অদ্ভুত যে, তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে অনাবশ্যক। এখানে অধ্যাপক পিস্সুরলেঙ্কর গার্ডা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব।

কাহারও সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি কে, কোথায় থাকিতেন, নিরপেক্ষ লোক কি না, সত্য নির্ণয়ের ইচ্ছা, সুবিধা এবং শক্তি তাঁহার ছিল কি না অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অধ্যাপক পিস্সুরলেঙ্কর বলেন, কস্মে ডা গার্ডা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তাহার পুস্তকের মলাটে তাঁহাকে natural de Marmugao (মর্ম্মুগাঁওর অধিবাসী) বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁহার গ্রন্থ যিনি সম্পাদন করিয়াছেন তিনি উৎসর্গ পত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে গ্রন্থকারের বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন; হঠাৎ গ্রন্থখানি তাহার হস্তগত হইয়াছিল। Bibliotheca Lusitana ও Diccionario Bibliographico Portuguez অনুসারে গ্রন্থকারের আসল নাম Cosme da Guarda নহে—ইহা ছদ্মনাম মাত্র। (O nome de Cosme da Guarda e affectado) এবং পরলোকগত সুপণ্ডিত জে, এ. ইসমাইল গ্রাসিয়াস মনে করিতেন যে গ্রন্থকার আদৌ ভারতের লোক নহেন, তিনি খাস পর্টুগাল নিবাসী পর্টুগীজ হইবেন।

সুতরাং যাঁহার সম্বন্ধে বাস্তবিক কিছুই জানা যায় নাই, কেবল মুদ্রাকর প্রমাদের দোহাই দিয়া doze স্থানে dois পাঠান্তর ধরিয়া, তাঁহারই সাক্ষ্যের বলে, মুসলমান ও মারাঠা ঐতিহাসিকদিগের বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য সত্ত্বেও শিবাজীর জন্ম সম্বন্ধে এই কুৎসিত কাহিনী প্রচারের চেষ্টা একশ্রেণীর পর্টুগীজ লেখকের মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছে মাত্র।

পর্টুগীজ ভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক মাল মসলা পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। পর্টুগীজেরা বাঙ্গালার উপকূলে বহু উপদ্রব করিয়াছিল, বোম্বাইর উপকূলে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালী ও বোম্বাই নিবাসীর পক্ষে পর্টুগীজ ভাষা উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষাতে বহু পর্টুগীজ শব্দ স্থায়িভাবে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং কোন কোন পর্টুগীজ ঐতিহাসিক নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিলেও, বাঙ্গালী ছাত্রকে মুসলমান যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইলে পারসী ইংরাজী ফারসী ভাষার ন্যায়, পর্টুগীজ ভাষাও শিক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

বেদনার সুর

গৃহে গৃহে আর মনে মনে আজ
এ কি ক্রন্দন উঠিছে জাগি'—
রুদ্ধ-দহনে আছাড়ি' হৃদয়
মূক কণ্ঠের রসনা মাগি' !
এ কি কলরোল ! মরণ-বিলাপ ?
বিশ্ব ছাপিয়া এ কি অভিশাপ ?
কোন জীবনের শত শত পাপ
রচি' মায়াজাল কিসের লাগি' ?

তীব্র-দহনে অস্ফুট বাণী
কাতরে চাহিয়া দিবস যাপি'—
কবে তার মূক ভাষার শক্তি
প্রাণের কাঁদন উঠিবে কাঁপি ?
কতদূর আর—কতদূর তার ?
বুক চাপা এ কি মহা হাহাকার,—
যুগনিগড়ের পাষাণের ভার
চঞ্চল-ব্যথা উঠিবে ছাপি' !

কবে কোন লোকে জাগিবে তরুণ
নব জীবনের পরাণ গীতি—
পাথর ছাপিয়া ঝরণার ধারা
উচ্ছ্বলি' কবে জাগিবে নিতি ?
কবে উন্মাদ দলিতের প্রাণ,
জাগার আলোকে হ'বে লেলিহান্,
নিঃশেষে পুড়ি' ব্যথা অপমান
অত্যাচারের আকুল ভীতি ?

প্রতিদিন তাই এ কি ক্রন্দন
চারিদিক হ'তে ছুটিয়া আসে ?
গন্ধের সম গগনে পবন
চঞ্চল করি' নিয়ত ভাসে !
শোন কাণ পেতে কোন তালে তালে –
বিলাপের শিশু নাচে পালে পালে !
কোন বেদনার সুর চিরকালে,
সঙ্গীত, হাসি সকলই গ্রাসে !

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

সুলোচনার ডায়েরী

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরক্তি।

শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ মিত্র বি, এল,—আট বৎসর কাল ডেপুটী মেজিষ্টর হওয়ার পর বর্দ্ধমান সদরে বদলি হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল, বত্রিশ বৎসর। এতদিন, দূর দূর অস্বাস্থ্যকর স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, এবং পত্নী তরুণী থাকায়, পত্নীকে বাসায় লইয়া যাইবার সুবিধা হয় নাই। কেবল ছুটীতে ছুটীতে বাটী আসিয়া, পত্নীপ্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। এক্ষণে বর্দ্ধমানে তিন মাস কাল অবস্থিতির পর, তিনি একদিন হঠাৎ স্থির করিলেন যে, গৃহিণীশূন্য গৃহে আর বাস করা চলে না; পল্লিগ্রামের বাটী হইতে সত্বর গৃহিণীকে লইয়া আসা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কুলদাবাবু বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী থাকিতেন পল্লীগ্রামে তাঁহার খুড়াখুড়ীর নিকটে। পুত্রকন্যাহীনা খুড়ী, বধূকে কন্যা নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন; এবং বিশেষ যত্ন তাহাকে গৃহধর্ম্ম ও স্বামিসেবা শিক্ষা দিতেন; এবং মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, কালক্রমে সে তাঁহারই মত স্বামী-সোহাগিনী হইবে!

কুলদাবাবু স্ত্রীকে বাসায় পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া খুড়াকে পত্র লিখিলেন। খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্র পাইয়া, বুদ্ধিমতী গৃহিণীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া, বধূকে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দিলেন। এবং বধূমাতার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য, তাহার সহিত একজন পুরাতন ও বৃদ্ধ দ্বারবান পাঠাইলেন। এই বধূর নাম সুলোচনা। সুলোচনা সুন্দরী, এবং উনবিংশবর্ষীয়া যুবতী।

সুলোচনা বাসায় আসিয়া স্বামীকে গৃহস্থ করিল; শৃঙ্খলাহীন সংসারে সুশৃঙ্খলা আনিল; শত অপব্যয় হইতে স্বামীর অর্থ রক্ষা করিল; ভালবাসায় সমস্ত সংসার পূর্ণ করিয়া দিল; প্রেমকথায় স্বামীর কর্ণকুহর সুধাপূর্ণ করিল। এইরূপে বড় সুখেই কয়েক মাস অতিবাহিত হইল।

তাহার পর হঠাৎ একদিন, কি জানি, কি কুগ্রহের প্রকোপে কুলদাবাবুর মনে মনে প্রতীতি জন্মিল যে, সুলোচনার সুবিবেচনা অতিশয় কম,—সে কোন কাযই বুদ্ধিপূর্ব্বক করিতে পারে না; আরও কিছুদিন পরে তিনি বুঝিলেন যে, সে কর্ম্মতৎপরা নহে,—কায করিতে হইলে তাহার হাত পা যেন জড় হইয়া যায়; আরও কিছুদিন পরে, তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীট মোটেই প্রেমময়ী নহে,—অন্য স্ত্রীর ন্যায় তেমন রঙ্গিনী, তেমন হাব-ভাব বিলাসময়ী নহে। এইরূপে কুলদাবাবু সুলোচনার নানা দোষ খুঁজিয়া বাহির করিলেন; এইরূপে আপন মানসকৃত অশান্তিতে তিনি মহাকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

মনের এই মহা অশান্তি লইয়া কুলদাবাবু একদিন শ্রান্ত অবসন্ন দেহে কাছারী হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, হস্ত-পদাদি প্রক্ষালনের জল যথাস্থানে রক্ষিত হয় নাই; গামছাখানা উঠানের এককোণে আবর্জ্জনা ফেলিবার স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে; চাকর বেটা কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই; ডাকিয়া বামুন ঠাকুরের কোন সাড়া পাইলেন না; ঝি তখনও উঠানে বাসন মাজিতে ব্যস্ত। তাহার উপর, ক্লান্ত কুলদাবাবু উপরে উঠিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া, তথায় বিরহিণী গৃহিণীকে, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় প্রেম-উৎফুল্ল নয়নে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন যে এই প্রেমহীনা, কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্যা পত্নীকে লইয়া জীবনে কোনও সুখই লাভ করিতে পারিবেন না। মহা অশান্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

এই বিরক্তি ও অশান্তির ভার বহন করিয়া, তিনি সপদে পুনরায় নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন। তৈজস মার্জ্জনকারিণী পরিচারিকাকে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঝি, এরা সব গেল কোথায়?"

ঝি, 'এরা সব' এর অর্থ উপলব্ধি করিয়া কহিল, "মা আপনার জন্যে রান্নাঘরে জলখাবার গোছাচ্চেন।"

বাস্তবিকই স্বামীর বাজারের জলখাবার পছন্দ হয় না বলিয়া, এবং তাহা তাঁহার অম্লরোগগ্রস্ত উদরের অনুপযোগী বলিয়া, সুলোচনা সারা দ্বিপ্রহর পরিশ্রম করিয়া, তাঁহার জন্য উপাদেয় জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে স্বামীর গৃহ প্রত্যাগমনের চরণশব্দ তাহার সচকিত কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায়, সে সত্বর রান্নাঘরে আসিয়া তাহা থালিতে সজ্জিত করিতেছিল। স্বামী হস্তে রন্ধনগৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া, স্বামীকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সে বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল—"আমাকে খুঁজছিলে?"

কুলদাবাবু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "তোমাকে খুঁজিনি। মুখ ধোবার জল খুঁজছিলাম!"

স্বামীর বিরক্তি তীক্ষ্ণধার ছুরীর ন্যায়, সুলোচনার কোমল বক্ষে বিদ্ধ হইল। সে সেই মহা যন্ত্রণা আপন বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। কেবল জলভরা মেঘের

মত মুখখানি মলিন করিয়া কহিল, "মুখ ধোবার জল উপরে বারান্দায় আছে ; তুমি যে বলেছিলে কাল থেকে উপরে জল রেখ।"

কুন্দাবাবুর বিরক্তি তখনও অপনীত হইল না। রূঢ় স্বরে কহিলেন, "কিন্তু মুখ ধুয়ে মুখ মুছব কিসে? গামছাখানা ত আস্তাকুঁড়ে লুটপুটি খাচ্ছে।"

স্বামীর রুষ্ট বাক্যে সুলোচনার মলিন মুখ আরও মলিন হইয়া গেল ; সে ম্লান মুখে কহিল, "ও গামছাখানা ছিঁড়ে গেছে তাই ফেলে দিয়েছি। নূতন গামছা আনিয়ে কেচে উপরে মুখ ধোবার যায়গায় রেখেছি।"

মানুষের স্বভাব এই যে রাগের সময় কথায় হারিয়া গেলে তাহাতে তাহার রাগের উপশম হয় না। কুন্দবাবুরও অপ্রসন্নতা সুলোচনার কথায় বিদূরিত হইল না। উপরে উঠিতে উঠিতে তিনি পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী পত্নীকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চাকর বামুন গেল কোথায়?"

সুলোচনা বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "চাকর তোমার জন্তে তামাক সাজছে; আর বামুনকে আমি দু'পয়সার বরফ আনতে পাঠিয়েছি।"

কুন্দবাবু স্ত্রীর বুদ্ধিহীনতায় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "একটু আগে এগুলো করিয়ে রাখলেই হ'ত।"

সুলোচনা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "তামাকে আগে আগুন দিলে তা পুড়ে যেত ; দু'পয়সার বরফ আগে আনলে তা গলে যেত।"

কুন্দাবাবু আর কথা কহিলেন না;—বোধ হয় বলিবার মত কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। কাপড় ছাড়িয়া হাত মুখ ধুইয়া নূতন গামছাতে মুখ মুছিলেন। সদ্য প্রস্তুত পরিপাটী জলখাবার খাইয়া সুশীতল বরফ জল পান করিলেন; পরে সুগন্ধী তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ধূমপান করিয়া তাহার সৌরভময় ধূম উদ্গারণ করিলেন। তাহাতে, বোধ হয় তাঁহার বিরক্তি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইল; কিন্তু তিনি মুখে সে ভাব প্রকাশ করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদায়।

কিছুদিন হইতে এইরূপ প্রায় নিত্যই ঘটিতেছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া, কুন্দাবাবু কর্ম্মস্থান হইতে বাটীতে নিত্যই বিরক্তির ভার বহন করিয়া আনিতেন; নিত্যই সুলোচনা সে ভারে নিপীড়িত হইয়াও উপাদেয় আহারে, সুশীতল পানীয়ে, সুবিবেচনা-সম্ভূত যত্নে, প্রণয়পূর্ণ আদরে প্রিয়তমকে প্রসন্ন করিতে যত্ন করিত। কিন্তু স্বামীর অপ্রসন্নতায় সে কখনও তাহার ম্লানমুখে হাসি আনিতে পারিত না।

কিন্তু অদ্যকার ঘটনায় সুলোচনাকে একটু বেশী মাত্রায় ব্যথিত করিল। স্বামী ধূমপানে রত হইলে সে বাহিরে যাইয়া একবার চোখের জল মুছিল। আবার উৎসের ন্যায় চক্ষু জলপূর্ণ হইল। জলভরা চক্ষে সে একবার ভাবিল যে, স্বামী যদি তাহার প্রত্যেক কাযে এইরূপ বিরক্ত হন, তাহা হইলে তাহার বাসায় থাকিয়া লাভ কি? স্বামীকে তুষ্ট করিতে না পারিলে, তাহার ত আর এখানে কোন কাযই নাই। সুলোচনা কথাটা মনোমধ্যে যতই আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার প্রতীতি জন্মিতে লাগিল যে, স্বামীর মনে শান্তি আনিবার জন্য, আপাততঃ তাহার সে স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অভাগিনী যাইবে কোথায়? কথাটা ভাবিতেও সুলোচনার সুকোমল কপোলতল অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। সেই অশ্রুজলে স্নাত হইয়া সে সঙ্কল্প করিল, আর নিজের শত শত ত্রুটী লইয়া সে স্বামীকে বিরক্ত করিবে না; আবার পল্লীগ্রামের বাটীতে যাইয়া, খুড়শাশুড়ীর নিকট কার্য্য শিক্ষা করিয়া, কয়েক মাস পরে আসিয়া দেখিবে সেবার স্বামীকে তুষ্ট করিতে পারে কি না।

সুলোচনা মনে মনে এই সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া লইল। এবং পরদিন কুন্দবাবুকে আফিস পাঠাইয়া, প্রথমতঃ আশু স্বামিবিরহভয়ে কিয়ৎকাল কাঁদিল; পরে চোখের জল মুছিয়া খুড়শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে পত্র লিখিতে বসিল।

কিন্তু সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। লিখিতে বসিয়া কলম হাতে করিয়া, আবার সুলোচনার নয়নপ্রান্তে বন্যার ন্যায় জলপ্রবাহ প্রবাহিত হইল। কেবলই মনে হইতে লাগিল—এ যে তাহারই গৃহ, তাহারই পাতানো সংসার; এ গৃহ এ সংসার সে কিরূপে ত্যাগ করিয়া যাইবে? তিনি যে তাহার স্বামী, তাহার সর্ব্বস্ব, তাহার যত্নের ধন, তাহার সকল আদরের একমাত্র আদর পাত্র; তাঁহাকে কিরূপে ছাড়িয়া যাইবে?

তথাপি সে বারবার নয়নপ্রান্ত মার্জ্জন করিতে করিতে, কোনমতে পত্রখানা লিখিয়া ফেলিল। লিখিল—

বর্দ্ধমান।
আষাঢ়, ১০—

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন—

খুড়ীমা, এক বছর ধরিয়া, এই বিদেশে তোমাদের কাছ ছাড়া পড়িয়া রহিয়াছি। তোমরা ত আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবার নামও কর না। কতদিন তোমাদের দেখি নাই। তোমাদের দেখিবার জন্য মন ছটফট করিতেছে। আমাকে শীঘ্র তোমাদের কাছে লইয়া যাইবে; যেন একটুও দেরী না হয়। কাকা মহাশয় ইঁহাকে পত্র লিখিলেই ইনি পাঠাইবেন। কিন্তু আমার এই পত্রের কথা যেন প্রকাশ করিও না। কাকা মহাশয়কে শীঘ্র পত্র লিখিতে বলিও। তোমরা কেমন আছ লিখিও। আমরা ভাল আছি। কাকা মহাশয়ের শ্রীচরণে আমার শত কোটী প্রণাম জানাইও। নিবেদন ইতি।

প্রণতা
সুলোচনা।

সুলোচনা বহুকষ্টে এই পত্রখানি সমাপ্ত করিয়া, খামের মধ্যে পুরিয়া শিরোনাম লিখিল; এবং দেশ হইতে আগত বৃদ্ধ দ্বারবান দ্বারা ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। এই পত্রের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে দ্বারবানকে নিষেধ করিল।

ইহার পর সুলোচনা মনে করিল, সে যেন আপনার চিরনির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা আপনিই প্রচারিত করিয়াছে; সে যেন আপনার খাদ্যে আপনিই কালকূট মিশাইয়া দিয়াছে; সে যেন আপন দহনাগ্নি আপনিই প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে।

সেই পত্র যথাকালে খুড়িমার হস্তগত হইল। তিনি সুলোচনার পত্রের উল্লেখমাত্র না করিয়া লিখিলেন যে, তাহাদের অনেকদিন তিনি দেখেন নাই; তাহাদের দেখিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছে, ইত্যাদি।

আরও দুইদিন পরে, তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া খুড়া মহাশয় কুলদাবাবুকে আশীর্ব্বাদ পত্র লিখিলেন। তাহাতে আশীর্ব্বচন ও কুশলাদি প্রশ্নের পর, খুড়া মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে কল্যাণীয়া শ্রীমতী বধূমাতাকে যেন একবার বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। লিখিয়াছেন, "বধূমাতা নিতান্ত বালিকা; অনেক দিন বিদেশে রহিয়াছেন; বাটীতেও তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন; অতএব কোনও রকম অমত না করিয়া তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য এ বাটিতে পাঠাইবে; তুমিও একবার ঐ সঙ্গে এ বাটীতে আসিতে পারিলে ভাল হয়; কিন্তু কার্য্যগতিকে যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এখান হইতে লোক পাঠাইয়া বধূমাতাকে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিব। আগামী ৬ই শ্রাবণ শুভদিন আছে; ঐ দিন বেলা দশটার পূর্ব্বে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে।"

কুলদাবাবু গম্ভীরভাবে খুল্লতাতের পত্রখানি পাঠ করিয়া, উহা সুলোচনার হস্তে দিয়া পড়িতে বলিলেন। পাঠান্তে সুলোচনা পত্রখানি কুলদাবাবুকে প্রত্যর্পণ করিলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল?"

সুলোচনা মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, "আমি কি বলবো? তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়, তা হ'লে—"

কুলদাবাবু তাঁহার স্বাভাবিক বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "আমার? আমার কি অসুবিধা হবে? তুমি এখানে থাকাতেই বা আমার কোন্ অসুবিধা ভোগ-

করতে না হয়? কাছারী থেকে বাড়ী ফেরবার পর ত নিত্যই একটা অশান্তি—নিত্যই একটা কিচিমিচি।"

সুলোচনার চোখে জল আসিতেছিল; সে অমিত মানসিক বলে সেই অশ্রু প্রবাহ রোধ করিয়া দিল; বিষাদপূর্ণ মুখে ধীরে ধীরে কহিল, "তবে এ অশান্তি ভোগ করবার চেয়ে, আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

কুলদাবাবু কি সুলোচনাকে ভালবাসিতেন না? হঁা, বাসিতেন বই কি!—তেমন সুশীলা, সুন্দরী, শান্তা পত্নীকে না ভালবাসিয়া কি থাকিতে পারা যায়? তবে তাঁহার ভালবাসাটা, কঠিন ত্বগাচ্ছাদিত নারিকেল ফলের অম্বু ও শস্যের ন্যায়, সর্ব্বদা একটা বিরক্তির আবরণে ঢাকা থাকিত; তাহা বাহিরে কদাচিৎ বিকাশ পাইত; প্রকাশ পাইত কর্কশ, রুক্ষ অপ্রসন্নতা। এক্ষণে পত্নীর বিষাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তর করুণায় ভরিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার বাক্যের কর্কশতার সহিত তাঁহার মনোভাবের একটুও মিল রহিল না। তিনি পুরুষজনোচিত কর্কশতার সহিত কহিলেন, "পাঠিয়ে ত দেবই; এ অশান্তি আর সহ্য হয় না। আর কাকার কথার অবাধ্য হওয়া চলবে না। কিন্তু এই বর্ষাকাল, পাড়াগাঁ, যদি ম্যালেরিয়া ধরে, তখন আমাকেই মুস্কিলে পড়তে হবে।"

সুলোচনা ঈষৎ তেজপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "সেই বারো বছর বয়সের সময় সেই বাড়ীতে এসেছি, তার পর থেকে এই একটা বছর ছাড়া বরাবরই সেই বাড়ীতে আছি। কৈ কখনও ত ম্যালেরিয়া হয়নি, আর কাউকেও ত কখনও মুস্কিলে ফেলি নি।"

কুলদাবাবু গম্ভীরমুখে বলিলেন, "তবে যাও।"

অতঃপর ঠিক হইয়া গেল যে, আপাততঃ তিন মাসের জন্য সুলোচনা পল্লীগ্রামের বাটীতে যাইয়া বাস করিবে। তাহার পর, তাহাকে পুনরায় বাসায় লইয়া আসা হইবে কি না, কুলদাবাবু পূজার ছুটিতে বাড়ী যাইয়া সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

নির্দ্দিষ্ট শুভদিনের দুই একদিন পূর্ব্বে, কুলদাবাবু ছুটী পাইবেন না বলিয়া, বাটী হইতে একজন গোমস্তা ও একজন পরিচারিকা আসিয়াছিল। সুলোচনা তাহাদিগের সহিতই বাটী যাইবে। তাহারা পুরাতন বিশ্বাসী ও দক্ষ লোক; তাহাদের সহিত দুই তিন ঘণ্টার রাস্তা—পত্নীকে পাঠাইতে কুলদাবাবুর কোনও আপত্তি ছিল না।

কুলদাবাবু পত্নীকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, কাপড় চোপড় কিছু যেন ভুল না হয়; সব ভাল কাপড় আর গহনা গুছাইয়া লইতে হইবে; আগামী পূজার সময় তাহা পরিবার আবশ্যক হইবে।

ছাই গহনা! ছাই কাপড়! সুলোচনা যে প্রাণাধিক রত্ন, বুকজুড়ান ধন ফেলিয়া যাইতেছে, তাহার তুলনায় যে রাজরাণীরও রত্ন অলঙ্কার ও রাজপরিচ্ছদ পথের ধূলার চেয়ে হেয়। আর, ভাল কাপড়ে বা অলঙ্কারে তাহার আবশ্যক কি? কাহার মনোবিনোদনার্থ সে উহা পরিধান করিবে? সুলোচনা কিছুই লইল না। গহনার বাক্স স্বামীর পোষাকের আলমারীতে তুলিয়া রাখিল; ভাল কাপড়ের বাক্স স্পর্শও করিল না। কেবল যাইবার দিন সকালে দুই চারি খানা মোটা কাপড় একটা ছোট ট্রাঙ্কের মধ্যে পূরিয়া লইল।

এইরূপে সংক্ষেপে স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসনের আয়োজন সমাধা করিয়া সুলোচনা স্বামীর নিকট বিদায় লইতে আসিল। অতি বিষাদে তাহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছিল; সে স্বামীকে প্রণাম করিতে যাইয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ কোন ক্রমে সংবরণ করিতে পারিল না; স্বামীর চরণপ্রান্ত অশ্রুপ্লাবিত করিল।

কুলদা বাবু পত্নীর ম্লান মুখ দেখিলেন, সেই অশ্রুপাত চরণপ্রান্তে উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার মনটা বড়ই করুণ হইয়া উঠিল। একবার মনে করিলেন, তাহাকে বক্ষে উঠাইয়া লইয়া, তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখ উত্তপ্ত চুম্বনের দ্বারা শুষ্ক করিয়া দেন। কিন্তু তাহা করিলেন না; তাহা হইলে তাঁহার পৌরুষ-গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যাইবে।

হৃদয়-ভারে অতিশয় পীড়িত হইয়া সুলোচনা স্বামীকে কোনও কথা বলিতে পারিল না। বাষ্পবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল। সে কেবল স্বামীর চিরাদৃত

মুখ সজল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সকল উদ্যোগই পূর্ব্ব হইতে হইয়া ছিল। এক্ষণে সুলোচনা, চক্ষুজল মুছিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিনী বিদ্যা।

পল্লীগ্রামে গিয়া আপনার চির-পরিচিত গৃহে প্রবেশ করিয়া সুলোচনা হৃদয়মধ্যে শান্তিলাভ করিল। খুল্লশ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন; সুলোচনা বিশ্রামাগারে যাইয়া তাঁহার পদে প্রণতা হইল।

তিনি উঠিয়া বসিয়া বধূর চিবুক আদরে তুলিয়া ধরিলেন; এবং সেই সরল মুখের ভিতর দিয়া, তাহার বুকের সমস্ত সংবাদই পাইলেন। বলিলেন, "ছি, মা! স্বামী ইহকালের পরকালের পরম গুরু; মেয়েমানুষের পক্ষে দেবতার চেয়ে বেশী; তার সঙ্গে কি ঝগড়া করতে আছে?"

সুলোচনা কাতর কণ্ঠে কহিল, "কৈ, আমি ত ঝগড়া করিনি, খুড়ীমা। বরং তিনিই আমার উপর বিরক্ত হতেন।"

খুড়ী অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কেন? কুলদা কি পুরুষমানুষ নয়? তুমি কি মেয়েমানুষ নও? পুরুষমানুষ কি মেয়েমানুষের উপর বিরক্ত হ'তে পারে? মা, ভগবান মেয়েমানুষদের এমন করে তৈরী করেছেন, যাতে পুরুষমানুষের মত পুরুষমানুষ আমাদের উপর কখনই বিরক্ত হ'তে পারে না। তবে আমরা যদি মেয়েমানুষ হতে ভুলে যাই, যদি পুরুষের কাষ দেখে পুরুষ হ'তে চাই, তখনই পুরুষমানুষরা আমাদের উপর বিরক্ত হয়; আর আমরাও তখন আপনার মনের শান্তি আর সুখ আপন ইচ্ছায় হারাই; তখন ঝগড়া আর কান্না ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায়ই থাকে না। কুলদা যাতে বিরক্ত হয়, তুমি এমন ধারা অমেয়েমানুষের মত কাষ কিছু করেছিলে, তাই সে বিরক্ত হ'য়েছে। তাকে বিরক্ত করে তোমার বাড়ী চলে আসা ভাল হয় নি।"

সুলোচনা তেমনই কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমি ত চলে আসিনি খুড়ীমা, তিনিই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

খুড়ীমা আরও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চলে আস নি? তবে তুমি আমাদের চিঠি লিখতে বলেছিলে কেন?"

খুড়ীমার প্রশ্ন শুনিয়া সুলোচনার মনে সন্দেহ জন্মিল। ভাবিল, স্বামীকে বিরক্ত করিয়া চলিয়া আসা বোধ হয় তাহার ভাল হয় নাই; বিরক্তির কারণ কি, তাহা আর একটু ভাল করিয়া দেখা তাহার উচিত ছিল। তথাপি সে আপনার মনকে প্রবোধ দিবার জন্ম কহিল, "তিনি ত আমাকে আসতে বারণ করেন নি।"

খুড়ীমা হাসিলেন; কহিলেন, "বটে, এইটিই তার মস্ত অপরাধ?—তুমি যা' করতে চেয়েছিলে, তাই, ভাল মানুষটির মত, তোমায় করতে দিয়েছে, বারণ করে নি।"

সুলোচনার বিরহ-কাতর হৃদয়মধ্যে আর সন্দেহ রহিল না যে, তাহার বাটী আসাটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। সে কাঁদকাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমি কি করবো খুড়ীমা?"

খুড়ীমা কহিলেন, "এখন এখানে যখন এসেছ, তখন এইখানেই দিন দশেক থাক। তার পর কিন্তু আবার তোমাকে সেইখানেই যেতে হ'বে। সেই তোমার যায়গা। স্বামীর পায়ের কাছ ছাড়া, সতী সাধ্বীর আর অন্য কোন যায়গা নেই। আর সেই যায়গাই মা, স্বর্গের চেয়ে বড় যায়গা। কেমন করে স্বামীর মন পেতে হয় আমি এই ক' দিনে ভাল করে তোমায় শিখিয়ে দেব।"

সুলোচনা খুল্লশ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। দুই চারি দিন পরে একদিন খুড়ীর সহিত স্বামী-প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তায়, স্বামীর বিরক্ত হইবার কারণ

সুলোচনা খুড়ীকে শুনাইল—"যখন কোনও কারণ পান না, তখন একটা কারণ মনে মনে গড়ে নিয়ে বিরক্ত হন।"

খুড়ীমা কহিলেন, "বাছা, এই ক'দিন তোমার কাছে যা' শুনলাম তাতে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, কুলদা বিনা কারণে তোমার উপর বিরক্ত হয় নি; তুমি তাকে বিরক্ত করেছ তবে সে বিরক্ত হ'য়েছে।"

সুলোচনা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমি তাঁকে বিরক্ত করেছি? আমি ত তাঁর সেবার কোন ত্রুটী করিনি।"

খুড়ীমা কহিলেন, "আমি কি বলছি যে তুমি তার সেবা বা যত্ন করনি? কিন্তু মা, পুরুষমানুষেরা শুধু সেবা যত্ন চায় না। তারা মোহিত হ'তেও চায়; এবং তা' হ'তে খুব ভালবাসে; তাই ভগবান আমাদের মোহিনী করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাড়ীতে এসে সে চায় কিছুক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে সব ভুলে যেতে; আর তখন তুমি যাও তাকে সেবা আর যত্ন দিতে। তাইতেই সে বিরক্ত হ'য়ে পড়ে। মেয়েমানুষের সেবাও ধর্ম্ম বটে, কিন্তু মোহিনী বিদ্যাটা সব আগে। একথাটা কখনও ভুলে যেও না।"

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করিল, "তা তিনি যখন কাছারী থেকে ফিরে আসবেন, আমি তখন কেবল মোহিনী সেজে বসে থাকব, আর কোনও কায করবো না?"

খুড়ীমা বলিলেন, "বাছা আমি কি তোমাকে কায করতে বারণ করছি? কায করবে, খুব কায করবে, প্রাণপণে কায করবে; কিন্তু মেয়েমানুষের মোহিনী বিদ্যা ভুলে যাবে না। কায করবে, কিন্তু শরীরে কাযের কোনও চিহ্ন থাকবে না, আর স্বামীর সমুখে কখনও কায করবে না। স্বামীর সমুখে কেবল হাসি মুখে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবে;—যেন কখনও কোন কায করনি, যেন কোনও কায করতে পার না, যেন এতটুকু কায করতে গেলে তোমার কোমল অঙ্গ, বাসি ফুলের পাপড়ির মত এলিয়ে পড়বে—বুঝেছ?"

সুলোচনা হাসিল; বলিল, "বুঝেছি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিরহ।

পত্নীর বাটী গমনের পর, কুলদা বাবু একদিন আফিস হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, চাকর বেটা তখনও ঘুমাইতেছে, বামুন ঠাকুর রান্নাঘরের দরজার চৌকাঠের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে, উচ্ছিষ্ট তৈজস সকল অমার্জ্জিত অবস্থায় উঠানের বক্ষ-শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

প্রভুকে দেখিয়া বামুন ঠাকুর গাত্রোত্থান করিল না, তদবস্থায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রে কি রান্না হ'বে?"

কুলদা বাবু বামুন ঠাকুরের অশিষ্ট ব্যবহারে কিছু রুষ্ট হইলেন। কিন্তু সে জন্য তাহাকে সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। যদি চলিয়া যায়—সুলোচনা নাই—কে তাঁহাকে রাঁধিয়া দিবে? কেবল বলিলেন, "রাত্রের কথা পরে হ'বে, এখন জলখাবার নিয়ে এস।"

বামুন ঠাকুর সেইরূপ বসিয়া অম্লান বদনে কহিল, "কি জল খাবার নিয়ে যাব?"

কুলদা বাবু কহিলেন, "যা তৈরী ক'রে রাখতে বলে গিয়েছিলাম;—লুচি, তরকারী, হালুয়া।"

বামুন ঠাকুর অকাতর কণ্ঠে কহিল, "তা ত এখনও তৈরী হয়নি।"

কুলদাবাবুর তখন জঠরাগ্নি জ্বলিতেছিল। বামুন ঠাকুরের উত্তর শুনিয়া তাহার গণ্ডপ্রদেশে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত বসাইয়া দিবার অত্যন্ত বাসনা জন্মিল। কিন্তু তাহা পূর্ব্বোক্ত কারণে করিতে পারিলেন না। রোষবহ্নি ও জঠরাগ্নি নিবাইবার জন্য একটি ঢোক গিলিয়া কহিলেন, "কেন?"

বামুন ঠাকুর কহিল, "কি করে হ'বে? খুন্তী, হাতা, কড়া সব যে এখনও সকড়ি রয়েছে। ঝি এসে আগে ওগুলো মেজে দিক, তবে ত আমি জলখাবার তৈরী করতে পারব।"

কুলদা বাবু কোন মতে মনের বিরক্তি দমন করিয়া কহিলেন, "ওগুলো চাকরকে দিয়ে মাজিয়ে নাওনি কেন?"

বামুন ঠাকুর কহিল, "তা কি আর না বলেছি, বাবু? কিন্তু সে বল্লে ও কায আমার নয়, ঝিয়ের কায আমি করবো কেন?"

কুলদা বাবু বুঝিলেন, ইহাদের উপর বিরক্ত হইলে উপায় নাই, ইহারা সুলোচনা নয়; ইহারা রাগ করিতে জানে এবং তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য অনায়াসে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারে। অতএব তিনি বলিলেন, "আচ্ছা জলখাবার বাজার থেকে কিনে নিয়ে এস।" এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া, উপবিষ্ট পাচকের নিকট গিয়া, তাহার হস্তে প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, "যাও জল খাবার কিনে নিয়ে এস। চার পাঁচ আনার যা গরম গরম পাবে, তাই কিনে নিয়ে আসবে।"

অতঃপর তিনি উপরে উঠিয়া দেখিলেন যে, শূন্য কক্ষ সকল, মহাশূন্যের ন্যায় পতিত রহিয়াছে; তাহার মধ্য হইতে যেন একটা নীরব হাহাকার উত্থিত হইতেছে। প্রভাত কালের ত্যক্ত শয্যা এখনও অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। কক্ষমধ্যে বৃষ্টিজল ঢুকিয়া মেঝের কতকটা ভিজিয়া গিয়াছে। তাহাতে একখান ছিন্ন চিঠির টুকরা সকল পতিত হওয়ায়, ঐ স্থানটা হাসি-কান্নার লীলা অভিনয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে। মুখ ধুইবার স্থানে যাইয়া দেখিলেন যে, জলের বালতিটা জলশূন্য অবস্থায়, দন্তবিহীন মুখের বিদ্রূপের হাসির ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঘটীটা মাতালের মত জলপ্রণালীতে গড়াগড়ি দিতেছে। গামছাখানা চোরের ন্যায় কোথায় লুকাইয়াছে।

কুলদা বাবু মুখ ধুইবার জল দিবার জন্য ভৃত্যকে উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। ভৃত্য তখনও ঘুমঘোরে অচেতন ছিল; সে উত্তর দিল না।

তখন কুঁজার জলে মুখ ধুইয়া লইবেন এই প্রত্যাশায় তিনি কুঁজার নিকট গিয়া দেখিলেন যে, উহা ভাবগ্রস্ত বৈরাগীর ন্যায়, শূন্যোদরে, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে। তিনি অনন্যোপায় হইয়া সেই অসংস্কৃত বিছানায় যাইয়া নীরবে বসিয়া, ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। হাত বুলাইয়া দেখিলেন যে মুক্ত বাতায়নের পথে বৃষ্টির ছাট আসিয়া শয্যার কিয়দংশ ভিজিয়া গিয়াছে। ভিজা অসংস্কৃত বিছানায় বসিয়া শ্রাবণ মাসের দীর্ঘ দিবা অতিবাহিত হইল। সাতটা বাজিয়া গেল। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। তথাপি বামুন ঠাকুর জলখাবার লইয়া ফিরিয়া আসিল না। তিনি কাহার উপর বিরক্ত হইবেন? সুলোচনা ত সেখানে নাই;—অনাদরে যে তাহাকে তিনি বিদায় করিয়া দিয়াছেন। বড় দুঃখে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

আশু তৃষ্ণা নিবারণ জন্য তিনি গৃহমধ্যে একটু জল খুঁজিলেন কিন্তু কোথায় এক বিন্দুও দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলেন চাকর ঘুমাইয়া ছিল, কে জল ধরিয়া রাখিবে? বামুন ঠাকুর?—জল ধরা ত তাহার কায নয়।

অবশেষে রাত্রি প্রায় আটটার সময় বামুন ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল যে, সারা রাণীগঞ্জের বাজার খুঁজিয়া, এমন কি বড়বাজার পর্য্যন্ত খুঁজিয়া সে কোথাও কোনও রকম গরম খাদ্যদ্রব্য পাইল না। বামুন ঠাকুরের পর, ভৃত্য তামাকের কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, হুঁকাটি কুলদা বাবুর হস্তে দিয়া সংবাদ দিল যে, এতক্ষণ সে ঝিকে ডাকিবার জন্য ঝির বাটীতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার চারখানা লেপ মুড়ি দিয়া জ্বর আসিয়াছে, সে আসিতে পারিবে না।

কুলদা বাবু হতনম্র কণ্ঠে, কহিলেন, "কাল আর কোনও ঠিকা ঝিকে ডেকে নিয়ে এস; আপাততঃ তুমি আলো গুলো জ্বেলে দিয়ে আমাকে এক গেলাস খাবার জল দাও।"

ভৃত্য পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে এক কলসী জল আনিয়া তাহারই এক গ্লাস কুলদা বাবুকে দিল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রের রান্নার কি হ'বে? রান্নার বাসন ত সব সকড়ি পড়ে রয়েছে।"

কুন্দা বাবু যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "আজকার মত যদি তুমি দু'চার খানা মেজে দাও তাহলে আজ কোনও গতিকে রান্না হয়। আর রান্না হলে শুধু যে আমার পেট ভরবে তা নয়; তোমরাও খেতে পাবে। একটু কষ্ট স্বীকার করতে পারলে তোমাদের আর উপবাসী থাকতে হয় না।"

ভৃত্য প্রভুর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিল; এবং কতক বাসন মাজিয়া, রান্নার যোগাড় করিয়া দিল।

তখন কুন্দাবাবু বামুন ঠাকুরকে আদেশ করিলেন, "এত রাত্রে আর কিছু রান্নার যোগাড় কোরো না; কেবল আলু পটল কুমড়ো ভাজ, আর খিচুরী চড়িয়ে দাও। একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির কর। জলখাবার খাওয়া হয়নি, ক্ষিদে পেয়েছে।"

তদনুযায়ী বামুন ঠাকুর রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় অর্দ্ধপক্ক খিচুড়ি ও অর্দ্ধদগ্ধ ভাজা কুন্দা বাবুকে আনিয়া দিল। পেটের জ্বালা নিবারণ জন্য তিনি তাহা আহার করিয়া, পুকুরের জল পান করিয়া, বাজারের সাজা পাণ চর্ব্বণ করিতে করিতে ধুমপান করিলেন।

হায়! কুন্দা বাবুর গ্রীষ্মের শীতল ব্যজন, পিপাসার বরফ সংযুক্ত পানীয়, ক্ষুধার জলখাবার, বর্ষার খেচরান্ন —তুমি কোথায় গেলে? কুন্দা বাবু ভিজা ও অপরিষ্কার বিছানায় শুইয়া অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

বিরহটা কুন্দা বাবুর কি কষ্টকর হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা কেবল একদিনের ঘটনা বিবৃত করিলাম। এইরূপ প্রায়ই ঘটিতেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পোষ্ট অফিসের খাতা ও ডায়েরী।

পরদিন জন্মাষ্টমীর ছুটি ছিল। কুন্দাবাবু গৃহে বসিয়া অবিচ্ছিন্ন নির্জ্জনতা ভোগ করিতেছিলেন। কিরূপে বিরহের দীর্ঘ দিবা অতিবাহিত করিবেন, তাহাই কাতর মুখে ভাবিতেছিলেন।

বর্ষাকালে জন্মাষ্টমীর বৃষ্টি হয়, ইহা সত্যযুগের সনাতন নিয়ম। কিন্তু এই ঘোর কলিকালে সকলই উল্টা; তাই এই বর্ষাকালে, এই জন্মাষ্টমীর দিনে, সূর্য্যদেব উত্তপ্ত ময়ূখমালা বর্ষণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

সেই তপ্তরৌদ্র দেখিয়া হঠাৎ কুন্দাবাবুর মনে সেই দীর্ঘদিবা অতিবাহিত করিবার একটা সুবুদ্ধি জন্মিল। শীতকালের গরম কাপড়গুলিকে রৌদ্রে দিয়া, কীট দংশন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি ভৃত্যকে সুখনিদ্রা হইতে উঠাইয়া, আলমারীর চাবী খুলিয়া, একে একে কাপড়গুলি বাহির করিয়া রোদে দিতে বলিলেন।

কাপড় বাহির করিতে করিতে কুন্দাবাবু দেখিলেন যে, সুলোচনার গহনার বাক্স আলমারীর এক কোণে বস্ত্র মধ্যে লুকাইত রহিয়াছে। ঐ বাক্সের একটা ডুপ্লিকেট (দোহারা) চাবি তাঁহার নিকট থাকিত। তিনি চাবির দ্বারা বাক্স খুলিয়া দেখিলেন যে, অলঙ্কার গুলি সমস্তই বাক্সের মধ্যে রহিয়াছে;—সুলোচনা তাহার একটিও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। অলঙ্কার-প্রিয়া অঙ্গনাগণের মধ্যে একজনের অলঙ্কারে এই অবজ্ঞা দেখিয়া কুন্দা বাবু অবাক হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিয়া দেখিলেন যে, সে ভ্রমবশতঃ উহা ফেলিয়া যায় নাই। কারণ তিনি যাইবার পূর্ব্বদিনও উহা লইয়া যাইবার কথা তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন; আর সুলোচনা তাঁহার আদেশ ভুলিবার পাত্রী নহে; এবং ভুল হইলে ইহা সুলোচনার বড় কাপড়ের বাক্সের মধ্যেই যথা নিয়মে পড়িয়া থাকিত; কুন্দা বাবুর পোষাকের আলমারীতে আসিত না। তিনি বুঝিলেন, ইহা ভুল নহে; ইচ্ছা পূর্ব্বক রাখা; ভুল হইলে, পরে বাটী যাইয়া, পত্র লিখিয়া একথা সে তাঁহাকে জানাইত।

কুন্দাবাবুর ভাবনা হইল যে, পল্লী মধ্যে কোথাও কোনও উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ হইলে, বা পূজার সময়, সুলোচনা আপন সুললিত অঙ্গ সাজাইবে কি দিয়া?

সুলোচনার বড় বাক্সের দোহারা চাবিও কুলদাবাবুর নিকট থাকিত। কৌতূহল বশতঃ উহাও তিনি ঐ চাবির দ্বারা খুলিলেন। দেখিলেন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কাগজ পত্রের নিম্নে, সুলোচনার যাবতীয় পোষাকী কাপড় রহিয়াছে; মূল্যবান কাপড়, জ্যাকেট্, ব্লাউজ প্রভৃতি একটিও সে লইয়া যায় নাই। হায় হায়! সে পূজার সময় অথবা নিমন্ত্রণোপলক্ষে কি পরিবে? তাহার কি কোনও সখ নাই?

কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিতে কুলদাবাবুর দৃষ্টি সহজেই উপরকার কাগজ পত্রের দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলেন, তাহার মধ্যে দুই খানি খাতা রহিয়াছে, তা ছাড়া একখানি পোষ্ট অফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতা রহিয়াছে। প্রথম খাতাগুলি, কোনও হিসাবপত্রের খাতা মনে করিয়া, প্রথমে ভাল করিয়া দেখিলেন না। ব্যাঙ্কের খাতা খানা খুলিয়া বিস্মিত লোচনে অবলোকন করিলেন যে, এই এক বৎসরের ভিতর সুলোচনা প্রায় দেড় হাজার টাকা জমাইয়াছে। কেমন করিয়া এত টাকা জমিল, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। যখন তিনি একাকী বাসায় থাকতেন, চারি শত টাকা বেতনের ভিতর হইতে এক পয়সা বাঁচাইতে পারিতেন না; এখন বাসায় লোকবৃদ্ধি হইয়াছিল, তবু এত টাকা বাঁচিল কেমন করিয়া? সুলোচনা বাসায় আসিয়া গৃহিণীর পদ লইবার পর, তিনি আপন খুচরা খরচ জন্য পঞ্চাশ টাকা রাখিয়া, মাহিনার বাকী টাকা সমস্তই সুলোচনার হাতে দিতেন; এবং তাহার কোনও হিসাব কখনও চাহিতেন না। সেই টাকা হইতে, সুলোচনা কতক কতক আসবাব, এবং আবশ্যক তৈজসপত্র, এবং তাঁহার জন্য একটী হীরক অঙ্গুরীয় ও পরিচ্ছদাদিতে হাজার টাকার উপর খরচ করিয়াও, এত টাকা বাঁচাইয়াছে!—কয়েক দিনের বিরহ যন্ত্রণায় তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, সুলোচনা ব্যতীত তাঁহার চলিবে না; এক্ষণে পোষ্ট অফিসের খাতা দেখিয়া, তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, অবর্জ্জনীয়া সুলোচনা গৃহকর্ম্মে তাঁহার অপেক্ষা সুদক্ষা।

পেটক গর্ভে, খনিগর্ভে লুকাইত মূল্যবান মণির ন্যায় কুলদাবাবু আর এক রত্ন লাভ করিলেন।—সেই খাতা দুই খানির মধ্যে এক খানিতে গোয়ালা, দরজী, পোদ্দার, বাড়ীওয়ালা প্রভৃতির হিসাব লিখিত ছিল; আর একখানি রত্নাধিক রত্ন,—সুলোচনার ডায়েরী; তাহ'তে তাহার হৃদয়নিহিত প্রেম, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সুবিবেচনা, মণিমালার ন্যায় গ্রথিত ছিল। তাহা কখনই নিয়মিত ভাবে লিখিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাই পাঠ করিয়া কুলদাবাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার সুলোচনার ন্যায় পত্নী জগতে দুর্লভ!—তেমন পতিব্রতা, বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে তিনি অকারণে ক্লেশ দিয়াছেন, অকারণ সেই ইন্দীবর লোচনে জলধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

ডায়েরী ১৩০০ সনের ১লা বৈশাখ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা সেই ঊনবিংশ বর্ষীয়া যুবতীর কয়েক দিনের গোপন আত্মকাহিনী, আমাদের পাঠক পাঠিকার মনোবিনোদনার্থ, অবিকল উদ্ধৃত করিব।—

১লা বৈশাখ। উনি বলেন যে, দীর্ঘ দুপুর বেলাটা বাড়ীতে একলা কাটান বড় শক্ত কায। পত্নীকে এই শক্ত সংস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে উনি বোধ হয়, দোকলা যোটাতে রাজি নন। তাই বল্লেন, ডায়েরী লেখ। এ উপদেশটা অনেক দিন আগে দিয়েছিলেন; তাঁর বোধ হয়, একথা আর মনে নেই,—যে ভুলো! আমি কিন্তু ভুলি নি;—তাঁর কোন কথা জীবনে কখনও ত ভুলব না; জীবনের পরেও ভুলব কি না সন্দেহ।

২রা বৈশাখ। কাল বছরের প্রথম দিন গিয়েছিল। তাই মনে করেছিলাম যে, কাল কাছারী যাবার সময়, আমার মুখে একটা চুমো খেয়ে যাবেন। আমি সেই আশায়, তিনি কাছারী যাবার আগে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু কৈ খেলেন? খেলে, আমারও খাবার সুযোগ হত,—আমার নূতন বছরের জীবন সার্থক হত।—যাক্, রাত্রে কিন্তু এর শোধ নিয়েছিলাম।

৩রা বৈশাখ। বাজারের জলখাবার কি ছাই; ওঁর রোজ তা খেয়ে অম্বল হয়। তাই আজ থেকে ঠিক করেছি, নিজে জলখাবার তৈরী করবো,—খুড়ীমার কাছে ত সব তৈরী করতে শিখেছি। সকালে ছানা

করবার জন্যে বেশী দুধ নিয়েছি; ঘি, ময়দা বেশম সব বাজার থেকে আনিয়েছি; কাঠের উনুনটা ঠিক করে রেখেছি। আর ডায়েরী লিখে সময় নষ্ট করবো না। যাই, জলখাবার তৈরী করিগে।

৪ঠা বৈশাখ। রবিবার। উনি বাড়ীতে আছেন। খাওয়া দাওয়ার পর, বাতাস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমার এখনও খাওয়া হয় নি। যাই, তাড়াতাড়ি মাথায় এক ঘটী জল ঢেলে, খেয়ে নিইগে। তার পর জলখাবার তৈরী করতে হবে। একটা বেজে গেছে, কখন যে হবে বলতে পারি নে।

৫ই বৈশাখ। কাল থেকে উনি অম্বল বোধ করেন নি।

৭ই বৈশাখ। দু'দিন লেখা হয় নি। দু'দিন দুপর বেলা একটু অবকাশ ছিল না; পরশু দত্তদের মেজ বৌ বেড়াতে এসেছিল, তার উপর জলখাবার তৈরী ছিল। কাল রসগোল্লার রসটা এঁকে গিয়েছিল, আবার নূতন করে রস তৈরী করতে হ'ল; অনেকটা চিনি নষ্ট হ'ল। তা' হোক্, এ মাসে আমি সাবান আর খোস্‌বো কিনব না, তা হ'লেই পুষিয়ে যাবে।

৮ই বৈশাখ। রান্না খারাপ হ'য়েছিল বলে ওঁর ভাল খাওয়া হয় নি, তাই আমারও আর খাবার ইচ্ছা রইল না। ভারি রাগ হ'য়েছিল। উনি কাছারীতে চলে যাবার পর, বামুনটাকে খুব বক্‌লাম। সে রাগে গম্ গম্ করে চলে গেছে, বোধ হয়, আর আসবে না। না আসে ত বেশ হয়। কেন, আমি কি এই ক'জনের ভাত তরকারী রাঁধতে পারি না? খুড়ীমা বলতেন, যে মেয়েমানুষ রাঁধতে পারে না, সে কিছুই করতে পারে না।

৯ই বৈশাখ। কাল আর বামুন আসে নি। আমি জলখাবার তৈরীর পর রেঁধেছিলাম। বিকালে হিঙের কচুরী আর রসগোল্লা; আর রাত্রে, ভাত, মুগের ডাল, মাছের কালিয়া, একটা ছ্যাঁচড়ার তরকারী, আর আমের অম্বল। উনি খুব ভাল করে খেলেন,—দেখে আমার বড়ই তৃপ্তি হ'ল। কিন্তু সন্ধ্যে বেলাটা ওঁর কাছে না থাকাতে একটু রাগ করলেন।

১২ই বৈশাখ। ক'দিন লিখতে পারি নি। বড় গরম পড়েছে। দুপর বেলাটা রেঁধে বেড়ে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু আমি বেশ আছি। রাঁধুনি এখনও পাওয়া যায় নি। উনি বলেন, এই গরমে আগুন তাপে রোজ রোজ রাঁধলে আমার অসুখ হবে।—স্বামীকে রেঁধে তৃপ্তি পূর্ব্বক খাওয়ানতে, মেয়েমানুষের যে কত সুখ, তাতো উনি জানেন না। আমাদের জাত, স্বামীকে তুষ্ট করবার জন্যে অনায়াসে আগুনের ভিতর যেতে পারে—আগুন তাপ ত অল্প কথা।

১৭ই বৈশাখ। কাল রাঁধতে গিয়ে কাপড়ে একটু তেল হলুদ লেগে গিয়েছিল। দেখে বল্লেন, কিগো কার গায়ে হলুদ, তেল হলুদ মেখেছ কেন? শুনে আমার এমনই লজ্জা হ'ল। ছিছি!

১৮ই বৈশাখ। কাল মাহিনার সব টাকা আমাকে দিয়েছিলেন। ওঁর জন্যে পঞ্চাশ টাকা, আর সংসার খরচের জন্যে গেল মাসের টাকা হাতে যা মজুত ছিল, তার উপর আরও কিছু রেখে, দুশো টাকা পোষ্ট অফিসে জমা দিলাম। এই রকম করে পাঁচহাজার টাকা জমিয়ে ওঁকে দিতে পারলে—কি মজা! উনি অবাক হ'য়ে যাবেন।

২০শে বৈশাখ। আজ আবার নূতন বামুন এসেছে। এ লোকটা রাঁধে এক রকম মন্দ নয়। কিন্তু আমি রাঁধুনী বামুন রাখতে ওঁকে বারণ করেছিলাম। কোনও মতে শুনলেন না। বল্লেন, এই গরমে একটা ব্যারাম করে ফেলবে।—ব্যারাম না হাতী করে ফেলব!

২৬শে বৈশাখ। কাল বিকালে আফিস থেকে এসে একটা তুচ্ছ কারণে আবার আমার উপর বিরক্ত হয়েছিলেন। বড় দুঃখে মুখটা ভার করে ছিলাম। তাতেও বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, কেলো হাঁড়ির মত মুখ করে আছ কেন? আমি কি করবো? উনি বিরক্ত হ'লে যে কিছুতেই আমার হাসিমুখ থাকে না। আড়ালে গিয়ে একটু কাঁদলাম।

২৯শে বৈশাখ। তিন দিন ওঁর মনটা বেশ ছিল। আমিও হাসিমুখে কাজ কর্ম্ম করতে পেরেছিলাম।

আজ আবার বিরক্ত হ'য়ে আফিস থেকে ফিরেছিলেন। ঘর পরিষ্কার করতে করতে আমার কাপড়ে একটু কাদা লেগে গিয়েছিল। তাই দেখে একবারে রেগে আগুন হ'য়ে বল্লেন ও রকম নোঙরা কাপড় পরে আমাকে জলখাবার দিতে আস্তে লজ্জা হল না? কথাট শুনে আমি আড়ালে গিয়ে কত কান্নাই কাঁদলাম।

৩রা জ্যৈষ্ঠ। মনের দুঃখে ক'দিন লেখা হয় নি। লেখবার মত কিছুই ছিল না। আজ তিনি আফিস থেকে ফেরবার সময়, ঘরের ঝুল ঝাড়ছিলাম। ঝুল দেখলে তিনি বিরক্ত হ'ন তাই ঝাড়ছিলাম। তিনি আফিস থেকে আসবার পূর্ব্বে মুখ হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে তাঁর জলখাবার গুছিয়ে রাখছিলাম। তিনি বাড়ী এসে চাকরের উপর বিরক্ত হলেন। তার পর আমি জলখাবার নিয়ে তাঁহার কাছে যাবামাত্র তিনি আমার মাথায় এক গোছা ঝুল দেখে বল্লেন ঝুল মেখে পেত্নী সেজেছ কেন? যাও পেত্নীর হাতের জলখাবার খেতে চাই নে। আমি সাধা সাধনা করলাম, পায়ে হাতে ধরলাম কিন্তু সেই ঝুলের একটু ছুতো ধরে কোন মতেই খেলেন না।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কেঁদেছিলাম। আজ কাছারী যাবার সময় আমায় ডেকে, কি জানি কি ভেবে হাসিমুখে বল্লেন, আজ বিকালে সেদিনকার মত কাঁচা আমের চাটনি করো। এই ফরমাইস শুনে আমি যেন আহ্লাদে গলে গেলাম। তখনই চাকরকে একটা টাকা দিয়ে, ডাল ভাঙ্গা কাঁচা আম কিনতে পাঠালাম।

৫ই জ্যৈষ্ঠ। কাল কাঁচা আমের চাটনি ওঁর বড় পছন্দ হয়েছিল।

৬ই জ্যৈষ্ঠ। কাল আবার হিঙের কচুরী করেছিলাম। উনি তৃপ্তিপূর্ব্বক সবগুলি খেলেন। আমার জন্যে অন্য দিনকার মত একখানিও ফেলে রাখেন নি। তা না রাখুন, ওঁর তৃপ্তি দেখলেই যে আমার পেট ভরে যায়!

৮ই জ্যৈষ্ঠ। কাল আবার বিরক্ত হয়েছিলেন। কেন এত বিরক্ত হ'ন? আমি কি করবো? কি করলে উনি প্রসন্ন হবেন? হয়ত আমার অনেক দোষ আছে কিন্তু সে দোষটা কি, আমি ত বুঝতে পারি নে! উনি বলে দেন না কেন?

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। মনে শান্তি ছিল না, তাই এতদিন লিখতেও ইচ্ছা হয় নি। কাল মাহিনা পেয়ে সব টাকা আমাকে দিয়েছিলেন। গত মাসের টাকা সব খরচ হ'য়ে গেছে কি না, একবার আমাকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করেন নি। কখনই করেন না। এদিকে এত বিশ্বাস, কিন্তু আমার কোনও কায পছন্দ করেন না।

২০শে জ্যৈষ্ঠ। এত করে সব গুছিয়ে রাখি, তবু উনি বিরক্ত হন কেন? আমি কি বড় কুৎসিত হয়ে গেছি? কায কর্ম্ম সব ভুলে গেছি?

২৩শে জ্যৈষ্ঠ। রোজ এ অশান্তি আর সহ্য হয় না। সকল কাযে উনই যদি বিরক্ত হ'লেন; তবে আর এখানে থেকে লাভ কি?

৩১শে জ্যৈষ্ঠ। মনে একটুকু শান্তি পাইনে। মেয়েমানুষের জন্ম স্বামীর জন্যেই; সেই স্বামীকে যদি সুখী করতে না পারলাম, তবে বেঁচে লাভ কি? আমার কেবল মনে হয়, ওঁর অশান্তির কালী বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিই।

৩রা আষাঢ়। সত্যিই কি আমি কায-কর্ম্ম ঠিক মত করতে পারিনে? খুড়ীমা আমায় কায শিখিয়েছিলেন; তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হ'লে কাযটা কি রকম জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা যায়।

১৫ই আষাঢ়। কাল ভারি বিরক্ত হ'য়ে বাড়ী এসেছিলেন; কিন্তু কথার ঠিক মত উত্তর পেয়ে শান্ত হ'য়েছেন।

১৬ই আষাঢ়। উনি কত আর অশান্তি ভোগ করবেন? আমি কত আর কাঁদব? তার চেয়ে কিছু দিন বাড়ী গিয়ে থাকাই ভাল। আবার কিছু দিন খুড়ীমার কাছে কায কর্ম্ম শিখে ফিরে এসে দেখবো, মন যদি পাই।

ডায়েরীতে আর কিছু লিখিত ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিলন।

কুলদাবাবু ডায়েরীর এই কয়টি পত্র বার বার পাঠ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আবার পত্নী-প্রেম উছলিয়া উঠিল। দীর্ঘ বরষার শেষে শারদ-শশধর যেন তাঁহার হৃদয়াকাশে পূর্ণিমার কিরণধারা ঢালিয়া দিল।—হায়! যে তাঁহার বিরক্তি অপনয়নের জন্ম আপন হৃদয়-রক্ত ঢালিয়া দিতে কাতর নয়, তিনি তাহারই উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন! যে তাঁহার জন্ম হৃদয়ে অপার প্রেম বহন করিয়াছে, তিনি তাহারই সেই হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছেন! তিনি হেলায় অপার্থিব রত্ন হারাইতে বসিয়াছিলেন। ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। তিনি ত্বরায় বাটী যাইয়া আদরে তাঁহার সুলোচনাকে লইয়া আসিবেন; এবং পুনরায় তাহাকে গৃহিণীর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, নিজের অশেষ বিরহক্লেশ নিবারণ করিবেন।

এই স্থির করিয়া, তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পরবর্ত্তী শনিবার ও রবিবারের ছুটী প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট, বিরহ-কাতর ডেপুটীর শুভ-সংকল্পের বিষয় অবগত হইতে না পারিয়া, তাঁহার ছুটী মঞ্জুর করিলেন না।

অগত্যা, যে শনিবারে তাঁহার বাটী যাইবার—এবং সুলোচনার চির-শীতল প্রেম-ধারায় অবগাহন করিয়া দারুণ বিরহ জ্বালা-নিবারণ করিবার ইচ্ছা ছিল, সেই নিদারুণ দিনে, বিরহদগ্ধ হৃদয়ে অতি কষ্টে কুপক্ক অন্ন উদরস্থ করিয়া, কুলদাবাবু কাছারী গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে কোন কাযে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।—তাঁহার হৃদয়ে যে বিষাদ-অশ্রুর সরোবর জমিয়া ছিল, তাহাতে কেবলই সুলোচনার কমল মুখ ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বেলা পাঁচটার পর, অবসন্ন-পাদবিক্ষেপে তিনি গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। সে গৃহিণীহীন গৃহে ফিরিতে যেন প্রতি বিক্ষেপে পদযুগল জড়াইয়া যাইতেছিল;—দেহ যেন ছটয়া পোরা বালিশের মত ভারি বোধ হইতেছিল। দেহের জড়তা ও ভার লইয়া কষ্টে কোনও ক্রমে তিনি বাড়ী পৌঁছিলেন

চাকরকে ডাকিবামাত্র তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন, সে আজ ঘুমায় নাই;—জাগ্রত-কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে।' এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি বাড়ী ঢুকিয়া আরও বিস্মিত হইলেন—গৃহ সকলের, ও গৃহসজ্জার শৃঙ্খলা, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া। ভিতর বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, একজন নূতন ঝি, চক্‌চকে মাজা বাসনগুলি গুছাইয়া রাখিতেছে; তাঁহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিন্তু উপরে উঠিবামাত্র, তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা রহিল না।—আনন্দের বন্যার ন্যায়, হাস্য-মুখী সুলোচনা কক্ষ হইতে বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল; এই কয়েক দিন পল্লীবাসে তাহার স্বাস্থ্য ও রূপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তাহার উপর তাহার সজ্জারও কিছু পারিপাট্য ছিল। তাহা দেখিয়া, কুলদাবাবু আত্মহারা হইয়া গেলেন; উচ্ছ্বসিত প্রেম-বেগে তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ম, দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, হাসিয়া, মোহিনীবিস্তাগর্ব্বে তাঁহার দিকে কটাক্ষ-পাত করিয়া, সুলোচনা কহিল, "এস।" এই বলিয়া স্বামীকে আহ্বান করিয়া, তিনি আলিঙ্গন করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া প্রণতা হইল।

কুলদাবাবু মহা আদরে পত্নীকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, এবং তাহার অভিনব সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া কহিলেন,—"তুমি—তুমি—তুমি কোথা থেকে, কেমন করে এলে?"

সুলোচনা স্বামীর বক্ষে মুখ রাখিয়া, স্মিত মুখে কহিল, "বাড়ী থেকে, গাড়ী চড়ে এলাম।"

কুলদাবাবু আলিঙ্গন আরও দৃঢ় করিয়া কহিলেন, "হঠাৎ চলে এলে যে?"

সুলোচনা কহিল, "খুড়ীমা পাঠিয়ে দিলেন। বল্লেন,

তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছে, যাও। তাই এলাম।—সত্যি, তোমার কষ্ট হয়েছিল ?"

কুন্দাবাবু কহিলেন, 'সত্যিই আমার বড়ই কষ্ট হ'য়েছিল। এত বেশী কষ্ট হ'বে জানলে, তোমাকে পাঠাতাম না।"

সুলোচনা কহিল, "তুমি ত পাঠাও নি। তুমি কেবল বিরক্ত হতে বলে, আমিই তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।—কাযটা আমার ভাল হয়নি; এবারকার মত আমাকে ক্ষমা কর।"

কুন্দাবাবু ব'ললেন, "তোমাকে আমি ক্ষমা করবো, না, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে? আগে আমি বুঝতে না পেরে, তোমার উপর বিরক্ত হ'য়েছি। আর কখনও এমন হবে না। আমি তোমাকে এখন চিনেছি।

সুলোচনা মনে মনে বলিল, "ছাই চিনেছ! খুড়ীমার মোহিনীবিদ্যা সার্থক হ'য়েছে।" প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করে চিনলে ?"

কুন্দাবাবু ডায়েরী দেখাইয়া তখনই স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিবেন বলিয়া, আনিবার জন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাক্স খুলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু সুলোচনা তাহাতে বাধা দিল। বলিল, "কায নেই এখন আমার সে কথা শুনে। তুমি এখন পোষাক ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে আগে জলখাবার খেতে বস। তার পর ধীরে সুস্থে সে কথা বোলো।"

সুলোচনা বাটী হইতে সকাল সকাল আহার করিয়া, বেলা দশটার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়াছিল; বেলা দুইটার পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়াছিল। দুইটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত এই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এবং ব্রাহ্মণ পরিচারক ও পরিচারিকাগণকে খাটাইয়া গৃহ ও গৃহসজ্জার সংস্কার করিয়াছিল; এবং বাজার হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া জলখাবার তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিল।

এক্ষণে কুন্দাবাবু প্রিয়তমার উপদেশানুযায়ী বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া সেই জলখাবার পরম-শান্তি ও পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। পরে বিছানায় পত্নীর পার্শে বসিয়া, সুগন্ধি তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ধূমপান করিতে লাগিলেন। এবং ডায়েরী ও পোষ্টাপিসের খাতা বাহির করিয়া, উহা পত্নীর হস্তে দিয়া কহিলেন, "এই দুটি রত্ন হতেই, আমার রত্নকে আমি চিনেছি। তোমার ভিতর যে এত সদ্বিবেচনা ও ভালবাসা আছে, তাতো আমি আগে বুঝতে পারি নি, তাই আগে বোকার মত, তোমার উপর কতই বিরক্ত হয়েছি। তুমি সে সব কথা এখন ভুলে যাও।"

স্বামীর মুখে আপন সুখ্যাতি শুনিয়া লজ্জায় ও আহ্লাদে সুলোচনার কপোলদেশ যেন কোকনদ আভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল; বলা বাহুল্য যে সেই গণ্ড, স্বামীর পুরস্কার লাভ করিল। সে বুঝিল, খুড়ীর নিকট যে মোহিনীবিদ্যা লাভ করিয়াছে তাহা সার্থক হইয়াছে। কুন্দাবাবু মনে করিলেন, ডায়েরী হইতেই তিনি তাঁহার স্ত্রীর যথার্থ পরিচয় পাইলেন।

বস্তুতঃ খুড়ীর মোহিনীবিদ্যা, ডায়েরী অথবা পোষ্ট অফিসের খাতা,—যে কারণেই হউক—সুলোচনার দীর্ঘ জীবন মধ্যে, কুন্দাবাবু তাহার উপর আর কখনও বিরক্ত হন নাই। এবং সে পুত্র কন্যা ও পৌত্র দৌহিত্র লইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বাঁশীর সুর

এ যে গো আকুল প্রণয়ে ব্যাকুল
প্রেমের ব্যথায় গগন ছায়,
যেন এ নীরব প্রাণের গোপন
স্বপন সুখের আবেশ ভায় ;
মধুর মধুর বিবশ বিধুর
গোপন সরম মর্ম্মবঁধুর
আঁধারে খুঁজিয়া লুকানো হিয়ার
পীরিতি-মেদুর পরশ চায়।

সুরের যেন এ আকুল নির্ঝর—
ঝরে ঝরে পড়ে ঝরণা তার ;
পাষাণ কঠিন হৃদয় বাহিয়া
বহিয়া এনেছে রসের ধার—
কল কল্লোলে চলেছে জোয়ার
অমল মধুর পুণ্য-তোয়ার,
ছলছলি এল মন্দাকিনীর
নির্ম্মল পূত সুধার সার।

রণিয়া রণিয়া মঞ্জীরধ্বনি
ঝঙ্কারি তোলে হৃদয় মন
কোন্ বিরহিণী কাঁকণ নিকর্ষে
কম্পিত করে কুঞ্জবন।
তাই কণকণি রুণুঝুণু গান
বাঞ্ছিত লাগি উদাস পরাণ
বঞ্চিত হৃদি ক্রন্দনে তোলে
মৃদু বিলাপের গুঞ্জরণ।

বুঝি এ রাগিণী মূর্চ্ছনা তুলি
বিশ্ববাসীর বারতা কয়,
কি যে ব্যথা জাগে মরমে মরমে
উঠে কোন্ সুরে সুখের জয়!
কোটি মরমের গোপন তিয়াস
একটি গভীর দীর্ঘ নিশাস
ধরণী রাণীর বক্ষ টুটিয়া
বাহিরিয়া এল ভুবনময়।

শ্রীভক্তিসুধা হার।

জৈন-সাহিত্যে রাম কথা

ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাম-কথা বা রামায়ণ প্রচলিত আছে। আধুনিক নানা ভাষাতে (বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠি ইত্যাদি) কবিরা যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃতেই অনেকগুলি আখ্যান আছে। অনেকগুলি পুরাণে এবং মহাভারতে রামকথা সঙ্ক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মূল আখ্যান—রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাবণ বধ ইত্যাদি—এক প্রকার হইলেও, বিস্তৃত বর্ণনাতে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। আধুনিক ভাষার কবিরাও আপন আপন ইচ্ছা ও রুচি মত নানা প্রকার গল্প ও চরিত্র বাড়াইয়াছেন বা কমাইয়াছেন। এই সকল উপাখ্যান মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বাল্মীকি মুনিকে বাঙ্গালা কবি কৃত্তিবাস রত্নাকর নামক [সম্ভবতঃ অনার্য্য] দস্যুর পরিণত অবস্থা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এ ঐতিহাসিক তথ্য কোথায়

পাইলেও তাহা বলেন নাই। বাল্মীকি রামের সম-সাময়িক, সীতা শেষ-জীবন তাঁহার আশ্রমে কাটাইয়া-ছিলেন, সেই সময়ে মুনি রামায়ণ রচনা করিয়া সীতার পুত্রদ্বয়কে গান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনিই সীতাকে সঙ্গে করিয়া রামের সভাতে লইয়া গিয়া-ছিলেন; অতএব তিনি রামায়ণের আখ্যানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট। কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে অনার্য্য দস্যু বলিলেও, তাঁহার অনার্য্যদের প্রতি ঘৃণোক্তি পাঠ করিলে তাঁহাকে আর্য্যকুলোদ্ভব বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার অনার্য্য বর্ণনা যে সত্য হইতে পারে না তাহা পাঠককে বলিয়া দিতে হয় না। রামায়ণে অনেকগুলি আর্য্য ও অনার্য্য চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস রাম আট আনা বিষ্ণু অবতার হইলেও, হনুমান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চরিত্র একটিও নাই। হনুমান একাধারে বলবান, বীর্য্যবান, সাহসী, যোদ্ধা, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, নীতিজ্ঞ, বাগ্মী ও জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু সকল গুণরাশির সহিত তিনি শাখামৃগ, বিবসন বানর, প্লবঙ্গম, শতযোজন লম্ফ দিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; তাঁহার দীর্ঘ লাঙ্গুল কাপড় জড়াইয়া তৈলসিক্ত করিয়া রাবণ পোড়াইয়া দিয়াছিল। বাল্মীকি-বর্ণিত বানর কোন্ শ্রেণীর জীব ঠিক বুঝিতে পারা যায় না; কেননা ঐ বানর-বংশের রাজা বালীর শ্রাদ্ধে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করা হইয়াছিল, পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণ বিদায় কিছুই বাদ যায় নাই। তাহাদের অন্য রাজা সুগ্রীব, অভিষেকের সময়ে বহুমূল্য বস্ত্র ও মূল্যবান পাদুকা যুগল পরিধান করিয়াছিলেন, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপূত হবি দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, মহর্ষি-বিহিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে তীর্থসলিল দ্বারা অভিষেক করিয়াছিলেন। তবে, এ ব্রাহ্মণেরা বানর-কুলোদ্ভব দীর্ঘলাঙ্গুল ভট্টাচার্য্য, অথবা ধুতি চাদর পরিহিত শিখা ও উপবীত শোভিত মানব, সে কথা লেখা নাই।

রাম ব্রহ্মচার্য্য ধারণ করিয়া বনবাসী, কিন্তু সঙ্গে সীতা। সীতা হরণের পর দণ্ডকারণ্যে ও কিষ্কিন্ধ্যাতে শারদীয়া পূর্ণিমার বিমল জ্যোৎস্না দর্শনে রামের সীতা বিরহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, ও "কাম পীড়িত" হইয়া ছোট ভাইটির কাছে তিনি অনেক বিলাপ করিয়াছিলেন। অথচ কিষ্কিন্ধ্যা নগরে বানরী-সুন্দরীদের দর্শন করিলে পাছে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় সেই ভয়ে নগরে প্রবেশ করেন নাই। এই রূপ ও যৌবন ভরে গর্ব্বিতা, মাল্য ও ভূষণদ্বারা বিভূষিতা বানরী-সুন্দরীরা নূপুর ও অলঙ্কার পরিতেন, অতএব কখনই বিবসনা হইতে পারেন না; কিন্তু লাঙ্গুল ধারিণী কিনা, তাহা কল্পনা-সাপেক্ষ। বানরদের সম্বন্ধে যুক্তপ্রদেশের এক কবি বলিয়াছেন—"মানস্ ক্যাসে হাথ পাওঁ, মানস্ ক্যাসে কায়া। আট মহিনা ক্যা কিয়া ছপ্পর ভি তো নহি ছায়া?" অর্থাৎ "হে বানর, তোমার হাত, পা ও শরীর মানুষের মত দেখিতেছি, তথাপি তুমি আট মাসের মধ্যে [চার মাস বর্ষা কালের আশ্রয়ের জন্য] এক খানা চালাও ছাইতে পার নাই?" কিন্তু এই কিষ্কিন্ধ্যার বানরেরা বড় বড় কারুকার্য্যময় স্ফটিক-মণিময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত দিব্য গিরিগুহারূপ অট্টালিকাতে ও বিন্ধ্য ও মেরুগিরি সদৃশ প্রাসাদে বাস করে। তাহাদের বড় বড় সাজান তন্ত্রীগীত-সমাকীর্ণ মধুর ধ্বনি-প্লাবিত প্রকোষ্ঠে নানা প্রকার পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসন [বা সোফা চেয়ার ইত্যাদি] পাতা। তাহারা সোণার চিত্রিত দোলায় চড়িয়া বেড়ায়।

আবার, এই বানরেরা অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া লম্ফ দেয়, "কিলকিলা" শব্দ করে, মধুবনে প্রবেশ করিয়া মধুপান [তাড়ি পান?] করিয়া গাছ নষ্ট করে। তাহাদের রাজ-প্রাসাদের অস্ত্রধারী প্রহরীরা লক্ষ্মণকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া [সম্ভবতঃ অস্ত্রত্যাগ করিয়া] বৃহৎ পর্ব্বত শৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করে। তাহাদের প্রধানেরা সমর ক্ষেত্রে গাছ পাথর লইয়া যুদ্ধ করে, তখন নখ ও দশনই তাহাদের আয়ুধ; তাহারা অন্য অস্ত্র ধারণ করে না বা করিতে জানে না। আবার, বানরের মাংস, স্মৃতি-শাস্ত্র মতে যে কয়েকটি পঞ্চনখের মাংস দ্বিজাতিরা খাইতে পারে, তাহার মধ্যে গণ্য নহে, ইহা জানিয়াও

রামের মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অধর্ম্ম-শঙ্কাশূন্য হইয়া বালীকে মারিলেন কেন, তাহার কৈফিয়ৎ যে তলব করে। কোন কোন বানর আর্য্য মানবাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিল্পী, পাকা ইঞ্জিনিয়ারের কায করে, সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধে, আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করে, ডাক্তারী করে, মন্ত্রিত্ব করে, রাজনীতির গূঢ় প্রশ্নাবলীর বিচার করে।

—এক কথায় বাল্মীকি বর্ণিত অনার্য্য চিত্রে ও চরিত্রে মোটে সামঞ্জস্য নাই।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্য ছাড়া, সংস্কৃতে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের পুস্তক বড় অল্প নহে। অনেকের মত যে জৈন গ্রন্থগুলি বাছিয়া বাদ দিলে সংস্কৃতের গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। জৈন সম্প্রদায়ে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে হেমচন্দ্র সূরি (হেমচন্দ্রাচার্য্য, হেমাচার্য্য) একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি গুজরাটের রাজা কুমার পালের গুরু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন, ইতিহাস, জ্যোতিষ ইত্যাদি সকল বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এখন তাহার মধ্যে অতি অল্পই পাওয়া যায়, অধিক ভাগ নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম "ত্রিষষ্টিশলাকা-পুরুষ-চরিত্র।" জৈনমতে প্রতি কল্পে ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১২ জন চক্রবর্ত্তী রাজা, ৯ জন বলদেব, ৯ জন বাসুদেব ও ৯ জন প্রতিবাসুদেব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই রূপে প্রতি কল্পে ৬৩ জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। উপস্থিত কল্পে যে ৬৩ জন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন চরিত এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। তীর্থঙ্কর বা ধর্ম্মস্থাপক, চক্রবর্ত্তী রাজারা বাহুবলে বা আজ্ঞা বলে সেই ধর্ম্ম প্রচার করেন। বলদেবেরা আপন সময়ে আদর্শ চরিত্র দ্বারা ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করেন। বাসুদেবেরা হিন্দুদের অবতারের মত প্রতিবাসুদেবদের যমালয়ে প্রেরণ করিয়া ভূভার হরণ করেন। একজন বলদেব, বাসুদেব ও প্রতিবাসুদেব এই সময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

তীর্থঙ্করদের নাম—১ ঋষভ দেব, ২ অজিতনাথ, ৩ সম্ভবনাথ, ৪ অভিনন্দন, ৫ সুমতিনাথ, ৬ পদ্মপ্রভু, ৭ সুপার্শ্বনাথ, ৮, চন্দ্রপ্রভু, ৯ সুবিধিনাথ, ১০ শীতলনাথ, ১১ শ্রেয়াংশনাথ, ১২ বাসুপূজ্য, ১৩ বিমলনাথ, ১৪ অনন্তনাথ, ১৫ ধর্ম্মনাথ, ১৬ শান্তিনাথ, ১৭ কুন্থুনাথ, ১৮ অরনাথ, ১৯ মল্লীনাথ, ২০ মুনিসুব্রত, ২১ নমিনাথ ২২ নেমিনাথ, ২৩ পার্শ্বনাথ, ও ২৪ মহাবীর স্বামী।

চক্রবর্ত্তী রাজাদের নাম—১ ভরত, ২সগর, ৩ মঘবা, ৪ সনৎ কুমার, ৫ শান্তিনাথ, ৬ কুন্থুনাথ, ৭ অরনাথ, ৮ সুভূম, ৯ মহাপদ্ম, ০ হরিষেণ, ১১ জয় ও ১২ ব্রহ্মদত্ত।

বলদেবদের নাম—১, অচল, ২ বিজয়, ৩ ভদ্র, ৪ সুপ্রভ, ৫ সুদর্শন, ৬ আনন্দ, ৭ নন্দন, ৮ রাম, ও ৯, বলভদ্র।

বাসুদেবঃ—১ ত্রিপৃষ্ট, ২ দ্বিপৃষ্ট, ৩ স্বয়ম্ভু, ৪ পুরুষোত্তম, ৫ পুরুষসিংহ, ৬ পুরুষপুণ্ডরীক, ৭ দত্ত, ৮ লক্ষণ ও ৯ শ্রীকৃষ্ণ।

প্রতিবাসুদেব—১ অশ্বগ্রীব, ২ তারক, ৩ মেরক, ৪, মাধুর, ৫ নিশম্ভু, ৬ বলিরাজ, ৭ প্রহ্লাদ, ৮ রাবণ, ও ৯ জরাসন্ধ।

ইহার অষ্টম বলভদ্র পদ্ম [অথবা রাম], বাসুদেব নারায়ণ [বা লক্ষ্মণ] ও প্রতিবাসুদেব দশমুখ [বা রাবণ] সমসাময়িক ছিলেন। প্রতিবাসুদেব দশমুখকে নিধন করিবার জন্য লক্ষ্মণ বা নারায়ণের জন্ম হইয়াছিল। পদ্ম বা রাম বাল্যাবধি সংসারে বিরক্ত ছিলেন, তিনি রাজ্যশাসন অপেক্ষা তপস্যা শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার পিতা দশরথ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বনে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, তখন রাম রাজ্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ভরতকে রাজ্যগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত, পিতার সহিত তপস্যা করিতে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে রাজ্যগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য রাম ১৪ বৎসর বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়া বনে প্রবেশ

করিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন, কিন্তু রাম তাঁহাকে বনেই অভিষিক্ত করিলেন। কাযে কাযেই ভরতকে ১৪ বৎসরের জন্য রাজ্য গ্রহণ করিতে হইল। ১৪ বৎসর অতীত হইলে রাম লক্ষ্মণকে রাজ্যদান করিয়া স্বয়ং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন।

বাল্মীকিতে চারি ভাই মধ্যে রামই প্রধান ব্যক্তি—বিষ্ণুর আট আনা অংশ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অন্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণে রাম পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। জৈন সাহিত্যে লক্ষ্মণ প্রধান।

জৈন সাহিত্যে বানর ও রাক্ষস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু অন্য অর্থে। উত্তর ভারত যেমন আর্য্যদের দেশ, দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত, সেইরূপ দক্ষিণ ভারত বিদ্যাধর দেশ। লঙ্কাবাসী রাক্ষস ও কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানরেরা সকলেই বিদ্যাধর। আর্য্যদের যেমন ইন্দ্র ছিলেন, তাহাদেরও সেইরূপ এক ভীমেন্দ্র ছিলেন। তিনি মেঘবাহন নামক এক বিদ্যাধরকে রাক্ষসদ্বীপ ও পাতাল লঙ্কা বাসার্থ দিয়াছিলেন এবং শত্রু হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ও শত্রুদের শাসনে রাখিবার জন্য রাক্ষসীবিদ্যা নামক এক গুপ্তবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। মেঘবাহনের বংশধরদের এই গুপ্ত বিদ্যা আয়ত্ত ছিল; তাহারা যুদ্ধের সময়ে এই বিদ্যাবলে শত্রুকে নির্দ্দয় ভাবে দমন করিত বলিয়া লোকে তাহাদের রাক্ষস বলিতে কুণ্ঠিত হইত না। রাক্ষসদ্বীপবাসী বিদ্যাধরেরা জীব হত্যার ঘোর বিরোধী, বীতরাগ ভক্ত শ্রাবক ছিল। অনেক রাক্ষসরাজা, বিশেষতঃ দশমুখ রাবণ, জৈনতীর্থে গমন করিয়া তীর্থঙ্করদের পবিত্র মূর্ত্তি বন্দনা করিয়াছিলেন। অন্য বিদ্যাধর রাজাদের মধ্যে অনেকেই পরিণতাবস্থায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। রাবণের সমসাময়িক এক বিদ্যাধর রাজা ব্রাহ্মণদের পরামর্শে পশু বলি দিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। পরম শ্রাবক রাবণের কাছে নারদ মুনি তৎসম্বন্ধে অভিযোগ করিলে, রাবণের আজ্ঞামত পশুবলি রহিত করা হইয়াছিল। এ হেন রাক্ষসেরা নরমাংসভুক্ হইতে পারে না।

দাক্ষিণ ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরের সমান্তরাল যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে—আধুনিক পশ্চিম ঘাট—তাহাকে জৈন সাহিত্যে বৈতাঢ্য পর্ব্বত বলা হইয়াছে। এই পর্ব্বতের সানুদেশে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বিদ্যাধর রাজাদের রাজধানী ছিল। এইরূপ এক নগরে—রথনূপুরে—যে রাজা থাকিতেন, তিনিই বিদ্যাধরদের সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। রথনূপুরকে অনেকটা বিদ্যাধরদের দেশের দিল্লী বলা যাইতে পারে।

একাদশ তীর্থঙ্কর শ্রেয়াংশ প্রভুর তীর্থে রাক্ষসদ্বীপের রাজধানী লঙ্কাপুরে মেঘবাহনের বংশধর কীর্ত্তিধবল নামক বিদ্যাধর রাজা ছিলেন। সেই সময়ে বৈতাঢ্য পর্ব্বতের সানুদেশে মেঘপুরে অতীন্দ্র নামক এক বিদ্যাধর রাজা ছিলেন। তাঁহার শ্রীকণ্ঠ নামক এক পুত্র ও দেবী নাম্নী এক সুন্দরী কন্যা ছিল। রথনূপুরের তাৎকালীন সম্রাট্ পুষ্পোত্তর, দেবীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া ঐ কন্যা আপনার পুত্র পদ্মোত্তরের জন্য যাচ্ঞা করিলেন। অতীন্দ্র ক্ষুদ্র রাজা হইয়াও, সম্রাটের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না তিনি পুষ্পোত্তরের প্রায় সমকক্ষ, রাক্ষসদ্বীপের রাজা কীর্ত্তিধবলকে কন্যা দান করিলেন। এই ঘটনাতে রথনূপুর ও মেঘপুর দুই রাজবংশে মনোমালিন্য আরম্ভ হইল। ইহার কিছুকাল পরে পরম শ্রাবক শ্রীকণ্ঠ উত্তরভারতে তীর্থভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, ফিরিবার সময়ে তিনি রথনূপুরে কয়েকদিবস বিশ্রাম করিতেছিলেন। একদিবস তিনি পুষ্পোত্তর রাজার কন্যা পদ্মাকে বনবিহারকালে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইলেন। শ্রীকণ্ঠ পদ্মাকে লইয়া পলাইলেন। কিন্তু রথনূপুরের সৈন্য, সংখ্যা ও বলে মেঘপুরের অনেক বেশী বলিয়া, তিনি পদ্মাকে লইয়া আপনার ভগিনীপতি ও বন্ধু কীর্ত্তিধবলের কাছে লঙ্কাপুরে পলাইয়া গেলেন। পুষ্পোত্তর রাজার সেনা তাঁহাকে তাড়া করিয়া লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইলে, কীর্ত্তিধবল তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিলেন ও পুষ্পোত্তরের কাছে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি কি অন্যায়

করিতেছেন ? ভারতের রাজকন্তারা চিরকাল স্বয়ম্বরা হইয়া থাকে, ঘটী বাটীর মত কেহ তাহাদের দান করে না; কোনও রাজা ঐরূপ দান গ্রহণও করে না। আপনার কন্তা পদ্মাও স্বয়ম্বরা হইয়াছে, তবে আপনি সৈন্ত পাঠাইয়াছেন কেন ?"

এই দূতের মুখে পদ্মাও পিতাকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হইয়াছেন, কেহ তাঁহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। পুষ্পোত্তর এই সংবাদ পাইয়া আপনার সৈন্ত প্রত্যাহার করিলেন ও কন্তার বিবাহের যৌতুক পাঠাইয়া দিলেন।

কীর্তিধবল আপনার প্রিয়বন্ধু ও শ্যালককে মেঘপুরে যাইতে দিলেন না। বলিলেন, "আমার বিস্তৃত রাজ্যে যেখানে ইচ্ছা বাস কর।" লঙ্কাপুরের বায়ুকোণে তিন শত যোজন বিস্তৃত অতি রমণীয় বানর দ্বীপ আছে। শ্রীকণ্ঠ এই দ্বীপে কিষ্কিন্ধ্যাগিরিশিখরে কিষ্কিন্ধ্যা নামক এক গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সেইখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে কিষ্কিন্ধ্যা একটি বড় নগর হইল। এই কিষ্কিন্ধ্যা-শিখরে নানাজাতীয় নানা ভঙ্গীর বানর থাকিত। বীতরাগ ভক্ত শ্রাবক শ্রীকণ্ঠ নগরের নানা স্থানে তাহাদের আহারীয় ও পানীয় দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে এক এক বংশের কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা, নিজ নিজ রথের পতাকা ও গৃহ প্রাচীরে এক এক প্রকার বানরের চিত্র অঙ্কন করিতে লাগিলেন,—ঐ বানর চিত্র দেখিয়া, কে কোন বংশে উৎপন্ন বুঝিতে পারা যাইত। অন্ত দেশের লোকেরা পূর্ব্বাবধি কিষ্কিন্ধ্যাকে বানরের পর্ব্বত বলিত, চিত্র অঙ্কনের পর কিষ্কিন্ধ্যাবাসীকে বানর বলিতে লাগিল।

উপরিউক্ত ঘটনার বহুকাল পরে বিংশ তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতের তীর্থে বানর দ্বীপে ঘনোদধি, রাক্ষসদ্বীপে তড়িৎকেশ ও রথনূপুরে অশনিবেগ রাজ্যশাসন করিতেন। অশনিবেগের বিজয় ও বিদ্যুদ্বেগ নামক দুই মহাবলগর্ব্বিত পুত্র ছিল। এই সময়ে বিদ্যাধরদের দেশে আদিত্যপুর নগরে মন্দিরমালী নামক এক সামান্ত রাজা ছিলেন। মন্দিরমালী আপন কন্তা শ্রীমালার স্বয়ম্বরে দেশ দেশান্তরের রাজাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। শ্রীমালা বিজয়কে উপেক্ষা করিয়া, ঘনোদধির জ্যেষ্ঠপুত্র কিষ্কিন্ধীর গলে মাল্যদান করিলে, বিজয় কিষ্কিন্ধীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তড়িৎকেশের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকেশ আপনার বন্ধু কিষ্কিন্ধীর অনুকূলে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; এই যুদ্ধে বিজয় নিহত হইলেন, কিষ্কিন্ধীর সহিত শ্রীমালার বিবাহ হইল। ইতঃপূর্ব্বে দুই বন্ধু তড়িৎকেশ ও ঘনোদধি এক সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তপস্তা করিতে বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অশনিবেগ পুত্র-হন্তাকে শাস্তি দিতে রাক্ষসদ্বীপ আক্রমণ করিলেন; সুকেশ ও কিষ্কিন্ধী পরাজিত হইয়া উভয়ে পাতাল-লঙ্কাতে পলাইয়া গেলেন। উভয়ের রাজ্য অশনিবেগ অধিকার করিলেন। অশনিবেগ রাক্ষসদ্বীপ শাসন করিতে নির্ঘাত নামক এক অনুগতকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু প্রিয় পুত্রের অকাল নিধনের পর আর সংসারে থাকিতে পারিলেন না, স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বিশাল রাজ্য তাঁহার পুত্র সহস্রার শাসন করিতে লাগিলেন।

পাতাল লঙ্কাতে নির্ব্বাসনকালে সুকেশের মালী, সুমালী ও মাল্যবান নামক তিন পরাক্রমশালী পুত্র উৎপন্ন হইল। কিষ্কিন্ধীর শ্রীমালা হইতে আদিত্যরজা ও ঋক্ষরজা নামক দুই পুত্র উৎপন্ন হইল। কিষ্কিন্ধী মধুপর্ব্বতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সুকেশের পুত্রেরা লঙ্কা আক্রমণ করিয়া নির্ঘাতকে বধ করিলেন। মালী রাক্ষসদ্বীপের সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হইলে তিনি কিষ্কিন্ধীকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিষ্কিন্ধী মধুপর্ব্বতের মত রমণীয় স্থান ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার অনুমতি লইয়া আদিত্যরজা কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য গ্রহণ করিলেন।

রথনূপুরের সম্রাট সহস্রারের পুত্র ইন্দ্র অতি বলশালী ছিলেন। তিনি স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রের অনুকরণে আপনার নামকরণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন রাজ্যে

চারিজন দিক্‌পাল, সপ্তসেনা ও সেনাপতি, তিন প্রকার সভা, বজ্র আয়ুধ ও ঐরাবত হস্তী, রম্ভাদি বারাঙ্গনা, বৃহস্পতি উপাধিধারী মন্ত্রী, নৈগমেষী নামক পত্তি-সৈন্যকা-নায়ক [১ হস্তী, ১ রথ, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতিতে এক পত্তি] ইত্যাদি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব দিকের দিক্‌পালের উপাধি সোম, দক্ষিণের যম, পশ্চিমের বরুণ ও উত্তরের কুবের রাখিয়াছিলেন।

ইন্দ্র অনুগত সেবক নির্ঘাতের প্রতিশোধ লইতে মালীকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। সুমালী ও মাল্যবান আবার রাজ্য ছাড়াইয়া পাতাল লঙ্কাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ইন্দ্র বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণকে লঙ্কারাজ্য শাসন করিতে নিযুক্ত করিলেন।

পাতাল লঙ্কাতে সুমালীর রত্নশ্রবা নামক একপুত্র উৎপন্ন হইল। রত্নশ্রবার কৈকসী নাম্নী এক সুন্দরীর সহিত বিবাহ হইল। কৈকসী বৈশ্রবণের মাতা কৌশিকার কনিষ্ঠা ভগিনী। কৈকসীর তিন পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দশমুখ রাবণ, দ্বিতীয় ভানুকর্ণ বা কুম্ভকর্ণ, পরে কন্যা চন্দ্রনখা বা সূর্পনখা, ও সকলের ছোট বিভীষণ। দশমুখ রাবণ বাল্যাবধি তেজস্বী ও স্বাধীন প্রকৃতি ছিলেন। তিনি প্রথমে বংশগত গুপ্ত রাক্ষসী বিদ্যা ও নানা বিদ্যা সাধন করিলেন। তিনি যোগ সাধন দ্বারা অমরত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হয়েন নাই। দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া এই মাত্র বর দিয়াছিলেন যে, তুমি প্রতি বাসুদেব, একমাত্র বাসুদেব ছাড়া আর কেহ তোমাকে মারিতে পারিবে না। দশমুখ বৈশ্রবণকে নিহত করিয়া পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি কিছু কাল দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে ভারতময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে খর নামক এক বিদ্যাধর চন্দ্রনখাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিল। চন্দ্রনখার দুই পুত্র শম্বুক ও সুন্দ উৎপন্ন হইয়াছিল।

দশমুখ লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করিলে আদিত্যরজা কিষ্কিন্ধ্যা অধিকার করিলেন। আদিত্যরজার দুই পুত্র বালী ও সুগ্রীব ও ঋক্ষরজার দুই পুত্র নল ও নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। আদিত্যরজা তপস্যা করিতে বনে প্রবেশ করিলে, বালী কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

দশমুখ বালীর বীর্য্যের সুখ্যাতি সহ্য করিতে না পারিয়া বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন; কিন্তু বলবান্ বালী দশমুখকে কুক্ষিগত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলেন। দশমুখ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন কিন্তু বালী ভাবিতে লাগিলেন, দশমুখের মত বন্ধুও যুদ্ধ করিতে আসিলেন, তাহার একমাত্র কারণ ধন, বল, রাজ্য-অহঙ্কার ইত্যাদি। অতএব এ কারণকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কায। তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া মুনিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও অষ্টাপদ শিখরে [কৈলাসে] স্থাণুর মত তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য সুগ্রীব শাসন করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য রাবণের সহিত আপন ভগিনীর বিবাহ দিলেন।

চন্দ্রনখার পুত্র শম্বুক এক বিদ্যা [অথবা চন্দ্রহাস নামক খড়্গ] সাধন উদ্দেশ্যে এক বাঁশঝাড় মধ্যে তপস্যা করিতেছিল। হঠাৎ সেই বনে লক্ষ্মণ প্রবেশ করিলেন ও চন্দ্রহাস খড়্গ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কেননা শম্বুক লতা পাতায় ঢাকা পড়িয়াছিলেন। পরে খড়্গ লইয়া ঝোপে আঘাত করিতেই শম্বুকের ছিন্ন শির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। অজ্ঞানে ও অসাবধানতা বশতঃ জীবহত্যা করিয়া লক্ষ্মণ বড় দুঃখিত হইলেন। এমন সময়ে চন্দ্রনখা পুত্রকে দেখিতে আসিল। চন্দ্রনখা লক্ষ্মণের বীরবপু দেখিয়া কামপীড়িতা হইয়া সম্বোধন করিলে লক্ষ্মণ রামকে দেখাইয়া দিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে চন্দ্রনখা আপনার স্বামী খরকে, পুত্রহন্তাকে বধ করিতে পাঠাইল এবং অগ্রজ রাবণকে সীতা হরণ করিতে উত্তেজিত করিল। যখন খরের সহিত লক্ষ্মণ যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন রাম লক্ষ্মণের কাতর আহ্বান শুনিতে পাইলেন, তিনি সীতাকে একা ছাড়িয়া লক্ষ্মণকে

সাহায্য করিতে গেলেন। এই অবসরে রাবণ সীতাকে হরণ করিলেন। এই যুদ্ধে খর ও তাহার ভ্রাতা দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইল; চন্দ্রনখার দ্বিতীয় পুত্র সুন্দ লঙ্কাতে পলাইয়া গেল।

রাম কিষ্কিন্ধ্যাপতি রাজা সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি যেরূপে সম্ভব সীতাকে উদ্ধার করিবেন। রাবণের মত বলবান প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে বুঝাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিবার চেষ্টা করা উচিত বিবেচনা করিলেন। ভাবিলেন, এমন এক দূত পাঠাইতে হইবে যাহার পরামর্শ রাবণ অগ্রাহ্য করিতে সাহস না করে। তিনি চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, বৈত্যাচা গিরির সানুদেশে আদিত্যপুরের (১) রাজা প্রহ্লাদের পৌত্র ও পবনজয়ের পুত্র হনুমানই ঐরূপ ব্যক্তি। তিনি যদি স্বীকার করেন, তবেই বিনাযুদ্ধে কার্য্যোদ্ধার সম্ভব। হনুমানকে ডাকিয়া অনুরোধ করাতে তিনি দৌত্য স্বীকার করিলেন ও অল্প সৈন্য সঙ্গে লইয়া আপনার মাতামহ মহেন্দ্র পর্ব্বতের রাজা মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই পথে লঙ্কা প্রবেশ করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে চন্দ্রনখা ও খরের কন্যা অনঙ্গকুসুমার সহিত হনুমানের বিবাহ হইয়াছিল। সুগ্রীবের কন্যা পদ্মরাগা ও নলের কন্যা হরিমালিনীও হনুমানের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। অতএব হনুমান এক শ্বশুরের অনুরোধে অন্য এক মামাশ্বশুরের কাছে সীতা ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না।

চন্দ্রনখা ও খর পাতাল লঙ্কাতে যেখানে বাস করিত, সে নগরে কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি আদিত্যরজার এক পুত্র [সুগ্রীবের ভ্রাতা] চন্দ্রোদর রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। খর চন্দ্রনখাকে বিবাহ করিবার পর চন্দ্রোদরকে মারিয়া রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। চন্দ্রোদরের বিধবা অনুরাধা তখন গর্ভবতী ছিলেন; তিনি গোপনে বনে বাস করিলেন ও বিরাধ নামক এক পুত্র প্রসব করিলেন। যখন খর দূষণ ও ত্রিশিরা নিহত হইলেন তখন বিরাধ সৈন্য সহিত লক্ষ্মণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সুন্দের লঙ্কায় পলায়নের পর লক্ষ্মণ বিরাধকে পাতাল-লঙ্কার রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ খরের প্রাসাদে ও বিরাধ সুন্দের পরিত্যক্ত প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের সভাতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মত, রাবণের সভাতে হনুমানের নীতি-উপদেশ বিফল হইল। প্রতিজ্ঞা মত সুগ্রীব সসৈন্যে রামকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। সুগ্রীবের খুল্লতাতপুত্র নল সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধিলেন। সুগ্রীবের আহ্বানে তাঁহার প্রতিবেশী ও কুটুম্ব রাজারা আপন আপন সৈন্য আনিলেন। লঙ্কা অবরোধ করা হইল। রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণ সীতাকে ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন বলিয়া রাজ-সভাতে রাবণ কর্ত্তৃক অপমানিত হয়েন। তিনি অগ্রজকে ত্যাগ করিয়া সুগ্রীবের কাছে আসিলেন ও রামের সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাম ও রাবণে ঘোর যুদ্ধ হইল। রাবণ সবংশে নিহত হইলেন। পরে রাম বিভীষণকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। লঙ্কাতে যাইবার সময়ে সুগ্রীব ও অন্য রাজারা লক্ষ্মণকে কন্যাদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন লক্ষ্মণ গ্রহণ করেন নাই, এখন সেই সকল কন্যার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ হইল।

অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভরত বলিলেন, "আমি আর রাজ্য-শাসন করিতে পারি না, আমি আপনার অনুরোধে ১৪ বৎসরের জন্য রাজ্য-শাসন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম, এখন আপনি আপনার রাজ্য গ্রহণ করুন, আমি তপস্যা করিব।" রাম স্বয়ংও বাল্যকাল হইতেই বিরাগী ছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া রাজ্য-শাসন করিতে তিনি বাধ্য। তিনি লক্ষ্মণকে রাজ্যে অভিষিক্ত

---

(১) ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরে আধুনিক গোয়ার (Goa) কাছে হনুমানের রাজধানী ছিল। হনুমানের পিতা এবং বাল্যকালে হনুমান স্বয়ং রাবণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

করিয়া স্বয়ং তপস্যা করিতে হিমালয়ের দিকে চলিয়া গেলেন। তিনি অতি শীঘ্রই মুনিপদ পাইলেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া লক্ষ্মণের রাজ্য-শাসন প্রণালী দেখিয়া যাইতেন।

জৈন-শাস্ত্রে রাম একজন "বলদেব।" তিনি পদ্ম নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন গ্রন্থ মতে পদ্মই তাঁহার প্রকৃত নাম, লোকে তাঁহাকে রামও বলিত। প্রাচীন কালে, এমন কি হেমাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত এক এক রাজার ৫।৭ বা আরও অধিক নাম পাওয়া যায়। ইতিহাসে গোলমাল হইয়া যায়। যাহা হউক, জৈন-সাহিত্যে যে পুস্তকে সবিস্তারে রামকথা আছে তাহাকে পদ্মপুরাণ বলা হইয়াছে। এ পদ্মপুরাণ হিন্দুদের পদ্মপুরাণ হইতে ভিন্ন; রামের পিতৃ-মাতৃ দত্ত নাম পদ্ম বলিয়া পুস্তকের নাম পদ্মপুরাণ।

কিষ্কিন্ধ্যা আজিও তীর্থস্থান। প্রাচীন বালীর রাজধানী আধুনিক বেলারী (Bellary) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটি বড় নগর। পম্পা সরোবর ইত্যাদি এখনও যাত্রীদের দেখান হয়। তবে ইহার সহিত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অযোধ্যাতে এখনও একখানি ইটের গাঁথুনি (বোধ হয় ৩০।৪০ বৎসর অপেক্ষা পুরাতন নহে) ছোট ঘর—আন্দাজ ১০ × ১০ ফুট—পাণ্ডারা যাত্রীদের দেখাইয়া বলে ইহাই "সীতা রসোই" অর্থাৎ কোশল-রাজ্যের সম্রাজ্ঞী ঐ ঘরে বসিয়া ডাল রুটি রাঁধিতেন ও এক কোণে প্রায় বর্গ একগজ চৌকাতে বসিয়া সম্রাট রামচন্দ্র ঐ ডাল রুটি, সম্ভবত একখানি আমের আচার দিয়া, খাইয়া তৃপ্ত হইতেন। রাম তৃপ্ত হউন বা না হউন, পাণ্ডারা একটি পয়সা পাইয়া তৃপ্ত হয়। সেইরূপ পম্পা সরোবরতটে কোন্ পাথর খানার উপর রাম, কোন খানার উপর লক্ষ্মণ বসিয়াছিলেন পাণ্ডারা নির্ভুলরূপে তাহাও দেখাইয়া দেয়। হনুমানের রাজধানী পশ্চিম সমুদ্র তীরে গরসপ্পা (Gersappa Fall) জল-প্রপাতের কাছে ছিল। তিনি বড় রাজা ছিলেন না বটে, কিন্তু নিজের বাহুবল, বুদ্ধি ও সৎ-চরিত্র দ্বারা এমন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, রাবণকে মৌখিক উপদেশ দিয়া সৎপথে আনিবার মত লোক তিনি ছাড়া আর কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। এই কিষ্কিন্ধ্যাবাসী ও রাক্ষসদ্বীপবাসী বিদ্যাধরেরা বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষা, অস্ত্র চালনা, শিল্প ইত্যাদি কোন বিষয়েই উত্তর ভারতবাসী আর্য্যবংশীয়গণ অপেক্ষা হীন ছিল না। বরং স্থপতিবিদ্যায় তাহারা আর্য্যদের অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

শক্তি-স্তুতি

এস মা শ্মশানকালী! ঘটে ঘটে হও স্বপ্রকাশ।
এ শ্মশানে শুধু শিবা কুক্কুরেরা করিছে চীৎকার,
কাড়াকাড়ি করিতেছে নিয়া তুচ্ছ পচা মাংস হাড়!
ক্ষান্ত কর হানাহানি শুনায়ে মা তীব্র অট্টহাস।
সহে না সহে না আর এ বীভৎস আত্ম-অবিশ্বাস!
চতুর্দ্দিকে হের মৃত নরনারী কাতারে কাতার,
ছুটাছুটী করে তবু নিয়া পূর্ব্ব দুঃখ হাহাকার!
ত্রিপুষ্কর-প্রাপ্ত সবে গণ্ডী মাঝে করে হা হুতাশ!
মৃত সঞ্জীবনী সুধা পিয়াও, মা, সন্তানে তোমার—
তড়িৎ শক্তির বলে আচম্বিতে বাঁচাও সবায়!
চাক্ষুষ দর্শন করি, আগ্যাশক্তি, চিন্ময় তোমায়—
'মা, মা' রবে সমস্বরে প্রকম্পিত করুক সংসার!
তুমি মা প্রকট হয়ে মহাজাতি কর সংগঠন!
আর নাহি ভাল লাগে 'দেহি, দেহি' বৈষ্ণব ক্রন্দন!

শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

বাসিমালা

চল্‌তে পথে কুড়িয়ে পেলাম ছিন্ন বকুল মালা,
ক্লিষ্ট তাহার অঙ্গখানি কি সৌরভে ঢালা,
পরাগ পেলব কোমল তনু গাঁথা সূতার সাথে
কোন সে নিঠুর করলে দলন কঠিন চরণপাতে !
কঠোর পদের পেষণ ভয়ে সুগন্ধ তার জেগে—
মরণমুখীর ভগ্নবুকে বইছে আরো বেগে।
কোন্ প্রভাতের দুষ্ট হাওয়া কাঁপিয়ে শাখাগুলি,
ঝরিয়ে দিলে ধরায় তোদের—ছুঁইয়ে ধরার ধূলি ?

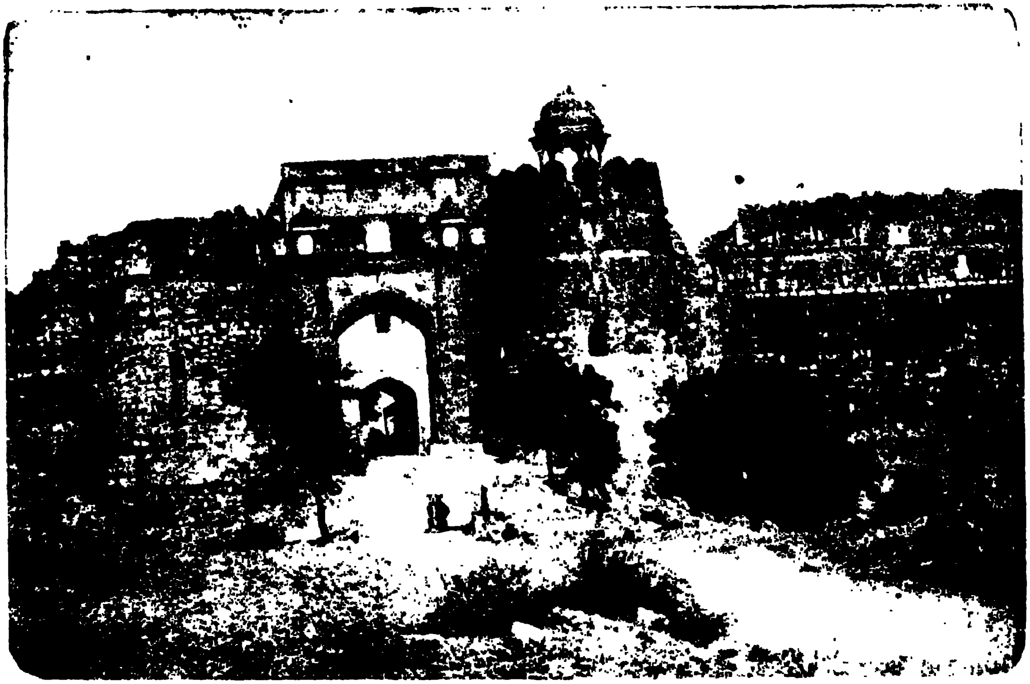
ঝাকড়া মাথায় কোঁকড়া অলক নাচিয়ে সখী দলে,
কোন্ কিশোরী ফুল কুড়াতে এল বকুল তলে
রাঙা চরণ ফেলে দ্রুত বনহরিণীর সমা ?
নীলাম্বরীর আঁচলে কে করলে তোদের জমা ?
যতন করে কাহার তরে সেই রূপসী বালা,
চাঁপার কলি আঙুল দিয়ে গাঁথলে তোদের মালা ?

শ্রীরাধারাণী দত্ত।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দুর্গ হইতে জুম্মা মসজিদ পর্যান্ত পথ অধিক নহে, গাড়ীতে যাইতে অতি অল্প সময়ই লাগে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই সেখানে পঁহুছিলাম। সমস্ত দিবস ঘুরিয়া কিছু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম আমার ইচ্ছা ছিল, সরাইয়ে ফিরিয়া গিয়া আমার বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করি, যখন শেষ হইবে ঈশানচন্দ্র আমাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া তাহার চিরাভ্যস্ত মাংস মসলায় ভোজন করাইবে। কিন্তু সে দিবস শুক্রবার ছিল, গাইড্ আমাকে বলিল জুম্মার দিনে জুম্মা মসজিদে বহু-লোকসমাগম হইয়া থাকে, সে দৃশ্য দিল্লীতে আসিয়া না দেখা বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। কথা সঙ্গত বুঝিয়া, আমি শ্রান্তি সত্ত্বেও তাহার উপদেশ মত মসজিদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যাইবার সময়ে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, মসজিদের প্রশস্ত সোপানাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র লোকে লোকারণ্য এবং তখনও পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য লোক পথ দিয়া সেই দিকেই যাইতেছে। সে দিন কেবল মাত্র শুক্রবার নহে, কি একটি বিশেষ পর্ব্ব-দিনও ছিল, সেই জন্য এত অধিক লোকসমাগম তথায় হইয়াছিল। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল, শ্রান্তি জনিত আলস্যে সে দিবস সেখানে না গেলে একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইতে বঞ্চিত হইতাম। জুম্মা মসজিদ দিল্লীতে চিরকালই থাকিবে এবং আমিও হয়ত আরও বহুবার দিল্লী আসিব, কিন্তু বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষ্যে এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মমন্দিরে যে জন-সমাগম হইয়া থাকে তাহা দেখিবার সুযোগ আমার হয়ত বা আর ঘটিবে না। এই কথা ভাবিয়া আমি গাইড্‌কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলাম; সে নীরবে স্মিতমুখে আমাকে একটি সেলাম করিয়া, জুতা খুলিয়া সোপানে আরোহণ করিতে বলিল এবং নিজে জুতা খুলিয়া আমারি আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। সোপানের নীচে দেখিলাম, বহু সহস্র জুতার যোড়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই দিল্লীর নাগরা। জুতা—ছোট বড় ভাল মন্দ নূতন পুরাতন সর্ব্ব প্রকারের জুতা রহিয়াছে; কোন জুতায় একটু জরীর কায করা, কোনটা বা কেবল চামড়ার

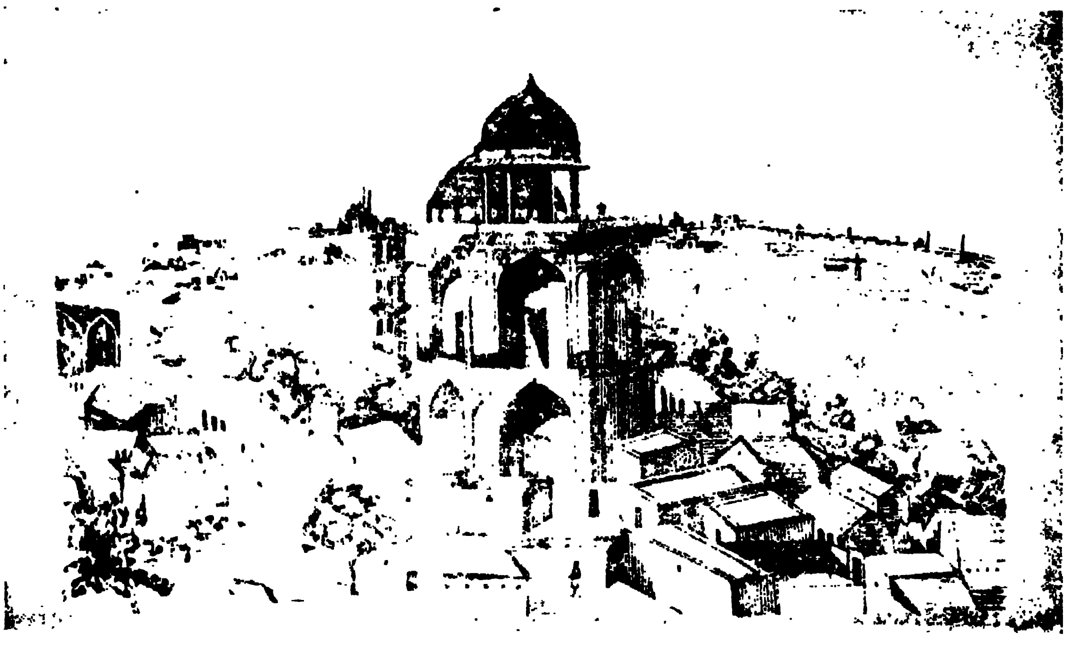


ইন্দ্রপ্রস্থ দুর্গ—প্রবেশদ্বার

তৈয়ারী জরি নাই, খুব অল্প সংখ্যক দেখিলাম চোসিয়ার-পুরের জুতা, (যাহাকে কলিকাতায় আজ কাল পিণ্ডি বা লপেটা বলে)—তদপেক্ষা কম ইংরাজী জুতা।

সোপানাবলী আরোহণ করিয়া যাহা দেখিলাম সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। আমি তৎপূর্ব্বে কখনও এত অধিক সংখ্যক মুসলমানকে একত্রে নমাজ করিতে দেখি নাই। মসজিদের ইমাম উচ্চ বেদিকার উপরে নমাজ-নিরত, নিম্নে অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান নমাজের নিয়মানুসারে একত্রে উঠাবসা এবং প্রণাম করিতেছে। সৈনিক বিভাগের লোক যেমন বহু সহস্র বা বহু লক্ষও একত্রে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে বা কুচ কাওয়াজের নানা কৌশল দেখাইবার সময়ে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্ব্ব চেষ্টা একত্রে সম্পন্ন করিতে কোন বাধা হয় না, মনে হয় যেন কলের মানুষ কলে চলা ফেরা করিতেছে, নমাজ-নিরত নানা শ্রেণীর এই বহু সহস্র মুসলমান তদ্রূপ একত্রে প্রণাম উত্থান উপবেশন, নমস্কার প্রভৃতি নমাজের সময়ের তদঙ্গীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিল আমি নির্নিমেষ নেত্রে অবাক্ হইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। দিল্লীর জুম্মা মসজিদ জগদ্বিখ্যাত, শুনিয়াছি এই মসজিদের ন্যায় সুবৃহৎ মসজিদ পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ, ভারতে আর নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। লক্ষ্ণৌয়ের ইমাম বাড়ীর হল বৃহৎ বটে, এবং কড়ি বরগা-বিহীন সুবৃহৎ ছাদ অপূর্ব্ব কৌশলে শতবর্ষ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে; বিজাপুরের "বোল গুম্বজ" অতি বৃহৎ এবং স্থাপত্যের অপূর্ব্ব কৌশলে গুম্বজের এক-প্রান্ত হইতে অস্ফুটবাক্য অপর প্রান্তে গুরু গম্ভীর স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়; ভারতের নানা স্থানে আরও বহু ইমারত রহিয়াছে যথা আগ্রার তাজ ও ইৎমাতদ্দৌলা, দিল্লীর হুমায়ুনের গোরস্থান প্রভৃতি, যাহার গঠন সৌন্দর্য্য জগতের বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে; ফতেপুর শিকরীর দুর্গাভ্যন্তরের মক্কা মসজিদ কিংবা

আজমীরের খাজা মইনুদ্দীন চিস্তির দরগা (যাহা মুসলমান জগতে দ্বিতীয় মক্কা সরিফ বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে) সুন্দর ও সুগঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাদশাহ শাজাহান নির্ম্মিত দিল্লীর জুম্মা মসজিদ, তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ এবং অভ্রভেদী মিনারদ্বয় যেমন সুবৃহৎ, তেমনি গঠন সৌন্দর্য্যে অপরাজিত। এবং এই মসজিদ ও তাহার সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যত লোক একত্রে নমাজ করিতে পারে, শুনিয়াছি এত লোকের একত্রে নমাজের স্থান হয় এরূপ শেষ করিয়া যথসম্ভব সত্বর প্রস্তুত হইয়া লই, দিল্লী এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য দর্শনীয় পদার্থ দেখিবার জন্য বাহির হওয়া যাইবে; সমস্ত দিনে সেগুলি শেষ করিয়া, তৎপর দিবস প্রত্যূষে পৃথ্বীরাজের পুরাতন কেল্লা এবং কুতব মিনার দেখিবার জন্য যাত্রা করা যাইবে, কেননা সেগুলি দিল্লী হইতে অনেক দূরে, প্রত্যূষে যাত্রা না করিলে সেগুলি দেখিয়া সেই দিবস সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আইসা কঠিন। গাইডের কথা মত সেই ব্যবস্থাই করা হইল।



ইন্দ্রপৎ দুর্গের অভ্যন্তরভাগ (প্রাচীন চিত্র হইতে)

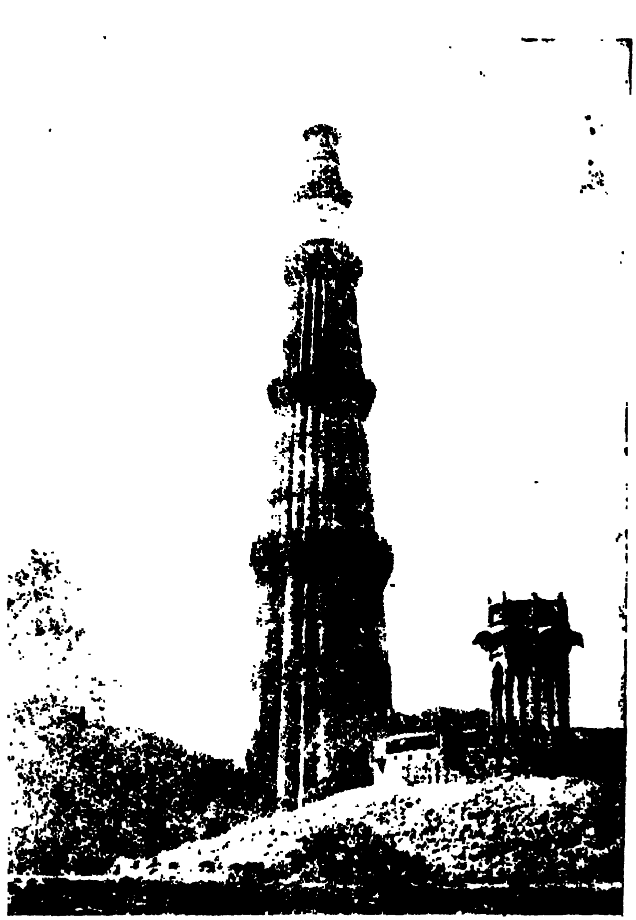
মসজিদ জগতে আর অতি অল্পই আছে, কেহ কেহ বলেন যে এরূপ দ্বিতীয় আর একটি কোথাও নাই।

নমাজ শেষ হইলে, সেই বিশাল জনসঙ্ঘ ছত্রভঙ্গ হইয়া নানাদিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, আমরাও দিল্লীর ষ্টেসন সন্নিহিত মোর সরাইয়ে গিয়া আশ্রয় লইলাম। গাইড্ বলিল, সে পর দিবস আহারাদি শেষ করিয়া বেলা নয়টা আন্দাজ সময়ে গাড়ী লইয়া হাজির হইবে, আমি যেন আহার ঈশানচন্দ্রকে তাগাদা করিয়া রাত্রের ভোজন সমাধা করিলাম। বিছানায় দেহ ঢালিয়া দেওয়া মাত্র পূর্ব্ব রাত্রের বেশ গাঢ়ীর আধ ঘুম আধ জাগা এবং সমস্ত দিনের শ্রান্তির বশে নিদ্রায় চক্ষু আপনি বুজিয়া আসিল। এক ঘুমে রাত্রি প্রভাতে কাকরবের সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শকটসহ গাইড হাজির হইল। আমার আহারাদি শেষ করিয়া বাহির হইবার জন্য

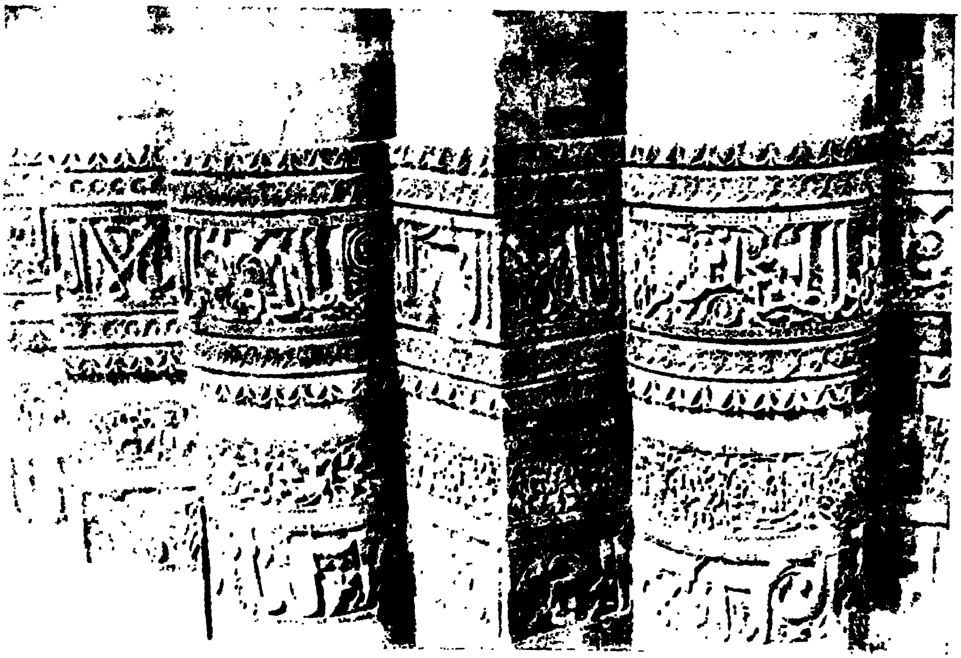
প্রস্তুত হইতে বেলা আন্দাজ দশটা বাজিয়া গেল। ক্ষীণাশ্বযোজিত শকটে আরোহণ করিয়া রওনা হইলাম। গাইডকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম হুমায়ুনের কবর পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের জীর্ণস্তূপ, টোগলকাবাদের ভগ্নাবশেষ, সফদরজঙ্গ, জাহানারা বেগমের গোর প্রভৃতি আজ শেষ করিতে হইবে। কোন্ স্থান কত দূরে, কোথায় যাইতে কত সময় লাগিবে, সে সকল বিষয়ের কোন ধারণাই আমার ছিল না, সুতরাং পথ প্রদর্শক গাইডের পরামর্শই শিরোধার্য্য করা উচিত বিবেচনায় আমি নীরবে পথ-পার্শ্বের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম

পুরাতন ইন্দ্রপ্রস্থের জীর্ণস্তূপ যে স্থানে দেখাইল ঐ স্থানেই ভারতপ্রসিদ্ধ কুরুরাজকুলের রাজধানী ছিল কি না কে জানে? সে কথার মীমাংসা প্রত্নতাত্ত্বিকের কার্য্য, আমার ন্যায় কোন প্রত্ন নহে সর্ব্বতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানহীন অপ্রাপ্ত বিংশ বর্ষ বালকের মনে ওরূপ কথা উদয়ই হয় না, হয়ত নাই; আমি কেবল স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম মহাভারত বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের কথা—ময়দানব নির্ম্মিত, বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত, অপূর্ব্ব স্থাপত্য কৌশলময় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞশালার কথা—যেখানে সমগ্র ভারতের লক্ষ নরপতি করদ হইয়া যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, যে যজ্ঞশালার অপরূপ নির্ম্মাণ কৌশলে দুর্য্যোধনের ন্যায় রাজচক্রবর্ত্তীরও দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছিল; ভাবিতেছিলাম অতুল ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অপার বীরত্বের লীলাস্থলী সর্ব্বগুণান্বিত রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং ত্রিলোকে অজেয় বীরাগ্রগণ্য দুর্দ্ধর্ষ ভীমার্জ্জুনের সর্ব্বসম্পদময়ী শ্রীসম্পন্ন রাজধানী সে দিনে কি ছিল, আর আজ কালবশে কি হইয়াছে!



কুতব মিনার

টোগলাকাবাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, সেখানেও সেই শ্মশানভস্মের স্তূপ। আমার গাইডের মনে মনে ধারণা সে মোগল পাঠানের ইতিহাসে অসাধারণ পণ্ডিত। দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণন উপলক্ষ্য করিয়া সে ইতিহাস আওড়াইতে আরম্ভ করিল এবং তাহাও আবার ইংরাজী ভাষায়। কতকগুলি বাঁধিবুলি মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তদতিরিক্ত কিছু বলিতে হইলে, কিংবা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার ইতিহাস ও ইংরাজী কিছুতেই কুলাইয়া উঠে না, মহা বিপদ উপস্থিত হয়। আমি বারম্বার বলিলাম, মোগল কিংবা পাঠানের ইতিহাস আমার কিছু কিছু জানা আছে, তাহাকে কষ্ট করিয়া আমাকে সে সকল বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? তাহার বিশ্বাস ইংরাজীতে ইতিহাস বলিলে তাহার কদর



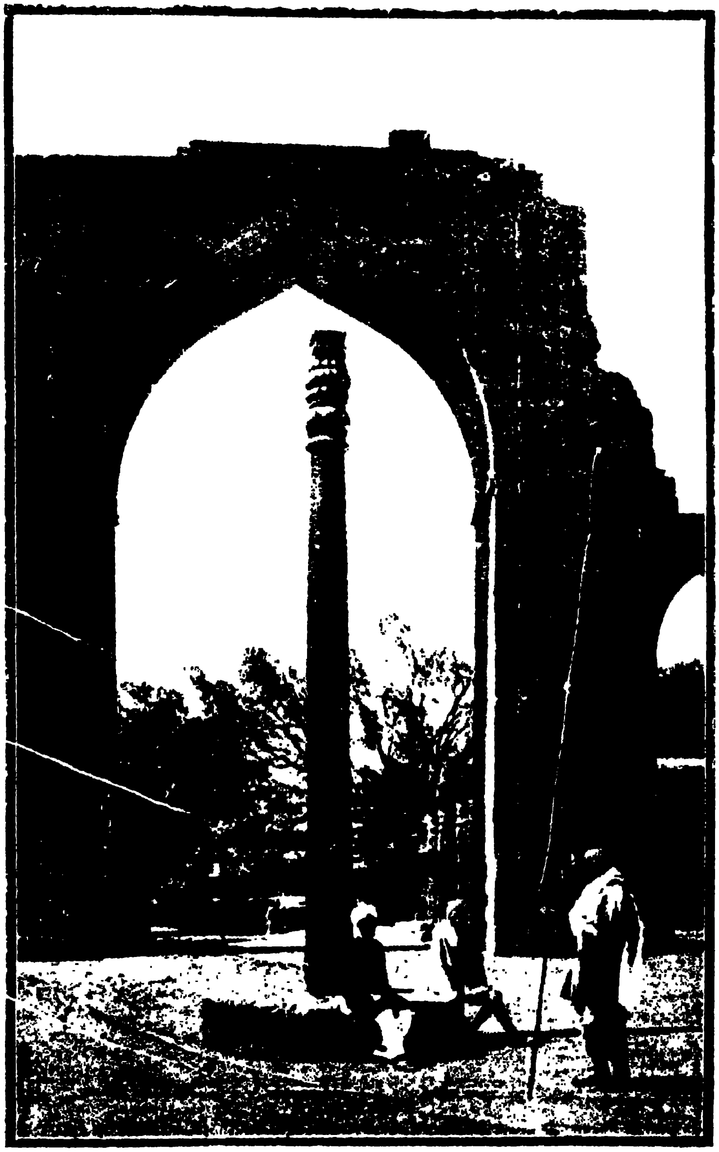
কুতবমিনারের প্রথম স্তর

বাড়িবে, এবং তাহা হইলেই তাহার বিদায়ের সময়ে প্রাপ্তি সাধারণ গাইড হইতে অধিক হইবে। তাহার ইচ্ছানুসারে যাহা খুসী বলিয়া সে ইতিহাসের "একোদ্দিষ্ট" করিতে লাগিল। আমি সেই ভগ্নস্তূপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া টোগলক্ বংশের সময়ের দিল্লীর সমৃদ্ধি এবং তৈমুরের ধ্বংস লীলার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ইতিহাসে বর্ণিত লক্ষ ভারতবাসীর তৈমুর কর্তৃক নির্ম্মম হত্যা এবং টোগলক্ বাদশাহগণের ধনধান্য পরিপূর্ণা, সুখৈশ্বর্য্যশালিনী, সুন্দরী রাজনগরীর উদ্দেশ্য-বিহীন নিষ্ঠুর ধ্বংসের কথা আমার মনে আসিয়া অন্তর মনকে নিতান্তই পীড়িত করিতে লাগিল; আমি সেখানে অধিকক্ষণ আর দাঁড়াইতে পারিলাম না।

হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরের দিকে যখন অগ্রসর হইতেছিলাম, দূর হইতে হঠাৎ দেখিয়া আমার তাজ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল—ভাবিলাম এ কি ব্যাপার, অকস্মাৎ আগ্রার তাজ মহল দিল্লীতে এক রাত্রির মধ্যে কি ইন্দ্রজাল প্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল? প্রবেশ দ্বার হইতে সমাধি মন্দির পর্য্যন্ত যে পথ চলিয়া গিয়াছে, তাহা এবং পথপার্শ্বের উদ্যান ও জলযন্ত্র, সমাধি যে উচ্চ বেদিকার উপরে স্থাপিত সেই বেদিকা এবং তাহাতে উঠিবার সোপান, সমাধির গুম্বজ এবং উভয় পার্শ্বের মিনার এই সমস্ত একসঙ্গে দর্শকের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ তাহার মনে তাজ বলিয়া প্রতীত জন্মাইয়া দেয়—তবে সে ভ্রম ক্ষণিকের মাত্র; পরক্ষণেই সে ভ্রম দূর হইয়া যায় এবং যাহার কল্পনায় এই সমাধি মন্দিরের পরিপূর্ণ ছবি প্রথমে আসিয়াছিল তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। অন্যের মতের সহিত মিলিবে কি না জানি না, তবে আমার মনে হয়, যদি ভারতবর্ষে তাজ নির্ম্মিত না হইত, তবে হুমায়ুন বাদশাহের এই সমাধি মন্দিরই তাজের স্থান অধিকার করিত; এই সমাধি এবং আগরার প্রান্তবাহিনী যমুনার পরপারস্থিত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা গীয়াসবেগের গোরের উপরিস্থ মন্দির-ভবন, গঠন-সৌন্দর্য্যে জগতের স্থাপত্য কীর্ত্তির মধ্যে

উচ্চতম স্থান অধিকার করিত সন্দেহ নাই। হুমায়ুনের এই সমাধির সহিত বহু দুঃখকাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। বাদশাহ হুমায়ুনের জীবন কুসুম শয্যায় কাটে নাই; প্রথম জীবনে পিতা বাবরের সহিত তাঁহার দক্ষিণ বাহুর স্বরূপ হইয়া বহু যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে; পরে যখন পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, সে সুখ অধিক দিন সহিল না। শেরখাঁর বাহুবলে এবং রণ-কৌশলে পরাজিত হইয়া সিংহাসন হারাইয়া প্রাণভয়ে ভারতসীমার বাহিরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়া অন্তঃসত্ত্বা আকবর জননীর সহিত দুর্লঙ্ঘ্য মরুপ্রদেশ পার হইতে হইয়াছিল তাহা তিনি এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচরেরাই জানিত। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বৈরতা সত্ত্বেও তাহারই হস্তে পত্নী এবং সদ্যোজাত পুত্রের ভার দিয়া পারস্যে পলাইয়া যাইতে হয়, এবং পারস্য সম্রাটের সাহায্য এবং সৈন্যবল না পাইলে ভারতের সিংহাসন পুনরধিকার করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। শেরখাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু রাজ্যের বিস্তৃতি এবং শৃঙ্খলা হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার অপঘাত মৃত্যু সংঘটিত হইল। "আজান"ধ্বনি শুনিয়া সত্বরতার সহিত নমাজার্থে "কেতাবগৃহ" হইতে নামিবার সময়ে পদস্খলন হয় এবং সেই সাংঘাতিক আঘাতেই কয়দিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে—মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র অপ্রাপ্তবয়ঃ বালক আকবর তখন লাহোরে। শেষ সময়ে পিতা পুত্রের সাক্ষাৎও ঘটিতে পারে নাই। এই সমাধিমন্দিরে, অস্বাভাবিক মৃত্যুতে কাল-কবলিত মোগলবংশের বহু রাজকুমারগণ সমাহিত হইয়াছেন। প্রথমে বাদশাহ হুমায়ুন। তাহার পরে তাঁহারই বৃদ্ধ প্রপৌত্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারা সেকো, কনিষ্ঠ



অশোক স্তম্ভ—দিল্লী



নিজামুদ্দিন কবরী, দিল্লী

আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর ভাবে হত হইয়া বৃদ্ধ প্রপিতামহের পার্শ্বে ঐ মন্দিরেই চিরশয়ন লাভ করিয়াছেন। সে দুর্ঘটনার ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর পরে নামসর্ব্বস্ব মোগল সম্রাট দিল্লীপতি বাহাদুর শাহের দুইটি পুত্র ইংরাজ রাজ্যের সহিত সিপাহীগণের সংঘর্ষকালে ইংরাজ সেনানী কর্ত্তৃক প্রকাশ্য রাজপথে বিপুল জনতার সমক্ষে পিস্তলের গুলিতে অপঘাত মৃত্যু লাভ করিয়া, মোগলবংশের দ্বিতীয় সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি মন্দিরেই সমাহিত হইয়াছে। ঘটনা পরম্পরা চিন্তা করিলে মনে হয়, যেন কোন্ এক একান্ত অশুভ মুহূর্ত্তে এই সমাধিভবনের প্রথম শিলাবিন্যাস হইয়াছিল এবং এই জগদ্বিখ্যাত রাজকুলের অস্বাভাবিক ভাবে কালকবলিত রাজা এবং রাজকুমারগণের শেষ শয়নের জন্যই এই সুবৃহৎ এবং সুন্দর সমাধির সৃষ্টি হইয়াছে

সফদর জঙ্গও একটি সমাধি ভবন। অসামান্ত যোগবল সম্পন্ন মুসলমান সাধুর মৃত দেহের উপর এই সুন্দর সমাধিভবন নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। ইহা আয়তনে হুমায়ুনের সমাধি, তাজ বা এৎমাদের সমকক্ষ না হইলেও, গঠন সৌন্দর্য্য ইহার সামান্ত নহে। ইহার গুম্বজের গঠন অপরাপর গুম্বজ অপেক্ষা একটু বিভিন্ন প্রকারের। এই সমাধি ভবনের সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গনে রাজকুমারী জাহানারার গোর রহিয়াছে। এই গোরের একটু বিচিত্রতা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মোগল পাঠান উভয় রাজকুলেরই রাজাধিরাজগণের এবং তাঁহাদের কোনও কুমার কুমারীর সমাধিভবন সুবৃহৎ এবং বিচিত্র কারুকার্য্যে সমন্বিত হইয়া থাকে এবং বহু অর্থব্যয়ে ইহা সমাধা হয়। রাজকুমারী জাহানারার মনের গতি অন্ত প্রকারের ছিল দেখা যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বৃদ্ধ পিতা সম্রাট্ শাহাজহান যখন আগ্রা দুর্গের অপ্রশস্ত এক কক্ষে বন্দীরূপে আবদ্ধ হইলেন, রাজকুমারী জাহানারা পিতার কারাজীবনের দুঃখের দিনে স্বীয় সেবা দ্বারা যদি কিয়ৎপরিমাণেও সে ক্লেশের লাঘব করা যায় সেই উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় স্বয়ং বন্দিনীর জীবন বরণ করিয়া লইয়া পিতার জীবন-কালের শেষতম নিমেষ পর্য্যন্ত কন্তার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। যে মনোভাবে স্বেচ্ছায় তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই মনোভাবেই তাঁহার পার্থিব দেহাবশেষের উপর অভ্রংলিহ মিনার গুম্বজ সমন্বিত কারুকার্য্যময় সমাধি মন্দির প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, উন্মুক্ত আকাশ তলে, তৃণাচ্ছাদিত ভূমি খণ্ডের উপরে যেন তাঁহার সমাধি হয়, যাহাতে মেঘের বারিধারা এবং সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ তাঁহার সামান্ত সমাধির প্রস্তর খণ্ডের উপর নিয়ত বর্ষিত হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত জাহানারার সমাধি ঐ ভাবেই রহিয়াছে, কেবল তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া একটি মর্ম্মরজালিকা—যাহাতে শৃগাল কুক্কুর সমাধি-প্রস্তরের অসম্মান না করিতে পারে। বিলাসের লীলাভূমী দিল্লী প্রাসাদে জন্ম লইয়া এইরূপ মনোবৃত্তি লাভ করা অতীব বিচিত্র। জানি না আকবরের সময় হইতে যে হিন্দুশোণিত-ধারা মোগল রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের শিরায় প্রবাহিত হইতেছে ইহা তাহারই ফল কি না।

এই গুলি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল, আমরা ফিরিয়া গিয়া সরাই খানায় আশ্রয় লইলাম। দিল্লীর এই মোর সরাই সাধারণতঃ সরাই বলিলে যাহা বুঝায় বা ধর্ম্মশালা বলিলে পশ্চিমে যে অর্থ সকলে বুঝেন, তাহা নহে। এখানে পশ্চিমের ধরমশালার মত প্রতি ঘরে ঘরে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানাবিধ আচার ব্যবহারের লোক যথেচ্ছ যাইয়া রন্ধন বা পান ভোজনের ব্যবস্থা করিতে পারে না,—এখানে একটুখানি ভদ্র ব্যবহারের ভদ্রলোকদিগেরই থাকিবার ব্যবস্থা আছে। ঘরগুলি প্রশস্ত, পাকশালা প্রাঙ্গনের অপর প্রান্তে, ভৃত্যগণের থাকিবার স্থানও পৃথক, ভদ্রগোছের হিন্দু হোটেলের মত সমস্ত ব্যবস্থা। জানিনা এখন সে মোর সরাই আছে কি না; এ যে দিনের কথা, তাহার পরে বহু বৎসর গত হইয়াছে এবং দিল্লীর বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতের রাজধানী হইবার পর দিল্লীর এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, ইহার অনেক স্থান আর চিনিবারই উপায় নাই—হয়ত যে মোর সরাইয়ে আমরা ছিলাম তাহার স্থান দিল্লীর রেল ষ্টেশনের কুক্ষিগত হইয়া তাহার উপর দিয়া লৌহবর্ত্ম ধাবিত হইয়াছে।

পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া সামান্ত কিছু আহার করিয়া লইলাম। আমার গাইড এবং গাড়োয়ান পূর্ব্ব দিবসের ব্যবস্থামত যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। মধ্যপথে ঘোড়া বদল করিতে হইবে বলিয়া আর এক জুড়ি ঘোড়া সে রাত্রিতেই যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিল; সাধারণতঃ এরূপ করে না, সে দেশের অশ্বিনীকুমারগণ তাহাদের চিরাচরিত প্রথা মত যে ধীর মন্থর গতিতে অভ্যস্ত সেই গতিতেই সমস্ত পথ শকট টানিয়া লইয়া যায় এবং

পথে কোন এক স্থানে চাপক প্রবণ্ড বৃষ্টিমেয় তৃণগুচ্ছ চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির ভান করিয়া লয়। আমার জন্য এই ভিন্ন ব্যবস্থা বোধ করি গাইডের পরামর্শ মত করিয়া থাকিবে। এই সকল গাইডগণ বহু লোকের সংশ্রবে আসিয়া থাকে, সুতরাং কে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে খুসী হইবে তাহা বুঝিয়া লইতে ইহাদের ক্ষণ-মাত্র বিলম্ব হয় না। লোকের প্রকৃতি এবং অভ্যাসাদি বুঝিয়া লইতে ইহাদের ক্ষমতা অসাধারণ, যদিও ইহারা মূর্খ।

যথাকালে যাত্রা করিলাম। বহু পথ অতিবাহিত করিতে হইবে, কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আমার সঙ্গে ছিলেন ডাক্তার বাবু, তথাপি দুই একখানি পুস্তক লইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে মারের গাইড একখানি ছিল, ইহাতে বহু আবশ্যক তথ্য পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, সিলোন এবং বর্ম্মার মোটামুটি দ্রষ্টব্য পদার্থের তালিকা এবং স্থূল স্থূল বর্ণনাও ইহাতে আছে। ঐ পুস্তক খানি ভ্রমণ কালে প্রতি বারেই আমার সঙ্গে থাকে এবং একখানি কেনের ইণ্ডিয়াও আমার ভ্রমণ সময়ের চিরসঙ্গী। পথে যাইবার সময়ে আধুনিক দিল্লী বা শাজাহানবাদ ছাড়াইলে পথের উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং দুই চারি মাইল অন্তর অন্তর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রাজ বংশের স্থাপিত পুরাতন দিল্লী নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বৈভবময়ী পুরাতন নগরীর ভগ্নাবশিষ্ট জীর্ণ প্রস্তর ও মৃত্তিকার স্তূপ দেখিলে মনে হয় যেন দিল্লী একটি মহা শ্মশান এবং এই বিরাট শ্মশান ভূমিতে বহু হিন্দু এবং মুসলমান রাজবংশের এবং তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বিপুল রাজ্য ও রাজধানীর শেষ সৎকার এখানে হইয়া গিয়াছে, ভগ্ন স্তূপ গুলি যেন নির্ব্বাপিত চিতাগ্নির শেষ ধূম মহাব্যোমে মিলাইবার অপেক্ষায় ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। মহাভারতের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান সাম্রাজ্যের দিন পর্য্যন্ত পুরাণে তিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে দিল্লী যেন একটি অভিশপ্ত নগরী। যে সম্রাটের সিংহাসনই এখানে পাতা হইয়াছে, তাহাই অচিরকাল মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ধনৈশ্বর্য্য, বলবীর্য্য সমস্তই যেন কি এক মায়ামন্ত্র বলে গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় অন্তঃসার শূন্য হইয়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে; শ্মশানান্ত সময়ের দুঃখ-স্মৃতিটুকু মাত্র ভারতবাসীর অন্তরে চির জাগরূক হইয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ ধরিয়া গাড়ী চলিল। মধ্য পথে একবার ঘোড়া বদল হইল। ঘোড়ার দানা খাইবার "তোবড়া" এবং ঘাসের আটি কোচমান তাহার পাওদানে তুলিয়া লইয়া পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আমাকে খবর দিল। আমি নিকটেই রাস্তার উপর পায়চারি করিতে ছিলাম, গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী চলিতে লাগিল। কুতবের সন্নিহিত হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ মিনার দেখা গেল; দূর হইতে তাহার উপরের দুই কি তিন তালা দেখা যায়, পাদমূল হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র মিনারটি নিকটে না গেলে দেখিতে পাওয়া যায় না। দূর হইতে মিনার চূড়া আমার দৃষ্টি পথে পড়িয়া মাত্র ক্ষণেকের মধ্যে এক বিচিত্র হর্ষ বিষাদের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। দিল্লীর শেষ হিন্দু নরপতি পৃথ্বীরাজের রাজধানী যেখানে ছিল, হিন্দুর পক্ষে সেই তীর্থ সদৃশ পুণ্য ভূমিতে যাইতেছি—বোধ করি হর্ষানুভবের ইহাই কারণ। আর বিষাদের হেতুর কি অন্ত আছে? তরায়ণের যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ, শোক, বিষাদ, পরিতাপে দগ্ধ না হয় এমন ভারতবাসী আছে বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। জয়চন্দ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অচিরকাল মধ্যে সে নিজেই করিয়া গিয়াছে এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিপুল জনসঙ্ঘ সে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

পৃথ্বীরাজের পুরাতন কেল্লার দ্বারে গিয়া আমাদের শকট দাঁড়াইল। আমরা গাইডের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সপ্তশত বৎসরের পুরাতন রাজ-প্রাসাদ সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হইয়া প্রায় সমস্তই ভূমিশায়ী হইয়াছে, বহুস্থানে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় হইতেই হিন্দুর

রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত হইয়াই পড়িয়া ছিল, তাহার পরে মোগল রাজত্বের অবসানে ইংরাজের প্রথম আমলে উভয় কালের দুর্গ, কেল্লা, প্রাসাদ, মন্দির, মিনার সমস্তই যত্নাভাবে ধ্বংসের পথে যাইতেছিল। যেগুলি নিতান্তই যাইবার নহে, যাহাদের সুদৃঢ় গঠন কালের ধ্বংসলীলাকে বহুকাল উপেক্ষা করিতে পারে, তাহারাই কোনমতে দণ্ডায়মান ছিল; ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন সেই সকল পুরাতন স্মৃতিচিহ্নের রক্ষাকল্পে বিধিবিধান এবং অর্থব্যয় না করিলে আজ পর্য্যন্ত কয়টি অবশিষ্ট থাকিত কে জানে?

পৃথ্বীর প্রাসাদের সংলগ্ন যোগমায়ার মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় থাকিলেও, তাহারও দুর্দ্দশার সীমা নাই। যদিও বৎসরান্তে শ্রাবণের অজস্র ধারাপাতের সময়ে "ফুলওয়ালোঁকি সয়ের" বলিয়া সেখানে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে, (যে মেলায় দিল্লী এবং বহু দূর হইতে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়) তথাপি মন্দির সংস্কার কল্পে কোনও চেষ্টা কখন হয় কিংবা হইয়াছে কি না তাহা আমার জানা নাই। প্রসঙ্গক্রমে কথা উপস্থিত হইল তাই বলিতেছি, এই "ফুলওয়ালোঁকি সয়ের" নামক মেলা এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। লক্ষাধিক হিন্দু ও মুসলমান এই মেলায় সমবেত হয়। যুঁই, চামেলী প্রভৃতি সদ্গন্ধযুক্ত ফুলের মালা এবং পাখা প্রস্তুত করিয়া হিন্দু যোগমায়ার মন্দিরে এবং মুসলমান কুতবের সন্নিহিত দরগায় ঐ সকল মালা ও পাখা চড়ায় এবং সমবেত হিন্দু মুসলমান প্রীতিভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, বৎসর ভরিয়া যত কিছু মনোমালিন্য বিবাদ বিসম্বাদের কারণ হইয়াছে সে সমস্তই বিস্মৃত হয়। শুনিয়াছি বাদশাহী সময় হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে এবং সেই দিনে পরস্পরের হাত হইতে পাণ সরবত তামাক লইয়া খাইতে এবং পান করিতে কেহ দ্বিধা মনে করে না—"পাণ পানিমে আয়েব নাই" এই প্রবাদবাক্যের যাথার্থ্য সেই দিনে প্রমাণিত হয়। আজ সে বিধি আছে কি না জানি না, মেলাই এখন আর প্রতি বৎসর হয় কি না তাহাও আমি অবগত নহি; কিন্তু যখন এই মেলা আমি প্রথমে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এক বন্ধুর নিকট হইতে শুনিয়া, এই মিলনমেলার প্রবর্ত্তক যাঁহারা, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া পারি নাই।

কালের আঘাতে আজও ধ্বংসপুরে প্রয়াণের জন্য অগ্রসর হয় নাই কেবল সেই অভ্রভেদী কুতব মিনার। কেহ কেহ বলেন, মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি কুতব উদ্দীন ভারতবিজয় ব্যাপারকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই গগনভেদী মিনার জয়স্তম্ভ রূপে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; এবং পৃথ্বীরাজের রাজপ্রাসাদ ও দেবমন্দিরগুলিতে যে সকল কারুকার্য্যসমন্বিত প্রস্তর ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া এই জয়স্তম্ভের গঠনকার্য্যে লাগান হইয়াছিল। আবার কাহারও কাহারও মতে পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তা দেবীর নিত্য প্রাতে যমুনা দর্শনের জন্য ত্রিতল স্তম্ভ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কুতবুদ্দীন তাহার উপরে আরও দুইটি তালা নির্ম্মাণ করিয়া কুতব মিনার নাম দিয়া ভারতবিজয়ের স্মৃতিরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালার প্রস্তরগুলি একবর্ণের, চতুর্থ ও পঞ্চম তালা অন্য রঙের পাথরে গড়া। জানি না সেই জন্যই ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের প্রস্তুত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে কি না। সে সকল কথার মীমাংসা করা ঐতিহাসিকের কার্য্য; তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকারের স্থাপত্য কলার দিক দিয়া বিচার গবেষণা করিয়া হয়ত ইহার কাল এবং নির্ম্মাতার নাম ধাম সমস্তই বাহির করিবেন বা করিয়াছেন; সে চেষ্টা করিবার মত ইতিহাসে বা প্রত্নতত্ত্বে আমার অধিকার নাই। অন্যান্য মিনারের ন্যায় ইহারও মূলদেশ স্থূল এবং ক্রমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর হইয়া ইহার শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহার সর্ব্বাবয়বের ক্রমানুপাত বড়ই সুন্দর এবং অঙ্গসৌষ্ঠবে ইহা ভারতের কোন মিনার অপেক্ষায় তুলনায় হীন হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে যে চারিটি মিনার রহিয়াছে, শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত সেই মিনার চারিটি গঠন-সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় সন্দেহ নাই, এবং স্তম্ভের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য করিয়াই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু শ্বেত মর্ম্মর উহার শোভা অধিকতর

বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কুতব মিনার মর্ম্মরে নির্ম্মিত না হইয়াও, ইহার অবয়বের সমানুপাত-সৌষ্ঠবে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। জুম্মা মসজিদের মিনার, ইতমাতদ্দৌলার মিনার, কিংবা হায়দরাবাদের "চারমিনার" যেহই কুতবকে গঠন সৌন্দর্য্যে পরাজিত করিতে পারিবে না; এত বৃহৎ অথচ এত সুন্দর দ্বিতীয় আর কিছু আছে কি না জানি না।

আমার সঙ্গের একজন গাইড এবং সেই স্থানের আর দুই একজন মুসলমান আমাকে বারবার মিনারের শীর্ষদেশে চড়িবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এলাহাবাদের মেও হলের উপরে চড়িয়া নামিবার সময়ে আমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল সে কথা মনে পড়িল, আমি উহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ইহার পাদমূলে বসিয়া রহিলাম। আমাদের ডাক্তারবাবু উপরে চড়িতে লাগিলেন। এখন ভুলিয়া গিয়াছি কয় শত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চড়িতে হয়। সোপান শ্রেণীও ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ ডাক্তার বাবুর আরোহণ এবং অবরোহণে বহু সময় লাগিল এবং তিনি যখন নীচে নামিয়া আসিলেন, দেখিলাম সেই দানবতুল্য বলশালী ডাক্তারবাবুও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছেন। ইহার অনেক দিন পরে, আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে দিল্লী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন; আগ্রার তাজের মিনারের উপর অনায়াসে চড়িয়া গেলেন, শ্রান্তি ভীতি কিছুই বোধ করেন নাই; আমি স্বীকার করিতেছি যে, নিজের অক্ষমতায় লজ্জা বোধ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই মিনারে চড়িলাম না। মনে ভাবিয়াছিলাম দিল্লীর কুতবে চড়িবার শক্তি তাঁহার হইবে না, কিন্তু সে আমার নিতান্তই ভ্রম। অনায়াসে উদ্বেগহীন চিত্তে তিনি সেই অভ্রভেদী স্তম্ভের মূর্দ্ধাতে কেবল বাম চরণ নহে, তাঁহার শ্রীচরণদ্বয় স্থাপন করিয়া, পরী বা অপ্সরলোকের কাছাকাছি গিয়া পঁহুছিলেন এবং উর্দ্ধলোক হইতে এই ধূলিমলিন ধরাপৃষ্ঠে শুষ্কভাবে উপবিষ্ট তাঁহার এই নর স্বামীটিকে কত ক্ষুদ্র এবং নিজেকে কত উচ্চ বোধ করিতেছিলেন সে কথা জিজ্ঞাসা করায় আজ পর্য্যন্ত কোন সদুত্তর পাই নাই। তিনি যে স্থানেই গিয়া ছন, শুম্বজ মিনার স্তম্ভ কিছুই বাদ দেন নাই। উচ্চে উঠিবার সুযোগ পাইলেই সেখানে আরোহণ অনিবার্য্য, নিষেধ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। বোধ করি আমাদের এই ডানাকাটা মর্ত্ত্য পরীর দল তাঁহাদের ডানা থাকা সময়ের অভ্যস্ত আকাশ বিহার আজও ভাল করিয়া ভুলিতে পারেন নাই, তাই সুযোগ পাইলেই তাহার সদ্ব্যবহার হইয়া থাকেন। আমার আত্মীয়াদের অনেকে কলিকাতার মনুমেণ্টে আরোহণ করিবার আরজি আমার নিকট পেশ করিয়াছেন, আমি রাজি হই নাই বলিয়া আমার প্রতি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত অসন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু কি করিব, ঘুরণা সিঁড়ির ভয় আমার জীবনেও গেল না। আমি ত ঘূর্ণা সিঁড়ির কাছেও যাই না, অপরকে চড়িতে দেখিলেও আমার হৃৎকম্প ও সর্ব্বাঙ্গের শিহরণ চেষ্টা করিয়াও নিবারণ করিতে পারি না। স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ নিজের স্ত্রী যাহা পারে, তাহা পারি না, ইহা স্বীকার করা নিদারুণ লজ্জার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু "সত্যং ব্রূয়াৎ" ইহাও যে শাস্ত্রেরই কথা।

কুতব মিনারের সন্নিকটে অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের দুর্গের ভগ্ন বশেষের নিকটে একটী লৌহস্তম্ভ আছে যাহা যথার্থই বিস্ময়জনক পদার্থ। আজ কতকাল ধরিয়া অনাবৃত স্থানে মেঘ ও রৌদ্রের সমস্ত উৎপাত শিরে বহন করিতেছে, তথাপি লৌহের চাকচিক্য ও মসৃণতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ইহা যে সময়ের স্তম্ভ, সে কালে কোন পদার্থই কলে প্রস্তুত হইত না; এত বৃহৎ লৌহ স্তম্ভ যাহার আপাদ মস্তকে কোথাও কোন জোড়া নাই, তাহার উপযুক্ত "হাফর, নেহাই, হাতুড়ি" ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পদার্থই বা কত বড় ছিল এবং ঐরূপ বৃহৎ যন্ত্রাদির সাহায্যে এই বৃহৎ স্তম্ভ প্রস্তুত হইল কিরূপে ইহা বুঝিয়া উঠা একালের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষেও নাকি শুনিয়াছি কঠিন ব্যাপার। এই লৌহ স্তম্ভ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা অশোক স্তম্ভ; মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সময়ে

সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ নাকি কল্পনা করিতেন যে, পৃথ্বীরাজ প্রথম বারে ঘোরীকে পরাজিত করিয়া পরে বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ এই স্তম্ভ প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার রাজধানীতে প্রোথিত করাইয়াছিলেন। আবার শুনিয়াছি, কেহ কেহ বলেন যে, অপর কোন ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার রাজ্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য, বৈদিক কাল প্রসিদ্ধ এক মহাযজ্ঞ করিয়া এই স্তম্ভ তিনি স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সামন্ত রাজগণের সাহায্যে বাসুকীর ফণার উপরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সেই ফণিরাজের ফণা কোথায় তাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বেত্তা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা গণনায় স্থির করান হইয়াছিল। এইরূপ রহস্যকর কল্পনা গল্প করিবার সামগ্রী, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য ইহার মধ্যে কতখানি আছে তাহা ইতিহাস-বেত্তা যাঁহারা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

আবার শুনিয়াছি যে এই স্তম্ভের গাত্রে খোদিত লিপিতে যাহা লিখিত আছে, তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া নাকি জানা গিয়াছে যে, গাহড়বাল কিংবা অপর কোন রাজবংশের রাজগণের মধ্যে চন্দ্র নামক এক রাজার সময়ে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। যদি স্তম্ভগাত্রের লিপি পাঠে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তবে সম্ভবতঃ উহাই সত্য, কিন্তু এক রাজার সময়ে নির্ম্মিত স্তম্ভের গাত্রে অপর রাজকর্ত্তৃক লিপিও খোদিত হইতে পারে —যেমন্ এলাহাবাদের অশোক স্তম্ভে অশোকের অনুশাসন এবং গুপ্ত সম্রাটের অশ্বমেধ ব্যাপারের কথা উভয়ই খোদিত রহিয়াছে। তবে দিল্লীর লৌহস্তম্ভে একাধিক লিপি খোদিত আছে কিনা জানি না। যাহাই হউক, ইহা কোন্ সময়ে কোন্ রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকের কার্য্য, উহা আমার ন্যায় সাধারণ লোকের কর্ত্তব্য-সীমার বাহিরে এবং সাধ্যের অতীত। এই বিস্ময়কর বৃহৎ স্তম্ভ, ইহার উৎকৃষ্ট লৌহ ও সুদৃঢ় গঠন দেখিয়া নিশ্চিত ধারণা হয় যে, বহু পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হইত এবং এমন সকল অদ্ভুত বিস্ময়কর সামগ্রী এই ভারতে জন্মলাভ করিয়াছে যাহার নষ্টাবশেষ দুই একটি পদার্থ দেখিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার জন্ম নিকেতন ইউরোপ বা মার্কিণের বড় বড় বিদ্বান ইঞ্জিনিয়ারগণও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে, সে কালের বর্ব্বর ভারতবাসী এরূপ সভ্যজনোচিত অত্যাশ্চর্য্য, বিস্ময়কর শিল্প সামগ্রীর জন্মদান করিয়াছিল কেমন করিয়া। তাঞ্জোরের সুবৃহৎ এবং বিশাল উচ্চ মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি বৃহৎ প্রস্তর গোলক সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অত বড় মন্দিরের উচ্চ শীর্ষে তাদৃশ বৃহৎ গোলাকার পাথর কেমন করিয়া তুলিয়া দিয়াছে ইহা বর্ত্তমান কালের ইঞ্জিনিয়ারদিগের জ্ঞানের বাহিরে, কারণ তাঁহারা মনে করেন, সে কালের সভ্যতাহীন ভারতবাসীর, গুরু ভার ঊর্দ্ধে উঠাইবার জন্য ক্রেণের মত কোন কৌশল থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাই এই বিস্ময়। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে জাতির মস্তকে বেদ বেদান্তদর্শন, উপনিষৎ তন্ত্র মন্ত্র চিকিৎসা, চতুঃষষ্ঠী প্রকার কলাবিদ্যা ও পুরী প্রাচীর, নগর, বন্দর, মন্দির, মসজিদ নির্ম্মাণের কৌশল প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ স্থান পাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে গুরুভার উত্তোলনের ক্রেণবৎ কোন কৌশল বা বৃহৎ লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণ কিছু কঠিন কথা নহে।

পৃথ্বীরাজের পুরাতন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ জীর্ণ পাষাণের স্তূপ, কুতব মিনার প্রভৃতি দেখা এক দিনে শেষ করিতে পারি নাই। সেখানে একটি ডাকবাঙ্গলা ছিল,—এখন একাধিক হইয়াছে—আমি সেই ডাক বাঙ্গলায় রাত্রি যাপন করিলাম। রাত্রের আহারাদির ব্যবস্থা সেইখানেই একরূপ করিয়া লইলাম। ডাক বাঙ্গলায় খাটিয়া ছিল কিন্তু বিছানার অভাব, সঙ্গে গাড়ীতে দুই এক খানি রাগ্ যাহা ছিল তাহা দ্বারাই কায চালাইয়া লওয়া গেল; কারণ সে বয়সে শীতে অধিক কাতর করিতে

পারিত না এবং নিদ্রা দেবীর অনুকম্পাও যথেষ্টই ছিল।

পর দিবস আর একবার চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া লইয়া সেই পাষাণের শ্মশান হইতে বিদায় লইলাম। পথে এক স্থানে কূপে ঝম্প প্রদান দেখিলাম। সে ব্যাপার আমার নিকট বড়ই ভীতিপ্রদ এবং বিপজ্জনক বোধ হইল। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর, মধ্যস্থলে সুগভীর কূপ, উচ্চ প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া সুগভীর কূপের মধ্যে ঝম্প প্রদান করিতেছে এবং পুনরায় প্রাচীরে আরোহণ করতঃ দ্বিতীয় লম্ফের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। দৈবাৎ যদি কূপের পাষাণ বেষ্টনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অংশ আহত হয়, তবে মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু সামান্য অর্থলাভের আশায় এই কার্য্য করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। দশ বার বৎসরের বালক হইতে আরম্ভ করিয়া, পরিণত বয়স্ক প্রৌঢ় পর্য্যন্ত এই কূপে ঝম্প প্রদান করিয়া দর্শকগণের নিকট হইতে অর্থলাভ করিতেছে। সে অর্থ অধিক নহে, দুই চারি আনা পাইলেই এই প্রাণ সংশয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ নাই।

ফতেপুর পথ ব্যতীত আরও দুই এক স্থানে এই লম্ফ ব্যাপার দেখিয়াছি—ফতেপুর সিকরীর "বুলন্দ দরওয়াজার" নিকটে এই রূপ একটি বৃহৎ "বাউলী" আছে, তাহার মধ্যেও সেই স্থানের মুসলমান বালক যুবক এবং প্রৌঢ়গণ ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই ব্যাপার বিপদ-সঙ্কুল বিবেচনায় পুলিশ হইতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল শুনিয়াছি, কিন্তু দর্শক কেহ উপস্থিত হইলে গোপনে নিষেধ অবহেলা করিয়া ইহারা ঝম্পের জন্য প্রস্তুত হয়। দর্শকেরাও কৌতূহল বশতঃ, কিংবা নিষেধাজ্ঞার বিষয় না জানিয়া এই অদ্ভুত এবং অকরণীয় লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া থাকেন। আমার স্ত্রী যখন দিল্লী, আগরা প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে এই অসম-সাহসিক মুসলমানগণ কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রাচীরের উচ্চতা এবং গভীর কূপের অবস্থা দেখিয়া ঐ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখেন নাই; এবং সকল লোকদিগকে বিনা ঝম্পেই তাহাদের আশাতিরিক্ত অর্থ দান করিয়া বহু আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোনও স্ত্রীলোকের পক্ষে ঐ ভীষণ ব্যাপার দাঁড়াইয়া দেখা এবং তাহাতে আমোদ বোধ করা, আমার মনে হয় কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। কোনও দেশের কোনও নারীর পক্ষে এই একান্ত অকরণীয় দুঃসাহসিক কার্য্য নির্ভীক ভাবে দাঁড়াইয়া দেখা কল্পনার অতীত। এই বর্ব্বরোচিত দুঃসাহসের কার্য্য নাকি বাদশাহী আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যাহারা কার্য্য করে, তাহারা নাকি, যাহারা পূর্ব্বে করিত তাহাদের বংশধর, অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে ইহারা এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। বাল্যকাল হইতেই নাকি ইহারা এই বিষয়ের শিক্ষালাভ করে—বিচিত্র নহে! অতি প্রাচীন কালের গ্ল্যাডিয়েটার দিগের হিংস্র পশুর সহিত যুদ্ধ ব্যাপার ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি এবং ইতিহাসেই লিখিত রহিয়াছে যে, সহস্র সহস্র নরনারী এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিবার জন্য বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিত। হিংস্র পশুর আঘাতে মল্লের মৃত্যু চক্ষুর উপরে ঘটিতে দেখিয়াও পুরুষ স্ত্রীলোক কেহই এই লোমহর্ষণ কৌতুকক্রীড়া দেখিবার ইচ্ছা নিবারণ করিতে পারিত না।

স্পেন দেশে "বুল ফাইট" নাকি আজিও হয় এবং দেশ দেশান্তর হইতে নর নারী এই নির্ম্মম বুল ফাইট দেখিবার জন্য স্পেনে একত্রিত হইয়া থাকে। বাদশাহী আমলে দিল্লী আগ্রায় হস্তিযুদ্ধ—যাহাতে মাহুতের মৃত্যু হইবার আশঙ্কা পদে পদে ছিল—শাহানশাহগণের নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত বলিয়া ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে। এই সকল ব্যাপার যখন ঘটিতে পারিয়াছে তখন কূপে ঝম্প প্রদান ত সামান্য কথা। মানুষ সভ্যতার পথে যতই কেন অগ্রসর না হউক, বাহিরে মানুষ যতই কেন দেবভাবাপন্ন দেখাইতে চেষ্টা না করুক, অন্তরের কোনও এক নিভৃত প্রদেশে পশুভাব কেন যে লুকাইত থাকে, তাহা যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন,

সেই সর্ব্বশক্তিমানই জানেন। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রে পশু যদি বিচরণ না করিত, তাহা হইলে যুগে যুগে কুরুক্ষেত্রের অভিনয় হইত না এবং এই শ্যামা ধরণীর বুকের উপর দিয়া শোণিত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ খেলিত না।

কুতবের চতুর্দ্দিক দুই দিবস ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটু শ্রান্তি বোধ করিতেছিলাম, সেই জন্য আর এক দিবস দিল্লীতে বিশ্রামার্থ রহিয়া গেলাম। দিল্লীর প্রসিদ্ধ "চাঁদনি চক্" দিবসে, সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, বহু খ্যাতি সম্পন্ন "হাম্মাম্" এ স্নান করিতে গিয়া নাপিতের পদাঘাত সর্ব্বাঙ্গে লাভ করতঃ কৃতার্থ হইলাম, এবং চাঁদনি চকের প্রসিদ্ধ হাতিদন্তের কিছু কিছু জিনিষ এবং দিল্লীর এমব্রয়ডারি (Embroidery) কিছু ক্রয় করিতে অর্থ ব্যাপারে একরূপ রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলাম। বাড়ী হইতে তারযোগে পুনরায় টাকা আনাইতে আরও দুই দিবস বিলম্ব ঘটিয়া গেল। তাহার পরে, দিল্লীর লাড্ডু খাইতে না পাইয়া "পস্তাইতে পস্তাইতে" দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

কুট্টালম্

কুট্টালম্ তিনেভেলী জিলার পশ্চিম-প্রান্তে, তেন্-কাশী তালুকের অন্তর্গত একটি শৈল-বেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহা একটি তীর্থস্থান; কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর জন্যই স্থানটি দ্রাবিড়-দেশে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

তিনেভেলী হইতে ট্রেণ ধরিয়া আমরা তেন্কাশী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। মান্দ্রাজ হইতে এই ষ্টেশনের দূরত্ব ৪৮৭ মাইল। তেন্কাশী চিত্রা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে তহশীলদার ও সাব ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী, সাবরেজিষ্টারী আফিস, ডাক্তারখানা ইত্যাদি আছে। কিন্তু একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের জন্যই তেন্কাশী বিখ্যাত। এই মন্দির হইতেই স্থানের নাম হইয়াছে "তেন্ কাশী" অর্থাৎ "দক্ষিণ কাশী।" মন্দিরের একটি স্তম্ভে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহার মর্ম্ম এইরূপ:—পাণ্ড্য বংশে অরিকেশরী-পরাক্রম নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। কাশীধামে ৺বিশ্বনাথের মন্দির সংস্কারাভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছিল, সেই জন্য স্বয়ং বিশ্বনাথ স্বপ্নে রাজা অরিকেশরীকে আদেশ করেন যে, দক্ষিণ দেশে তাঁহার জন্য নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করা হউক। সেই স্বপ্নাদেশের ফল—তেন্-কাশীর মন্দির। ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরে শিবপ্রতিষ্ঠা হয়। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় এবং রাজা অরিকেশরীও ঐ বৎসর পরলোক গমন করেন।—মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ পাণ্ড্য রাজগণের অনেকগুলি অনুশাসন আছে।

৺কাশীধামের তুল্য মাহাত্ম্যলাভ করিতে না পারিলেও, তেন্-কাশী এক সময়ে তীর্থ বলিয়া গণ্য হইত। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' লিখিত আছে, মহাপ্রভু পাণ্ড্য দেশে তীর্থভ্রমণ করিবার সময়

"তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন।"

দ্রাবিড় দেশে, 'শিবকাঞ্চী' ও 'বিষ্ণু কাঞ্চী' আছে, কিন্তু "তিল-কাঞ্চী" নামক কোন তীর্থ নাই। সম্ভবতঃ

লিপিকর প্রমাদে 'তেন্‌কাশী' 'তিলকাঞ্চী' মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

শিবমন্দিরের 'গোপুরম্' (তোরণ) নির্ম্মাণ করিতে দশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই অত্যুচ্চ গোপুরমের ঊর্দ্ধাংশ অগ্নি-সংযোগে বিনষ্ট হইয়াছে। উহা এখন ধ্বংসোন্মুখ। সেই জন্য বাহির হইতে মন্দিরটিকে পরিত্যক্ত 'ভাঙা দেউল' বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের বহিঃস্থ মণ্ডপের উভয় পার্শ্বের প্রত্যেকটি স্তম্ভ এক একটি মূর্ত্তির আকারে খোদিত। নৃত্যরত মহাদেব, মহাদেবী, মদন ও রতি প্রভৃতির বৃহৎ মূর্ত্তি এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত খুদিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মদনের হাতে পুষ্পধনুর পরিবর্ত্তে সরস ইক্ষু দণ্ডের ধনু দেখা গেল। [ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ এই তত্ত্ব সূচিত হইতেছে যে হৃদয় জয়ের পক্ষে মিষ্ট রস একান্ত আবশ্যক!] এই মন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তি সমূহের অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

মূল মন্দিরের পার্শ্বে 'বসন্ত-মন্দির' অর্থাৎ "বাগান বাড়ী।"—মহাদেব বসন্ত-যাপন করিবার জন্য এই মন্দিরে আসিয়া থাকেন। তাহার পার্শ্বে দেবী মন্দির। দেবীর নাম বিশালাক্ষী। রামেশ্বরের মন্দিরেও বিশ্বনাথের পার্শ্বে বিশালাক্ষী অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছি।

তেন্‌কাশীর ৩॥০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার একটি শাখার পাদমূলে কুট্টালম্। তেন্‌কাশী হইতে কুট্টালম্ পর্য্যন্ত তরুচ্ছায়ামণ্ডিত সুন্দর রাজ-পথ। কুট্টালম্ একটি উপত্যকা—সমুদ্র সমতল হইতে ৫৫৯ ফুট উচ্চ। এই স্থানে চিত্রা নদীর জল-প্রপাতের দৃশ্য অতি রমণীয়। জল-প্রপাতের পার্শ্বেই শিব-মন্দির। স্থানীয় কিম্বদন্তী অনুসারে, এই পর্ব্বতের নাম ত্রিকূটাচলম্ এবং শিবের নাম ত্রিকূটাচলপতি। ত্রিকূটাচলম্—"তিরুকুট্টালম্" এবং পরে "কুট্টালম্" (ইংরাজীতে Courtallam) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি যে দিন কুট্টালমে পৌঁছিলাম, সে দিন সেখানে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। যাত্রিগণের বাসের জন্য মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ সারি সারি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, কয়েকটি হোটেল এবং সত্রও আছে। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া ভিন্ন স্থানবাসী কয়েক জন ধনী ব্যক্তি এখানে বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুর মহারাজেরও এখানে একটি বাড়ী আছে। মন্দিরের অদূরে একজন জমিদারের একটি বৃহৎ অট্টালিকা খালি পড়িয়া ছিল; আমি সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই প্রাসাদের দ্বিতলের বারান্দায় বসিলে, সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বত-শিখরে শুভ্র-মেঘের সঞ্চরণ এবং নিম্নদেশে চিত্রা নদীর প্রপাতের বিচিত্র দৃশ্য পরিষ্কার রূপে দেখা যায় এবং জলের ঝর্ঝর তান অবিরাম কাণে আসিতে থাকে।

কুট্টালম্ জলপ্রপাতের বিশেষত্ব এই যে, এখানে শৈল-মূলে বসিয়া ঝরণার জলে স্নান করিবার সুবিধা আছে। এইরূপ স্নানে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যুরোপীয়গণ এই ঝরণার জলে স্নানের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য মাঝে মাঝে কুট্টালমে আসিতে আরম্ভ করেন। জুন হইতে অক্টোবর মাস এখানে বাস করিয়া স্নান করিবার উপযুক্ত সময়। এখনও ত্রিবাঙ্কুর ও তিনেভেলী হইতে অনেক যুরোপীয় নরনারী প্রতিবৎসর এই স্বাস্থ্যনিবাসে আসিয়া থাকেন। যুরোপীয়গণের স্নানের স্বতন্ত্র সময় নির্দ্দিষ্ট আছে।

পরদিন প্রাতে আমরা প্রথমেই প্রপাতের জলে স্নান করিতে গেলাম। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে জলধারা শিলায় শিলায় প্রতিহত হইয়া, পর্ব্বতমূলের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে সম্মুখে প্রসারিত একখণ্ড প্রশস্ত শিলার উপর আছাড়িয়া পড়িতেছে—এবং উৎক্ষিপ্ত শীকরকণা ছত্রাকারে সম্মুখস্থ জলকুণ্ডে আসিয়া মিশিতেছে। ঐ শিলাখণ্ডের ঠিক নিম্নেই স্নান করিবার স্থান। একটি সেতু অতিক্রম করিয়া ঐস্থানে পৌঁছিতে হয়। জল প্রপাতের বেগ স্নানার্থীকে সহ্য করিতে হয় না—প্রকৃতি-রচিত "shower bath"এর জলধারায় স্নান করা

যায়। স্নানের স্থান লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা—উহার একদিকে স্ত্রীলোকদিগের জন্য। নিকটেই বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য একটি গৃহ আছে। পর্ব্বতের গাত্রে অসংখ্য শিবলিঙ্গ খোদিত। শীকর ধারায় স্নান করিয়া শরীর যেমন স্নিগ্ধ, মনও তেমনি প্রফুল্ল হইল। জলধারা নিম্নে একটি অগভীর কুণ্ডে পড়িয়া সেইখান হইতে স্রোতস্বিনী আকারে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানেই চিত্রানদীর যাত্রা আরম্ভ। স্নানকুণ্ডের উত্তর ধারে "তীর্থ-বারি মণ্ডপ"—পর্ব্বোপলক্ষে তীর্থজলে স্নান করিবার জন্য দেবতা এই গৃহে আনীত হন। কুট্টালমের শিবমন্দির হেন্ কাশীর মন্দিরের ন্যায় বড় নহে। মন্দির পূর্ব্বদ্বারী, সম্মুখে প্রশস্ত মণ্ডপ—উহার মধ্য স্থলে ধ্বজস্তম্ভ এই মণ্ডপ গৃহ মন্দিরের ন্যায় প্রাচীন নহে—অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। যে জমিদার এই মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মণ্ডপের একধারে তাঁহার বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। কিম্বদন্তী অনুসারে, পুরাকালে এখানে একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল; অগস্ত্য মুনির তপোবনে বিষ্ণুমূর্ত্তি শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এই মন্দিরের প্রাচীরে পঞ্চদশ শতাব্দীর পাণ্ড্যরাজগণের অনুশাসনে উৎকীর্ণ আছে।

শিবমন্দিরের পার্শ্বেই দেবীমন্দির। পুরোহিত বলিলেন, দেবতার নাম কুট্টলনাথ স্বামী এবং দেবীর নাম "বেণু-বাক্-বাচিনী।" দেবী মন্দিরের সম্মুখস্থ



কুট্টালম জলপ্রপাত

কুদ্র-মণ্ডপে কয়েকটি প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। একদিকে মদন, অন্যদিকে রতি। অন্য দুইটি মূর্ত্তি চিনিতে পারা গেল না। মন্দিরের অঙ্গনে, ছোট ছোট কক্ষে বহু শিবলিঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে।

দক্ষিণদেশে, প্রায় প্রত্যেক দেবমন্দিরের সান্নিধ্যে একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়—উহার নাম "তেপাকুলম" অর্থাৎ "ভেলা সরোবর।" পর্ব্বোপলক্ষে দেবতাকে এই সরোবরে আনয়ন করিয়া সুসজ্জিত ভেলার উপর স্থাপন করা হয়। কুট্টালম্ মন্দিরের নিকটেও একটি 'তেপাকুলম্' আছে—উহার মধ্যস্থলে

উচ্চ গোপুরম্। এই শ্রাবণ মাসে পুষ্করিণী প্রায় জল-শূন্য। পৌষ মাঘ মাসে এদিকে বর্ষাকাল—তখন এই পুষ্করিণী জলে পরিপূর্ণ হয় এবং কুটলনাথের 'ভেলা উৎসব' হইয়া থাকে।

সরোবরের পূর্ব্ব তীরে 'চিত্র-সভা' নামক একটি প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ। এই গৃহের সমস্ত প্রাচীর দেব-দেবীর চিত্রে মণ্ডিত। এখানেও মদন ও রতির চিত্র দেখিলাম—মদনের বাহন শুক পক্ষী এবং রতির বাহন হংস। লঙ্কাধিপতি রাবণ বীণাবাদক রূপে চিত্রিত। এদেশে প্রবাদ, রাবণ বীণা সংযোগে সামবেদ গান করিতেন।

অপরাহ্নে, ভ্রমণ করিবার জন্য পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিতে লাগিলাম। কুটালম্ প্রপাতের নিকটে পাহাড়ের নিম্নদেশে "ফরেষ্ট আফিস।" অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ কুটালম্ আসিয়া এই অফিসেই বাস করিয়া থাকেন। জলপ্রপাতের ঊর্দ্ধে একস্থানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নির্ঝরের চঞ্চল নৃত্যলীলা দেখিলাম।—

"নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাস ভরে
বন্ধুর শিলা সরণে।
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ হৃদয় হরণে।
কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু সুর
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদা শিঞ্জিত মাণিক নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে।"

দেড় মাইল পথ হাটিয়া আমরা চিত্রানদীর আর একটি জলপ্রপাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম "শেম্বকা (চম্পকা ?) দেবী"—প্রপাত। জল প্রপাতের এক পাশে, ক্ষুদ্র প্রস্তর মন্দির। মন্দিরের দ্বার বন্ধ, শুনিলাম বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষ্যে উহা খোলা হয়, এবং সেই সময় দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করা যাইতে পারে। মন্দিরের নিকটে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন—এই স্থানেই তাঁহার আশ্রম। ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ঝরণার জল উপর হইতে পাথরের উপর পড়িয়া চঞ্চল বেগে নীচের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ যেন "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ"—এখনও সে চিত্রানদীর মূর্ত্তি ধারণ করে নাই, কিন্তু তাহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে—

আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।

এই স্থান হইতে, দূরে নিম্ন ভূমিতে তেন্‌কাশীর মন্দিরের উচ্চ গোপুরম দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম, আরও দুই মাইল পথ ঊর্দ্ধে আর একটি জল-প্রপাত আছে—উহার নাম "তেন্‌-আরিভি" অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের জল-প্রপাত। কিন্তু ততদূর উঠিতে আমার উৎসাহ ছিল না। সুতরাং "শেম্বকা-দেবী" প্রপাত দেখিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রাচ্য নৃত্য

(১৮৫৩ খ্রীঃ প্রকাশিত Read's Characteristic Dances all Nations হইতে)



হিন্দুস্থানী শালনৃত্য



তুর্কী সারাবান্দ নৃত্য

শিকার ও শিকারী

হাওদা শিকার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাঘ অত্যন্ত সতর্ক জন্তু। কিন্তু একস্থানে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। কোন কোন সময় গুরু ভোজনের পর, ইহাদের নিদ্রা এত গভীর হয় যে, সহজে জাগ্রত হয় না।

একবার আমাদের দেশে ভবানীপুর নামক স্থানে ক্যাম্প্ করিয়া আমি ও রাজা জগৎকিশোর * শিকার করিতে যাই। ঐ স্থানের জঙ্গলে অনেক কাঁটা বাঁশ ও গারো বাদা থাকায়, হাতীদ্বারা শিকার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। [আমাদের দেশে জঙ্গলে গারোরা আসিয়া স্থানে স্থানে 'জুম' করে। ইহাদিগকে নামদানী গারো বলে। পাহাড়ের নিম্নভূমিতে বসতি করে বলিয়া ইহাদের ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছে। ইহারা ৩.৪ বৎসরের অধিক একস্থানে থাকে না। তাহারা চলিয়া গেলেই ঐসব স্থানে ভয়ানক কাঁটা জঙ্গল জন্মে; উহাকেই "গারো বাদা" বলে।] গারো বাদাতে হাতী প্রবেশ করা অসম্ভব। আমরা ২।৩ শত প্রজা সংগ্রহ করিয়া, হাতীর সঙ্গে একত্রে জঙ্গল ভাঙ্গাইতাম, কয়েক দিনের উপর্য্যুপরি চেষ্টাতেও কোন ফল পাই নাই। কিন্তু এমন রাত্রি ছিল না যে বাঘের ডাক শোনা না গিয়াছে, অথবা মরি (kill) না করিয়াছে। আমরা যখন কয়েক দিনের ক্রমাগত চেষ্টাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব মনে করিতেছিলাম, এমন সময় একদিন এক ফকির আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া বাঘ দেখাইবে বলিল। অন্ধ বিশ্বাসী প্রজাদের অনুরোধে একদিন সেই ফকিরকে লইয়া শিকারে বাহির হইলাম। ফকির হাতীতে উঠিয়াই, খানিক ধূলি হাতে লইয়া উড়াইয়া দিয়া একদিকে আমাদিগকে যাইতে বলিল, আমরাও তাহাই করিলাম। প্রাতে ৮টা হইতে আরম্ভ করিয়া বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া আমরা সকলেই এত পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তখন ঐ ফকিরকে যে পায় সেই মারে এই অবস্থা হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার প্রহারের অধিক দুর্দ্দশা হইয়াছিল। তখন বুঝিতে পারি নাই যে মাহুতরা দুষ্টামি করিয়াই তাহাকে এক বদ্ হাতীতে উঠাইয়া দিয়াছিল। খানিক পরে দেখা গেল এক মাহুত ফকিরকে হাতী দিয়া আছড়াইয়া ফেলিয়া তাহার দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করিয়াছে। যাহা হউক, ফকিরের এই দুর্দ্দশার পর পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে আরও খানিক দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া হইবে। পরামর্শ হইল বটে, কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়ায় লাইনের প্রতি কাহারও তেমন মনোযোগ হইল না। খানিক দূর লাইন করিয়া যাওয়ার পর, এক স্থানে অত্যন্ত কাঁটা ছিল বলিয়া লাইনের অন্যান্য হাতী ও লোকজনের অপেক্ষায় হাওদার হাতীগুলি দাঁড় করাইতে হইল। Beater হাতী ও লোকগুলি ৪০।৫০ গজ পিছনে, ভয়ানক সোর-গোল করিয়া আসিতেছিল। কেহ বা হাতী দিয়া বাঁশ ও গাছ ভাঙ্গিতেছে, কেহ বা 'দা' দিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে আসিতেছে, এইরূপে অগ্রসর হইয়া আমাদের সহিত মিলিতে উহাদের প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।

* বিগত ফাল্গুন সংখ্যা পত্রিকায় এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের নামটি ৺ (পরলোকগত) রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মারাত্মক ভ্রমের জন্য আমরা অতীব দুঃখিত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছি। রাজা জগৎকিশোর সুস্থ ও নিরাময় দেহে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করুন ইহাই ভগবৎসমীপে আমাদের প্রার্থনা।

— মাঃ মঃ সম্পাদক।

জঙ্গলের তো এই অবস্থা। এখন বাঘের ঘুমের কথা বলিতেছি। এইরূপ ভীষণ গোলযোগের মধ্যে আমরা দাঁড়াইয়া আছি; রাজা জগৎকিশোর আমার ৩০।৪০ হাত দূরে, একাকী কাঁটা বাঁশের ঝোপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 'দা' দিয়া বাঁশের 'খড়কে' তৈয়ার করাইতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার হাওদার পিছনের লোক হঠাৎ তাঁহাকে বলিল, "হুজুর বাঁশ ঝোপের মধ্যে একটা কি যেন দেখা যায়।" তিনি অনেক উকিঝুঁকি Beater হাতী এবং লোকজনগুলিও প্রায় আসিয়া পড়িয়াছিল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী ভয়ানক ডাক দিয়া 'ঝটাপট' করিয়া দৌড় দিল। ইহার পরই আমরা তাড়াতাড়ি যতদূর সম্ভব লাইন form করিয়া খানিকদূর যাইয়া দেখি, বাঘিনীর পেটে গুলি লাগিয়া নাড়ি ভুঁড়ি বাহির হইয়া গাছের মধ্যে একদিক্ আটকাইয়া গিয়াছে। বাঘিনী উহা টানিয়া বড়শিতে মাছ গাঁথার মত ১০।১২ হাত দূরে গিয়া পড়িয়াছে।



আমাদের হাতী লাইন

দিয়াও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরন্তু ইহা লইয়া তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। হাতী এদিক ওদিক নানা স্থানে সরাইয়া, একস্থানে যেন হলদে সতরঞ্চের মত কি একটা পড়িয়া আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তারপর আর কিছুক্ষণ উঁকি-ঝুঁকি করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, সাদা কি একটা একটু একটু নড়িতেছে। বাস্তবিক উহা বাঘিনীর পেটের সাদা লোমগুলি ভিন্ন আর কিছু নহে। ঐ নড়া স্থান লক্ষ্য করিয়াই তিনি ১২ বোর রাইফেলের একগুলি করিলেন। তখন পিছনের পরে আর এক গুলিতে উহাকে শেষ করা গেল বাঘিনীটী মাপে ৯ ফিট্ ৩ ইঞ্চি ছিল।

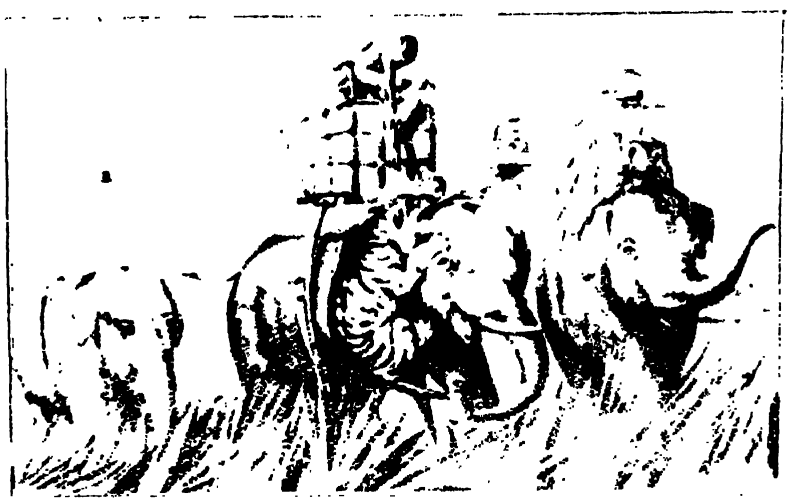
বাঘিনীকে মারার পর ফকিরের আস্ফালনে মাহুতেরা কিছু দমিয়া গেল। "ঝড়ে বক মরিল ফকিরের কেরামত বাড়িল", পূর্ব্বদিন ফকির যতটুকু নাকাল হইয়াছিল, পরদিন মাহুতদের 'সিন্নি' খাইয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়াও সমধিক লাভবান হইয়াছিল।

এই ঘটনা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, অনেক সময় বাঘেরা ঘুমে কুম্ভকর্ণকেও পরাস্ত করে; মৃত্যুর পূর্ব্বে বহু চৌর্য্য ফলে অকালে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রা-

ভগ্ন হইয়াছিল; কিন্তু ৫০টী হাতী ও বহু লোকজনের 'সোরগোলে'ও মৃত্যুর পূর্ব্বে এই হতভাগ্য পশুর ঘুম ভাঙ্গে নাই। ইহার পর আরও ২।১ স্থানে ঘুমন্ত বাঘ দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাদের নিদ্রা এত গভীর নহে—গোলমাল শুনিয়াই জাগিয়া পড়িয়াছে।

যে বাঘ মানুষের ত্রিসীমানায়ও আসিতে চায় না, তাহাদের আর একটী আশ্চর্য্য স্বভাব এই যে, খুব বেশী ক্ষুধার্ত্ত হইলে অনেক সময় লোকজন গ্রাহ্য করেন না। নিম্নের ঘটনা দুইটী হইতে ইহাদের এইরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একবার শিলেটের 'চন্দ্রপুর' ক্যাম্প্ হইতে আমরা কোন এক স্থানে শিকার করিতে গিয়া বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় রাস্তায় একজন লোক



আমাদের হাওদা শিকার

ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিল, "হুজুর, বাঘ ব্যাড়ো।"—অর্থাৎ এক বাঘকে বেড় দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া সে আমাদিগকে সংবাদ দিতে আসিয়াছে। লোকটা এত দ্রুত আসিয়াছিল যে, কিছুক্ষণ উহার মুখে কথাই সরিতেছিল না। উহার নিকট সমস্ত অবস্থা শুনিয়া সেখানে যাইয়া দেখিলাম যে, কোন গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র নল-বনে (যেখানে বাঘ আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই) রাত্রে কোন্ সময় যে বাঘ আসিয়াছে তাহা কেহ 'টের' পায় নাই। ঐ স্থানটী আমাদের ক্যাম্পের অতি নিকটে ছিল। প্রাতে একটী বাছুর ধরিয়া নেওয়ায় প্রথম বাঘের সন্ধান হয়। তখন কতকগুলি লোক সেই জঙ্গলে গিয়া বাছুরটাকে ছাড়াইয়া আনে। ইহার ঘণ্টাখানেক পরেই আবার কতকগুলি লোকের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বলদকে জখম করে। উহারা বলদটীকেও বহু কষ্টে ছাড়াইয়া নেয়।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। এই সব হিংস্র-জন্তু-সমাকুল স্থানের লোকগুলি অত্যন্ত সাহসী হইয়া থাকে। ইহারা একাকী জঙ্গল দিয়া চলাফেরা করিতে এবং এইরূপে বাঘের মুখ হইতে গরু বাছুর ছাড়াইয়া আনিতে কিছুমাত্রও ভয় পায় না। ইহাদের পরম সৌভাগ্য এই যে ঐ সব অঞ্চলের বাঘ এ পর্য্যন্ত নরখাদক হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। নচেৎ বাস-জঙ্গলে ইহাদের যে কি বিপদ ঘটিত তাহা বলাই বাহুল্য।

বাঘটী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয় লোকজনের বাধা বিঘ্ন না মানিয়া ক্রমাগত গরু ধরিতেছিল; নচেৎ সচরাচর প্রায় এরূপ করিতে দেখা যায় না।

আমরা আসিয়াই দেখিলাম ৪০।৫০ জন লোক ও

৩৪টী হাতী বনটীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। স্থানটী আমাদের ক্যাম্পের নিকটবর্ত্তী বলিয়া, প্রথমতঃ ক্যাম্পে গিয়া যে কয়টী রুগ্ন হাতী ছিল তাহার এবং লোকজনের সাহায্যে ঘিরিয়া রাখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা করিতেছে।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আর শিকার করা চলে না বলিয়া অতঃপর কি করা হইবে তাহাই পরামর্শ চলিতে লাগিল। কেহ বলিলেন, "মরা গরুটাকে জঙ্গলে রাখিয়া দেওয়া হউক। কাল আসিয়া শিকার করা যাইবে। মরা গরুর লোভে বাঘ বনেই থাকিয়া যাইবে।" কাহারও মতে যে ভাবে পাহারা দেওয়া চলিতেছে, সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া রাখিয়া এইরূপ পাহারা দেওয়া চলুক। এইরূপ নানা উদ্ভট কল্পনার পর স্থির হইল যে, একটী বেট্ (bait) বাঁধা হউক। (বাঘের 'মরির' জন্য যে জানোয়ারকে বাঁধা হয় তাহাকে bait বলে) পরামর্শান্তে তাঁবুতে ফিরিয়া গিয়া বেট্ বাঁধার জন্য একটী ঘোড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ঘোড়াটীকে বনের নিকটেই ফাঁকা যায়গায় বাঁধা হইল। হাওদা-শিকারী-দের পক্ষে একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, হাওদা শিকার করিতে হলে ২।৪টা ঘোড়া বা মহিষের বাচ্চা বেট্ বাঁধিবার জন্য সঙ্গে রাখা উচিত। অনেক সময় "মরির" খবর না পাওয়া গেলেও জঙ্গলে বাঘ আছে জানিতে পারিলে, মাছের জন্য 'চার' ফেলার মত ঐ সব স্থানে বেট্ বাঁধিতে হয়। অজ্ঞাতার তাহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই জন্য বেট্ সঙ্গে না থাকিলে অনেক সময় হাওদা শিকার ভাল হয় না। ভিন্ন স্থানে এইপ্রকার 'মরি' বাঁধাকে 'গাড়া' বাঁধা বলে।

বেট বাঁধিবার নিয়ম এই—খুব শক্ত সরু দড়ি দিয়া লম্বা করিয়া ইহাদের পায়ে বাঁধা উচিত, গলায় বাঁধা ঠিক নয়। যতদূর সম্ভব, বাঘকে ইহা বুঝিতে দেওয়া উচিত যে বেট্ স্বাধীন ভাবে চরিতেছে।

যাহা হউক, পরদিন প্রাতে আমরা যাইয়া দেখি ঘোড়াটী মরে নাই; কিন্তু উহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। ঘাড়ের একস্থানে চারিটী দাঁতের চিহ্নও রহিয়াছে।

প্রথমেই ঘোড়ার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া এত দুঃখ হইল যে তাহা বলিবার নহে। সে বেচারা কোন রকমে দাঁড়াইয়া ছিল মাত্র। স্থানের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, বাঘের সঙ্গে ঘোড়ার লড়াই হইয়াছিল। ঘোড়ার খুরের আঘাতে ঐস্থানে ঘাস ও মাটি খানিক খানিক উঠিয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে মাটি ও জঙ্গল পাট হইয়া ভূমির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমাদের সকলের ধারণা হইল যে, যখনই ঘোড়াটা আক্রান্ত হইয়াছে তখনই পিছন্ ফিরিয়া ক্রমাগত 'পুস্তক' ঝাড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। হয়ত ঘাড়ে কামড়াইবার সময় ঘোড়াটা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া বাঘটাকে ছাড়াইয়াছিল। ঘোড়াটী গাড়ীর ঘোড়া ছিল বলিয়া পায়ে নাল বাঁধা ও আয়তনে বড় ছিল।

যাহাহউক, জঙ্গলে ঢুকিতেই বাঘ পাওয়া গেল। প্রথমে মাহুতরা উহাকে নির্জ্জীব অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। মনু বাবুর অব্যর্থ সন্ধানে পশু-দেহ হইতে মুক্তি লাভ করিবার সময় কিন্তু উহার জাতীয় বীরত্ব দেখাইতে ছাড়ে নাই, যদিও তাহা ক্ষণিক। বাঘিনীটী মাপ ৯ফিট্ ২ইঞ্চি ছিল।

ইহার শরীর স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। দাঁতের গোড়ায় ও মুখের অনেক স্থানে ঘোড়ার নালের চিহ্ন ছিল। ইহাদ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল বলিয়াই বাঘটী এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও ছোট জঙ্গলে থাকিয়া ঘোড়ার সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। কিন্তু ইহ জীবনে তাহার ক্ষুধার আর নিবৃত্তি হইল না।

আমার মনে হয় বাঘিনীটীকে না মারাই উচিত ছিল: জীবিত থাকিলে, অশ্ব জাতির নিকট কিরূপ অপদস্থ হইয়াছিল তাহা জ্ঞাতি কুটুম্বের নিকট প্রচার করিত—হয়ত উহাতে ভবিষ্যতে ঘোটক কুলের উপকারও হইতে পারিত।

ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত অস্থির হইলে বাঘ লোকের ঘরে আসিয়া পড়িতে দ্বিধা বোধ করে না। সে আজ প্রায় ২৫।২৬ বৎসরের কথা, আমাদের বাড়ীর নিকট-বর্ত্তী লাঙ্গুলীয়া গ্রাম হইতে একদিন একটা লেপার্ডের

সংবাদ পাইয়া শিকার করিতে যাই। সেদিন সঙ্গে হাতী বড় বেশী ছিল না, আমি একাই গিয়াছিলাম। আমার হাওদার ও অন্যান্য হাতী সমেত সর্ব্ব শুদ্ধ ৪।৫টী হাতী ছিল। হাওদায়, আমার পশ্চাতে আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুধেন্দুনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ছিলেন। শিকারে আমার মত তাঁহার বাতিক না থাকিলেও, হাওদার পিছনে বসিবার বাতিক বড় কম ছিল না। বাড়ীর আশে পাশে শিকার হইলেই তিনি হাওদার পিছনে বসিয়া যাইতেন; এ ক্ষেত্রেও ছিলেন।

জঙ্গল বেশী থাকায় সন্ধান পাইয়াও ৪৫ ঘণ্টার অক্লান্ত চেষ্টায় বাঘটী মারিতে পারি নাই। কেহ কেহ আবছায়ার মত ৩।৪ বার বাঘটীকে দেখিয়াছিল।

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া হতাশ হইয়া গ্রামের ভিতর এক বাড়ীর নিকট আসিলাম। তখন আমি সবে মাত্র নূতন শিকারী, তাহাতে আবার 'দেখা দিয়া শ্যাম কোথা লুকালে,' ইহাতে আমার মনের অবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অগত্যা নিরাশ হইয়া বাড়ী আসিবার জন্য হাওদা হইতে নামিয়া প্যাডে উঠিয়াছি, ঠিক সেই সময় নিকটেই বাঘের ডাক শোনা গেল। তখন মাহুতদের মধ্যে কেহ কেহ আবার জঙ্গল Beat করা হউক, কেহ কেহ বা পরদিন আসিয়া শিকার করা যাইবে ইত্যাদি নানারূপ পরামর্শ দিতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সেদিন আর না ঘাটাইয়া, একটা ছাগল দিয়া বেট্ বাঁধা স্থির করা হইল। তখনই গ্রাম হইতে একটা ছাগল কিনিয়া আনিয়া, যেদিকে বাঘের ডাক শোনা গিয়াছিল, তাহার নিকটেই কোন এক স্থানে ছাগলটাকে বাঁধা স্থির করিয়া, আমার হাওদার হাতীর মাহুতকে ছাগল লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। আর আমি হাওদায় উঠিয়া, নিজেই হাতী চালাইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম; অন্যান্য হাতীও আমার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। খানিক অগ্রসর হওয়ার পরই হতভাগ্য ছাগল ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল; লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে "হুজুর ছাগল নিলে, ছাগল নিলে" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেই চাহিয়া দেখি যে, বাঘটা হঠাৎ লাফাইয়া আসিয়া ছাগলের ঘাড়ে পড়িয়াছে। তখন আমরা সকলে একযোগে চেঁচাইয়া উঠিতে বাঘ ছাগল ছাড়িয়া জঙ্গলে ঢুকিল। এদিকে সেই সাহসী মাহুতও একদৌড়ে আসিয়া একটা হাতীর শুঁড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া বসিল। ছাগলট খুব জখম না হইলেও, পড়িয়াছিল। ইহার পর ২।৩ জন লোক হাতী হইতে নামিয়া ইহাকে ধরাধরি করিয়া একটা বাঁশ ঝোপের নিকট বাঁধিল। বলা বাহুল্য, আমরা ছাগলটাকে সে বার হাতী দিয়া ঘিরিয়া লইয়া গেলাম।

ছাগল বাঁধিবার পর ১৫।২০ হাত ফিরিয়া আসিয়া কি জানি কেন আমার খেয়াল হইল, একটু দাঁড়াইয়া দেখা যাক আবার আইসে কি না। মাত্র ২।৩ মিনিট দাঁড়াইবার পরই দেখিলাম বাঘটা 'গুড় গুড়' করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছে। ইহার একটু পরেই আবার ছাগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমরা যে ৪।৫টী হাতী লইয়া এত নিকটে দাঁড়াইয়া আছি তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। যখন লাফ্ দিয়া আসিয়া মুখ 'কাও' করিয়া ছাগলটার গলা কামড়াইয়া ধরিল, তখন সে কি ভয়ানক দৃশ্য! ছাগলটা পা ঝাড়িতেছে আর গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও গোঁঙরাইতেছে। ঠিক সেই সময়ে সকলেই সমস্বরে বলিতেছিল "হুজুর গুলি করুন, হুজুর গুলি করুন।" গুলি আর কি করিব, আমি যেন ভাবে বিভোর হইয়া কেবলই ভাবিতেছিলাম, ছাগলটী যেন গোঁঙরাইতে গোঙরাইতে বলিতেছে—"It is play to you but death to me." যাহা হউক লোকগুলির কোলাহলে আমার চমক্ ভাঙ্গিবামাত্র নিশানা করিয়া এক গুলি করিলাম। গুলির সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মুখ হইতে ছাগলটা খসিয়া পড়িল। গুলি তাহার মাথায় লাগায় একটুও নড়িতে চড়িতে পারে নাই।

নানা রকম অবস্থার মধ্য দিয়া একটা মাত্র বাঘ

মাত্রায় কেবল যে খুসীই হইয়াছিলাম তাহা নহে। ইহাতে ব্যাঘ্র চরিত্রেরও ২।৩টী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এরূপ দৃশ্য অনেক শিকারীর ভাগ্যেই ঘটে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল যে, ইহার মত নির্লজ্জ বাঘ বুঝি বা ইহাদের সমাজে দ্বিতীয়টী নাই। ১।৪ মিনিট অপেক্ষা করিলেই সম্ভবতঃ উহার আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিত না। কিন্তু পোড়া পেটের জ্বালা বড় জ্বালা!

কেবল ব্যাঘ্র কেন, মনুষ্য সমাজেও ইহা অপেক্ষা বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখা যায়। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থানে কত বুভুক্ষু মাতা সময় সময় আপন সন্তানকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া নিজের আহার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। কোন কোন সময় জলমগ্ন জাহাজের আরোহীরা বোটে ভাসিয়া যাইতে যাইতে, ক্রমে আহার্য্য নিঃশেষ হইয়া আসিলে, নিজেদের মধ্যে lottery করিয়া এক একজনকে নিহত হয়।

যখন সভ্য জগতেই এরূপ ঘটনা বিরল নহে, তখন আর ক্ষুধার্ত্ত লোভী বাঘ আহারের জন্য জীবন দিবে, সে আর বেশী কথা কি?

হারানিধি।

আমার পাণ্ডুলিপি এই পর্য্যন্ত লেখার পর, ‘হারানিধি’ পাওয়ার একটা গল্প বলিতেছি। যদিও ইহার সহিত মূল বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি অর্দ্ধ পথে আমি কিরূপ ‘নাকাল’ হইয়াছিলাম তাহা পাঠকদিগকে না শুনাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। ইহাতে আমার একটু উপকারও হইবে। অভিনয় করিতে করিতে যেমন মধ্য পথে Carpenter’s scene এর আবশ্যক হয়, এই গল্পটিতে আমারও সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। ইহাতে ক্ষুদ্রের পার্শ্বে বৃহতের অবতারণা দোষ পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

সেদিন কোন বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাই। বন্ধুবরের বিশেষ অনুরোধে এই পাণ্ডুলিপি খানিও তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আহারান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় ঘটনাক্রমে ২।৩ বার গাড়ী বদল করিতে হয়। রাত্রি প্রায় ১টার সময় বাড়ীর নিকট আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, গাড়ীতে পাণ্ডুলিপি খানি নাই। আমার তখনকার মনের ভাব সকলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি গাড়ীখানা লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পূর্ব্বে যে যে স্থানে গাড়ী বদল করিয়াছিলাম, সে সব স্থানে অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

এত বড় কলিকাতা সহর তখন প্রায় নিস্তব্ধ। কেবল গ্যাসের আলো ও স্থানে স্থানে পাহারাওয়ালা ছাড়া কচিৎ ২।১ জন নিশাচর গাড়ীতে বা মোটরে যাতায়াত করিতেছিল। কোথাও বা সুরাপান-বিহ্বলা বারাঙ্গনার অলস-কণ্ঠ নিঃসৃত অস্পষ্ট সঙ্গীত শোনা যাইতেছিল। আমার সে সব দিকে কোনই লক্ষ্য ছিল না। আমার মনের এই দুরবস্থা ‘History of the French Revolution’এর সুপ্রসিদ্ধ লেখক Carlyle তখন উপস্থিত থাকিলে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। Carlyle বহু শ্রম ও গবেষণার ফলে ‘History of the French Revolution’ নামক সুবিখ্যাত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত John Stuart Millএর নিকট দেখিতে দেন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় Millএর দাসী উহা অকর্ম্মণ্য কাগজ মনে করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় Carlyleএর মনে যে ভাব হইয়াছিল, আমার তাহা অপেক্ষা বড় কম হয় নাই। তবে Carlyleকে পরে বহু চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া আবার দীর্ঘ দিনে ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান আমাকে সে দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

সমস্ত রাত্রি বিফল চেষ্টার পর প্রত্যুষে আবার বাহির হইয়া, বেলা ১২টা পর্য্যন্ত অক্লান্ত অন্বেষণ করিয়া, এক আস্তাবল হইতে আমার এই হারানিধি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

হাওদা শিকারে—হাওদা শিকারে কেন, সব শিকারেই,—মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। যে শিকারী যত

উত্তেজিত হইয়া পড়িবেন, তাঁহার নিজের বিপদের এবং শিকার না পাইবার সম্ভাবনাও তত বেশী। একবার উত্তেজিত হইয়া কিরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম তাহা লিখিতেছি।

প্রায় ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে শিলেটের শ্রীপুর নামক স্থানে আমরা ক্যাম্প করিয়া ঝিঙ্গাবুরি গ্রামের জঙ্গল শিকার করিতে যাই। বাঘের সন্ধানে উপর্য্যুপরি কয়দিন চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হওয়ায় শেষে একদিন একটী ঘোড়াকে বেট (bait) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। পর দিন প্রাতে দেখা গেল, ঘোড়াটাকে মারিয়া বনের মধ্যে অনেক দূর টানিয়া লইয়া গিয়াছে। সে বার আমাদের শিকার পার্টিতে —বাবুও ছিলেন। তিনি জঙ্গলে ঢুকিয়াই এত উত্তেজিত হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহার উপদ্রবে আর কাহারও শিকার করার উপায় থাকিত না। পাখী, গো-সাপ, বেজী প্রভৃতি যাহাকেই বন নড়াইতে দেখিতেন, বাঘ বাঘ বলিয়া ক্রমাগত চেঁচাইতেন ও তাহার উপরই ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও বেশ সপ্রতিভই থাকিতেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে একবার আসামের কোন এক জঙ্গলে আমাদের সঙ্গে শিকার করিতে করিতে এই অভিনব প্রণালীতে দৈবাৎ এক প্রকাণ্ড বাঘ (tiger) মারিয়া ফেলিয়াছিলেন; সেই হইতেই তাঁহার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে, বন-নড়া দেখিয়া মারিলেই শিকার হয়—জানোয়ার দেখার আর আবশ্যক করে না। আরও একটু মজা এই যে, তিনি এইরূপ যদৃচ্ছা (at random) গুলি করিতেন বলিয়া, যে কোন শিকার মারা পড়িলে, তিনি মারিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়া বসিতেন।

প্রতি দিনই বন নড়া দেখিয়া গুলি করিয়া সকলেরই শিকারের অসুবিধা জন্মাইতেন বলিয়া সেদিন আমরাও তাঁবু হইতে ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম যে সকলেই তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিব।

আমরা সেই বাঘের উদ্দেশে গিয়া অতি অল্পায়াসেই তাহার সন্ধান করিয়া ফেলিলাম। খোঁজ হইবামাত্রই তিনিও তাঁহার যথাভ্যস্ত 'ব্যাটারি' চালাইতে সুরু করিলেন। আমরা পূর্ব্ব পরামর্শমত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াও পরিয়া উঠিলাম না; কারণ আমরা এ ভাবে শিকার করিতে একেবারেই অনভ্যস্ত।

বাঘেরও সন্ধান হইল, তিনিও তাহার পাছে পাছে জঙ্গলের মাথা নড়া দেখিয়া ক্রমাগত গুলি করিতে করিতে ছুটিলেন। তখন অন্য শিকারীরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। লাইন নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর দেখে কে? তখন আমরা এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে তাহা আর বলিবার নহে। আমার বিরক্তির সঙ্গে ক্রোধের ও উত্তেজনার ভাবও হইয়াছিল। সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু আমি আমার হেড্ মাহুত সুনাউল্যাকে হুকুম করিলাম, "ঐ হাতীর সঙ্গে চালাও।" সেদিন হাওদা আমার প্রিয় বিখ্যাত হাতী মোহনলালের উপর ছিল। মোহনলাল যেমন একদিকে শিকারে শ্রেষ্ঠ ছিল তেমনই অন্য হাতীকে সায়েস্তা করিতেও খুব মজবুত ছিল। আমিও তাঁহার হাতীর সঙ্গে প্রায় পাশাপাশি মিলিত হইয়া দৌড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু তখনও তিনি তাঁহার নিত্য কর্ম্ম ভুলেন নাই। যতই পিছন হইতে আওয়াজ হইতেছিল বাঘও ক্রমেই ততই দূরে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সৌভাগ্য এই যে আমার হাতী তাঁহার হাতীর সঙ্গে ভিড়িয়া পড়াতে, তাঁহার হাতী ভয় পাইয়া পিছনে হটিয়া গেল। ইহাতে বরং একটু সুবিধাই হইল। আমি সম্মুখে পড়িয়া যাওয়াতে তিনি আর গুলি করিবার সুযোগ পাইলেন না। ইহাতেই আমি বাঘের খুব নিকটে যাইতে পারিয়াছিলাম।

জঙ্গল ঘন হইলেও খুব উচ্চ ছিল না। একস্থানে যেন বন নড়িতেই হঠাৎ নড়া থামিয়া গেল। বাস্তবিক সেই স্থানে একটা গর্ত্ত ছিল। বাঘ সেই গর্ত্তে নামিয়া বোধ হয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আমার হাতীও গর্ত্তের পারেই দাঁড়াইয়াছিল। তখন ওখানে গর্ত্ত আছে বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, তিনি প্রায় আসিয়া পড়িলেন। পাছে

আবার সেই বিপ্লবের সৃষ্টি হয় মনে করিয়া, যে স্থানে বন নক্সা শেষ হইয়াছে ঠিক সেই স্থানে হাতী বাড়াইতে আদেশ দিলাম। ইহার পর, মুহূর্ত্ত মধ্যে কি যে হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। হাতী একটু অগ্রসর হইয়াই উপুড় হইয়া গর্ত্তে পড়িয়া গেল। আমার হাতে 500 express rifleটী হাওদার ডাণ্ডায় ধাক্কা লাগায় ডান্ নল (right barrel) দম্ করিয়া আওয়াজ হইয়া গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়া হাওদায় ভয়ানক ধক্কা খাইলাম, ওদিকে বাঘেরও ভীষণ ডাক শুনিলাম। এই ঘটনা ঘটিতে বোধ হয় ১০।১৫ সেকেণ্ডের অধিক সময় লাগে নাই।

যখন হাতী চারি পায়ে ভর করিয়া ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তখন হাওদার সম্মুখে ঝুঁকিয়া দেখি হেড্ মাহুত হাতীর কাণের পাশ দিয়া কাত হইয়া পড়িয়াছে। দুলনীতে পা আট্কাইয়া তাহার মাথা নিচের দিকে ঝুলিতেছে। (হাতী চালাইবার জন্য তাহার গলায় রজ্জু গুচ্ছকে দুলনী বলে; মাহুত উহাতে পা আট্কাইয়া হাতী চালায়। ইহা ঘোড়ার রেকাবের মত কায করে।) হাতী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বাঘ তাহার মাথা কামড়াইয়া ধরিয়া সম্মুখের দুই পা দিয়া মাথার দুই পার্শ্বে ও পিছনের পা দিয়া শুঁড় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। সে দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বুঝানো অসম্ভব। তখনই আমার মনে হইল, হয় বাঘ মাহুতকে ধরিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, অথবা আমার বন্দুকের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়াতে এই বিপদ্ ঘটিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ বন্দুকের বাঁ নল (left barrel) বাঘের ঘাড়ে প্রয়োগ করিলাম। আমার বিশ্বস্ত বন্দুকের অমোঘ শেল্ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পার্থিব জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিল।

টাইগারটী প্রকাণ্ড—মাপে ৯॥ ফিটের উপর ছিল।

ইহার পর যখন মাহুত হাওদা ধরিয়া হাতীর উপর বসিল, তখন দেখিতে পাইলাম, তাহার মাথার পাগ্ড়ী পড়িয়া গিয়াছে, সে নিজেও নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্য যে কোন রূপ জখম হয় নাই। যদি আমি এই ভাবে উত্তেজিত হইয়া আমার সহযাত্রীর সহিত প্রতিযোগিতা না দেখাইতাম, তবে হয়ত এই বিপদ হইত না।

তবে ইহাও ঠিক যে, আমি এই ভাবে বিপদগ্রস্ত না হইলে বাঘটী ক্রমাগত গুলির উৎপাতে হয়ত বাড়ী যাইয়া মরিত।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

বর্ত্তমানের কথা

নারীর কথা, অকাল মৃত্যু, বাল্যবিবাহ, এই সব সামাজিক প্রসঙ্গ লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছে। সমাজের পক্ষে এ আন্দোলন শুভ বলিয়াই মনে করি। আমাদের দেশে দুস্থানুবর্ত্তিতার মোহ কিছু কম নয়, সে ক্ষেত্রে আলোচনা সুফল প্রসব করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর প্রবন্ধের উত্তরে অনেকেই লিখিয়াছেন দেখিতেছি, এবং মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে লেখিকাও দেখিলাম বাল্যবিবাহের সমর্থন-সুর অনেকটা বদলাইয়া ফেলিয়াছেন। "মানসী" অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাল্যবিবাহ প্রবন্ধে আমি মনস্বী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে লেখিকা লিখিয়াছেন—"এ স্থলে পুরোহিত বলিতে কাহাদের বুঝাইতেছে? যদি আধুনিক "দেবপূজা" ব্যবসায়ী সংস্কৃত ভাষা-ভীত "চালকলাজীবী" জীব বিশেষকে বুঝায়, তাহা হইলে স্বামিজীর কটূক্তি যত তীব্র হয় আমি ততই খুসী; কিন্তু সে কটূক্তি যদি মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি মহর্ষিগণের বিরুদ্ধে করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে সবিনয়ে বলিব

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"—একথার উত্তরে আমি বলি, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ অতি সত্য কথা হইলেও 'দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন বিবেকানন্দের দৃষ্টি এ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হয় নাই, এবং মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিগণও যে কালে যে দেশে যে যুগোপযোগী বিধি ও শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা খুব সম্ভব সময়োপযোগী ভাবে দীর্ঘকাল সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ এত শতাব্দী পরেও যে সেই বিধি সমাজের মঙ্গলকর ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে ইহার কোনও আশা নাই, বিশেষ করিয়া বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সভ্যতা প্লাবিত ভারতবর্ষে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে শাস্ত্রচর্চ্চা ও শিক্ষাদান শিষ্য পালনই ছিল ব্রাহ্মণের ব্রত। কেহ কি বলিতে পারেন আজিকার দিনে ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই ব্রত পুরাপুরি বজায় রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে সমর্থ? শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান গ্রহণ করিতেন না; আর আজিকার দিনে রাজসরকারের সেবা না করিয়া কয়জন ব্রাহ্মণ জীবিকা সংস্থান করিতে সমর্থ?

সুতরাং যুগধর্ম্মকে না মানিয়া অব্যাহতি কৈ? এক্ষণে আর একটি কথা হইতেছে, স্বাস্থ্যহানি ও অকালমৃত্যুর কথা। অকালমৃত্যু ও স্বাস্থ্যহানির মূলে সম্ভবতঃ একটি মাত্র কারণই বিদ্যমান নহে। তবে বর্ত্তমান সভ্যতা যে ইহার জন্য কতকটা দায়ী ইহা অস্বীকার করা যায় না। যে কারণেই হউক, খাঁটি ভাল জিনিষ যাহা জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহা ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে, বিশেষ করিয়া সহর বাজারে, মানব দেহের ভিত্তি স্বরূপ শৈশবে ও বাল্যাবস্থায় প্রচুর গোদুগ্ধ পান একেবারেই অসম্ভব। তাহার উপর কলিকাতা সহরের অফিস বাজারে অন্ন সংস্থানের জন্য Daily passenger গাড়ী গুলিতে শত সহস্র যে সকল আরোহীগণ নিত্য যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের রোজনামচা জানিলে বুঝিতে পারা যায়, কি কঠিন শ্রম তাঁহাদিগকে করিতে হয়। ট্রেণ ধরিবার জন্য, অনেককেই ভোর ছটার সময়েই নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া দৌড়িতে হয়। যে যে স্থানে কল কারখানা আছে, তথাকার শ্রমজীবিদিগেরও এই অবস্থা। সুতরাং এই কঠোর জীবন সংগ্রামের ফলে জনসমাজ ক্রমেই স্বাস্থ্য ও বল হারাইয়া অকালমৃত্যুর অধীন হইয়া পড়িতেছে এবং ইহাদের বংশধরগণও যে অল্পায়ু ও রুগ্ন হইবে তাহা কিছু অসম্ভব নয়।

এইবার নারীর শিক্ষার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। শিক্ষা নারী কি নর উভয়ের পক্ষেই তুল্য ভাবে প্রয়োজন; তবে কয়েকখানা কেতাব পড়িয়া পাশ করাটাই যে শিক্ষা এমন কথা কেহই বুঝিবেন না। যে শিক্ষায় মনুষ্যজনোচিত মনোবৃত্তি গুলির সম্যক্ বিকাশ হয়, কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয়, দেশের ও দেশবাসীর প্রতি মমতা জন্মে শিক্ষা তাহাকেই বলি। অনেকেই যে শিক্ষিতা নারীর বিলাসিতা বা বিবিয়ানার প্রসঙ্গ তুলিয়া শিক্ষিতা নামের প্রতি সাধারণের একটা বিতৃষ্ণা আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তো বুদ্ধিমানের কায নয়! এ বিষয়ে নারী কেন, অনেক নরও তো কিছু মাত্র পশ্চাৎপদ নহেন। বাপ মার যেমনই অবস্থা হোক্, ঘরে অন্নের সংস্থান থাক্ বা নাই থাক্, ছেলেটি সাজিয়া গুঁজিয়া লক্কা পায়রার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, এ বিষয়ে শিক্ষার দোষ কি? অশিক্ষিতা সহরে মেয়েরাও তো সাজসজ্জায় কিছুমাত্র উদাসীন নয় দেখিতে পাই। অবশ্য আমরা সাজসজ্জার এই বৃথা আড়ম্বরকে কেহই শ্রদ্ধা বা সম্মানের চক্ষে দেখি না বা দেখিতে পারি না। বিলাতী সিল্কের শাড়ী সেমিজ ও লেস ঝালর, চিকনের আড়ম্বরপূর্ণ ফ্রক ব্লাউজের ঘটা অবশ্যই আমাদের দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, এবং এই সব পোষাক-পরা মেয়েদের দেখিবামাত্র মন আমাদের ব্যথায় ভরিয়া উঠে। ইহার প্রতীকার অবশ্য মেয়েদেরই হাতে, কিন্তু পুরুষরাও যে কতকটা এজন্য দায়ী নহেন তাহাও বলিতে পারি না। তাঁহারা গৃহসংসারে স্বচ্ছন্দে নিজেদের অনেক আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির সাজসজ্জার এই বিদেশীয় উপকরণগুলি যোগাইবার বেলা তো বেশ নির্ব্বাক? আসল কথা, শিক্ষার তেমন বহুল প্রচার হইয়াছে কৈ? দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে যদি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং সত্যকার শিক্ষিতা

স্বদেশ প্রেমিকা নারীগণ ঘরে ঘরে কন্যা ও জননীগণকে সুশিক্ষা দিবার ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন, তবেই যদি শিক্ষার প্রচার হয়; নতুবা বিবাহের বাজারে কাটুতি করিবার জন্ত সখের খাতিরে মেয়েদের খানিকটা লেখা পড়া শেখানো, রূপের ভাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্কুল কলেজের ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস তো হয় খাঁটী ইংরাজ মহিলা—নয় নকল মেম সাহেব। তিনি আসিয়া মেয়েদের বিদ্যার পরীক্ষা যত না করুন, কার কয়টা সেফ্‌টিপিন্‌ আঁটা হইয়াছে, কে কেমন ঘুরাইয়া শাড়ীখানি পরিয়াছে তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখেন। সুতরাং মেয়েগুলি যে এ সব বিষয়ে একটু বেশী অগ্রসর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তারপর মেয়েদের স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। সমাজ হিতৈষী কোনও ব্যক্তিরই নারীর এই স্বাধীন উপার্জ্জন সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই। চাকুরীপ্রার্থী পুরুষদের ভিড় ঠেলিয়া নারীরা যে কোনও দিন পথ করিতে পারিবে তাহা তো মনে হয় না। তবে আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া থাকা অপেক্ষা নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত বা অপোগণ্ড পুত্র কন্তার জন্ত যে তাহাদের দু দশটাকা উপার্জ্জন করা বিধেয় এ কথা বেশ বোঝা যায়। মসীজীবী কেরাণী না হইয়াও এ দিকে তাঁহারা সুবিধা করিতে পারিবেন। যে স্থানে শ্রমশিল্পের বিনিময়ে নারীগণ স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন, কর্ম্মপ্রার্থিনী নারীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই সকল স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে না। মোট কথা অতীতে আমাদিগের শাস্ত্রে বা সমাজে কোন্‌ বিধি নিষেধের ছাপ আঁকা ছিল তাহা খোঁজাখুঁজির জন্ত উঠিয়া পড়িয়া না লাগিয়া, বর্ত্তমান সময়ে সমাজে কোন্‌ কোন্‌ বিধি ব্যবস্থা জীবন ধারণের অনুকূল, সহৃদয় চিন্তাশীল নরনারীগণ তাহাই ভাবিয়া দেখুন এবং শুধু বাক্যে নয়, সাধ্যমত কার্য্যেও সেই মত প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করুন—তবেই যদি দীর্ঘকালের অবসাদগ্রস্ত এ জাতির কল্যাণ হয়।

জগতে সব কিছুই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং "এই ভারতে একদিন সতীদাহ প্রথা ভারতের সতী নারীকে জগতের বিস্ময়ের সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছিল" এই গৌরবপূর্ণ বচন আওড়াইয়া যে আজও বালিকা ও দুগ্ধপোষ্য শিশু বিধবা গুলিকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাধীন রাখিতে হইবে এবং বিধবা বিবাহের নামে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া ধর্ম্ম হানির ভয়ে চমকিত হইতে হইবে এমন কি কথা আছে? অবশ্য জোয়ারের স্রোতকে কেহই ঠেকাইতে পারে না, পরিবর্ত্তনের স্রোত আপনা হইতেই সমাজকে নূতন পথে ঠেলিয়া লইতেছে। মানুষের ক্ষীণ দৃষ্টি ইহার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিলেও, মহাকালের হস্ত ইহাকে ধ্বংসের মুখে না লইয়া নূতন সৃষ্টির মুখেই অগ্রসর করিয়া দিবে।

বিধাতার নব নব বিধানের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তিগণ এই কথাই মানিয়া লইবেন।

গতানুগতিকতা ও ছন্দানুবর্ত্তিতার মোহ, সত্যপন্থী কোনও নর নারীকেই আর মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সভ্যতার প্লাবনের মধ্যে দোষ, ত্রুটি, বিলাস, ব্যসন প্রভৃতি যত কিছু আবর্জ্জনা আসিয়াছে আসুক—ইহারই মধ্যে যে পলিমাটী ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মহাপ্রাণ নর নারীর মঙ্গল কর্ম্ম চেষ্টার বীজ তাহার মধ্যে উপ্ত হইয়া দেশকে যে অদূর ভবিষ্যতে নানারূপে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে—আশা করি ইহা আমার ভ্রান্তবিশ্বাস নহে।

শ্রীসরসীবালা বসু।

আত্মসংযম

মানুষ স্ব স্ব প্রকৃতির অধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ও গুণত্রয়ে অভিভূত হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণ ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। সত্ত্ব গুণ হইতে প্রহর্ষ, প্রীতি, আনন্দ ও প্রশান্তচিত্ততা; রজোগুণ হইতে অসন্তোষ, পরিতাপ, কাম, ক্রোধ, শোক, লোভ ও অক্ষমা; এবং তমোগুণ হইতে অপমান, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন, তন্দ্রা, সমুপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ গুণত্রয়ই প্রকৃতিসম্ভূত। কর্ম্ম প্রকৃতির গুণের পরিণাম। কর্ম্ম সকল, প্রকৃতির গুণ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। জ্ঞান আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। মন জ্ঞানের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় গ্রহণ, মন তদ্বিষয়ে সংশয় উৎপাদন, বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া থাকে। মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই বিষয় বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। তম প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করিয়া থাকে। বুদ্ধিপ্রভাবেই নেত্র দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা আস্বাদন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান ও মন দ্বারা চিন্তা জন্মে। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ, কেবল বুদ্ধির বিষয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। স্থূল দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা, তিনিই পুরুষ। মনসংকল্পাত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক। জ্ঞান ও বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া সংসারে নিজ নিজ প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম্ম করিতে করিতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিয়মিত করিতে পারা যায়। প্রথমে ইন্দ্রিয় জয়; পরে সহজেই মন ও বুদ্ধি জয় করা যায়। মন ও বুদ্ধি বশীভূত হইলে আত্মাকে সংযত করা যায়। ইহাই আত্মসংযম। ইহা লাভ করা অতি সুকঠিন। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে অভ্যাসবলে একাগ্র শক্তি জন্মিলে উহা লাভ করা যায়। ক্রমে ক্রমে আত্মার সৎপ্রবৃত্তি গুলির পরিপুষ্টি ও কু বৃত্তি গুলির বিনাশ হয়। মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানা প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযমই তাঁহাদের সকলের মতে সর্ব্বপ্রধান। (মহাভারত) শাস্ত্রকারেরা উহাকে দমগুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এবং বলেন—"দমগুণ দান, যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা দ্বারা তেজ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। দম গুণের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।...দমগুণই ক্ষমা ধৃতি অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয় পরাজয়, দক্ষতা, মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অনসূয়া, গুরুপূজা-প্রবৃত্তি ও দয়ার উৎপত্তির কারণ। দম-গুণান্বিত মহাত্মারা কদাচ ক্রূর ব্যবহার, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যের অপমান, উপাসনা বা নিন্দা করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ, এক কালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।...দমগুণ প্রভাবেই হৃৎপদ্ম-নিহিত অবিরোধী সনাতন ব্রহ্মপদ পাওয়া যায়।" (মহাভারত)

আত্মসংযম মনুষ্যকে পশু হইতে পৃথক করিয়াছে, অসভ্য জাতি অপেক্ষা সভ্য জাতিকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। যিনি মনের স্বাভাবিক উত্তেজনায় বাধা দিতে পারেন, তিনিই পশুজীবনের ঊর্দ্ধে থাকিয়া নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন। আত্মসংযম সকল ধর্ম্মের মূল। মনুষ্য যখনই চিত্তক্ষোভ বা কামাদি রিপুকে রশ্মি দ্বারা সংযত করিতে সমর্থ হইবেন, তখনই তাঁহার নৈতিক স্বাধীনতা আসিয়া পড়িবে। এই ক্ষমতা মানবের বাহ্য ও নৈতিক জীবনের বিভিন্নতা স্থাপন করে এবং উহাই ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি।

যিনি মানসিক প্রকৃতিকে নিজের শাসনাধীনে আনিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠ বলবান; নগর-বিজয়ী তাঁহার নিকট হীনপদ বাচ্য। ঐ বলবান পুরুষই, স্বীয় নিয়মানুবর্ত্তিতা গুণে, তাঁহার চিন্তা,

তাঁহার বাক্য ও কার্য্যের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। যে সকল পঙ্কিল বাঞ্ছা নিরন্তর সমাজকে অবনত করিতেছে, যাহার প্রশ্রয়ে শত শত পাপ তাহাকে কলুষিত করিতেছে, বীরোচিত আত্মশাসনাধীনতা, আত্মমর্য্যাদা ও আত্মসংযমের সম্মুখে, সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায়, প্রভাবহীন হইয়া অচিরেই অপসৃত হইয়া যায়। ঐ সকল গুণের অবহিত নিয়োগ মানবের হৃদয় ও মনের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ করায় এবং মানব চরিত্রকে বিশুদ্ধ, ধর্ম্মপ্রবণ ও শান্ত করিয়া তুলে।

নিয়মানুবর্ত্তিতা চরিত্র গঠনের পক্ষে বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। এতদ্ব্যতীত আমাদের জীবনকে বিধিবদ্ধ করিবার উপযুক্ত পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা আর কিছুই নাই। ইহার উপরেই আত্মমর্য্যাদা-বোধের উৎকর্ষ সাধন, বক্তৃতা অভ্যাসের সুশিক্ষা ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের ক্রমোন্নতি নির্ভর করে। আত্মনির্ভরশীল, আত্ম-শাসনক্ষম মানব সর্ব্বদা নিয়মানুবর্ত্তিতার অধীন হইয়া চলেন। যতই এই নিয়মানুবর্ত্তিতা পূর্ণতা লাভ করিবে, ততই মানবের নৈতিক অবস্থা উচ্চ হইয়া উঠিবে। তাঁহার বাসনাগুলিকে নিয়মাভ্যস্ত করাইতে হইবে, তাহাদিগকে তাঁহার প্রকৃতিগত ক্ষমতার বশে আনিতে হইবে। উহা যেন তাঁহার উপদেষ্টা বিবেকের আদেশ বাক্য সর্ব্বদা পালন করে। নতুবা ইহা তাঁহার প্রবৃত্তির দাস, তাঁহার অনুভূতি ও উত্তেজনার ক্রীড়ায় সঙ্গী হইয়া পড়িবে।

দেখিতে পাওয়া যায় আত্মসংযমের অভাবে অনেককে নিজকৃত ক্লেশ ও সঙ্কটের সহিত আজীবন যুদ্ধ করিতে হয়; তাহারা জীবনে কোন কার্য্যেই সফলতা লাভ করিতে পারে না। অথচ তাহাদের অপেক্ষা হীন-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক, কেবল মাত্র ধৈর্য্য, আত্মসংবরণ ও মনের সমভাব লইয়া, জীবন পথে সহজে প্রবেশ করিয়া, জীবনের সকল কার্য্যে সাফল্য লাভ করে।

কোন ইংরেজ তত্ত্বজ্ঞানী আত্মসংযমের সর্ব্বোচ্চতা উল্লেখ করিয়া বলেন—"ভাবপ্রবণ না হওয়া—নব নব আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত না হওয়া—আত্মসংযত ও আত্ম-সাম্যভাবাপন্ন হওয়া—সমবেত অনুভূতি সমূহের মন্ত্রণা সভায়, যেখানে প্রত্যেক কার্য্য সম্যক্ আলোচিত ও ধীরভাবে অবধারিত হইবে, সমবায় সিদ্ধান্ত-শাসিত হওয়া—এই সকল, আমাদের শিক্ষা, অন্ততঃ নৈতিক শিক্ষা, উৎপাদন করিতে প্রয়াস পায়।"

সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য, কেবল মাত্র কার্য্যে নহে, বাক্যেও মানবের সংযত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অনেক সময়ে বাক্য, প্রহার অপেক্ষা কঠিনতর রূপে আঘাত করে; হস্তে ছুরিকা ব্যবহার না করিলে অনেক সময়ে তাহা ছুরিকার কার্য্য করে। অনেক সময়ে বাক্য তীক্ষ্ণ সূচীর ন্যায় অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া বিষম কষ্ট প্রদান করে। অনেক সময়ে বাক্য সুতীক্ষ্ণ তরবারির ন্যায় অন্যের হৃদয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, পাছে অন্যের হৃদয়ে আঘাত লাগে, এই ভাবিয়া তীব্র ও কঠিন বাক্য প্রয়োগের বাসনাকে সর্ব্বদা সংযত রাখেন। যিনি নির্ব্বোধ, তিনি যাহা ভাবেন, যথোচিত বিবেচনা না করিয়া তাহা বলিয়া ফেলেন; হয়ত তাঁহার ঐ প্রকার বিদ্রূপে বন্ধুকে হারাইয়া বসেন। বিজ্ঞের মুখ, তাঁহার অন্তঃকরণে; নির্ব্বোধের অন্তঃকরণ তাহার মুখে।

কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ নহেন; অথচ সহিষ্ণুতা ও আত্মসংযম না থাকায় তাঁহাদের কথায় ও কার্য্যে নিতান্ত অবিবেকীর ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উত্তেজনক্ষম অসাধারণ ধীশক্তি, প্রকৃতিগত ক্ষিপ্রচিন্তা ও তীক্ষ্ণধারে বক্রোক্তি সময়ে সময়ে তীব্র বিদ্রূপাত্মক বাক্য উদ্গিরণ করিয়া অশেষ ক্ষতি সম্পাদন করে। কত রাজনৈতিক ব্যক্তি এইরূপে অমূল্য বন্ধুত্ব হারাইয়াছেন; এমন কি অনেক সময়ে রাজ্যে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন, সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

মিলন-পথে

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অশোক সকাল বেলা বেড়াইয়া আসিয়া উমাকে ডাকাইয়া বলিল, "জেনে এলাম, আমাদের বাড়ীর আশে পাশে চার পাঁচ জনের বসন্ত হয়েছে।"

উমার ছেলে মেয়ে দু'টি বারান্দায় খেলা করিতেছিল, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই উমার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে শুষ্ক-কণ্ঠে বলিল, "তবে কি হবে দাদা? গাঁয়ের লোক যা, তাতো আমি জানি। তাদের দোষে শীগ্‌গিরই বসন্ত গাঁ-ময় ছড়িয়ে পড়বে। কি হবে দাদা?"

অশোক একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমাকে আর এখানে রাখতে আমার ভরসা হচ্ছে না দিদি। আজই তোমাদের চাঁদপুরে পাঠিয়ে দেব।"

"তা যেন হলো, কিন্তু তুমি?"

"আমার তো আজই যাওয়া হ'তে পারে না উমা।"

"না, না, সে আমি শুনব না। তোমাকেও যেতেই হবে।" বলিয়া উমা ছুটিয়া আসিয়া অশোকের হাত চাপিয়া ধরিল। তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া অশোক বলিল, "তোকে তো আজ পাঠাই। বাড়ীর একটা বন্দোবস্ত ক'রে আমি না হয় দু'চার দিন পরে বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা চ'লে যাব। সেখানে একটু কাযও আছে।"

উমা প্রথমে একথায় কিছুতেই সম্মত হইল না। অশোক ও বন্ধু মিলিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলায় অবশেষে ছেলে মেয়ে দু'টির কথা ভাবিয়া অশোককে দু'দিনের জন্ত ফেলিয়া যাইতে রাজি হইল।

অশোকের অনুরোধে সে তখনি যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু অশোক যে আজই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না, তাহারও যাইতে মন সরিতেছিল না। বৈকালে অশোক যাইয়া উমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। গাড়ীতে উঠিয়াও উমা সজল-নয়নে অশোকের হাত ধরিয়া আর একবার মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া গেল।

উমাকে রওনা করিয়া দিয়া অশোক অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরিবার পথ ধরিল। চলিতে চলিতে সে গোবিন্দ দাসের গৃহ-লগ্ন পথটিতে আসিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মাধবীদের বাড়ীর অতি নিকটেই এক জনের বসন্ত হইয়াছে। তাহারা ও মাধবী একই পুকুর ব্যবহার করে। দিনের আলোকে প্রকাশ্যে না পারিলেও রাত্রির অন্ধকারে সকলের অজ্ঞাতে রোগীর কাপড় ও খাওয়ার বাসন যে সেই পুকুরে ধোওয়া হয়, তাহাতে অশোকের কোন সন্দেহ ছিল না। বাঙ্গালীরা স্বাস্থ্যনীতি পালনে যে কতখানি অলস ও অজ্ঞ, তাহা অশোক উত্তম রূপেই জানিত।

অশোক পথে দাঁড়াইয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে বসিয়া ঠাকুর্দ্দা বোধ হয় জপ করিতেছিলেন, মাধবী তাঁহারই কাছে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে দাওয়ায় উঠিয়া ডাকিল, "মাধবী, মাধু!"

মাধবী আজ মোটে ইহা আশা করিতে পারে নাই। সে অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া দাওয়ায় আসিয়া বলিল, "কি?"

অশোক বলিল, "ঘরের মধ্যে ঠাকুর্দ্দা বোধ হয় জপ করছেন? আচ্ছা, এই খানেই একটা আলো নিয়ে এস, বড় অন্ধকার।"

মাধবী একটা আলো লইয়া আসিল। মৃদু আলোকেও অশোক দেখিল, এই পাঁচ ছ'দিনের মধ্যেই মাধবীর ঢল ঢলে মুখখানি শুষ্ক ও ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। সে উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া বলিল, "বাড়ীর পাশে বসন্ত, এখানে তো তোমার থাকা হ'তে পারে না। কালই এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। তৈরী হয়ে থেক।, মোহনগঞ্জের নদীর ওপারে

আমাদের একটা বাড়ী আছে জান। ঠাকুর্দ্দাকে নিয়ে সেখানে গিয়ে কিছু দিন থাক। আমিও পরশু কলকাতা যাচ্ছি।"

মাধবী সব কথা স্থির হইয়া শুনিয়া, নিশ্চিন্ত উদাসীন ভাবে বলিল, "ও বাড়ীর বসন্ত আমার কি করবে? আর ওখানে গেলেই বা কি? মোহনগঞ্জের ওপারে কি যম যেতে পারবে না? পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে!"

এই তত্ত্বকথা শুনিয়া অশোকের হাসি পাইল। বলিল, "ছেলেমানুষী এখন রাখ। কাল বঙ্ক ভোরে এসে তোমাদের ওখানে রেখে আসবে।"

"না, সে হতে পারে না অশোক দা।"

মাধবীর স্বরে দৃঢ়তার স্পষ্ট পরিচয় পাইয়া অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হ'তে পারে না মাধু?"

মাধবী জবাব দিল না, দৃষ্টি নত করিয়া কুঞ্চিত অঞ্চল লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। অশোক কিছু আন্দাজ করিয়া তীব্র-কঠিন-কণ্ঠে বলিল, "এ অনর্থক ভয় তোমার। আমার পয়সায় কেনা বাড়ীতে এই সময়ে থাকলে কেশব কিছু মনে করত না। তাকে আমি জানি।"

মাধবী তথাপি মৌন হইয়াই রহিল। মাধবীর মতের পরিবর্ত্তন করা অসাধ্য বুঝিয়া অশোক চলিয়া গেল।

অশোক বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জামা জুতা না খুলিয়াই হতাশ ভাবে একটা আরাম চৌকির উপর শুইয়া পড়িল। উমার অভাব তাহাকে পীড়িত করিয়াছে অনুমান করিয়া বঙ্ক তাহা দেখিয়াও কিছু বলিল না। ঘণ্টা খানেক পরে অশোক নিজেই উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া যখন খাইতে বসিল, তখন বঙ্ক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পরশুই তো আপনি কলকাতা রওনা হবেন। আপনার সঙ্গে—"

অশোক বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কোথাও যেতে পারব না, এইখানেই থাকতে হবে আমাকে। তোমরা সব চ'লে যাও।"

মনিবের স্বরে রাগের পরিচয় পাইয়া বঙ্ক আশ্চর্য্য হইয়া তখনকার মত নীচে চলিয়া গেল।

সাত আট দিনের মধ্যেই উমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল, গ্রামময় ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটিল। বসন্ত যেন মূর্ত্ত মহামারী হইয়াই গ্রামে দেখা দিল। যাহারা সুস্থ ছিল, এবং পৈতৃক প্রাণের মায়া অন্যের প্রাণের মায়ার চেয়ে কম মনে করিতে পারিল না, তাহারা সকলেই গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়া গেল। কোন কোন বাড়ী বা একেবারে শূন্য পড়িয়া খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল, আর কোন কোন বাড়ীতে বা অনন্যগতি পিতামাতা অথবা স্ত্রী, রোগাক্রান্ত সন্তান বা স্বামী লইয়া পড়িয়া রহিল। যে দু'একজন বাড়ীর মায়া ছাড়িতে না পারিয়া রহিয়া গেল, তাহারাও ভয়ে বাড়ীর বাহির হইতে পারিত না।

রোগীর আর্ত্তনাদ এবং মৃতের আত্মীয়ের বিলাপ ছাড়া গ্রামে প্রায় শব্দ শুনা যাইত না। এই রোগটাকে পল্লীবাসীরা যে পরিমাণ ভয় করিত, ঠিক সেই পরিমাণে যদি রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তি পাওয়ার এবং রোগীর সতর্ক সাবধান শুশ্রূষার উপায় জানিত, তাহা হইলে গ্রামটা বোধ হয় এমন অসহায় হইয়া পড়িত না। যে মরিতে লাগিল, সে প্রায় অচিকিৎসায়, অশুশ্রূষায়; আর যে বাঁচিয়া উঠিল সে পিতৃ পুণ্যের জোর ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারিল না। রাস্তা প্রায় জন-শূন্য হইয়া পড়িল, হাট বাজার বন্ধ হইয়া গেল।

অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করিয়া মাধবীর বুকও ভয়ে শুকাইয়া উঠিল। সে নিজের অপরিণামদর্শিতাকে শত ধিক্কার দিয়া, একদিন অশোকের কাছে গেল। দুপুর বেলা অশোক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাধবী তাহাকে ঠেলাঠেলি করিয়া জাগাইয়া দিল। উমা যাইবার পর মাধবী আর আসে নাই। অশোক বেশ একটু বিরক্ত স্বরেই বলিল, "কাঁচা ঘুমে জাগালে কেন? হয়তো মাথা ধরবে।"

মাধবী বলিল, "তা ধরে ধরবে। তুমি উঠে ব'সে আমার কথা শোন।"

অশোক অনিচ্ছুক ভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "বল।"

"চল, আজ আমরা কলকাতা যাই।"

ইচ্ছা হ'লে তুমি যেতে পার, তার জন্যে আমাকে জাগাবার কি দরকার ছিল?

"বাঃ! আমি একলা যাব নাকি?"

"একলা যাবে কেন? তোমার বাহন ঠাকুর্দ্দা তো আছেনই; দরকার হ'লে বঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। তা হলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। সবাইকে বিদায় করেছি, ওকে কিছুতে পারলাম না।"

"তুমি যাবে না?"

অশোক শক্ত হইয়া বলিল, "না।"

মাধবী ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "না কেন?"

অশোক বলিল, "আমার ইচ্ছা;"

তারপর একখানা বই খুলিয়া লইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। মাধবী টান মারিয়া বইখানা মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া বলিল, "তুমি এই সময়ে আমার ওপর সব রকম শোধ তুলবে নাকি ভেবেছ?"

"শোধ আবার কি?" বলিয়া অশোক বইখানা তুলিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

এই একেবারে নূতন কঠিন ভাবটা দেখিয়া আজ মাধবী রাগ করিতে ভরসা করিল না। সে অশোকের পা জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমাকে এই একটি বারের জন্যে মাপ কর।"

অশোক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, করলাম; কিন্তু এ শুধু বঙ্কু আর ঠাকুদ্দার জন্যে, জেনে রেখ।"

মাধবী উঠিয়া মাথা নাড়িয়া হাসিয়া বলিল, "তা আমি জানিগো জানি। তোমার সঙ্গে কি কি জিনিস যাবে, ঠিক করিগে। আর তো বেশী সময় নেই।"

ছয় মাস পূর্ব্বের মত মাধবী আজ আবার এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশোকের প্রবাসের দরকারী জিনিসগুলা গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিল। তারপর বঙ্কুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিধুঠাকরুণ তো গ্রাম ছাড়া, এ ক'দিন কি খেলে তোমরা?"

বঙ্কু দুঃখ করিয়া বলিল, "সে আর কি বলব দিদি? কত খুঁজলাম, রান্নার লোক তো পেলামই না। আমি তো নিজেই রেঁধে খাই। কিন্তু বাবর অবস্থা দেখলে কান্না আসে। কোনমতে দুটো ভাতে ভাত রেঁধে নেন, তা কোন দিন বা গ'লে ফেনের সঙ্গে মিশে যায়, কোনদিন বা আধ সেদ্ধ হয়। রাত্তিরের খাবার তো দু'একটা ফল টল; একটু খানি দুধ। কত বল্লাম কত সাধলাম, কোনমতেই বাড়ী ছাড়তে রাজি হলেন না।"

কোনমতে অশ্রু দমন করিয়া মাধবী বাড়ী গেল, কিন্তু গিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ঘণ্টা দুই পরে অশোক দেখিল, মাধবী একখানা ঢাকা দেওয়া রেকাবী লইয়া ঘরে ঢুকিল। জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি মাধু?"

মাধবী রেকাবীখানা সযত্নে সাবধানে রাখিতে রাখিতে বলিল, "খানকতক লুচি আর একটুখানি মোহন ভোগ। রাত্তির ন'টায় তো গাড়ী, কিছু খেয়ে তো উঠতে হবে।"

অশোক বলিল, "তোর হাতে খেলে আমার জাত যাবে না?"

মাধবী বলিল, "না, তা যাবে না। দোকানীর হাতের চেয়েও আমার হাত খারাপ নাকি? গোপনে ভাত খেলেও তো তোমাদের জাত যায় না।" বলিয়া মাধবী হাসিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অশোক উঠানে পাইচারি করিতে করিতে ঠিক করিল, মাধবীকে কলিকাতায় রাখিয়া সে ফরিদপুরে যাইয়া তাহার বন্ধুগৃহে বেড়াইয়া আসিবে। কলিকাতা যাত্রার তখন সমস্ত আয়োজন হইয়া গিয়াছিল, বঙ্কু গাড়ী ডাকিবার জন্য প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক দ্রুতপদে আসিয়া অশোকের পায়ের কাছে কোন মতে আপনাকে ফেলিয়া দিয়া, বুক ফাটা কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবু আমার ছেলেটিকে রক্ষা কর।"

অশোক চিনিল, সে তাহার প্রজা রামধনের স্ত্রী। স্ত্রীলোকটির দেহ কাপড়ে ঢাকা থাকিলেও মুখ দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তাহারও দেহে বসন্ত আশ্রয় লইয়াছে। অশোক সভয়ে পিছাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেরও কি বসন্ত—"

"না, না, বাবু, মায়ের অনুগ্রহ হয় নি তার। কিন্তু তার বাপের এমন অবস্থা যে আর কোন আশা নেই। তার জন্যে ভয় কি? আমারো হয়েছে, একসঙ্গে যেতে পারব। কিন্তু আমার গোপালের কি হবে? কাল থেকে দোরে দোরে ঘুরেছি, কত কেঁদেছি, কেউ তাকে একটু ঠাঁই দিতে চাইলে না। তুমি তাকে রক্ষা কর বাবু।" —বলিয়াই সেই স্ত্রীলোকটি ঘাসের উপর পড়িয়া এমন ছট ফট করিতে লাগিল যে, ছেলের আশ্রয়ের জন্য সে এখনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। শুধু মায়ের প্রাণ বলিয়াই সে এতখানি ছুটিয়া আসিতে পারিয়াছে। সন্তান সর্ব্বস্ব মাতৃহৃদয়ের এই মূর্ত্তিমতী ব্যাকুলতা অশোককে বিকল করিয়া তুলিল। স্বামী স্ত্রী দুজন দুই বিছানায় পড়িয়া, সেবা করিবার কেহ নাই, আশ্বাস দিবার কেহ নাই; মমতার শীতল

স্পর্শ কাহারও গায় হাত বুলাইয়া দেয় না। ছেলের চিন্তা রোগার্ত্ত পিতামাতার রোগযন্ত্রণা দশগুণ বাড়াইয়া দিয়া মরণ নিকটতর করিয়া দিতেছে। অশোক শিহরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "তুমি যাও, ভয় নেই, আমি তোমার ছেলের ভার নিলাম।"

এই অভয় বাণী স্ত্রীলোকটিকে মৃত্যুর কি আনন্দময় অভয় মূর্ত্তিই দেখাইল! তাহার চক্ষু দেখিয়া অশোক তাহা অনুমান করিতে পারিল। তাহার ক্রন্দন থামিয়া গেল। সে মুহূর্ত্তকাল অশোকের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, অশোক যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানের ধূলি লইয়া বুকে কপালে ও মাথায় দিয়া আবার তেমনি দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে অশোক যখন একজন চিকিৎসক ও একজন শুশ্রূষাকারী লইয়া রামধনের বাড়ী পৌঁছিল তখন দেখিল, রামধনের স্ত্রী তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিতেছে "আর ভয় কি? গোপালকে বাবুর ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। এস, আমরা নিশ্চিন্দি হয়ে আগের মত ঘুমিয়ে থাকি।"

রামধন অনেক চেষ্টা করিয়া কম্পিত শিথিল হাতখানা স্ত্রীর গলার উপর রাখিয়া জড়িত ক্ষীণ কণ্ঠে কি বলিল বুঝা গেল না, কিন্তু তাহার শীর্ণ গণ্ড বহিয়া জল পড়িল তাহা দেখা গেল। এই করুণ মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য দেখিয়া অশোক বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

অশোক যখন রামধন ও তাহার স্ত্রীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতেছিল, তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মাধবী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বঙ্কু, এ কি কাণ্ড তোমাদের? এখনো গাড়ীর খোঁজ নেই? ট্রেণ ধরবে কি করে? বাবু কৈ?"

উত্তরে বঙ্কু যাহা বলিল তাহা শুনিয়া মূর্চ্ছাতুরার মত মাধবী মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অশোক মাধবীর ভূলুণ্ঠিত মস্তকের উপর হাত রাখিয়া বলিল, "ভয়ে থাকলে তো এখন আর চলবে না মাধু, ভয়কে ভয় করলেই সে বেশী চেপে ধরে। ওঠ।"

অশোকের স্পর্শ ও কথা মাধবীর নিঃসংজ্ঞ দেহ মনে সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিল। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "তুমি কি শুধু আমাকে সাজা দিবার জন্যেই—"

কথাটা আর সে শেষ করিতে পারিল না, কিন্তু অসমাপ্ত কথাটা বুঝিতে অশোককে বেগ পাইতে হইল না। সে বলিল, "এমন কথা কেন বলছ? রামধনের কান্না যদি দেখতে আর তার কথা যদি শুনতে, তবে তুমিই উদ্যোগ করে আমাকে তাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে। কি অবস্থাই দেখলাম তাদের! রামধন আজ রাত কাটায় কি না সন্দেহ; তার স্ত্রীর জীবনেরও কোন আশা নেই। দেখ, এখন তাদের ছেলেটিকে বাঁচাতে পারি কি না। আমি তার মাকে আশ্বাস দিয়েছি। আট বছরের ছেলে, বোঝে সব, সে কি বাপ মাকে ছেড়ে আসতে চায়! বঙ্কুর ঘরে বসে কি রকম কাঁদছে সে! দেখতে পারলাম না তাই চলে এলাম।"

মাধবী উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, "গোপালকে আমার ওখানে নিয়ে যাব?"

অশোক একটু ভাবিয়া বলিল, "না, ঠাকুর্দ্দা আছেন! ওর বসন্ত হবারই ত ষোল আনা সম্ভাবনা।"

মাধবী হাসিল। বলিল, "শুধু আমি বাড়ী থাকলে আপত্তি করতে না, কেমন? আমার প্রাণের একটুও দরদ নেই তোমার।"

অশোক স্মিতমুখে মাধবীর পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "না।"

"এতবড় মিথ্যা কথাটা বলতে একটুও বাধল না?"

"মিথ্যা কি করে বুঝলে? কিন্তু ভয়ে যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে দেখছি। রামধনের ওখানে যাওয়ার সময়ে আমি যে তোমার সাহসের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিলাম।"

"এখনো তা করতে পার"—বলিয়া মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর অনেকক্ষণ বসিয়া গোপালকে শান্ত করিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া বিছানা করিয়া শোওয়াইয়া বাড়ী চলিল। বঙ্কু আলো লইয়া সঙ্গে গেল।

এত রাত্রি হইল, তবু মাধবী আসিল না; ঠাকুর্দ্দা উদ্বিগ্ন ভাবে উঠানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ন'টার ট্রেণে কলিকাতা যাওয়ার কথা। অথচ ন'টার মধ্যে মাধবীর দেখা নাই।

মাধবী তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "ঠাকুর্দ্দা, তুমি আমার জন্তে খুব ভাবছিলে বোধ হয় ?"

ঠাকুর্দ্দা মাধবীকে সুস্থ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মুখে বলিলেন, "হাঁ দিদি।"

"তা হ'লে তোমার কিসের বৈরাগ্য ?"

"মায়াময়ীর কাছে বৈরাগ্য কি টিকতে পারে ?"

"আমি তোমাকে বৈরাগ্য ভ্রষ্ট করছি, তাই বল।"

"না দিদি, তা তুমি পার না। বৈরাগ্য আমার ছিল না, চাইও নি।"

"আজ আর আমাদের কলকাতা যাওয়া হল না।"

"তাতো দেখছি, কিন্তু কেন দিদি ?"

"বলছি। বঙ্কু, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে কেন ?"

বঙ্কুকে বিদায় দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ঠাকুর্দ্দাকে সব কথা বলিল। শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "অশোক বাবু এখানে থাকলে যে এ রকম একটা কিছু ক'রে বসবেন, তা জানতাম। তিনি তো এমন প্রার্থনা কিনা করতে পারেন না।"

কথাটা মাধবীর বুকে যাইয়া বিঁধিল। সে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেছিল ঠাকুর্দ্দাকে খাওয়াইয়া নিজে কিছু খাইয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িল।

পরদিন সে অশোকের বাড়ী যাইয়া শুনিল, রাত্রেই রামধন ও তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু, কাছেই ছেলের কাছে মৃত্যু সংবাদ গোপন করা যায় নাই, শোকার্ত্ত ছেলেটির ছটফটানি দেখিয়া দর্শক মাত্রের চক্ষুই সিক্ত হইয়া উঠিল।

পরবর্ত্তী পাঁচ সাত দিন মাধবী গোপালকে লইয়া এমনি বিব্রত হইয়া পড়িল যে, তাহার ভয় করিবারও অবসর রহিল না। কিন্তু সে জন্য ভয় দূরে থাকিল না, অশোকের গায়ে বসন্ত দেখা দিল। এবার অশোক চাহিয়া দেখিল, অশ্রান্ত সেবারতা মাধবীর মুখে ভয়ের লেশও নাই।

মাধবীর ভার লঘু করিবার জন্য ঠাকুর্দ্দাও মাঝে মাঝে অশোকের শয্যার অপর পার্শ্বে আসিয়া বসিতে লাগিলেন দেখিয়া অশোক অত্যন্ত ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। অশোকের পীড়ার প্রথম দিন হইতেই মাধবী নিজ বাড়ী ছাড়িয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর্দ্দা আসিয়াও অশোকের গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন। মাধবী বলিয়াছিল, "ঠাকুর্দ্দা, তুমি এখন আখড়ায় যাও।"

ঠাকুর্দ্দা জবাব দিয়াছিলেন, "কায কি দিদি ? এখানে তবু তুমি আমাকে একটু দেখবে, সেখানে কে দেখবে ?"

মাধবী বলিয়াছিল, "কেন, তোমার ঠাকুর।"

ঠাকুর্দ্দা উত্তর দিয়াছিলেন, "তিনি এখন এখানেই জেগে আছেন।"

মাধবী আর কিছু বলিল না, ঠাকুর্দ্দা রহিয়া গেলেন।

সেদিন বোধ হয় অশোকের রোগ যন্ত্রণা খুব বাড়িয়াছিল। সে চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়াই পড়িয়া ছিল। মাধবী তাহার বিছানার উপর বসিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখ পানে চাহিয়া ছিল। অদূরে ঠাকুর্দ্দা বসিয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি খুব যাতনা বোধ করছ ?"

তাহার উদ্বেগ, আশঙ্কা ও বেদনা অনুভব করিয়া অশোক মৃদু কণ্ঠে বলিল, "না।"

তারপর একটু থামিয়া নিমীলিত নেত্রেই বলিল, "যাতনা তো তুচ্ছ কথা, মরণও যদি আসে আজ, সে আমার জন্তে আনন্দ ও অভয় নিয়েই আসবে। মাধু, তুমি কোন দুঃখ ক'রো না, উমাকেও দুঃখ করতে বারণ ক'রো।"

মাধবী মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল, ঠাকুর্দ্দা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মাধবী নত হইয়া অশোকের মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উমাকে খবর দেব ?"

"না, দরকার নেই। ছোঁয়াচে রোগ, ছোট দু'টি ছেলে মেয়ে। শুধু তুমি আমার কাছে থাক।"—বলিয়াই হাত তুলিয়া অশোক মাধবীর মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। মাধবী বহু কষ্টে উচ্ছ্বসিত রোদন সম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল। অশোক বলিল, "আলো আড়াল ক'রে রেখেছ কেন ? আমি তো তোমার মুখ খানি ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছিনে। আলোটা আমার কাছে আন।"

অশোককে চুপ করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিতে দেখিয়া মাধবী আলোটা নামাইয়া আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। উঠিয়া আড়াল সরাইয়া আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। উজ্জ্বল আলোক ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল। অশোক তাহার আলোক দীপ্ত মুখ পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "মোটাসোটা তো কোনদিনই ছিলে না, এখন আরো কত রোগা হ'য়ে গেছ। কিন্তু তবু কি সুন্দর হয়েছ দেখতে !"

এই অবস্থায়ও মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অশোক

দুই চক্ষু ভরিয়া সেই অরুণাভা পান করিতে করিতে বলিল, "যাও, এখন একটু গড়িয়ে নাও গে। বন্ধুকে ডেকে দিয়ে যাও। না দিলেও পার, আমি তো এখন ভালই আছি।"

মাধবী ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিয়া, অশোককে ঔষধ খাওয়াইয়া সযত্নে সাবধানে তাহার মুখ মুছাইয়া দিল। তার পর পায়ের কাছে বসিয়া তাহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ভাল যদি থাক, একটু ঘুমোও দেখি; কথা বলো না।"

অশোকের ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কথা বলিবার ও শুনিবার লোভ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল; কিন্তু মাধবী তাহাকে বেশী কথা বলিতে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিল। তাই সে সুশীল বালকের মত চক্ষু বুজিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "আচ্ছা, চেষ্টা করছি।"

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে সে নিজের অঙ্গীকারের কথা ভুলিয়া ডাকিল, "মাধু!" মাধবী তাহার মুখের কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকছ, কি চাই?"

অশোক বলিল, "একটা কথা বলতে চাই। আচ্ছা, সব মানুষের মধ্যেই কি এমন কিছু আছে, যা মরণ ভয়কে এমনি তুচ্ছ ক'রে বুক ফুলিয়ে চ'লে যেতে পারে?"

মাধবীর বুক উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শাসনের সুরে বলিয়া উঠিল, "আবার কথা!"

"এই চুপ্‌ করছি" বলিয়া অশোক তাহার শিথিল হাত দু'খানা মাধবীর কোলের উপর রাখিয়া চক্ষু বুজিল।

এমনি করিয়া কয়েক দিন কাটিল। চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার সুবন্দোবস্তে অশোক তিন সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ রোগমুক্ত হইয়া উঠিল। রোগের আক্রমণ তেমন প্রবল হয় নাই, কিন্তু তবু তাহার জন্য তিনটি প্রাণের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। তাহাকে রোগমুক্ত দেখিয়া মাধবী নিজের গৃহে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া অশোক তাহাকে আরও দু' চার দিন থাকিয়া যাইবার জন্য সকাতরে মিনতি জানাইল। মাধবী তাহা উপেক্ষা করিতে পারিল না।

প্রায় এক মাসের মধ্যে মাধবী চুলে তৈল ও চিরুণী স্পর্শ করাইবার অবসর পায় নাই। আজ দুপুর বেলা সকলের খাওয়া দাওয়া চুকিয়া গেলে সে তৈল ও চিরুণী লইয়া চুল ঠিক করিতে লাগিল। দেওয়ালে বৃহৎ দর্পণ, মাধবী তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া তৈলসিক্ত চুল আঁচড়াইতেছিল। খানিক পরে দর্পণ মধ্যে অশোকের প্রতিবিম্ব পড়ায় মাধবী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "শুয়ে ছিলে, উঠে এলে কেন আবার?"

কক্ষতলে একটা মাদুর পাতা ছিল। অশোক তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ঘুম এলো না, তাই গল্প করতে এলাম।"

"আমার এখন কায আছে, শুয়ে থাকগে।"

"গল্প করতে করতেও ও-কাজটা চলতে পারে। আচ্ছা, আমার মুখের দাগগুলি কি যাবে না?"

"বেশী তো হয় নি, যাবে বৈকি। কিছু মাখলে টাখলেই যাবে বোধ হয়। কিন্তু তোমার না যাওয়াই উচিত। এত দিন পাত্রী দেখে দেখে ব'লে এসেছ, 'পছন্দ হলো না।' এবার তারা পাল্টে বলতে পারবে, 'বর পছন্দ হলো না।' তা হ'লেই তোমার উচিত শাস্তি হয়।"

"সে পক্ষে তোমারও কিছু সুবিধে দেখছিনে। তুমি যে আমার অসুখ হয়ে অবাধ এখানে পড়ে আছ, তা কেশব শোনেনি ভেবেছ নাকি?"

"শুনলেই বা কি? আমি বোষ্টমের মেয়ে, আমার কিছু না জুটলে ভিক্ষা তো জুটবে। কিন্তু তোমার কি গতি হবে, তাই ভাবছি।"

"ভাবনা কি? অগতির গতি যিনি তিনি একটা গতি করবেনই। আর ভেবেছ নাকি যে তোমরা ভেলা না হ'লে আমরা সংসার-নদী পার হতে পারিনে?"

"বেশী কথায় কায কি, তার প্রমাণ তো সত্য সত্যই পেয়েছ?"

"তুমি কাছে না থাকলেও আমি সেরে উঠতাম। ঠাকুদ্দা আর বন্ধু তো ছিল।"

"এই রকম করে কথা বাড়িয়ে আমায় কায করতে দেবে না দেখছি।"

"আচ্ছা, এখন আমি উঠছি। দশ মিনিটের মধ্যে আমায় ঘরে যেও কিন্তু, বই পড়ে শোনাতে হবে।" বলিয়া অশোক চলিয়া গেল।

মাধবী চুল আঁচড়ান শেষ করিয়াও সেইখানে মাদুরের উপর চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিল! ঘড়ি দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে অশোক যে সেই ঘরে আসিয়া ফিরিয়া গেল, তাহা

সে জানিতে পারিয়াও চোখ মেলিল না! এই সঙ্গলোভটাকে সে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস করিতেছিল না।

সন্ধ্যার পরে মাধবী একটা ছোট কৌটা হাতে করিয়া অশোকের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এই নাও অষুধ। ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে আনিয়েছি। এটা মুখে মাখলেই দাগগুলি উঠে যাবে।"

অশোক বলিল, "না, ও আমি চাইনে।"

বিস্মিত হইয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, রাগ নাকি?"

গাঢ় স্বরে অশোক জবাব দিল, "না মাধু, রাগ নয়। অসুখে পড়ে আমি যা পেয়েছি, জগতে বুঝি তার তুলনা নেই। আমার প্রাপ্তির স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এই দাগগুলি থাকতে দাও।"

মাধবী নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে আহারাদি করিয়া অশোক শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে মাধবীও সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কাল আমি বাড়ী যেতে চাই।"

অশোক সকল দিক ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই যেও।"

এত সহজে নিষ্কৃতি পাইবে, মাধবী তাহা আশা করিতে পারে নাই। সে একটু আশ্চর্য্য হইল। বলিল, "তুমি এখন দিন কতক উমাদিদির কাছে গিয়ে থাক না।"

"সেজ কাকাকে কথা দিয়েছিলাম, তাঁর শালার মেয়েকে দেখতে যাব। অসুখের জন্যে দেরী হয়ে গেল, এখন তো যেতে হবে।"

"পছন্দ যখন হবে না তখন এ কষ্টভোগ কেন?"

"এখানেও পছন্দ হবে না, তা কি ক'রে জানলে?"

"তা আমি জানি। বিয়ে যখন করবার ইচ্ছা হবে, তখন ক'রো। এখন অনিচ্ছায় অন্যের অনুরোধে ছল করতে যেও না।"

অশোকের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তোমার কথাই ঠিক। সত্যিই তো আমি ছল করতে যাই। আর যাব না।"

মাধবী পিছন ফিরিয়া খোলা জানালাগুলি বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "কিন্তু মনটা স্থির ক'রে যদি বিয়ে করতে পারতে, তা হ'লে সুখী হতাম।"

"সত্যি বলছ, সুখী হ'তে?"

এমনি সুরে অশোক কথাটা বলিল যে, মাধবী সহসা জবাব দিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে জানালাগুলা বন্ধ করিয়া অশোকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর স্থির শান্ত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "হাঁ সত্যিই বলছি।"

মুহূর্ত্তে সর্ব্বস্ব-হারার মৌন বেদনায় অশোকের মুখ কালো হইয়া গেল। মাধবী সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিল, "শুয়ে পড় এখন; এই শরীরে রাত জাগা সইবে না।"

অশোক তৎক্ষণাৎ শয়ন করিল। মাধবী মশারি ফেলিয়া, ধারগুলি ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্ত

চেতন ও অচেতন বাদ

প্রাচীন কালের ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানিগণ মনঃসত্তাকেই (mind-substance) এই স্থূল জগতের নির্ম্মাণ উপাদান বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। "মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে"—মনই বিকার ও পরিণাম লাভ করিয়া সৃষ্টিকে উৎপন্ন করিতেছে, ইহাই হইতেছে আমাদের প্রাচীন সিদ্ধান্ত। এবং এই সিদ্ধান্ত কোন্ দিক হইতে ও কিরূপে ন্যায়তঃ ও বিচারতঃ প্রতিপন্ন হইবার দাবি করিয়াছিল তাহারও কথঞ্চিৎ আভাস যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে।

মনঃসত্তাকে এতরূপে জগৎ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে আমরা বর্ত্তমান যুগের দুইটি পরস্পর-বিরোধী দর্শন তন্ত্রের এতই প্রত্যাসন্ন প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি যে, সেই দুইটি নব্য দর্শনবাদকে উপেক্ষা করিয়া আমাদের অগ্রসর হইবার পথ দেখা যাইতেছে না। সেই দুইটি দর্শনবাদের নাম

হইতেছে spiritualism (কিংবা idealism) ও materialism। আমাদের বিবেচনায় এই দুইটি পাশ্চাত্য-বাদকে যথাক্রমে "চেতন বাদ" ও "অচেতন বাদ" বলিয়া অনুবাদ করা অসঙ্গত হয় না। অতএব এই প্রবন্ধে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, আমাদের পুরাতন দর্শনের জীর্ণ তরীকে, দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত অচেতন-বাদের ঘূর্ণীজল এবং বামাবর্ত্তে অবস্থিত চেতনবাদের উত্তুঙ্গ পাষাণের মধ্যবর্ত্তী কোনও সংকীর্ণ পথ দিয়া চালানো সম্ভব কি না। সেই জন্যই এই দুইটি পরিচিত দর্শনবাদের অবতারণা করা হইতেছে। এবং তাহার দ্বারা আরও একটু বেশী লাভের আশাও আমরা করিয়া থাকি। এতদুপলক্ষে ইহাও আমরা দেখিয়া লইতে চাহি আমাদের সেই যে পুরাণো সোণা,—তাহা বর্ত্তমান যুগের চেতন ও অচেতন বাদের বিভিন্ন নিকষে যথার্থই খাঁটী জিনিস বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, না তাহা কোন এক অবৈজ্ঞানিক যুগের গিল্‌টি করা মেকী বলিয়া প্রমাণিত হয়? এই প্রসঙ্গে প্রথমে অচেতন বাদ বা materialismএর কথাই উত্থাপন করিতেছি, আশা করি দৈর্য্যশীল পাঠক, দেশীয় দর্শনের ধানভানা প্রসঙ্গে, যৎকিঞ্চিৎ বৈদেশিক শিবের গান বরদাস্ত করিবেন।

অচেতন-বাদ।

Materialismএর নাম শুনিলেই অনেক ধর্ম্মপ্রাণ সাধুজন আতঙ্কে শিহরিত হইয়া উঠেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাতে শিহরণের বিষয় কিছুই নাই। অথবা ইহা কোনই সত্যধর্ম্মের প্রাণ-ঘাতী সংক্রামক ব্যাধি নহে। ইহা বর্ত্তমান যুগের উন্নত বিজ্ঞানের আলোকে, জগতের চরম সত্য নির্দ্ধারণের এক অকুণ্ঠিত ও উপরোধ বিহীন চেষ্টা মাত্র। সেই চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া, যাহারা নিজেদের সুকোমল ধর্ম্ম-প্রাণকে এক অস্পৃশ্যাম্পৃশ্য শুচিতার মধ্যে রক্ষা করিতে যত্নশীল, তাহাদের সেই শুচিতাই কোনও দিন সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইবার সমধিক সম্ভাবনা। কারণ উদার আকাশ-পথবাহী সবিতৃদেবের চরাচরব্যাপী মুক্ত রশ্মি-ধারা যেখানেই ব্যাহত বা নিরুদ্ধ হয়, সেইখানেই জীবনান্তকারী রোগের জীবাণু সকল তাহাদের সূতিকাগৃহের ভিত্তি-পত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, পরমর্ষিগণ-বিহিত আমাদের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞান এমন কোনই ব্যাধিত কোমল-প্রাণ তত্ত্বজ্ঞান নহে। তাহার উন্নত প্রশস্ত ললাটে, ও বিস্তৃত বক্ষের উপর নবযুগের সমস্ত ভাত বাতই অনায়াসে সহ্য হইয়া থাকে।

এ যুগের অচেতন-বাদের উৎপত্তি হইতেছে বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক বিদ্যার সূত্রপাত হইতে। বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানাচার্য্যগণ অবিসম্বাদী প্রমাণ ও পরীক্ষা বলে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ (normally) মনের যে কোন অভিচেষ্টা সম্ভব, তাহা সমস্তই জীবের সর্ব্বায়ব ব্যাপী শিরা বিতান ও মেরু ও মস্তিষ্কগত শিরাতন্ত্র ও ঝিল্লীকূপ সকলের (nerve cells) কোন না কোনরূপ রাসায়নিক বৈদ্যুতিক, বা অন্যবিধ জড়-ক্রিয়া ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। সে ক্রিয়া, ঠিক মত কিরূপ ক্রিয়া তাহা হয়তো আজও সম্পূর্ণ রূপে জানা যায় নাই, কিন্তু তাহা যে অবশ্যই কোন না কোন প্রকারের জড়-ক্রিয়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব, আমাদের ইচ্ছাদ্বেষাত্মক প্রবৃত্তিই বলুন, কিংবা রূপরসাদির বোধই বলুন, অথবা সুখ দুঃখের অনুভূতিই বলুন, এ সমস্তই আমাদের শিরা ও মস্তিষ্ক-বিধানের (nervous system) বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম ও অবস্থার সহিত সংযুক্ত ও সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

মস্তিষ্ক বিধানের কর্ম্ম হইতে মনো-বিধানের কর্ম্ম কিরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এই হইতেছে অচেতন-বাদের বিচার্য্য ও সমস্যা। এবং এই সমস্যার বিচার প্রসঙ্গে অচেতন-বাদিগণ আমাদিগকে একাধিক মীমাংসা দান করিয়া থাকেন। এই বিচারের প্রারম্ভযুগে, আমরা দেখিতে পাই,* অচেতন-বাদী নবীন মস্তিষ্ক বিজ্ঞার অসংযত আবেগে বলিয়াছিলেন —"The Brain secretes thought, just as the Liver secretes bile." কিন্তু উত্তর-কালীন বিচারে তাহার এ প্রতিজ্ঞা টিকিতে পারে নাই। কারণ,—চিন্তা-রস ও পিত্ত রস, এই দুই রসকে যখন রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল, তখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া গেল, এই দুই রস কোনই সম-জাতীয় রস নহে,—তাহারা পরস্পর "অ-স্ব রস।" কেন,—ইহার উত্তরে মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ রসায়ন-বিৎ Wilhelm Wandt বলিয়াছেন—"We can prove that the bile arises in the liver by a chemical process, which in part at least,

we can follow in detail. But cerebral process gives us no shadow of indication as to how our mental life comes into being.... No system of cosmic mechanics can make it plain to us how a motion in the brain can pass over into a sensation or feeling."

অগত্যা চিন্তা-রসকে মস্তিষ্ক-রস বলিয়া ব্যাখ্যা করা আর চলিল না। এবং অচেতন-বাদের বড় বড় শূর বীরকেও মানিতে হইল, মস্তিষ্কতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে কোনই সংযোগের পরিদৃশ্যমান সেতু বন্ধ নাই। অথচ উভয় তত্ত্বের মধ্যে এক অবিসম্বাদী সম্বন্ধও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তখন অচেতন-বাদ, সেই সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব হইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্য "থিওরি" উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রথম "থিওরি" করিলেন তাহার নাম "Theory of Psycho-neural parallelism."

এই থিওরি কর্ত্তারা ধরিয়া লইলেন যে জীব হইতেছে এক স্বয়ং চলমান (automaton) যন্ত্র স্বরূপ। এবং তদনুসারে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল এই যে, জীবের তাবৎ কর্ম্মই মস্তিষ্ক-বিধান হইতে স্বতঃ (automatically) নিষ্পন্ন হইতেছে। তাহার জন্য জ্ঞানের (consciousness) কোনই অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন নাই। জীবের সমস্ত কর্ম্মই যে জ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবে মেরু ও মস্তিষ্ক-বিধান হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ইঁহারা নিম্ন-লিখিত পরীক্ষা (Experiment) দেখাইয়া থাকেন। একটি জীবিত ভেকের শিরশ্ছেদ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ জীবটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায় না,—কিন্তু এককালীন তাহার চৈতন্য (consciousness) লুপ্ত হয়। সেই সময় যদি ঐ চতুষ্পদ সরীসৃপের অঙ্গে এক ফোঁটা অ্যাসিড্ ফেলিয়া দেওয়া যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় জ্ঞান ব্যতিরেকেও ঐ জন্তুটি, তাহার একটি পা দিয়া ঐ অ্যাসিড্ ফোঁটাটি মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। আবার সে পা'টি ধরিয়া ফেলিলে, সে যেন বিবেচনা পূর্ব্বক অন্য পা' দিয়া ঐরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। ছিন্নশীর্ষ সরীসৃপের এই যে জ্ঞান-ব্যতিরিক্ত কর্ম্ম, ইহা তাহার মেরুস্থিত শিরা-বিধান হইতে স্বতঃ যন্ত্রবৎ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অচেতন-বাদী এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন। এখানে ভেকের তথাকথি "জ্ঞান ক্রিয়া" সম্বন্ধে জ্ঞানের 'ব্যতিরেক" দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু ব্যাঙটির" মুণ্ড যখন বজায় ছিল তখন অবিকল ক্রিয়া সম্বন্ধেই জ্ঞানের "অন্বয়" দৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব ক্ষেত্রে, আমাদের নৈয়ায়িকগণের সুপরিচিত "অন্বয় ব্যতিরে ন্যায়' অনুসারে তাঁহারা বলেন, জ্ঞান মস্তিষ্ক কর্ম্মের কো নিত্য সহযোগী (concommitant) হইতেছে না। এ জ্ঞান ব্যতিরেকেও জীব কর্ম্ম করিয়া থাকে। অত তাঁহাদের মতে জ্ঞান ও মস্তিষ্ক কর্ম্মের মধ্যে কোনই পরস্পর কর্ম্ম-নির্ব্বাহক (inter-acting) সম্বন্ধ নাই। তবে কে সম্বন্ধ আছে? সে সম্বন্ধ হইতেছে পরস্পর হইতে নির্লি এক "Parallelism" বা সমান্তরাল-বর্ত্তিতার সম্বন্ধ, এ সেই সম্বন্ধবশে জ্ঞানের যদি অনুদয় হইত, তাহা হইলে জীবের জীবন-যাত্রার কোন বিশেষ হানি হইত না। কা জ্ঞান বিদ্যমান থাকিয়াও, তাহা মস্তিষ্ক-বিধানের সহিত নির্লি সমান্তরালে অবস্থিত থাকায়,—তাহার দ্বারা মস্তিষ্ক-কর্মে কোনই সহায়তা হয় না।

এই অদ্ভুত "থিওরি" যে অনেকেরই মনঃপূত হয় ন সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ এই মতে, জ্ঞান যদি স্ব ও নীরন্ধ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রহিল, এবং মগজের আবর মধ্যেই মগজকর্ম্ম ঢাকা থাকিল,—তবে তাহাদের ম কার্য্য-কারণের অতীত এক 'Parallelism" সম্বন্ধই সম্ভব হইল কিরূপে? অর্থাৎ আমাদের পরিচিত উপম ভাষায়, আপত্তি এই দাড়াইল যে,—বৈজ্ঞানিকের মস্তি পিঞ্জরে আবদ্ধ কাক যদি ঐ পিঞ্জরের মধ্যে বসিয়াই কণ্ট ফল ভক্ষণ করিল, তবে ঐ কাকের সমান্তরালে অব বহিঃস্থ জ্ঞান রূপী বকের চঞ্চুপুটে আঠা লাগিল কিরূপে অতএব এই Parallelism তত্ত্বের অন্য কোন ব্যাখ প্রয়োজন হইল, এবং সেই ব্যাখ্যার নাম হইল "Theory Psycho-physical parallelism." এই থিও নানান ভেদ আছে, কিন্তু Herbert Spencer প্রবর্ত্তি থিওরির এখানে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

তাঁহারা বলেন মস্তিষ্কবিধানের কর্ম্ম ও মনোবিধানে কর্ম্ম যে "parallelism" মাত্র, ইহা অবশ্যই আমাদে বাহ্য বিষয়ের ধারণা ও অন্তর্বিষয়ের ধারণার দিক হই

অস্বীকার করা যায় না, কারণ মস্তিষ্কের স্পন্দন ও কম্পনকে কখনই মনের সুখ দুঃখের ভাষায় অনুবাদ করা যায় না। অথচ তাহারা যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-বিহীন তাহাও বলা যাইতে পারে না। অতএব মস্তিষ্ক-বিধানের বাহ্য অচেতন গুণ ও কর্ম্ম সকল মনো-বিধানের সুখ দুঃখাদি ভাবের সহিত অবশ্যই কোন অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত ভূমিতে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব ইঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, জগৎ-সত্য হইতেছে এক অজ্ঞেয় ও অচিন্ত্য সত্য। এবং সেই সত্য, সমান্তরাল ব্যবস্থিত দুই বিভিন্ন আকারে (Appearance) আমাদের নিকট সর্ব্বদাই প্রতীত হইয়া থাকে। সেই অচিন্ত্য সত্য-বস্তুর এক দিকে পদার্থ সকলের যোগ ও গতি, তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগ, তাহাদের কম্পন ও স্পন্দনের, পদার্থ-বিজ্ঞানগত (Physical) বর্ণমালা আমরা পাঠ করিয়া থাকি। এবং তাহার সমান্তরাল-বর্ত্তী অন্য পৃষ্ঠায় আমাদের চেতন মনোবিধানের ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রের (Psychological) অক্ষর পরিচয় হইয়া থাকে। ইহাই হইতেছে তাঁহাদের "Theory of Psycho-physical parallelism."

"থিওরি" হিসাবে ইহাকে মন্দ উদ্ভাবনা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু "অজ্ঞেয় সত্তা", ভূতযোনির ন্যায় সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ ও অপ্রামাণ্য বিষয় বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইয়া থাকে। সেই জন্য এই অজ্ঞেয় জগৎ-বাদ বৈজ্ঞানিক মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইতে পারে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব, এই সমান্তরালবর্ত্তী দ্বৈত তত্ত্ব (dualism) কোনও জ্ঞেয় একত্বের (monism) মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে কিনা, ইহা হইতেছে আধুনিকতম যুগের অচেতন-বাদের বিচার্য্য সমস্যা।

এই যুগের অগ্রণী অচেতনবাদী হইতেছেন—Ernst Heckel। হেকেলের নাম বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত। জীবতত্ত্ব শাস্ত্রের (biology) তিনি একজন শ্রেষ্ঠতম আচার্য্য, এবং ডারুইন তত্ত্বের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত। হেকেল্ দেখাইয়াছেন জড় ও চেতনের মধ্যে কোনই জাত্যন্তর ব্যবধান নাই। চৈতন্য হইতেছে জড়েরই গুণ, এবং প্রত্যেক জড় পরমাণু হইতেছে চৈতন্য-গুণ-বিশিষ্ট। কারণ জড়ের মধ্যেও ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি চেতন গুণের আভাস পাওয়া যায়। যেমন,—যখন আমরা বলি রাসায়নিক সংশ্লেষণে দুইটি পরমাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, কিংবা রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাহারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, তখন আমরা অবশ্যই পরমাণু দ্বয়ের মধ্যে ইচ্ছা দ্বেষ স্বীকার করিয়া থাকি। তাহা না করিলে আমরা অন্য কি বলিয়া অণুদ্বয়ের ঐ আকর্ষণ ও বিকর্ষণকে বুঝাইতে পারি? সেই জন্য হেকেল্ প্রত্যেক পরমাণুর এক নাম দিয়াছিলেন—"Atom soul"। পাশ্চাত্যদর্শনবিৎ পাঠক, হেকেলের এই Atom soul এবং Leibnitzএর "Monad"কে একই জিনিস্ বিবেচনা করিবেন না। কারণ Leibnitzএর monad হইতেছে এক চৈতন্য পরমাণ্ মাত্র, কিন্তু Heckelএর Atom-soul হইতেছে atom রূপ পদার্থের (massএর) চৈতন্য-রূপ শক্তি (energy)। হেকেলের মতে পরমাণু সকলের ইচ্ছা দ্বেষ অবশ্যই তাহাদের অজ্ঞাত (unconscious) ইচ্ছা দ্বেষ বা অচেতন ইচ্ছা দ্বেষ। কিন্তু তিনি বলেন, চেতন ও অচেতন কোনই অত্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগী বিষয় নহে। যাহাকে আমরা অচেতন বলি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অতীব ক্ষীণমাত্রার চেতন! এবং সেই প্রক্ষীণ চৈতন্যই বিবৃদ্ধ মাত্রার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া স্ফুট চৈতন্য হইয়া থাকে। যে সকল পরমাণুর মধ্যে চৈতন্য শক্তি প্রস্ফুট হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে হেকেল্ তাহাদের নাম দিয়াছেন—"psycho-plasm"। এবং বলিয়াছেন জীবের দেহ ও শিরাবিধান-গত psycho-plasm সকল ক্রিয়াশীল হইয়া চেতন জ্ঞানকে নিষ্পন্ন করিতেছে।

হেকেলের এই চৈতন্য-শক্তি-বাদকে জর্ম্মনির বিখ্যাত রসায়ন-বিৎ Wilhelm Ostwald তাহার চরম পরিণামে উপনীত করিয়াছেন। Ostwald দেখাইয়াছেন পদার্থ বা দ্রব্য (= Mass) একটি স্বীকার্য্যতত্ত্ব (postulate) মাত্র, এবং শক্তিই (energy) হইতেছে তাহার চরম সত্তারূপ। অতএব চৈতন্য হইতেছে শিরা-বিধান সংক্রান্ত শক্তি (= nerve energy) মাত্র। এবং সেই energyই হইতেছে চেতন মন।

চেতন-বাদ।

এই অচেতন-বাদের বিরুদ্ধে, চেতন-বাদ (spiritualism) চারি দিক হইতেই আপত্তির অসি সমুত্থিত করিয়াছেন। এবং সেই আপত্তিকে অচেতনবাদ সর্ব্বথা সম্পূর্ণরূপে যে নিরস্ত করিতে পারিয়াছেন এ কথা কেহই

বলিতে পারেন না। ইহার দু'একটি উদাহরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অচেতন-বাদ প্রথমে বলিয়াছেন, কোন এক অচিন্ত্য জগৎ-সত্য, জড় ও চেতন দুই বিভিন্নরূপে সর্ব্বদা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এবং অচেতন-বাদ শেষে বলিয়াছেন জড় ও চেতন, একমাত্র বহির্জ্জগতের energyর মধ্যেই সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এখানে দুই স্থলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি জড়-বাদী ইহা স্বীকার করিতেছেন, বহির্জ্জগৎ বলিয়াও অবশ্য কোন বস্তু আছে। এবং বহির্জ্জগতের আলোচনা দ্বারা সিদ্ধ, কোনরূপ energy, কিংবা তদ্বৎ অজ্ঞেয় অন্য কিছু দ্বারাই চৈতন্য ব্যাখ্যা লাভ করিতেছে। ইহার উত্তরে চেতন-বাদী বলেন, অচেতন বাদী এখানে বিচারতঃ প্রমাণ-বিপর্য্যয় ("begging the whole question") ঘটাইয়াছেন। তাঁহার প্রমেয় বিষয় হইতেছে চৈতন্য ও মন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন চৈতন্য ও মন অন্য কোন্ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই অন্য পদার্থ তাঁহার মতে হইতেছে, বহির্জ্জগৎ। কিন্তু বহির্জ্জগৎ কি?—ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে, বৈজ্ঞানিক তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিকে নিজের মধ্যে যদি মুহূর্ত্তের জন্য সংযত করেন, তবে অবশ্যই তিনি দেখিতে পাইবেন, যাহাকে তিনি বহির্জ্জগৎ বলিতেছেন স্বরূপতঃ তাহা তাঁহার মনো জগৎ মাত্র। যাহাকে তিনি বহিঃস্থ বিশ্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা তাঁহার মনোরূপ মাত্র। অবশ্য এ কথা সত্য যে তাঁহার সেই মনোময় জগৎ সম্বন্ধে এক বহিঃ-প্রত্যয় হয় বলিয়াই তিনি তাহাকে অন্তর্জ্জগৎ না বলিয়া বহির্জ্জগৎ বলিয়া থাকেন।

কিন্তু সে বহিঃ প্রত্যয়ও তাঁহার মনেরইরচনা মাত্র—হইতে পারে শুধুই কল্পনা মাত্র। অতএব তিনি কোন ক্রমেই, তাঁহার চেতন মন্ হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং স্বাধীন বহির্জ্জগৎ তত্ত্বতঃ পাইতে পারেন না,—কল্পনা বা প্রত্যয় মাত্রে পাইতে পারেন। অতএব অচেতন-বাদী যখন মনের আদিম প্রস্রবণ বহির্জ্জগতের মধ্যে দেখিয়াছিলেন, তখন প্রকৃত পক্ষে তিনি মনের মধ্যে মনের উৎপত্তি সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। যাহা তাঁহার প্রমেয় ছিল, তাহাই তাঁহার প্রমাণ বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছিল, যাহাকে তিনি কর্ত্তা বলিতে চাহিয়াছিলেন বিচারতঃ তাহা কর্ত্তা বলিয়া প্রমাণিত না হইয়া,—তাহা কর্ত্তার কর্ম্ম বলিয়াই প্রমাণি হইয়াছিল।

অতএব চেতনবাদী বলেন, এই যে মন,যাহার বিরচিত র হইতেছে এই বিশ্বরূপ, যাহার অবধারিত Idea হইতে তথা কথিত বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে energy আদি চরম বৈজ্ঞানি তত্ত্ব, সেই মনকে বহির্জ্জগতের তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করি যাওয়া, এবং ঘোড়াকে গাড়ীর পিছনে যুতিয়া গাড়ী চালাইব চেষ্টা করা, একই কথা।

ইহা Ostwaldএর শক্তি-বাদ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। Ostwald বলিতেছেন চেতন ম হইতেছে মস্তিষ্ক শক্তি মাত্র। কিন্তু শক্তি (Energy বলিতে কি বুঝায়? এবং শক্তির ধারণা আমরা কোন্ চ বিষয় হইতে প্রাপ্ত হই? ইহার উত্তর Ostwald নিজে দিতেছেন:—"To gain an idea of the conce of Energy we must start with the fa that we are able through our Will, to ca forth occurences in the external world." ইহাই যদি শক্তির নিদানতত্ত্ব হয় তবে Ostwaldএর প্রতি—"The mind is a form of physical Energ—কিরূপে দাঁড়াইতে পারে? অষ্টওয়াল্ডের প্রতিজ্ঞা প্রমাণি হয় না, তাঁহার নির্দ্ধারণ অনুসারে চেতনবাদী Arth Schopenhauerএর প্রতিজ্ঞাই প্রমাণিত হয়—"Tl world is will and idea only"। এইরূপে চেত বাদের যুক্তি-তত্ত্ব শুধু অচেতন বাদকে নিরস্ত করিয়া পর্য্যবসান লাভ করে নাই। তাহা শুধুই ভাঙ্গে না অবশ্য কিছু গড়িয়াও তুলিয়াছে। তাহারও অবশ্য ন্যায় যুক্তি অনুরোধী একটা*স্বকীয় তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্ব কি তাহা সংক্ষেপের মধ্যে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কি বর্ত্তমান-যুগের Berkeley হইতে Hegel পর্য্যন্ত চেত বাদিগণের Idealism তত্ত্বের একটা সাধারণ লক্ষণ আ যাহা সংক্ষেপের মধ্যেও অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পা সে লক্ষণটি হইতেছে এই। বুদ্ধির সাক্ষ্য প্রমাণের উ নির্ভর করিয়া আমরা প্রতিক্ষণ ব্যবহারতঃ যে এক বহির্জ্জগৎ পৃথক-অস্তিত্ব-শীল বিষয় বলিয়া মানিতেছি, সেই সা প্রমাণকে ইঁহারা সকলেই অল্প বিস্তর সন্দেহ করিয়াছে

* Nature Philosophy p. 153.

এইজন্য ইঁহাদের অনেকের মতে, চেতন হইতে অতিরিক্ত কোন অচেতন বহির্জগৎ নাই। এবং সেইজন্য ইঁহাদের চরম সিদ্ধান্ত এই দাঁড়াইয়াছে যে এক ও অদ্বৈত চেতন মন (সেই মনকে ইঁহারা নাম দেন Spirit বা Ego বলিয়া), চেতন ও অচেতন দুই বিভিন্নরূপে প্রতীত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় চেতন ও অচেতনবাদ।

এই পাশ্চাত্য চেতন ও অচেতন-বাদের সহিত আমাদের প্রাচীন বাদকে তুলনা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, এই দুইটি পাশ্চাত্য বাদ সমগ্রভাবে আমাদের দর্শন, উপনিষৎ বা শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও গৃহীত হয় নাই। এবং তাহা গৃহীত না হওয়ার কারণ ইহা নহে যে, বর্ত্তমান যুগের যুক্তি-তর্ক প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণের ধারণার অতীত ছিল। কেন না আধুনিক কালের Idealismই বলুন, কিংবা Materialismই বলুন, তাহা নব্য ইউরোপের পক্ষে এক অভিনব ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু পুরাতন ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা কোনই অভিনব বা অপরিচিত দর্শনবাদ ছিল না। কারণ, আমরা সকলেই জানি Ostwald কিংবা Heckel জন্মগ্রহণ করিবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, অতি প্রাচীন বৃহস্পতির সুযোগ্য শিষ্য চার্ব্বাক অবিকল তাঁহাদেরই তানলয়ে গাহিয়াছিলেন—"চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যমুপজায়তে" শরীরস্থ পৃথিব্যাদি চতুর্ভূত হইতেই চৈতন্য উৎপন্ন হইতেছে। এবং সেই শরীরস্থ চতুর্ভূতের হেকেল্ যদি বিশেষ নাম দিয়া থাকেন —Psycho-plasm, কিংবা অষ্টওয়াল্ড নাম দিয়া থাকেন "Nerve Energy"—তবে তাহাতে মূল সিদ্ধান্তের যে কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, এ কথা না বলিলেও চলিবে। এবং Idealism ও এদেশের কোনই অপরিচিত দর্শন-বাদ নহে। Berkeley সাহেবের বহু, বহুকাল পূর্ব্বে এ দেশের "বিজ্ঞান-বাদী" ও বৌদ্ধ শূন্য বাদীরা বলিয়াছিলেন এ জগতে "বিজ্ঞান" (= Idea) ছাড়া অন্য কিছুই নাই। এবং ইতঃপূর্ব্বে ইহাও আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,চার্ব্বাকের ন্যায় প্রাচীন ভারতের জড়বাদী, কিংবা বৌদ্ধের ন্যায় "আইডিয়া-বাদী"র যুক্তি তর্ক অনেকটা বর্ত্তমান যুগের চেতন ও অচেতন বাদীর যুক্তি তর্কেরই ন্যায় ছিল। অতএব শাস্ত্র যদি এই চেতন ও অচেতন-বাদ গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তবে সেই গ্রহণ-না-করা কোনও "আদিম বর্ব্বরতা" বা "চিন্তাশক্তির জড়তা" প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা জ্ঞানতঃ ও বিচারতঃ প্রত্যাখ্যান করাই হইয়াছিল।

বর্ত্তমান চেতন ও অচেতন-বাদের সহিত আমাদের দর্শন বাদের বিরোধের কেন্দ্রস্থান হইতেছে চেতন ও অচেতনের ধারণা লইয়া। বর্ত্তমান কালের দর্শন, চেতন বা আত্মা (spirit) বলিতে মনকেই (mind) বুঝিয়া থাকেন. কিন্তু আমরা চৈতন্য বা আত্মা বলিতে মনকে বুঝি না. মনের অতিরিক্ত এক জ্ঞাতৃ-শক্তি বা চিৎ-শক্তিকেই বুঝিয়া থাকি। এবং সেই জন্য আমাদের মতে মন হইতেছে এক জ্ঞেয় ও অচেতন সত্ত্বা, তাহা বহি-বিশ্বের ইট্-কাঠ্-শ্রেণীর এক সত্ত্বা। কিন্তু পাশ্চাত্য মতে জ্ঞেয় মনই হইতেছে জ্ঞাতা চৈতন্য, এবং সেই মনই হইতেছে চেতন আত্মা. অহং বা spirit।

মনের অতিরিক্ত এক জ্ঞাতৃ-শক্তিকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করার স্বপক্ষে আমাদের যে যুক্তি আছে, তাহার আলোচনা অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এবং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করার কোনই প্রয়োজন নাই। এবং এতদ্-পক্ষে আমরা আশা করিয়া থাকি, আমাদের সেই শাস্ত্রীয় যুক্তির সত্য মর্ম্মকে যে দিন ইউরোপ সম্পূর্নরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে, সে দিন পাশ্চাত্য দর্শন-বিদ্যার এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে। কিন্তু উপস্থিত আমরা এই মাত্র বলিতে চাহি, মনের অতীত কোন এক জ্ঞাতৃ-চৈতন্যকেই আমরা আত্মা (= soul, or spirit) বলিয়া স্বীকার করায়, এবং মনঃ-সত্ত্বা ও জগৎ-সত্ত্বা উভয়কেই অনাত্ম ও অচেতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করায়, আমরা দুইটি বিষয়ে মহৎ পরিত্রাণ পাইয়াছি। প্রথমতঃ আমাদের দর্শন-বাদে কুত্রাপি জড় ও চৈতন্যের পৃথক মর্য্যাদা সঙ্কুচিত কিংবা কুন্ঠিত না হইয়াও, আমাদের মনস্তত্ত্ববাদে অচেতন জগৎ-শক্তির সহিত অচেতন মনঃশক্তির এক সহজ সামঞ্জস্য হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দর্শনের থিওরি বিরুদ্ধ এক বৃহৎ ব্যবহারিক কপটাচার হইতে আমরা সহজে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। এই দুইটি পরিত্রাণ-তত্ত্ব একটু খোলসা করিয়া বলা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ দেখুন, পাশ্চাত্য দর্শন-বিদ্গণের মধ্যে প্রায় সকলেই বলিতেছেন, মনো-বিধান (psychical system) ও জগৎ-বিধান (physical system) হইতেছে দুইটি

পৃথক ও স্বতন্ত্র বিধান, কারণ মনো-বিধান হইতেছে চেতন-বিধান এবং জগৎ-বিধান হইতেছে এক অচেতন বিধান। এবং তাঁহারা বলিতেছেন জড় ও চেতনের মধ্যে কোনই সংযোজক সেতু না থাকায়, উভয় বিধানের মধ্যে কোনই কার্য্যকারণাত্মক স্পর্শ-যোগ থাকিতে পারে না। কিংবা তাঁহাদের মতে, এক স্বতন্ত্র বিধানের কার্য্যপ্রণালী, অন্য স্বতন্ত্র বিধানের কার্য্য-প্রণালীর সদৃশ হইবে, এমন কোন সিদ্ধান্তও ন্যায়তঃ দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু তথাপি,—মস্তিষ্কের জড়-ক্রিয়া এবং মনের তথাকথিত চেতন-ক্রিয়া, প্রত্যক্ষ ভাবে যে কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত,—ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ স্থানে মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক যে এক বিষম দায়ে ঠেকিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অঙ্গীকৃত প্রতিজ্ঞা হইতেছে—তাহা চেতন সত্ত্ব। এবং সে অঙ্গীকার বজায় রাখিয়া, এই কার্য্য-কারণের কঠিন বটিকা তাঁহার গলাধঃকরণেরও উপায় নাই। অতএব এক অপার্থিব "parallelism"এর আবরণে আবৃত করিয়া, সে বটিকাকে তাঁহার বৈজ্ঞানিক জঠরে কথঞ্চিৎ পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে তাঁহাদের 'থিওরি' অনুসারে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুইটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে নীরন্ধ্র ভাবে আবদ্ধ। তাহাতে অবশ্যই একের দ্বারা অন্যকে স্পর্শ করে না, একের গতি অন্যের মধ্যে নিষিদ্ধ ও নিবারিত হয়। কিন্তু তিনি যখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (Experience) অবলম্বনে তাঁহার মনো-বিদ্যা (Psychology) কিংবা পদার্থ-বিদ্যা (Physics) অনুশীলন করেন, তখন তাঁহার বিচার-প্রণালীর মধ্যে, বহির্জগৎ ও মনোজগতের চরিত্রকমা পংক্তি-ভেদ ক্ষণ মাত্রও রক্ষিত হয় না; তিনি অন্তর্জগতের মধ্যে নিরুদ্ধ পাঠ পড়াইবার সময়, বহির্জগতের Force, Relativity, Intensity, Reflex motion প্রভৃতি বাহ্য অচেতন তত্ত্বের উপর পদে পদে "হুঁচট" খাইয়া পড়িতে বাধ্য হয়েন। এবং অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সাদৃশ্য ও সমান-জাতীয় কার্য্য-বিধিকে, কোন এক "অপ্রাকৃত উপমা-জ্ঞান" বলিয়া বুঝাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার অন্য দিকে বৈজ্ঞানিকও ঐরূপে সতত বিপদ্‌গ্রস্ত। তাহার মতে বাহ্য-কর্ম্মের অতীত কোনই মনোধর্ম্ম নাই, এবং মনোজগৎ হইতেছে বহির্জগতের

অট্টালিকার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মাত্র। কিন্তু আ[illegible] বিষয় এই যে, তাঁহার মতে পদার্থতত্ত্বের একটি ক্ষুদ্রতম মনের ইচ্ছাদ্বেষ ব্যতিরেকে বুঝিবার উপায় নাই। বলেন মনের সংকল্পাত্মক প্রযত্নের সাদৃশ্য দ্বারাই [illegible] বৈজ্ঞানিক চরম-তত্ত্ব Energyর অর্থ বোধ হইয়া [illegible] তাহার পদার্থবিদ্যা সর্ব্বদাই মনোবিদ্যার উপর [illegible] খাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তথাচ সেই মনকে তিনি বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহাকেও কচিৎ Paralle[illegible] বাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বা অন্যথা চেতন অচেতনের পার্থক্য স্বীকার করিতে হইতেছে।

কিন্তু আমাদের দেশের বিশেষ প্রকারের আ[illegible] অনাত্ম-বাদকে আশ্রয় করিলে, 'থিওরি'র সঙ্গে [illegible] অভিজ্ঞতার (Experinece) এই নিত্য-বিরোধ স[illegible] সামঞ্জস্য লাভ করিয়া থাকে।

অতঃপর, "থিওরির" সহিত ব্যবহারের কপটতা বে[illegible] তাহা দেখা যাউক, এবং তাহা দেখিবার জন্য [illegible] দুরবগাহ তত্ত্বে অবগাহন করিবার প্রয়োজন হয় না। [illegible] কল্পিত "থিওরির" পার্শ্বে, তাঁহার সহজ-সিদ্ধ "থিও[illegible] দাঁড় করাইয়া দিলেই তাহা পরিষ্কার ভাবে দেখিতে যায়। যেমন ধরুন, অচেতন-বাদী Materialist কল্পনা করিয়াছেন, চেতন তিনি অন্য কিছুই নহেন, হইতেছেন psychoplasm এর শক্তি, কিংবা শিরা [illegible] শক্তি মাত্র। কিন্তু যখন সেই বৈজ্ঞানিক তিনি [illegible] বলিয়া ঘর করণায় প্রবৃত্ত হয়েন, কিংবা টেবিলে বসিয়া খান, তখন কার্য্যতঃ তিনি যে Psychop[illegible] শক্তি মাত্র এ কথা কখনই বিবেচনা করেন আবার অন্যদিকে চেতনবাদীর Idealism কথা স্মরণ তিনি পুঁথির পর পুঁথি লিখিয়া প্রমাণ করিতে থাকু[illegible] বাহ্য জগৎ হইতেছে তাঁহার Idea মাত্র, কিন্তু কখনের মধ্যে যতটুকু Idea হইতে স্বতন্ত্র সত্তা বাহ্য আছে, সেইটুকু মাত্র বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার ক[illegible] তাঁহার এক দণ্ডেরও ঘর করণা চলিতে পারে না।

ব্যবহারতঃ এমন অসদৃশ প্রহেলিকায় আমাদের কখনই আমাদিগকে উপনীত করে নাই। আমরা ও অনাত্মাকে তাহাদের সহজ ব্যবহার-সিদ্ধ অধিকার বিচারতঃ বঞ্চিত করি নাই। আমরা তর্কবলে

অপ্রাকৃত দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চন্দ্রালোক (moon shine) সৃজন করিতে চাহি নাই। আমরা ব্যবহার-সিদ্ধ প্রত্যভিজ্ঞার বনিয়াদের উপর যে দর্শন-বাদ বিরচন করিয়াছিলাম, তাহারই সহজ ও সঙ্গত পরিণাম বশে এক ব্যবহারাতীত ও লোকাতীত মুক্তি জীবের চরম গতি রূপে বিহিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমাদিগকে গোড়া হইতেই জগৎ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে দার্শনিক রণ-যাত্রা করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

কেন এবং কি জন্য শাস্ত্রীয় বাদের সহিত পাশ্চাত্য বাদের এই মৌলিক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, ইহার তথ্যানুসন্ধান কৌতূহল জনক। কিন্তু সে অনুসন্ধানের জন্য আমাদের আধুনিক মাথাকে ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্র নিজেই তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। আধুনিক মতবাদের অনুরূপ তাৎকালীন বিরুদ্ধ মতবাদের সহিত শাস্ত্রীয় বাদের প্রভেদ কেন দাঁড়াইয়াছিল, শাস্ত্রকার নিজেই তাহার নিদান নিরূপণ করিয়াছিলেন। এবং সেই নিদানতত্ত্ব বর্ত্তমান যোগেও সর্ব্বথা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনের শেষ অধ্যায়ের একটি সূত্রের ২৩ ব্যাস ভাষ্যে এই নিদানতত্ত্ব যেরূপে নিরূপিত হইয়াছিল তাহার অবিকল মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

মনকে স্ফটিক বা মণির ন্যায় এক শুদ্ধ স্বচ্ছ সত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। তাহা বিষয়ী (subject) দ্রষ্টা চৈতন্যের বিষয় (object)। বিষয় স্বরূপ সেই মনের মন্তব্য অর্থ হইতেছে অচেতন বাহ্য বিষয়, ও চেতন আত্মা। মন সেই মন্তব্য অচেতন ও চেতন অর্থের দ্বারা উপরক্ত হইয়া তদাকারে নির্ভাসমান হইতেছে। এই জন্য বিষয়ী বা দ্রষ্টা চৈতন্যের দ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া, বিষয় 'object' হইয়াও চিত্ত, বিষয়ী 'subject' রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এবং বাহ্য বস্তু উপরাগে চিত্তই বাহ্য বস্তু-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অর্থাৎ চিত্ত, চেতন ও অচেতন দুই রূপেরই সহিত সমান রূপতা প্রাপ্ত হইতেছে। চেতন ও অচেতন উভয়বিধ রূপের সহিত সারূপ্য প্রাপ্ত চিত্তের দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া কেহ বলিতেছেন চিত্তই চেতন, কেহ বলিতেছেন এই গবাদি ও ঘটাদি লোক বিশিষ্ট বহির্জগৎ হইতেছে চিত্ত-মাত্র। ইঁহারা ভ্রান্ত ও অনুকম্পনীয়। এবং ইঁহাদের ভ্রান্তিবীজ হইতেছে এই। তাঁহারা ইহা বুঝিতেছেন না, চিত্ত যে চেতন ও অচেতন আকারে নির্ভাসমান হইতেছে সেই চেতন অচেতন আকার চিত্তের নিজ রূপ নহে, তাহা চিত্ত হইতে অন্য পদার্থের রূপ। যোগিগণ যখন সমাধি-প্রজ্ঞা লাভ করেন (তাহাতে যোগিগণ যথা-বস্তু দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন) তখন তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পান, প্রজ্ঞেয় অর্থ হইতেছে প্রতিবিম্বীভূত চিত্ত। যোগীর এই সত্য দর্শন হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, যাহা প্রতিবিম্বীভূত, তাহার অবশ্যই অন্য আলম্বন আছে। কারণ বিম্ব ব্যতিরেকে কখনই প্রতিবিম্ব অসম্ভব হইতে পারে না। অতএব চিত্তে যে চেতন ও অচেতনের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে সেই চেতন ও অচেতন, তদাকারে পরিণত চিত্ত হইতে অন্য। এবং সমাধি প্রজ্ঞাতে যিনি প্রজ্ঞেয় অর্থকে প্রতিবিম্বীভূত চিত্ত বলিয়া অবধারণ করিতেছেন তিনিই হইতেছেন জ্ঞাতা ও পুরুষ।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার।

দুঃখের শেষ

(গল্প)

বাড়ীর মধ্যে আসিয়া স্ত্রীকে ডাকিলাম—"এস।"

স্ত্রী মেঝের উপর শুভ্র সুকোমল শয্যা রচনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আমি আসিতেই তিনি খাটের উপর চলিয়া গেলেন। বলিলেন—"থাক্, ও সবে আর কায নেই।"

অনেক মিষ্ট কথা বলিয়া তবে তাঁহাকে নীচে নামাইলাম। সন্ধ্যার সাহিত্যের আসর ভাঙ্গিতে আজ একটু বেশী দেরী হইয়াছিল সে জন্য স্ত্রীর এই অভিমান।

Tolstoiএর Three Questions পড়িয়া স্ত্রীকে বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। দুজনেই মুগ্ধ হইলাম।

স্ত্রী বইখানি একবার হাতে লইয়া, ঘননিবদ্ধ অক্ষরগুলির উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া ফিরাইয়া দিয়া একটা মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন; তাহা অনেকটা অনুযোগের মত আমার কাণে শুনাইল।

সে অনেক দিনের কথা। বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার অবসরে যখন ইংরাজীসাহিত্যের সুন্দর সুন্দর কবিতা ও গল্প বাছিয়া স্ত্রীকে অনুবাদ করিয়া শুনাইতাম সেই সময়ে তাঁহার মনে ইংরাজী শিখিবার সাধ হয়। কখন একখানি ইংরাজী First Book আনাইয়া তাহার অক্ষরগুলি শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি জানিতে পারিয়া প্রথমে তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিয়াছিলাম, মনে মনে একটু আনন্দও পাইয়াছিলাম; কিন্তু পরে তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হঠাৎ একদিন দেখিলাম বইখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। কে ছিঁড়িয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে স্ত্রী বলিয়াছিলেন, "বালাই গিয়েছে; কি হবে?"

এখন সে সব দুঃখের ঘা মিলাইয়া গিয়াছে, শুধু এক আধটা দাগ রহিয়া গিয়াছে।

পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের পড়ার কলরব শুনা যাইতেছিল। তখন আর পুরাণো কথা মনে করিয়া নিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় ছিল না।

নূতন একটা গল্প লিখিয়াছিলাম সেটি শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় একটি ব্যাঘাত ঘটিল।

"হতচ্ছাড়া মিন্‌ষের জ্বালায় আর সংসার হয় না।" —পিছনের দুয়ার খোলার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলি কাণে আসিল।

চাহিয়া দেখিলাম যিনি কথাগুলি বলিয়াছিলেন তিনি আমাদের সম্মুখেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। খুব বেশীবার এবং ভাল করিয়া দেখা না হইলেও চাহিতেই বুঝিতে পারিলাম ইনি উপেন বাবুর স্ত্রী; কারণ ঐ দীর্ঘ গঠন, গৌর বর্ণ ও মুখের ভাবে কেমন একটা বিরক্তি উপেন বাবুর বাড়ী যাইতে আসিতে কয়েকবার আমি দেখিয়াছি। কিন্তু কপালে রক্তের দাগ কেন?

সে সব কথা বসিয়া বসিয়া কিন্তু ভাবিবার সময় ছিল না। আমি যে সেখানে বসিয়া ছিলাম তিনি তাহা প্রথমে জানিতে পারেন নাই। সেখানে বসিতেই আমার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি ঘোমটা টানিয়া উঠিবার উদ্যোগ ক[রিতেছেন] দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম "[আপনি] বসুন, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

একেবারে বাহিরের বারান্দায় চলিয়া আ[সিয়া] ভাবিতে লাগিলাম—ইহার মধ্যে কি ব্যাপার ঘটিল? তো উপেনবাবু এখান হইতে উঠিয়া গেলেন—এখনও ঘণ্টার বেশী হয় নাই।

একটু পরেই স্ত্রী দুয়ারের কাছ হইতে আমাকে [ডাকিয়া] বলিলেন, "উপেনবাবু নেশা করে মার ধোর করেছেন। বাইরে গিয়ে বস। যদি তিনি আসেন তাঁকে [ধরে] রেখো।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তিনি এই যে বেশ অবস্থায় এখান থেকে গেলেন! এরি মধ্যে নেশ[া] করলেন কখন, আর—"

স্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমরা কখন যে ভা[ল] কখন যে মন্দ থাক বোঝা শক্ত। একটা থেকে একটায় যেতে এক মিনিটও দেরী হয় না। ইনি আজ এখানেই থাকবেন সেইটে কেবল বলে পাঠাতে।"

বলিয়া স্ত্রী তাড়াতাড়ি দুয়ারটা বন্ধ করিয়া দি[লেন]। তাঁহার বোধ হয় ভয় হইতেছিল উপেনবাবু তাঁহার [স্ত্রীকে] লইয়া যাইবার জন্য এখনি বুঝি টলিতে টলিতে [আসিয়া] উপস্থিত হইবেন।

বাহিরে একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল। নিজের ঘরে না গিয়া সেখানেই সেই বেঞ্চিখানার উপর [শুইয়া] পড়িলাম।

আমি রাজকার্য্যে মফিস্বলী হইতে বদলি হইয়া বৎ[সর খানেক] এখানে আসিয়াছি। বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা এক কেবল ই[হাঁর] সঙ্গে ঘটিয়াছে—যদিও অনেককে বলিতে শুনিয়াছি ম[দ্যপের] সঙ্গে মেশামিশি বা ঘনিষ্ঠতা করা নাকি আমাদের [সমাজের] জাতির পক্ষে বিশেষ গর্হিত কার্য্য। উপেন বাবু উ[কিল]; শুনিয়াছি তাঁহার শ্বশুরও উকিল ছিলেন—তাঁহারই ইনি অনেক পরিমাণে পাইয়াছেন। তার উপর, উঁ[হার] সঙ্গ তো সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। আমিও লোকাচার করিবার পাত্র ছিলাম না। কিন্তু কোন্‌খানে দুজনের মিল ছিল সেই সূত্রে সকলকে বর্জ্জন করিয়াও, কেবল উপেনবাবুর সহিতই আমার প্রাণের টান জন্মিয়া গিয়া

সমস্তদিন কোর্টে উকিলের আস্ফালন, আমলাদের গুঞ্জন, বাদী প্রতিবাদী সাক্ষী ইত্যাদির পুঞ্জীভূত কলভাষণ শুনিয়া শুনিয়া এবং আইনের বেড়াজালে ও সত্যপ্রিয় সাক্ষীদের গুণে নিপুণ দলিল পত্রাদির জোরে প্রায়ই জানিয়া শুনিয়া রামের জিনিষ শ্যামকে এবং শ্যামের জিনিষ রামকে দিয়া যখন বিচাররূপ ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বাসায় ফিরিতাম, তখন জীবনটাকে নিংড়াইয়াও একবিন্দু রস বাহির করিতে পারিতাম না। কেবল সন্ধ্যায় যখন দুজনে বাহিরের ঘরটায় আসিয়া ছাত্র-জীবনের ২।১টা গল্প করিয়া ধীরে ধীরে সাহিত্যের মৃত সঞ্জীবন রাজ্যে প্রবেশ করিতাম, তখন মনে হইত, হাঁ মরণ সমুদ্রেও খুঁজিতে পারিলে সুধার ভেলা মিলিয়া যায়।

সেই বাল্যকালের পড়া কাব্যামৃত রসাস্বাদ যে সংসাররূপ বিষবৃক্ষের অন্যতম মধুর ফল এই সত্য সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করি।

কিন্তু উপেন বাবু আজ এ কি করিলেন? মাঝে মাঝে স্ত্রীর সহিত একটু আধটু অমিল হয় এই পর্য্যন্ত আমি জানিতাম; আজ ইহাতে এতখানি কি করিয়া হইল? রাত্রি ৯।১০টার পর তিনি যে একটু নেশা করিতেন তাহাও আমার জানা ছিল। কদাচিৎ এক আধদিন সকালেও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থও দেখা যাইত; কিন্তু নেশার ঝোঁকে কোন প্রকার অন্যায়াচরণ করিতে কখনও শুনি নাই।

আরও খানিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া দেখিলাম উপেন বাবু আসিলেন না। বাড়ীর ভিতরের দিকে কাণ পাতিয়া শুনিলাম, ছেলেমেয়েদের পড়ার কলরব বন্ধ হইয়া গিয়াছে; মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীর ও উপেন বাবুর স্ত্রীর কথাবার্ত্তার শব্দ আসিতে লাগিল—বোধ হইল তাঁহারা আজিকার ব্যাপারেরই আলোচনা করিতেছিলেন, ছেলে-মেয়েরাও পড়া ভুলিয়া সেই মুখরোচক গল্প শুনিতেছে।

তখন ধীরে ধীরে উপেন বাবুর বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার বাসার সীমা পার হইলেই পূর্ব্বদিকেই উপেন বাবুর বাসা। মাঝখানে কেবল একটি প্রাচীর। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকের খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। দুই পরিবারের যাতায়াতের সুবিধা হইত বলিয়া সেখানটা আর গাঁথা হয় নাই—খোলা দুয়ারের কাজের জন্যই তাহাকে ঐ অবস্থাতেই রাখা হইয়াছিল।

হয়ত সদর দরজা এতক্ষণ বন্ধ করা হইয়াছে ইহা অনুমান করিয়া আমিও সেই ভগ্ন প্রাচীরের পথ ধরিলাম।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। কার্ত্তিক মাস, কিঞ্চিৎ শীতও পড়িয়াছিল। কিন্তু মনের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় মোটেই শীত বোধ হইতেছিল না। উপেনবাবুর ফলফুলের বাগানটা জ্যোৎস্নায় যেন ভিজিয়া গিয়াছিল। বড় একটা জাম গাছের পত্রান্তর দিয়া জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছিল। মেঘলেশহীন আকাশ চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল। এমন সুন্দর রাত্রে এমনি একটা অসুন্দর বিষয়ের মধ্যে যাইতেছি ভাবিয়া মনে শান্তি পাইলাম না। এমন মধুর রাত্রি, এই শুভ্র জ্যোৎস্না শান্ত নীরবতা কি এই সব বিরোধ ও অশান্তির জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল?

ভাবিতে ভাবিতে বারান্দায় আসিয়া উঠিলাম। ভিতর হইতে দুয়ার জানালা সব বন্ধ করা ছিল। মনে হইল যেন বাহিরের সকল শান্তি ও সৌন্দর্য্য হইতে এই হতভাগ্য গৃহখানি বঞ্চিত হইয়া আছে।

উপেন বাবুকে ডাক দিলাম। প্রথম বারে কোন উত্তর আসিল না। দ্বিতীয় বার ডাকিয়া একটু অপেক্ষা করিতে সাড়া পাইলাম। বলিলাম—আমি গৌর, দুয়ার খুলুন।

দুয়ার খুলিয়া উপেনবাবু অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—"আসুন।"

আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

আমি ভিতরে আসিবার পূর্ব্বেই ঘরের দুইটি জানালাই খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমি একটু ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিলাম কোথাও বোতল গেলাসের চিহ্ন আছে কি না। উপেনবাবুর ঈষৎ লাল চোখ দুটি ছাড়া আর তাহার কোন নিদর্শনই পাইলাম না। আশ্বস্ত হইয়া বসিলাম।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। উপেনবাবু প্রথমে কথা কহিলেন—"আপনি বোধ হয় কিছু বলতে এসেছেন। আমার আজকার ব্যবহার সম্বন্ধে?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—"ঠিক কিছু বলতে নয়। আপনার শুধু অনুমতি নিতে এসেছি, আপনার স্ত্রী আজ আমার স্ত্রীর কাছে থাকবেন।"

"বেশ, সে আর বেশী কথা কি?—কিন্তু আমি

কোথায় থাকি অর্থাৎ কোথায় যাই বলুন দেখি গৌর বাবু?"—বলিয়া উপেন বাবু ঠিক অসহায়ের মত আমার পানে চাহিলেন।

প্রথম সংকোচটা কাটিয়া গিয়াছিল তাই বলিতে পারিলাম—"এর জন্যে আপনি মন খারাপ করবেন না লজ্জাও পাবেন না। এমন একটু মন কষাকষি কাদের না হয় বলুন?"

"সকলেরই হয়, সেই যা একটু আশার কথা। আচ্ছা আপনাদেরও হয়?" বলিয়াই উপেন বাবু হঠাৎ একবার উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু সেটা হাসি কি কান্না তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত।

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"তা কখন কখন হয় বৈকি।"

"তবে এতটা হয় না—নয়? একেবারে রক্তা-রক্তি!"

আমি এবার আর উত্তর দিলাম না। মনটা একটু বিরূপও হইল। একেবারে ইতরের মত গায়ে হাত তোলা কি করিয়া ইঁহার দ্বারা সম্ভব হইল? অথচ স্বীকারও তো করিলেন।

উপেন বাবুই পুনরায় কথা কহিলেন—"আমারই দোষ, গৌর বাবু। সহ্য করতে পারিনি, ধাক্কা দিয়েছিলাম। তাই টেবিলে লেগে কপালটা কেটে গিয়েছিল। কিন্তু আমি মারবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি যদি না চলে যেতেন তাহলেও কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না।"

এবার কিন্তু মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল—"এটা কিন্তু আপনার কাছ থেকে আশা করি নি।"

"না—কিছুতেই করেন নি, আমিও করি নি। কিন্তু কি করি?"

বলিয়া উপেন বাবু হাত দুইখানা অসহায়ের মত রগড়াইতে লাগিলেন। মুখে অপরিসীম লজ্জা ও দুঃখ ফুটিয়া উঠিল।

এবার আমারও দুঃখ হইল। বলিলাম—"ওর জন্যে আর মন খারাপ করিবেন না; এ সব দুদিনেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। দাম্পত্য কলহে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া এ তো আছেই।"

"ক্রিয়া তো ক্রমশঃই গুরু হচ্চে—যার ফল নিজেরা তো পাচ্ছিই, আপনাদেরও পেতে হচ্ছে এই যে আরও দুঃখের কথা। কিন্তু কি করে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাই?"

অত্যন্ত চিন্তিত মুখে উপেন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকে বলিতে হইল—"একদিন দৈবাৎ একটা অন্যায় হয়ে গেছে বলে অত মুষড়ে পড়া ভাল নয়।"

উপেন বাবু বলিলেন—"একদিন তো নয়; এ হচ্চে অনেক বছর থেকে, আপনারা আজ একদিন দেখতে পেয়েছেন—তাও অতি সামান্য অংশ।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা কেন এমন হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"সেই কথাই তো বলা শক্ত"—বলিয়া উপেন বাবু একবার পাশের ঘরে গিয়া সাবধানে দুয়ার বন্ধ করিলেন। আবার মিনিট ৩,৪ এর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "দেখুন গৌর বাবু, যদি আমাকে এ রকম কায করতে আর কোন দিন দেখেন, তাহলে আমার খুড়ীমাকে খবর দেবেন টেলিগ্রামে। শুধু বলবেন উপীন তার খুড়ীমাকে দেখতে চায়।"

বলিয়া হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া একবার মাথায় স্পর্শ করিয়া, ঠিক ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার মত ভক্তিভরে ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন—"খুড়িমা! খুড়িমা!" পরক্ষণে হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। আঙুলের ফাঁক দিয়া কিছুক্ষণ চোখের জল পড়িতে লাগিল।

আমি বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—উপেন বাবুর এত দুঃখ কিসের?

৩

সে রাত্রে উপেন বাবুকে অশ্রুজল, লজ্জা, দুঃখ ও

নেশার ঘোরের মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। পরদিন তাঁহার স্ত্রী সকালে উঠিয়াই আপনাদের বাসায় চলিয়া গেলেন। আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যাইবার সময়ে একটু মুখ ভার করিয়াই গিয়াছিলেন; অথচ আমার স্ত্রী যত্ন আদর ও সহানুভূতি কোনটারই ত্রুটী করেন নাই।

রাত্রে যে সহানুভূতিটুকু ভাল লাগিয়াছিল প্রভাতে তাহারই স্মৃতি হয়ত তাঁহার মনকে বিরূপ করিয়া দিয়াছিল।

ইহাই হয়ত স্ত্রীচরিত্র!

সেদিন সন্ধ্যায় উপেন বাবু আমাদের সাহিত্যের আসরে আসিলেন না। ভাবিলাম হয়ত ইহা কালিকার দাম্পত্য কলহের মধুর পরিণাম। কিংবা হয়ত কাল রাত্রে বেশী নেশা করিয়াছিলেন তাহার ফলে উঠিতে পারেন নাই। এইটাই বেশী সম্ভব মনে হইল, কারণ আজ ইনি কোর্টেও যান নাই সে সংবাদ জানিতাম।

উপেন বাবু আসিলেন না দেখিয়া আমি বাড়ীর ভিতর যাইব ভাবিতেছি, এমন সময় উপেন বাবুর ভৃত্য এক প্রকার ছুটিতে আসিয়া ছুটিতে আমায় বলিল, "বাবু একবার শীঘ্র আসুন—নইলে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কি হয়েছে?"

সে বলিল—"দুজনেই ভয়ানক রেগেছেন। আপনি আসুন।"

আমি তখনই সেই দিকেই ছুটিলাম। বারান্দায় উঠিয়া দেখিলাম উপেন বাবুর ঘরের দুয়ার খোলা। একবার গলার সাড়া দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। উপেন বাবু মেঝের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন; পাশের ঘরে যাইবার দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ। বুঝিলাম সেখান হইতে উপেন বাবুকে ঠেলিয়া দিয়া তাঁহার স্ত্রী দুয়ার বন্ধ করিয়াছেন।

মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"এই অবস্থায় এঁকে ঠেলে ফেলে উনি দুয়ার বন্ধ করেছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর আসিল "ঠেলে ফেলব না তো দুয়োর খুলে রেখে মাতালের হাতে মার খাব নাকি? আমায় তখন যদি খুন করতো ঝোঁকের মাথায়, কে ঠেকাত?"

আমি নির্ব্বাক্ হইয়া গেলাম। স্বামীর সম্বন্ধে স্ত্রীর কি উত্তর! কিন্তু সত্যই যদি প্রাণের আশঙ্কা থাকে তাহা হইলে তো ইহার জন্ত দোষ দেওয়া যায় না! আমি তখন ভৃত্যের সাহায্যে উপেন বাবুকে ভূমিশয্যা হইতে উঠাইয়া পার্শ্বের শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলাম। মনে হইল বাহিরে যাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কোথায় যাইতেছিলেন, এমন সময় এই দুর্য্যোগ। বালিশে মাথাটা তুলিয়া দিতে দেখিলাম কপালের উপরিভাগে খানিকটা অংশ ফুলিয়া রহিয়াছে। জুতা মোজা আর উপরকার বড় কোটটি খুলিয়া দিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ক বোতল খেয়েছেন জান?"

সে বলিল—"দু বোতল।"

"কে এনে দিয়েছিল?"

মাথা নীচু করিয়া ভৃত্য উত্তর দিল—"আমি!"

বুঝিলাম এতখানি নেশার উপর ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। নাড়ী দেখিলাম। একটা উত্তেজনা ছাড়া আর কোন চিহ্ন পাইলাম না।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া উপেন বাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। এমন গভীর জ্ঞান, এত বিদ্যানুরাগ, এমন মধুর স্বভাব সত্ত্বেও কেমন করিয়া এই লোকের ঘরে এমন সব নীচ কার্য্য ঘটিতেছে তাহা ভাবিয়া পাইলাম না।

তার পর, যাহার হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত আপন স্ত্রীকেও শারীরিক বলের সাহায্য লইতে হইয়াছিল, সেই লোককে নিতান্ত অসহায় শক্তিহীন ও সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পরের অনুগ্রহের উপর ছাড়িয়া দিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম।

সেই রাত্রেই উপেন বাবুর খুড়িমাকে আনিবার জন্ত দেশে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম।

৪

ব্যাপারটা যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে আরও অনেকদূর গড়াইয়াছিল। পরদিন সকালে উপেনবাবু উঠিতে গিয়া মাথার ভিতর একটা যন্ত্রণা বোধ করেন ও পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া যান্। ডাক্তার আসিয়া অনেক চেষ্টার ফলে প্রায় অপরাহ্নের দিকে চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ডাক্তার বাবু বাঙ্গালী। আমাকে বলিয়া গিয়াছেন ব্রেণ এবং হার্ট দুইয়েরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। উপেন বাবুর জ্ঞান হওয়ার পর আমি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার সহিত দেখা করি নাই। শুধু আগ্রহের সহিত তাঁহার খুড়িমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম তাঁহার স্ত্রীকে একটু শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে—এ অবস্থায় তিনি যেন কোন উত্তেজনার সৃষ্টি না করিয়া বসেন।

আমার স্ত্রী আসিয়া যে সংবাদ দিলেন তাহার মাথামুণ্ড তো আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। স্ত্রী বলিলেন—বৌটা কাল হইতে খায় নাই, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—কাল হইতে ওরা আমাকে ও ঘরে যাইতে দেয় নাই। তোমার স্বামীকে দিয়া ডাক্তারের মত করিয়া দাও আমাকে যেন যাইতে দেয়; নহিলে আমি পাগল হইয়া যাইব।

সে রাত্রি ও তাহার পরের সকালে ভয়ে ভয়ে কাটিল। অপরাহ্ণে কোর্ট হইতে আসিয়া শুনিলাম উপেন বাবুর খুড়িমা আসিয়াছেন। বুক হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল।

কোর্টের পোষাক পরিবর্ত্তন না করিয়া হাত মুখ না ধুইয়াই তাহাদের সহিত দেখা করিবার জন্য ছুটিলাম।

বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইতেই কক্ষের ভিতরকার নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম:—

"উপী, গোপাল আমার, এমন শরীর হয়ে গেছে তা আমাকে কিছু দিন আগে কেন খবর দিস্‌নি?"

"কোন্ মুখে তোমাকে আর খবর দেব খুড়িমা? খবরই যদি দেব তো তোমার কাছ থেকে চলে আস্‌ব কেন?"

"চলে এসেছিস্ তার জন্যে এত লজ্জা কেন বাবা? লোকের ছেলে কি বিদেশে কায করে না?"

"আমি তোমাদের বুকে কত বড় ব্যথা দিয়ে এসেছি। কেন যে এসেছি সে কথাটাও যে বলে আসতে পারি নি। লিখিয়ে পড়িয়ে, পেটে না খেয়ে আমাকে মানুষ করেছিলে, আর আমি বুড়ো বয়সে তোমাদের একলা ফেলে চলে এলাম!"

"ছিঃ উপী, ছেলেমানুষের মত কাঁদনা। তোর কাকা তখনি আমাকে বলেছিলেন—তুমি দুঃখ কোরো না, আমাদের কোন একটা বড় দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যেই ও চলে গেল; নইলে ও কি সেই ছেলে।"

"তাই সত্যি খুড়ীমা। কিন্তু পারলাম না তো। আবার তো তোমাকে এই সবের মধ্যে টেনে আনলাম। ও কি বলেছিল জান খুড়িমা? আমি যদি মতিহারী না যাই তো তোমাকে আমার সামনে ও অপমান করবে। করতও তাই। ও তো বুঝতো না যে ওকে তুমি আমার চেয়ে ভালবাস; তুমিই ওকে পছন্দ করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে। ওর দুর্ব্ব্যবহারে তোমার বুক একেবারে ভেঙে যাবে, তাই খুড়িমা ভয়ে লজ্জায় দুঃখে আমি চলে' এলাম। এ দুঃখটা তোমাকে দিতে হল—বড় হয়ে আমি স্ত্রী নিয়ে আলাদা থাকতে চাই এই ভাণ করে' চলে এলাম।"

"আমি তো তাতে কোন দুঃখ পাইনি বাবা। তুই কোনও দিন নিজের সুখ দেখিস্ নি। নিজে যদি এতে সত্যিই একটু সুখ পাস একটু আনন্দ পাস্ এই ভেবে আমারা যে সুখীই হয়েছিলাম।"

"তাই সুখী হয়েছিলাম খুড়িমা। কোনও দিন তামাক চুরুট পর্য্যন্ত খাই নি, জান ত? আর আজ এসে তো সব দেখতে পেয়েছ। আমি আর তোমার কাছে মুখ দেখাবার যোগ্য নই।"

"এ যে ঘরের আবর্জ্জনার মত উপী, ঝেড়ে

ফেলে দিলেই সাফ হয়ে যাবে। তুই ভাল হয়ে ওঠ্, সব ঠিক হবে। এ কি, কপালে কিসের দাগ উপী? বল্, চুপ করে রইলি কেন?"

"খুড়িমা, ওটা জিজ্ঞাসা কর না।"

"আচ্ছা, বলতে লজ্জা হয় তো বলিস্‌নে।"

"না খুড়িমা, বলি। তোমার কাছে কিছু লুকোব না। সেদিন তোমাকে অকারণে একটা কটূক্তি করে বল্লে তোমরা টাকার লোভী তাই আমার উপর দরদ দেখাও। আমি বল্লাম ওঁদের নামে তুমি কোন মন্দ কথা বোলো না, ওটা আমি সহ্য করব না। বল্লে বেশ করব বল্‌ব কি করবে কর। মারবে? না মার তো তোমার খুড়িমার দিব্যি।—বলে' সামনে এসে দাঁড়াল। আর সহ্য হ'ল না। সাম্‌নে থেকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে টেবিলে তার কপালটা লেগে একটু কেটে গেল। তখনি ও নীচে থেকে ভাঙা কাঠ তুলে নিয়ে, এইখানটায়—ওঃ ছিঃ ছিঃ খুড়িমা—এও আমার অদৃষ্টে ছিল!"

"ওঃ বাছা আমার! কি কষ্টই পেয়েছিস্ উপী! কেন তুই অত গুলো করে টাকা আমাদের পাঠাতিস? আমাদের দুজনের যা দরকার তাই পাঠালেই তো হ'ত বাবা। তাহলে বৌমারও আক্রোশ হ'ত না!"

"খুড়িমা!"

"কি বাবা!"

"আর আমাকে ছেড়ে যাবে না।"

"না বাবা!"

"কাকা আস্‌বেন?"

"আসবেন বৈ কি—তোকে যে তিনি নিজে হাতে তৈরি করেছেন। তুই যে তাঁর কত আদরের জিনিষ তা কি জানিস নে?"

"ও যদি অপমান করে তাহলেও চলে যাবে না?"

"তা হলেও যাব না। কিন্তু ঐ খানেই তোর ভুল হয়েছিল বাবা। ওর সাধ্যি কি বাবা ও আমাকে অপমান করে? আমি অপমান মনে না করলে আমাকে কে অপমান করে বাবা? তুই চুপ করে' এখন ঘুমো। অনেক বকেছিস্।

"খুড়িমা।"

"বাবা?"

"আমার মাথায় একটু হাত দাও।"

আমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। তখন আর আমি উঁহাদের বিরক্ত না করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যার পর শুনিলাম উপেন বাবুর অবস্থা তেমন সুবিধা নয়। তাড়াতাড়ি তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাহির হইতে খবর দিতে, ভিতর হইতে দরজা খুলিবার শব্দ শুনিলাম, আমি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

উপেনবাবু শুইয়া আছেন। তাঁহার কাছে যিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিলাম উনি খুড়িমা।

তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমি তোমার কথা উপীর মুখে সব শুনেছি। বস বাবা।"

কি মিষ্ট স্বর! মানুষের এত মধুর কথা আমি আর কখনও শুনি নাই!

উপেন বাবু আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"গৌর বাবু, আর ভাবনা নেই, আমার খুড়িমা এসেছেন।" বলিয়া চক্ষু বন্ধ করিলেন। খানিক পরে চমকিয়া উঠিয়া আবার চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "গৌর বাবু, আর আমাকে কখনও অন্যায় কায করতে শুনবেন না। খুড়িমা আমার কাছে থাকবেন।" তারপর, খুড়িমার কোলের উপর অসীম নির্ভরের সহিত আপনার হাত রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু সে ঘুম আর ভাঙিল না। শুধু খুড়িমার এতদিনকার সঞ্চিত অশ্রুজল ঝরিয়া ঝরিয়া এই দুর্ভাগ্য সন্তানকে ধৌত ও ধন্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

দৈনিক নিদ্রা দীর্ঘনিদ্রা ও যোগনিদ্রা

১

আমরা প্রতি দিনই কিছু কালের নিমিত্ত নিদ্রিত হই। ইহাকেই দৈনিক নিদ্রা বলিতেছি। দীর্ঘ নিদ্রা শব্দে আমি মৃত্যুকে লক্ষ্য করিতেছি না। বিবিধ প্রাণিগণ, কেহবা শীতকালে কেহবা গ্রীষ্মকালে নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং সমস্ত ঋতুকাল ঐ অবস্থাতেই থাকে। ইহারা পরবর্ত্তী ঋতুতে জাগরিত হয়। ঋতুকাল ব্যাপী এই নিদ্রাকে আমি দীর্ঘ নিদ্রা বলিতেছি। যোগ নিদ্রা বলিতে যোগাবস্থাকে নির্দ্দেশ করিতেছি। এই ত্রিবিধ অবস্থা অর্থাৎ দৈনিক নিদ্রার অবস্থা, ঋতুকালব্যাপী নিদ্রার অবস্থা এবং যোগাবস্থা পরস্পরের সহিত তুলনীয়। আমি ১৩০৪ সালের ভাদ্রে "নব্যভারত" পত্রে লিখিয়াছিলাম যে "দৈনিক নিদ্রা, দীর্ঘনিদ্রা এবং যোগনিদ্রা যেন এক সূত্রেই গ্রথিত। ইহারা কি এক হইতে অন্যে ক্রমবিকশিত? লক্ষণের সমতা, মাত্রাভেদের সমতা এবং একটী হইতে অন্যটীর ক্রমিক বৃদ্ধি—এই সকল দেখিয়া ক্রম বিকাশ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও নিশ্চয় মত দেওয়া সম্ভব নহে।" আমি যে সকল কারণে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম তাহা নব্যভারতে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছিলাম, সে আজি প্রায় পাঁচ বৎসরের কথা। এই কাল মধ্যে শারীর বিজ্ঞান অনেক অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে। এতদ্দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনীতি সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছেন—তাঁহারা সে সকল তত্ত্ব অবগত হইবার সময় পাইতেছেন না। যাহা হউক, ঐ সকল অভিনব তত্ত্ব মধ্যে দেহের গণ্ড (gland) সকলের কর্ম্ম ও ফল অতি বিস্ময়কর। শারীর বিজ্ঞান গণ্ড বিষয়ক আশ্চর্য্যজনক তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া মানব সমাজকে স্তম্ভিত করিতেছে—সে সকলের প্রচার করা এস্থলে আমার উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য ত্রিবিধ নিদ্রার সম্বন্ধে এই সকল তত্ত্ব হইতে যে মত প্রতিপন্ন হয়, তাহাই আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

গণ্ড মাত্রেই কোষগুচ্ছ। পিটুটারি গণ্ড (Pituitary gland) নামক একটী গণ্ড মস্তিষ্কের নিম্নভাগে ঠিক নাসামূলের কিছু পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত। উহার আকার একটী মটরের ন্যায় এবং বর্ণ শ্বেত ও পীত মিশ্রিত। উহা দুই খণ্ড, যেন দুইটি গণ্ড একত্রে সংযুক্ত। এক খণ্ডকে পূর্ব্বাংশ ও অন্য খণ্ডকে পরাংশ বলা যাইতে পারে। পিটুটারি গণ্ডের পরাংশ হইতে যে রসক্ষরণ হয়, তাহা বিশ্লেষণ করতঃ রসায়নিক উপায়ে পিটুট্রিন্ নামক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পদার্থ দেহ মধ্যে ইঞ্জেক্‌সন দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যায় যে, রক্তের বেগ ও চাপ বাড়িয়াই যায় এবং কিছুক্ষণ বাড়িয়াই থাকে; মূত্রগণ্ড (kidney) হইতে মূত্র ক্ষরণ এবং স্তনগণ্ড হইতে দুগ্ধ ক্ষরণও বাড়িয়া যায়। মূত্রাধার ও জরায়ু পিটুট্রিনের ক্রিয়াবশতঃ পুনঃ পুনঃ সঙ্কুচিত হয়; এবং সম্ভবতঃ রক্তের মধ্যস্থ লবণের ভাগও নিয়মিত হইয়া থাকে। * * * পিটুটারি গণ্ডের পূর্ব্বাংশ হইতে কতিপয় কোষ অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া লইলে অর্থাৎ উহার আয়তন ছোট করিয়া দিলে দেখা যায় যে, দেহের অস্থির বৃদ্ধি হ্রাস হইয়া যায়; দেহে মেদ বৃদ্ধি হয়, নিদ্রা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, দেহের কেশ সকল খসিয়া পড়ে, মনোবৃত্তিও ন্যূনাধিক স্তব্ধ হইয়া যায়।

পিটুটারী গণ্ডের পূর্ব্বাংশ কাটিয়া ফেলিলে দেহের মেদবৃদ্ধি ও নিদ্রাবৃদ্ধি হওয়া বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবেন। দেহ মধ্যে পিটুট্রিনের ভাগ (ইঞ্জেক্‌সন দ্বারা) বাড়াইয়া দিলে রক্তের বেগ ও চাপ এবং মূত্রক্ষরণ বৃদ্ধি হওয়াতে

অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে যে, পরাংশের কতকভাগ কাটিয়া ফেলিয়া দিলে রক্তের বেগ ও চাপ এবং মূত্রক্ষরণ অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। প্রকৃত পক্ষে হয়ত তাহাই পিটুটারি গণ্ডের ক্রিয়া—বিশেষতঃ রসক্ষরণ ক্রিয়া, সময়ে বৃদ্ধি পায় সময়ে হ্রাস হয়; যেমন স্ত্রীজাতির রজঃক্ষরণ সময়ে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে তদ্রূপ; কিংবা পুরুষের অণ্ডের রসক্ষরণ ক্রিয়াও সময়ে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ।

এক্ষণে উপরের লিখিত ত্রিবিধ নিদ্রার লক্ষণগুলি স্মরণ করা আবশ্যক। দৈনিক গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় রক্তের বেগ ও চাপ কমিয়া যায়, দেহের তাপ কমে, (১) আহার ও মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়, (২) মনোবৃত্তি স্তব্ধ হয় বাহেন্দ্রিয় স্তম্ভিত হয়। স্নায়ুমণ্ডল, সুতরাং মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, পেশীগুলি কিঞ্চিৎ সবল হয়। আর, নিদ্রাভঙ্গ হইলে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসে। এ সকল লক্ষণ পিটুটারি গণ্ডের পূর্ব্বাংশ কতক কাটিয়া ফেলিলে এবং পরাংশ কতকভাগ কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ হয় প্রায় তদ্রূপ।

দীর্ঘনিদ্রার লক্ষণ প্রধানতঃ আটটী। (১) রক্তের গতি কমিয়া যায়; (২) দেহের তাপ চতুষ্পার্শ্বস্থ তাপের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিন্তু সম অনুপাতে নহে; (৩) স্নায়ুমণ্ডল সুতরাং মস্তিষ্ক কিছু দুর্ব্বল হয়, (৪) পেশী সকল বিশেষতঃ ডাইন দিকের হৃৎপিণ্ডের পেশী উত্তেজিত হয়; (৫) আহার ও মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ হয়; (৬) ইন্দ্রিয়গণ স্তম্ভিত হয়; (৭) মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অথবা প্রায় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়। (৮) শ্বাস প্রশ্বাস সম্পূর্ণ অথবা প্রায় সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়।—এ সকল লক্ষণও পিটুটারি গণ্ডের পূর্ব্বাংশ ও পরাংশ কতক কাটিয়া ফেলিবার মত। দীর্ঘ নিদ্রান্তেও নিদ্রা ভঙ্গ হইলে জীবগণ পুনরায় পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করে।

যোগনিদ্রা'র লক্ষণও প্রায় পূর্ব্ববৎ। ১ শ্বাস রোধ; ২ দেহতাপের ও রক্তের বেগ ও চাপের খর্ব্বতা; ৩ ইন্দ্রিয় স্তম্ভন; ৪ মনোবৃত্তি নিরোধ; ৫ আহার ও মলমূত্র নিরোধ; ৬ যোগ ভঙ্গে পূর্ব্বস্মৃতির পুনরাবর্ত্তন। যোগের আধ্যাত্মিক ফল আছে; সে ফল ছাড়িয়া দিলে কেবলমাত্র দৈহিক লক্ষণ এবং মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বাহ্যিক বিকাশ তুলনা করিলে দীর্ঘ নিদ্রার সহিত যোগনিদ্রার সাদৃশ্য স্বীকার করিতেই হয়। যোগনিদ্রার লক্ষণগুলিও পিটুটারি গণ্ডের পূর্ব্বাংশের এবং পরাংশের কতকভাগ কাটিয়া ফেলিবার মত; অর্থাৎ পিটুটারি গণ্ডের রসক্ষরণ কমিয়া গেলে যেরূপ হয় তদ্রূপ।

দীর্ঘ নিদ্রাগত জন্তুর পিটুটারী গণ্ড পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে দীর্ঘ নিদ্রিত অবস্থায় ঐ গণ্ডের রসক্ষরণ ক্রিয়া অনেক কমিয়া গিয়াছে, অথবা নাই। সুতরাং দৈনিক নিদ্রার এবং যোগনিদ্রায় ঐ গণ্ডের ক্রিয়ার হ্রাস হইবে অথবা প্রায় থাকিবে না ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া ডাক্তার বারম্যান মীমাংসা করেন যে, দীর্ঘনিদ্রা (Hibernation), বিশেষতঃ শীত ঋতুর দীর্ঘনিদ্রা (যাহাকে হিমনিদ্রা বলিতে পারি) তাহা দৈনিক নিদ্রারই বর্দ্ধিত অবস্থা। (১) আমি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বেই (১৩১৪) কতিপয় পরীক্ষা দ্বারা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে দৈনিক নিদ্রা, দীর্ঘ নিদ্রা এবং যোগ নিদ্রা বোধ হয় ক্রম-বিবর্ত্তন দ্বারা সংযুক্ত। আবার এখনও মনে হয় যে, একপ্রকার নিদ্রা অন্য প্রকার নিদ্রার বর্দ্ধিত অবস্থা নহে, ক্রম-বিবর্ত্তিত অবস্থা। একথা স্বীকার করিতে হয় যে এই ত্রিবিধ নিদ্রার স্থায়িত্বের তারতম্য আছে, গাঢ়ত্বেরও আছে। দৈনিক নিদ্রা অল্পকাল স্থায়ী এবং কম গাঢ়; দীর্ঘনিদ্রা অপেক্ষা-

১। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে আমাদিগের রক্তের তাপ চতুষ্পার্শ্বস্থ তাপ অপেক্ষা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই অধিক থাকে। সরীসৃপগণের তদ্রূপ নহে। অনেক জীবের তদ্রূপ নহে। তাহারা শীত অথবা গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ নিদ্রাগত হয়।

২। কদাচিৎ কখনও নিদ্রাবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ হইতেও দেখা যায়।

১। I. Winter sleep may be looked upon as an exaggeration of ordinary night slep.

Hiberuation p-65. (1922

কৃত অধিক কাল স্থায়ী এবং অধিক গাঢ়. যোগনিদ্রা তদপেক্ষাও অধিককাল স্থায়ী এবং ততোধিক গাঢ়। ইহা সম্ভবতঃ পিটুটারি গণ্ডের ন্যূনাধিক রসক্ষরণের ফল। যাহা হউক তুলনা-মূলক অনুশীলন করিতে গেলে সাম্য এবং অসাম্য দুইই দেখিতে হয়। দৈনিক নিদ্রায় শ্বাস প্রশ্বাস চলে, কিন্তু দীর্ঘ নিদ্রায় ও যোগনিদ্রায় শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হয়। এ স্থলে গুরুতর অসাম্য। আবার, দৈনিক নিদ্রায় গাঢ় নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে চক্ষু মুদিত থাকিলেও নানাবিধ বিস্ময়কর ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থা উভয় স্থলেই সমান। আর, ত্রিবিধ নিদ্রাতেই রক্তের বেগ ও চাপের হ্রাস, দেহের তাপের হ্রাস, স্নায়ুমণ্ডল সুতরাং মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, আহার ও মলমূত্রের নিরোধ, ইন্দ্রিয়গণের স্তম্ভন, মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। যদিও মাত্রাভেদ আছে তথাপি ওসকল লক্ষণ ত্রিবিধ নিদ্রাতেই দেখা যায়। এ সকল বিষয়ে লক্ষণের সমতা, কিন্তু মাত্রাভেদ। দৈনিক নিদ্রায় শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে সত্য, কিন্তু তাহার বেগ ও সংখ্যা কমিয়া যায়। হ্রাস হওয়া এবং বন্ধ হওয়াকেও মাত্রাভেদ বলিতে পারি।

দীর্ঘনিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে দেহে মেদ বৃদ্ধি হয়। দীর্ঘ নিদ্রিত অবস্থায় অনাহার সময়ে ঐ মেদ দ্বারা শরীর পোষণ হইয়া থাকে। এ লক্ষণ পিটুটারি গণ্ডের পূর্ব্বাংশের কতক ভাগ কাটিয়া ফেলিবার মত।

সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে ত্রিবিধ নিদ্রার ক্রম বিবর্ত্তন অনুমান করা অসঙ্গত হয় না।

এস্থানে যোগের আধ্যাত্মিক ফলের কথা এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, উহা পূর্ব্ব সংস্কারের অনুরূপ হওয়াই সম্ভব বোধ হয়। একথা যোগ শাস্ত্রের অন্তর্গত; অনধিকারীর এ বিষয়ে আলোচনা করা সঙ্গত নহে।

যাহা হউক, দেহ লক্ষণের আলোচনা হইতে আমরা এ সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছি যে, যোগাবস্থায় যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা প্রাণিগণের দীর্ঘ নিদ্রাবস্থার লক্ষণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর নহে। দৈনিক নিদ্রার অবস্থা হইতে যদিও (শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধে) যোগাবস্থা এবং দীর্ঘ নিদ্রাবস্থা গুরুতররূপে বিভিন্ন, তথাপি ভিন্ন শ্রেণীর নহে।

ক্রম বিবর্ত্তনে উত্তরোত্তর যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহার প্রথমটী হইতে শেষটি অর্থাৎ নিতান্ত অনুন্নত হইতে অত্যুন্নতটীর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী লক্ষণ সকলের সহিত প্রথমের ও শেষের তাদৃশ পার্থক্য থাকে না। কীট হইতে মানুষ কত বিভিন্ন। সরীসৃপ হইতে মানুষ বিভিন্ন হইলেও তাদৃশ নহে। এই নিয়ম অনুসরণ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, দীর্ঘনিদ্রার লক্ষণ ও হেতু সম্যক প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হইলেই দৈনিক নিদ্রার হেতুও কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে; কারণ দীর্ঘনিদ্রার অবস্থাকে অপর দুই নিদ্রার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বিবেচনা করা যায়।

আমরা বারান্তরে দীর্ঘনিদ্রার হেতু নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। আশা করি তাহাতে যোগনিদ্রাও কিছু কিছু বুঝিতে পারিব। তাহার পারমার্থিক ফল যদিও সম্যক্ বুঝিতে না পারি; কিন্তু এ কথা উপলব্ধি করিতে পারিব যে উহা পূর্ব্ব সংস্কারের এবং বিশ্বাসের উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করে।

শ্রীশশধর রায়।

পোষ্ট মাষ্টার

গল্প

ধড়ে ছাওয়া গ্রাম্য পোষ্ট আপিসের ভিতরে, নড়বড়ে টেবিলের সামনে, হাত ভাঙ্গা চেয়ারের উপর, বেগুনী রঙের আলোয়ান গায়ে ঐ যে যুবকটি বসিয়া কায করিতেছে, ওই এখানকার পোষ্টমাষ্টার বা ডাক বাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিতেই, বাহিরে ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনা গেল; 'রাণার' ডাক লইয়া আসিয়াছে। 'রাণার' প্রবেশ করিয়া ডাকের ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিল; বাবুকে প্রণাম করিয়া কপালের ঘাম মুছিল। ডাকবাবু ব্যাগের শীলমোহর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। রাণার তখন 'তামুক' খাইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

আপিস গৃহ এখন জনশূন্য। পিয়নেরা রান্না খাওয়া সারিয়া লইতেছে—খানিক পরেই আসিয়া জুটিবে, এবং নিজ নিজ বীটের চিঠি, মনি অর্ডার, রেজিষ্টারি প্রভৃতি বুঝিয়া লইবে। ব্যাগটি কাটিয়া বিমল উহা টেবিলের উপর উবুড় করিয়া ধরিল। চিঠিপত্র পার্শেল প্রভৃতির সঙ্গে, একটা প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের পাঁচ ছয়টা বিভিন্ন প্যাকেটও বাহির হইল। একটা প্যাকেট লইয়া বিমল তাহার দেরাজের মধ্যে রাখিল। (ইহা সে বাসায় লইয়া যাইবে এবং আহারাদির পর শয়ন করিয়া, খুলিয়া গল্প ও প্রেমের কবিতাগুলির রসাস্বাদন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িবে।) তার পর, চিঠির গাদা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতেও ৪।৫ খানি বাছিয়া লইয়া, দেরাজের মধ্যে লুকাইল। এগুলি সমস্তই খামের চিঠি এবং পুরুষের হস্তাক্ষরে, স্ত্রীলোকের নামে ঠিকানা লেখা। এগুলিও সে বাসায় লইয়া গিয়া, জল দিয়া খুলিয়া পাঠ করিবে;—শুধু প্রেমের গল্প কবিতা নয়, প্রেমের চিঠি পড়িতেও বিমল অত্যন্ত ভালবাসে। এটা সে একটা নির্দ্দোষ আমোদ বলিয়াই মনে করে; কারণ, চিঠিগুলি সে নষ্ট করে না, আবার জুড়িয়া, পরদিন ছাপ মোহর লাগাইয়া, বিলির জন্য পিয়নদের দিয়া থাকে। ছয় মাসের অধিক কাল বিমল এখানে আসিয়াছে—প্রত্যহই এইরূপ চিঠি অপহরণ করে;—এটা তাহার একটা নেশার মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

সাড়ে দশটা বাজিল; পিয়নেরা একে একে আসিয়া টেবিলের উভয় পার্শ্বে বসিয়া গেল। বিমল তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের পত্রাদি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিল; এই অবসরে, আমরা এই মহাপুরুষের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পরিচয় দিয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।

২

বিমলের নিবাস যশোর জেলার কোনও এক গণ্ডগ্রামে। তথায় একটি হাইস্কুল আছে—সেই স্কুলের উপরের ক্লাসগুলির প্রত্যেকটিতে দুই তিন বৎসর করিয়া কাটাইয়া, বিমল যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার গোঁফদাড়ি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এবং বয়স হইয়াছে ২২ বৎসর। গ্রামের লোকে সে সময় বলিয়াছিল, "বিমল যে দিন পাস হবে, সেদিন পূবের সূর্য্যি পশ্চিম দিকে উঠবে।" এইরূপ মন্তব্যের যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল। গ্রামের যত বওয়াটে ছোকরাই ছিল বিমলের বন্ধু; সখের থিয়েটার দলের সেই ছিল প্রধান পাণ্ডা; এবং গঞ্জিকা সেবন ত অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল, ইদানীং থিয়েটারের রিহার্সালে যে বোতলও গোপনে আমদানী হইত, তাহারও বিশ্বাসজনক প্রমাণ আছে।

কিন্তু যে ঘটনা অভাবনীয়, তাহাই ঘটিয়া গেল; গেজেট বাহির হইলে দেখা গেল, বিমল তৃতীয় বিভাগে পাস হইয়াছে,—অথচ সূর্য্যদেব গ্রামের লোকের ভবিষ্যবাণীর কোনও খাতিরই করিলেন না।

বিমল ছেলেটি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, কিন্তু তাহার মন্দভাগ্যের জন্য আজও বিবাহ হয় নাই। সংসারে তাহার মা ও জেঠাইমা (উভয়েই বিধবা), একটি ছোট ভাই, একটি বিধবা ভগিনী এবং দুইটি জেঠ্‌তুতো ভাই বর্ত্তমান। বড়টি স্থানীয় জমিদারী কাছারিতে সামান্য বেতনে মুহুরীগিরির কর্ম্ম করে—ছোট ভাই দুটি স্কুলে পড়ে। বিমলেরও এখন অর্থোপার্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িল,—সামান্য যাহা জোৎজমা আছে তাহাতে সংসার চলে না। তাহার এক মামাশ্বশুরের সঙ্গে, ২৪ পরগণার পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল; তাঁহারই সুপারিশে সে ডাক-বিভাগে কর্ম্ম পায়। আলিপুরের হেড আপিসে বৎসর খানেক শিক্ষানবিশী ও একটিনি করিয়া, আজ ছয় মাস হইল সে এই মহেশপুর ডাকঘরের সাব পোষ্ট মাষ্টার হইয়া আসিয়াছে।

হেড আপিসে থাকিতে পাঁচজন উপরওয়ালার অধীনস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমলের মোটেই ভাল লাগিত না; এখানে আসিয়া সে স্বাধীন হইয়াছে। সরকারী বাসাটি ভাল, পিয়নেরা আজ্ঞাকারী, খাদ্য দ্রব্যাদি সুলভ; এমন কি, পল্লীগ্রাম হইলেও এখানে "বিলাতী" পাওয়া যায়—তবে সোডা পাওয়া যায় না, জল মিশাইয়া খাইতে হয়, এই যা একটু অসুবিধা। সুতরাং মোটের উপর বিমল এখানে ভালই আছে বলিতে হইবে।

৩

পিয়নগণ স্ব স্ব ব্যাগ ভরিয়া পত্রাদি লইয়া রওয়ানা হইয়া গেলে, বিমল অপহৃত মাসিকপত্র খানি ও চিঠিগুলি হাতে করিয়া আপিস ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাতে তালা বন্ধ করিল। বাসায় প্রবেশ করিয়া উঠান হইতে বলিল, "বামুন মা, রান্নার কত দূর?"

একজন বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণ বিধবা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "রান্না আমার শেষ হয়েছে, তুমি চান করে' এস বাবা।"—ইঁহার বাড়ী এই পাড়াতেই, বড় গরীব, মাত্র চারিটি টাকা বেতনে বিমলকে দুই বেলা রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যান।

বিমল নিজ ঘরে গিয়া, চিঠি গুলি ও মাসিক-পত্র খানি বালিসের নীচে গুঁজিয়া, কোট প্রভৃতি খুলিয়া রাখিয়া, একটা শিশি হইতে কিঞ্চিৎ তেল ঢালিয়া মাথায় দিয়া, সাবান গামছা ও বস্ত্র লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গেল। স্নান করিয়া আসিয়া, ভিজা কাপড়খানি শুকাইতে দিয়া, জামা পরিয়া, আর্সি চিরুণী ও বুরুষ লইয়া পরিপাটি রূপে নিজ কেশসংস্কার করিল। তারপর রান্না ঘরের বারান্দায় বিছানো আসন খানির উপর বসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

বিমলকে খাওয়াইয়া 'বামুন মা' যখন চলিয়া গেলেন তখন বেলা প্রায় ১২টা। বিমল পাণ চিবাইতে চিবাইতে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া, শয়ন ঘরে প্রবেশ করিল। এক গেলাস জল ও একখানি ছুরী লইয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) ছোট টেবিল খানির উপর রাখিয়া, বিছানায় বসিয়া, বালিসের তলা হইতে মাসিক পত্র ও চিঠিগুলি বাহির করিল। জলে আঙুল ভিজাইয়া, প্রত্যেক চিঠির মুখে বেশ করিয়া বুলাইয়া, সেগুলি সারিবন্দি টেবিলের উপর রাখিয়া, মাসিক পত্রখানির মোড়ক ছিঁড়িয়া ফেলিল। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোনও চিঠির মুখের জল শুষ্ক হইয়াছে কি না। মাঝে মাঝে সেগুলির মুখ আবার ভিজাইয়া দিতে লাগিল। যখন বুঝিল এইবার সময় হইয়াছে, তখন মাসিক পত্রখানি রাখিয়া, ছুরির ফলা চিঠির মুখে ঢুকাইয়া উল্টাদিকের চাপ দিয়া একে একে চিঠি গুলি খুলিয়া ফেলিল।

প্রথম চিঠিখানি বাহির করিয়া দেখিল, তাহার সহিত একখানি দশ টাকার নোট। বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, আজ বউনি হল মন্দ নয়!" নোট খানি বালিশের তলায় গুঁজিয়া রাখিয়া, চিঠির ভাঁজ খুলিল। প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন। বিমল সাগ্রহে

চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। কলিকাতা-প্রবাসী বিরহী স্বামী স্বীয় বিরহ যন্ত্রণার অনেক বর্ণনা করিয়াছে; লিখিয়াছে বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া, তাহার হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধরিয়া, সকল জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে—সে জন্ম দিন-গণনা করিতেছে। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়া, খোকার দুধ খরচের জন্ম ১০টি টাকা পাঠাইতেছে। এ ব্যক্তির আরও কয়েকখানি পত্র ইতিপূর্ব্বে বিমল পাঠ করিয়াছিল—সে জানিত, লোকটি কলিকাতায় চাকরির জন্ম উমেদারী করিতেছিল।

এ পত্রখানি রাখিয়া, বিমল দ্বিতীয় পত্রখানি খুলিল। "পূজনীয়া পিসিমা!" সম্বোধন দেখিয়া—"ধুত্তোর" বলিয়া সক্রোধে চিঠিখানি বিছানার উপর ফেলিয়া, তৃতীয় পত্রখানি উন্মোচন করিল।

এই লোকের চিঠিও মাঝে মাঝে বিমল পড়িয়াছে—তাহা হইতে ইহাদের পূর্ব্বকথা কিছু কিছু সে অবগত ছিল। মেয়েটির নাম চারুশীলা—সে বিধবা, বোধ হয় বালবিধবা। এই মহেশপুর গ্রামের দক্ষিণে রসুলপুরে তাহার বসতি—খুব সম্ভব ঐ স্থান তাহার শ্বশুরালয়। তাহার পিত্রালয় কলিকাতায়;—কলিকাতা নিবাসী এই পত্রলেখকের সহিত তাহার প্রণয় সংঘটিত হয়। পত্র লেখককে পত্রশেষে কখনও নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছে বলিয়া বিমলের স্মরণ হয় না—সে সহি করে—"তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী", "তোমার ভালবাসা,"—"তোমার সে,"—এইরূপ সব মাথামুণ্ড। বিগত ৩৪ মাস হইতে ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রেমপত্র চলিতেছে—তবে, মেয়েটির লেখা চিঠি বিমল কখনও দেখিবার সুযোগ পায় নাই;—নাম না জানাতে, রওয়ানা চিঠি গুলির মধ্যে হইতে সেখানি বাছিয়া বাহির করা শক্ত বলিয়াও বটে; এবং সময় পাওয়া যায় না বলিয়াও বটে,—কারণ বিভিন্ন গ্রামের ডাক বাক্স হইতে পিয়নেরা চিঠি বাড়িয়া আনিবার সময় ডাকঘরে অনেক লোকজন থাকে, ছাপ মোহর দিয়া ব্যাগ ভর্ত্তি করিবার ধুম পড়িয়া যায়।

বিমল সাগ্রহে পত্রখানি পাঠ করিল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

কলিকাতা
২২শে অগ্রহায়ণ

আমার হৃদয়েশ্বরী

গতকল্য তোমায় একখানি পত্র লিখিয়াছি—তাহা তুমি পাইয়া থাকিবে। তাহাতে লিখিয়াছিলাম, আমি আগামী শনিবার দিন গিয়া তোমায় লইয়া আসিব। কিন্তু শনিবারে যাওয়ার সুবিধা করিতে পারিলাম না। পরদিন—অর্থাৎ রবিবার দিন আমি নিশ্চয় যাইব তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তুমি পূর্ব্ব পরামর্শ মত, রাত্রি ঠিক ১২টার সময়, তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে সেই শিব মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে—আমি পূর্ব্ব হইতে মন্দিরের পার্শ্বস্থ সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় লুকাইয়া থাকিব; এবং তুমি আসামাত্র তোমাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিব। যান বাহনাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিব তাহা এখন বলিতে পারি না—হয়ত হাঁটিয়াই উভয়ে ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আইন অনুসারে আমাদের বিবাহের সমস্ত আয়োজন আমি করিয়া রাখিয়াছি—পুরোহিতও স্থির হইয়াছে—সোমবার দিন আমি যথাশাস্ত্র তোমার পাণিগ্রহণ করিব। এ সম্বন্ধে আমি উকীল ব্যারিষ্টার গণের পরামর্শও লইয়াছি। তাঁহারা বলেন, যদি তোমার শ্বশুরকুলের কেহ, এই লইয়া আমার উপর মামলা মোকর্দ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তবে, তোমার বয়স ১৮ বৎসরের অধিক হইয়াছে এবং তুমি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসিয়াছিলে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই কেহই আর আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে। সেইজন্ম আমি, জন্ম মৃত্যু রেজেষ্টারি আপিস হইতে, তোমার জন্মদিনের সার্টিফিকেটের নকল পর্য্যন্ত আদায় করিয়া আনিয়াছি। সুতরাং সকল দিকেই আটঘাট বাঁধা রহিল। রবিবার সন্ধ্যার ট্রেণে আমি রওয়ানা হইয়া, ষ্টেশনে নামিয়া, রাত্রি

দশটার মধ্যেই তোমাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিব। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, গৃহের বাহির হইও—আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের মিলনের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইবে।

অধিক আর কি লিখিব। আমার শূন্য গৃহে আসিয়া তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও—আমার শূন্য হৃদয়ে বসিয়া আমাকে চিরসুখী কর। ইতি

তোমার (মন) চোর।

এই পত্রখানি পড়িয়া বিমল আপন মনে বলিয়া উঠিল—কি চমৎকার! এ যে রীতিমত একটা নভেলী ব্যাপার! বাঃ—বাঃ—ক্যা মজাদার! ক্যা তোফা! বাহবা চারুশীলা—ব্রাভো! জিতা রও বাবা—থ্রিচিয়ার্স কর চারুশীলা। বেশ—বেশ করবে তুমি যাবে—মাইকেল ত লিখেনই দিয়ে গেছে—"যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে"—ব্রজাঙ্গনা কাব্য দেখ! গড্ ব্লেস্ দি হ্যাপি কেপ্লার—তোমাদের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করবে না বাবা? লুচি খেয়ে আসতাম!

অতঃপর বিমল বাকী পত্র দুইখানি পড়িয়া দেখিল; এ দুখানিই মামুলি-স্বামীর মামুলি প্রেমের চিঠি—তাহাতে প্রেমের চেয়ে দরকারী কথাই বেশী—কোনও বিশেষত্ব নাই। বিমল এই ছয় মাসের মধ্যে বৈধ ও অবৈধ সহস্রাধিক প্রেমপত্র পড়িয়াছে, সে জানে বৈধ প্রেমের চিঠি অপেক্ষা, অবৈধ প্রেমের চিঠিতেই "মজা" বেশী থাকে। পত্রগুলি আবার জুড়িয়া রাখিয়া বিমল মাসিকপত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমে উহা তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল; সে তখন পাশ ফিরিয়া, পাশের বালিসে পা দিয়া আরামে ঘুমাইতে লাগিল।

৪

অপরাহ্নকালে বিভিন্ন গ্রাম হইতে পিয়নেরা ফিরিয়া আসিলে বিমল তাহাদের নিকট হইতে মনি অর্ডার রেজিষ্টারি প্রভৃতির রসিদ বুঝিয়া লইয়া, খাতা পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। কার্য্যশেষ হইলে, ভৃত্যকে বলিল, "ওরে, যা দেখি, হরেন সার দোকান থেকে এক বোতল বিয়াইব নিয়ে আয়। চাদরের ভিতর বেশ করে' লুকিয়ে নিয়ে আসবি—বুঝেছিস? আর, করিমদ্দিকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাস।"—বলিয়া বিমল, সরকারী তহবিল হইতে ভৃত্যের হস্তে ছয়টি টাকা দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, পিয়ন করিমদ্দি সেখ আসিয়া বলিল, "হুজুর ডেকেছেন?"

বিমল বলিল, "হ্যাঁ। আজ একটা কাউলের কারি বানিয়ে দিতে পারবে হে শেখের পো?"

করিম বলিল, "কেন পারবো না হুজুর?"

"আচ্ছা—এই টাকা নাও। বেশ মোটা তাজা দেখে একটা মুরগী কিনে এন। বেশ করে' লঙ্কাবাটা দিও—আমরা বাঙ্গাল মানুষ, ঝালটা কিছু বেশী খাই।"—বলিয়া বিমল ক্যাশ হইতে তাহাকেও একটি টাকা দিল।

কাযকর্ম্ম শেষ হইলে, ক্যাশ হইতে আর তিনটি টাকা লইয়া, দ্বিপ্রহরে লব্ধ সেই দশ টাকার নোটখানি ক্যাশে রাখিয়া ক্যাশ পূরণ করিল। ক্যাশ মিলাইয়া তাহা লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া, আপিসঘরে চাবি দিয়া বিমল বাসায় গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বামুন মাকে দেখিয়া বলিল, "মা, আজ শরীরটে কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে, আজ রাত্রে ভাতটা আর খাবনা, খান কতক পরোটা ভেজে রেখে দেও। তরকারী টরকারী বেশী কিছু দরকার নেই—খানকতক আলুভাজা হলেই চলবে।"—বলিয়া সে মুখহাত ধুইতে চলিয়া গেল। (মাঝে মাঝে—বিশেষ, বেতন পাইবার পর ২।৪ দিন বিমলের এরূপ গা ম্যাজ ম্যাজ করিয়া থাকে—এবং রাত্রে ভাতের পরিবর্ত্তে লুচী বা পরোটা ফরমাস করে।) মুখহাত ধুইয়া আসিয়া, বিমল এক পেয়ালা চা পান করিয়া, পাণ মুখে দিয়া ঘোষেদের বৈঠকখানায় পাশা খেলিতে গেল—প্রত্যহই এইরূপ যায়।

রাত্রি ৮টা বাজিতেই বামুন মা পরোটা ও আলুভাজা

বিমলের শয়ন ঘরে ঢাকিয়া রাখিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে, বিমল বাসায় আসিয়া রামচরণ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "করিমর্দ্দি এসেছিল?"

রামচরণ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ। ঐ রেখে গেছে।" —বিমল দেখিল, একটি এনামেলের বড় বাটীতে তাহার আকাঙ্ক্ষিত কাটলেট কারি ঢাকা রহিয়াছে।

বিমল তখন ভৃত্যকে রাত্রের মত বিদায় দিয়া, সদর দরজা বন্ধ করিয়া, শয়নঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেওয়ালে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল—তাহার আলো বাড়াইয়া দিয়া, যথাস্থান হইতে বোতল, গ্লাস এবং কার্কস্ক্রু বাহির করিয়া, শয্যাপার্শ্বস্থ (সরকারী) টেবিলের উপর রাখিল; জুতা মোজা ত্যাগ করিয়া, বিছানার ধারে বসিয়া বোতলটি খুলিয়া ফেলিল।

এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালাটি পাড়িয়া তাহাতে ছড় দিতে লাগিল। একটা গৎ বাজাইয়া আর এক গ্লাস পান করিয়া, বেহালা যথাস্থানে রাখিয়া ভাবিল, সেই মজার চিঠিখানা আর একবার পড়িতে হইবে! দেওয়াল আলমারি খুলিয়া, চিঠিগুলি বাহির করিয়া, চারুশীলার খানি বাছিয়া লইয়া বলিল—"এঃ, খুলে ফেলেছি যে দেখ্‌ছি। কুছ পরোয়া নেই—ফের খুলবো!"—বলিয়া টলিতে টলিতে বিছানায় আসিয়া বসিল। চিঠিখানিকে সামনে ধরিয়া বলিল, "কি চাঁদ, জল খাবে? না ব্রাণ্ডি?"—বলিয়া গেলাসে খানিক ব্রাণ্ডি ঢালিয়া, আঙুলে একটু লইয়া চিঠির মুখ ভিজাইয়া বলিল, "যা বেটা, তোর চিঠিজন্ম সার্থক হয়ে গেল।" পরে ব্রাণ্ডিটুকু পান করিতে করিতে, চিঠিখানি খুলিতে চেষ্টা করিতেই উহার মুখ ছিঁড়িয়া গেল। চিঠিখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "ছিঁড়ে গেলি? কাল্ বিলি হবি কি করে রে শালা?"—বলিয়া খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া, খামখানা ছিঁড়িয়া মেঝের উপর ফেলিয়া বলিল —"জাহান্নমে যাও!" চিঠি খুলিয়া, পড়িল—"আমার হৃদয়েশ্বরী!" চিঠি রাখিয়া নিজ বক্ষে হাত দিয়া, চক্ষু মুদিয়া অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল— "হৃদয়েশ্বরী!—হৃদয় জ্বলে গেল,—পুড়ে গেল,—খাক্ হয়ে গেল! একটু খাই"—বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া, পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জিহ্বা তখন তাহার জড়াইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া, নেশা হইলে, সে আর 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না—'স' স্থানে 'ছ' বলিত। একটি একটি কথায় জোর দিয়া পড়িতে লাগিল—

"কিন্তু—ছনিবারে,—যাওয়ার—ছুবিধা করিতে—পারিলাম না। পরদিন—অর্থাৎ রবিবারে—আমি নিশ্চয় যাইব তাহাতে কোন ছন্দেহ নাই। তুমি—পূর্ব্ব পরামর্শ মত—রাত্রি ঠিক ১২টার ছময়—তোমাদের বাড়ীর পশ্চিমে ছেই ছিবমন্দিরের ছম্মুখে আছিয়া দাঁড়াইবে।"

চিঠি রাখিয়া, আর কিঞ্চিৎ পান করিয়া, গম্ভীর মুখে কি ভাবিতে লাগিল। অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে, মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিল—"এ চিঠি ত তুমি পাবে না মণি! খাম খানাই যে ছিঁড়ে ফেলেছি। পূর্ব্ব চিঠি মত—তুমি ছনিবারে রাত ১২টায় এছে ছিবমন্দিরের কাছে দাঁড়াবে। তার আছাপথ চেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—অবছেছে ক্লান্ত হয়ে বছে পড়বে—বছে বছে ক্রমে শুয়ে পড়বে। কিন্তু ছে ত আছবে না। অল্‌রাইট্—আমি যাব। আমি গিয়ে তোমায় বল্‌বো—

উঠ উঠ হে ছুন্দরী,
তব পদছ্‌পর্শ যোগ্য নহে এ ধরণী!
তুমি কেন ধূলায় পতিত?

তুমি চল—আমার ছঙ্গে চল। চল ছখি, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী হবে। হৃদয়ের ছঙ্গী—না ছুরি? হৃদয়ের ছুরি হোয়ো না দোহাই বাবা হাতজোড়াই তোমায়!" —বলিয়া চক্ষু খুলিয়া, আপন রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া বিমল একটু হাসিল। গ্লাসের বাকীটুকু পান করিয়া ফেলিয়া, আবার চিঠিখানি লইয়া পড়িতে বসিল। পড়িল—

"আমার ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়া, তুমি লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হও। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে বসিয়া আমার চিরদুঃখী

কর। ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া গৃহের বাহির হইও—আশা করি তাঁহার আশীর্ব্বাদে, আমাদের মিলনের পথ হইতে সকল বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইবে।"

চিঠি রাখিয়া বিমল বলিতে লাগল—উত্তম কথা!—কিন্তু দাদা, তোমারই হৃদয় কি শূন্য? আমারও যে তাই। আমার শুধু শূন্য সব শূন্য। আমার হৃদয় শূন্য - প্রেম নেই; গৃহ শূন্য ইহ—গিন্নী নেই—বাক্সো শূন্য, টাকা নেই! আমার সব শূন্য—মহাব্যোম—ব্যোম ভোলানাথ—শনিবার রাত ১২ টায় আমি যাব—তোমার মন্দিরের কাছে বটগাছের নীচে আমি লুকিয়ে থাকবো—চারুশিলাকে নিয়ে এসে, আমার শূন্য গৃহ শূন্য হৃদয় পূর্ণ করবো। তুমি হচ্চ বিঘ্ন বিনাশনের বাপ—তাকে সাবধান করে দিও—যদি কোনও বাধা বিঘ্ন ঘটে - তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রুরকে এর জন্যে রেসপন্‌সিবিল হতে হবে—এই ছাপ্‌ কথা আমি বলে রাখলাম।"

বলিয়া বিমল বীররসের সহিত বিছানায় এক মুষ্ট্যাঘাত করিল, চক্ষু খুলিল। আর খানিকটা সুরা ঢালিয়া, জল মিশাইয়া পান করিয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিল "লেডিস্ এণ্ড জেন্টেলমেন, তোমরা ভাবছো—মাতালছা নানা ভঙ্গি—এখন এ বেটা মদের খেয়ালে এই সব বলছে—কাল এসব কিছুই মনে থাকবে না। তা নয় তা নয়—হাম যায়েঙ্গা—আলবৎ যায়েঙ্গা।—মুখ ঢেকে যায়েঙ্গা—আমায় চিনতে পারবে না। তার পর এই বাছার এসে তাকে বন্দিনী। আদরে যত্নে মিঠে কথায় ইহজিন্দগির লোককে বশীভূত করতে কতক্ষণ?—আর আমার এ চেহারাটাও কি কোনও কাযে লাগবে না?—এখন একটু ঘুমো যাক্।" বলিয়া মাতাল বিছানায় দেহ লুটাইয়া দিয়া, নিদ্রা ঘোরে অচেতন হইয়া পড়িল। কোথায় রহিল তার পরোটা—আর কোথায় রহিল তার সাধের কালিকাবি!

৫

খামের উপর শ্রীমতী চারুশীলা দাসী ঠিকানা লেখা থাকিলেও, এবং রসুলপুর গ্রামে যথার্থই একজন চারুশীলা দাসী থাকিলেও, পত্রখানা তাহার জন্য উদ্দিষ্ট নহে। তাহার নামেই পত্র আসে বটে, কিন্তু পত্র না খুলিয়াই, চারুশীলা সেখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া পাশের বাড়ীতে তাহার প্রিয়সখী বনলতাকে দিয়া আসে। ইহাই গোপন বন্দোবস্ত। সব কথা খুলিয়াই বলি।

বনলতা, বনে জন্মগ্রহণ করে নাই—খাস কলিকাতা সহরে, তাহার মাতুলালয়ে জন্মিয়াছিল। বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া, বনলতা মামার বাড়ীতেই মানুষ হইতে থাকে। মামা বড়লোক ছিলেন; নিজের মেয়েদের সঙ্গে বনলতাকেও ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বজাতীয় একটি যুবক, কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িত—তাহার সহিত বনলতার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু মাস কয়েক পরেই সেই হতভাগ্য যুবক কাল-কবলিত হয়। বনলতার মামা, অভাগিনী ভাগিনেয়ীকে আরও লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। গত বৎসর উইল করিয়া তাহাকে বিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিয়া, ইহধাম হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

যে লোকটি "তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষী" "তোমার মনচোর" ইত্যাদি বলিয়া চিঠি সহি করে, তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল- ইঁহাদেরই জ্ঞাতি। সে লোকটিও সুশিক্ষিত এবং উদারমতাবলম্বী। ব্রহ্মদেশে সেগুন কাঠের তাহার বিস্তৃত কারবার আছে—কলিকাতায় তাহার ব্র্যাঞ্চ আছে। বনলতার মামার শ্রাদ্ধ উপলক্ষেই বর্ম্মা হইতে নরেন কলিকাতায় আসে এবং বিধবা বনলতার সহিত পরিচিত হয়। তাহাদের বাড়ী ভিন্ন হইলেও, প্রত্যহই এ বাড়ীতে সে আসিতে লাগিল এবং এসব ক্ষেত্রে যাহা হয়—প্রথমে আঁখি মজিল, তার পর মন মজিল। ব্যাপার অবগত হইয়া বনলতার মামাতো ভাইয়েরা, নরেনের সহিত তাহার বিধবা-বিবাহ দিতেও কৃতসংকল্প হইলেন।

এই খবর কাকমুখে রসুলপুর গ্রামেও আসিয়া পৌঁছিল। উইলের সংবাদও পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছিল। বনলতার শ্বশুর কলিকাতায় গিয়া, বনলতার

মাসতো ভাইদের উপর উকীলের চিঠি দিয়া, মহা হাঙ্গামা করিয়া, বিধবা পুত্রবধূকে "উদ্ধার" করিয়া আনেন।

রসুলপুরে আসিয়া বনলতা প্রথমে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। মাস খানেক পরে, পাশের বাড়ীর সমবয়সী চারুশীলার সহিত তাহার সখীত্ব জন্মে। চারু, তার স্বামীর অভিমতে, বনলতার সহিত তাহার হস্তাকাঙ্ক্ষীর পত্রবিনিময়ে এইভাবে সহায়তা করিতে সম্মত হয়।

অপহৃত পত্র খানিতে লেখা ছিল, "গত কল্য তোমায় পত্র লিখিয়াছি যে, শনিবার রাত্রে গিয়া তোমায় লইয়া আসিব।" সে পত্রখানি যথাসময়ে চারুর হস্তগত হয়, এবং যথা-নিয়মে বনলতাকে সেখানি সে দিয়াও আসে। অন্যান্য পত্র, বনলতা পড়িয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু এ পত্রখানিতে সময় তারিখ ইত্যাদি লেখা ছিল বলিয়া, বাক্সে লুকাইয়া রাখে। বনলতার শাশুড়ী তাহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তাহার অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে তিনি তাহার বাক্স পেটরা গোপনে খানাতল্লাসীও করিয়াছেন—কিন্তু এপর্য্যন্ত "দোষজনক" কিছুই পান নাই। এই পত্রখানি পৌঁছিবারর পর দিন, দ্বিপ্রহরে বনলতা চারুশীলাদের বাড়ী গিয়াছিল—সেই সুযোগে তাহার শাশুড়ী অন্য চাবি দিয়া তাহার বাক্স খুলিয়া, পত্র খানি পাঠ করেন এবং স্বামীকে দেখান। স্বামী বলেন, "আচ্ছা, আসুক না পাজি, তাকে উচিত মত শিক্ষা দেওয়া যাবে।"

শনিবার দিন বনলতার শ্বশুর তাঁহার দুইজন বন্ধুকে রাত্রে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শাশুড়ী, নানা অছিলায়, রান্না-বান্নায় বিলম্ব করিলেন। অতিথিদ্বয়ের আহার যখন শেষ হইল, রাত তখন ১১টা।

অন্য দিন রাত্রি ১০টা না বাজিতেই বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়ে। আজ বনলতা ছটফট করিতেছে, কিন্তু বাড়ীর সকলে জাগিয়া; শাশুড়ী-ননদেরা তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছেন। ওদিকে বৈঠকখানায়, ১২টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বনলতার শ্বশুর, তাঁহার বন্ধুদ্বয় সহ, লাঠি ও দড়ি সঙ্গে হইয়া, শিব-মন্দিরের পশ্চাতে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই, ওভারকোট গায়ে, মাথায় মুখে কম্ফর্টার জড়ানো, বিমল ধীরে ধীরে আসিয়া বটবৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াইল। ক্ষণপরেই হঠাৎ তিন জন লোক আসিয়া তাহার মাথায়, পার্শ্বে, বুকে, পদদ্বয়ে লাঠি, কিল, চড়, ঘুসি ও লাথি মারিতে মারিতে তাহাকে মাটীতে পাড়িয়া ফেলিল। প্রহারে চোটে তৎপূর্ব্বেই বিমলসংজ্ঞাহীন হইয়াছিল।

লোক তিনজন তখন অচেতন বিমলের হস্তপদ উত্তমরূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। এক ব্যক্তি কহিল, "বেটা বেঁচে আছে ত? না মরেছে?"

অপর ব্যক্তি তাহার নাকের কাছে হাত দিয়া বলিল, "না—নিশ্বাস ত বেশ পড়ছে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এখন, একে কি করা যায় বল দেখি? এইখানেই কি পড়ে থাকবে?"

"না না—আমাদের বাড়ীর কাছে কেন? শেষ কালে কি কোনও বিপদে পড়বো?"

"তবে চল, বেটাকে নিয়ে খানিক দূরে কোথাও ফেলে রেখে আসা যাক্।"

"দেশলাইটে জ্বাল ত, লোকটা কে, দেখি।"

এক ব্যক্তি দেশলাই জ্বালিল। তিন জনেই তখন বলিয়া উঠিল, "এ কি! এ যে পোষ্ট মাষ্টার!"

দেশলাই পুড়িয়া গেল। আবার যেমন অন্ধকার তেমনই অন্ধকার।

তখন তিন জনে ফিস্ ফিস্ করিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। "এ বেটাই বা এখানে এল কেন? যে বেটার আসবার কথা সেই বা এল না কেন?"

"সে যা হোক তা হোক—এখন চল একে মহেশপুরে পোষ্ট আপিসের বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে আসা যাক্।"

তিনজনে তখন অচেতন বিমলের দেহ বহন করিয়া লইয়া চলিল। পল্লীগ্রামের পথ—রাত্রি দ্বিপ্রহর—রাস্তায় আলো নাই—জনমানবের সঞ্চার নাই।

৬

শীতে, খোলা বারন্দায় পড়িয়া থাকিয়া, ঘণ্টা দুই পরেই বিমলের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে সেই আবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া, নানারূপ উপায় ফন্দি চিন্তা করিতে লাগিল।

ক্রমে ভোর হইল। একজন পিয়নকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া, বিমল ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল।

পিয়ন আসিয়া বলিল, "বাবু, ব্যাপার কি?"

বিমল চিঁচিঁ করিয়া বলিল "ডাকাতি রে, ডাকাতি! আগে আমার প্রাণটা বাঁচা।"

সে ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া অন্যান্য পিয়নকে ডাকিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া বিমলের বন্ধন রজ্জু খুলিয়া দিল।

বিমল বলিল, "আমার বুক পকেট থেকে চাবি নে। ডাকঘর খোল্, খুলে, মেঝের উপর আমায় শুইয়ে দিয়ে থানায় খবর দিগে যা।"

পিয়নেরা তাহাই করিল। বিমল কাৎরাইতে কাৎরাইতে বলিল—"সব পিয়ন যা। দারোগা প্রথমে তোদেরই জবানবন্দি নেবে কিনা!"

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলবো হুজুর?"

"যা জানিস—যা দেখেছিস—সবই বলবি।"

পিয়নগণ যখন চলিয়া গেল, তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে। বিমল টলিতে টলিতে উঠিয়া, সরকারী লোহার সিন্ধুক খুলিল। তাহার মধ্যে নোটে, টাকায় ৫৪২৲ ছিল—সেগুলি সমস্ত বাহির করিয়া, রুমালে বাঁধিয়া, বাসায় গিয়া নিজ ট্রাঙ্কে লুকাইয়া রাখিয়া—আসিয়া ডাকঘরের মেঝেতে পূর্ব্ববৎ শুইয়া রহিল।

৭

দুইদিন পরে, কলিকাতার কাগজে কাগজে ছাপা হইল—

ভীষণ ডাকাতী

পোষ্ট আফিস লুট।

বিগত শনিবার রাত্রে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামের পোষ্ট আপিসে একটি ভয়ানক ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট মাষ্টার, বাবু বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাত্রি ১১টার সময় ডাকঘরে বসিয়া হিসাব মিলাইতে-ছিলেন, পিয়নেরা তৎপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে আর কেহ ছিল না। ৫।৬জন যুবক হঠাৎ ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রিভলবার বাহির করিয়া বলে—"খবর্দার চীৎকার করিও না, গুলি করিব। লোহার সিন্দুকের চাবি দাও।" ইহাতে পোষ্ট মাষ্টার বলেন, "তা কখনই দিব না—প্রাণ দিব তবু সরকারের টাকা দিব না।" একজন যুবক তৎক্ষণাৎ পিস্তলের বাঁট দিয়া বিমলবাবুর মস্তকে সজোরে প্রহার করে। অপর যুবকগণ তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া, তাঁহার বুকে বসিয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলে। তার পর হস্তপদাদি রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া চাবি খুঁজিতে থাকে। চাবি পাইয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া পূর্ব্ব দিনের ক্যাশ ৫৪২৲ লইয়া, সিন্দুক বন্ধ করণান্তর পোষ্ট মাষ্টারকে বাহিরের বারান্দায় আনিয়া, শোয়াই দেয়। আফিস ঘরে তালা বন্ধ করিয়া, চাবির গোছা পোষ্ট মাষ্টারের পকেটেই ভরিয়া দিয়া তাহারা পলায়ন করে। প্রকাশ, ডাকাতগণের মুখে কালো মুখস, গায়ে কালো কোট, পায়ে বুটজুতা ছিল, এবং তাহারা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তার মাঝে মাঝে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল। এই ডাকাতী সম্পর্কে গত কল্য কলিকাতার কয়েকটি ছাত্রাবাসে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে—এবং পুলিস, তিনজন যুবককে সন্দেহ ক্রমে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।"

* * *

শেষ পর্য্যন্ত ডাকাতেরা কেহই ধরা পড়ে নাই। আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া বিমল সরকারের টাকা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এই বিশ্বাসে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বিমলকে ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত করিয়া দিলেন।

রবিবার রাত্রে নরেন যথাস্থানে আসিয়া, বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। বনলতা পত্রে এখানকার সমস্ত ঘটনা তাহাকে জানাইয়াছিল

মাস খানেক পরে একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে, রমলতা পলায়ন করিয়া, পরস্পরে ষ্টেসন ষ্টেশনে গিয়া নরেনের সঙ্গে মিলিত হয় এবং উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া যায়। তার শ্বশুর কলকাতায় গিয়া থানায় এবং উকীল বাড়ীতে অনেক ছুটাছুটি করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। নরেনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কৈলাস পর্ব্বত মান সরোবর দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সন ১৩৩০ সালের ২৪ শে বৈশাখ আমার সাংসারিক জীবনের একটি প্রধান দিন। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা দুর্গা-ময়ীর বিবাহ হইয়া গেল। মেয়ের বিবাহের পর মা নিজের শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলেন। আমিও শ্রীশ্রীদুর্গা ময়ীর আসল শ্বশুরবাড়ী শ্রীকৈলাস ধাম দর্শনে যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

আমার বাড়ী বর্দ্ধমানের খুব সন্নিকট—বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে একক্রোশ উত্তরে রায়ান গ্রামে। ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুভ পঞ্চমী তিথিতে আমি গৃহ হইতে যাত্রা করিলাম। বর্দ্ধমান হইতে সোজা একখানি কাশীর টিকিট খরিদ করিলাম। এক্সপ্রেস ট্রেণ ধরিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে বঙ্গ দেশ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। শীঘ্রই রাণীগঞ্জ পার হইয়া মধুপুর ও ঝাঝার কাছে পৌঁছিয়া শাস্ত্রকথিত ঝারখণ্ড দেশের মধ্য দিয়া রেল লাইন যাইতে লাগিল। দু'ধারেই ছোট পাহাড়, সামান্য সামান্য জঙ্গল, যেন হিমালয় পর্ব্বতের ছায়া। শীঘ্রই বৈদ্যনাথের কাছাকাছি পৌঁছিলাম। উত্তর মুখ হইয়া সদাশিবকে মনে মনে নমস্কার করিলাম।

ট্রেণ নিজের গতিতে চলিয়াছে। পাহাড় পর্ব্বত সমূহ পার হইয়া বেহারের বড় বড় মাঠ দিয়া যাইতে লাগিলাম। এখনও জ্যোৎস্না নয় তাই কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছিলাম। নানারকম চিন্তা করিতে করিতে শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কাশী পৌঁছিবার পূর্ব্বে রাস্তাতে রাজগির কুণ্ডে স্নান করিয়া যাইব ইচ্ছা করিয়াছিলাম। বক্তিয়ারপুর ষ্টেশন হইতে একটি ছোট লাইন, বক্তিয়ারপুর বেহার লাইট রেলওয়ে রাজগির কুণ্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে। বক্তিয়ারপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়া ছোট লাইন ধরিয়া অতি প্রত্যূষে রাজগির কুণ্ড পৌঁছিলাম। রাজগির কুণ্ড হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, এখানে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে। এবৎসর চান্দ্রমাস অনুসারে একটি অধিক মাস পড়িয়াছে, সেই কারণে অনেক হিন্দুস্থানী যাত্রীর সমাগম হইয়াছে।

রাজগির কুণ্ডে ছয়টি বড় বড় তপ্ত কুণ্ড ও একটি বড় ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্ম কুণ্ডের জল বড়ই তপ্ত। ইহা একটি মস্ত বড় কূপের মত। নিকটে কয়টি দেব দেবীর মন্দির। তপ্ত কুণ্ড গুলিতে স্নানাদি করিয়া মন্দির গুলিতে দেবার্চ্চনা করিতে হয়। এই স্থানে পুরাকালে একটি বৃহৎ নগর ছিল। কলিকাতায় যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে, সেই রকম পুরাকালের ইতিবৃত্তে বর্ণিত নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই স্থানের পর্ব্বত গুলিতে জৈনদিগের অনেক মন্দির ও তীর্থঙ্কর-দিগের যোগাশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে পরেশনাথ পর্য্যন্ত যে সকল গিরিমালা বিস্তৃত, সমস্তগুলি জৈন সম্প্রদায়দিগের তীর্থস্থান।

দিন দুয়েক রাজগিরে থাকিয়া আবার বক্তিয়ারপুরে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রী কাশীধাম পৌঁছিলাম। বাবা বিশ্বনাথের নগরীতে দুই চারি দিন থাকিয়া গঙ্গাস্নান ও বাবার আরতি দর্শন করিলাম। অন্নপূর্ণার প্রসাদ

পাইয়া জয়োদশীতে বেলা ১১ টার সময় লক্ষ্ণৌ এর এক খানি টিকিট কিনিয়া এক্সপ্রেস ট্রেণে অযোধ্যাপুরী হইয়া লক্ষ্ণৌ পৌছিলাম। ছেলেবেলায় লক্ষ্ণৌয়ে থাকিতাম এবং এইখানেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম। একবার আসিয়া পুরাতন বন্ধু বান্ধবদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লইলাম। লক্ষ্ণৌ হইতে পশ্চিম উত্তরাভিমুখে একটি ছোট লাইন সীতাপুর হইয়া কাঠগুদাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানে বড় লাইন ছাড়িয়া সেই ছোট লাইন ধরিয়া আমাকে যাইতে হইবে। ২৯শে মে সন্ধ্যার সময় ছোট লাইনের গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া রোহিলখণ্ড কুমায়ুঁ রেলওয়ের মেন লাইনের উপর পিলিভিত ষ্টেশনে ৩০শে তারিখ প্রাতে পৌছিলাম। পিলিভিতে গাড়ী বদল করিতে হইবে. নূতন লাইন ধরিয়া টনকপুর যাইতে হইবে। টনকপুর রেল পথের শেষ সীমা, এইখান হইতেই পদব্রজে হিমালয়ে যাত্রা করিতে হইবে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন টনকপুর ব্রাঞ্চ ছিল না, তখন পিলিভিত হইতেই হাঁটা পথ আরম্ভ হইত। পিলিভিত একটি জেলা সহর। পিলিভিতে দুই একদিন থাকিব স্থির করিলাম, কারণ এখানে রাস্তার অনেকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। ষ্টেশনের কাছে একটি ধর্ম্মশালা আছে, সেইখানে যাইয়া উঠিলাম। ধর্ম্মশালাটি অতি সুন্দর। দ্বিতল পাকা বাটী বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উপর তালাতে একটি ঘরে থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ধর্ম্মশালার ম্যানেজার বৃদ্ধ পণ্ডিত কানাইয়ালাল বড় ভাল লোক। আমি যে পথে যাইব সেই পথে তিনি পিথোরাগড় পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, সেখান পর্য্যন্ত পথের খবর তাঁহার কাছে ভাল করিয়া জানিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন, যদিও পিথোরাগড় পর্য্যন্ত পথ, পার্ব্বতীয় হইবার কারণ বড়ই কষ্টকর, কিন্তু পথে থাকিবার কোনই কষ্ট হইবে না। কারণ, স্থানে স্থানে সরকারি ডাকবাঙ্গলা আছে ও সরকারের তরফ হইতে খাদ্যদ্রব্যাদির দোকানও আছে। পথে যাইবার জন্য ঘোড়া ও কুলি পাওয়া যাইতে পারিবে। পিথোরাগড়ে তিনি তাঁহার কোনও বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখিয়া আমার হস্তে দিলেন, ডাকে পাঠাইলে পাছে দেরি হইয়া যায়।

স্বহস্তেই পাক করিয়া, দ্বিপ্রহরে আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যার সময় একবার সহর বাজার ঘুরিয়া আসিলাম। রাস্তাগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দোকানগুলিও বেশ ভাল, আর ব্যবসা বাণিজ্যও বেশ চলিতেছে। মসলাপাতির দোকান খুব বড় বড় আছে, কারণ এ সমস্ত জিনিষ এইখান হইতেই পাহাড়ে সরবরাহ হইয়া থাকে। এখানে কাঠের কায খুব ভাল হয়। কারুকার্য্য খচিত খড়ম অতি সুন্দর। রঙ্গিন খাটের পায়া, বাক্স ও নানা রকম দ্রব্য পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া সাথীর জন্য খোঁজ করিতে লাগিলাম কিন্তু কিছুই হইল না। পণ্ডিত কানাইয়ালালও বলিলেন, টনকপুরে গেলেই কেহ না কেহ একজন জুটিয়া যাইবে, সেইখানে একদিন অপেক্ষা করাই শ্রেয়। খানিকটা রাস্তার কথা জানিতেই পারিয়াছিলাম; রাস্তায় কি দরকার হইবে তাহারও একটা মোটামুটি আভাস পাইয়াছিলাম আমার সহিত অনেক বেশি কাপড় চোপড় ছিল, সেই জন্য ইংরাজি স্যুট ইত্যাদি এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে এইরূপ সমস্ত দ্রব্য এইখানেই রাখিয়া যাওয়া স্থির করিলাম।

৩১শে মে খুব সকালে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া জিনিষপত্র গোছাইয়া ফেলিলাম। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি লইয়া, বাকি সমস্ত একটি ট্রাঙ্কে ও হোল্ডলে ভরিয়া পণ্ডিতজীর কাছে রাখিয়া দিলাম। সঙ্গে এই কয়েকটি দ্রব্য লইলাম—খুব মোটা নেপাল দেশীয় দুইখানা ছোট কম্বল, একখানি খুব গরম কিন্তু ছোট আলোয়ান; সময়ে এইখানি পাতিবার বিছানা হইবে ও অন্য সময়ে গায়ে দেওয়াও চলিতে পারিবে; কম্বল দুইখানি গায়ে দিবার জন্য। একটি টুপি ও একটি কম্ফর্টার এগুলিও নেপাল দেশীয় বিশুদ্ধ পশমের সেই কারণ খুব গরম; গায়ে দিবার জন্য দুটি কামিজ, একটা ওয়েষ্ট-

কোট, একটা গরম সোয়েটার, একটি নেপালী চৌবন্দি, একটা গরম কোট। নেপালী পোষাকে চৌবন্দির উপর ইংরাজি ক্যাসানের কোট পরা হয়। দুইখানি ধুতি, ও নেপালী ক্যাসানের একটা গরম পাজামা, এক জোড়া মোটর সোল জুতা, গরম মোজা, ও কাপড়ের জুতার মত এক জোড়া খুব পাতলা চামড়ার জুতা (যাহা জুতার ভিতর পরা যাইতে পারে) জলপাত্রের জন্ত কাশী হইতে একটা কমণ্ডলু কিনিয়াছিলাম, একটা গেলাস ও ছোট বাটি যা তাহার ভিতর ধরিতে পারে, ও একটা ছোট রেকাবি যাহার দ্বারা কমণ্ডলুর জল ঢাকিতে পারা যায়।

ছুচ সূতা ছুরি ও কাগজ পেন্সিল কাপড় কাচা সাবান ও স্নান করিবার সাবান লইলাম। পাহাড়ে উঠিবার জন্ত একটি লাঠিও লইতে হয়; কিন্তু লাঠিতে আমার সুবিধা হয় না সেই কারণে লইলাম না।

তাড়াতাড়ি কমণ্ডলুতেই ভাত ও আলুভাতে চড়াইয়া দিলাম। রাঁধিয়া খাইয়া সকালে ৯ টার সময় ট্রেণ ধরিলাম। ট্রেণে খুবই ভিড় হইল, কোন রকমে বসিবার একটু স্থান পাইলাম। টিকিট থার্ড ক্লাসের কেনা হইয়াছিল, কারণ গাড়ীতেই লোকদের কাছে রাস্তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব। আমি যে গাড়ীতে ছিলাম অনেকগুলি পাহাড়ী সেই গাড়ীতেই ছিল, তাহাদের কাছে পাহাড়ের অনেক সন্ধান পাইলাম। জঙ্গল ও ছোট ছোট পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে করিতে, দূরে হিমালয়ের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিন ঘণ্টায় মাত্র ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম।

টনকপুর ষ্টেশনে নামিয়া জিনিসগুলি লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইলাম। বাহিরে দাঁড়াইতেই একটা নেপালী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া জানিতে পারিলাম তিনি আজ দুইদিন হইল টনকপুর আসিয়াছেন এবং পিথোরাগড় যাওবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। ইঁহার নাম রাধাকৃষ্ট নেওয়ার—ইনি নেপাল সরকারে কর্ম্ম করিতেন, কাঠমণ্ডু হইতে বাহাল পত্র পাইয়া এখন কাঠমাণ্ডু হইতে গোরখপুর হইয়া এখানে আসিয়াছেন। পিথোরাগড় হইতে গোরখপুর হইয়া ঝুলঘাট দিয়া তিনি নেপালের পশ্চিমাংশে বাটাদি মোকামে যাইবেন—সেখানকার তিনি ঠিঠা নিযুক্ত হইয়াছেন। নেপালের পরিচিত বন্ধুদিগের নাম করিতে তিনি আমার বিশেষ খাতির করিতে লাগিলেন। যখন বলিলাম আমিও ঐ রাস্তায় যাইব তখন বড়ই খুসী হইলেন। জিনিসপত্র লইয়া তাঁহাদের বাসায় পৌঁছলাম। তাঁহাদের বাসায় যাইয়া আর আর সকলের সঙ্গ সাক্ষাৎ হইল। তাঁর পিতা, ভগিনী-পতি, স্ত্রী, ভগিনীও তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন, একটি চাকরও সঙ্গে আছে।

পত্র লিখিবার জন্ত পোষ্টাপিসে গেলাম। আমি কৈলাস দর্শনের জন্ত তিব্বতে যাইতেছি এ কথা বাড়ীতে কাহাকেও বলিয়া আসি নাই। "পাহাড়ে যাইব" ও আরও কিছু আভাস কেবল আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়াছিলাম। এখন হিমালয়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি ও হিমালয় দর্শনে যাত্রা করিতেছি এই কথাই বাড়ীতে পত্র লিখিলাম—বাকিটা এখনও পরিষ্কার করিলাম না। তাহার অন্ত কোন কারণ ছিল না—মনে এখনও কিছু সন্দেহ ছিল, কঠিন পথে যাত্রা, কিছুদূর পর্ব্বতে না যাইলে এবং পথের সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে সাহসে কুলাইবে কি না ও ভগবানের কৃপা হইবে কি না বলিতে পারি না। পোষ্ট আফিসে বসিয়াই ঘোড়ার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অনেকগুলি ঘোড়াওয়ালা আসিল, কিন্তু কিছুই ঠিক হইল না। কাছেই একটি কুলি এজেন্সি আছে, সেখানে গেলাম। কিন্তু কুলি-এজেণ্টকে দেখিতে না পাইয়া বাসার দিকে ফিরিতেছি, দেখিলাম, একটি ছোকরা, পরিধানে ধুতি কোরতা কিন্তু মাথায় হ্যাট দিয়া চলিয়াছে। মনে করিলাম, ছোকরাটি লেখাপড়া অবশ্যই জানে। তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া বাজারের আরও বিষয় জানিতে পারিলাম—ঘোড়াওয়ালাদের আড্ডার সন্ধান পাইলাম। দুইটি ঘোড়া ঠিক করিয়া ফেলিলাম। লোহা ঘাট পর্য্যন্ত প্রতি ঘোড়ায় ১০৲ টাকা

করিয়া ভাড়া। বাজারের পিছনে একটি ছোট শিব মন্দির আছে, তাহার সংলগ্ন একটি বড় বাগান ও একটি ছোট পান্থশালা আছে, একটি পাতকুয়া থাকায় জলের খুব সুবিধা আছে। একজন গোরখপন্থী সাধু এই স্থানের মালিক। তাঁর অনুমতি লইয়া, এইখানেই রাত্রি-বাস স্থির করিলাম। জিনিস পত্র ও নেওয়ার মহাশয়দের এইস্থানে লইয়া আসিলাম। টনকপুর একটি মণ্ডি বা বড় বাজার, এখানে শীতকালে খুব ব্যবসা বাণিজ্য হইয়া থাকে। ভুটিয়ারা তিব্বত দেশ হইতে পশম ও সোহাগা আনিয়া এইস্থানে বিক্রয় করিয়া কাপড়, অন্যান্য পণ্যদ্রব্য খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি তিব্বতে বিক্রয় করিবার জন্য কিনিয়া লইয়া যায়। অনেকে বড় ব্যবসাদার, কলিকাতা বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইয়া তেজারতি মাল আসবাব লইয়া আসে। কিন্তু টনকপুরই তাহাদের একটি প্রধান বাজার। শীতকালে যদিও এখানে অনেক লোক থাকে, কিন্তু এ সময়ে বাজারটি প্রায় শূন্য। মাত্র দুই তিনটি দোকান আছে, বাকি বড় বড় দোতালা একতালা দোকানগুলি এখন তালাবদ্ধ। সহরের দৃশ্য অতি মনোরম। চতুর্দ্দিকেই বন জঙ্গল, উত্তরে হিমালয়ের পর্ব্বতমালা, পূর্ব্ব দক্ষিণে সারদা নদী। এই সারদা নদী এইস্থানে ভারত ও নেপালের সীমানির্দ্দেশ করিতেছে। স্থানটি পাহাড়ের তরাইয়ে অবস্থিত, সেই কারণ বড়ই গরম।

রৌদ্রে ট্রেণে আসিয়া ও দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে বেড়াইয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছে। মনে করিলাম, একবার নদীতে স্নান করিয়া আসিলে শরীর একটু শীতল হইবে। পোষ্ট আফিসে যাইয়া পোষ্ট মাষ্টারকে সঙ্গী করিয়া লইলাম। আরও দুই একটি ছোকরা ও পূর্ব্ব কথিত হ্যাটধারী নব্য যুবক সকলে মিলিয়া স্নানে বাহির হইলাম। নদী খুব সন্নিকটে। বর্ষাকালে যদিও নদী খুব বড় ও ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এ সময়ে খুব ছোট—কুলু কুলু রবে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর গর্ভেও সর্ব্বত্রই বড় বড় পাথর। গর্ভের ভিতর প্রায় আধ মাইল হাঁটিতে হইল। জলের মধ্যেও বড় বড় পাথর। জলে নামিয়াই বুঝিতে পারা গেল, এখনও জলের স্রোত এত বেশী যে সাঁতার দিলেই বেগে ভাসিয়া যাইতে হইবে। অতএব বেশী দূর না যাইয়াই স্নান করিতে হইল। কেহ কেহ, সাঁতার দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। জল অতি শীতল ও পরিষ্কার। সমস্ত দিনের উত্তাপ ভোগের পর শীতল জলে স্নান করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিলাম। সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই রাত্রিবাসের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। ভগবৎ কৃপায় আজ সমস্তই ঠিক মত চলিয়াছে,—সঙ্গী জুটিয়াছে, তার লইবার ঘোড়া ঠিক হইয়া গিয়াছে, পথের খবরও জানিতে পারিয়াছি। মনের শান্তিতে ভগবৎ চিন্তা করিতে লাগিলাম। কি আনন্দ! কাল হইতে হিমালয় দর্শন ও পরিভ্রমণ আরম্ভ হইবে। সুখে নিদ্রা যাইলাম।

১৮ই জৈষ্ঠ ১লা জুন। আজ সুপ্রভাত। খুব প্রত্যূষে—তখনও সামান্য অন্ধকার আছে,—ঘোড়াওয়ালা আসিয়া আমাদিগকে জাগাইল। জিনিস গুলি গুছাইয়া ভাল করিয়া বাঁধিয়া একটি ঘোড়ার উপর বোঝা দেওয়া গেল। কিছু জিনিস আমার নেপালী বন্ধুদের চাকরটি লইবে। বাকি একটি ঘোড়া সওয়ারীর জন্য খালি রাখা হইল। আমার কম্বল দুই খানি এবং দুই এক খানি কাপড় তার পিঠের উপর পালান স্বরূপ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমার বাকি জিনিস ও কাপড় গুলি নেপালী বন্ধু দিগের বাণ্ডিলের ভিতর দিলাম। মধ্যেপথে যখন কেহ বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, সেই সময় একটু সওয়ারি করিয়া শ্রান্তি অপনোদন জন্য অপর ঘোড়াটি সওয়ারির জন্য রাখা হইল। সমস্ত ঠিক করিতেই বেশ সকাল হইয়া গেল—আমরাও দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া, কৈলাসপতিকে নমস্কার করিয়া যাত্রা করিলাম।

বাজারের বাহিরেই জঙ্গল। তাহার মধ্য দিয়া উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথ বেশ সমতল, দুধারেই বন জঙ্গল। এটি খয়ের গাছের জঙ্গল। শাল ও অন্যান্য গাছও আছে, কিন্তু খয়ের গাছই বেশী।

জঙ্গলের শোভা অতি মনোরম। গ্রীষ্ম কালের সকাল বেলাটা বেশ শীতল বোধ হইতেছে। পাখীগুলি ভগবানের গুণগান করিতেছে। সূর্য্যদেবের আভাসও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, রক্তবর্ণ হইয়া তিনি মানবকে সতর্ক করিতেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আমরা চলিয়াছি। চারি মাইল পথ চলিয়া হাথীখোড়ের পর্ব্বতের নীচে পৌছিলাম। এই খান হইতেই হিমালয় আরম্ভ হইবে এবং খুব চড়াই চলিবে। পর্ব্বতের পদপ্রান্তেই একটি ছোট নদী ঝুর ঝুর করিয়া বহিতেছে; বড়ই পরিষ্কার শীতল জল। এই স্থানে সকলেই মুখ হাত ধুইলাম। আমি স্নানাদিও করিলাম। পরিষ্কার জলে অনেক গুলি ছোট ছোট মাছ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখা গেল। বড় বড় পাথর আছে, ধরিবার চেষ্টা করিলেই তার তলায় লুকাইতেছে। চাকরটি পিছাইয়া পড়িয়াছিল, আমি ও রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; অপর সকলেই অগ্রসর হইলেন। চাকরটি পৌছিলে আমরা রওনা হইলাম।

একটু অগ্রসর হইয়াই পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলাম। আরম্ভেই খুব চড়াই। রাস্তাটি ক্রমাগত আঁকাবাঁকা হইয়া চলিয়াছে। পথটি বড়ই খারাপ—বড় পাথুরে। একটু চড়িয়াই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে লাগিলাম। দেখি আমার বন্ধুর স্ত্রী ও তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি, (ইহাকে আমি এখন হইতে জামাই বাবু বলিব) ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। রাধা কৃষ্ণের পিতা অজ অম্বর ও ঘোড়াগুলি অগ্রসর হইয়াছে। মিনিট কয়েক বিশ্রাম করিয়া সকলেই আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছু দূর যাইয়া আবার সকলে বসিয়া পড়িলাম। এবার অনেকটা উপরে আসিয়াছি। একবার টনকপুরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—কি সুন্দর দৃশ্য! টনকপুরটি যেন জঙ্গলের মধ্যে একটি গৃহ, জঙ্গলগুলি যেন বাগান, পার্শ্বস্থিত সারদা নদী দূরে যেন একটি সাদা রেখার মত দেখা যাইতেছে; রেলের লাইনটি যেন একটি কালো রেখা।

আজ প্রথম দিন—তাই সকলের উৎসাহ খুব বেশি আছে। কিন্তু অনভ্যাসের জন্য শীঘ্র শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আরও কিছু দূর যাইয়া আঁকাবাঁকা পথ সোজা হইল, রাস্তাটি বেশ ভাল হইল—কিন্তু বরাবর চড়াই চলিয়াছে। সূর্য্যদেবও একটু উপরে উঠিয়াছেন, বেশ উত্তাপও আরম্ভ হইয়াছে। চাকরটি সুরু হইতেই পিছনে পড়িতেছে; আবার সে আমাদের সঙ্গ ছাড়া হইয়াছে। আমি নিজেও একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। সকলেরই বড় পিপাসা পাইয়াছে। আরও দুই তিন মাইল উপরে না যাইলে জল পাওয়া যাইবে না, আমি তাই অপর সকলকে অগ্রসর হইতে বলিলাম। টনকপুর হইতে হাথীখোড়ের নদী প্রায় ৪ মাইল আসিয়াছি। সেখান হইতে হাথীখোড়ের চড়াই ৯ মাইল উঠিয়া সুখীডাঙ্গের নীচে না পৌছিলে এই সাড়ে চার ক্রোশ পথের মধ্যে কোথাও একটি জলাশয় নাই। একটি ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি এই পথের মধ্যে আম খরক বা আমাপোয়া নামক স্থানে একটি জলসত্র দিয়াছেন। দুই ক্রোশ দূর হইতে জল আনিয়া এই জলসত্রে রাখা হয়, আমা পোয়া না পৌছিলে কাহারও জল পাইবার আশা নাই।

পশ্চিম দিকের পর্ব্বতটি খুব উচ্চ ও পূর্ব্ব দিকে নীচু হইয়া গিয়াছে। সমস্তটাই খুব ঘন জঙ্গল, দেবদারু ও শালগাছ। রৌদ্র প্রখর হওয়াতে আমরা আরও কষ্ট পাইতে লাগিলাম। এতক্ষণে আমারও খুব পিপাসা বোধ হইল; আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

আরও কিছু উঠিয়া আমাপোয়া পৌছিলাম। বসিয়া মুখ হাত ধুইয়া একটু জল খাইলাম। দেখিলাম, যে লোকটি জল খাওয়াইতেছে সে নিজের রন্ধন কার্য্য করিতেছে। জানিতে পারিলাম, লোকটি ব্রাহ্মণ। বলিলাম, "বাবা, বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছি, কিছু খাওয়াইলে ভাল হয়।" পয়সা দিতে চাহিলাম, তাহা লইতে সে অনিচ্ছা প্রকাশ না করিয়া বলিল, "আমার এই মোটা রুটি ও ডাল আছে, ইহা যদি আপনার খাইতে ইচ্ছা হয় তবে প্রস্তুত আছে।" দুই জনেই ডাল রুটি খাইলাম,

খাইয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। বোধ করি নানা রকমের ব্যঞ্জনাদি দিয়া ভোজন করিলে কোনমতে এরূপ তৃপ্তি হইত না। পর্ব্বতের এমন স্থানে ভোজনের প্রবন্ধ হওয়া যেন মা অন্নপূর্ণার ব্যবস্থা। আহারান্তে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বিশ্রাম করিয়া, ভোজনদাতা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

ইতিমধ্যে চাকরটি আসিয়া জুটিয়াছিল। সঙ্গীরা আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এখনও খুব রৌদ্র আছে সেই জন্য বিশ্রাম করিতে করিতে চলিতে বাধ্য হইলাম। আর বেশী চড়াই নাই, কিন্তু বরাবরই উপরে উঠিতেছি। সম্মুখে আরও বড় বড় উচ্চ পাহাড় দেখা যাইতেছে। সর্ব্বত্রই ঘন জঙ্গল, কোথাও মনুষ্যের বসবাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই সমস্ত জঙ্গলে নানা রকম বন্য পশু ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু থাকে। পর্ব্বতটীর নাম হাথীখোঁড় বলা হইয়াছে, কারণ ইহার পার্শ্ব ঘন জঙ্গলে বন্য হস্তীও আছে। পর্ব্বতের পাদস্থিত যে নদীতে আজ সকালে আমরা মুখ ধুইয়াছিলাম, বন্য হস্তীরা তথায় জল খাইতে আসে; সেই জন্য ইহার নাম হাথীখোঁড়। আরও কিছু দূর উঠিয়া হাথীখোড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ—ইহার নাম ভোলিয়া ঘাট বা সুখী ডাং। সুখী ডাং পর্ব্বতের উপর একটি ডাক বাঙ্গলা আছে। এই স্থানটি টনকপুর হইতে ১২ মাইল। ভোট দেশীয় নেকড়াই চণ্ডীর গল্প যাহা পড়িয়াছিলাম, এই স্থানে পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহা দেখিতে পাইলাম। পথের পার্শ্বে একটি গাছের শাখাগুলিতে নানা রকম রঙের কাপড়ের টুকরা ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলাম। পার্ব্বতীয় পথিক যে কেহ এই দিক দিয়া যায়, সুবিধামত একটু কাপড় ছেঁড়া পার্ব্বতীয় ভূত প্রেতাদির প্রীত্যর্থে গাছে বাঁধিয়া দিয়া যায়। আমিও এই গাছে এক টুকরা কাপড় বাঁধিয়া দিলাম। আমাদের বঙ্গদেশে কোথাও নেকড়াই চণ্ডী আছেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু কাটোয়ার দক্ষিণে কুচি গ্রামের সন্নিকটে এক ঢেলাই চণ্ডী আছেন জানি। কোনও পথিক সেই রাস্তায় যাইলে ঢেলাই চণ্ডিকে ঢেলা দিয়া যান।

এইখান হইতেই একবার চলখি নদী পর্য্যন্ত উৎরাই। একটু দূর নামিয়াই একটি জলের ঝরণা আছে। সেই খানে আমার বন্ধুদিগের কাছে যাইয়া পৌঁছিলাম। তাঁহারা এই স্থানে রন্ধনাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটু বসিয়া বিশ্রাম করিয়া আমি বলিলাম, আমি অগ্রসর হইতেছি আপনারা আসুন। চাকরটি আবার পিছনে পড়িয়াছিল।

এবার উৎরাই—খুব গড় গড় করিয়া যাইতে লাগিলাম। শীঘ্রই চল্‌খির তীরে পৌঁছিলাম। চল্‌খি নদী যদিও খুব বড়, কিন্তু এই গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া খুব ছোট হইয়াছে। বর্ষাকালে ইহা ভয়ানক হইয়া থাকে। পারাপারের সুবিধা না থাকায় রাস্তাটি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। চল্‌খি নদীর উপর একটি বেশ বড় পুল ছিল, কিন্তু নদী এমনই দুর্দান্ত যে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। এখন প্রায় দুই মাইল উপরিভাগে একটি ঝোলা পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষাকালে উহার উপর দিয়া মনুষ্যাদি যাতায়াত করে, কিন্তু ঘোড়া ও অন্যান্য বড় জন্তু পার হইতে পারে না। এ সময়ে দুইখানি মোটা কাঠ রাখিয়া গ্রামবাসীরা পুল করিয়া দিয়াছে তাই পারাপারের বেশ সুবিধাই আছে। চল্‌খির উপরিভাগে পিথিয়া ও গিথিয়া—শাস্ত্রে গণ্ডকী নামে অভিহিত হইয়াছেন। গণ্ডকীতে স্নান করিলাম। পরিষ্কার শীতল জলে স্নান করিয়া সমস্ত দিনের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বেশ পরিষ্কার হইল, তাহাতে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এখনও অনেকটা দিন ছিল, কাপড়গুলিকে বেশ ভাল করিয়া ধুইয়া শুকাইতে দিলাম। কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে আমার নেপালী বন্ধুরা আসিয়া মিলিত হইলেন।

এইবার আমার সম্মুখে দিউরি পাহাড়ের চড়াই। রৌদ্রের উত্তাপ কম হইয়া গিয়াছে, স্নান করিয়া ক্লান্তি দূর হইয়াছে, এইবার ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আবার চলিতে লাগিলাম। প্রথম যদিও চড়াই খুব বেশী নয়, কিন্তু কিছু দূরে যাইয়া বড়ই কঠিন চড়াই, আবার সেই সকালের মত আঁকা বাঁকা রাস্তা। কিছু দূর উঠিয়াই আবার

সকাল বেলার মত অবস্থা হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পুরুষেরাও তথৈবচ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু দিউরি এখনও অনেকটা পথ। সন্ধ্যার সময় পার্ব্বতীয় দৃশ্য অতি সুন্দর। সূর্য্যদেবের লাল ছটা যেন পর্ব্বতের কোলে একটি রাঙ্গা ছবি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। চলিবার আর ক্ষমতা নাই। ঘোড়া ওয়ালারা আগেই চলিয়া গিয়াছে, আজ খালি ঘোড়াটির কোন ব্যবহার করা গেল না। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিকে একটি অগ্নি দেখা দিয়াছিল। এটা দাবাগ্নি কি ভীষণ! আমাদের দেখিতে দেখিতে একটা জঙ্গল পুড়িয়া গেল। অনেকটা দূরে, বোধ হইতেছিল, কেহ যেন একটা ছাদের উপর লাল কালি বুলাইয়া দিল। আমাদের চলৎশক্তিও রহিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু না চলিলে উপায় নাই সেই কারণে চলিতেছি। ডিঠা রাধাকৃষ্ণ বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার নাক দিয়া ভয়ানক রক্তস্রাব হইতে লাগিল। বিষম সঙ্কট—একবিন্দু জলও নাই যে তাঁহাকে খাওয়ান যাইবে। অল্পক্ষণ বসিবার পর তিনি একটু সুস্থ হইলেন। ধীরে ধীরে চলিয়া রাত্রি নয়টার পর আমরা দিউরি পৌছিলাম। সমতল জমীর উপর দুই একটা দোকান ও একটা ডাক বাঙ্গালা। এই স্থানেই আজ বিশ্রাম। আজ ১৮ মাইল পথ আসিয়াছি। কম্বল পাতিয়া যেমনি শোয়া তেমনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

সত্যবালা
(উপন্যাস)

নবম পরিচ্ছেদ

এস নিনা।

কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী গভীর নিদ্রার পর কিশোরী যখন কিয়ৎ পরিমাণে সচেতন হইল, তখন হঠাৎ সে স্মরণ করিতে পারিল না এখন সে কোথায়, কি অবস্থায় রহিয়াছে। চক্ষু খুলিয়া, প্রদীপের ক্ষীণালোকে চারিদিকের গুহাগাত্র দেখিয়া কতক কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—"ঠিক। আমি ত সুদূর সিকিমে বৌদ্ধমঠে রহিয়াছি।" তন্দ্রাঘোরে আবার তাহার চক্ষু দুইটি মুদিয়া আসিল। আধ তন্দ্রা আধ জাগরণের অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ কাটিলে, সহসা বাহিরে পার্ব্বত্য পক্ষিগণের কল ঝঙ্কারের শব্দে সে সম্পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠিল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল—গুহাগাত্রের ফাটলের ভিতর দিয়া অতি মৃদু প্রভাতালোক প্রবেশ করিতেছে—ঘরের মেঝেতে দীপাধারের উপর প্রদীপটি নির্ব্বাণ-প্রায়। তখন গত রাত্রের সকল কথা একে একে তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমটা তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ সমস্ত বাস্তবিকই কি ঘটিয়াছিল? অত ধন—রূপার টাকা, সোণার টাকা, সোণা রূপার বাট, হীরা মোতি—এসব কি বাস্তবিকই আমি দেখিয়াছি? না, স্বপ্ন মাত্র? মনের এই অবস্থায়, ইতস্ততঃ চক্ষু সঞ্চালন করিতে করিতে গুহা গাত্রে স্থাপিত, শ্বেত প্রস্তরের সেই ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তির পানে দৃষ্টি পড়াতে তাহার ভ্রম কাটিয়া গেল—সে কৃতনিশ্চয় হইল যে সমস্তই যথার্থ ঘটিয়া গিয়াছে—স্বপ্ন নহে। অপর কক্ষ হইতে নিশ্বাস প্রশ্বাসের গভীর শব্দ শুনিতে পাইয়া তাহার ইহাও মনে পড়িয়া গেল যে, নিনা ঐ কক্ষে একাকিনী শয়ন করিয়া আছে।

কিশোরী তখন শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, ধ্যানীবুদ্ধকে প্রণাম করিল। অস্ফুটস্বরে বলিল—"উঃ—আচ্ছা ঘুমিয়েছি যা হোক!" বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল —নিনার বিপুল ধনরাশির চিন্তাতেই তাহার মন ছাইয়া গেল। সে ভাবিল—"অদ্ভুত বালিকা ঐ নিনা! আর, আমার উপরে তার এত বিশ্বাস! তার ঐ ধনভাণ্ডার কোথায় আছে, সেখানে কি আছে,—তা সে ছাড়া অন্য কোনও জীবিত প্রাণী জানে না; আমায় অসঙ্কোচে সমস্তই সে দেখিয়ে দিলে। অথচ আমি তার জাত নই, তার ধর্ম্মের লোক নই, আচার ব্যবহার ভিন্ন —এমন কি ভাষা পর্য্যন্ত ভিন্ন। এ সমস্তই সেই দেবতার কারসাজি, মহাদেব চোখের আগুনে যাঁকে ভস্ম করেও, আবার জীবন দিয়েছিলেন! আমি কি করি! নিনাকে বিবাহ করে' এই বিপুল ঐশ্বর্য্য আমি পেলে—আমি ত একটা রাজা—একটা মহারাজা! বংশাবলীক্রমে আমার দারিদ্র্য ঘুচে যায়। এ যে বিষম প্রলোভন! আমি কি করি? আমি যে অন্যের! আজ কোথায় আমার সেই সত্যবালা! এতদিন তারা দার্জ্জিলিঙে আছে কি কলকাতায় ফিরে গেছে কে জানে! এতক্ষণ কি তার ঘুম ভেঙেছে? বোধ হয় ভাঙেনি—তারা সাহেব লোক, একটু বেলাতেই ওঠে। কিন্তু আমার সতীর ভিতর সাহেবিয়ানার ত লেশ মাত্র নেই। আমারই আশায়—আমারই পথ চেয়ে সে জীবন ধারণ করে আছে। তাকে বলে এসেছি, বছর খানেক পরে, এ খুনের গোলমালটা কেটে গেলেই, আমি ফিরে আসবো—তখন আমাদের মিলন হবে। কিন্তু বছর খানেক মধ্যে, সে গোলমাল মিটবে কি? সম্ভবতঃ, আমায় ধরবার জন্যে, চারিদিকে হুলিয়া হয়ে গেছে। আমি ফিরে গেলে, যদি পুলিসে ক্যাঁক করে আমায় ধরে ফেলে? মল্লিক নিজে সাক্ষী দেবে—স্বচক্ষে সে দেখেছে। তার আর কোনও চাকর বাকর সে ঘটনা দেখেছিল কিনা তাই বা কে জানে! ফাঁসি বোধ হয় আমার দেবে না—ইচ্ছা করে ত আমি করিনি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কিংবা ধর যদি দশ বছর জেলই হয়, তখন কে সত্যবালাকে বিয়ে করবে? তখন মাথার গোলমালে, 'এক বছর পরে ফিরে আসবো'—এ কথা তাকে বলে এসেছি বটে;—কিন্তু—এক বছর পরে আমার ফেরাই কি নিরাপদ হবে? কি কুক্ষণে আমাদের দেখা হয়েছিল! কেন আমরা পরস্পরকে ভাল বেসেছিলাম!"

কিশোরী নিজের চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিল, অপর কক্ষে নিনার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ যে আর তেমন গভীর নাই, তাই লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, অপর কক্ষে নিনার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল "লালালামা! লালালামা! তুমি কি জাগিয়াছ?"—এই কথাগুলি নিনা তিব্বতীয় ভাষাতেই বলিয়াছিল; এটুকু বুঝিবার মত ভাষাজ্ঞান কিশোরীর এখন জন্মিয়াছে—সুতরাং সেও তিব্বতীয় ভাষায় উত্তর করিল, "হাঁ নিনা, আমি জাগিয়াছি।"

"আমি তোমার ঘরে যাইব কি?"

"এস, নিনা।"

কিশোরীর মনে হইল, নিনার কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট! আর, তার কথা বলিবার ধরণটিও কি সুন্দর! "তোমার ঘরে যাইব কি?"—এটা যেন আমারই ঘর! আমি যেন উহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী, একজন ভিখারী মাত্র নই।

পরক্ষণেই বাহির দ্বার খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে একরাশি আলো ও ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া কিশোরীর শয়নগুহা প্লাবিত করিয়া দিল। বাহিরে জল পড়িবার শব্দ হইল, নিনা বোধ হয় হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিতেছে। তারপর নিনা শয়ন গুহার মধ্যে আসিয়া প্রথমে গুহাগাত্রস্থ বুদ্ধমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া, করযোড়ে কি বলিতে লাগিল। আবার প্রণাম করিয়া, আচ্ছাদন বস্ত্রটি টানিয়া নামাইয়া দিয়া, কিশোরীর নিকট আসিয়া সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন আছ লালালামা?"

"ভালই আছি, নিনা।"

"ভাল ঘুম হইয়াছিল ত? রাত্রে তুমি কি উঠিয়াছিলে?"

"না, এক ঘুমে রাত কাবার।"

"তবে এখন ওঠ, মুখ হাত ধুইয়া নাও। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য চা তৈরি করি।"

কিশোরী বলিল, "তা উঠিতেছি। আচ্ছা নিনা তুমি কেন রোজ রোজ কষ্ট করিবে? কোথায় কি আছে দেখাইয়া দাও না—আমি উনন জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিয়া, মুখ হাত ধুইতে যাই।"

নিনা এ কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন। আগে তুমি উঠিয়া, মুখ হাত ধোও ত। আমি যা বলি তা শোন।"

তর্ক নিষ্ফল বুঝিয়া কিশোরী গাত্রোত্থান করিল। নিনা বলিল, "ঝরণায় যাইতেছ? ঐ কলসীটা হাতে করিয়া লইয়া যাইও, উহাতে জল ভরিয়া আনিও। ঘরে জল আর বেশী নাই।"

কিশোরী তাহার কলসী হাতে ঝুলাইয়া, বহির্গত হইল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে কিশোরী ফিরিয়া আসিল। নিনা উৎকণ্ঠিত হইয়া মঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল; কিশোরীকে দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—"খুব লোক তুমি যা হোক! এত দেরী!"

কিশোরী জলের ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "স্নান করিয়া লইলাম। অনেক দিন স্নান হয় নাই তাই আজ পরিষ্কার ঝরণার জল দেখিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।"

"তা বেশ করিয়াছ—কিন্তু আমি যে এদিকে ভাবিয়া মরি। পাথরে পা পিছলাইয়া পড়িয়াই গেলে; তা কি হইল! আর একটু দেখিয়া আমি তোমার খুঁজিতে বাহির হইতাম। তোমার পকেটে ও কি উঁচু হইয়া রহিয়াছে?"

কিশোরী তাহার আলখাল্লার পকেট হইতে একমুঠ কড়াইশুঁটি বাহির করিয়া দেখাইল। বলিল, "ঝরণার পশ্চিম দিকে খানিক নামিয়া দেখিলাম, সেখানে কড়াই লতার ঘন জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। তাই কতক শুঁটি তুলিয়া আনিলাম—চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাইবে।"—বলিয়া কিশোরী উভয় পকেট হইতে মুঠা মুঠা সুপুষ্ট কড়াইশুঁটি বাহির করিয়া পাথরের উপর জমা করিতে লাগিল।

নিনা বলিল, "তোমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, নয়?"

কিশোরী হাসিয়া বলিল, "তা স্বীকার করিতেছি।"

"এগুলি আগুনে একটু সেকিয়া লইব কি?"

"হুঁ সেই বেশ হবে।"

নিনার উনন জ্বলিতেছিল। ক্ষিপ্রহস্তে শুঁটিগুলির খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া, ঘৃত লবণ ও মরীচের গুঁড়া সহযোগে সেগুলি সে সেঁকিতে দিয়া, চা ঢালিতে বসিল।

চা পান শেষ হইলে নিনা বলিল, "আজ কোনও সময় সাইদা ও জুরচিং ঘোড়া কিনিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহারা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, চল আমরা ধন ভাণ্ডারে গিয়া, সমস্ত গোছগাছ করিয়া রাখিয়া আসি। কাল রাত্রে তুমি মূর্চ্ছা গেলে পর, অন্ধকারে হাতড়াইয়া, তোমার পিঠে করিয়া আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম। প্রদীপটা সেখানেই পড়িয়া আছে, চাবির গোছাও পড়িয়া আছে, সিন্দুক গুলিও খোলা পড়িয়া আছে বোধ হয়। এস আমরা দ্বার বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া আবার সেখানে যাই, সব ঠিকঠাক করিয়া, চাবির বাক্স যথাস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসি। আর একটা কথা! আমরা যে ডালি-লংপু যাইব, আমাদের যাইবার আসিবার খরচের টাকা কড়ি কি আজই বাহির করিয়া আনিব? ধর, আজ যদি ঘোড়া আসে, তাহা হইলে কবে যাত্রা করা তোমার ইচ্ছা?"

কিশোরী বলিল, "ঘোড়া আসুক ত, সে তখন দেখা যাইবে। এখন চল, কাজ যা আছে তা সারিয়া আসি।"

কিশোরীর মুখে এই কথা শুনিয়া, ডালি-লংপু

যাইবার জন্ত আর তাড়া নাই জানিয়া, নিনার মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে গুণগুণ স্বরে গান গাহিতে গাহিতে, গৃহকর্ম্ম সারিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, কিশোরীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার তবে দ্বার বন্ধ করি ?"

"কর।"

নিনা দ্বারটি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া লইয়া, শয়ন গুহার বিছানা সরাইয়া পাথর তুলিয়া, কিশোরীর সহিত সেই গহ্বর মধ্যে অবতরণ করিল। তার প্রণয়াস্পদ, পলাইবার জন্ত এখন আর ব্যস্ত নয় জানিয়া, নিনার মনটি আজ বেশ প্রফুল্ল। সেই সুরঙ্গ পথে চলিতে চলিতেও, ক্ষণে ক্ষণে তাহার কণ্ঠে গীতোচ্ছ্বাস হইতেছে।

দশম পরিচ্ছেদ

হাটবার।

দ্বিপ্রহরে খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে নিনা হঠাৎ বলিল—"বঃ, তুমি ত বেশ!"

কিশোরী বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন? কি করিলাম ?"

"আজ কি বার বল দেখি? আজ যে শনিবার—হাটবার—সে কথা আমায় মনে করাইয়া দিতে হয় না? আজ জিনিষপত্র কিনিয়া না আনিলে, এক সপ্তাহ আমরা খাইব কি? এ কি তোমার দার্জ্জিলিঙ যে যখন ইচ্ছা বাজারে গিয়া যাহা ইচ্ছা কিনিয়া আনা যায়।"

কিশোরীর স্মরণ হইল, প্রতি শনিবারেই নিনাকে সে হাটে যাইতে দেখিয়াছে বটে—এমন কি যেদিন সন্ধ্যায় সে সদলবলে আসিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেদিনও শনিবার ছিল, নিনা তখন মঠে উপস্থিত ছিল না, হাটে গিয়াছিল। সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, আজ তিনটি সপ্তাহ পূর্ণ হইয়াছে—তিন সপ্তাহ নিনার আতিথ্য ও সেবা ভোগ করা হইয়াছে। কিশোরী বলিল, "আমার সে কথা মনেই ছিল না। আচ্ছা নিনা, আমি তোমার সঙ্গে হাটে যাইব কি ?"

নিনা বলিল, "না, তোমার গিয়া কায নাই। সেখানে নানাস্থানের নানা লোক আসিয়া জমা হইবে; তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হইতে পারে। কাহার মনে কি আছে বলা যায় কি? তুমি ঘরে থাক। আমি আজ হাটে বেশী দেরী করিব না—জিনিষপত্র গুলি তাড়াতাড়ি কিনিয়া মুটিয়া দিয়া বহাইয়া আনিব।"

কিশোরী বলিল, "নিনা, একটা কথা তোমায় বলিব মনে করিতেছি, যদি রাগ না কর ত বলি।"

নিনা কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা শঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা দাদাবাবা ?"

কিশোরী বলিল, "কথা এই যে—এতদিন হইয়া গেল আমরা এখানে রহিয়াছি, খরচপত্র যাহা কিছু সমস্তই তুমি করিতেছ—কিন্তু আমারও কাছে ত টাকা রহিয়াছে; তোমার যদিও অগাধ টাকা—"

নিনা বাধা দিয়া বলিল, "চুপ্।"—তারপর কাছে সরিয়া আসিয়া, চুপি চুপি বলিল, "এত জোরে জোরে এই সব কথা কি বলিতে হয়? কোথায় কে শুনিবে—তখন বিপদে পড়িতে হইবে যে!"

কিশোরী এই কথায় একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল দেখিয়া নিনা চুপি চুপি বলিল, "আমার কথায় তুমি মনে কিছু দুঃখ করিও না। দেখ, এই জনমানব-শূন্ত স্থানে থাকিতে হয়; টাকার সন্ধান কেহ জানে না বলিয়াই রক্ষা—জানিলে, এতদিন চোর ডাকাত আসিয়া আমায় মারিয়া ফেলিয়া, সমস্তই লুটিয়া লইত। তারপর, তুমি কি বলিতেছিলে, বল।"

কিশোরী বলিল, "আজ যদি তুমি আমার টাকা লইয়া হাটে যাও, তাহা হইলে আমি সুখী হই।"

"এই কথা? তা বেশ ত—টাকা দাও।"

"ক'টাকা দিব বল।"

"অন্তদিন আমি দুই টাকা লইয়া হাটে যাই, আজ পাঁচ টাকা দাও।"

কিশোরী উঠিয়া, ঘরের কোণে রক্ষিত তাহার হাত ব্যাগটি খুলিয়া, পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া আনিয়া নিনার হাতে দিল।

নিনা টাকা গুলি বস্ত্র মধ্যে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমি মঠে থাক, আমি হাটে যাই। যদি ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়, তবে ভিতর হইতে দ্বার বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া, তবে শুইও, আমি আসিয়া ডাকিলে দ্বার খুলিয়া দিও।"

এই কথা বলিয়া, নিনা প্রস্থান করিল। দুজনের মধ্যে এই যে সমস্ত কথা বার্ত্তা হইতেছিল, তাহা নিনার ঘরে বসিয়াই। অপর ঘর খানি, যাহাতে কিশোরী, ফুরচিং ও সাইলা পূর্ব্বে শয়ন ভোজন উপবেশন করিত, সে ঘরখানি গতকল্য হইতেই তালাবদ্ধ।

নিনা চলিয়া গেলে, ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে কিশোরীর ভাল লাগিল না—সে একখানা কম্বল টানিয়া, মঠের সম্মুখস্থ চত্বরে বিছাইল। ফুরচিং তাহাকে তিব্বতীয় ভাষার দুই খানি বহি দিয়াছিল—একখানি বর্ণপরিচয়, অপর খানি শিশুপাঠ্য বুদ্ধজীবনী। পথে আসিতে আসিতে বর্ণপরিচয় শিক্ষা তাহার শেষ হইয়াছিল; বুদ্ধ জীবনীর কিছু অংশও পড়া হইয়াছিল। কিশোরী সেই বহি দুইখানি ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া, ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া দিল। কম্বলের উপর বসিয়া, বুদ্ধজীবনীখানি কষ্টে সৃষ্টে পড়িতে লাগিল—কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাতে মন বসিল না। বহি বন্ধ করিয়া, দূরস্থিত পর্ব্বত চূড়া গুলির প্রতি চাহিয়া, সে নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

প্রথম চিন্তা, নিজ অদৃষ্টের কথা। "ছিলাম কোথায় কলিকাতাবাসী স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী যুবক—আর, হইলাম এই সুদূর সিকিম প্রান্তে ছদ্মবেশধারী লামা! লামা,—অথচ না জানি তিব্বতীয় ভাষা—না জানি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের ক খ!"—

তারপর দেবের কথা, সত্যবালার কথা, মল্লিকের কথা মনে হইল। সত্যবালার কথা মনে হওয়াতে কিশোরীর চক্ষে জল আসিল। সে মনে মনে বলিল—"সতী! তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্যই আমি তোমার জীবন পথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি সেখানে থাকিলেই তোমার কত কষ্ট, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। যদি উভয়ের আকাঙ্ক্ষিত মিলন সংঘটিত হইত, তবু সে সকল দুঃখকষ্টের ক্ষতিপূরণ হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও হইল না। ভবিষ্যতে যে কখনও হইবে, তাহারই বা আশা কোথায়? কে আমাকে এখানে আসিয়া নিশ্চিত রূপে বলিবে যে সে সমস্ত গোলমাল এখন চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে—এখন তুমি নির্ভয়ে দেশে ফিরিয়া যাইতে পার। সুতরাং দেশে ফেরা, ইহজীবনে বোধ হয় আর হইল না। তবে, অনেক বৎসর পরে, ছদ্মবেশে ছদ্মনামে যদি যাই—তাহাতেই বা সুখ কোথায়? সুখ আর আমার অদৃষ্টে নাই।"

বসিয়া বসিয়াও ভাল লাগে না। কিশোরী উঠিয়া, এ দিক ওদিক একটু বেড়াইতে লাগিল। গিরি পৃষ্ঠের প্রান্তভাগে গিয়া সহসা কিশোরী দেখিতে পাইল, নিম্নে—অনেক নিম্নে তিনজন ভুটিয়া দক্ষিণপূর্ব্ব দিকের উপত্যকা ভূমি হইতে উঠিয়া আসিতেছে—প্রত্যেকের পৃষ্ঠে একটা করিয়া শাদা প্যাকিং বাক্স, অপরাহ্ণের সূর্য্যকিরণে ঝকমক করিতেছে। সে নিম্নদিকে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রহিল। ক্রমে দেখিতে পাইল, আরও প্রায় ৭।৮ জন কুলি, পৃষ্ঠে বোঝা ও হস্তে পাহাড়ী লাঠি লইয়া উঠিয়া আসিতেছে। আরও নিম্নে, কয়েকটা ভারবাহী অশ্বতর—তাহার আরও নিম্নে, শাদা হ্যাট মাথায় কয়েকজন অশ্বারোহী। সকলে নিম্নভূমি হইতে উঠিয়া আসিতেছে—সম্ভবতঃ এই পথ ধরিয়াই তাহারা তাহাদের অভীপ্সিত স্থানে গমন করিবে।

কিশোরী সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল—"কারা ইহারা? ইহারা কি ইংরাজ পুলিস বিভাগের লোক, আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে? পাইলে, গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিবে?" কিন্তু

এ আশঙ্কা অধিকক্ষণ কিশোরীর মনে স্থান পাইল না। সে ভাবিল "ভারি ত আমি একটা লোক! আমাকে ধরিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এত কাণ্ড করিবে?"

কিশোরী তাহার কম্বলের উপর ফিরিয়া আসিয়া, তিব্বতীয় বহি খুলিয়া বসিল—কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারিল না। আবার পূর্ব্বস্থানে গিয়া, নিম্নে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহারা উঠিয়া আসিতেছে বটে—কিন্তু এখনও ত অনেক দূর। পার্ব্বত্য পথারোহণে কত সময় লাগে তাহার ধারণা কিশোরীর জন্মিয়াছিল—সে অনুমান করিল, উহারা এখানে আসিয়া পৌঁছিতে এখনও অন্ততঃ দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। "কে উহারা? কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিতেছে? উহারা কি কোনও য়ুরোপীয় আবিষ্কারক অথবা ভ্রমণকারীর দল? য়ুরোপীয়গণ মাঝে মাঝে এইরূপে আসে বটে। অনেক লোকজন তাম্বু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, দুর্গম স্থানগুলিতে গমন করিয়া, ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া থাকে। কিন্তু আমার ধরিবার জন্য উহারা যে পুলিস-বাহিনী নহে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? মল্লিক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—আমার পরম শত্রু। সে চীফ্ সেক্রেটারি বা লাট সাহেবকে বলিয়া কহিয়া, আমার ধরিবার জন্য পুলিসের একটা সার্চ্চ পার্টি পাঠায় নাই এ কথা কে বলিল? আমার নিকট যদি একটা দূরবীণ থাকিত, দেখিতাম উহারা কে। উহাদের নিকট দূরবীণ নিশ্চয় আছে; এই যে আমি এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, হয়ত উহারা দূরবীণ কষিয়া আমায় দেখিতেছে। যদি উহারা ইংরাজ পুলিসের দলই হয়, আমায় খুঁজিবার জন্যই বাহির হইয়া থাকে, তবে ত এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি নিতান্ত বোকামির কার্য্য করিতেছি!"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কিশোরী পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। এদিকে বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের প্রান্তে মেঘ জমিয়া উঠিতে লাগিল। নিনা বলিয়া গিয়াছে, আজ তাহার ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না—তবে এখনও সে আসিয়া পৌঁছিল না কেন? সে ফিরিবার পূর্ব্বেই যদি ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবেই ত বিপদ! ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া, কাংপাচেনের পথে খানিক দূর গিয়া দেখিলে হয় না, সে আসিতেছে কি না?—কিশোরী স্থির করিল, একাকী বসিয়া ছটফট্ করার চেয়ে, সেই ভাল হইবে।

সে তখন কম্বল ও বহি ঘরের মধ্যে রাখিয়া, দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইল। একবার সেই উপত্যকা পানে চাহিয়া দেখিল;—সকলে একত্র হইয়াছে—তাঁবু পড়িতেছে। কিশোরী ভাবিল, বোধ হয় বেলা নাই দেখিয়া এবং আকাশে মেঘ দেখিয়াই, উহারা ঐখানেই আজ রাত্রিবাস করিতেছে। যাক্—আজ আর উহারা আসিবে না এটা স্থির।

কিশোরী পথ চলিতেছে, আর আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। মেঘাড়ম্বর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু অধিক দূর কিশোরীকে যাইতে হইল না। কাম্পাচেন গ্রাম দৃষ্টিপথে পড়িবার পূর্ব্বেই কিশোরী দেখিল, একটি যুবতী নিম্ন পাহাড় হইতে উঠিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে একজন ভারবাহী। নিনাকে দেখিতে পাইয়া কিশোরী দাঁড়াইল; নিনাও তাহাকে দেখিয়া হস্ত সঙ্কেতে অভ্যর্থনা করিল।

নিকটে পৌঁছিয়া নিনা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি নাজালামা, তুমি কোথায় যাইতেছিলে?"

"তোমায় খুঁজিতে।"

"কেন, আমি কি হারাইয়া যাইব?"

"আকাশের পানে চাহিয়া দেখ নিনা—মেঘের ঘটা দেখিয়া আমার ভয় হইল, যদি বড় বৃষ্টি নামে তবে পথে তোমার কি হইবে? তাই আমি আর থাকিতে পারিলাম না— তোমায় খুঁজিতে বাহির হইয়াছি।"

নিনা বাক্যে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখে একটা সুখের একটা আনন্দের জ্যোতি খেলিয়া গেল। সে কিশোরীর হাতখানি নিজ হাতে ধরিয়া

বলিল, "কেমন জব্দ করিয়াছি তোমায়? সকাল বেলা দেরী করিয়া তুমি আমায় ভাবাইয়াছিলে; এবেলা আমি তোমায় ভাবাইলাম।"—মুটিয়া কিছুদূর পশ্চাতে ছিল; এত কথার কিছুই তাহার কর্ণগোচর হইল না।

হাতে হাত দিতেই কিশোরী দেখিতে পাইয়াছিল, নিনার উভয় প্রকোষ্ঠে এক গাছি করিয়া নীলবর্ণ বেলোয়ারি চুড়ি রহিয়াছে—তাহার উভয় দিকে দুই গাছি করিয়া পুঁতির মালা। কিশোরী বলিল, "এগুলি তুমি কোথায় পাইলে নিনা?"

নিনা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "একজন আমায় দিয়াছে।"

"কে? তোমার কোনও সখী—না সখা?—এ অঞ্চলে তোমার কোনও সখা সখী আছে তাহা ত আমায় বল নাই।"

নিনা বলিল, "আমার একজন সখা আছে সেই দিয়াছে।"

কিশোরীর মুখখানি গম্ভীর হইল। সে, ধরা গলায় বলিল, "তোমার সে সখাটি কে? নাম শুনিতে পাই না?"

"শুনিবে এখন—মঠে চল।"—বলিয়া নিনা অগ্রসর হইল। পার্ব্বত্য পথে দুইজন পাশাপাশি চলা সম্ভব নহে;—কিশোরী গম্ভীর মুখে নিনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; কিন্তু তাহার পা যেন চলিতেছিল না—তাই সে একটু পিছাইয়া পড়িল। কিয়দ্দূর পশ্চাতে সেই ভারবাহী আসিতেছে।

মঠের নিকটবর্ত্তী হইতেই, দুই চারি ফোঁটা জল নিনার গায়ে পড়িল। সে পশ্চাৎ ফিরিয়া, কিশোরীকে বলিল, "বৃষ্টি আসিল- শীঘ্র এস।"—বলিয়া দাঁড়াইয়া, কিশোরীর গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া, চাপা হাসি হাসিতে লাগিল।

মঠে পৌঁছিয়া, ভারবাহীকে বিদায় দিয়া, জিনিষ পত্রগুলি গুছাইতে গুছাইতে নিনা বলিল, "কৈ, আমার সে সখার কথা আর তুমি জিজ্ঞাসা করিলে না?"

কিশোরী বলিল, "আমার অবশ্য শুনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার বয়স কত?"

"এই—তোমার বয়সীই হইবে।"

"কতদিন তার সঙ্গে তোমার—বন্ধুত্ব?"

"বেশী দিন না।"

"আচ্ছা নিনা—"

"কি?"

"না থাক্—আমি ভাবিয়া দেখিলাম সে কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিবার আমার কোনও অধিকার নাই। তবে অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। তোমার সে সখা, কৈ, এখানে কোনও দিন আসে না ত!"

নিনা বলিল, "আসে ত। তুমি তাকে দেখিতে চাও?"

"বেশ, আমি থাকিতে থাকিতে যদি কোনও দিন সে আসে, তাহাকে দেখাইও।"

"এখনি তোমায় দেখাইতে পারি"—বলিয়া নিনা তাহার বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি নূতন টিনের আর্শি বাহির করিয়া, কিশোরীর মুখের সামনে ধরিয়া, "ইহার ভিতর দেখ" বলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

কিশোরী সবিস্ময়ে নিনার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিনা বলিল, "তুমি যে আমায় পাঁচটি টাকা দিয়াছিলে, তাহাতে আমি এই চুড়ি, পুঁতির মালা, এই আর্শি, আর একখানি চিরুণী কিনিয়া আনিয়াছি। তোমার টাকা দিয়া কিনিয়াছি, সুতরাং এ সকল, তোমারই ত দেওয়া হইল!" বলিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে মহিষ শৃঙ্গের এক খানি মোটা চিরুণীও বাহির করিয়া দেখাইল।

এতক্ষণে কিশোরীর মুখ হইতে মেঘ কাটিয়া গিয়া, সেখানে হাসির কিরণ খেলিতে লাগিল। সে বলিল "দেখ নিনা, এতদিন মাঝে মাঝে আমার মনে হইয়াছে বটে যে, তুমি স্ত্রীলোক,—অথচ না আছে তোমার কোনও অলঙ্কারের সখ, না কোনও প্রসাধনের স্পৃহা।"

নিনা বলিল, "সত্যই ত, ও সব সখ কোনও দিনই ত তোমার ছিল না।"

"তবে, এখন হঠাৎ ?"

"কে জানে! ওগো শীঘ্র যাও, ভয়ানক ঝড় আসিতেছে—দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া এস।"

কিশোরী ছুটিয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। শুধু ঝড় নয়—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছিল—জলের ঝাপটায় কিশোরীর বস্ত্রও কিয়দংশ ভিজিয়া গেল।

নিনা তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া ফেলিয়া বলিল, "ফুর্‌চং সাহেব আজ আর আসিল না দেখিতেছি!"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

পোলাও

কবিতা গ্রন্থ। শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী প্রণীত মূল্য—১৲

গীতায় তিন প্রকার আহারের কথা বলা হইয়াছে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। তাহার মধ্যে "পোলাও" কোন শ্রেণীর আহার? শান্তিপুরের অদ্বৈত প্রভুর বংশাবতংস শ্রীযুক্ত বেনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় যে "পোলাও" রাধিয়া সংপ্রতি বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা দিগকে পরিবেষণ করিয়াছেন আমি সেই পোলাওয়ের কথা বলিতেছি।

গোস্বামী মহাশয়ের পোলাও নিশ্চয়ই সাত্ত্বিক আহার নহে। সাত্ত্বিক আহার "সুখপ্রীতি-বিবর্দ্ধনাঃ —যেমন বিদ্রূপ (humour)। রাজসিক আহার ঝাঁজাল (তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ)—যেমন শ্লেষ (satire); আর তামসিক আহার পচা পূতিগন্ধময় (পূতিপর্য্যুষিতং)—যেমন কুৎসা (slander)। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নাচুনি ছন্দে ইঙ্গবঙ্গ মিশ্রিত ভাষায় বৈঠকী খোসগল্পের অসম্বদ্ধ প্রণালীতে সর্ব্বশ্রেণীর রথিমহারথিগণকে লক্ষ্য করিয়া, সমাজ সাহিত্য ও রাজনীতির প্রসঙ্গ লইয়া যে সকল চোখা চোখা শরনিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহাদের সুখ-প্রীতি বিবর্দ্ধন করিবে না। কেহ কেহ হয়ত মজলিসি ভদ্রতা রক্ষার জন্য কবির সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ দাঁত বাহির করিয়া হাসিবেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে নিশ্চয়ই খোঁচার জ্বালা অনুভব করিবেন। তবে সাধারণ পাঠক পাঠিকার নিকট পোলাও যে খুব উপাদেয় হইয়াছে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। দোষের মধ্যে কতকগুলি আস্ত পেঁয়াজ মাথা খাড়া করিয়া বিজাতীয় গন্ধ বিস্তার করিতেছে—আমি ইংরাজী বুকনির কথা বলিতেছি। সেগুলি হজম করা অনেকের পক্ষে কঠিন হইবে। গোস্বামী মহাশয় স্বদেশীর প্রচারক হইয়া কেন এই ইংরাজি ভাষার মোহ কাটাইতে পারেন নাই একথা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক এই দোষ সত্ত্বেও তাঁহার পোলাও অনেকেরই মুখ-রোচক হইবে। আজকালকার দিনে সাত্ত্বিক হবিষ্যান্ন কয়জনে পছন্দ করে? আর সেই শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিদ্রূপ সৃষ্টির ক্ষমতাও বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। অবশ্য ইন্দ্রনাথ ছিলেন সর্ব্বপ্রকার শ্লেষ বিদ্রূপের রাজা। স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ যাহা ছাপাইয়া জেলে গিয়াছিলেন এবং সংপ্রতি-পরলোকগত পাঁচকড়ি দাদা তাঁহার নায়কের পৃষ্ঠে যে গুলির সৃষ্টি করিতেন তাহা ঐ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত অর্থাৎ তামসিক; এই জন্য প্রায়ই দাদার নামে মানহানির মোকদ্দমা হইত।

এই ক্ষুদ্র ভূমিকা করিয়া এখন গোস্বামী মহাশয়ের রাঁধা পোলায়ের কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিব। তিনি এবার হাঁড়ী পোলাও রাঁধিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে দুই একটা চাকিয়া দেখিলেই সকলে তাহার স্বাদ বুঝিতে পারিবেন।

সারা বঙ্গদেশ সম্প্রতি ভোটের ব্যাপার লইয়া ব্যতি-ব্যস্ত এবং রাজনৈতিক নেতার জন্যে সন্ত্রস্ত ছিল। এই সকল নেতাদের সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার একটা হাঁড়ী, হাটে এইরূপ ভাঙ্গিয়াছেন—

আসছে দেশে মন্টেগু দান এবার হইব ধন্য;
ক্ষমতা এবার করিয়া জাহির,
ধরণীতে হব গণ্য।
লুটিয়া ভোট, হইয়া সভ্য, ধরিব গগন চাঁদা;
সিংহ চর্ম্মে সাজি বাহিরিব কেহ ভাবিবে না গাধা।
Sinha সাহেব Baron হলেন, Earl হ'বেন বোস্।
গর্ব্বে জাতি উঠবে কেঁপে, হাসবে মতি ঘোষ।

বধ করিয়া শত পাঁঠা কাল কাষ মোব,
এই সমাজের নেতা এখন Attorneyদের বোস্।
দারিদ্র ঘরের পাথাল টাকা উড়ে চলে যায়,
বোসের ঘরের পঙ্গু টাকা করে হায় হায়।।

সুতোবাচ—

শুন বৎস একবার কর অবধান,
কি কি গুণে নেতা হয় করিব বাখান।
স্বার্থপর হবে বটে,—স্বার্থপরতায়
লুকায়ে রাখিবে যত্নে মনের গুহায়।
পরদুঃখে অশ্রুজল করিবে বর্ষণ,
করিবে না কভু অর্থ পরে বিতরণ।
প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড যদি হতে পার,
উত্তরিবে Politics ভীম পারাবার।
ভাষা মধ্যে সারবত্তা থাক্ বা না থাক্,
Choice word গুলির বসাইবে থাক্।
ম্যাটসিনির ইতিবৃত্ত আৱের ভাষায়,
হাত নেড়ে মুখ নেড়ে বলিবে সভায়।
বক্তৃতায় সভা যেন উঠে বিকম্পিয়ে,
পরের ছেলেরে দিবে বিপদে ঠেলিয়ে।
শুভ কর্ম্মের তরে চাঁদা করিতে চয়ন,
অভ্যন্তরে "সিংহ অংশ" করিবে গ্রহণ,
দৈনিকে আপন কীর্ত্তি করিবে বাহির
স্তাবক রাখিবে গুণ করিতে জাহির।

আজ দেশে যে Nation গঠনের ধুম পড়িয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে গোঁসাইজী বলেন—

Ladyর জুতা কিনে এনে পরাও ললনায়;
(আর) গলায় দিয়ে tieটা বাহু পুরাও বাসনায়।
যুঁই শেফালি টগর বেলা উঠিয়ে ফেলে দিয়ে
বাগান কর মনের মত ম্যাগনোলিয়া নিয়ে।
ঘোমটা খোচাও সিঁদুর মুছাও
স্বাধীন ভাবে প্রেম কর;
Nation যদি হতে চাও
ফিরিঙ্গি এ নাম ধর।

(চা)পে পড়ে সমাজটা যে হয়ে পড়ছে চ্যাপটা;
(এখন) মাথার মাঝে গুঁজতে হচ্ছে হ্যাটটা কিংবা ক্যাপটা।

সাহিত্যক্ষেত্রেও এই বিলাতী বিষ স্বাধীন প্রেমের (না)মে কি প্রকারে কামানলে ইন্ধন যোগাইতেছে (শ্র)বণ করুন,—

(এরা) চাঁদ-চুয়ান রূপ মাখান চুম্বন-প্রবণা বালায়,
(পরি)ক্রমা করিয়ে কামেরই অনলে বঙ্গভূমিরে জ্বালায়।
বসোরায় সেই গোলাপ বক্ষে, চুমার রেখাটী টেনে,
উচ্চ হইতে সুপ্ত মন্ত্রে পাতালেতে যান নেমে!
শৃঙ্খলার তার, সংযমের ডোর ছিঁড়িয়ে প্রেমেরি উচ্ছ্বাসে,
অবাধেতে প্রেম লোকে রূপরাশি তীব্র মনেরই উল্লাসে॥
প্রেম কেন বলি, শুধু ব্যভিচারে জাতীয়তা গেল ধুয়ে,
সমাজের ছিল শাঁসাল কল্প ক্রমশ পড়ছে নুয়ে।
রোগটারে ভাই পার যদি তবে আঁতুড়েই কর কাৎ,
একটুখানি বাড়লে পরেই করে বস্‌বে বাজিমাৎ।

কিন্তু যাঁহারা এই রোগকে "আঁতুড় ঘরে"ই মারিতে চান, কবি তাঁহাদিগকেও দুই কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়েন নাই, যথা—

সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার তরে
ঐ প্রবাসীর নেতা ধীরোদাত্ত রাম
করিছেন ধীরভাবে গম্ভীর ক্রোশন;
ওর শিষ্য হ'তে চাও করিনা নিষেধ
So-called morals নিয়ে করুক বসতি,
সাহিত্য যা ইহাদের কোলে টেনে লবে।

ইহাদের কাহাদের? না

শরতের কিরণ রাণী, রবির বিনোদা
জগতের কাব্য বনে যুগল মন্দার।
উভয়ের তুলি যেন কোন মন্ত্র বলে
বিধাতার বর্ণপাত্র করিয়া পরশ,
আঁকিয়াছে দুই জনে যুগল রতন॥

কবি আবার একথাও বলেন,

"গ্রাম যদি ভেঙ্গে যায় ভেঙ্গে যাক গ্রাম,
নারেগরা জলোৎসব তথাপি সুন্দর।"

ইহার গদ্য অনুবাদ হইতেছে Art for art's sake—আর্টের জন্যই আর্ট সেবনীয়, সমাজ তাহাতে থাক্ বা যাক্ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বলাবাহুল্য গোঁসাইজী এখানে আর্টের উপাসক কবির ভাষই কথা বলিতেছেন,—কিছুকাল পূর্ব্বে যিনি সমাজ সংস্কারক রূপে দেখা দিয়াছিলেন, তিনি এখন গা ঢাকা দিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র আবার তিনি সংস্কারক রূপে উদিত হইয়া কি বলিতেছেন শুনুন,

যে সভ্যতা যুবকের যৌবনেরে ডেকে
চুপি চুপি বলে দেয় বিলাসের কথা,
পয়োধরার মধু লুটে, দরিদ্রের ভালে
লিখে দিয়ে cuckold, মর্ম্মব্যথা সনে
হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস করে বিরচন;
যে সভ্যতা প্রাণমাঝে ভোগস্পৃহা সৃজি
পর বেদনার শক্তি লয়েছে কাড়িয়া।

যে সভ্যতা প্রমোদার প্রফুল্ল কপোলে
শিখায়েছে নিশিদিন, হায়রে কপাল,
আঁকিতে মদন চিত্র রসনা তুলিতে।
রমণীর সংযমের নিবিড় বন্ধন
বৈদেশিক সভ্যতার তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
ছিন্ন করি করিয়াছে রমণী রতনে,—
করিয়াছে দেবতার শুভ্র প্রতিমায়,—
করিয়াছে সাবিত্রীর অনুবর্ত্তিনীরে,—
ভিখারিণী, কাঙ্গালিনী, নরক পিশাচী।

এখানে দেখিতেছি কবির আর্টের মোহ কাটিয়াছে, তিনি আবার সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার জন্ত ব্যাকুল।

কিন্তু এই কাব্যগ্রন্থে কবির সমাজপ্রীতি অপেক্ষা স্বদেশপ্রীতিই অধিকতর উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্য স্বদেশগত প্রাণ নৃপেন্দ্রনাথ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, পোলাও পড়িতে পড়িতে তাঁহার (নৃপেন্দ্রবাবুর) অশ্রু মথিত চক্ষুর সম্মুখে স্বাধীন ভারতের বাগ্‌দেবী রক্তপদ্মে পাপড়ীর উপর চরণ স্থাপন করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। কবি এই স্বাধীনতা মন্ত্রের বর্ত্তমান পুরোহিত মহাত্মা গান্ধীর কিরূপ ধীরোদাত্ত স্বরে স্তুতিগান করিয়াছেন দেখুন,

"প্রকাম্যের প্রতিমূর্ত্তি গান্ধী মহারাজ
ভালবাসা দিয়ে বিশ্ব করিবেন মাত।
চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ আকাশের পানে
অধ্যাত্ম শকতি আজ পশুবিক্রমেরে
করিতেছে পরিম্লান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
প্রতিহিংসা, দানবের অব্যর্থ আয়ুধ,—
ভালবাসা দেবতার অমৃত নিছনি।
জেতার হৃদয়েতে তীব্র দাবানলে
ভালবাসা ঢেলে দিয়ে গুঞ্জরে নির্জ্জর
করিবেন শান্তিরাজ্য জগতে স্থাপিত।
জড়বাদ জড়তার ভাঙ্গি কারাগার
চিন্ময়ের প্রেমে প্রাণ করিবে শীতল।

গোস্বামী মহাশয় বাঙ্গালার ছোট বড় সাহিত্যিকদিগকে লইয়া দুই চারি লাইনে যে রঙ্গরস করিয়াছেন তাহা "পোলাও" পাঠ করিয়া উপভোগ করার জিনিষ—এখানে অল্প স্বল্প উদ্ধৃত করিয়া তাহার রসভঙ্গ করিব না।

গোস্বামী মহাশয় কৌতুক রহস্তে আপনাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিলে কি হয়, স্থানে স্থানে সেই অদ্বৈত প্রভুর শোণিত-প্রসূত বৈষ্ণব ভাব অতি পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যথা,—

আমিই ছিলাম মনে পড়ে স্বাধীন প্রেমের প্রচারক
ফিরে এলাম ভগ্নচিত্তে যখন হলেম অপারগ।
চক্ষুদুটী twin কৃষ্ণ রূপ রাধারে বাঁধতে চায়,
সৃষ্টি করি বৃন্দাবন দুলবে বসি হিন্দোলায়।
ভেঙ্গে দাও এই হৃদয় মাঝারে সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব,
আমারে করহ গোলোকবিহারী, তোমার গীতির ছন্দ।
নিরাকার ভাবে চাহিনা তোমায়, দিব্য মূরতি ধরি
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়া দাও হে ব্রজের হরি।
আমি হীন আমি হইব যখন, ঘুচে যাবে অহমিকা,
আমি-হীন আমি প্রকৃতি মূরতি তুলে ধর যবনিকা।

ভগবান এই সরলপ্রাণ অহমিকা-শূন্য প্রবীণ বৈষ্ণব কবির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

সাহিত্য-সমাচার

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

আগামী ৬ই ও ৭ই বৈশাখ (১৩৩১) ১৯এ ও ২০এ এপ্রিল শনি ও রবিবার খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের আহ্বানে স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের জন্মস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরে বঙ্গীয় সহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় কবিরাজ মহোদয় পৃষ্ঠপোষক; মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ বিএল্ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি; কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাধারণ সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি,আই, ই, এম্, এ, এফ আর এস্; সাহিত্য শাখার সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ইতিহাস শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ; দর্শনশাখার সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ; বিজ্ঞান শাখার সভাপতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্ সি, বিএ।

প্রবন্ধ লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া ২৮শে চৈত্রের মধ্যে তাঁহাদের প্রবন্ধ ও তাহার চুম্বক অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, মহাশয়ের নিকট ৭৪ ১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। টাকাকড়ি যিনি যাহা পাঠাইবেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট কলিকাতায় ৭৪।১ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীটে অথবা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয়ের নিকট ১৪ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে পাঠাইবেন।

গ্রাহিকার পত্র

একজন গ্রাহিকার নিকট হইতে আমরা যে পত্র খানি পাইয়াছি তাহা নিম্নে অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ইনি গত বৎসর "মানসী" ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এ বৎসর আবার গ্রহণ করিয়াছেন।

ওগো মানসী !

অনেক দিন তোর কোন খোঁজ খবর রাখি নি। দীর্ঘ এক বৎসর কাল তোর্ দেখা না পেয়ে যে আমি কি ভাবে কাটিয়েছি—তা আমিই জানি। মানসী, তুই যে আমার অতি আদরের অতি আহ্লাদের সামগ্রী;—তুই রাজার মেয়ে হ'স না কেন—তবু যে তোরে আমি চিরদিন ভালবাসি! তুই কলিকাতা মহানগরীতে জন্মেছিস্ লালিতা পালিত হচ্ছিস্—তবু আমরা সুদূর পল্লীবাসী, বাঙ্গলার নিঃস্ব পল্লীবাসী—চাই তোকে—তুই রাজার মেয়েকে—তোর্ রাজধানীর বুক্ থেকে টেনে এনে—তোকে তোর্ বিশাল অট্টালিকার মাঝ থেকে বের্ ক'রে এনে—আমাদের—আমাদের এই নিঃস্ব-পল্লীবাসীর চির-সঙ্গিনী কর্‌তে! মানসী! চঞ্চলা, চপলা, অটলা, ষোড়শী, রূপসী মানসী—তোর্ মুখ ভরা হাসি, বুক্ ভরা ভালবাসা যে তোকে মোটেই ভুল্‌তে দেয় না—তাইত ঘুরে ফিরে এসেই আবার তোর্ খবর নিতে ব্যস্ত হই!

মানসী! অনেক ছোট্ট থেকে তোকে চৌদ্দ বছরটা পর্য্যন্ত দেখেছিলাম—তারপর তোর্ পনের'র বছরটা কি ভাবে কাট্‌লো তা' কিন্তু জানি না! যাক্, মানসী, তুই ভাবিস না যে তোকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেম্ সত্যি। মানসী! এই একটা বছর তোর অদর্শনে বড়ই যাতনায় কাটিয়েছি। আমি সেদিন 'কর্ত্তা'র নিকট তোর গাড়ী ভাড়ার টাকা চারিটি পাঠিয়ে দিয়েছি। কর্ত্তাকেও লিখে দিয়েছি, যেন তিনি টাকা পাওয়া মাত্রই তোকে সত্বর পাঠিয়ে দেন। তোর্ অদর্শনে বাস্তবিকই বড় ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছি। মানসী! কেবলি ভাবছি ভাই—একে ত তুই রাজার মেয়ে—তাতে রূপসী—তার উপর আবার ষোড়শী হলি! না জানি এখন তুই কেমনটী হয়েছিস্!

মানসী! একবছর ভুলে ছিলাম বলে যেন রাগ করে—অভিমান করে বসে থাকিস্ নে—শীগ্‌গির চলে আসিস্। অনেক বাজে বক্‌লাম মনে কিছু করিস্ নে।

ইতি—তোরই—"লীলা"
(গ্রাহিকা নং ৬২৯৮)

আমাদের কথা

আমাদের ছাপাখানা, পূর্ব্ব ঠিকানা হইতে, ১৬ ১এ বিডন ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হওয়াতে দুই সপ্তাহের অধিক কাল ছাপাখানার কাযকর্ম্ম বন্ধ ছিল। এই কারণে, এ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নূতন উপন্যাস "নগবালা" আরম্ভ হইবে। তাহা ছাড়া, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীযুক্ত ফকির-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির গল্প শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রভৃতির প্রবন্ধাদি থাকিবে। "দাদার দুরদৃষ্ট", "শ্রুতি-স্মৃতি" প্রভৃতিও মুদ্রিত হইতেছে।

———

শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ প্রণীত নূতন উপন্যাস "অন্তরীক্ষ" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲

কলিকাতা
১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



অন্ধ-ভিখারী

Bengal Art Press, Shikdar Bagan.

চিত্রকর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সৌজন্যে

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ }
১ম খণ্ড }

বৈশাখ, ১৩৩১

{ ১ম খণ্ড
{ ৩য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র

বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে। জীবনে যে প্রশংসা ও নিন্দার যুগপৎ প্লাবনে গিরিশচন্দ্র ভাসমান হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পরও সেই তরঙ্গ অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। কালক্রমে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, বারঘোষ-সংসৃষ্ট রঙ্গালয় সম্পর্কবশতঃ সম্প্রদায় বিশেষের ঘৃণা প্রভৃতি এখন আর প্রবল নহে। সাহিত্যের আদর্শ দিয়াই এখন গিরিশচন্দ্রের বিচার হইবে। তাঁহার অতুলনীয় নটজীবন, এখন আর সাধারণের উপভোগের বিষয় নহে, রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাহা স্থান পাইবে। কিন্তু তাঁহার নাটকাবলী আজিও যেরূপ সাহিত্যামোদিগণের প্রীতি ও শিক্ষার উপাদান হইয়া রহিয়াছে, বঙ্গসাহিত্য যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তাহাদের প্রভাব এই ভাবেই থাকিবে।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক, গিরিশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য কি? যে সকল বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটক অন্য সমস্ত বাঙ্গলা নাটক হইতে পৃথক্, তাহার মধ্যে প্রথমটি এই। গিরিশচন্দ্রের প্রধান নাটকগুলি ধর্ম্ম-প্রবণ, হিন্দুধর্ম্মের অতি উচ্চ তত্ত্বগুলি অতীব সুকৌশলে এই নাটকগুলির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই কারণে গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি শুধু যে ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন সাধারণ পাঠকের নিকট আদরনীয় তাহা নহে, সংসারত্যাগী সাধুগণও এগুলি সাগ্রহে আলোচনা করিয়াছেন।* 'বিল্বমঙ্গল' পাঠে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।"

* "We noticed in him. (i.e. Swami Atmananda) a special fascination for the religious dramas of Giris Babu (the well known dramatist of Bengal), He would have regular classes on 'Kalapahar' 'Purna-clandra' and other dramas... Even here at Benares, I observed that one or two boys used to go to him to read from those books and get in that connection many a salutary counsel from him."—The late Srimat Swami Atmananda—Prabuddha Bharat, November 1923.

গিরিশচন্দ্রের রচনায় এ ধর্ম্মভাব আসিবার হেতু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব। পরমহংসদেবের প্রভাব আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মবিষয়ে মানসিক অবস্থার কথা, তাঁহার কথাতেই বর্ণিত হইতেছে :—

"আমাদের পঠদ্দশায় যাঁহারা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত হইতেন তাঁহারাই সমাজে মান্য গণ্য ও বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গলায় ইংরাজী শিক্ষার তাঁহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্প সংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক-ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করান, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটি হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাজীও দু'পাতা পড়িয়াছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ঈশ্বর না মানা বিদ্যার পরিচয়। এ অবস্থায় স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছু মাত্র রহিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক বিতর্কও চলে। আদি-সমাজেও কখনও কখনও যাওয়া আসা করি। একটি ব্রাহ্মসমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কি না সন্দেহ। যদি থাকেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না। ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম 'ভগবান, যদি থাকো, আমার পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দাও।' ইহার কিছুদিন পরেই নাস্তিকতা আসিল। ভাবিলাম, জল, বায়ু, আলো ইহজীবনের যাহা প্রয়োজন তাহা অর্জ্জন রহিয়াছে; তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা। জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ, তাঁহারা যে কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ভাবিলাম, ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা। এইরূপ তমসাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল।"

['ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব'—জন্মভূমি, ১৭শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৮]

গিরিশচন্দ্রের নিজ মনের এই অবস্থা তাঁহার 'কালাপাহাড়' নাটকে নায়ক কালাপাহাড়ের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। কালাপাহাড় বলিতেছে :—

"অতীব কুটিল —
মন মম—সংশয় আগার, দুর্নিবার
সন্দেহ তাড়নে মতিভ্রমে। কহ সত্য,
কহহ প্রমাণ—শাস্ত্র বাক্য অমূলক
নহে, যাহে নিরঞ্জন পাই দরশন।......
অগ্রগল চঞ্চল প্রবল
সন্দেহ-প্রবাহ-পাকে; নিবিড় আঁধার
আবরিল হৃদাগার, হাহাকার নিশি-
দিবা; সত্য তত্ত্ব কিবা কহ মহাশয়!...
সত্য কি ঈশ্বর? কেহ কভু হেরে তাঁরে?"

[১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

আবার—

"শাস্ত্র ছটা ব্যাখ্যা ঘটা, বাক্যের বিন্যাস
হতাশে হুতাশে করে মানবে নিক্ষেপ।
ক্ষুদ্র নর, শমনের ভয় নিরন্তর
হৃদে জাগে, আকুল এ অকূল পাথারে
সন্দেহ-সাগরে দুলে দুরন্ত হিল্লোল।
এই আশ, তখনি নিরাশ, মহাত্রাসে
ভাসে জীবকুল। যে দন্দের ধার বহে
অনিবার, কে রাখিবে দারুণ সঙ্কটে?

কোথা কোথা দয়াল ঈশ্বর ! জীবে কৃপা
কই তাঁর ? অকূল এ দুরন্ত পাথার !"

[১ম অ, ১ম গ]

"বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে" গিরিশচন্দ্র এই ভাবের কথাই সোমগিরির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—

"এ সংসার সন্দেহ-আগার
বিভু নহে ইন্দ্রিয়-গোচর
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক যুক্তি করে অনুমান।
যত করে স্থির
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।
ঈশলুব্ধ প্রাণ ব্যাকুলিত জানিবে সন্ধান
কি উপায়ে পূরাইবে মন-প্রাণ ?"

[৩য় অ, ৩য় গ]

এই চিন্তা ক্রমশঃ অনন্ত হইয়া উঠে—

"কোথায় স্থানের সীমা ? কতই বিস্তার
দশ দিশি ! কালের জনম কোথা ? কোথা
কালের গমন স্থির ? নিবিড় তিমির !
নিবিড় তিমির ! রুদ্ধশ্বাস বৃথা ধ্যানে
হতাশ চিন্তায় ! দেহ কিবা, মৃত্যু কিবা,
কিবা এ সংসার ! কার অধিকার এই
বিপুল ব্যাপার ! দিনকর, শশধর,
তারকামণ্ডল নিত্য জলে নভস্থলে,
কিবা অভিপ্রায়, ধায় অবিরাম গতি ?
অনন্ত অশান্ত কালস্রোত ! এই নাশ,
বিকাশ আবার ! অন্ধকার, অন্ধকার !
এ বৃহস্ত গোচর কাহার ? কোথা কেবা
কে কবে আমারে ? সত্য কিবা মিথ্যা নারি
করিতে নির্ণয়। ভ্রান্ত, ভ্রান্ত শাস্ত্রকার,
অভিপ্রায়-হীন এ সংসার ; অকস্মাৎ—
স্রষ্টাহীন—সংযোগ বিয়োগ বিশ্বকালে
অনিশ্চিত অনিশ্চিত। বুদ্ধি পরাজয়
নির্ণয় না হয়—কে আছ কোথায় ?"

[কালাপাহাড়—১ম অ, ৩য় গ]

জড়বাদীদের যুক্তি তর্কও তখন আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে :—

'আমি' সত্য—'আমি' কিবা না হয় নির্ণয়।
এ কি পঞ্চভৌতিক সংযোগ ? চুণ যথা
সলিল-সংযোগে করে উত্তাপ উদ্ভব,
ভূত-সম্মিলনে এ কি চৈতন্য বিকাশ ?
জড় হ'তে চৈতন্য উদয়, জড়ে ছিল
চৈতন্য নিহিত, জড় বৃক্ষে তবে কেন
না ফলে চেতন ? জীবসৃষ্টি হেরি মাত্র
জীবের সংযোগে। কিবা জড় ? চৈতন্য বা
কিবা ? কিবা স্বপ্ন ? কিবা জাগরণ ? চক্ষু
কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সকল কিবা ? দেখি
যাহা, কেন সত্য মানি ? ইন্দ্রিয়ে প্রত্যয়
কি কারণে ? চক্ষু কর্ণে, ঘ্রাণে, আস্বাদনে,
স্পর্শে ভ্রম হেরি পদে পদে। তবে কিসে
ইন্দ্রিয়ে বিশ্বাস ? পঞ্চেন্দ্রিয় ভোলে, পাঁচে
মিলি ভ্রমে নাহি বলে, কোন্ যুক্তিবলে
সত্য মানি ইন্দ্রিয়-বচন ? কিসে করি
সত্য-নিরূপণ ? কোথা সত্য, এস হৃদি-
মাঝে ! এস, এস দেখা দাও অভাগায়।"

[কালাপাহাড়—১ম অ, ৩য় গ]

'শঙ্করাচার্য্য' নাটকেও সনন্দন এই ভাবের কথা শঙ্করাচার্য্যকে বলিতেছেন :—

"বুদ্ধিশক্তিহীন এই দীন দাস তব
সন্দেহ-ঝটিকা করে আলোড়িত হৃদি।
শাস্ত্রতর্ক হৈল তব ব্যাসদেব সনে,
তাহে মম জন্মেছে ধারণা,
মীমাংসা সম্ভব নহে তর্কবলে কভু।
শাস্ত্রজ্ঞান লাভ তবে কিবা প্রয়োজন ?

প্রত্যেক দর্শন শাস্ত্র ঋষি বিরচিত,
কিন্তু দর্শন বিরোধী পরস্পর ;
এ বিরোধে আকুল অন্তর-প্রম।
যদিও চরণাশ্রিত সন্তান তোমার,
তথাপি সন্দেহ মনে হয় নিরন্তর
ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন কিরূপে হ'বে মম ?
প্রত্যক্ষ কিরূপে হবে সত্যের মূরতি ?"

[৩য় অ, ৪র্থ গ]

'শঙ্করাচার্য্য' গিরিশচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা। গিরিশচন্দ্র পূর্ব্বে রচিত আদ্যোপান্ত নাটক গুলিতে বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন মত আছে বলিয়া যে সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, 'শঙ্করাচার্য্যে' তাহার সমন্বয়ের চেষ্টা পাইয়াছেন। কতটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমরা এস্থলে সে সমন্বয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাঁহারা বলেন, "যখন 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্' এই শাস্ত্রের অবস্থা, তখন শাস্ত্রচর্চ্চা বা দর্শন আলোচনা নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন", তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের এই সমন্বয়-পাঠে বুঝিবেন, শাস্ত্র বা দর্শন আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয় নহে। শঙ্করাচার্য্য সনন্দনের উপরি-উদ্ধৃত বাক্যের উত্তরে বলিতেছেন :—

"বৎস, স্থিরচিত্তে করহ শ্রবণ,
'তর্কযুক্তি শক্তিহীন সত্য-নিরূপণে'—
তর্কে তাহা হয় নিরূপিত ;
তর্ক বুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন।
শুন বৎস,
যে কারণে হইয়াছে দর্শন রচনা।
মানব-কল্যাণ হেতু মহা ঋষিগণ
যে সময় মানবের অবস্থা যেমন,
করেছেন উপযোগী দর্শন-রচনা।
বেদমর্ম্ম বর্জ্জিত কুতর্ক রত জন
নিরাস কারণ, দর্শনের প্রয়োজন।
নির্ম্মল হৃদয়ে হয় সত্যের উদয়,
সত্যমূর্ত্তি নাহি হয় দর্শনে দর্শন।"

[৩য় অ, ৪র্থ গ]

বিজ্ঞান ভিন্ন যাঁহারা কিছুই মানেন না, তাঁহাদের চরিত্র গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা'র বিবেকের মুখে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"কতদূর গিয়ে দেখি বসে একজন
চিন্তায় মগন,
ত্যজিয়ে বিষয়, রিপু করি জয়,
ভাবে মনে মানবের হিত।
চিন্তা নিরন্তর, কিসে সুখী হবে নর ?
কিন্তু হায়, চিত্ত তার ঘোর অন্ধকার।
ভাবে বিজ্ঞান কেবল মানবের বল ;
একমন করিছে কৌশল ;
তড়িৎ-কিঙ্করী সদা আজ্ঞাকারী
দেশে দেশে বার্ত্তা বহে তার ;
লয়ে বাষ্পযান তুচ্ছ করে স্থান,
সাগর-হৃদয় দলিত করিয়া যায়।
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্য জ্ঞান,
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ;
লিখে দম্ভভরে
ঈশজ্ঞান অনর্থের হেতু—
মহাভয়ে দ্রুত আইনু পলায়ে।"

[১ম অ, ২য় গ]

এই বিষয়ই গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রলাপ না সত্য ?' শীর্ষক প্রবন্ধে (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১০ সাল) আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আছে—"ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত দেহের প্রয়োজন, ঈশ্বর-জ্ঞান হইলে দেহের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রথম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। আবার দেখা যায়, সেই ইন্দ্রিয়েরাই প্রলোভিত করিয়া মনকে ঈশ্বর পথ হইতে অন্তর করে। ইন্দ্রিয়-প্রলোভনে মন সুখ আশে ব্যাকুল হয়, অনিত্য বস্তুতে আসক্তি জন্মে। উচ্চাশয় ব্যক্তিরা সাধারণের ন্যায় ইন্দ্রিয়-প্রলোভনে সুখী না হোন, নানাবিধ তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যতই তত্ত্ব অনুসন্ধান করুন,

যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় বিস্ফারণ পূর্ব্বক যতই জড় নিয়মের জ্ঞানলাভ করুন, মানসিক চিন্তায় দ্বারা যতই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি করুন, স্থির চিত্তে বুঝিতে পারেন, যে জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছে, তাহা আপেক্ষিক জ্ঞান। নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার আদৌ জন্মে নাই।

"সুবোধ ভাবুক তখন বুঝিতে পারেন 'যামকো যো জানা নেই, সো জানা হ্যায়্ কেয়া হ্যে?' সারতত্ত্ব লাভের যতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অপার আপেক্ষিক জ্ঞানে বিজড়িত হন। কিছুই নিশ্চিত হয় না, অথচ শোনেন ঈশ্বর আছেন, পুনর্জ্জন্ম আছে, দেহের মৃত্যুতে জীবের মৃত্যু হয় না। শোনেন মাত্র, স্থিরনিশ্চয় করিতে অক্ষম হন। তিনি তখন বোঝেন যে, অপর কোন দৃষ্টি ব্যতীত, অপর কোন ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত না হইলে নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বিদ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হন, ব্যাকুল হন কোথায় কি উপায়ে সেই নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। কেহ বা নিরাশ হইয়া, বৃথা চেষ্টা বিবেচনায় নিরস্ত থাকেন।

"কিন্তু যে পুরুষের সেই জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, যন্ত্রণায় আকুল হন, নানা প্রকারে উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। শাস্ত্র পাঠে শুনিয়াছেন, প্রার্থনা করিতে হয়। চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছেন, কৈ, সে নিরপেক্ষ জ্ঞান ত জন্মিল না। কি করিব? কোথায় যাব? কে পথ বলিয়া দিবে? নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া দেখেন, এ একথা বলে; সে সে কথা বলে। শাস্ত্রপাঠে যে গণ্ডগোল দেখিয়াছিলেন, সে গণ্ডগোল আর ঘোচে না। কি শোনেন? মানুষ নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করে। বিস্তর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাইয়াছেন। লোকের মুখেও শোনেন। কখনো বলেন মিথ্যা, কখনো সন্দেহ জড়িত হইয়া বলেন, কৈ দেখিলাম না তো। ভাবেন, যাক্, আর ও কথায় কাজ নাই। কিন্তু, সম্মুখে মৃত্যু। ভাবেন, হায়, চোক বাঁধা বলদের মত ঘুরিলাম, কিছুই জানি না। কোথায় কে আমায় উপায় বলিয়া দিবে? প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা ত' তিনি করিয়াছেন।"

এ অবস্থা সাধারণের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কেহ সংশয় হইতে কোন নির্ণয়ের উপায় না পাইয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া যাবজ্জীবন আপাত মনোরম সাংসারিক ভোগ সুখে রত হইয়া সাংসারিক জন সুলভ সুখ দুঃখে দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কেহ-বা ভাগ্য বশে সদ্গুরুর কৃপা লাভে ঈশ-জ্ঞানের অধিকারী হন। নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবারই বা উপায় কৈ? অতি ঘোর নাস্তিকেরও বিপদ কালে এমন একটা অবলম্বন দরকার হইয়া পড়ে যা সংসারে পাওয়া যায় না। এইরূপ বিপদে পড়িলে আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা চলে না। গিরিশচন্দ্র চতুর্দ্দশবর্ষ ধর্ম্ম জীবনে নিশ্চেষ্ট ভাবে যাপন করিয়া এই প্রকার সাংসারিক মহা বিপদে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার নাস্তিকতা আর রহিল না।

আগে তিনি বলিতেন ঈশ্বর নাই। ঈশ্বরের প্রমাণ করিতে বলিলে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার উদাহরণ লোকে দেয়, কিন্তু হিউম বলিয়াছেন:—

"It is more probable that men should lie, than miracles should be true."

গিরিশচন্দ্র বিসূচিকা গ্রস্ত হইলেন। রোগ শয্যায় অনুভব করিলেন, তাঁহার পরলোকগতা জননী আসিয়া মুখে মহাপ্রসাদ দিলেন। চেতনাবস্থা লাভ করিলেও জিহ্বায় সেই প্রসাদের আস্বাদন গিরিশচন্দ্র অনুভব করিলেন। তখন হিউমের কথায় আর সেরূপ আস্থা রহিল না। নীরোগ শরীরে বিদ্যা বুদ্ধির অহঙ্কারে যাহাকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, রোগে, বিপদে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইল। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "বন্ধু-বান্ধব-হীন, চারিদিকে বিপজ্জাল, দুর্জ্জন শত্রু সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে; এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, এ অকূলে কূল দাও। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, কেহ

কেহ আর্ত্ত হইয়া আমায় ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই। দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশা-সূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ান্ধকার দূর করিল, বিপদ-সাগরে কূল পাইলাম।" [অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "গিরিশচন্দ্র," ১৮৬ পৃষ্ঠা]

এই অবস্থাই অন্যত্র গিরিশচন্দ্র এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"পরে দুর্দ্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপদ্ মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আমারও ত কঠিন বিপদ্, একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য। এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, দেবতা মিথ্যা নয়।

"বিপদ হইতে ত মুক্ত হইলাম কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব। কোন্ পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেব দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। কিন্তু সকলেই বলে যে গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই ত ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়; কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তি পূর্ণ হইল। মনুষ্যকে গুরু করিতে পারি না।

'গুরু র্ব্রহ্মা গুরু র্বিষ্ণুঃ গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া তাহা আমি কিরূপে করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়োজন। গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব? যাক, আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া গুরু হোন্। শুনিয়াছিলাম, নরবেশ ধরিয়া কখনো কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই। নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের ত কৈ দেখা পাই না, তবে আর কি করিব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব তার পর যা হয় হইবে।.........

"যে কারণে মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম, এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, গুরুর নিকট যে জোড়হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ যোটান মাত্র।"

("ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব")।

গুরু সম্বন্ধে এই ধারণা গিরিশচন্দ্র কালাপাহাড়ের মুখ দিয়াও বলাইয়াছেন—

"কেবা গুরু? কোথা তাঁর স্থান? মম সম
মানবে প্রত্যয় হায় কেমনে করিব?
কেমনে জানিব বাক্য মিথ্যা নহে তাঁর?
[১ম অ, ১ম গ]

"যাহে বিশ্বব্যাপী কহে, নর-
কলেবরে বিরাজিত মানিব কেমনে?
গুরু গুরু, কেবা গুরু, কোথায়, কোথায়?
কি প্রত্যয় কথায় তাঁহার?
মম সম ক্ষুদ্র নর, আবদ্ধ এ দেহের পিঞ্জরে,
জন্ম-মৃত্যু মাঝে, দুঃখসুখে দোলে কয়
দিন, ক্ষীণ তনু পলে পলে জীবনের

তাপ হবে লীন, তবে চিহ্নমাত্র নাহি
রবে আর, সীমাশূন্য বিস্তার বিস্তার
বিগুণ সংসার, লক্ষ্যশূন্য পন্থাহারা
কাহারে বিশ্বাস! চিন্তা, চিন্তা, ওহো
রুদ্ধ হয় শ্বাস, ঘোর ত্রাস বিনাশ সম্মুখে।"

[১ম অ, ৩য় গ]

যে দাম্ভিকতায় গিরিশচন্দ্র গুরু মানিতে চান নাই, তাহা মাৎসর্য্য-সৃষ্ট। চৈতন্যলীলায় মাৎসর্য্য বলিতেছে—

"একা আমি করি সমুদয়
অতিহীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায়;
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ পরাজয়
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার;
বুদ্ধি তারে বলে,
ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই।
গুরু কেবা? কিবা উপদেশ দিবে?"

[১ম অ, ১ম গ]

ধর্ম্মজীবনে এইরূপ মানসিক অবস্থার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত গিরিশচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। একদিন বাগবাজার বসুপাড়ায় ৺দীননাথ বসুর বাটীতে পরমহংসদেব আগমন করেন। গিরিশচন্দ্র ঐ পাড়ায় বাস করিতেন। তিনি পরমহংসদেবের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া কৌতূহল বশতঃ দেখিতে গেলেন। ইহার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মগণ তথায় যাতায়াত করিয়া থাকেন। ইহা পাঠে গিরিশচন্দ্রের ধারণা হইয়াছিল যে হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে পরমহংস বলে, ইনি সেরূপ পরমহংস নহেন। যাহা হউক, দীননাথ বসুর বাটীতে গিয়া গিরিশচন্দ্র দেখিলেন যে, পরমহংসদেব উপদেশ দিতেছেন ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি উপস্থিত সকলে তাহা শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হওয়ায় একজন আলোক জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংসদেব পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "সন্ধ্যা হইয়াছে?" ইহাতে গিরিশচন্দ্রের মনে হইল "সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে আলোক জ্বলিতেছে, অথচ ইনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে সন্ধ্যা হইয়াছে কি না? এ আর কি দেখিব!" এই ভাবিয়া পরমহংসদেবের প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

এই প্রথম দর্শনের কয়েক বৎসর পরে একদিন ৺বলরাম বসু গিরিশচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করেন। পরমহংসদেব রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে আসিবেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্যই এই নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র গিয়া দেখিলেন, পরমহংসদেব অতি দীনভাবে ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া বার বার নমস্কার করিতেছেন। একজন কীর্ত্তন গায়িকা কীর্ত্তন গাহিবার জন্য উপস্থিত ছিল। গিরিশচন্দ্রের এক বন্ধু তাহাকে উল্লেখ করিয়া পরমহংসদেবের প্রতি ব্যঙ্গ করিল। এই সময় অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ জোর করিয়া গিরিশচন্দ্রকে নিজে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

এই দর্শনের পর, ষ্টার থিয়েটার যখন বীডন ষ্ট্রীটে ছিল এবং গিরিশচন্দ্রের রচিত চৈতন্যলীলা যখন সেই থিয়েটারে অভিনীত হইতেছিল, তখন একদিন পরমহংসদেব ঐ থিয়েটার দেখিতে যান। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলে পরমহংসদেব অগ্রেই গিরিশচন্দ্রকে নমস্কার করিলেন। গিরিশচন্দ্র তখন নমস্কার করিলে, পরমহংসদেব আবার গিরিশচন্দ্রকে নমস্কার করিলেন। গিরিশচন্দ্র আবার নমস্কার করিলে পরমহংসদেব আবার নমস্কার করিলেন। তখন গিরিশচন্দ্র মনে মনে পরমহংসদেবকে নমস্কার করিয়া, তাঁহাকে থিয়েটারে বসাইয়া, নিজের শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলিয়া যান।

এই নমস্কারের ঘটনায় গিরিশচন্দ্রের মনে ধারণা হইল যে পরমহংসদেব নিরহঙ্কার। গুরুর নিকট শিষ্য

সর্ব্বদা যোড়হাত করিয়া থাকিবে কেন, এইরূপ যে দম্ভ তাঁহার যে ছিল, তাহা পরমহংসদেবের ব্যবহারে আর রহিল না। ইহার পর একদিন গিরিশচন্দ্র নিজ বাড়ীর রকে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন যে পরমহংসদেব যাইতেছেন। গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের দিকে চাহিবামাত্র পরমহংসদেব তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন। পরমহংসদেব চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলিল যে পরমহংসদেব তাঁহাকে ডাকিতেছেন। গিরিশচন্দ্র ৺বলরাম বসুর বাড়ীতে পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্ব হইতেই গুরু-বিষয়ক যে প্রশ্ন আসিতেছিল, তাহা তিনি এইবার প্রকাশ্যেই পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "গুরু কি?" পরমহংসদেব বলিলেন, "গুরু কি জান, যেমন ঘুটী—জুটিয়ে দেয়।" এই বলিয়া বলিলেন, "তোমার গুরু হয়ে গেছে।" এই কথায় গিরিশচন্দ্রের মনের অস্থিরতা দূর হইল। ভাবিলেন 'আর কি? আমার গুরু ত হয়ে গেছে।' *

গিরিশচন্দ্রের প্রথম বিশ্বাস ছিল, জলবায়ুর ন্যায় ধর্ম্ম মানবের প্রয়োজনীয় হইলে ঈশ্বর অবশ্যই তাহা সহজ-লভ্য করিয়া দিতেন। পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ লাভে তাঁহার বিশ্বাস হইল, সত্যই ধর্ম্ম অতি সহজলভ্য—নহিলে থিয়েটারে পরমহংসদেব তাঁহাকে দর্শন দিবেন কেন?

গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় বিশ্বাস ছিল, আমারই মত মানুষকে গুরু করিয়া তাঁহার পদলুণ্ঠিত হইব কেন? পরমহংসদেবের নিরভিমানতায় ও দীন ব্যবহারে তাঁহার সে দাম্ভিকতা চূর্ণ হইয়া গেল। পরমহংসদেবের এই ব্যবহার গিরিশচন্দ্র "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" নামক কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন—

"নিরৈশ্বর্য্য আসিয়াছ মাধুর্য্য লইয়ে
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব, মানব-মাঝে পরশিতে হিয়ে
অমিশ্রিত মাধুর্য্য অধরে;
পাছে নর নাহি আসে ডরে,
দীনবেশে ডাক সকাতরে;
হরিবারে মন-প্রাণ কর নাথ আত্মদান,
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন মাধুরী হেরি অভিমান হরে।"

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

* 'কালাপাহাড়' নাটকে গিরিশচন্দ্র এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন—

কালাপাহাড়। মহাশয় গুরু কেমন তিনি?
চিন্তামণি। ঘটক হে ঘটক, জুটিয়ে দেয়।
[১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

"ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি। তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

তীর্থযাত্রীর পত্র

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৬ই জুন ১৯২৩—ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য যাত্রীদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় সময় দিল্লী উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এই অসহ্য গরমে কেহই পদব্রজে ষ্টেশনে আসিতে সম্মত হইলেন না—শরীরকে অকারণ কষ্ট দিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হয়েন সকলেই এই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জিনিষ-পত্র ঠেলা গাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া আমরা মোটরে হরিদ্বার ষ্টেশনে আসিলাম।

এস লাইনে আমরা বাইবলে গাড়ীবদল করিবার ষ্টেশন হইতেই ছাড়ে। গাড়ী ষ্টেশনেই ছিল, আমরা তখন গাড়ীতে উঠিয়া ছাড়িবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় গাড়ী সাহারণপুর পৌঁছিল। এখানে আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। দিল্লীগামী গাড়ী এই ষ্টেশন হইতেই ছাড়ে কিন্তু গাড়ী তখনও প্লাট্‌ফরমে আইসে নাই; কুলী বলিল প্লাটফরমে অবস্থান করা যাইবে না, আমাদিগকে মুসাফেরখানায় যাইতে হইবে এবং গাড়ী ছাড়িবার অল্প পূর্ব্বে এখানে আসিতে হইবে।

রাত্রিকালে মাল-পত্র ও স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া পুলের উপর দিয়া একবার যাওয়া, আবার আসা এ অসুবিধা হইতে যদি অব্যাহতি পাওয়া যায় তাহার উপায় করিবার জন্ত টিকেট কালেক্টরের সঙ্গে আলাপ করিলাম এবং তাহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্লাটফরমেই রহিলাম।

অসুবিধা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত প্লাটফরমে রহিলাম বটে, কিন্তু বিপদ এক "দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া" আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্ত প্লাটফরমের অপর দিকে যাইবার সময় দীনেশ প্লাটফরমের নীচে ড্রেণে পড়িয়া গেল। স্থানটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। একজন রেলওয়ে খালাসীর নিকট হইতেই একটা লণ্ঠন আনিয়া দীনেশকে নর্দ্দামা হইতে তুলিলাম। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আঘাত গুরুতর হয় নাই। দীনেশকে প্লাটফরমে রাখিয়া নিজেই "বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায়" বাহির হইলাম।

যথা সময়ে দিল্লীগামী গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সমস্ত পথ রাত্রিতে অতিক্রম করায় পথের দুই দিকের দৃশ্য কিছুই দেখিতে পাই নাই। ষ্টেসনের মধ্যে মীরাট ছাউনী ষ্টেসনে গাড়ী অনেকক্ষণ ছিল। বর্ত্তমান মীরাটই নাকি প্রাচীন হস্তিনাপুর—দুর্য্যোধনের রাজধানী।

৭ই জুন—প্রাতে সাতটায় গাড়ী দিল্লী পৌঁছিল। শ্রীমান্ মুকুন্দকে (আমার ভাগিনেয়) ষ্টেসনে দেখিতে পাইব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ষ্টেসনে দুই চারিজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম রামযশ কলেজ এখান হইতে প্রায় ৩ মাইল দূর—পাহাড়ের উপরে। দুই খানা টোঙ্গা ভাড়া করিয়া কলেজ অভিমুখে রাওনা করিলাম।

কলেজের পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলে কলেজের অপর একজন অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট জানিতে পারিলাম ভাগিনেয় বাবাজী আমাদিগকে আনিবার জন্ত ষ্টেসনে গিয়াছেন।

অধ্যাপক বাবুর সঙ্গে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ ছিল এবং তাহার নিকটেই আমাদের জন্ত নির্দ্দিষ্ট ঘরের চাবী ছিল। সে কুলী ডাকিয়া মালপত্র বাসায় আনিল। আমরা বাসায় আসিবার অল্প পরে মুকুন্দও বাসায় আসিল। আমাদের গাড়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ে না আসাতে নির্দ্দিষ্ট প্লাটফরমে আমরা অবতরণ করি নাই সেই জন্ত শ্রীমানের সঙ্গে ষ্টেসনে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই।

যে পাহাড়ের উপর কলেজটি স্থাপিত সে পাহাড়টী তৃণ-গুল্মাদি বর্জ্জিত। সকালে ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত ঘরের বাহির হওয়া অসম্ভব—ঘরের মধ্যে থাকাও অতীব কষ্টকর। স্থানটী কিন্তু খুব স্বাস্থ্যকর—এবারকার দিল্লীর ভীষণ প্লেগের উপদ্রবেও এই পাহাড়ে প্লেগ সংক্রামিত হয় নাই। পাহাড়ের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা, ভৃত্যাভাব এবং জলাভাব।

কলেজে ও কলেজ সংলগ্ন অধ্যাপক ও ছাত্র-আবাসে সাধারণতঃ গাড়োয়ালীরাই ভৃত্যের কায করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে গাড়োয়ালীগণ গরম সহ্য করিতে পারে না, দেশে চলিয়া যায়। তখন অতিরিক্ত বেতন দিয়া স্থানীয় লোক নিযুক্ত করিতে হয় এবং তাহারাও যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায় না। পাহাড়ের উপর একটি কূপ আছে কিন্তু তাহার জল দুর্গন্ধ। রন্ধন এবং পানের জল প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী অন্ত কূপ হইতে আনিতে হয়।

আমরা যে কয়দিন দিল্লীতে ছিলাম সেই কয়দিন মাত্র আমাদিগকে জল সরবরাহ করিবার জন্য শ্রীমানকে তিনজন অতিরিক্ত ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

অদ্য বৈকালে আমি ভিন্ন অন্যান্য সকলে যুবকের সঙ্গে সহর দেখিয়া আসিল।

৮ই হইতে ১৩ই জুন পর্য্যন্ত দিল্লীতে ছিলাম। মধ্যে ৯ই জুন অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় দিল্লী ত্যাগ করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। ১০ই জুন কুরুক্ষেত্র ও থানেশ্বর দর্শন করিয়া সেইদিনই অপরাহ্ণে দিল্লী প্রত্যাগমন করি।

কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনের নিকটেই কলিকাতার কোন মল্লিক বাবুদের ধর্মশালা আছে। আমরা রাত্রিশেষে কুরুক্ষেত্র ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি সেই ধর্মশালায় অতিবাহন করি। প্রত্যূষে টোঙ্গা ভাড়া করিয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হই। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে তীর্থক্ষেত্র অনুমান দুই মাইল হইবে।

এখানকার তীর্থ কৃত্য দ্বৈপায়ন হ্রদে স্নান। যে জলাশয়ে আমরা স্নান করিলাম, পাণ্ডা বলিল ইহাই দ্বৈপায়ন হ্রদ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে দুর্য্যোধন এই হ্রদ-জল মধ্যে লুকায়িত ছিলেন। কালবশে হ্রদ এখন পুষ্করিণীতে পরিণত হইয়াছে। স্নানের পর অপর একটী স্থান দেখাইয়া পাণ্ডা বলিল, এইখানে পৃথিবী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিয়াছিলেন। আধুনিক কালের ভাষায় কর্ণের রথের চাকা এখানে মাটীতে ডাবিয়া গিয়াছিল। হ্রদের নিকটে কয়েকটি আশ্রম আছে এবং কোথাও পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে।

অনেক দূরে বাণগঙ্গা নামে একটী স্রোত আছে পাণ্ডা এরূপ বলিল। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মদেবের তৃষ্ণা শান্তি জন্য অর্জ্জুন পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই স্রোতই বাণগঙ্গা নামে পরিচিত। স্থানটি অনেক দূরে, আমরা দেখি নাই।

সমস্ত মাঠটী ৮৪ যোজন বিস্তৃত। ভ্রমণ শেষ করিতে প্রায় মাসাধিক সময় লাগে। পাণ্ডা বলিল কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের অনেক নিদর্শন এখনও এ মাঠে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণ্ডার কথায় সত্যতা নির্দ্ধারণের ভার ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রতি রাখিয়া, আমরা থানেশ্বরের কালীবাড়ী দর্শন করিয়া পুনরায় ধর্মশালায় আসিলাম এবং বৈকালের গাড়ীতে দিল্লী পৌঁছিলাম। পথে রেল গাড়ী হইতে পাণিপথের মাঠ দৃষ্ট হইল।

১৯১২ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে দিল্লীকে প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইত। এখন আধুনিক দিল্লী বলিতে অন্য এক অংশ বুঝাইয়া থাকে। এই অত্যাধুনিক দিল্লীর নির্ম্মাণকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।

(১) প্রাচীন দিল্লী—অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ। বর্ত্তমান স্থানীয় নাম পুরাণা কিল্লা। ইহাই পাণ্ডবদের রাজধানী ছিল। কিল্লার মধ্যে একটি শিব মন্দির আছে; ইহা কুন্তীদেবীর স্থাপিত বলিয়া কথিত। পূর্ব্বে কিল্লার মধ্যে লোক বসতি হইয়াছিল—লর্ড কর্জ্জনের সময় তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(২) আধুনিক দিল্লী অনেক স্থান বিস্তৃত। প্রধানতঃ পাঠান দিল্লী ও মোগল দিল্লী এই দুই সাধারণ নামে আধুনিক দিল্লীকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পাঠান দিল্লীও অনেকগুলি। দাসরাজ শ্রেণী (Slave dynasty) হইতে লোদী বংশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পাঠান রাজবংশ এবং শেরশাহ এক একটী স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এ সমস্ত ঐতিহাসিক কথা লিখিতে হইলে ইংরেজ লিখিত পুস্তকের তর্জ্জমা করিতে হয়, সুতরাং নিষ্প্রয়োজন।

আমরা দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—কুতব মিনার, লৌহস্তম্ভ, আলতামসের সমাধি, রিজিয়া বেগমের প্রার্থনা গৃহ (নমাজ পড়িবার ঘর), লম্ফন কূপ (অতি উচ্চস্থান হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কূপজলে পতিত হইয়া দর্শককে তামাসা দেখান হয়,) আলাউদ্দীন খিলিজির সমাধি, সফদর জঙ্গের সমাধি, হুমায়ুনের সমাধি. (অথবা তৈমুরের বংশের সমাধি) শাহজাহানের

দুর্গ, জুমা মসজিদ, (যে মসজিদ হইতে নাদির শাহ দিল্লী-বাসীদিগকে হত্যার হুকুম দিয়াছিল) এবং যে রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল সেই রাস্তা দর্শন করিলাম। একদিন কাশ্মীর তোরণ দেখিয়া আসিলাম।

একমাত্র শাহজাহানের দুর্গ দেখিতে পয়সা দিয়া টিকিট কিনিতে হয়, অন্যত্র কোথাও টিকিট কিনিতে হয় না, তবে পয়সা যে ব্যয় করিতে হয় না তাহা নহে।

দিল্লীতে সর্ব্বাপেক্ষা একটা নূতন জিনিষ দেখিলাম বা শুনিলাম "পৃথ্বীরাজের তোপখানা।" যে ব্যক্তি গাইড্ হইয়া আমাদিগকে পাঠান দিল্লী দেখাইতেছিল, সে কুতব মিনারের পূর্ব্বে একটা ভাঙ্গা দালান দেখাইয়া বলিল, "ঐটা ছিল পৃথ্বীরাজের তোপখানা।"

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর সর্ব্বপ্রথম তোপ ব্যবহার করেন ইহাই ইতিহাসের কথা। বৈদিক যুগেও ভারতবর্ষে বায়স্কোপ, কিনামটোগ্রাফ্ প্রভৃতি ছিল ইহা যাঁহারা সকলকে বিশ্বাস করিতে বলেন, তাঁহাদের মতে একাঘ্নী, শতঘ্নী বাণ প্রভৃতি Long Tom machine gun প্রভৃতিরই জ্যেষ্ঠ সহোদর। আমার গাইড, রাম রাবণের ও মোগল-পাঠানের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের আরম্ভ কালেও তোপের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রকাশ করিল।

যে "দিল্লীর লাড্ডু"র আমাদের দেশে এত খ্যাতি, দিল্লীতে তাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত। "দিল্লীকা লাড্ডু" বলিয়া যে একটা তামাসার কথা আছে দিল্লীবাসিগণ তাহা জানেও না।

১৩ই জুন—রাত্রে দিল্লী ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করি। দিবাভাগেই আমরা কলেজের নিকটবর্ত্তী একটী ছোট রেলষ্টেসনে গাড়ী ধরিয়া, দিল্লী সহরে ষ্টেশনের নিকট এক হোটেলে আসিয়া থাকি। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মুকুন্দ হোটেল হইতে সকলকে ষ্টেশনে লইয়া গিয়া রেল গাড়ীতে উঠাইয়া দেয়।

১৪ই জুন—সকালে মথুরা পৌঁছিলাম। এখান হইতে গাড়ী বদল করিয়া বৃন্দাবন আসিলাম।

মথুরা ষ্টেসনেই বৃন্দাবনের পাণ্ডার সহিত পরিচয় হয়। বৃন্দাবনে গোবিন্দের পাণ্ডার মুরলীধর স্বরূপ-জানের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

বাল্যকালে একটি সঙ্গীতে শুনিয়াছিলাম—

"ধন্য মানি জনম, হেরিলাম বৃন্দাবন
সফল হ'লো জীবন, জুড়াইলাম।"

আমরা বৃন্দাবনে দুই সপ্তাহ বিশ্রাম করিয়া "জুড়াইব" ঠিক করিলাম। সঙ্গীয় পাণ্ডাঘর দীনেশ ও ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া বাজার দেখাইয়া আনিল। পাণ্ডার প্রথম উপদেশ, কখনও ঘরের কপাট খোলা না রাখা। এখানে বানরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশী, একটু সুবিধা পাইলেই খাদ্য দ্রব্য এমন কি কাপড় বাসন প্রভৃতিও বানরে লইয়া যায়।

বৃন্দাবনেও জলকষ্ট কম নহে। এক বৃন্দাবনে কোথাও কূপজল বিস্বাদ-লবণাক্ত, আবার কোথাও কূপজল স্বাদু। আমাদের ধর্ম্মশালার কূপটির জল লবণাক্ত। পানের এবং রন্ধনের জল ধর্ম্মশালা হইতে পাওয়া যায়। যাত্রীদিগকে জল আনিয়া দিবার জন্য ধর্ম্মশালার তরফ হইতে একজন "চৌবেজী" নিযুক্ত আছে।

এখানে প্রবাদ, গোবিন্দজীর চরণে সমুদ্র বাস করেন, তাই গোবিন্দজীর জমীদারী মধ্যে যত কূপ সমস্তই লবণাক্ত জলপূর্ণ; গোবিন্দজীর জমীদারীর বহির্ভুক্ত স্থানের কূপজল স্বাদু।

নির্দ্দিষ্ট হারে প্রণামী না দিলে বিগ্রহ দর্শন করিতে পারা যাইবে না, বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র শ্রীপাট বৃন্দাবন ধামেই তাহা প্রথম শুনিলাম।

রূপ গোস্বামী স্থাপিত গোবিন্দজী, সনাতন গোস্বামী স্থাপিত মদনমোহন এবং শ্রীজীব গোস্বামী স্থাপিত গোপীনাথ—ভেটী অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টহারে প্রণামী না দিলে দর্শন করা যায় না। অন্যান্য অনেক দেবালয় আছে যেখানে ভেটী না দিলেও বিগ্রহ দর্শন করা যায়।

শেষোক্ত শ্রেণীর দেবালয় মধ্যে লালাবাবুর ঠাকুর বাড়ী, শেঠজীর মন্দির, লক্ষ্ণৌর শেঠজীর মন্দির, গোস্বা-

জিয়র মহারাজের ঠাকুর বাড়ী, বঙ্কুবিহারীর মন্দির, বেতকপুরের বাবুদের অষ্ট সখীর মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইহার কোন কোন মন্দির হইতে যাত্রীদিগকে প্রসাদও "বিতরণ" করা হয়। তবে পূর্ব্ব দিন বৈকালে অধ্যক্ষের নিকট হইতে টিকিট কিনিয়া আনিতে হয় নতুবা প্রসাদ পাওয়া যায় না। গোস্বামী স্থাপিত বিগ্রহের প্রসাদও ক্রয় করিতে হয়।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীই প্রতিপত্তিশালী। গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরটী নাকি রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরটী এত উচ্চ ছিল যে আগ্রার দুর্গ হইতে এই মন্দিরের প্রদীপ দৃষ্ট হইত এবং এই অপরাধে বাদশাহ আওরঙ্গজেব মন্দিরটীর চূড়া ভাঙ্গিয়া দেন। বর্ত্তমান মন্দিরটী কোনও বাঙ্গালী ধনী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

শেঠজীর ঠাকুর বাড়ীতে বিখ্যাত সোণার (অনেকের মতে পিতলের উপর গিল্টি করা) তালগাছ বর্ত্তমান। জয়পুর মহারাজের ঠাকুর বাড়ী এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এতদ্ব্যতীত নিধুবন, নিকুঞ্জবন, কালীয় দমন ঘাট, বস্ত্রহরণ ঘাট, বংশীবট প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের যৌবন লীলার স্মৃতি-বিজড়িত অনেক দ্রষ্টব্যস্থান আছে।

লালা বাবুর ঠাকুর বাড়ীর একটু দক্ষিণে চৌষট্টি মোহান্তের সমাধি। একজন বাঙ্গালী যুবক বৈষ্ণব এই সমাধি রক্ষা করিতেছেন। দর্শকের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপরই যুবকের নির্ভর। এখানে একটী গাছ শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্তরোপিত গাছ বলিয়া দেখান হয়। চৌষট্টি মোহান্তের সমাধি ক্ষেত্রে সনাতন গোস্বামীর এক সমাধি এবং মদনমোহনের বাড়ীর নিকট তাঁহার অপর একটী সমাধি দেখান হয়। কোন্‌টী যে প্রকৃত বলা যায় না।

চৌষট্টি মোহান্তের সমাধি ক্ষেত্রের নিকট মাড়োয়ারী পঞ্চাইতি। সকালে এবং বৈকালে ভিক্ষার্থীগণ সমবেত হইয়া "রাধা কৃষ্ণ" নাম গান করিলে তাহাদিগকে চাউল দেওয়া হয়। বৃন্দাবনে এখন মাধুকরীর পরিবর্ত্তে এই ভিক্ষা দ্বারা অনেকে জীবন ধারণ করিতেছে—মাধুকরী এখন দুষ্প্রাপ্য।

১৫ই হইতে ২৯.শ জুন পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে ছিলাম। দুই টাকা হারে ভেটী দিয়া গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন এবং কাত্যায়নী দর্শন করিতে হইল। এক নামে একাধিক বিগ্রহ স্থাপনের ব্যবসায়ও এখানে আছে। কাত্যায়নীর বাড়ীতে বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "শাস্ত্রে উক্ত, ব্রজে কাত্যায়নী পরা। এই সেই কাত্যায়নীর বাড়ী, প্রতারকের কথায় অন্যত্র যাইবেন না।" কাত্যায়নী বৈষ্ণব বিগ্রহ নহেন, শাক্তদের পীঠ।

যে কয়দিন বৃন্দাবনে ছিলাম, দ্রষ্টব্যস্থান গুলি সমস্তই দেখিলাম। তারাকিশোর বাবুর (মোহান্ত সন্তদাসজী) স্থাপিত নিম্বার্কাশ্রমে দুইদিন গিয়াছিলাম। আমার মুক্তিনাথ যাত্রায় সঙ্গী রাধাশ্যামজী এখনও বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই। আশ্রমস্থিত দুই একজন বৈষ্ণবের সঙ্গে আলাপে জানিতে পারিলাম, আমি যখন হরিদ্বারে ছিলাম, রাধাশ্যামজী তখনই হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন; আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় নাই। তারাকিশোর বাবু বৃন্দাবনের অসহ্য গরমে কলিকাতায় আছেন, ঝুলনের কিছু পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিবেন।

বৃন্দাবনে অবস্থান কালে "কৃষ্ণ চৈতন্যদাস বাবাজী" নামে একজন বৈষ্ণবের সহিত পরিচয় হয়। ইঁহার পূর্ব্বনাম (রায় সাহেব) কৈলাসচন্দ্র দাস। ইনি আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীনে চিকিৎসা বিভাগে কার্য্য করিতেন। পেন্সন লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই অবধি এখানেই আছেন। ঝুলন পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে থাকিতে তিনি আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু শেষে আমরা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

১৮ই জুন প্রাতে কেশীঘাটে স্নান করিয়া মাতাঠাকুরাণী ও আমি পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির

হই। বেলা প্রায় ১১ টায় সময় পুনরায় কেশীঘাটে আসি। ঝুলনের সময় অনেক লোক পরিক্রমণ করে, তখন পথও বেশ পরিষ্কার করা হয়। এখন পথ তত পরিষ্কৃত নহে এবং পরিক্রমণ কারীর সংখ্যাও খুব বেশী নাই। দুই চারি জন ভক্তের সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহারা বুকে হাঁটিয়া পরিক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

২৫শে জুন। অদ্য প্রত্যূষে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন জন্য যাত্রা করি। বৃন্দাবন হইতে যাতায়াতের জন্য একখানা গাড়ী ভাড়া করিলাম। ভাড়া ৭ টাকা। বেলা প্রায় ১০ টায় শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড উপস্থিত হইলাম। পরস্পর প্রায় সংলগ্ন দুইটী পুষ্করিণী শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড নামে খ্যাত। বহুদিন পক্কোদ্ধার না হওয়ায় পুষ্করিণীর জল বিবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে। পুষ্করিণীতে স্নান ও কয়েকটী দেবালয়ে বিগ্রহ দর্শন করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পথে গিরি গোবর্দ্ধন। এখানেও স্থাপিত বিগ্রহ আছে। গাড়ী থামাইয়া বিগ্রহ দর্শন করিলাম। আমি বিজয়কৃষ্ণ মহাশয়কে চিনি কিনা এখানকার একজন ব্রাহ্মণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড হইতে মথুরার পথে উষ্ট্র সওয়ার দেখিলাম। ঘোড়ার যেরূপ পিঠে জিন মুখে লাগাম দিয়া সওয়ার উঠে, সেইরূপ উটেরও পিঠে জিন মুখে লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মথুরা হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে আমাদের গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। অন্য কোন যান বাহন এখানে সংগ্রহ করা অসম্ভব, সকলকেই পদব্রজে রওয়ানা হইতে হইল। তীর্থ যাত্রীরা যেরূপ তাহাদের দ্রব্য সামগ্রী মোট বাঁধিয়া মাথায় বহিয়া লয়, সেইরূপ একটী মোট মাথায় করিয়া চলিতে আমার কন্যার বড় সাধ হইল। আমরা প্রত্যেকে একখানা করিয়া অতিরিক্ত কাপড় এবং গামছা আনিয়াছিলাম, তাহাই একত্র করিয়া একটী বোচ্‌কা বানাইয়া দিলাম। কন্যা বোচ্‌কা মাথায় করিয়া আনন্দে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি ও আমার কন্যা অগ্রে, অন্যান্য সকলে পশ্চাতে। মথুরা হইতে এক মাইল দূরে থাকিতে কন্যা জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, আর কত দূর? ঐ যে লোকটী আসিতেছে উহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" বালিকার কণ্ঠস্বর অতি করুণ, বুঝিলাম তাহার আনন্দ ও উৎসাহ আর নাই, পথশ্রান্তি জন্য অবসাদ আসিয়াছে।

ক্রমে মথুরা সহরে আসিলাম এবং পথপ্রান্তে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলাম। অন্যান্য সকলে আসিয়া পৌঁছিলে, সেখান হইতে আরও এক মাইল হাঁটিয়া আসিয়া বৃন্দাবন গামী একখানা গাড়ী পাইয়া সেখানা ভাড়া করিলাম।

পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি। অনেক যাত্রী বৃন্দাবন অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছে। নৈশ শোভা বড়ই সুন্দর। আমাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যতদূর উপভোগ করা সম্ভব, ততদূর উপভোগ করিতে করিতে, প্রায় রাত্রি দশটায় বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম।

২৬ শে তারিখে বিশ্রাম করিয়া ২৭ শে তারিখে আমরা গোকুল দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম।

অদ্য যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া না করিয়া টোঙ্গায় মথুরা পর্য্যন্ত আসিলাম।

মথুরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। বৃন্দাবন শুধু বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্মৃতি লইয়া বর্ত্তমান। মথুরা, ইতিহাস ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্মৃতি বিজড়িত। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতিকালে মথুরা একটী বিখ্যাত স্থান ছিল। এখনও তীর্থযাত্রীদিগকে বৈষ্ণব বিগ্রহের সহিত একটি বৌদ্ধদেবতা এখানে দেখান হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্যে কনস্ কিল্লা (রাজা কংসের দুর্গ) নামক একটী উচ্চস্থান দেখান হয়। কংসের এক রাণী কংসের সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ যমুনা-কূলে একটী মঠ দর্শককে দেখান হয়।

আমরা প্রথমতঃ যমুনায় স্নান সম্পন্ন করিয়া, নৌকায় পাণ্ডার বাড়ী আসিলাম। অতিরিক্ত বস্ত্রাদি এখানে রাখিয়া বিগ্রহ দর্শনে বাহির হইলাম।

কুঞ্জনাথ, মথুরানাথ দর্শন করিয়া আমরা দ্বারকা-

নাথের বাড়ী আসিলাম। বৃন্দাবনে যেমন গোবিন্দজী, মথুরায় তদ্রূপ দ্বারকানাথজী বিভবশালী বিগ্রহ। দ্বারকা-নাথের বাড়ীটী বড়ই সুন্দর। মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড নাট মন্দির। যখন আমরা দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম তখন ভোগের সময়, মন্দিরের কপাট বন্ধ, বহু লোক বিগ্রহ দর্শনের আশায় নাট মন্দিরে অবস্থান করিতেছে। এক স্থানে একজন পণ্ডিত ভাগবত পাঠ করিতেছেন। অন্যত্র গায়ক ও বাদক দল যন্ত্রাদি সহ অপেক্ষা করিতেছে। সকলেরই চক্ষু মন্দিরের দিকে—কখন্ দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

কিছুক্ষণ পরে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হইল। সমবেত কণ্ঠ হইতে "জয় দ্বারকানাথ জীকি জয়" শব্দে আনন্দ ধারা প্রবাহিত হইল। ভাগবত পাঠক তাঁহার পাঠ বন্ধ করিলেন, বাদক পাখোয়াজে ঘা দিল এবং গায়ক তানপুরায় ঝঙ্কার দিয়া ধ্রুপদ্ রাগিণীতে গান ধরিল—

"পরব্রহ্ম পরমেশ্বর !
পুরুষোত্তম, পরমানন্দ, নন্দনন্দন, আনন্দ কন্দ,
যশোদানন্দ, শ্রীগোবিন্দ।
দীননাথ, দুঃখ ভঞ্জন, ভক্তবৎসল, জগবন্দন,
জগজীবন, জগন্নাথ কাট মোহ ফাঁদ ॥
মধুসূদন, মদনমোহন মুরতি, মুরলীধর,
সর্ব্বমোহন, মেঘশ্যাম সুরত, মন ভাওন, মাধব, মুকুন্দ ॥
করুণাসিন্ধু, সঙ্কটহারন, পূরণ কর্ত্তা, কিশোর,
গুণনিধি, গোকুল চন্দ্॥
রামরূপ, যাদবর, গোবর্দ্ধন করপর ধারণ,
রতিনাথ, হর্ষিকেশ (হৃষীকেশ) গায় গুণ
তার আনন্দ্ ॥
শুনে গরীব, যশ্ লাগ্ রহে অন্তর্ধুনে,,
বাসুদেব, বনমালী, ব্রজপতি, দীনবন্ধু ॥

সমস্ত লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া, সঙ্গীত শ্রবণ করিল অথবা বিগ্রহ দর্শন করিল বুঝিতে পারিলাম না। সকলেরই মন তখন জড় রাজ্য হইতে কোন্ উন্নত-তর রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল। তাহারা যেন শ্রবণ ও দর্শনের অতীত শুধু মননেই মগ্ন ছিল।

কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বারকানাথজীর মূর্ত্তিটী অতীব সুন্দর। তাঁহাকে আবার এরূপ সুরুচির সহিত পুষ্পদলে সুসজ্জিত করিয়াছে যে বিগ্রহ হইতে চক্ষু আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। এখানে পূজারী কি প্রার্থীর "দেহি দেহি" শব্দ নাই। সকলেই মনের আনন্দে বিগ্রহ দর্শন করিতেছে। আমরাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেবালয়ে থাকিয়া বিগ্রহ দর্শন করিলাম।

হরিদ্বারে অবস্থান সময় দুইজন "মথুরা বাসিনী"র সহিত পরিচয় হইয়াছিল। দ্বারকানাথজীর বাড়ীতে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, অন্যান্য সকলে তাঁহাদের বাড়ীতে গেলেন, আমি পাণ্ডার বাড়ী আসিলাম।

সকলে পাণ্ডার বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে জল যোগান্তে গোকুল দর্শনে যাত্রা করিলাম। টোঙ্গাতে সময় অধিক লাগিবে, আমরা একখানা গাড়ী ভাড়া করিলাম।

যমুনার পুল পার হইয়া গাড়ী দক্ষিণ দিকে চলিল। রাস্তার দুই দিকে কেবল ঊষর মাঠ—জন মানব বসতির চিহ্ন নাই। রাস্তার পার্শ্বে পথিক দিগের জল পানের জন্য, কূপ আছে, কোথাও বা জলসত্র আছে।

অনেক দূর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া আমাদের গাড়ী পূর্ব্বদিকে চলিল। অপর একখানা গাড়ী কয়েক জন মাদ্রাজী যাত্রী লইয়া দক্ষিণ দিকেই গেল। পাচক জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, আমরাই "প্রকৃত" গোকুলে যাইতেছি। কয়েক শত বৎসর হইল মাদ্রাজী বৈষ্ণবেরা একটী স্বতন্ত্র গোকুল স্থাপন অথবা আবিষ্কার করিয়াছেন, মাদ্রাজী যাত্রীরাই সেখানে যাইয়া থাকে—অন্য কেহ যায় না।

কবি হোমর এবং কালিদাসের জন্মস্থান সম্বন্ধে যখন ভিন্ন ভিন্ন নগর এবং বিভিন্ন প্রদেশ নিজ নিজ দাবী উপস্থিত করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবানের জন্ম স্থান (বাল্যলীলা স্থলী) বলিয়া দুইটি গ্রামের পক্ষে, নিজ নিজ দাবী উপস্থিত করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী তিনটি বিভিন্ন স্থান মহাপ্রভুর জন্ম স্থানের অধিকার দাবী করিতেছে। ক্রমে গোকুলে

উপনীত হইলাম। নন্দালয় দর্শন না করিয়া আমরা প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দর্শন করতে গেলাম। এই স্থানে নন্দরাজের নব লক্ষ গাভী জলপান করিত। অত্রায় রাখাল বালকগণের সহিত ক্রীড়া উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মা যশোমতী এই ঘাটে আসিয়া কৃষ্ণকে হাঁ করিতে বলেন, কৃষ্ণ মুখ ব্যাদান করিলে নন্দরাণী কৃষ্ণের উদরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন, এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে ঘাটের নাম "ব্রহ্মাণ্ড ঘাট" হইয়াছে।

স্থানটি এখন আর ঠিক যমুনার তীরে অবস্থিত নহে—যমুনা অনেকটা সরিয়া গিয়াছে। স্থানটি খুব নির্জ্জন। এখানে একটী ক্ষুদ্র আশ্রম আছে। একজন ধনী ঘাটটির জীর্ণসংস্কার করিয়া দিয়াছেন এবং মথুরার কোনও কালেক্টর সাহেব ঘাট পর্য্যন্ত সরকারী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। বৃন্দাবনের মাখন মাটীর উৎপত্তি নাকি এই ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে।

শ্রীরাধিকার পিত্রালয় বর্ষাণ গ্রাম এখান হইতে প্রায় এক মাইল দূরে; সময়াভাবে যাওয়া হইল না।

ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দর্শনান্তর আমরা নন্দালয়ে আসিলাম। নন্দরাজার বাড়ী একটা অতি উচ্চ স্থানে—কোনও পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ হওয়া অসম্ভব নহে। আরোহণের পথে প্রথমেই গর্গ মুনির একটি মূর্ত্তি। উচ্চস্থানের অধিত্যকায় একটী মন্দির। এই মন্দিরে একটি দোল্‌নায় বালগোপাল স্থাপিত। দোলনা সংলগ্ন পিত্তলের শিকল টানিয়া গোপালকে দোল দেওয়াই এখানকার তীর্থ-কৃত্য। গোপালকে দোল দেওয়ার সময় আমার মা ও স্ত্রী হঠাৎ উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আমি প্রথমে কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। পরে মনে হইল, ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে আমার এক বৎসর বয়স্ক এক মাত্র শিশু পুত্রের মৃত্যুশোক তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে।

মন্দিরের পূজারী দুঃখ করিয়া বলিলেন, যে সমস্ত ধনী ব্যক্তি তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া থাকেন তাঁহারা রেল পথের নিকটবর্ত্তী মথুরা বৃন্দাবন দর্শন করিয়াই দেশে প্রত্যাগমন করেন; পথকষ্ট স্বীকার করিয়া কেহই প্রভুর বাল্যলীলাস্থলী দর্শন করিতে আইসেন না। মন্দিরের কোন আয় নাই—দৈনিক ভোগরাগ সম্পন্ন হওয়াই কঠিন।

মন্দির হইতে নন্দরাজের বাড়ীতে গেলাম। প্রভুর সূতিকাগৃহ (যদিও ভগবান মথুরায় কংস কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন), দধি মন্থনের স্থান, উদুখলে বন্ধনের স্থান এবং আরও অনেক স্থান পাণ্ডা দেখাইল; ছাদে একটা স্থান দেখাইয়া পাণ্ডা বলিল উহার নাম "খেলন্‌চাঁদ"। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য একদিন মহাদেব নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন। চন্দ্রচূড়ের চূড়স্থ চন্দ্র দর্শন করিয়া তদ্রূপ একটি চন্দ্র প্রাপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণ মা যশোমতীর নিকট আবদার ধরিলেন। মা যশোমতী একখানা দর্পণ ছাদে সংলগ্ন করিয়া দিলেন; শ্রীকৃষ্ণ দর্পণে আপন মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া চন্দ্র প্রাপ্তির আনন্দ [illegible] করিলেন।

নন্দালয়ে প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। বালক বালিকাগণ "মাইজী একটা পয়সা" "শেঠজী একটা পয়সা" করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাহার উপর আবার "ভেটী"।

রাজা নন্দ ছিলেন মহা কৃপণ। নতুবা স্বয়ং ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া তাঁহাকে রাখালের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন কেন? দুই একজন চাকর রাখিয়া দিলেই চলিত—বিশেষতঃ সেই পুরাকালে ভৃত্যের বেতনও তত অধিক ছিল না। ভগবানকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে মহা কৃপণ রাজা নন্দের বংশধরগণ এখন ভিক্ষুক হইয়াছে।

এমন যে মধুর নন্দালয়, এই প্রার্থীর দল তাহাকে বিরক্তিজনক করিয়া তুলিয়াছে। কতক্ষণে এখান হইতে যাইতে পারিব এখন সেই চিন্তা। মা যশোদার বাৎসল্য, ব্রজ রাখালগণের সখ্য, কিছুই একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া গেল না।

ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া রাত্রে মথুরাতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলাম এবং সেখান হইতে টোঙ্গা ভাড়া করিয়া সেই রাত্রেই বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম।

২৮শে জুন। অদ্য পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা। বৃন্দাবনেও অনেক বিগ্রহের জল যাত্রা হয়। মন্দিরে লতা পাতা বেষ্টিত কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়। চতুর্দিকে কৃত্রিম ফোয়ারা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং ফোয়ারা হইতে জলরাশি বিগ্রহ গাত্রে এবং দর্শক দিগের গাত্রে পতিত হয়। অপরাহ্নে জলযাত্রা সম্পন্ন হয়।

প্রথমতঃ গোবিন্দজীর বাড়ীতে জলযাত্রা দর্শন করিয়া, অন্যান্য অনেক দেবালয়ে জলযাত্রা দর্শন করিলাম। লক্ষ্মীর শেঠজীর ঠাকুর বাড়ীর বন্দোবস্ত আমার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হইল। যদিও অনেক লোক জলযাত্রা দর্শনে আসিয়াছিল, তথাপি কাহারও কোনই অসুবিধা হয় নাই।

জলযাত্রা দর্শন করিয়া সকলেই সন্ধ্যার পর আর্দ্র বস্ত্রে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন করিলাম।

২৯শে জুন—অদ্য বৈকালে বৃন্দাবন ত্যাগের কথা। দ্বিপ্রহরে পাণ্ডার বাড়ী "মাধুকরী" (ভোজনের নিমন্ত্রণ) ছিল। সকালবেলা রায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম।

মাতাঠাকুরাণী ব্যতীত আমরা সকলেই মাধুকরী সম্পন্ন করিয়া আসিলাম এবং বিশ্রামান্তে ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

অন্যান্য তীর্থ স্থানের তুলনায় এখানে পাণ্ডা দিগকে অনেক বেশী দিতে হইলেও, আমি এখানেও পাণ্ডার "উৎপীড়ন" উপলব্ধি করি নাই। আমাদের দুইজন পাণ্ডা ছিল। একজন না হয় অপর জন প্রায় সর্ব্বদাই ধর্ম্মশালায় উপস্থিত থাকিয়া আমাদের প্রয়োজন সম্পন্ন করিত।

বৃন্দাবনে চৌদ্দ দিন অবস্থিতিতে আমার কন্যা এখন আর আমি ভিন্ন অন্য কাহাকেও সম্পর্কগত উপাধিতে সম্বোধন করে না। "রাধে, রাধে" বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার বক্তব্য প্রকাশ করে।

বৃন্দাবন ষ্টেসন হইতে আমরা সকলে একই গাড়ীতে উঠিলাম। মথুরা ও হাতরাসে গাড়ী বদল করিয়া পরদিন (৩০শে জুন) দ্বিপ্রহরের সময় এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া নিকটবর্ত্তী এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অপরাহ্নে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান দেখিয়া আসিলাম।

১লা জুলাই—অতি প্রত্যুষে যমুনাতীরে আসিলাম। এখান হইতে নৌকায় ত্রিবেণী সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। মুণ্ডন ও ত্রিবেণী স্নান সম্পন্ন করিয়া অক্ষয় বট দর্শন করিলাম। কেল্লার মধ্যে পাণ্ডাদের যাওয়া নিষেধ, আমার পাণ্ডা বাহিরে অপেক্ষা করিল। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নৌকায় না আসিয়া টোঙ্গায় আসিলাম। বেণীমাধব দর্শনান্তর ধর্ম্মশালায় পৌঁছিলাম। মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বে একবার প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। তীর্থস্থান হিসাবে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি তাঁহার কিছু কিছু জানা আছে। তিনি পূর্ব্ববারে যে সমস্ত স্থান দেখিয়াছিলেন আমরাও এবার তাহাই দর্শন করিলাম। এখানেও বেণীমাধব নামে দুই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। আমরা মাতাঠাকুরাণীর পূর্ব্বদৃষ্ট বিগ্রহই দর্শন করিলাম।

অপরাহ্নে ধর্ম্মশালার নিকটবর্ত্তী খসরুবাগ দর্শন করিলাম। এখন আর ইহার "বাগ"ত্ব বিশেষ কিছুই নাই, গবর্ণমেণ্ট হইতে ঘাস বিক্রয় করা হইয়া থাকে। সমাধি মন্দির কয়টি এবং যতটুকু বাগান আছে তাহা দেখিলাম।

এলাহাবাদ ষ্টেসন হইতে মোগল সরাইএর পথে না আসিয়া আমরা "ছোট লাইনে" (B. N. W. R.) কাশী যাওয়া স্থির করিয়া, এলাহাবাদ হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে আসিলাম। রাত্রি দশটায় গাড়ীতে উঠিয়া তৎপর দিন বেলা ৮টায় কাশী পৌঁছিলাম।

সমাপ্ত

শ্রীশরৎচন্দ্র আচার্য্য।

নগবালা

(উপন্যাস)

প্রথম ভাগ—পাপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামপ্রাণবাবুর আশা।

আশী টাকা মাসিক বেতনে চাকুরী করিয়া, কলিকাতায় থাকিয়া, এই ঘোর কলিকালে, একটি পুত্রকে এম্-এ, বি-এল্, পড়ান কত কঠিনাদপি কঠিন কায, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। আমাদের শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ মুখোপাধ্যায় এই কঠিন কায সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নিজে বিপন্ন হইয়াও, পুত্রকে এম-এ, বি-এল পড়াইয়াছিলেন; বুদ্ধিমান পুত্র শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রকাশ ঐ দুই পরীক্ষাতে বিশেষ ভাবে কৃতকার্য্যও হইয়াছিল।

পুত্র যখন পেটেণ্ট লেদারের লপেটা পরিয়া, বেলদার পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া, ফরাসডাঙ্গার কালো ফিতা পাড় ধুতি পরিয়া, বুকে রেশম রচিত সুগন্ধি রুমাল উড়াইয়া, সিগারেটের ধূমপান করিতে করিতে কলেজে যাইত, তখন রামপ্রাণ বাবু হৃষ্টচিত্তে আধপেটা খাইয়া, ঘর্ম্মগন্ধান্বিত ময়লা চাপকান পরিয়া, শততালিবিশিষ্ট প্রাচীন জুতাটি পায়ে দিয়া আফিসে ছুটিতেন; এবং সকালে দশটা হইতে বিকালে পাঁচটা পর্য্যন্ত, প্রাণপণ শক্তিতে আপন কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অফিসের বড় সাহেবকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন। পুত্রের বিদ্যালাভের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, রোগ হইলে, তিনি ঔষধ খাইতেন না; বলিতেন, ঔষধের টাকাটা বাঁচিলে, শ্রীমানের জন্য আর একখানা আইন পুস্তক ক্রয় করিতে পারা যাইবে। দুর্ব্বল দেহে বল পাইবেন বলিয়া, পাড়ার আলাপী নন্দডাক্তার একবার তাঁহাকে নিয়মিত দুগ্ধ পান করিতে বলিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, কলিকাতার দুগ্ধ মহামূল্য সামগ্রী; একমাসের দুধের টাকা বাঁচিলে, বাবাজীর আর এক যোড়া কলেজ যাইবার জুতা হইবে। গৃহিণী তাঁহার অকালবৃদ্ধ দেহে বলাধান করিবার জন্য, পিত্রালয় হইতে কিছু গব্যঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিলে, তিনি বলিতেন, আমার কেরাণীগিরি কায, মাথা ঘামাইতে হয় না,—আমার ঘি খাইবার দরকার কি? জ্যোতি শক্ত শক্ত পুস্তক পাঠ করে, ঘিটা বরং তাহাকে খাইতে দিও; তাহার মাথার মগজে জোর হইবে। এইরূপে তিনি না খাইয়া, না পরিয়া, আপনাকে সকল সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া, এবং অশেষ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার আশা ছিল। পুত্র যখন বি-এ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইল, আশায় ও আনন্দে তাহার বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, আর দুই তিন বৎসর একটু কষ্ট করিতে পারিলেই—ব্যস্! পুত্র হাইকোর্টের উকিল হইয়া মাসে মাসে পাঁচ ছয় শত টাকা উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার হাতে আনিয়া দিবে; তিনি সেই টাকা হইতে পৈতৃক ভদ্রাসনটি ঋণমুক্ত করিবেন; গৃহিণীর এপর্য্যন্ত কোন সাধই মিটাইতে পারেন নাই,—তাঁহার বরদেহ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবেন, এবং নিজের জন্য একটি রৌপ্যমণ্ডিত হুঁকা প্রস্তুত করাইবেন। তাহার পর, যখন শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রকাশ, মা লক্ষ্মীর কৃপায়, আরও অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিবে, (তিনি শুনিয়াছিলেন যে, হাইকোর্টের অনেক উকীল মাসিক চারি পাঁচ সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন,) তখন তিনি এই বাটী ভাড়া দিয়া, ভবানীপুর অঞ্চলে নূতন ত্রিতল বাটী প্রস্তুত করাইবেন, তাহার কক্ষ সকল বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিবেন, তাহা পছন্দ মত আসবাব দ্বারা সজ্জিত করিবেন, গাড়ী ঘোড়া কিনিবেন, এবং রূপার একটি কর্সী

কিনিয়া, তাহাতে আলবোলার নল লাগাইয়া অম্বুরী তামাকের ধূমপান করিবেন। আর, আর……

কিন্তু রামপ্রাণবাবুর সকল আশার কথা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, আমাদের কালী ও কাগজ সব ফুরাইয়া যাইবে, লেখনীর লৌহমুখ ভোঁতা হইয়া যাইবে—এজন্ত আমরা সে চেষ্টায় বিরত হইলাম।

এক্ষণে তাঁহার এই সকল আশা ফলবতী হইতে বিলম্ব নাই। জ্যোতিঃপ্রকাশ এম এ, ও বি-এল দুই পরীক্ষাতেই পাশ হইয়া, ইউনিভার্সিটির জয়পত্র পাইয়াছে। এখন কেবল ওকালতির ফীটা জমা দিতে পারিলেই একবারে পুরাদস্তুর উকীল হইয়া সামলা মাথায় দিয়া হাইকোর্ট যাইতে পারিবে।

কিন্তু ফী যে অনেক টাকা! তাহা দরিদ্র সর্ব্বস্বান্ত রামপ্রাণবাবু কিরূপে সংগ্রহ করিবেন? তিনি অনেক ভাবিলেন, কিন্তু এই বিষম সমস্তার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। হায় হায়! দুস্তর ইউনিভার্সিটি সাগর পার হইয়া, শেষে কি তাঁহার আশার তরণী কূলে আসিয়া ডুবিবে? রামপ্রাণবাবুর বুদ্ধি, হিমালয়শীর্ষে তুষারের ন্যায়, একবারে জমাট বাঁধিয়া গেল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ বিভালয় হইতে প্রচুর বুদ্ধিলাভ করিয়া অতিশয় বুদ্ধিমান হইয়াছিল। সে পিতাকে বুদ্ধি দিল; কহিল প্রথমে একটা চাকরী করিয়া, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে; বছর দুই পরে ওকালতি আরম্ভ করিলেই চলিবে। সে পিতাকে বুঝাইয়া দিল যে, ওকালতি করিতে হইলে মাত্র ফীয়ের টাকা সংগ্রহ করিলেই চলিবে না, আরও অন্যান্ত অনেক খরচ আছে। কতকগুলি আইনের পুস্তক কিনিতে হইবে; তাহা সজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্ত দুইটা আলমারী আবশ্তক; একটা সেক্রেটেরিয়েট টেবিল ও পাঁচ ছয় খানা চেয়ারও কেনা দরকার হইবে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল মূল্যবান গৃহসজ্জার ভিতর একটিও, আশী টাকা বেতনের কেরাণীর গৃহশোভা বর্দ্ধন করিত না; ঐ অল্প আয় হইতে তাহা ক্রয় করাও সম্ভবপর ছিল না। তাহার উপর, রামপ্রাণ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন যে, এই সকল গৃহসজ্জার দ্বারা তাঁহার বাহিরের ঘরটি সজ্জিত করিবার আগে, উহার উত্তমরূপ সংস্কার হওয়া আবশুক এবং তাহাতেও অর্থব্যয় আছে।

অতএব পুত্রের অধিক বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া, তিনি সেই সুবুদ্ধিই গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, প্রথমে চাকুরী গ্রহণ করাই সুযুক্তি। তিনি সুবুদ্ধি পুত্রের উপযুক্ত চাকরীর অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এসম্বন্ধে তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন, তাহার আফিসের বড় সাহেব।

ইত্যবসরে সুবুদ্ধি পুত্রও নিশ্চেষ্ট ছিল না। সে আফিসে আফিসে চাকুরীর সন্ধানে ফিরিল; সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও প্রোফেসার গণের বিশেষ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া, তাহার নকল সহ, নানা স্থানে দরখাস্ত করিল; তা ছাড়া প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়া উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরী পাইবার চেষ্টাতেও রহিল।

রামপ্রাণবাবু ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, তাঁহার তেমন পুত্রের চেষ্টা যেন সফল হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শুভদর্শন।

যখন চাকুরীর চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময় একদিন বায়ুসেবন ও সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করিবার জন্ত, জ্যোতিঃপ্রকাশ, কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত, 'ইডেন গার্ডেনে' বেড়াইতে গিয়াছিল।

তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে একটি যুবকের নাম রমেশ-চন্দ্র মজুমদার। আমরা রমেশের একটু বিশেষ পরিচয় দিতে চাই। রমেশের কাপড় বা জামায় জ্যোতিঃ প্রকাশের মত পারিপাট্য ছিল না, বিস্তার তেমন দৌড় ছিল না, এবং এসেন্সেরও তেমন সৌরভ ছিল না; অধিক কি, এসেন্স দ্বারা সিক্ত করিবার জন্ত তাহার পকেটে রুমালই ছিল না। ম্যাট্রিকুলেশন

পর্য্যন্ত সে জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত একসঙ্গে পড়িয়াছিল। ইহার পর রমেশের পিতৃবিয়োগ হয়; কাযেই জ্যোতিঃপ্রকাশ যখন উচ্চ শিক্ষার প্রশংসাময় পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, রমেশ তখন মা সরস্বতীর কৃপায় বঞ্চিত হইয়া, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, এক দালালের আফিসে একটি ত্রিশ টাকা বেতনের মুহুরীর কার্য্য লইতে বাধ্য হইয়াছিল। দুইজনের পন্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল—অর্থাৎ একজন উচ্চ শিক্ষার মার্জ্জিত মার্গ এবং অন্যজন সংসার প্রতিপালনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কর্দ্দমময় পথ অবলম্বন করিয়াছিল। আমাদের মার্জ্জিত রুচি জ্যোতিঃপ্রকাশের সাবান চর্চ্চিত সুমার্জ্জিত দেহ কোমল; রমেশের অমার্জ্জিত দেহ কিছু কর্কশ, কিন্তু তাহার প্রশস্ত বক্ষে এবং পেশী-বহুল বাহুতে সে বিলক্ষণ বল ধারণ করিত। সুগন্ধি-তৈলসিক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশের কেশ-কলাপ আধুনিক রুচি অনুযায়ী কর্ত্তিত হইয়া, সদাই বুরুষ-চিরুণী-আদির কারকার্য্যে টেরির দ্বারা সুশোভিত থাকিত, রমেশের অসংস্কৃত কেশগুচ্ছ কখনও টেরির শোভায় শোভিত হইবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু দুইজনের শিক্ষা ও রুচি সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও, উভয়ের একই পাড়ায় বাস বলিয়া, উভয়ের বাল্যের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই অবকাশ পাইলেই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন রমেশচন্দ্র সুশিক্ষিত ও সুশোভিত জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত 'ইডেন গার্ডেন' প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাইত।

বাগানে প্রবেশ করিয়া, অপর বন্ধুসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল; কেবল রমেশ ও জ্যোতিঃপ্রকাশ একত্র রহিল। বাগানের ভিতরে এক পথের ধারে, একখানা লৌহাসন খালি পাইয়া, তাহাতে তাহারা উপবেশন করিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ সিগারেট খাইতে লাগিল; রমেশ ও রসে বঞ্চিত, সে সেই পথগত কোন কোনও পথিকের পরিচয় দিতে লাগিল।

দালালী ব্যবসায় সংলিপ্ত থাকায়, রমেশ-চন্দ্রের সহিত, জ্যোতিঃপ্রকাশের অপরিচিত, অনেক লোকের আলাপ হইয়াছিল। সে এইরূপ লোকেরই পরিচয় দিতেছিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত সেই লৌহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, রমেশচন্দ্র ভ্রাম্যমান এক অপরিচিত যুবককে দেখিল। যুবক একাকী ছিল না। তাহার সহিত এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া, সালঙ্কারা, সৌখীন পরিচ্ছদ-মণ্ডিতা ও সভ্যা সুন্দরী বিচরণ করিতেছিল। রমেশ সেই যুবককে তাহাদের বেঞ্চের নিকট সমাগত দেখিয়া তাহাকে নমস্কার করিল। যুবকও ঈষৎ হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিল। কিন্তু কেহ কোনও বাক্যবিনিময় করিল না;—রমেশ জানিত, কোন অপরিচিতা মহিলা সঙ্গে থাকিলে, পরিচিত লোকের সহিত তখন বাক্যালাপ করা, সভ্যতাবিরুদ্ধ কার্য্য।

যুবক, যুবতীর সহিত, পথ অতিক্রম করিয়া, শ্রবণ পথের বাহিরে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া জ্যোতিঃ-প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটা কে হে?"

রমেশচন্দ্র বলিল, "আমাদের দালাল বাবুর সঙ্গে আলাপ আছে;—ওর নাম, কৃষ্ণকমল রায়।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ কণ্ঠস্বর ঈষৎ নিম্ন করিয়া কহিল, "সঙ্গে মেয়েটি কে?"

রমেশ বলিল, "শুনেছি, ও কৃষ্ণকমলের কি রকম বোন হয়;—ওর নাম জ্যোতির্ম্ময়ী।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ সেই তরুণীর দিকে একবার বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, জ্যোতির্ম্ময়ীই বটে!—যেন গমনশীলা দীপশিখা উদ্যানপথ আলো করিয়া চলিয়াছে, যেন চন্দ্রদীপ্তি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, মর্ত্ত্যভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে, যেন বিজ্ঞান বলে তড়িৎ-আলোকে মানবপ্রতিমা গঠন করা সম্ভবপর হইয়াছে! জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপ-জ্যোতিতে আত্মহারা হইয়া গেল।

রমেশ বলিয়া যাইতে লাগিল, "ও বেথুন কলেজে পড়ে। গেল বছরে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস হয়ে বৃত্তি পেয়েছে। ও কৃষ্ণকমলের বাড়ীতে থাকে না, ওদের আলাদা তেতলা বড় বাড়ী

আছে ; ও সেইখানে ওর মার সঙ্গে থাকে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীর উজ্জল রূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রখর সূর্য্যের দিকে তাকাইলে মানুষ যেমন স্তিমিতনেত্র হইয়া যায়, তেমনই স্তিমিত নেত্র হইয়া গিয়াছিল। সে স্তিমিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "ওর বাপ কি করেন ?"

রমেশ বলিল, "ওর বাপ নেই ; অনেক দিন আগে মারা গেছেন। শুনেছি, তিনি অনেক টাকার কোম্পানির কাগজ রেখে গেছেন ; তাতেই ওদের বেশ স্বচ্ছন্দে সংসার চলে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বুঝি ওদের সঙ্গে খুব আলাপ আছে ?"

রমেশ বলিল, "মোটেই আলাপ নেই।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ তেমনই স্তিমিত নেত্রে ও বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ওদের এত খবর জানলে কি করে ?"

রমেশ বলিল, "কিছুদিন আগে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তারপর, চার পাঁচ দিন আমি মেয়েটিকে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে বেড়াতে দেখি। প্রথমে মনে করেছিলাম, উভয়ে প্রণয়ী প্রণয়িনী কিম্বা নব-বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ। তারপর, বুঝলাম সেটা আমার ভুল। একদিন কৃষ্ণকমল আপনা হ'তে আমাকে মেয়েটির সকল পরিচয়ই দিলে ; তখন বুঝলাম মেয়েটি কৃষ্ণকমলের ভগিনী। কৃষ্ণকমল মেয়েটির বাড়ীর ঠিকানা বলে দেওয়ায়, আমি একদিন রামবাগানে গিয়ে, বাইরে থেকে, ওদের বাড়ী দেখে এসেছি ;—চমৎকার বাড়ী! দরজায় দারবান আছে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ তেমনই বিজড়িত কণ্ঠে ও স্তিমিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "দারবান কেন ?"

রমেশ বলিল, "বাড়ীতে কেবল দুটি মেয়ে মানুষ থাকে ; পুরুষ কেউ নেই। তাই বোধ হয়, চোর ডাকাতের ভয়ে দারবান রেখেছে।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ আর কোনও প্রশ্ন করিল না। স্তিমিত নেত্রে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। রমণীর রূপাগ্নির তেজে যখন তোমাদের লোচন নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে, তখন তোমরা সতর্ক হইও—কেন না, সেই নিস্তেজ নয়ন পথেই অনেক সময় পাপ আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই জন্যই সাধকপ্রবর বিল্বমঙ্গল ঠাকুর আজন্মের ভোগবিলাস লালসা বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের পদে শরণ লইবার আগে, আপন অসংযত লোচনদ্বয়ে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের দুর্ব্বলচিত্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ সময়ে আপন চিত্ত দমন করিতে পারিল না। তাহার সেই অসতর্ক লোচন পথে—পদ প্রক্ষালনের ত্রুটি অবলম্বন করিয়া, ক্রূর শনি দেবতা যেমন নিষ্পাপ নলরাজের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—তেমনই জ্যোতিঃপ্রকাশের সাবান সুবাসিত শরীরাভ্যন্তরে পাপ প্রবেশ করিল।

কিন্তু আমরা করিতেছি কি ? একটি স্তিমিত নেত্র ও বিজড়িত কণ্ঠ, পাপগ্রস্ত যুবকের কথা, এবং তাহার সহিত একজন অর্দ্ধশিক্ষিত দালালের মুহুরীর উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের উপন্যাসের আকাশকে কৃষ্ণ মেঘ-সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, উপন্যাসের প্রধান উপাদান যুবক যুবতী, মধুর প্রেমকথা, এবং ততোধিক মধুর, আলিঙ্গন ও চুম্বন। আমরা এ সকলের অবতারণা করিতে পারি নাই। তথাপি আমাদের আশা আছে ; মেঘ যদি উঠিল, তবে তাহাতে বিদ্যুদ্বিভা বিকশিত হইবার আশা আছে। এই দামিনী বিভার বিকাশ দেখিবার জন্য, এস আমরা জ্যোতির্ম্ময়ী ও কৃষ্ণকমলের অনুসরণ করি। তোমাদের নাসারন্ধ্রে তাহাদের বসনানুলিপ্ত সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভ প্রবাহিত হউক, তোমাদের কর্ণে সুন্দরী, যুবতী ও বিদুষী জ্যোতির্ম্ময়ীর বিশুদ্ধ ও ললিত বাক্যাবলী, নিদাঘতপ্ত ধরণীর পাত্রে, বর্ষার প্রথম বৃষ্টিপাতের ন্যায়, বর্ষিত হউক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেমলীলা।

মধুর সন্ধ্যাকালে, ইডেন উদ্যানে বৈদ্যুতিক আলোক

মালা জলিয়া উঠিয়াছিল; মলয় মারুত গঙ্গায় ঈষৎ ঊর্ম্মিলীলাময় বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া শীতল হইয়া বহিতেছিল। তথায় অসংখ্য পোত সকল একে একে আলোকমালায় ভূষিত হওয়ায়, গঙ্গাবক্ষ ভাসমান নগরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল; উদ্যানে আলোকিত বাস্তমঞ্চে ইংরাজি বাদ্য-ধ্বনি ইংরাজি শিক্ষিত বঙ্গবাসীর কর্ণে, ত্রিদিব সংগীতের ন্যায়, ঝঙ্কৃত হইতেছিল; উদ্যান, নানাবর্ণ পুষ্পভারে যেন হাসিয়া, লুটাইয়া পড়িতেছিল; অমবস্যার আকাশে চাঁদ উঠে নাই; কিন্তু তারাদল আকাশাঙ্গনে হেলিয়া দুলিয়া জড় হইয়া বড় হাসি হাসিতেছিল,—পুরুষ অভিভাবকের অগোচরে উৎসবোন্মত্তা সীমন্তিনীগণ, বোধ হয়, এমনি হাসি হাসিয়া থাকে; উদ্যানস্থ প্রসূন-দামে সৌরভ ছিল না, কেবল রঙের বাহার; কিন্তু উদ্যান-সমাগত নরনারীগণের গাত্রবসন হইতে, বসনলিপ্ত সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভে উদ্যান যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই আলোক মালা, এই শীতল পবন, এই সঙ্গীতোচ্ছাস, এই শোভা, এই সৌরভ সকলই যুবক যুবতীগণের প্রেমবর্দ্ধনের উপকরণ। এই উপকরণ বেষ্টিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী উদ্যানস্থিত এক নিভৃত বেঞ্চে বসিয়া ছিল; যুবক কৃষ্ণকমল তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিল। প্রেমবর্দ্ধনের উপকরণের মধ্যে থাকায়, হৃদয়মধ্যে প্রেম বর্দ্ধিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয়েই নীরব। সেই প্রেমরাজ্যে তাহারা একা রাজা রাণী; জন কোলাহল সেই নিভৃত প্রদেশে আসিয়া শান্ত হইয়া যাইতেছিল; আলোকরশ্মি তথায় প্রভা বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা কথা কহিলে তাহা কেহ শুনিত না; তাহাদের প্রেমলীলা সেই নিষ্প্রভ আলোকে কাহারও নয়নগোচর হইত না। তবে তাহারা নীরব কেন? এ নীরবতার অবশ্যই কোনও কারণ থাকিবে। আমরা শুনিয়াছি, যুবক যুবতী যখন একত্রে নিভৃতে বসিয়া বাক্য-কথনে বিরত থাকে, তখন তাহাদের প্রাণে প্রাণে, প্রাণের কথার বিনিময় হয়,—কন্দর্প-ঠাকুর তাহাদের কাণে কাণে যে মধুর কথাগুলি কহিয়া থাকেন, তাই তাহারা নীরবে বসিয়া বসিয়া শুনে।

কৃষ্ণকমল রমেশকে মিথ্যা বলিয়াছিল। সে ভগিনী বলিয়া, জ্যোতির্ম্ময়ীর পরিচয় প্রদান করিলেও, এবং জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে "কৃষ্ণকমল দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিলেও, প্রকৃত পক্ষে, উভয়ে উভয়ের কেহ নহে; তাহাদের কোনও শোণিতসম্পর্কই ছিল না। কেবল তাহারা বাল্যকাল হইতে পরস্পরের পরিচিত ছিল। এক্ষণে যৌবন সমাগত হওয়ায়, পরিচয়টা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল জ্যোতির্ম্ময়ীকে কেবল মাত্র প্রেম সম্বোধন করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না; পরন্তু তাহাকে বিবাহ করিবার জন্যও ব্যগ্র ছিল। জ্যোতির্ম্ময়ীও তাহার কৃষ্ণকমল "দাদা"র গলে বরমাল্য দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

তবে তাহাদের বিবাহ হইল না কেন? তাহাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য ছিল কিনা, আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু তাহারা ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন, কেবল মাত্র জাতিগত পার্থক্য তাহাদের বিবাহের পথে অন্তরায় হয় নাই। জ্যোতির্ম্ময়ীর মাতাই এ বিবাহের প্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কি জানি কেন, তাঁহার সভ্যতা-আলোকে আলোকিত মর্ম্মমধ্যে একটা কুসংস্কার থাকিয়া গিয়াছিল; তিনি বলিতেন, উচ্চ শ্রেণীর অথচ সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবক পাইলে, তিনি তাহারই সহিত কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহ দিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেইরূপ বিবাহকামী কোন ব্রাহ্মণ না পাওয়ায়, কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। ইত্যবসরে কৃষ্ণকমল ও জ্যোতির্ম্ময়ী এবং তাহাদের প্রেমও অলস ছিল না; প্রেম তাহাদিগকে উৎসাহান্বিত করিতেছিল. এবং তাহারাও গোপনে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু গোপন বিবাহের শুভ সংবাদটা অকালে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মাতাঠাকুরাণী স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়স্বরে বলিলেন যে, জ্যোতির্ম্ময়ী যদি তাঁহার অমতে গোপনে কৃষ্ণকমলকে বিবাহ করে, তবে সে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইবে; তিনি

লেখাপড়া করিয়া তাঁহার সম্পত্তি হাঁসপাতালে দান করিয়া যাইবেন। জ্যোতির্ম্ময়ী মাতার স্পষ্ট কথা বুঝিত; সে কৃষ্ণকমলের সমস্ত প্রেমের জন্ত, এই ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজি ছিল না। কৃষ্ণকমলের প্রেমটাও জ্যোতির্ম্ময়ী অপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময়ীর সম্পত্তির প্রতিই অধিক ছিল, সুতরাং সেও আর জেদাজেদি করিল না। এইরূপ অবস্থায় জ্যোতির্ম্ময়ী, মাতার অগোচরে কৃষ্ণকমলের সহিত উত্তান ভ্রমণে আসিয়াছিল।

অমানিশার অন্ধকারময়ী সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিল; মৌনব্রত অথবা প্রেমের স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া কৃষ্ণকমলকে কহিল, "চল, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, বাড়ী ফিরে যাই।"

কৃষ্ণকমল মিনতির স্বরে বলিল, "আর একটু বস; এই ত সাতটা বাজল।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শঙ্কিতা হইয়া কহিল, "না, না, এখনই আমাকে ফিরতে হ'বে। একেই ত সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা, মা মোটেই পছন্দ করেন না; তার পর, যদি জানতে পারেন যে, তোমার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে এসেছি, তাহলে একবারে অনর্থ করবেন। আগেই ত বলেছি যে, তিনি অমাবস্তায় কালীঘাটে কালীর আরতি দেখ্‌তে গেছেন; তাই ফাঁক পেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছি।"

কৃষ্ণকমল কহিল, "কালীর আরতি এখনও শেষ হ'তে দেরী আছে। আর একটু বসলে, কিছু হবে না। তোমার মা দেখছি, পৌত্তলিকতা মানেন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী একটু হাসিয়া বলিল, "মা সুবিধা মত সবই মানেন,—কালীঘাটেও পূজা দেন, ব্রাহ্ম সমাজেও চাঁদা দেন; মেয়েকে স্ত্রীস্বাধীনতা শেখান, আর তার বিয়ের বেলা কুলীন বামুন খোঁজেন। কিন্তু আমি আর বসব না; বড় দেরী হয়ে গেছে।"

কৃষ্ণকমল অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, জ্যোতির্ম্ময়ীর কোমল অলঙ্কৃত হস্ত ধারণ করিল। জ্যোতির্ম্ময়ী কৃষ্ণকমলের দিকে, তড়িৎ আলোকের চেয়ে উজ্জল, কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিল; এবং উঠিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতির্ম্ময়ীদের একখানা সুদৃশ্য ল্যাণ্ডো ও একটা কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ ঘোড়া ছিল। কিন্তু তাহা লইয়া, তাহার মাতা কালীঘাটে আরতি দেখিতে গিয়াছিলেন। এজন্ত সে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া কৃষ্ণকমলকে লইয়া বাগানে আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ট্যাক্সিতে আসায়, কৃষ্ণকমলের সহিত একত্রে পরিভ্রমণের বিষয় গোপন রাখা সম্ভবপর হইয়াছিল।

বাগানের গেটের বাহিরে অনেক ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল। তথায় আসিবার জন্ত উভয়ে পাশাপাশি ভ্রমণ করিয়া, তাহারা উত্তানপথ অতিক্রম করিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল বলিতেছিল, "ভালবাসলে, তুমি তোমার মার কথা শুনতে না; জোর করে' আমাকে বিয়ে করতে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিল, "তাহলে মার কোম্পানির কাগজ গুলো আমাদের হাতছাড়া হ'য়ে যেত। সেটা বুদ্ধির কায হত না। আমাকে তুমি খাওয়াতে কি? তোমার নিজেরই খরচ চলত কিসে? তুমি বেশ করে বুঝে দেখ, মা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন, ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক্ তাঁর অমতে আমাদের কোন কায করা, কিছুতেই চলবে না; আর তাঁকে না চটিয়ে তাঁর মতে চলাই আমাদের সুবিধা-জনক। তার পর টাকাগুলো একবার হাতে পেলে, তখন তুমিও রইলে আর আমিও রইলাম, আর আমাদের ভালবাসাও রইল; তখন আর কেউ আমাদের ছাড়াছাড়ি কর্ত্তে পারবে না। তখন নির্ব্বিঘ্নে তুমি আমার হবে, আর আমিও তোমার হব।"

কৃষ্ণকমল মুগ্ধ হইয়া বলিয়া ফেলিল, "আর, তোমার টাকাও আমার টাকা হবে!"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল, "হবে বই কি! আমিই যখন তোমার হ'ব, তখন আমার টাকাকড়ি ঘর বাড়ী সবই তোমার হ'বে।"

কৃষ্ণকমল কহিল, "বুড়ী এখন শীঘ্র মরলে হয়।

শরীরের যে জোয়ার, তাতে কখনও যে মরবে তা'ত মনে হয় না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শঙ্কিত নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "খবরদার! ও কথা আর মুখে এনো না। মা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারেন, তা'লে তোমার আর আমার একেবারে সর্ব্বনাশ; মা কি রকম ভয়ানক লোক তা ত তুমি জান না!"

কৃষ্ণকমল কহিল, "জান্‌তে চাইনা। Eat drink and be merry;—তোমাকে আর তোমার টাকা গুলোকে পেলেই হ'ল। ভাল কথা মনে হয়ে গেল, আমার টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে। আমাকে গোটা দশেক টাকা ধার দিতে পার?"

জ্যোতির্ম্ময়ী জানিত কৃষ্ণকমলের এমন টানাটানি প্রায়ই পড়িয়া থাকে; এবং ঋণ বলিয়া যাহা সে গ্রহণ করে তাহা পরিশোধ করিতে কখনই তাহার মনে থাকে না। তথাপি সে বলিল, "দশটা টাকা ত সঙ্গে আনিনি। বোধ হয় সাত আট টাকা ব্যাগে আছে।"

কৃষ্ণকমল তাড়াতাড়ি বলিল, "যা আছে তাই দাও।"

জ্যোতির্ম্ময়ী ব্যাগের সমুদয় অর্থ কৃষ্ণকমলের অঞ্জলিতে ঢালিয়া দিল।

কৃষ্ণকমল আনন্দিত হইয়া তাহা আপন পকেটে পুরিয়া, প্রণয়িনীর হস্ত ধরিয়া ট্যাক্সিগুলির দিকে অগ্রসর হইল। এবং একখানির নিকটস্থ হইয়া, অগ্রে জ্যোতির্ম্ময়ীকে উঠাইয়া দিল; পরে নিজে উঠিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, তাহার সুকোমল গাত্রের স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

ট্যাক্সি ছুটিল। পথিপার্শ্বে এক স্থানে কৃষ্ণকমলকে নামাইয়া দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অদূরবর্ত্তী আপন আলয়দ্বারে উপস্থিত হইল। তখন সে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমেই অনুসন্ধান লইয়া জানিল যে, মাতা তখনও ফিরেন নাই। পরে সে দ্রুত পাদবিক্ষেপে সত্বর উপরে উঠিয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং বাক্স খুলিয়া টাকা লইয়া, ভৃত্য হস্তে ট্যাক্সি-ভাড়া পাঠাইয়া দিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দর্শন

(রাধানগরে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশনে দর্শন-শাখা-সভাপতির অভিভাষণ)

জ্ঞানের উন্মেষ হইতেই মানুষ সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে। মানুষের চেষ্টা কোনও অনির্দ্দেশ্য প্রেরণার ফলে সর্ব্বদাই সত্যকে ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা যাহা জানি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করি; যাহা জানি, তাহাও ভাল করিয়া জানিবার জন্য ব্যগ্র হই। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ প্রতিনিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে এবং প্রতিনিয়ত আমরা কিছু না কিছু জানিতে পারিতেছি। এই সকলের সন্নিকর্ষ হইতে যে জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। চক্ষুর দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই শুধু প্রত্যক্ষ নহে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা, শ্রবণ, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেও প্রত্যক্ষ বলা হয়; যদিও তাহাতে অক্ষি বা চক্ষুর ব্যাপার কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহার প্রায় দশ ভাগের মধ্যে নয় ভাগ চক্ষুর সাধ্য। শুধু তাহাই নহে, চক্ষু ঘটিত জ্ঞান অন্যান্য ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুস্পষ্ট, সুদূরব্যাপী ও বিস্তৃত। সাধারণ দৃষ্টিতে

অনুমানাদির তুলনায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অবিসংবাদিত, সেই জন্যই ইন্দ্রিয়-গোচর জ্ঞান মাত্রকেই প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। ইংরেজিতেও observation শব্দটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞান মাত্রে প্রযুক্ত হয়।

'দর্শন' শব্দের অর্থও জ্ঞান লাভ করা। সত্যের সাক্ষাৎকারের নাম দর্শন। সে সত্যের স্বরূপ যাহাই হউক না, যে জ্ঞানে তাহা প্রতিফলিত হয় তাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সত্যের প্রকাশ কবিকল্পনার বিষয় নহে, তর্কজালের দ্বারা রচিত কোনও মতবাদ মাত্র নহে। সত্য যখন কাহারও চিত্তপটে প্রতিফলিত হয়, তখন তাহা সমস্ত আশঙ্কা-সংশয়ের অন্ধকাররাশি বিনাশ করিয়া আলোকের মত, জ্যোতির মত, সূর্য্যের মত প্রকাশিত হয়।

এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি-রূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।—ছান্দোগ্য।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।—মুণ্ডক।

সেই জন্য যাঁহারা সত্যের উপলব্ধি করিতেন তাঁহাদিগকে এদেশে ঋষি বা মন্ত্রের দ্রষ্টা বলা হইত; ইয়ুরোপে বলিত "Seer." সেই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধিকে 'দর্শন' বলা হয়।

Philosophy অর্থে 'দর্শন' শব্দটি আমাদের দেশে খুব প্রাচীন নহে। কিন্তু সত্যের সাক্ষাৎকার যে প্রাকৃত দৃষ্টিরই মত, ইহা আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন ধারণা। তত্ত্বজ্ঞান ইন্দ্রিয়সাধ্য নহে, তাই উপনিষদ্ বলেন আত্মা দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন।

মনোঽস্য দিব্যং চক্ষুঃ

ইহা বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় জ্ঞানযোগী মহাদেবের তৃতীয় নয়ন কল্পিত হইয়াছিল। সেই জ্ঞান-নয়নের জ্যোতিঃ অগ্নিজ্বলনের ন্যায় মদনকে ভস্ম করিয়াছিল। জ্ঞান বিনা কামকে ভস্ম করিতে পারে এরূপ সাধ্য আর কিছুরই নাই।

তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে দর্শন শব্দের প্রয়োগ আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই :

আত্মা বারে দ্রষ্টব্যো শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।

আত্মাকে দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, ধারণা করিতে হইবে এবং ধ্যান করিতে হইবে।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শনহেতবঃ॥

উপরিউক্ত প্রাচীন শ্রুতি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, দর্শন শব্দের দ্যোতনা প্রাচীন কাল হইতেই কোন্ দিকে রহিয়াছে। উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ হইতেও আমরা এই অর্থই প্রাপ্ত হই। আত্মা চিৎস্বভাব বা চৈতন্যময়। চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যের উপলব্ধি প্রসিদ্ধ। চক্ষু শরীরের অংশ মাত্র সুতরাং জড়ের ধর্ম্মবিশিষ্ট। সুতরাং চক্ষুর ব্যাপার যে দর্শন, তাহা আত্মাতে প্রযুক্ত হইবে কি প্রকারে? আত্মদর্শন একটি অসাধারণ ব্যাপার হইলেও, ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট ইহাই পরম সত্য বলিয়া উপপন্ন হইয়াছিল।

প্রাচীন কালে তত্ত্ব জ্ঞানকে 'বিদ্যা' বলিয়া উল্লেখ করা হইত। বিদ্ ধাতুর অর্থ জ্ঞান। আমরা এখনও তত্ত্ববিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি শব্দ কখনও কখনও ব্যবহার করিয়া থাকি। জ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা আছে যথা আন্বীক্ষিকী, দণ্ডনীতি ইত্যাদি। জ্ঞানের মূল কাণ্ডের নাম বেদ। যাহাতে পরম তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাই বেদ। আধুনিক ভাষায় পারিভাষিকভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, সম্যক্‌জ্ঞান প্রভৃতি শব্দের প্রচলনের চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শন ও PHILOSOPHY

Philosophy শব্দটি আমাদের অনেকের নিকট সুপরিচিত। ইহার মূল অবশ্য গ্রীস্ দেশে। হিরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে ক্রিসাস্ (Croesus) এবং সোলন (Solon) এর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে ক্রিসাস্ বলিতেছেন যে তিনি পূর্ব্ব হইতেই সোলনের নাম

শ্রুত আছেন। সোলন যে, জ্ঞানের লোভে (Philoso-phising) নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। লোকে দেশ পর্য্যটন করিতে যায় ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে, অর্থের অথবা চাকরীর চেষ্টায়। সুতরাং কেহ যখন শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্ম বিদেশ পর্য্যটনে যায়, তখন তাহাকে নিঃস্বার্থ বা অহৈতুকী জ্ঞান-লিপ্সাপ্রণোদিত বলিতে হয়। ইহাই পাশ্চাত্য জগতে ফিলজফি কথার মূল। কথিত আছে, পাইথাগোরস আপনাকে ফিলজফস্ অর্থাৎ জ্ঞানানুরাগী বলিতেন, 'জ্ঞানী' এ কথা বলিতেন না। এই কথাটির মধ্যে একটু তাৎপর্য্য আছে—তত্ত্বজ্ঞান যে নিঃস্বার্থতা-প্রণোদিত, ইহাই ঐ পারিভাষিক শব্দটির ইতিহাসে রক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের 'দর্শন' শাস্ত্র ঠিক নিঃস্বার্থতা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ প্রচলিত দর্শনগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায়শঃ তাহাদের জন্ম পরমার্থ-চিন্তন হইতে। পূর্ব্ব মীমাংসা ব্যতীত অন্য দর্শন গুলির উদ্দেশ্য যে মোক্ষ-লাভ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। মোক্ষকেই প্রাচীন ঋষিগণ পরম পুরুষার্থ বা 'নিঃশ্রেয়স' (অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর কিছু শ্রেয়ঃ নাই (sumnum bonum) এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ একটি পারমার্থিক বা পারলৌকিক প্রয়োজন থাকায় অস্মদ্দেশে দর্শন শাস্ত্র ধর্ম্মতত্ত্বের বা theologyর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন যে ইউরোপের মধ্যযুগে যেরূপ তদ্দেশীয় দার্শনিক বিদ্যা ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া Churchএর কবলে পড়িয়াছিল, আমাদের দেশেও সেইরূপ ভাবে দর্শন শাস্ত্রের স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা ধর্ম্মমতের দ্বারা খর্ব্ব হইয়াছিল। এই জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে আমাদের দেশের দর্শনকে ফিলজফি পদের যোগ্য মনে করেন না। পাশ্চাত্য দেশে দার্শনিক চিন্তা অব্যাহতস্বৈরগতি। ভগবত্তত্ত্ব, পরলোকবাদ, শ্রুতি স্মৃতির দ্বারা তাহার প্রণালী সীমাবদ্ধ নহে।

আমাদের দেশে দার্শনিক বিদ্যার যে স্বাধীনতা ছিল না, তাহা আমি স্বীকার করি না। লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তত্তৎকালের মানসিক অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, যে সকল দার্শনিক মত আমরা সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে প্রাপ্ত হই, তাহা বহুকালের গবেষণার ফল। তাহাদের ক্রম-বিবর্ত্তন অল্প দিনে হয় নাই। ঐ সকল মত গঠিত হইবার জন্য শুধু যে দীর্ঘ কালের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা নহে; সমাজ দেহে, রাষ্ট্রনীতিতে ও ধর্ম্মজগতেও যে নানা ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

যাহাই হউক, জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ করিবার যে চেষ্টা, সত্যের জন্য সত্য উদ্ধার করিবার যে সংকল্প, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার্হ। পাশ্চাত্য জগতের তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় এই যে নিঃস্বার্থতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অশেষ কল্যাণের আকর হইয়াছিল। ইহার ফলে সে দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের অবাধ স্রোত প্রবাহিত হইয়া মানব মনকে উন্নতির পথে বহুদূর লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের যে মোক্ষবাদ, ইহারও অনুকূলে বলিবার অনেক কথা আছে। আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন, আদর্শ হিসাবে যেরূপই সিদ্ধান্ত করি না কেন, কার্য্যক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত যে, জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার অন্তরালে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রত্যেক কার্য্যই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত। জ্ঞানলাভ ক্রিয়ারও একটি উদ্দেশ্য থাকিবেই। অর্থোপার্জ্জনই হউক, আর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাদিই হউক, কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বর্ত্তমান থাকিবেই। বেকন্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জ্ঞানই শক্তি। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাই জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার শক্তি জন্মে। সেই শিক্ষার ফলে আজ মানব নিত্য নূতন জ্ঞানের আহরণে নিযুক্ত আছে এবং এই জ্ঞানের দ্বারা

সে প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে সংহত, নিরত করিয়া নিজের কার্য্যে লাগাইতেছে। বিদ্যুৎকে দিয়া সে কল চালাইতেছে, পাখা ঘুরাইতেছে, বাতি জ্বালাইতেছে, দূর দূরান্তরে সংবাদ বহন করিতেছে। জল বায়ু পৃথিবী মন্থন করিয়া নব নব নিয়মের আবিষ্কার দ্বারা সে জগতের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

আর্য্য ঋষিগণ এই সকল জাগতিক ব্যাপার হইতে তত্ত্বজ্ঞানকে বিযুক্ত করিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য কোনও হীন, তুচ্ছ, সংকীর্ণ স্বার্থ-প্রাপ্তি নহে। মানব জীবনের চরম কল্যাণ, আত্মার পরম শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় তাঁহারা 'দর্শন'কে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন। পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করিয়া যে তাহারা তাঁহাদের চিন্তা প্রণালী পরম পুরুষার্থে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাও কম নিঃস্বার্থতার পরিচায়ক নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহারা মোক্ষ বা মুক্তি বলিতে কি বুঝিতেন। হিন্দুদিগের মুখ্য ষড়্ দর্শন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। মীমাংসা, ন্যায় বৈশেষিক ও সাংখ্য যোগ। মীমাংসা দর্শন পূর্ব্ব এবং উত্তর অথবা কর্ম্মমীমাংসা এবং তত্ত্বমীমাংসা এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম্ম মীমাংসায় আত্মতত্ত্বের উপদেশ পাওয়া যায় না। স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য কি প্রকারে যাগযজ্ঞ করিতে হয়, তাহারই উপদেশ জৈমিনির ধর্ম্ম মীমাংসা বা কর্ম্ম মীমাংসায় দেখিতে পাওয়া যায়। জৈমিনির মতে কর্ম্মই ফল প্রদানে সমর্থ। ইহার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না।* এই পূর্ব্ব মীমাংসা ভিন্ন সকল দার্শনিক তত্ত্বের লক্ষ্য—মোক্ষ, মুক্তি বা অপবর্গ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মোক্ষধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সদোষাঃ স্যুঃ পুনরাবৃত্তিকারকাঃ॥

ন্যায় মতে—

অথ শাস্ত্রস্য পরমং প্রয়োজনমপবর্গঃ।

মোক্ষই পরম প্রয়োজন।

কণাদ বলেনঃ—

যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।

ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলেন—

"নিঃশ্রেয়সমাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ"

বিবৃতিকার বলেন—

নিঃশ্রেয়সং মোক্ষঃ"

সাংখ্য বলেন

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ
ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি।

কৈবল্য অর্থে—মোক্ষ। মোক্ষই পুরুষার্থ।

পুরুষার্থো মোক্ষস্তদর্থং জ্ঞানমিদং গুহ্যং রহস্যং
শ্রীকপিলর্ষিণা সমাখ্যাতং (গৌড়পাদ ভাষ্য)

যোগ দর্শনের লক্ষ্যও মোক্ষ বা কৈবল্য। অভ্যাসের দ্বারা দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়ে অর্থাৎ ধন রত্ন স্ত্রীপরিজন এবং স্বর্গাদি কাম্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ ব্যক্তি পুরুষ-দর্শন অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান প্রসাদে পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। তখন সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ-শূন্য গুণের প্রলয় হইয়া আত্মা কেবল মাত্র চিৎ শক্তিকে নিয়ত অধিষ্ঠান করেন।

পুরুষার্থ-শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং
স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তিরিতি (যোগসূত্র—কৈবল্য পাদ)

তৃষ্ণাক্ষয় জনিত সুখের নিকট পার্থিব কোন ও সুখই দাঁড়াইতে পারে না।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্।

সুতরাং তৃষ্ণাক্ষয় জনিত বৈরাগ্য লাভ করিতে

* যদিও লৌগাক্ষি ভাস্কর পূর্ব্ব মীমাংসার্থ সংগ্রহে বলেন—
ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ
অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, তাহাই নিঃশ্রেয়স—অর্থাৎ মোক্ষের কারণ হয়।

পারিলে, লোক জীবন্মুক্ত হইতে পারে। শ্রুতিও বলেন—"জীবন্নেব বিদ্বান্ মুক্তো ভবতি।"

বেদান্ত আত্মাকে মোক্ষ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ (বেদান্ত সূত্র ১ম পাদ ৭ম সূত্র)

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো এই রূপ শ্রুতি হইতে আত্মার চিৎস্বরূপতা ও অথ সংপৎস্যে ইত্যাদি হইতে প্রারব্ধ ক্ষয়ানন্তর মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়।

অতএব আমাদের প্রধান আর্যদর্শন গুলিকে মোক্ষদর্শন বলিলেও অন্যায় হয় না। বৌদ্ধ দর্শনে যে নির্ব্বাণের আদর্শ আছে তাহাও এই মোক্ষেরই নামান্তর বলিয়া আমি মনে করি। অনাদিবাসনা-সন্তান নিবৃত্ত হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয়

রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেবা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

(সর্ব্বদর্শন)

আর্হত দর্শনেও মোক্ষমার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। সকল প্রকার কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে আত্মা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম হইতেই যাবতীয় ক্লেশ, কর্ম্ম হইতেই সংসার; জন্মমৃত্যু ক্লেশের নামান্তর। জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম ভস্মসাৎ হইলে আত্মা ঘৃতাভিবর্দ্ধিত হোমানলশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে প্রয়াণ করে।

সংসারের অনিত্যতা।

এক্ষণে এই যে ভারতীয় দর্শনের একান্ত কামনার বিষয় মুক্তি বা মোক্ষ, ইহার স্বরূপ কি? দর্শন গুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে যতই মতভেদ থাক, একটি বিষয়ে বেশ সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়,—সংসারের অনিত্যতা। এই অনিত্যতা-বুদ্ধি পাশ্চাত্য দর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্লেটো ইহার একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তাঁহার মতে এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, অসার, ছায়াবাজী মাত্র। সত্যলোক জগতের পর পারে কোথাও আছে। এই মরজগতে বসিয়া আমরা কখনও কখনও সেই ধ্রুবলোকের কিছু কিছু আস্বাদ পাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় প্রাচ্যে এই অনিত্যতাবাদ এবং দুঃখাত্মকতাবাদ যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, পাশ্চাত্য দেশে সেরূপ নহে। এ দেশের কাব্যে, দর্শনে, পুরাণে ইতিহাসে সর্ব্বত্র এই অসারত্ব-বাদ প্রসার লাভ করিয়াছে। তাই মোক্ষের জন্য এত আগ্রহ, এত ব্যাকুলতা।

আমরা মুক্তির প্রয়াসী। কিন্তু মুক্তি চায় কে, না, যে পরাধীন। আমরা এমন কোন পরাধীনতা ক্লেশ সহ্য করিতেছি, যাহা হইতে ছুটী পাইবার জন্য এরূপ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা? সাংখ্য বলিবেন, জগতের দুঃখরাশি আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা ত্রিবিধ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই। এমন ভাবে পরিত্রাণ চাই যে আর কখনও সে দুঃখ আমাদিগকে গ্রাস করিতে না পারে। দুঃখই বন্ধের হেতু।

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞো হি ইষ্টাপূর্ত্তকারী
কামোপহতমনা বধ্যতে। (তত্ত্বকৌমুদী)
কাম্যেঽকাম্যে চ কর্ম্মণি দুঃখাৎ দুঃখং ভবতি।

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

যাহা আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, তাহাও দুঃখ। সুখভোগোঽপি দুঃখভোগ এব। সুতরাং দুঃখ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাই চিন্তনীয়। এই দুঃখ-নিবৃত্তি-বাদ সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মূল কথা।

জৈন দার্শনিকেরাও বলেন—

কর্ম্মণাং নিরসনাদাত্যন্তিক কর্ম্মমোক্ষণং মোক্ষঃ।

(সর্ব্বদর্শন)

কর্ম্ম ত্যাগ করিতে করিতে যখন আত্যন্তিক কর্ম্মক্ষয় হয়, তখন তাহাকে মোক্ষ বলে। কারণ কর্ম্ম করিলেই অবশ্য তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।

কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত সকলই ক্ষয়শীল। শ্রুতিঃ বলেন

যথেহ কর্ম্মচিত্তো লোক জীয়তে এবমেবা২মুত্র পুণ্যচিত্তো লোক জীয়তে।

সাংখ্য ও জৈন দর্শন হইতে আমরা কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হই। জন্ম মৃত্যু সকলই কর্ম্মের অধীন। কর্ম্ম হইতেই দুঃখ সুতরাং কর্ম্মের বিনাশ সাধন করাই দর্শনের প্রতিপাদ্য। ন্যায় দর্শনও বলেন—ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।

কর্ম্ম না থাকিলে ফলও থাকে না। জৈনগণ বলেন যে কর্ম্মের গতিকে আত্মাতে এক প্রকার শক্তি জন্মে, যাহার ফলে আত্মা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ সেই সেই কর্ম্মানুযায়ী শরীর ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। আর্হত দিগ্গণ সেই জন্য সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম পরিহার করাই চরম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কর্ম্ম কেবল বাহিরের ব্যাপার। শরীরের বা মাংসপেশীর কতকগুলি বিক্ষেপের নাম কর্ম্ম বইত নয়। সেই বিক্ষেপের মূলে যে আভ্যন্তর ব্যাপার আছে, তাহার বিনাশ না হইলে শুধু কর্ম্মের বিনাশে কি হইবে? জৈনেরা সেই জন্য বলেন, চিত্তশুদ্ধি করিতে হইবে। কর্ম্মের বীজমাত্রও যেন না থাকিতে পারে, এমন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা তিনটি সাধনের নাম করিলেন, তাহাদিগকে ত্রিরত্ন বলে।

সম্যগদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ

(সর্ব্বদর্শন)

অর্থাৎ মোক্ষের তিনটি পন্থা সম্যক দর্শন, জ্ঞান এবং সচ্চরিত্রতা। সম্যক্ দর্শন ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য অনেক। বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে যে প্রভেদ, জৈনদের মতে সম্যক দর্শন ও জ্ঞানের মধ্যে সেই প্রভেদ। একটি Intuition অপরটী knowledge উভয়ই সাধন সাপেক্ষ। একটির দ্বারা মনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তত্ত্বের স্ফুরণ হয়, অপরটী যুক্তি তর্ক আলোচনার দ্বারা সিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধেরা কর্ম্ম অপেক্ষা বাসনার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবান হইলেন। বাসনাই কর্ম্মের মূল। কর্ম্ম সংসারের মূল। যাবতীয় কর্ম্ম পরম্পরায় মধ্য দিয়া একটি বাসনার সূত্র লম্বিত রহিয়াছে। সেই বাসনার সূত্র যতদিন বিনষ্ট না হইবে, ততদিন পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইবে। নিও-প্লেটনিক দার্শনিকগণের মধ্যেও এইরূপ একটি তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; অপরিতৃপ্ত বাসনাই সমস্ত পৃথিবীর মূল কারণ :—

"The whole world that we know arose and took its shapes from desire.—Plotinus

সুতরাং বাসনাকে বর্জ্জন করিলেই ভবোচ্ছেদ হইবে বা নির্ব্বাণ লাভ হইবে, ইহাই বৌদ্ধদিগের অভিপ্রায়। শঙ্কর বলেন,

সংকল্পং বর্জ্জয়েৎ তস্মাৎ সর্ব্বানর্থকারণম্।

—বিবেক চূড়ামণি।

এই আদর্শ যতই সুসঙ্গত হউক না কেন, প্রাকৃত জগতে ইহা অতি কঠিন ব্যাপার। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে মানব কোনও না কোন কর্ম্ম করিতেছে। সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়াহীনতার নামই মৃত্যু। সুতরাং কর্ম্ম বা বাসনার অতীত হওয়া আদৌ সম্ভবপর কি না, তাহাই সন্দেহ। এই জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমন্বয় করিলেন—কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। কর্ম্ম করিতে হইবে; কর্ম্ম না করিলে চলিবে কেন? কর্ম্মের দ্বারা যে জগৎসংসার চলিতেছে। তোমার নিজের জন্য যদি কর্ম্মের আবশ্যকতা নাও থাকে, তাহা হইলে লোক শিক্ষার জন্য তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ।

কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, ইহা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কান্ট্ বলিলেন আসক্তি শূন্য না হইতে পারিলে কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না। মমতা, স্নেহ, প্রণয়, স্বার্থ প্রভৃতির প্রয়োজনায় যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হীন কর্ম্ম। সুতরাং এ সকল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতেই কর্ম্ম করিলে তাহারই চারিত্রনৈতিক উৎকর্ষ স্বীকৃত হইবে। গীতা কিন্তু এরূপ অনাসক্তির কথা বলেন নাই। কর্ম্ম করিব অথচ দয়া শ্রদ্ধা সম-

বেদনা প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি যাহা কর্ত্তব্যসাধনের প্রেরণা জন্মায়; তাহাদিগকে বর্জ্জন করিব, ইহা সম্ভব নহে।

বিষয়েষরতির্জন্তোর্মরুভূমৌ লতা যথা (যোগবাশিষ্ঠ)

গীতা কিন্তু ফলে অনাসক্তিই উপদেশ করিয়াছেন। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্ম্মফলে যে আসক্তি, তাহাই বাসনার বীজ। আমার যাহাতে অভিরুচি, আমার যাহাতে আবেশ, আমার যাহাতে সুখ, এমন কিছু করিবার জন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্য ভগবান বলিলেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।

ফলের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিজেকে বিযুক্ত করিতে হইলে সমস্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। যাহা কিছু করিলাম, তাহা সমস্তই শ্রীবিষ্ণুচরণে সমর্পিতমস্তু এই বুদ্ধি লইয়া করিতে হইবে। আমি স্বর্গ চাই না, ধন জন পুত্র কলত্র চাই না, ইন্দ্রিয় সুখ চাই না, সংসারের কোনও বস্তুতেই আমার কামনা নাই, শুধু "তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।" আমি যেমন অবস্থায় থাকি না কেন, সুখে থাকি বা দুঃখেই থাকি, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ যে যোনিতেই আমার জন্ম হউক না, শুধু কামনা এই:—

"মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে" (বিদ্যাপতি)

তোমার প্রসঙ্গে যেন মতি থাকে। শ্রীলকবিরাজ গোস্বামী বলিলেন যতদিন কোনও পার্থিব কামনা লইয়া ভগবানকে ভজনা করিবে, সে ভজনা কাম নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। কেবল তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহাকে ভজনা করার নাম প্রেম।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

যতদিন ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন প্রেম অঙ্কুরিত হইতে পারে না। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি এক চার্ব্বাক ব্যতীত ভারতীয় সকল দর্শন শাস্ত্র কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞানে ও সহজাত সংস্কার বলে দেহতেই আত্মাভিমান হয়। অস্থিমাংস বসায় সমষ্টি নানা সুখদুঃখব্যাধিজরায় আকর। যত কাল এই শরীর আত্ম-পদবাচ্য হয়, যত কাল ইন্দ্রিয়বিষয়ে 'আমার' এই অভিমান দূরীভূত না হয়, তত কাল জ্ঞানের আলোক হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না। তত কাল মুক্তি হয় না—জ্ঞান বিনা মোক্ষ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? সেই জন্য বেদান্ত শাস্ত্র অবিদ্যা দূর করিয়া দিবার উপদেশ করিয়াছেন। অবিদ্যা দূর হইলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। (ব্রহ্ম সূত্র)

অবিদ্যার-ধর্ম্ম।

অবিদ্যা কাহাকে বলে?

অজ্ঞানমবিদ্যাহস্মতিরিত্যমরঃ। অমর কোষে অবিদ্যার পর্য্যায় অজ্ঞান এবং অহংমতি। অহংমতির অর্থ যাহা আত্মা নহে, তাহাতে আত্মবুদ্ধি;

"অহমিত্যস্ত মননমহস্মতিরনাত্মন্যাত্মাভিমানাৎ।"

এই যে অনাত্মবিষয়ে আত্মজ্ঞান রূপ ভ্রম বা অবিদ্যা ইহা বুদ্ধির ধর্ম্ম।

বিপর্য্যয়োহজ্ঞানমবিদ্যা সা বুদ্ধিধর্ম্মঃ। (তত্ত্ব কৌমুদী)

এই বিপর্য্যয় বা জ্ঞানের বৈপরীত্য হইতে আত্মার বন্ধন হয়।

বিপর্য্যয়াদতত্ত্বজ্ঞানাদিষ্যতে বন্ধঃ (তত্ত্বকৌমুদী)

ন্যায়সূত্রবৃত্তি বিপর্য্যয়ের অপর পর্য্যায় দিয়াছেন মিথ্যাজ্ঞান; অবিদ্যা শুধু জ্ঞানের অভাব নহে; পরন্তু অযথার্থ-নিশ্চয়তা রূপ মিথ্যাজ্ঞান।

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানাপরপর্য্যায়োহযথার্থনিশ্চয়ঃ।"

অবিদ্যা যে বিদ্যাবিরোধিজ্ঞানান্তরম্ একথা যোগশাস্ত্রের ব্যাস ভাষ্য ও স্বীকার করেন।

জৈনেরাও বলেন—

মিথ্যাজ্ঞানাবিরতি কষায়াঃ বন্ধহেতবঃ (বাচকাচার্য্য)

মিথ্যাজ্ঞান, অবিরতি বা আসক্তি এবং পাপ লোকের বন্ধনহেতু হয়।

এ স্থলে খৃষ্টানদিগের মুক্তিবাদ সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কারণ খ্রীষ্টানেরাও মোক্ষবাদী। পাপবশে আত্মার অধঃপতন ঘটিয়াছে। মানবের আদিম অবস্থা হইতেই এই পাপ আশ্রয় করিয়াছে। সেই পাপের ফলে মানবাত্মার স্বর্গচ্যুতি হইয়াছে। সুতরাং পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। খ্রীষ্টানদিগের এই মুমুক্ষুত্বের সহিত হিন্দুদিগের মুমুক্ষুত্বের আংশিক সামঞ্জস্য থাকিলেও পার্থক্য যথেষ্ট। খৃষ্টানের মুক্তিবাদ আগন্তুক এক পাপোৎপত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোনও দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রোথিত নহে। গ্রীস্ দেশের এক রহস্যবাদে (Orphic mysteries) আত্মার পতনের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রহস্যবাদ হইতেই এই মৌলিক পাপের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। যাহা হউক, খ্রীষ্টানেরা মনে করেন যে মৃত্যুর পর আত্মা কিছু কাল দেহ-বিযুক্ত অবস্থায় বাস করে; পরে বিচারের দিন সমাগত হইলে আত্মা ভগবানের দরবারে হাজির হয়। সেখানে করুণাবতার যীশুখৃষ্ট তাহাদের সকলের পাপ নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিলে পরে মানবাত্মা মুক্ত হয়, এবং অনন্তকাল ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করিয়া অপার সুখের অধিকারী হয়। খৃষ্টানেরা পাপ ও মৃত্যু এই দুই তত্ত্বের অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তদুপরি মুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাপ হইতে মৃত্যু এবং মৃত্যুর দ্বার দিয়া অমৃতে প্রবেশ—ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল কথা।

Like the hand which ends a dream
Death with the might of his sunbeam
Touches the flesh and the Soul awakes
—Browning.

খৃষ্টীয় এই মুক্তিবাদের মধ্যে আমরা প্রাচ্য আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই না। আত্মার দর্শন-স্বরূপতা ইহার প্রতিপাদ্য নহে। ইহাতে পাপতত্ত্ব আছে, অজ্ঞানতত্ত্ব নাই। দ্বৈত-জ্ঞান আছে, অদ্বৈত সিদ্ধি নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে আর্হত দর্শনে বন্ধের হেতু কষায় বা পাপ বলিয়া বর্ণিত আছে। "নির্জ্জর" না হইলে নির্ব্বাণ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানবাদী যোগদর্শনকারু বলিয়াছেন, চরিত্র শুদ্ধি না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার যোগ্যতা হয় না।

সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শন-
যোগ্যত্বানি চ
(সাধনপাদ—৪১)

শুচিতা হইতে সত্ত্বশুদ্ধি, অর্থাৎ মনের নির্ম্মলতা; মনের নির্ম্মলতা হইতে আনন্দ; তাহা হইতে একাগ্রতা; তাহা হইতে ইন্দ্রিয়জয় এবং ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শনযোগ্য শক্তি হয়।

রামানুজ দর্শনেও ঐ একই কথা:—

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ
এবং ধ্রুব স্মৃতি মোক্ষের উপায় বলিয়া কথিত হয়। (সর্ব্বদর্শন)

হিন্দুদর্শনের বৈশিষ্ট্য আত্মতত্ত্বে।

খৃষ্টান দিগের ধর্ম্মতত্ত্বে চরিত্র-নীতির স্থান অতি উচ্চে। মৃত্যুর চিন্তা হইতেই পরলোকের নানা প্রকার কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছে। পরলোকবাদ ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাণস্বরূপ। শোপেনহাওয়ার বলেন "মৃত্যুই সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের জননী।" মৃত্যুকে বরণ করিতে কেহ চাহে না। সকলেই জীবনের প্রয়াসী; যোগশাস্ত্র ইহাকে অভিনিবেশ বলিয়াছেন—স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ। (সাধন পাদ) আমার যেন মৃত্যু কখনও না হয়, আমি যেন চিরকাল থাকি, ইহা প্রাণীমাত্রেই কামনা করে। ইহারই নাম অভিনিবেশ। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা ইহাকেই বলেন instinct of self-preservation. ইহকালে আয়ুর বৃদ্ধি এবং পরকালে যাহাতে অনন্ত জীবনলাভ হয়, তাহার জন্য সকলেই সচেষ্ট। এই দুই কাল রক্ষা করিয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই চতুর।

"যা লোকদ্বয় সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"।

সুতরাং মৃত্যুর চিন্তা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ এ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বিরল নহে।

গৃহীত্বা ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।

পাশ্চাত্য দেশে চরিত্র-নীতি এবং ধর্ম্মতত্ত্বের সম্যক্ অনুশীলন হইলেও, এ দেশের বৈশিষ্ট্য আত্মতত্ত্বে। দার্শনিক যুগের প্রথম হইতেই ভারতবর্ষে আত্মতত্ত্বের অনুশীলন দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে কদাচিৎ কখনও আত্মা ও মনের পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা ও মন একই পদার্থ এইরূপ ভাবই সচরাচর দেখা যায়। মন হিন্দুদর্শনে ইন্দ্রিয় মাত্র। চক্ষু যেরূপ দর্শনের ইন্দ্রিয়, বা সাধন, মন সেইরূপ জ্ঞানের ইন্দ্রিয় বা সাধন। সেই জন্য ইহাকে অন্তঃকরণ বলা হয়। জড়ের ধর্ম্মও কিছু কিছু ইহাতে আছে। ইহা বিনাশী (ন্যায় মতে নহে)। পাশ্চাত্য দর্শন মনকে আত্মার সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া, আত্মতত্ত্বের দিকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আত্মা ব্রহ্মাণ্ডের দর্পণ-স্বরূপ। ইহাতে এমন এক বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যাহার ফলে মানবাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ভৌতিক উপাদানের দ্বারা ইহা গঠিত হইতে পারে না। জড়-জগতের ধর্ম্ম ইহাতে সম্ভব হয় না। জড়-জগতের যে পরিণাম তাহাও ইহার পক্ষে অপ্রয়োজ্য। জগতের ছায়াবাজির মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য, যাহাকে আশ্রয় করিলে সেই ধ্রুবজ্যোতিঃ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা পার্থিব জ্যোতিঃ নহে—

That light which never was on land or sea.

যিনি এই আলোক দেখিতে পান, তাঁহার নিকট সকল অজানাই জানা হইয়া যায়। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমেব বিজ্ঞাতং ভবতি। কারণ জড়-জগতের বিরাট গ্রন্থ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে, অধ্যাত্ম জগতের নিগূঢ় তত্ত্বও সে দেখিবার অধিকারী; তাহার—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব জানা বড়ই কঠিন। আত্মা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ। অণোরণীয়ান্। আরাগ্রমাত্র পুরুষোহণুরাত্মা চেতনাবেদিতব্যঃ। চৈতন্যৈকরস পদার্থ আত্মা ইহাকে চৈতন্য দিয়া জানিতে পারা যায়। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিয়াছেন যে, পরমাত্মাকে জানিলে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ থাকে না। The mind that wishes to behold God must itself become God. (Philo the Jew) আমাদের শাস্ত্রেও আছে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যে, সামানাধিকরণ্য আছে ইহা গ্রীক্ দার্শনিকেরও মত। জীবাত্মাকে তাঁহারাও বস্তুতঃ ভগবানের অংশস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিতেন। গীতা বলেন :—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

নিওপ্লেটনিক দার্শনিকেরা বলিতেন, জীবাত্মা সকল ভগবানের স্বরূপ হইতে বিস্ফুলিঙ্গের মত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সেই কেন্দ্রের দিকে যাইতেই তাহাদের নিয়ত চেষ্টা। (Plotinus)

উপনিষৎ বলেন—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। (বৃহদারণ্যক)

শুধু যে জীবজগৎ, তাহা নহে। সমস্ত ভূতবর্গ সেই পরমাত্মা হইতে সত্তা লাভ করিয়াছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব। (গীতা)

সূত্রে নিবদ্ধ মণিগণের ন্যায় সমস্ত বস্তু আমাতে গ্রথিত। সেই জন্য মধ্বাচার্য্য নিখিল বস্তু তত্ত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—এক স্ব-তন্ত্র; অপর অ-স্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষোহশেষসদ্‌গুণঃ॥
(সর্ব্বদর্শন)

পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা ভগবানকে causa

sui আখ্যা দিয়াছেন। causa sui অর্থ স্ব-তন্ত্র, স্বয়ং সিদ্ধ; কারণান্তরানপেক্ষ। স্পিনোজার মতে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর এক, বিশ্বেশ্বর হইতে বিশ্বের কোনও পৃথক্ সত্তা নাই। সমস্ত সত্তাই ঈশ্বরে পর্য্যবসিত। নিও-হেগেলিয়ান সম্প্রদায় বলেন, পরিণামশীল প্রকৃতির মধ্যে যে বিবর্ত্তন, তাহা সেই বিশ্ব-সত্তারই ক্রম-বিকাশ। এবং সেই বিশ্ব-সত্তা মানবাত্মায় এক চরম অধ্যাত্মতত্ত্বে পরিণতি লাভ করে; সকল ভূতের চিৎশক্তি তাঁহার আশ্রয় স্থল। সেই চিৎশক্তির পূর্ণ বিকাশ মানবের আত্মার চরম অভিব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

God is a Being with whom the human spirit is identical, in the sense that He is all which the human spirit is capable of becoming. (Green's Prolegomena)

মানবাত্মার চরম অভিব্যক্তি যে ভগবান্, এরূপ তত্ত্বের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য আপাত দৃষ্টিতে অতি নিকট বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যতক্ষণ আত্মা কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারা না যায়, ততক্ষণ এরূপ তত্ত্বে আমাদের তৃপ্তি হয় না। আত্মা যে এই সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অভিনব বস্তু; ইহা যে ভৌতিক উপাদানের দ্বারা বিরচিত হইতে পারে না, এ তত্ত্বটি যেমন এদেশের মনীষিগণ বুঝিয়াছিলেন, তেমন আর কোনও দেশেই নহে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা হয়ত বলিবেন যে, আদিম বর্ব্বর জাতিদিগের animism হইতে আত্মা নামক পৃথক সত্তার কল্পনা আমাদের দর্শনে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু ঐটুকু বুঝিলেই আত্মতত্ত্বের কিছুই বুঝা হইল না। আত্মা কি? আমাদের ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা বলিব, মনকে আত্মা বলিব, না চিৎশক্তিকে আত্মা বলিব?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ (গীতা)

ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা প্রকাশশীল বলিয়া ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। নিশ্চয়াত্মিকা বলিয়া বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ। এবং বুদ্ধিরও উপরে যিনি সাক্ষি স্বরূপে অবস্থিতি করেন তিনিই আত্মা। এই আত্মাই অন্বেষ্টব্য। এই আত্মাই মোক্ষধর্ম্মশীল। এই আত্মা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব। এই আত্মার সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে—

প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময় আত্মা।

এই আত্মাই "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

উপনিষদের যুগ হইতে এই তত্ত্ব ভারতবর্ষে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের Cultural individuality বা শিক্ষাসাধনাগত বৈশিষ্ট্য যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা এইখানে। আমি বস্তুতন্ত্রতাকে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না। ইউরোপ বস্তুতন্ত্রের সাধনায় অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। আরও নব নব আবিষ্কারের দ্বারা জগৎকে চমকিত করিবার জন্ম অগ্রসর হইতেছে। আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করিলে, বিজ্ঞানের সাধনাকে অবহেলা করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে, দারিদ্র্য ভোগ করিতে হইবে, পরমার্থ চিন্তনেও সুতরাং ব্যাঘাত পড়িবে। আমাদের শাস্ত্রেও বলিয়াছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যতে

কঠোর কর্ম্ম সাধন করিয়াও বল সঞ্চয় করিতে হইবে।

কর্ম্মণা যেন কেনাপি মৃদুনা দারুণেন বা।
উদ্ধরেদ্দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ॥

এরিষ্টটল্ও বলিয়াছেন যে পূর্ণ মানবত্ব লাভ করিতে হইলে, অভাব দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হওয়া চাই।

কেহ কেহ মনে করেন আমাদের শাস্ত্রের আত্মতত্ত্ব ও মোক্ষবাদ আমাদের দর্শনালোচনার স্রোত নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এই সকল তত্ত্বের ফলে আমরা এমন একটি সীমানায় উপনীত হইয়াছি যে আর আমাদের

পক্ষে নূতন কোনও ভাবোন্মেষ হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখবাদ ও অদ্বৈত তত্ত্ব জন্মান্তর ও কর্ম্মফল আমাদের মনে কেবল অবসাদ আনিয়া দিয়াছে, জাড্য জন্মাইয়াছে, আমাদের জাতীয় উদ্বোধন দূরে অপসারিত করিয়াছে। এ কথা যে সত্য নহে তাহা ভারতবর্ষের দর্শন চর্চ্চার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দুঃখবাদ সত্ত্বেও যে দার্শনিক মতবাদের অপ্রাচুর্য্য ঘটে নাই, তাহা নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইতে জানিতে পারা যায়।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ আমাদের জীবনে বর্ত্তমানে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এক সময়ে তাহারই পার্শ্বে, সাংখ্য ও যোগ পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দাবী করিত। ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, বেদান্ত বলিতেছেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; সাংখ্য বলিতেছেন ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই; বৈশেষিক দর্শনেও ঈশ্বর প্রসঙ্গ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্। এই সূত্রে তৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে, কিন্তু 'ধর্ম্ম' হওয়াই অধিকতর সম্ভব।

সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরতত্ত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন প্রমাণাভাবে। পাতঞ্জলদর্শনকে সময়ে সময়ে সেশ্বর সাংখ্য বলা হয়। কিন্তু এক সময়ে যোগদর্শন ঈশ্বরকে তেমন আমল দেন নাই, এ কথাও কেহ কেহ বলেন। আমরা যে যোগসূত্র জানি তাহাতে ঈশ্বরবাদ অবশ্য সুপরিস্ফুট রহিয়াছে। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে, সমস্ত যোগ দর্শনের সঙ্গে উহার ঈশ্বর তত্ত্বের সম্বন্ধ খুব বেশী নহে। ইহার জন্যই হয়ত ঐ ধারণা লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতে যোগদর্শন সেশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত এক তত্ত্ব যোগদর্শনের বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরবাদ যোগদর্শনে ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব। যাহা হউক, সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যাই আবহমান কাল ভারতের চিন্তায় ধাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই।

বৌদ্ধমতও এদেশের একটি অতি প্রাচীন মত। ইহার মূল উপনিষদে মিলিলেও ইহা নিশ্চিত যে, বৌদ্ধেরা হিন্দুদর্শনের অচলায়তন ভেদ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পন্থা আপনাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং যাগযজ্ঞের ফলদায়কত্ব অস্বীকার করিয়াও বৌদ্ধ মত যে ভারতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। পরে মহাযানী বৌদ্ধেরা হিন্দু ধর্ম্মমত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া বৌদ্ধমতকে হিন্দুদিগের নিকট উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই হইতেই নাস্তিক দর্শনের স্রষ্টা ঈশ্বরবাদের বিরোধী তথাগত বুদ্ধ হিন্দুদিগের দশাবতারের মধ্যে স্থান পাইলেন। হিন্দু সমাজ, হিন্দুধর্ম্ম এবং সমস্ত দার্শনিক মতবাদ আর একবার ওলটপালট হইয়া গেল।

অনেকে মনে করেন যে বেদান্তের মায়াবাদ বৌদ্ধ দর্শন হইতে আসিয়াছে এবং সাংখ্যমতও বৌদ্ধমত হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল। অতি দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশের দর্শনশাস্ত্র সমূহের ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং সাংখ্য হইতে বৌদ্ধমত অথবা বৌদ্ধ হইতে সাংখ্যমত আসিয়াছে এ সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভবপর নহে। এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে সাংখ্য ও বৌদ্ধদের মধ্যে সাদৃশ্য খুব বেশী। সাংখ্যের সংস্কার এবং সংস্কার জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ বৌদ্ধদর্শনেও আছে। সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ এবং বৌদ্ধদিগের ক্ষণিক বাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। সাংখ্য এবং বৌদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী এবং নির্ব্বাণের পথিক। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ ধ্বংসবাদ নহে। উভয় মতবাদের মধ্যে এই সকল বিষয়ে সাদৃশ্য সত্ত্বেও বৈষম্যও অনেক। সাংখ্যের পুরুষ বাদের চিহ্ন বৌদ্ধ মতে পাওয়া যায় না। সাংখ্য ত্রিগুণতত্ত্বেরও কোনও নিদর্শন বৌদ্ধ মতে নাই।

দর্শনে সমন্বয়-প্রবৃত্তি।

এই সকল দর্শনের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে চিন্তার রাজ্যে ভারতীয়দিগের গতানুগতিকতা স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে কালোপযোগী দার্শনিকতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সহিত ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক সময়ে সমন্বয়ের চেষ্টা অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হয়। সমন্বয়ের যুগ দর্শনের ইতিহাসে নিষ্ফল যুগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। অনেকে মনে করেন ভারতের নানা দার্শনিক মত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্থির যে, সত্য এক ; ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সেই সত্যকে জানিবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মাত্র। কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী বলিলে অন্যায় হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শন সত্যসাধনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরমাত্র ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না; সত্য সন্ধানের মূল্য তাহাতে থাকে না। সেই জন্য কেহ কেহ যখন বলেন যে ন্যায় বৈশেষিকের প্রথম সোপান আরোহণ করিয়া, তার পরে সাংখ্য যোগের মধ্য দিয়া আমরা মীমাংসার অদ্বয় তত্ত্বে উপনীত হই, তখন আমার মনে হয় যে এইরূপ সিদ্ধান্ত দার্শনিক স্বাধীনতার হানিকর। এই সকল দর্শনের মধ্যে যে মিল আছে, তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে প্রত্যেক দর্শনের বৈশিষ্ট্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সত্যানুসন্ধানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অন্তরায় আর কিছুই নহে। যুগধর্ম্মানুসারে, মানব মনের পরিণতি অনুসারে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রবাহ পৃথিবীর বক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। চিন্তাশীলের পক্ষে, ঐতিহাসিকের পক্ষে, সেই প্রবাহের প্রত্যেকটি তরঙ্গের মূল্য আছে। পূর্ব্ব মীমাংসার কর্ম্মকাণ্ডের পরে উত্তর মীমাংসার অদ্বৈত তত্ত্বের আবির্ভাব মানবমনের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বমীমাংসার নিরীশ্বরবাদ উত্তর মীমাংসার ব্রহ্মবাদে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে অর্থাৎ একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে যোগ দর্শনের দ্বারা সাংখ্যের এবং ন্যায়ের দ্বারা বৈশেষিকের পাদপূরণ করিয়া লইতে হইবে; আমার বক্তব্য এই যে, ইহাতে দার্শনিক চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

বঙ্গদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে ইতিহাসের নানা পটপরিবর্ত্তনের মধ্যেও দার্শনিক চিন্তার স্রোত অবাধে বহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম অশোকের সময় মাথা তুলিয়া উঠিল, দিগ্ দিগন্তে তাহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িতে লাগিল। বাঙ্গালা-দেশ এক সময় তাহাকে বাধা দিবারও চেষ্টা করিয়াছিল, বাঙ্গালার রাজা শশাঙ্ক বোধিদ্রুম পর্য্যন্ত পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে পালরাজগণের সময়ে যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্লাবনে বঙ্গভূমি ভাসিয়া গেল, তখন নানাস্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইল, ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর দেবতাকে বোধিসত্ত্বের পার্শ্বে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বঙ্গের অনেক স্থলে এখনও বৌদ্ধ কীর্ত্তির চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়াছিলেন। নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতটবাসী ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পূর্ব্ববঙ্গের লোক। ইনি ১০৩৮ সালে বিক্রমশীল বিহার হইতে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিকতার যুগ।

বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের নিকট যখন অবাধে ঋণগ্রহণ করিতে লাগিল, তখন নানা ধর্ম্মমত ও দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হইল। আমার বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে তান্ত্রিক মত বিস্তার এই সময় হইতে হয়। যদিও প্রবুদ্ধ ভারতের একজন লেখক কর্ত্তৃক তন্ত্রের উৎপত্তি উপনিষৎ ও বৌদ্ধযুগের মধ্যস্থলে কল্পিত হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহা সুনিশ্চিত যে, তন্ত্রের প্রচার বঙ্গদেশে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের পরেই হইয়াছিল। পালরাজগণ বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন। মহাযান বৌদ্ধেরা দেব-

দেবীকে নির্ব্বাসন করেন নাই। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের * প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন বুদ্ধশক্তি চণ্ডিকাদেবীর উপাসনা করিতেন। (আজের গম্ভীরা) মাধ্যমিক দল হইতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিকাশ সাধিত হয়। এই সম্প্রদায় "কালচক্রযান," "মন্ত্রযান" ও "বজ্রযান" নামেও অভিহিত হয়। তন্ত্রের উপাস্য দেবতা "শক্তি"। এই আদ্যাশক্তি স্ত্রীও নহেন পুরুষও নহেন। এই শক্তি একাধারে বিদ্যা ও অবিদ্যা, পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া। ইহা দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে।

অদ্বৈতং কেচিদ্‌বদন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতাঃ।

(কুলার্ণব তন্ত্র)

বিশ্বের মূল কারণ, বীজ এই দ্বৈতাদ্বৈতরহিত শক্তি। এই শক্তি হইতেই মায়া, ইহা হইতেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। ইহা হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই শক্তি ভুবনেশ্বরীরূপে জগন্মোহিনীরূপে জগৎ প্রসব করিতেছেন, আবার মহাকালী ভৈরবী রূপে সমস্ত সংহার করিতেছেন। তন্ত্রের মূল তত্ত্ব সংক্ষেপে ইহাই। বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্ব ও বৌদ্ধ শূন্যবাদের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যের ত্রিগুণতত্ত্ব এবং যোগদর্শনের সাধন তত্ত্ব ইহার প্রধান উপজীব্য। অধিকাংশ তন্ত্র শাস্ত্রের সংস্কৃত ভাষা দেখিলে তাহা আধুনিক এবং বাঙ্গালী সাধকের লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। বঙ্গদেশে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা ইহা বলিলেই উপলব্ধি হইবে যে এক্ষণে এরূপ কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায় বঙ্গীয় হিন্দুদিগের মধ্যে নাই, যাহা তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবিত নহে। (See Arthur Avalon's Introduction to Principles of Tantra) এ স্থলে সহজিয়া মতের উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য মনে করি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রসাদে মধ্যযুগে নাঢ় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ মতবাদ চলিতেছিল, তাহা আমরা "বৌদ্ধগান ও দোহা" হইতে জানিতে পারি। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই সহজিয়া সাধন বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা অন্য স্থলে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মমত একটি উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে নিহিত। তাহার সহিত সহজিয়াদের মহাসুখবাদের আদৌ মিল নাই। সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের একটি অবান্তর ফল। তন্ত্রের পঞ্চ মকার সাধন হইতে সহজিয়ারা পঞ্চমটি বিশেষভাবে সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র যে এইভাবের তান্ত্রিকতা গৃহীত হইয়াছিল তাহা নহে। অনেকস্থলে শক্তিবাদের সহিত বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মবাদের সুপবিত্র মিলনও দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা যায় রাজা রামমোহন রায় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তান্ত্রিকতার শেষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। তিনি ভোগসুখ একেবারে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিতেন। নিজের জীবনেও কামিনীকাঞ্চনের সংস্রব এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন। রমণী দেখিলেই তিনি জগন্মাতার প্রতিকৃতি দেখিয়া মা মা বলিয়া অজ্ঞান হইতেন। নিদ্রিত অবস্থায়ও কোনও ধাতুদ্রব্য তাঁহার গায়ে ঠেকিলে শরীর আপনা আপনি সংকুচিত হইত। তান্ত্রিক শক্তি-আরাধনার সহিত বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব মিলন।

নব্যন্যায়।

মুসলমান রাজত্বকালে নবদ্বীপ একটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া উঠে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য দেশ বিদেশ হইতে অসংখ্য ছাত্র এখানে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। বাঙ্গালীর অদ্ভুত কৃতিত্ব নব্যন্যায়ে। কাউয়েল সাহেব বলিতেন এই সকল তর্কশাস্ত্রের জটিলতার

* মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন বলিয়া এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম মাধ্যমিক হইয়াছিল।

অতো ভাবাভাবান্তদ্বয়রহিতত্বাৎ সর্ব্বস্বভাবানুৎপত্তিলক্ষণা শূন্যতা মধ্যমা প্রতিপন্মধ্যমো মার্গ ইত্যুচ্যতে (Indian Logic Dr. S. C. Acharya)

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি।

(বৌদ্ধ গান ও দোহা)

ইউরোপীয়দিগের মাথা ঝিম ঝিম করে। বাস্তবিক স্তায় শাস্ত্রের চর্চ্চা পারিভাষিকতার কত উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নব্য স্তায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বাঙ্গালী ছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণির তত্ত্বদীধিতি নাম্নী টীকা একজন বাঙ্গালীরই লেখা। দীধিতির রচয়িতা রঘুনাথ শিরোমণি "পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি" নবদ্বীপে হরিঘোষের গোয়ালে নব্যস্তায়ের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহার পরেও কয়েকজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিক বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। কণাদ তর্কবাগীশ চিন্তামণির একখানি টীকা রচনা করেন, তাহার নাম তত্ত্বটীকা। কণাদ তর্কবাগীশ এই অঞ্চলের লোক ছিলেন। আমাদের জেলার (যশোর) অধিবাসী গঙ্গাধর কবিরাজের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু চিকিৎসা বিস্তায় অদ্বিতীয় ছিলেন না; নানাশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া তিনি উপনিষৎ, স্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতির ভাষ্য রচনা করেন। ইংরেজ রাজত্বকালের দার্শনিক ইতিহাস যিনি লিখিবেন, তিনি গঙ্গাধর কবিরাজ ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিতে বাধ্য। রাজা রামমোহন বেদান্তের ভাষ্য বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদান্তসার নামে একখানি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তুলনা মূলক ধর্ম্মমতের সমালোচনা মহাত্মা রামমোহনই প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি সকল ধর্ম্মের সার সত্যগুলি সংকলন করিয়া উপনিষৎ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা রাজা রামমোহনের অন্ততম কীর্ত্তি।

বৈষ্ণব দর্শন।

রঘুনাথ শিরোমণি যে সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। কলিযুগের অধঃপতিত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচার করেন। প্রেমের সহিত নাম করিলেই জীবের গতি হয়, এই তত্ত্ব তিনি আপামর সাধারণে বিলাইলেন এবং নাম প্রেমের মালা গাঁথিয়া আচণ্ডালের গলে দোলাইলেন। তাঁহার পরিকরগণ হরিনামের তরঙ্গে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই মধ্যে একজন শ্রীমদভিরাম গোস্বামী এই রাধানগরে গোপী নাথের শ্রীপাট স্থাপনা করিয়াছিলেন। অভিরাম গোপাল ব্রজলীলার শ্রীদাম সখা ছিলেন। চৈতন্তচরিতামৃত বলেন—

অভিরাম মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোল শাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী॥

ব্রজভাবে ভাবিত হইয়া তিনি মুরলী বাদনের ইচ্ছা করিলেন, এবং অন্ত কিছু না পাইয়া একগাছি ষোল শাঙ্গের কাষ্ঠকে বাঁশী করিয়া বাজাইয়া ছিলেন। বৈষ্ণব সাধক নির্জ্জনে তাঁহার বাঞ্ছিতকে লইয়া এই নির্জ্জন পল্লীতে অবশিষ্ট জীবন "নাম" করিয়া কাটাইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন, তিনিই এই শ্রীপাটের সান্নিধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া এই স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্তও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। নবাব সরকারের চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি এইস্থানে আসিয়া নাম জপ করিয়া কাটাইতেন। রামমোহনের মাতা ফুল ঠাকুরাণী নিজে সম্মার্জ্জনীর দ্বারা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম দেখিতে হইত, তখন তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের বিগ্রহ সম্মুখে রাখিয়া বিষয় কর্ম্ম দেখিতেন। মহা প্রভুর ধর্ম্ম এইরূপ ভাবে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীরূপগোস্বামী এই ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; পরে উহা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী কর্ত্তৃক ষট্ সন্দর্ভে ও শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী নামে টীকার

পরিপুষ্টি লাভ করে। ভাগবতের ব্যাখ্যাকর্ত্তা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও পদ্যামৃত সমুদ্রের সংকলয়িতা শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যে সকল দার্শনিক মতবাদের আলোচনা করিলাম, তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, এদেশে দার্শনিক চিন্তার ধারা অব্যাহত ভাবে বহিয়া গিয়াছে। এই চিন্তাধারায় আত্মতত্ত্বের নব নব বিকাশ, নব নব অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই আমাদের দেশের জল বায়ু ও প্রকৃতির অনুকূল। ইহা ভারতীয়দিগের বৈশিষ্ট্য। অধুনা দর্শন অপেক্ষা বিজ্ঞানের আদর বেশী। বিজ্ঞান ইহলোকের কল্যাণসাধন করে। অধ্যাত্মতত্ত্ব পরলোকের কল্যাণ লক্ষ্য করে। আজ কাল নগদ মূল্যের আদর বেশী। তাই মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত বলেন যে, অহিংসা—যাহা ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্মমতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—হিন্দুজাতির রাজনৈতিক অধঃপতনের হেতু। হইতে পারে, আমরা আমাদের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় কিছু উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সে উদাসীনতা দর্শনের অপরাধ নহে, আমাদের দুর্ভাগ্য। আমি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত একমত; তিনি বলিয়াছেন যে আমাদের যদি পুনরুত্থান হয়, তবে তাহা এই আধ্যাত্ম বিদ্যার বলেই হইবে। অস্ত্রশস্ত্রের প্রচণ্ডতা অপেক্ষা যদি অধ্যাত্ম বলেই জগৎকে সম্পূর্ণভাবে জয় করা যায়, তাহা হইলে আমাদের এখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু চাই সেই রূপ গুরু, যিনি সমাধিপ্রণত হৃদয়ে পরমার্থচিন্তায় নিবিষ্ট হইবেন এবং সেই মৌন গুরুর পার্শ্বে উপসন্ন শিষ্যেরও সমস্ত সংশয় আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

মিলন পথে

(উপন্যাস)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এখন আর বসন্তের সেই করাল মূর্ত্তি নাই। সে বহু বলি গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়া শান্তভাবে বিদায় লইয়াছে। বসন্তের ভয়ে যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রামের হাট, বাজার, রাস্তাগুলি আবার পূর্ব্বের মত মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বৈঠকখানা গুলিতে আবার তাস, পাশা, দাবা এবং তৎসঙ্গে চাটনি স্বরূপ পরচর্চ্চার আড্ডা জমিয়া উঠিয়াছে। স্নানের ঘাটগুলি মেয়েদের হাসি, গল্প, কৌতুক, কলহে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা আপন আপন হৃদয়রত্ন গুলি বসন্তের কবলে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস এবং আর্ত্তরব গ্রামের আকাশে বাতাসে মাঝে মাঝে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? কেই বা তাহাদের খোঁজ লয়?

মহেন্দ্রলালের বৈঠকখানায় প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যাতেই গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদের একটি ছোটখাটো অধিবেশন বসিত। এই সান্ধ্য অধিবেশনে কখনও খোস-গল্প, কখন নানারূপ বিচার বিতর্ক ও মীমাংসা চলিত। ইহার অধিকাংশ সভ্য এবং স্বয়ং মহেন্দ্রলাল বসন্তের ভয়ে এতদিন গ্রামছাড়া ছিলেন, অধিবেশনও সুতরাং বন্ধ ছিল। এখন আবার সকলেই গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার অধিবেশন বসিয়াছে। নানাবিধ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তামাকের কুণ্ডলীকৃত ধূমে এবং

তাম্বুল চর্ব্বণের শব্দে বৈঠক খানা ভরিয়া গিয়াছে। নক্ষত্র-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় মহেন্দ্রলাল কয়াসের মধ্যস্থলে আসীন। উমেশ বাবু পাণের ডিবাটা আগাইয়া দিয়া মহেন্দ্রলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি তো একটা পাণও খেলেন না। নিন্।" মহেন্দ্রলাল ঈষৎ হাস্য করিতেই তাঁহার হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "আপনি বলেন কি? উনি সন্ধ্যা না ক'রে পাণ খাবেন?" উমেশ বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "ঠিক, ঠিক, আমার ভুল হয়ে গেছে।"

বিদ্যানিধি মহাশয় শিখা আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "আজকাল হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এরূপ অনুরাগ বিরল।" বলিয়াই আড় চোখে একবার মহেন্দ্রলালের মুখ দেখিয়া লইলেন। সেখানে প্রসন্নতার চিহ্ন দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠে প্রাতঃসন্ধ্যা, বেলা দশটা পর্য্যন্ত পূজা পাঠ, তার পর সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত জপতপ, তিথি নক্ষত্র উপলক্ষ্য করে প্রায় আমিষ ত্যাগ—এ গ্রামে আমি আর তো কারো দেখলাম না। ঝি চাকরের হাতের এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খান না, এঁর সব খাবার গিন্নিমা নিজের হাতে করেন। যে সে বামুনের হাতেও খান না। কেনই বা খাবেন? বামুন হলেই তো আর শুদ্ধাচারী হয় না।"

উমেশ বাবু একটা পাণের খিলি মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "সেজ বাবুর কথা তো আমরা সবই জানি। ওঁর ভাইপোটির কথা একবার বলুন না!" বিদ্যানিধি মহাশয় হুঁকাটা উমেশে বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, "কে, অশোক? আরে রাম রাম! তার কথা ছেড়ে দিন মশায়।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় সরোষে বলিলেন, "কেন ছেড়ে দেব? সে জমিদারের ছেলে বলেই কি সমাজের বুকের উপর ব'সে যথেচ্ছা কদাচার করবে, আর আমাদের টাকা নেই ব'লে, আমরা চুপ ক'রে তাই সয়ে থাকব? হিন্দুত্ব রসাতলে গেছে? হিন্দু সমাজ কি ধনের পায়ে মাথা বিকিয়েছে? তা নয়। এখনও সমাজের বীর্য্য আছে, তেজ আছে।" বলিয়া তিনি এমন অঙ্গভঙ্গী করিলেন যে, তাহা দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া গেল হিন্দু সমাজের তেজ-বীর্য্যের অংশ তাঁহাতেও বিদ্যমান আছে।

মহেন্দ্রলাল নেকা সাজিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অশোক আবার কি করেছে?"

উমেশ বাবু মৃদু হাসিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, "বিদ্যা-নিধি তায়া তো বাড়ীতেই ছিলেন। বলুন না তিনিই।"

"আমি কেন? চক্রবর্ত্তী তো গ্রামেই ছিল, সেও তো সব জানে।"

উমেশ বাবু বলিলেন, "রসনা কলুষিত হবার ভয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় বোধ হয় পাপ কথা বলবেন না।"

বিদ্যানিধি এই খোঁচাটা নীরবে পরিপাক করিলেন। কিন্তু উমেশ বাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি আবার বলিলেন, "বিদ্যানিধি মশায়, আপনার ছেলের স্কুলের মাইনেটা অশোক দেয় বটে, কিন্তু সমাজের মর্য্যাদার মূল্য কি সেই দুটো টাকার চেয়েও কম?"

বিদ্যানিধি এবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "খোঁচাটা আমায় দিলেন বটে, কিন্তু আপনার পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময়ে এই অশোক আপনাকে কতখানি সাহায্য করেছে, সেও তো আমরা ভুলে যাইনি। আপনিই বা দু'বছরে ভু'লে গেলেন কি ক'রে?"

রুষ্ট উমেশ বাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাকে বাধা দিয়া মিত্রজা মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "আহা আপনারা থামুন। ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আসল কথাটাই ভু'লে যাচ্ছেন। সবাই মিলে আলোচনা ক'রে এর একটা প্রতিবিধান করব, তা নয়, ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন। সেজ বাবু, শুনুন, আমিই সব বলছি। আপনার ভাইপো অশোক, রামা চাঁড়ালের ছেলেটাকে তো বাড়ীতে এনে নিজেদের সঙ্গে এক করেই রেখেছে। তারপর নিজের বয়স্ক হওয়ায়, সেই ছলে গোবিন্দ বোষ্টমের মেয়েটাকে একেবারে ঘরে এনে রেখেছে। তার হাতে খাচ্ছে দাচ্ছে, আরো কত কাণ্ড করছে। আপনি তাকে বিশেষ ক'রে শাসন ক'রে দোরস্ত করুন। নইলে আমরা আর এই অত্যাচার বেশী দিন সইতে পারব না

বলে রাখছি। শুধু রায় বংশের ছেলে ব'লেই এতদিন চুপ ক'রে আছি।"

মহেন্দ্রলাল—বোধ হয় ঘৃণায় লজ্জায়—ললাট কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে যখন বুঝিলেন, তাঁহার মন্তব্য শুনিবার জন্ত সভা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তখন অনেক দিক ভাবিয়া বলিলেন, "দেখুন, অশোক আমার পুত্রাধিক, কারণ তার বাবা জীবিত নেই। আমার নিজের ছেলে হ'লে কথা ছিল না, কিন্তু পিতৃহীন ভাইপোকে এখনি বর্জ্জন করিতে পারিনে। তবে সমাজের যাতে মান থাকে, সে যাতে ভাল হয়, তা আমি নিশ্চয়ই করব।"

সভ্যগণ অশোকের প্রতি এইরূপ গভীর স্নেহের জন্ত মহেন্দ্রলালকে ধন্তবাদ দিয়া এবং আর একবার তাম্বুল ও তাম্রকূটের সদ্ব্যবহার করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

পরদিন মহেন্দ্রলাল অশোককে ডাকাইয়া আনিয়া, কোন ভূমিকার আড়ম্বর না করিয়া, গত সন্ধ্যা বৈঠকের মন্তব্য (অবশ্য তাহার দুষ্কৃতি সম্বন্ধে) তাহাকে শুনাইয়া দিলেন। অশোক ইহার জন্ত প্রস্তুত ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আমাকে কি করতে বলেন?"

মহেন্দ্রলাল বলিলেন, "ছ'মাস আগে যা করতে বলেছি, আজ ও তাই বল্‌ছি। সেই নষ্ট স্বভাব মেয়েটার সব রকম সংস্রব ত্যাগ ক'রে—"

অশোক রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "আপনি মাধবীর সম্বন্ধে অসম্মানজনক শব্দের উল্লেখ করবেন না। তার মত চরিত্র মহিমা যদি ভদ্র সমাজের থাকত, তা হ'লে সমাজের এমন অধোগতি হতো না।"

আজ অশোককে বেশী চটাইবার ইচ্ছা মহেন্দ্রলালের ছিল না। তাই তিনি ধীর ভাবে বলিলেন, "মেনে নিলাম, তার স্বভাব ভাল। কিন্তু তবু তার সঙ্গে এমন ভাবে মেলামেশাটা ভাল কি? তার বাপ মা বাড়ী নেই, এই অবস্থায় তুমি তাকে এক মাস বাড়ীতে রেখেছ।"

"আমি এনে রাখিনি, সে আমাকে বাঁচাতে এসেছিল। তার বাপ মা যাকে তার অভিভাবক করে রেখে গেছে, তিনিও তার সঙ্গে ছিলেন। যখন বসন্তের জ্বালায় শূন্ত বাড়ীতে ছটফট করছিলাম, তখন কোথায় ছিল আপনার সমাজের এই রত্নগুলি? আমি ত তাদের কারু অনিষ্ট করিনি, বরং সাধ্যমত উপকার করতেই চেষ্টা করেছি। আমি মানুষ, মানুষের একটা ধর্ম্ম আছে; সেটা সমাজ-ধর্ম্মের চেয়ে ছোট নয়। সেই ধর্ম্ম পালন করতে যদি মাধবীর সঙ্গে সংস্রব রাখতে হয় তো রাখবই। মিথ্যাকে স্বীকার করে ধর্ম্মে পতিত হ'তে পারব না। মানুষের মহত্ত্ব সমাজ সইতে পারে না, নইলে মায়ের মত বোনের মত মমতায় যে একজন অসহায়কে যমের মুখ থেকে টেনে এনেছে, সমাজ তাকেই ছোট বলে, হীন বলে, দূর করে দিতে বল্‌ছে।"

মহেন্দ্রলালের শ্যালক, একটি মাতৃহারা কন্তা এবং তাহার বিবাহের জন্ত পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার কাছে রাখিয়া সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহেন্দ্রলাল সুর বদলাইয়া বলিলেন, "তুমি যা বল্‌ছ, তা ঠিক বটে। যাক্, আমি সবাইকে ঠাণ্ডা ক'রে দেব। তোমার বিয়ের সময়ে একটা ভাল ভোজ দিলেই লুচি সন্দেশের তলে এ সব তলিয়ে যাবে।" তার পর তিনি অন্দরের দিকে মুখ ফিরাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "কিরণ, ও কিরণ, পাণ দিয়ে যাও।"

অল্পক্ষণ পরেই একটি কিশোরী আসিয়া মহেন্দ্রলালের সম্মুখে পাণের ডিবা রাখিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, খপ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া তিনি অশোককে বলিলেন, "অশোক, এটি তোমার কাকীমার ভাইঝি। এর বাপ মারা গেছেন, তাই এখানে নিয়ে এসেছি।"

অশোক চোখ তুলিয়া দেখিল, হ্রী ও শ্রী মণ্ডিত কিশোরী মূর্ত্তি। মহেন্দ্রলাল হাত ছাড়িয়া দিতেই মেয়েটি চলিয়া গেল। তখন তিনি অত্যন্ত স্নেহের সুরে বলিতে লাগিলেন, "আমি আর তোমার কোন ওজর আপত্তিই শুনব না। এই বৈশাখ মাসের প্রথমেই একটা ঠিক ক'রে ফেলব। চিরদিন যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে, তাকে নিজের চোখে দেখে নেওয়াই ভাল, তাই একবার দেখালাম। নইলে এর বা কি দরকার

ছিল ? তুমি ত আমার ঘরের ছেলে, তুমি যে বাপ খুড়োর কথার ওপর কথা বল্‌বে না; তা কি আমি জানিনে ?"

অশোক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা, আপনি কি বল্‌ছেন ?"

কাকা বিরক্তি গোপন করিয়া বলিলেন, "তোমার বিয়ের কথা বল্‌ছি।"

"বিয়ে করার সুবিধে এখন হবে না।"

"অবাক্ করলে! বিয়ে করার আবার সুবিধে অসুবিধে কি ? সম্ভ্রান্ত ঘরের সুন্দরী মেয়ে। তোমার ত অযোগ্য নয় বাবা।"

"যোগ্যাযোগ্যের কথা হচ্ছে না। এখন আমি বিয়ে করব না।"—বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

একমাস পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গ্রামের সকল 'সামাজিক'ই নিমন্ত্রিত হইল, কিন্তু অশোকের নিমন্ত্রণ হইল না। অশোক ইহাতে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইল না। সে জানিত, সেজকাকার শ্যালক কন্যা বিবাহ করিয়া নগদ অন্ততঃ সাড়ে চারি হাজার টাকা তাঁহার লোহার সিন্দুকে তুলিয়া দিবার সহায়তা না করিলে সমাজের এই ব্রহ্মাস্ত্রই বুক পাতিয়া লইতে হইবে।

তাহারই গৃহের পাশ দিয়া নিমন্ত্রিতগণ যখন কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল, তখন নিষ্ফল রুদ্ধ আক্রোশে সে গর্জ্জিতে লাগিল। একটা কল্পিত অপরাধের বোঝা তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া এই যে প্রকাশ্য অপমান, দুঃসহ দণ্ড, ইহা সে কেন সহ্য করিতে যাইবে ? সমাজের ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরগণের চরিত্রের কথা ত তাহার অবিদিত নাই। এই অপমানের গুপ্ত নায়ক যে মহেন্দ্রলাল, সে বিষয়ে অশোকের সন্দেহের অবকাশ মাত্র ছিল না। সে একবার ভাবিল, সেজ কাকাকে বেশ কড়া কড়া দুকথা শুনাইয়া আসা যাক্। কিন্তু আবার তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল। ইচ্ছা করিলে সে দণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু সামাজিক সম্মানের মূল্য সে আজ কোন মতেই অন্তরে স্বীকার করিতে পারিল না। পথের ধূলি কণার চেয়েও ইহা তাহার কাছে নগণ্য তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল।

এই সমাজের মুখ চাহিয়া সে প্রতিদিন একান্ত কাম্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে। কেন ? সমাজ তাহার এমন কি করিয়াছে যে, তাহার বিনিময়ে সে আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবে ? নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিবে ? এই ত সমাজ, যে সত্য মিথ্যা দেখিবে না, ভাল মন্দ বিচার করিবে না, মানুষের হৃদয়কে অস্বীকার করিয়া চলিবে, তথাকথিত ইতর জাতের এতটুকু মহত্ত্ব স্বীকার করিবে না, শুধু নির্ম্মম কঠোর হস্ত দণ্ডদানের জন্যই উদ্যত করিয়া রাখিবে। ইহারই জন্য ত্যাগ করিয়া সর্ব্বরিক্ত হইতে হইবে ? না, না, সে তাহা পারিবে না।

সামাজিক সমস্যার মীমাংসায় এবং ভাবী জীবন প্রবাহ কোন্ খাতে বহাইবে, তাহারই কল্পনায় অশোকের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারিল না। প্রথমে সে যখন শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মন শুষ্ক ও ম্লান দেখা গেলেও তাহার অন্তরের দ্বন্দ্ব শেষ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার চিত্ত দৃঢ় ও শান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অধরে ও নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব অভিব্যক্ত। সে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে যাইয়া বসিল।

কিছুকাল পরে বদু মণ্ডল আসিয়া অশোকের পায়ের কাছে এক ভাঁড় দুধ রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "বদু, একি ?" বদু লজ্জিত হাস্যের সহিত বলিল, "বাবু, গাইটা বিয়েছে, তারই একটুখানি দুধ।"

অশোক প্রসন্ন মুখে বলিল, "বেশ বেশ, সকাল বেলাই কিছু পাওনা হয়ে গেল।"

অধিকতর লজ্জিত হইয়া বদু বলিল, "আপনি বড়

লোক—কত উপকার পাই আপনার কাছে—একি একটা পাওনা হ'লো ?"

অশোক বলিল, "যাও, বাড়ীর ভেতর গিয়ে মুখটা বন্ধুর কাছে দিয়ে এস।"

বন্ধু চলিয়া যাইতেই পাঁচ ছয় জন যুবক কোলাহল করিতে করিতে অশোকের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। এই নিষ্কর্ম্মার দল মাঝে মাঝে তাহার গৃহে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহ মুখর করিয়া তুলিত, ইহাদের নিমন্ত্রণের দরকার ছিল না। মূর্ত্ত উপদ্রবের মত আসিয়াই ইহারা অশোকের কাছে খাবার আদায় করিত। আজ ইহাদের দেখিয়া, কন্যাকার ঘটনার জন্য ইহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন কল্পনায় অশোক ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা কিন্তু অশোকের কল্পনার ধার দিয়াও গেল না। তাহাদের কেহ বা বসিয়া কেহ বা দাঁড়াইয়াই চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশে সুপ্রচুর মিষ্ট বচন বর্ষণ করিয়া, বোধ করি শুষ্ককণ্ঠ হইয়া পড়িল। তাই অতুল অশোককে বলিল, "আরে, তুই তামাক খাসনে ব'লে আমাদেরও কি দিতে বলতে নেই ? কিছু ভদ্রতা জানিস নে, তাই তো চক্রবর্ত্তী তোকে একঘরে করেছে।" বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রভুর আদেশে হরু আসিয়া তামাক দিয়া গেল।

তামাক খাইয়া খগেন বলিল, "আমরা কি ঠিক করেছি জানিস অশোক ? ছাব্বিশে বোশেখ চক্রবর্ত্তীর মেয়ের বিয়ে। সেই বিয়েটা পণ্ড ক'রে বেটাকে বিয়ের সভার মাঝখানে বেহদ্দ নাকাল ক'রে তবে ছাড়ব। আমরা তার ফন্দি টন্দি ঠিক ক'রে রেখেছি। সেই সঙ্গে তোর সেজ কাকার ভণ্ডামীটাও আচ্ছা ক'রে ভেঙ্গে দেব।"

অশোক বিশেষ করিয়াই জানিত যে, এই সকল সাহসিক কর্ম্মে এই বীরপুরুষেরা পশ্চাৎপদ বা অপটু নহে। সে বলিল, "ছি, ভাই, এসব কায কখনো করিস নে। বুড়োর দল আমায় একঘরে করলেই বা; তোরা তো আমায় ত্যাগ করিস নি। ওরা আর ক'দিনই বা বাঁচবে ?"

বীরেন গর্জ্জিয়া উঠিল, "রেখে দে তোর লেকচার। আমরা তোর মত বি-এ এম্-এও পাস করিনি, সভ্য-ভব্যও হইনি। আমরা শোধ তুলে ছাড়ব। মিথ্যাবাদী ভণ্ডের দল !"

এখন এই উত্তেজনার মুখে কিছু বলা বৃথা বুঝিয়া অশোক বলিল, "এখনি তো আর শোধ তুলছিস নে, তারও তো কয়েকদিন দেরী আছে। আর পাশা খেলি।"

পরেশ বলিল, "এখন নয় ও-বেলা খেলব। আর কাল আমরা সবাই তোর এখানে খাব, নেমন্তন্ন ক'রে গেলাম।"

অশোক বলিল, "আমার এখানে খাবি কিরে ? তোদের বাপেরা কি বলবেন ?"

অতুল বলিল, "যা বলবেন, তাতো আর তোকে শুনতে যেতে হবে না। সে ভেবে তোর কায কি ?"

বীরেন সঙ্গীদের বলিল, "বেলা হয়ে গেছে, এখন চল যাই।"

তাহারা যাইতে যাইতে অশোককে বলিয়া গেল, "মাংস চাই কিন্তু। তোমার বিধু ঠাকরুণকে দিয়ে চলবে না, ভাল রাঁধুনি যোগাড় ক'রো।"

আর একজন অস্ফুটে বলিল, "রাঁধুনি মাধবী হ'লেও আমাদের আপত্তি নেই।"

কথাটা অশোকের কাণে গেল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, যৌবন জিনিসটা অতুলনীয়ই বটে। ইহা নির্ভীকতার খনি, সমস্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্মের উৎস। কিন্তু অশোক ইহাও জানিত, যুবকেরা আজ তাহার গৃহে খাইয়া গেলেও, প্রয়োজন হইলে কালই তাহাদের অভিভাবকেরা সেই ভোজন ব্যাপারটাকে অস্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

দুপুর বেলা খাওয়ার পর অশোক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিল না। আজ মাধবী একবারও এখানে আসে নাই। গোপাল মাধবীর কাছে চার পাঁচবার গিয়াছে। মাধবীর আসিতে দেরী হইলে সে এই

রকমই করিত। অশোক কাহারও অভাব অভিযোগ বুঝিয়া যত্ন করিতে পারিত না, নিজের অভাব পূরণ করার শক্তিই তো তাহার কোন দিনও ছিল না, তা আবার অন্য! কাজেই গোপালের যত্নও তারই মাধবীর উপর পড়িয়াছিল। গোপালও দুই মাসের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমে মাধবীর বশ হইয়া গিয়াছিল। গোপাল চার পাঁচবার আনা-গোনা করিয়া আপন মনেই অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে একবার বলিয়া উঠিয়াছিল, "মা আজ কেবল তার বাড়ী ব'সে কাঁদই করছে, একবারও আমাদের বাড়ী এল না। আমিও আর যাচ্ছিনে।"

কথাটা অশোকের কাণে গিয়াছিল। কালিকার ঘটনাটা যে মাধবীকে কতখানি বেদনায়, কতখানি ক্ষতিতে, কতখানি অপমানে বিষাইয়া তুলিয়াছে অশোক তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। আরও বুঝিল, নিঃশব্দে এই বিষ গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দেই সে সহিয়া যাইবে, এ জন্য একটা কাতরোক্তি প্রকাশ করিতেও সে ঘৃণা বোধ করিবে। অশোক জীবনের হিসাবটা আগাগোড়া খতাইয়া দেখিল, খরচ তো তাহার বিশেষ কিছু হয় নাই, জমার পাত্রই ভরিয়া উঠিতেছে। মাধবীর আজ এই যে সর্ব্বনেশে ক্ষতি, এও তো তাহারই দেওয়া। এই ক্ষতি সে জীবন ভরিয়া পূরণ করিতে চেষ্টা করিবে।

অশোক কি একটা কাজে বৈকালে মোহনগঞ্জে গিয়াছিল, ফিরিয়া ঘরে উঠিতে না উঠিতেই গোপাল ছুটিয়া আসিয়া একমুখ হাসি লইয়া বলিল, "মাকে জোর ক'রে ধ'রে এনেছি, ওপরের ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেছি। দেখবেন, চলুন।" বলিয়া অশোকের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। উপরে উঠিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ একটা ঘর দেখাইয়া চুপি চুপি বলিল, "এই ঘরে। মাকে আজ ছেড়ে দেবেন না। যেমন আসেনি, তেমন সাজা। আমি নীচে যাই, ঘুড়ি ফেলে এসেছি, কে আবার নিয়ে যাবে।" বলিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেল।

অশোক দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, মাধবী কোলের উপর বই রাখিয়া খোলা জানালার কাছে বসিয়া পড়িতেছে। সে দরজা খোলার শব্দ পাইয়া ফিরিয়া বলিল, "এসেছ? ছেলেটা আমাকে দু'ঘণ্টা বন্ধ ক'রে রেখেছে। কিছুতেই দরজা খু'লে দিলে না। কি যে দুষ্ট হচ্ছে, একটুও শাসন করনা তুমি!"

অশোক এ সকল কথার জবাব না দিয়া অদম্য বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "তুমি পড়ছ? আমি ভাবছিলাম—"

"শুয়ে শুয়ে কাঁদছি? কেন কাঁদব? ঠাকুর্দা বলেন, 'যা অনিত্য, যা মিথ্যা, তার জন্যে শোক করতে নেই। আজ সেই কথাটাই আমার বার বার মনে হয়েছে।" বলিয়া মাধবী হাসিল।

হাসি দেখিয়া অশোকের ভয় হইল। এই হাসি কি অন্তর উৎস হইতে স্বতঃ উৎসারিত? নারী জীবনের কঠোরতম আঘাতের চিহ্ন সে তো তাহার মুখ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া লইতে পারে নাই। অশোক সহসা কোন কথাই বলিতে পারিল না। তাহার সামীপ্যও মাধবীকে এমনি স্থির রাখিবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে মাধবীর পানে চাহিয়া রহিল।

মাধবী তাহার আঁচল হইতে একখানা চিঠি খুলিয়া অশোকের হাতে দিয়া বলিল, "বাবার চিঠি আজ এসেছে, পড়ে দেখ।"

অশোক চিঠিখানা পড়িল—

'মা, শ্রীধাম বৃন্দাবন আনন্দের হাট। যদি অতদূরে তোমাকে ফেলিয়া না আসিতাম তবে আনন্দ পুরা-মাত্রায় ভোগ করিতে পাইতাম। যখনি মনে হয়, বৃন্দাবনের ধূলির সঙ্গে যশোদা-দুলালের রাঙাচরণ দু'খানির ধূলি মিশিয়া আছে, যখনি মনে হয় সংগ্র প্রেমিকের সঙ্গে তিনি এইখানে কত লীলা করিয়াছেন, যখনি মনে হয় যমুনার নীল জল নীলরতনের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়া আছে, তখন আর এস্থান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না।

"যেদিন কেশবের সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতে যাইতেছিলাম, সেদিন তোমাকে লুকাইয়া

কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম। তুমি তাহা জান না। কিন্তু সে দিন বুঝিয়াছিলাম, বিবাহে তোমার ইচ্ছা নাই। এখন যদি তোমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ভালই, আমি আসিয়া তোমার বিবাহ দিব। আর যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে ঠাকুর্দ্দাকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে। আমি তাঁহাকেও চিঠি লিখিলাম। তোমার যদি না আসা হয়, আমি যত সত্বর পারি চলিয়া আসিব। ইতি।"

অশোক চিঠিখানা মাধবীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ চিঠির কি জবাব দেবে? কি করবে তুমি?"

মাধবী স্মিত মুখে বলিল, "এবার সত্যিই গোপী-বল্লভের আহ্বান এসেছে। একে আর অনাদর বা উপেক্ষা করা চলবে না।"

অশোক অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর আরক্ত সজল নেত্র মাধবীর মুখপানে স্থির করিয়া বলিল, "সবাই যখন আমাকে ত্যাগ করেছে, তুমিই বা বাকি থাকবে কেন মাধু?"

"তোমায় ত্যাগ করব? আজকের দিনটিতেও তুমি আমায় ভুল বুঝছ কেন!"—বলিয়াই মাধবী ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অশোক বিচলিত হইল। সে চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল, একটু নত হইয়া মাধবীর হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিল, "মাধু, পরস্পর আমরণ ছাড়াছাড়ি হ'য়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কি কোন উপায় নেই? বল, বল, বিমুখ হ'য়ে চুপ ক'রে থেক না।"

অশোকের সেই কষ্ট মাধবীর সকল বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া গেল। সে অশোকের দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আর কি উপায় আছে? কি করতে পারি বল?"

অশোক সাগ্রহে সস্নেহে মাধবীর মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমাকে ভালবেসে অন্যায় করেছি বলে কখনও মনে হয়নি। সমাজের সব নিয়ম মেনে চলাই যে ধর্ম্ম, তাও আজ আমার মনে হচ্ছে না। যে সমাজ মিছামিছি আমাদের এত বড় একটা শাস্তি দিলে, তারই আদেশ মাথায় করে নিয়ে, হৃদয়কে অস্বীকার ক'রেই কি আমাদের থাকতে হবে? ইচ্ছা করলেই তুমি আমার হ'তে পার। এই বিবাহ সমাজ কখনো অনুমোদন করবে না জানি; কিন্তু ভগবান যদি জগতের সব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করেন, তবে আমরাও তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত হব না।"

মাধবী নিজের হৃদয়ের মত অশোকের হৃদয়ও জানিত, তথাপি অশোকের মনে যে এমন অসম্ভব আশা জন্মিয়াছে তাহা কখনও জানিতে পারে নাই। তাহার হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত তালে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল। সে, কথা বলিতে পারিল না। তাহার নীরবতা অশোককে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া ফেলিল। সে অধীর আগ্রহে বলিল, "কথা বল মাধু; বল, আমাদেরও মিলবার পথ আছে।"

মাধবী শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "না, এজন্মে নয়।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "নয় কেন মাধু?"

অশোকের ভগ্ন কণ্ঠ মাধবীকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। তবু সে স্থির কণ্ঠে বলিল, "দেখ, সমাজ আজ গড়ে ওঠেনি। এর শত শত বছরের নিয়মগুলি আমাদের স্বভাবের সঙ্গে মিশে গেছে। একে আর আলাদা ক'রে ভাববার উপায় নেই। আজ রাগ করে যাই বলনা কেন, সমাজ কি বর্জ্জনীয়? কেউ সমাজ ছেড়ে থাকতে পারে? না, থাকা উচিত? বুড়ো মা বাবা যদি ভুল বুঝে আমাদের শাসন করেন, তা হ'লে আমরা দুঃখ পাই, রাগও করি বটে; কিন্তু তাঁদের স্নেহের প্রয়োজন, শাসনের প্রয়োজন কি তখনি শেষ হ'য়ে যায়? তাঁদের তৃপ্তি লাভের চেষ্টা, স্নেহ লাভের চেষ্টা আমরা কেউ কখনো কোন অবস্থাতেই ছাড়তে পারিনে। আমার মনে হয়, সমাজও বুড়ো বাপ মার মত মাঝে মাঝে ভুল বুঝে বসে। কিন্তু এর বিধান গুলি একেবারেই অপ্রয়োজনীয় অর্থশূন্য নয়। সমাজ থেকে আলাদা হ'য়ে থাকা যে কত বড় দুঃখ, কত বড় আপমান, তাতো একটি দিনেই বুঝতে পেরেছ।

মা বাপ হ'য়ে, সন্তানের স্কন্ধে কে এই দুঃখ অপমান সঞ্চিত ক'রে রেখে যেতে পারে? সমাজ ছাড়া বা তাজাই কি বড় কায? চেষ্টা ক'রে এর ভুল গুলি শোধরান কি কায নয়?"

অশোক বলিল, "অত কথার কায কি? সামাজিক সম্মানটাই তোমার কাছে সব চেয়ে বড় এই একটা কথা বল্লেই তো হ'তো।"

মাধবী বলিল, "ইচ্ছা ক'রে ব্যথা দেবে তার কি করব? যা বল্লে, তা যদি সত্যি ব'লেই জানতে, তা হ'লে সমাজের শীর্ষস্থান থেকে আমারই জন্যে এতখানি নীচে নেমে আসতে চাইতে না। সহস্র সুখের প্রলোভনেও তোমার দুঃখ অপমান আমি সইতে পারব না। তুমি দুর্লভ, তাই আমার এত প্রিয়; তাই তোমার মূল্য তোমার মর্য্যাদা আমার কাছে সকলের উপরে। জন্মান্তর তুমি মান কিনা জানিনে, কিন্তু আমি মানি। তোমার সেবার অধিকার,—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দ—একদিন এসে আমার হাতে ধরা দেবেই। আমি সেই দিনটাকে মুক্ত করবার জন্যেই বৃন্দাবনে চল্লাম। তুমি আজ খুসী মনে আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমার তপস্যা সার্থক হোক্, সেবার পথ যেন আমার অনতিক্রম্য হ'য়ে থাকে না।"

বহু কষ্টে অশোক অশ্রু দমন করিয়া স্থির হইয়া রহিল বটে, কিন্তু একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না। মাধবী অগ্রসর হইয়া, তাহার পায়ে মাথা রাখিতেই অশোক সুগভীর স্নেহে তাহার মাথাটি বক্ষলগ্ন করিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিল। মুহূর্ত্তে উভয়ের অশ্রুধারা মিলিত হইয়া গেল।

সমাপ্ত

শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা।

শ্রুতি-স্মৃতি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

যতদিন বাহিরে থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মাতার নিকট হইতে ভ্রমণের অনুমতি পাইয়াছিলাম, তদপেক্ষা অধিকদিন হইয়া গেল। গৃহে মাতা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তার যাইতে লাগিল। যে স্থানে বেশী দিন থাকিতে হইয়াছে সেখানে চিঠিও পাইয়াছি তাহাতে ফিরিবার জন্য মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—যাহার অর্থ আদেশ। বঙ্গদেশে আমার জন্ম, জন্মাবধি নাটোর, রাজসাহী এবং কলিকাতা ভিন্ন ভারতের অন্য কোন্ স্থান দেখিবার আমার সুযোগ তৎপূর্ব্বে হয় নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিতে হইত এবং তাহা বর্ত্তমান সময়ের "ঐচ্ছিক" (optional) নহে, "বাধ্যতামূলক" (compulsory) ছিল; স্কুল হইতে কলেজ পর্য্যন্ত ইতিহাস পড়িতেই হইত, কেবল বি-এ পড়িবার সময়ে ঐচ্ছিক ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত। ইতিহাস শুনিয়াছি অনেক ছাত্রের ভাল লাগে না, আমার ভাল লাগিত; নাটক নভেল পড়িতে যেমন অনেকের ভাল লাগে, ইতিহাস আমার তেমনই ভাল লাগিত। সময় পাইলেই স্কুল কলেজের পাঠ্য ব্যতীত অনেক বড় বড় ইতিহাসের কেতাব কলেজ লাইব্রেরি হইতে আনিয়া পড়িতাম, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে আমি অধিক আনন্দলাভ করিতাম। সেই সকল ইতিহাসে বর্ণিত ভারতের নানা স্থানের কথা, মোগল-পাঠানের দিল্লী আগ্রার কথা, মুসলমান শেষ স্বাধীন নরপতির লক্ষ্ণৌয়ের কথা, শিবাজীর বাহুবললব্ধ পশ্চিম ভারতের গিরি-পরিবেষ্টিত পুণা সেতারার বৃত্তান্ত, রাজ-

পুতের রাজওয়াড়ার কাহিনী পড়িতে পড়িতে সেই সকল দেশ দেখিবার প্রবল ইচ্ছা আমার মনে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে সুযোগ যখন আসিল, সত্য সত্যই যখন ভারতের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বারাণসীতে, মোগলের লীলা-নিকেতন দিল্লী আগ্রায় গিয়া পঁহুছিলাম, তখন মাতৃ-আদেশ সত্ত্বেও নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আর অধিক বিলম্ব করিলে মাতা ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, সেই ভয়ে সেবারে দিল্লী হইতেই দেশে ফিরিলাম। ইচ্ছা রহিল যথাসম্ভব সত্বর একটু সুযোগ করিয়া লইয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িব।

বাড়ী আসিয়া একটু বিপদাপন্ন হইলাম। আমার একবিংশতিবর্ষ পূর্ণ হইবার আর এক বৎসর মাত্র বাকি। মাতা আদেশ করিলেন, "জমীদারী কার্য্য শিক্ষা কর, —আর অল্প দিবস পরেই যখন কার্য্যভার তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তখন তৎপূর্ব্বে আমাকে সাহায্য কর, সেই উপলক্ষেই তোমার শিক্ষা হইয়া যাইবে।" মানুষ ভাবে এক, হয় আর!

উপায় নাই, মাতার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতেই হইবে, এবং বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবা মাত্রই পুনরায় ভ্রমণার্থ বাহির হইবার উপযুক্ত কারণও খুঁজিয়া পাইলাম না। মা যদি অনুমোদন না করেন, তবে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করিবার মত সাহস আমার কোন কালেই হয় নাই। আজ কাল শুনিতে পাই যে, পিতা মাতার ইচ্ছা এবং আজ্ঞার প্রতিকূলেও কার্য্য করা স্বাধীনচেতার লক্ষণ, গুরুজনের আজ্ঞা পালন নাকি "মানসিক দাসত্বের" অপর এক নাম। আমরা সেকালে শিক্ষকদিগের নিকট যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, তাহাতে বরং "মানসিক দাসত্ব"রই আড়ম্বর কিছু অধিক মাত্রায় ছিল। নিরুপায় হইয়া মাতৃ-আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইলাম, কিছু কালের জন্ত ভ্রমণেচ্ছাকে কায়ক্লেশে দমিত রাখিতেই হইল। নিত্য প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে জমানবীশ, সুমারনবীশ, মুনসী প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ বৃহৎ বৃহৎ খাতা-পত্র লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। জমাওয়াশীল বাকি, একযায়, তেরিজ, বাজিজ, একওয়ান, মিসল্ত বংখাস্ত, আদায় তহশীল, ইরসাল প্রভৃতি সেরেস্তার প্রচলিত নামগুলি আয়ত্ত করিতেই আমার বহু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, কারণ আসল কথা এই যে, উহাতে আমার মন ছিল না, সর্ব্বদাই ভাবিতাম, কি সুযোগে পুনরায় বাহির হইব, কত দিন পরে সে সুযোগ আসিবে। কর্ম্মচারিগণ আসিয়া আমার সম্মুখে কাগজ খুলিয়া পড়িয়া যাইতেছে, আমি দিগন্তের দিকে চক্ষু দিয়া দেশান্তরের কথা ভাবিতেছি। এরূপ অবস্থায় শিক্ষা কত দ্রুত অগ্রসর হয় তাহা আমার পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। প্রণয়ার্ত্ত নর-নারী যেমন প্রিয়জনের চিন্তায় নিরন্তর তন্ময় হইয়া থাকে, আমারও প্রায় তদ্রূপ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। নূতন প্রেমের মত নূতন দেশ দর্শনের স্পৃহা আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, জমা-ওয়াশীল বাকির জীর্ণ জটিল খাতার দিকে মন কি দেওয়া যায়?

যাহা হউক কোনরূপে দিন কাটিতে লাগিল—দিন ত কাহারও সুখ দুঃখের জন্ত বসিয়া থাকে না। ক্রমে ক্রমে বৎসরাধিককাল কাটিয়া গেল। ৺শারদীয় পূজার পরে এক অক্টোবরের ৯ই তারিখে আমার একবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল। প্রথানুসারে দৈব-কর্ম্ম ও রাজবংশের বিধি-বিধানমত উৎসবান্তে কার্য্যভার আমার উপরে সমর্পণ করতঃ মাতা নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্মে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। বিষয়-কর্ম্ম জটিল এবং তাহাতে আনন্দও বিশেষ নাই, তবে কর্ত্তব্য করিতেই হইবে বলিয়া যথাসাধ্য তাহাতে মন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিছু কালের জন্ত দেশ ভ্রমণার্থ বাহির হইবার ইচ্ছা মন হইতে দূর করিতে হইল, কারণ বিষয়-কর্ম্মে আমি নূতন ব্রতী, কর্ম্মচারিগণ আমাকে উহাতে নিয়ত নিবিষ্ট রাখিবার জন্ত সমস্ত ব্যাপারেই আমার মতামত লইতে লাগিলেন, অধিক অবসর পাইবার আর উপায় রহিল না।

এই ভাবে যে সময় কাটিয়া গেল তাহা নিতান্ত নগণ্য নহে; ইতিমধ্যে আমার একটি পুত্র সন্তানের

জন্ম হইল। জন্মের প্রায় তিন মাস পর হইতেই নবজাত শিশু ইন্‌ফ্যান্টাইল লিভার রোগে ভুগিতে লাগিল, অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুর প্রাণ রক্ষা হইল না। আমার মাতৃদেবী এবং শিশুর জননী শোকে নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের মাত্রা কিছু অধিক। ডাক্তারগণ বলিলেন ম্যালেরিয়াই ইনফ্যাণ্টাইল লিভার জন্মাইয়াছে, ভবিষ্যতে অপর শিশুর জন্ম হইলে তাহাকে রোগের পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করিতে হইবে। চিকিৎসকগণের উপদেশ রহিল বটে কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। কিছুকাল পরে একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, সে কন্যাটিরও সাতমাস বয়সের সময়ে যকৃতের দোষে মৃত্যু ঘটিল। এবার ডাক্তারগণ বলিলেন যে, শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই শিশুর জননীকে স্থানান্তরিত না করিলে সন্তান রক্ষা করা কঠিন হইবে। উপর্য্যুপরি পৌত্র ও পৌত্রীর মৃত্যুতে মাতা ঠাকুরাণীর শোকের অবধি রহিল না। ডাক্তারগণের ব্যবস্থামত ভবিষ্যতে শিশু জন্মিবার পূর্ব্বেই আমার স্ত্রীকে স্থানান্তরিত করিবার বিষয়ে তিনি আর দ্বিধা করিলেন না। সকলের পরামর্শমত আমার স্ত্রীর কলিকাতা আসাই স্থিরীকৃত হইল, কেন না কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার বিশেষ আধিক্য নাই, এবং শিশুর কোন ব্যাধিপীড়া হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সাহায্যও পাওয়া যাইতে পারিবে। মাতা গৃহ-বিগ্রহ শ্যামসুন্দরের সেবা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অধিককাল থাকিতে পারিবেন না, সুতরাং স্ত্রীর সহিত আমাকেই আসিতে হইল। যে সকল ঘটনার কথা বলিলাম সে সমস্ত ঘটিতে প্রায় তিন বৎসরের অধিককাল কাটিয়া গেল। যখন কলিকাতায় আসিলাম তখন আমার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর হইবে। সেই সময় হইতে রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল। আজ যে শাসন পরিষদে বহু সদস্য নির্ব্বাচিত হইতেছেন, সে দিনে সমস্ত বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা হইতে পরিষদে পাঁচজন মাত্র সদস্য লওয়া হইত, এবং সেই পাঁচজনও বর্ত্তমানের ন্যায় জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ছিলেন না, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে সভ্যগণের দ্বারা মনোনীত হইতেন মাত্র, তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন গভর্ণমেণ্ট। সুরেন্দ্র বাবু (অধুনা স্যর সুরেন্দ্রনাথ) আমাকে সদস্য পদ প্রার্থী হইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ আরম্ভ করিলেন। অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতি বৎসরের যুবকের রাজনীতির অভিজ্ঞতা সে দিনে প্রায় কিছুই হইত না। আমি যতই সভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, সুরেন্দ্রবাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয্য ততই বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল ফলতঃ রাজসাহী বিভাগের মিউনিসিপালিটি সমূহ আমাকেই মনোনীত করিল এবং তদানীন্তন ছোটলাট স্যর চার্লস এলিয়ট সে মনোনয়ন মঞ্জুর করিয়া লইলেন। তদবধি লর্ড কারমাইকেলের সময় পর্য্যন্ত আমি একাধিকবার শাসন পরিষদে আসিয়াছি; কিন্তু সে সকল রাজনীতির নীরস কথায় পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার ইচ্ছা আমার নাই।

কলিকাতা আসিবার কিছুকাল পরে আমি একবার পীড়িত হইলাম। পীড়া বিশেষ কিছু নহে, কাণের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ হইতে লাগিল এবং ব্রণের ব্যথা ভয়ঙ্কর ও সেই ব্যথার সন্তাপে জ্বর। ডাক্তারগণ বলিলেন স্বাস্থ্য মন্দ হইয়াছে—তাঁহাদের ভাষায় বলিলেন, "Your health is below par." ইহার অর্থ যাহাই হউক, তাঁহারা বলিলেন "Go for a change". আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ করিবার পথ পাইলাম। চিকিৎসকগণ বলিলেন, "সমুদ্রতীরে যাও।" সে দিনে পুরীর ফ্যাসান প্রচলিত হয় নাই, ভাইজ্যাগও হয়ত তাদৃশ সুপরিজ্ঞাত ছিল না। সমুদ্রতীরে থাকিবার স্থান প্রায় কোথাও সে দিনে পাওয়া যাইত না—ইষ্ট কোষ্ট রেলওয়ে তখন খুলে নাই, গোপালপুরের নামও সে দিনে কেহ জানিত না। সুতরাং বোম্বাই সহরই একমাত্র গন্তব্যস্থান, যাহা সমুদ্রতীরেও বটে এবং থাকিবার মত স্থানেরও সেখানে অভাব নাই, কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে বোম্বাই নগরী কলিকাতার সমকক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, অনেকাংশে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই ভাল স্থান ইহাও অনেকের মত।

সকল দিক দিয়াই আমার দীর্ঘকালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সুযোগ হইতে লাগিল, কারণ, ছত্রপতি শিবাজির বাহুবলে যে কোঙ্কণ গিরিমালা পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডে হিন্দু-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, সে ভূভাগ এই বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত। ভূগোল ইতিহাস এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "জীবন প্রভাত" প্রভৃতি উপন্যাসে, শিবাজী মহারাজের কোঙ্কণ প্রদেশের গিরি-দুর্গাবলীর অনেক কথা পড়িয়াছিলাম এবং সেই তরুণ বয়স হইতেই মহারাষ্ট্র দেশ এবং সেই দেশবাসিগণকে দেখিবার এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। শুনিয়াছিলাম কোঙ্কণ প্রদেশেই আমাদের চিরদিনের চিরসংস্কারের মলয়াচল, যেখানে চিরবসন্ত চিরবিরাজমান রহিয়াছে, যে মলয়াচলে ভীলপুরন্ধ্রী, চন্দনতরু ইন্ধন রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

শুভক্ষণ স্থির করাইয়া, অপরাহ্ণে যাত্রা করিয়া গৃহান্তরে রহিলাম, পরে রাত্রি নয়টার সময়ে পাঞ্জাব মেলে রওনা হইলাম। সেকালে বোম্বাই মেল বলিয়া পৃথক কোন গাড়ী ছিল না—বেঙ্গল নাগপুরের লাইন তখন খুলে নাই। তাহার কিছু দিবস পরে খুলিলেও, নূতন লাইনে পান ভোজনাদি বিষয়ে নানা অসুবিধা বলিয়া অনেকে সেদিক দিয়া দক্ষিণাপথে যাইতে চাহিত না। এখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর বোম্বাই মেল একখানি স্বতন্ত্র গাড়ী এবং উহা শিউকী হইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আমি যে দিনের কথা বলিতেছি সেদিনে বোম্বাইয়ের যাত্রীকে এলাহাবাদ হইয়া যাইতে হইত। গাড়ী কিছুকাল এলাহাবাদে দাঁড়াইয়া পুনরায় নাইনী জংশন দিয়া জব্বলপুর হইয়া যাইত।

আমার শরীর সে সময়ে খুব সবল ছিল না, সুতরাং পরামর্শ হইল যে, পথে বিশ্রাম করিতে করিতে যাওয়াই কর্ত্তব্য। এখান হইতে রাত্রি নয়টায় যাত্রা করিয়া পরদিন প্রভাতে পাটনায় নামিলাম। কিন্তু ষ্টেসন মাষ্টার বলিলেন, পাটনায় থাকিবার তেমন ভাল স্থান পাওয়া কঠিন, যে সকল ভদ্রলোক দুই একদিন থাকিতে চাহেন তাঁহারা বাঁকীপুরে অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া থাকেন। আমরাও তাহাই করিলাম। পাটনা হইতে বাঁকীপুরে গাড়ী করিয়া গিয়া ডাকবাঙ্গালায় আশ্রয় লইলাম। পাটনা পুরাতন স্থান হইলেও, সেদিনে সেখানে দর্শনীয় বিশেষ কিছু ছিল না। বাঁকীপুরও প্রায় তদ্রূপ, সুতরাং সেখানে দুই দিন মাত্র থাকিয়া এলাহাবাদে যাইবার ব্যবস্থা করিলাম। আমার সঙ্গী একজনকে আগে পাঠাইয়া একটি বাংলো ভাড়া করাইলাম, আমরা গিয়া সেই ভাড়ার বাংলাতেই উঠিলাম। আসবাবপত্র সে বাংলাতে বিশেষ কিছু ছিল না, তবে খাটিয়া এবং ভাঙ্গা দুই একখানি চেয়ার যাহা ছিল তাহাতেই কায চলিয়া গেল। এলাহাবাদে আমার এক মাতৃষ্বসা থাকিতেন, এখনও আছেন। আমার মেশো মহাশয়ের নাম ছিল ডাক্তার এস, পি, রায়। তিনি এলাহাবাদের খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন, এখন স্বর্গগত। মাসিমার সঙ্গে যখন দেখা করিতে গেলাম তখন অন্যত্র বাসা লইয়াছি শুনিয়া অনুযোগ দিতে লাগিলেন। আমি কহিলাম "সঙ্গে অনেক লোক আছে, তোমার বাসায় স্থান হইবে না বলিয়া বাসা ভাড়া করিয়াছি।" সে কথা কে শুনে? তাঁহার অনুযোগ আর ফুরাইতে চাহে না। যাহা হউক, দুই বেলাই তাঁহার বাড়ীতে আহারের প্রতিশ্রুতি লইয়া তবে আমাকে অব্যাহতি দিলেন। ডাক্তার এস, পি, রায় সেখানে সুপরিচিত, তিনি এলাহাবাদের তদানীন্তন খ্যাতনামা বহুলোকের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। সে সকল বন্ধু জনের মধ্যে আজ অনেকেই লোকান্তরে গিয়াছেন, যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে হয় কলিকাতায় নতুবা এলাহাবাদে কিংবা অপর কোন তৃতীয় স্থানে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

এলাহাবাদে চারি পাঁচ দিন রহিলাম। এই কয় দিনেই আমার অসুস্থতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া গেল। মেশো মহাশয় আমার শারীরিক অবস্থা শুনিয়া নিজে ঔষধ দিলেন এবং বোম্বাই যাইবার সময়ে অনেকগুলি প্রেশক্রপসন আমার সঙ্গে দিয়া সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করিবার জন্য

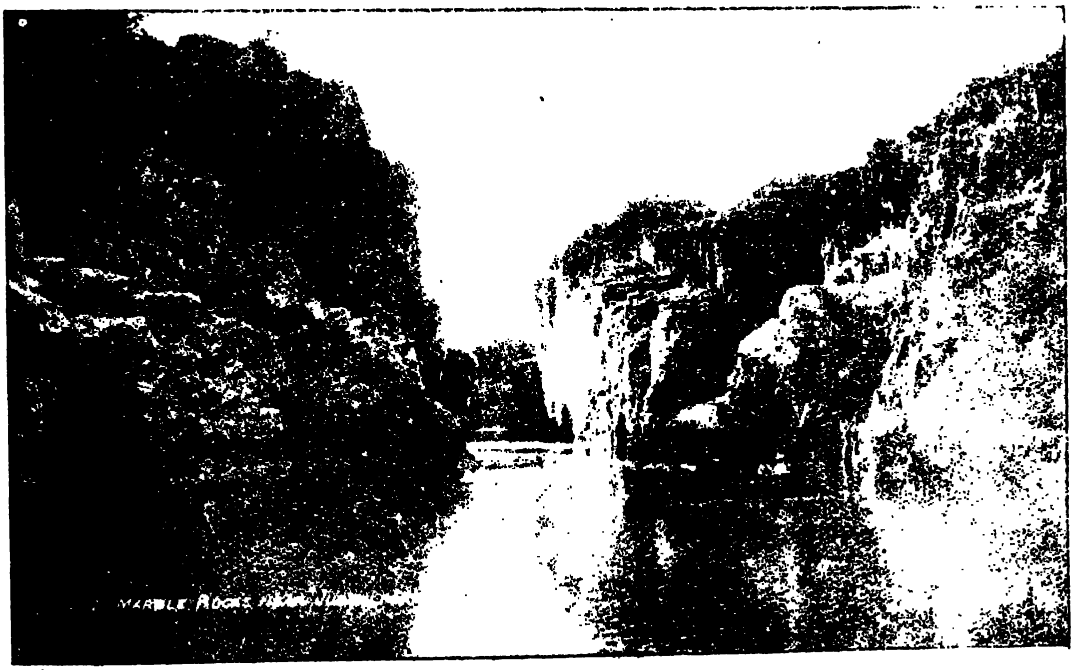
বারবার অনুরোধ করিলেন। সুদূর বিদেশে অসুস্থ শরীরে কষ্ট না পাই সেইজন্য বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ পার্শী ডাক্তার বাহাদুরজীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া আমার সঙ্গে দিলেন। বলিলেন প্রয়োজন হইলে তাঁহাকেই যেন ডাকি। ডাক্তার বাহাদুরজী মেশোমহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, সুতরাং আমার চিকিৎসা তিনি যত্ন সহকারে করিবেন, সেইজন্য এই পরিচয় পত্র মেশোমহাশয় নিজে উদ্যোগী হইয়া দিয়াছিলেন। সে পত্র ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ স্থান পরিবর্ত্তনেই আমার শরীর ক্রমশঃ ভাল হইতেছিল, ঔষধ পত্রের আর বিশেষ কোন আবশ্যক হইল না। এলাহাবাদ পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি, সুতরাং সেবারে আর অধিক ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই। পথের প্রয়োজনীয় কোন কোন জিনিস, যাহা কলিকাতা হইতে লইয়া যাই নাই, সেইরূপ কিছু কিছু সামগ্রী কিনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সাপুরজী নামক পার্শী দোকানদারের দোকান হইতে সে সকল ডাক্তার রায়ের সাহায্যে ক্রয় করা হইল। দুই তিন দিবস খস্রুবাগটি পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, কারণ খস্রুবাগের গোলাপ ফুল পশ্চিমাঞ্চলে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ তাদৃশ বৃহৎ এবং সদ্‌গন্ধযুক্ত গোলাপ মধুপুর বৈদ্যনাথ অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথাও হয় কিনা সন্দেহ। রাজপুত্র খস্রুর সন্দেহজনক অপঘাত মৃত্যুর বিষাদ কাহিনী তাঁহার কবরের সহিত বিজড়িত থাকায় সমগ্র খস্রুবাগটিকে যেন শোকাচ্ছন্ন ও ম্লান করিয়া রাখিয়াছে—চিরবন্দী ও দুঃখী রাজকুমারের হৃদয় বেদনা যেন রক্ত গোলাপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই এই শোকমগ্ন নিভৃত স্থানটিতে বারবার যাইবার প্রলোভন আমি দমিত করিতে পারিতাম না। জব্বলপুর হইয়া যাইতে হইবে, ডাক্তার রায় জব্বলপুরে নামিয়া নর্ম্মদার জল-প্রপাত ও মর্ম্মর-শৈল দেখিয়া যাইবার উপদেশ বারবার করিয়া দিলেন। উহা নিষ্প্রয়োজন ছিল, কারণ মারের গাইড ও কেনের ইণ্ডিয়া হইতে সে সকল তথ্য আমি পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, এবং জব্বলপুরে নামিবার সঙ্কল্প আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

চারি পাঁচ দিবস এলাহাবাদে থাকিয়া এক দিন অপরাহ্ণের যে গাড়ীতে জব্বলপুরে রওনা হইলাম। সে ট্রেণখানি প্রাতে গিয়া জব্বলপুরে পঁহুছিত। সকাল বেলা নূতন স্থানে পঁহুছিলে থাকিবার স্থান স্থির করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না, এবং সমস্ত দিবস ঘুরিয়া বেড়াইবার দীর্ঘ সময় পাওয়া যাইবে, সেইজন্য ডাকগাড়ীতে না গিয়া এই অপেক্ষাকৃত মন্থর গতির ট্রেণই পছন্দ হইল, কারণ সেদিনে ডাক গাড়ী জব্বলপুরে যাইত প্রায় প্রায় রাত্রি শেষে। গাড়ী যখন জব্বলপুরে পঁহুছিল তখন ভোর হইয়া গিয়াছে, বেলা প্রায় সাতটা হইবে। অন্য কোথাও বাসার চেষ্টা না করিয়া রেল-ষ্টেশনেই রহিলাম। জিনিষ-পত্র যাহা সঙ্গে ছিল তাহা ওয়েটিংরুমে রাখিয়া ষ্টেশনেই আহারাদির ব্যবস্থা করিলাম এবং শীঘ্র শীঘ্র সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লইয়া টাঙ্গা যোগে ভেড়াঘাটের জল-প্রপাত ও নর্ম্মদার গর্ভোত্থিত শুভ্র শৈলশ্রেণী দেখিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

জব্বলপুর রেলষ্টেশন হইতে ভেড়াঘাট অনেক দূরে, প্রায় ১১।১২ মাইল পথ হইবে। টাঙ্গাগুলি একটু অদ্ভুত রকমের গাড়ী। সম্মুখে গাড়োয়ানের স্থান, তাহার বামপার্শ্বে একজন বসিতে পারে, এবং পশ্চাতে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া দুইজনের স্থান হয়। গাড়ী সম্মুখে চলিতেছে, আরোহী পশ্চাতের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিলে, (জানি না সকলের হয় কি না) আমার বড়ই অসুবিধা হয়; মনে হয় বুঝি গাড়ী হইতে পিছলাইয়া পড়িয়া যাইব। সেই জন্য আমি কোচোয়ানের পার্শ্বেই বসিলাম। আমার সঙ্গীদিগের মধ্যে দুইজন পশ্চাতে স্থান করিয়া লইয়া নিরুদ্বেগে মহানন্দে গল্প করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম কোন অসুবিধা হইতেছে কি না। তাঁহারা বলিলেন, অসুবিধা দূরে থাকুক, সুবিধাই হইয়াছে; কারণ তাঁহারা অশ্ব এবং অশ্বচালকের গাত্রগন্ধ হইতে দূরে আছেন। কথা সঙ্গত, কারণ ঐ প্রাণিযুগলের দেহ হইতে যে গন্ধ বাহির হইতেছিল, আতর, গুলাব, কস্তুরি, কুঙ্কুম বা অগুরু-

চন্দনের সহিত তাহার তুলনা কিছুতেই হইতে পারে না। টাঙ্গার অশ্বগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত যায়; এগার বার মাইল পথ যাইতে প্রায় দেড়ঘণ্টা সময় লাগিল, ঠিকা গাড়ীর পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

নদীতীরে যেখানে ডাকবাঙ্গলা আছে, টাঙ্গাগুলি সাধারণতঃ সেইখানেই দাঁড়ায়। আমাদের টাঙ্গাও সেইখানে গিয়াই দাঁড়াইল। স্থানটি বড়ই মনোরম। "বিন্ধ্যপাদমূলে, উপল-ব্যথিত গতি," কলনাদিনী রেবা প্রবাহিতা, উভয়তীরে শ্বেতশৈলমালা তাহাদের উচ্চশির উর্দ্ধে তুলিয়া দিয়া নর্মদার স্বচ্ছ নীরে নিজ প্রতিবিম্ব যেন নীরবে নিরীক্ষণ করিতেছে; নৃত্যপরা নটীর নূপুরশিঞ্জিতের ন্যায় প্রস্তর প্রতিহত নির্ঝরের ঝর্ঝর



জব্বলপুর—মর্ম্মর শৈল

রব এবং কচিৎ বিহঙ্গ কাকলী ব্যতীত আর সমস্তই সেখানে যেন নিস্তব্ধ ধ্যাননিরত।

আমাদের টাঙ্গা আসিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে গাইড গাইড রবে অনেকগুলি লোক আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। আমরা তাহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত চতুর এবং বাক্‌পটু দুইজনকে আমাদের গাইড পদে বরণ করিয়া লইলাম। ডাকবাঙ্গালায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গাইডের সঙ্গে রওনা হইলাম। যাহাকে ভেড়াঘাট বলে, অর্থাৎ নর্ম্মদার জলপ্রপাত যেখানে বৃহৎ শিলাসমূহের উপর দিয়া নৃত্য করিতে করিতে ঘোর রবে চলিয়াছে, ডাকবাঙ্গলা হইতে সে স্থান প্রায় এক মাইল পথ। গাইড ডাণ্ডি আনিবার ব্যবস্থা করিতেছিল, আমরা তাহাকে নিষেধ করিয়া পদব্রজেই যাত্রা করিলাম। কিন্তু দেখিলাম কাষ ভাল করি নাই। এক মাইল পথ কিছুই নহে, কিন্তু যেখান দিয়া যাইতে হয় উহা পথ নহে, নতোন্নত উপল-বিকীর্ণ বন্ধুর ভূমিখণ্ড, যাহার উপরে পাদুকা সহ গমন অনভ্যস্তের পক্ষে কেবল কষ্টদায়ক নহে, বিপজ্জনকও বটে। অতি সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ঐ ব্যাপার এতই শ্রমসাধ্য যে ডিসেম্বর মাসের শীতেও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে হইল। আমরা যে কয়জন ছিলাম তাহার

মধ্যে গাইড দুইজন ছাড়া সকলেরই সমান অবস্থা। দুই একজন, মধ্যে মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম না করিয়া কিছুতেই যাইতে পারিলেন না। স্বভাবতই আমার গতি ধীর, অত পথ চলা আমার পক্ষে অসম্ভব, বিশেষতঃ আমি এই অসমতল উপলাস্তীর্ণ ভূমির উপর বহু সাবধানে চলিতেছিলাম বলিয়া আমার সঙ্গী সকলেই প্রথমে হাসিতে আরম্ভ করিলেন। আমি সে বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করিতেছিলাম। কিছুকাল পরেই যখন সকলেই সমান অবস্থাপন্ন তখন আমার হাসিবার সময় আসিল। আমি প্রতিশোধ ভাল করিয়া লইব বলিয়া হাসিলাম না। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার দিকে হস্তপ্রসারণ করিয়া দিয়া বলিলাম, "আসুন, আমার হাতের উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে চলুন।" বলাবাহুল্য তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন, কিন্তু তথাপি নির্লজ্জের মত আমার হাতে ভর করিয়া কিছু দূর গেলেন।

এক মাইল পথ যাইতে আমাদের প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিল। নর্ম্মদার প্রপাতের নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বেই নৃত্যশীল নির্ঝরের শিলাপ্রতিহত, ঊর্দ্ধে ক্ষিপ্ত শীকররাশি বায়ুবাহিত হইয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গে পড়িতে লাগিল। পরিধেয় শীতবস্ত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণই ভিজিয়া গেল, কিন্তু সেই শীকর-সম্পাত, শ্রমজল পরিপূর্ণ দেহে যেন অমৃত বৃষ্টির ন্যায় বোধ করিতে লাগিলাম। পাদুকা খুলিয়া প্রপাতের সন্নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল জলের মধ্যে আমরা সকলেই নামিয়া পড়িলাম। হস্ত-পদ, মুখ মস্তক, শরীরের ঊর্দ্ধার্দ্ধ প্রায় সমস্তই শীতল জলে ধৌত করিয়া লইবার পরে, শ্রান্তদেহে যেন নবজীবন সঞ্চার হইল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বহুক্ষণ প্রপাতের সন্নিকটবর্ত্তী শিলাতলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি অপনোদিত হইলে, ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু এবারে গাইড আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া নিষেধ সত্বেও ডাণ্ডি আনাইয়াছিল। আমরা পালা করিয়া সকলেই এক একবার ডাণ্ডিতে চড়িলাম, সেইজন্য প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রাণান্ত পরিশ্রম হয় নাই।

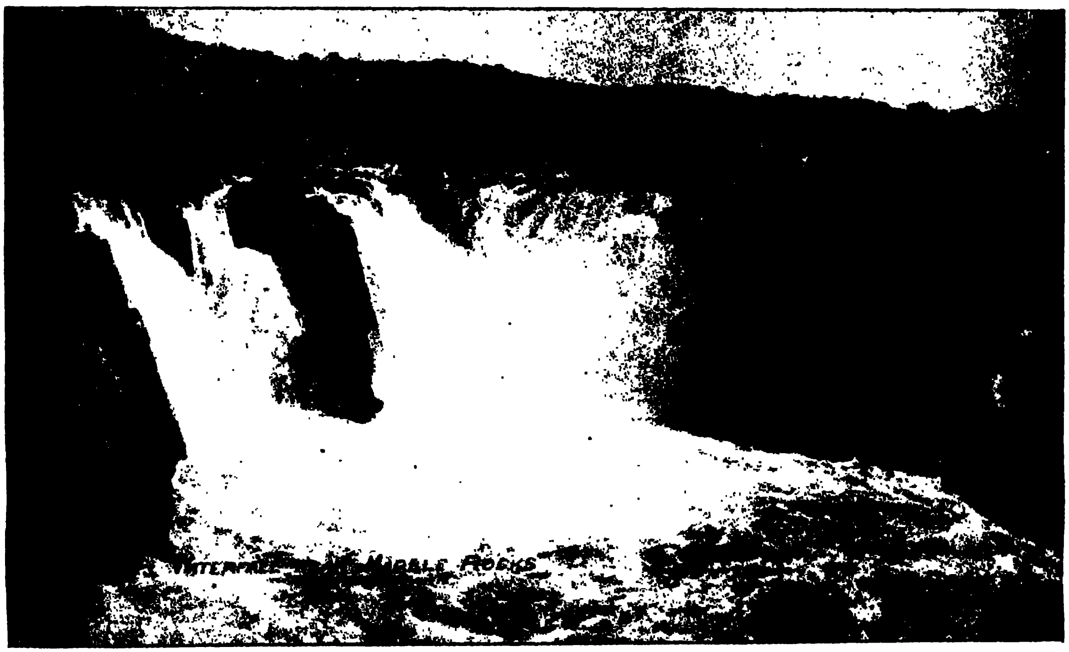
মার্ব্বল রক্ দেখিতে নৌকায় কিছুদূর যাইতে হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নৌকা ডাকবাঙ্গলার নিকটেই থাকে, মাঝিমাল্লা ঠিক করিতে এক মিনিট সময়ও যায় না, কারণ ভ্রমণকারী সেখানে উপস্থিত হইলেই গাইড, ডাণ্ডি ওয়ালা, মাঝিমাল্লা সকলেই সেখানে সমবেত হয়। ভ্রমণকারীদিগের নিকট হইতে বৎসরে ইহারা নিতান্ত কম উপার্জ্জন করে না।

নৌকাখানি দেখিতে সুন্দর, পাঁচ ছয়জন লোক বেশ আরাম বসিতে পারে। মাল্লাগণ দাঁড় টানে, মাঝি পশ্চাতের গলিতে বসিয়া হাল ধরে। দাঁড় এবং হাল ইংরাজী ধরণের। ক্ষুদ্র নৌকা অথচ পাঁচ ছয়খানি দাঁড় বসাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে বর্ষার সময়ে নদীর স্রোতোবেগ অত্যন্ত প্রবল হয় স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা লইতে হইবে, কারণ শ্বেত শৈলশ্রেণী দেখিতে যাইতে উজান বাহিতে হয় সুতরাং দাঁড়ির সংখ্যা অধিক না হইলে যাওয়া দুষ্কর। নৌকায় উঠিবামাত্র মাঝি বলিল, মুখের সিগারেট ফেলিয়া দিতে হইবে। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম, মার্ব্বল রকের গায়ে মধুমক্ষিকার চাক রহিয়াছে, চুরুটের ধূম দেখিলে তাহারা সেই ধূম উদ্গিরণকারী লোককে আক্রমণ করে। একবার দুইজন ইংরাজ সেনানী মার্ব্বল রকের নিকট বন্দুক লইয়া শীকার করিতেছিল, মক্ষিকাগণ তাহাদের মধুচক্র আক্রান্ত হইতেছে ভাবিয়া ঐ শীকারিদ্বয়কে আক্রমণ করে। সে আক্রমণ এত ভীষণ যে সেনানী দুইজন নিরুপায় হইয়া নর্ম্মদার জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং প্রবল স্রোতোবেগে নদীগর্ভস্থ শিলাসমূহে আহত হইয়া প্রাণ হারায়। পরে দেখিলাম, সৈনিকদ্বয়ের কবর সেখানে রহিয়াছে এবং প্রস্তরফলকে তাহাদের শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর আমূল বৃত্তান্ত লিখিত আছে। আর একখানি নোটিশ বোর্ডে, মর্ম্মরশৈলের সন্নিকটে ধূমপান বা বন্দুকের শীকার নিষিদ্ধ বলিয়া লেখা আছে। আমি মাঝির নিষেধেই মুখের চুরুট নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া, নিতান্ত ক্ষুব্ধ

বালকের মত নৌকায় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া রহিলাম।

দেখিলাম, নর্ম্মদার স্রোতোবেগ নিতান্ত কম নহে; স্রোতের প্রতিকূলে যতই অগ্রসর হইতেছিলাম, স্রোতের বেগ ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেই ডিসেম্বরের শীতেও দাঁড়িগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিল। প্রায় একমাইল পথ অতিবাহনের পরে নদী ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। উভয় পার্শ্বে দেখিলাম, তুষারধবল শৈলমালা আকাশে শির উত্তোলন করিয়াছে। কি সুন্দর সে দৃশ্য! পর্ব্বতের যে অংশ শ্বেত নহে, সে অংশ নানাবিধ বৃক্ষলতাগুল্মে পরিপূর্ণ, কিন্তু শৈলমালার শ্বেতাংশে তরু, তৃণ, লতা কিছুই নাই, কেবল "কুন্দ-শুভ্র নগ্নকান্তি" শ্বেত শিখরী অস্তগমনোন্মুখ রবিরশ্মিসম্পাতে ঝলমল করিতেছে। শুক্লপক্ষের শেষার্দ্ধের পরিপুষ্ট চন্দ্রকিরণ যখন এই শ্বেতশৈলের শিখরদেশে বর্ষিত হয়, তখন ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে।

প্রাচীনকালে এই বিন্ধ্যশিখরীর পাদমূলে অনেক দেবালয় ছিল, এবং সে সকল দেবমন্দিরের প্রস্তরে খোদিত কারুকার্য্যের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে অদ্যাপি দুই একটি দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সকলগুলিই জীর্ণ, ভগ্ন, পরিত্যক্তপ্রায়। এই স্থানের লোকেরা বলে যে, ঔরঙ্গজীব যখন হিন্দুদেবালয় ধ্বংস কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তখন এই দূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সীমান্তস্থিত মন্দিরগুলিও তাঁহার রোষদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। জানি না ইহার মধ্যে সত্য কতখানি আছে; তবে সত্য হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ যখন বৃন্দাবনের গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, মথুরার কেশব, বারাণসীর বিশ্বনাথ কেহই রাজরোষ হইতে অব্যাহতি পান নাই, তখন বিন্ধ্য-পাদমূলের "চৌষট্টি যোগিনী"ই বা মুক্তি পাইবেন কোন শক্তির বলে? এই চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির-প্রাঙ্গণ বিস্তীর্ণ, এবং সেই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর-প্রাচীর গাত্রে যে সকল অপূর্ব্ব খোদিত কারুকার্য্য আজও রহিয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আর্য্যাবর্ত্তে



নর্ম্মদা জলপ্রপাত

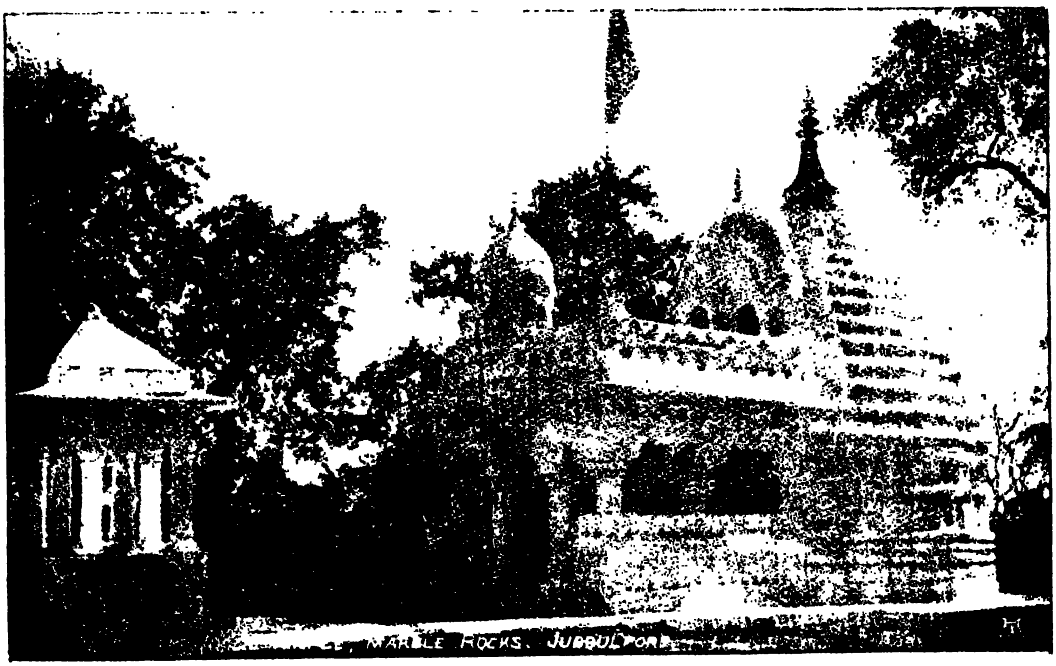
নানা আবর্ত্তের বেগে হিন্দুর দেব-মন্দিরগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর রোষ বহ্নি তাদৃশ প্রজ্জ্বলিত হইবার অবকাশ এবং অবসর পায় নাই। সেই জন্ত আজও বিন্ধ্যের দক্ষিণে হিন্দুর কীর্ত্তিচিহ্ন যাহা আছে, দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বেও এই জাতির ধর্ম্মপ্রাণতা কত অধিক পরিমাণে ছিল এবং কত সুদীর্ঘ সময়ে অজস্র অর্থব্যয়ে এবং অক্লান্ত-পরিশ্রমে এই সকল কারু খচিত গগনস্পর্শী দেবায়তন নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমি একাধিক বার দাক্ষিণাত্যে গিয়াছি, বিন্ধ্য হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নগরী দেখিয়াছি, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, রামেশ্বর, কন্যাকুমারী প্রভৃতি স্থানে যে সকল বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত অভ্রংলেহী দেবায়তন দেখিয়াছি, তাহা আজও জগতের বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে। কেবল অর্থব্যয়ে বা রাজশক্তির প্রভাবে তাদৃশ সময় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমার মনে হয়, যে সকল নৃপতি ও শ্রমজীবী এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহাদের মন প্রাণ অন্তর দিয়া এই ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা না করিলে এই বিরাট ব্যাপার নিষ্পন্ন করা মানুষের সাধ্য হইত না। ধর্ম্মে আস্থা এবং ধর্ম্মার্থে স্বেচ্ছাকৃত শ্রম ব্যতীত অজন্তা ও ইলোরার বিপুল গুহামন্দির নির্ম্মাণ মনুষ্য শক্তির অতীত ব্যাপার। এই সকল মন্দির ও পর্ব্বত গুহার ভিত্তি গাত্রে ও স্তম্ভে যে কারুকার্য্য রহিয়াছে তাহার এক এক ক্ষুদ্রাংশের কায করিতে বোধ করি এক এক জনের জীবন কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ দেবায়তন সমাধা করিতে ভারতের শিল্পী সম্প্রদায় কত পুরুষ ধরিয়া কায করিয়াছে কে জানে? যে সকল দেব মন্দিরের উল্লেখ করিলাম তাহাদের তুলনায় জব্বলপুরের চৌষট্টি যোগিনী বা উত্তর ভারতের বর্ত্তমান যে কোন মন্দির নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নর্ম্মদার জল প্রপাত, মর্ম্মর শৈল, ভগ্ন দেব মন্দিরাদি দেখিয়া শ্রান্ত দেহে অপরাহ্ণে ডাকবাঙ্গলায় ফিরিলাম, এবং শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত চা নামক রঞ্জিত উষ্ণোদক পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। ফিরিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছি এমন সময়ে আমাদের ডাক বাঙ্গলার বারান্দা পাথর বিক্রেতায় ভরিয়া গেল। নর্ম্মদার স্রোত-চালিত বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরে নানাবিধ প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় পদার্থ লইয়া তাহারা হাজির হইয়াছে। বিক্রয়ার্থ সামগ্রীর মধ্যে দেখিলাম কাগজ চাপা, কাগজ কাটা (paper knife), সার্টের হাতার বোতাম (sleeve links) এবং নমনীয় প্রস্তর (flexible stone) প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক। প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে কাগজ চাপাই একমাত্র পদার্থ দেখিলাম, এবং সেগুলি বিচিত্র বর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরে, বিচিত্র আকারে নির্ম্মিত; কতকগুলি তাহাই কিনিয়া কোন মতে বিক্রেতাগণের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম। কিন্তু গাইড আসিয়া তাহার 'খাতা' হস্তে দাঁড়াইল। তাহার পারিশ্রমিক যাহা পাইবার তাহা সে পাইয়াছে, এখন চাহিতেছে—"সার্টিফিকেট।" সে যে সমস্ত গাইডগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাইড, সেই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। কি উপায়ে সে আমার পরিচয় সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল জানিনা, বোধ করি সঙ্গীয় কাহারও নিকট হইতে; এবং তাহার বিশ্বাস একজন "জীবন্ত" মহারাজার হস্তাক্ষরে "সার্টিফিকেট" থাকিলে সেই বলে সে সমস্ত সাহেব লোক এবং বড় লোককে ধরিতে পারিবে। দেখিলাম, একটি মাত্র গাইড (দুইজন লইয়া গিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা একই দলের লোক), অথচ লিখিতে হইবে সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এরূপ তুলনায় সমালোচনা করা কঠিন হইল, কিন্তু করি কি? কোন মতে ইংরাজী ভাষার "কারচুপির" সাহায্যে তাহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলাম। ডাণ্ডিওয়ালা, নৌকাওয়ালা, ডাক বাঙ্গালার চৌকিদার সকলকে কোন মতে খুসী করিয়া তথা হইতে ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। সেই রাত্রির মেল ট্রেণেই বোম্বাই রওনা হইবার ইচ্ছা মনে মনে রহিল।

আরও দুই চারি বার জব্বলপুরে গিয়াছি। প্রতি বারেই জল প্রপাত ও শ্বেত শৈল দেখিয়াছি। যে বার

আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া গিয়াছিলাম, সে বার নর্মদা তীরস্থ ডাক বাঙ্গলায় রাত্রি যাপন করিয়াছি; সৌভাগ্য ক্রমে সে রাত্রি পূর্ণিমার রাত্রি ছিল। বীচিবিক্ষুব্ধ নর্ম্মদার বারি রাশির উপরে চন্দ্রের কিরণ সম্পাত দেখিয়াছি, কি অপূর্ব্ব সে শোভা! স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে যে সকল বিপদ হয়, তাহাও হইয়াছে। নর্ম্মদার সলিলে অবগাহন করিবার সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন আমার স্ত্রী! উপায় নাই, স্নানের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেই হইবে, অথচ কানাত দিয়া ঘাট ঘিরিতেও হইবে। কি সর্ব্বনাশ, সে জঙ্গলে কানাত কোথায় পাই? জব্বলপুরে সেই রাত্রে লোক পাঠাইয়া কানাত ভাড়া করাইলাম, ঘাট ঘিরিলাম, পুরোহিত আসিল—সে কি জাতি তাহা শপথ করিয়া বলিতে আমি পারি না, বোধ করি সেও শপথ করিয়া বলিতে পারিত না। যাহা যাহা করণীয় অকরণীয় সমস্ত নিষ্পন্ন হইল। এ সকল করিতে শ্রম ও উদ্বেগ কম হয় নাই; কিন্তু সে সমস্তই বিনা বাক্যে স্বীকার করিয়াছিলাম, কারণ, এই উপলক্ষ্যে নির্ম্মল সলিলা নর্ম্মদার তট ভূমিতে অধিককাল থাকিবার অবসর ও সুযোগ হইয়াছিল।

জব্বলপুরে ইংরাজদিগের একটি ক্লাব আছে, তাহার নাম নর্ম্মদা ক্লাব। এই ক্লাবের ইংরাজগণ শুনিয়াছি সপ্তাহে এক বা দুইদিন এইখানে সমবেত হন। নর্ম্মদার গর্ভ হইতে বাঁধিয়া একটি ব্যাণ্ড ষ্টাণ্ড প্রস্তুত করাইয়াছে, সেখানে বাজনা বাজে। আহার বিহারের জন্য ডাক বাঙ্গলা ব্যতীত আরও একটি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। "জ্যোছনা মত্তা" যামিনী যোগে নর্ম্মদার নির্ম্মল তটে নির্ম্মিত মর্ম্মরাস্তীর্ণ গৃহতলে রেবার শীত সমীর বিতাড়িত সলিলকণা নৈশ ভোজনান্তে নৃত্যপর ইংরাজ দম্পতীর শ্রমাপনোদন করিয়া থাকে এই কথা শুনিয়াছি। বাস্তবিক যে যে ভাবেই জীবন উপভোগ করুক না কেন, একত্রে প্রকৃতির সর্ব্বসম্পদ সমন্বিত স্থান জীবনোপভোগের জন্য নির্ব্বাচিত করিতে হইলে বোধ করি এই স্থানের নামই সর্ব্বাগ্রে মনে আসিবে।



চৌষট্টি-যোগিনীর মন্দির

গাড়ী যথা সময়ে রেল ষ্টেশনে পহুঁছিল। আসিয়া

দেখিলাম, সঙ্গীয় এক ভদ্রসন্তানের প্রবল জ্বর হইয়াছে। সমস্যা হইল যে, ইহার আরোগ্যলাভ পর্য্যন্ত এই স্থানে থাকা, কিংবা বোম্বাই যাওয়া। সঙ্গীয় ডাক্তার বাবু বলিলেন, বোম্বাই যাওয়াই উচিত, কেন না দৈবাৎ জ্বর বৃদ্ধি হইলে বোম্বাই সহরে ডাক্তার ও ঔষধাদির সুবিধা পাওয়া যাইবে।

ডাক্তার বাবুর মতানুসারে রোগী লইয়া যাওয়াই সিদ্ধান্ত হইল; পথে রোগীর সুবিধার জন্য যাহা কিছু করা সম্ভব, সমস্তই করিয়া ডাক্তার বাবুকে রোগীর সঙ্গে এক গাড়ীতেই যাইতে বলিলাম। জব্বলপুর ষ্টেশন হইতে সেকালে গাড়ী শেষ রাত্রিতে ছাড়িত। শীতকালে জব্বলপুরের ঠাণ্ডা কম নহে—রোগীর কামরার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াও ঠাণ্ডা নিবারণ করা কঠিন হইল। র‍্যাগ, কম্বল, লেপ যাহা কিছু ছিল, সমস্তই রোগীর অঙ্গে চাপা দিয়া চলিলাম। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, রোগীর নিষ্ঠীবনের সঙ্গে ঈষৎ রক্তের আভা দেখা যাইতেছে। এক ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইবার পর ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করিয়া আমাকে গোপনে বলিলেন, রোগীর নিউমোনিয়া হইয়াছে। আমার কামরায় আসিয়া বলায় রোগী শুনিতে পাইল না বটে, তবে শিক্ষিত ভদ্র রোগীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার পীড়া নিতান্ত সামান্য নহে। গৃহ হইতে বহু দূরদেশে চলিয়াছেন, আত্মীয় স্বজন, সম্পর্কিত ব্যক্তি কেহই সঙ্গে নাই, ভরসা আমরাই, সেই জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে তাঁহার কামরায় ডাকাইয়া নিতান্ত ব্যাকুলভাবে তাঁহার চিকিৎসা শুশ্রূষা যত্ন প্রভৃতির জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি বারবার তাঁহাকে আশ্বাস দিলাম যে তাঁহার পীড়া সামান্য, এবং অতি শীঘ্রই তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, এবং আমাদের যথাসাধ্য তাঁহার চিকিৎসা, সেবা, যত্ন সমস্তই করিব, তাহাতে কোন ত্রুটী হইবে না।

উদ্বেগের মধ্যে রেলপথ অতিবাহিত করিতে হইল। পথের মধ্যে নূতন নূতন ষ্টেশনে নূতন নূতন লোকের আনাগোনা, নামাউঠা দেখিবার যে আনন্দ আছে, তাহা ভাল করিয়া উপভোগ করা হইল না। তবে এ যে বয়সের কথা, তখন আনন্দের জন্য বিশেষ আয়োজনের আবশ্যক হয় না, অন্তরের মধ্যে যে অফুরন্ত আনন্দের উৎস নিয়ত উৎসারিত হইতেছে তাহাকে দমন করাই কঠিন। সে দিনে রেল গাড়ীর গতিবেগ আজিকার দিনের মত ছিল না। জব্বলপুর হইতে শেষ রাত্রিতে রওনা হইয়া পরের সমস্ত দিন রাত্রি গেল, তৎপর দিবস প্রাতঃকালে বেলা প্রায় সাড়ে আট নয়টার সময়ে বোম্বইয়ের ভিক্টোরিয়া টারমিনাস ষ্টেসনে গিয়া পৌছিলাম। তৎপূর্ব্বে তাদৃশ বৃহৎ রেল ষ্টেসন আমি দেখি নাই; বর্ত্তমান সময়ের হাওড়া ষ্টেশন বড় হইয়াছে, প্ল্যাটফরম অনেক হইয়াছে, কিন্তু সে দিনে ভিক্টোরিয়া ষ্টেসন বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষাই বড় ছিল। সেই বৃহৎ ষ্টেসনে যখন গাড়ী থামিল তখন দেখিলাম চতুর্দ্দিকে লোকারণ্য, নানা দেশের নানা পরিচ্ছদধারী নানা ভাষাভাষী স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা চারিদিকে নানা কার্য্যে ব্যস্তভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

বোম্বাই সহরে পঁহুছিবামাত্র কলিকাতা হইতে একটি বিষয়ের পার্থক্য তৎক্ষণাৎ চক্ষুর উপরে ভাসিয়া উঠে। কলিকাতাও বৃহৎ সহর, বোম্বাই কিংবা ভারতের অপর সমুদয় সহর অপেক্ষা বড়, ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে লণ্ডনের পরেই সর্ব্ব বিষয়ে কলিকাতার স্থান। কিন্তু কলিকাতা বাঙ্গালার সহর, বাঙ্গালীর সহর (এখন যদিও বাঙ্গালী অপেক্ষা অপর দেশের লোকের সংখ্যা সম্ভবতঃ অধিক) সুতরাং শিরস্ত্রাণহীন মানুষের গতিই চক্ষে পড়ে। পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য সহরে পাগড়ীধারী লোক আছে বটে, কিন্তু বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিবামাত্র গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, ভাটিয়া, মান্দ্রাজী, হিন্দুস্থানী, বেহারী, পাঞ্জাবী, শিক্ষ, রাজপুত, বোরা, খোজা, পেশোয়ারী প্রভৃতি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু মুসলমানের নানা বিচিত্র বর্ণের শিরস্ত্রাণ এবং পশ্চিম ভারতের "সৌভাগ্যবতী" (সধবা) হিন্দু রমণীদিগের শাটীর বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া যথার্থই মনে হয় যে কোনও নূতন আরব্যোপন্যাসের রাজ্যে আসিয়াছি,—বুঝি বা হারুণ অল্‌রসীদের বোগদাদ নগরী।

আমরা ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়াই পার্শী কোচ-ম্যানের ল্যাণ্ডো ও জুড়ী দেখিলাম এবং সে পার্শী

কোচম্যানটি আমাদিগকে বাঙ্গালী দেখিয়া বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল। আমরা নূতন লোক, কিছুই জানি না, সে স্থানের কিছুই চিনি না, ইহা আমাদের কথাবার্ত্তায় সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিল, এবং ইহাও বুঝিল যে, ইহারা নিতান্ত নিঃস্ব দরিদ্র নহে, ইহাদিগকে নাড়া দিলে ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। সসম্মানে গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল এবং কহিল যে সে বোম্বাইয়ের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হোটেলে লইয়া যাইবে। রোগীকে ডাক্তার বাবু এবং ভৃত্যবর্গ সহ অল্প সময়ের জন্ত একটি ধর্ম্মশালা গোছ হোটেলে পাঠাইয়া, আমি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সহিত পার্শী চালিত গাড়ীতে বসিয়া তদানীন্তন সময়ের উৎকৃষ্ট ইংরাজী হোটেল গ্রেট ওয়েষ্টার্ণে গেলাম- পরামর্শ হইল, সেখানে স্নানাদি সারিয়া একটি বাড়ী খুঁজিয়া লইতে হইবে, কারণ বাড়ী ভিন্ন রোগীর সেবা সুবিধামত হইবার সম্ভাবনা হোটেল বা ধর্ম্মশালায় নাই।

পার্শী কোচম্যানটিকে দেখিয়া তাহার কথায় বার্ত্তায় বেশ বিন্তাসে বিশেষ ভদ্র বলিয়া মনে হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম যে বিলাত বা মার্কিণে যেমন শিক্ষিত ভদ্রলোকে এরূপ কায করিতে দ্বিধা বা অপমান বোধ করে না, বোম্বাইও বুঝি সেইরূপ বিলাতের মতই হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমার ভ্রম দূর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। বেশ বিন্তাস দেখিয়া যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা নহে। দেখিলাম ইনি "বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।" হোটেলের দ্বারে নামিয়া যখন ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম. সে অম্লান বদনে বলিল "Twenty rupees, sir." আমি ত অবাক! ষ্টেশন হইতে হোটেল অর্দ্ধ মাইল পথ হইবে কি না সন্দেহ, তাহার ভাড়া কুড়ি টাকা, কি সর্ব্বনাশ! কলিকাতায় ষোল টাকায় কুকের বাড়ীর জুড়ীগাড়ী সমস্ত দিন কায করে, আর এখানে এ কি ব্যাপার। শুনিয়াছিলাম বোম্বাইয়ে ধনকুবেরগণের বাস, তাহা হইলেও এ কি অসম্ভব রকম গাড়ীভাড়া! আমার সেক্রেটারীটি চিরকাল দরদস্তর করিয়া আসিতেছেন, তিনি বলিলেন "তোমার মিউনিসিপ্যাল রেটের টিকিট দেখাও।" সে কহিল, "উহা আনি নাই।" সেক্রেটারী বাবু কহিলেন, "উহা না দেখাইলে ভাড়া পাইবে কিরূপে?" পার্শী কোচম্যানটি তখন দেখিলেন, ইহাদিগকে দেখিতে যেরূপ নির্ব্বোধ মনে হয়, কাযের বেলায় তেমন নহে।" এই সকল কথাবার্ত্তা যখন হইতেছে সেই সময়ে হোটেলের ম্যানেজার সাহেব তথায় আসিলেন, এবং তাঁহারই হোটেলের visitor বা guest যাহাই বলুন তাহারই সহিত গাড়োয়ানের বিবাদ দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি কথাটা বুঝাইয়া দিলাম। তিনি কহিলেন, "এই শ্রেণীর ভদ্র বেশধারী লোকেরা নূতন লোক পাইলেই এইরূপ করিয়া থাকে; রেল-ষ্টেশন হইতে এখানে আসিবার ভিক্টোরিয়া ভাড়া এক টাকার অধিক নহে, উহার ল্যাণ্ডো গাড়ী এবং তাহাতে জুড়ী ঘোড়া আছে, সুতরাং দুই টাকা উহার ন্যায্য প্রাপ্য; এখন আপনার যেরূপ অভিরুচি।" আমি তাহার কথিত প্রাপ্য দুই টাকার উপরে আর দুইটি টাকা দিলাম, সে বকবক করিয়া গুজরাটী ভাষায় কি বকিতে বকিতে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা বুঝিলাম না। ইতিমধ্যে আমার চাকর আবশ্যক জিনিষপত্রের ট্রাঙ্ক, সুটকেস প্রভৃতি লইয়া পঁহুছিল, ম্যানেজার সাহেবের সহিত আমি আমার ঘর দেখিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

হোটেলটি সুবৃহৎ, বহু শত লোকের স্থান সেই হোটেলে হইতে পারে। ভোজনাগার প্রকাণ্ড এবং প্রতি guest এর শয়ন ঘর গুলিও বড় এবং আলোক ও বায়ু প্রবেশের জানালা দরজা গুলিও প্রশস্ত। যাহা হউক, আমরা সেখানে অল্প সময়ের জন্তই আসিয়াছি, সেই দিবসই বাড়ী ভাড়া লইয়া রোগীটিকে তথায় লইতে হইবে, তাহার ঔষধাদির ব্যবস্থা এবং ডাক্তার আনাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, সুতরাং শীঘ্র স্নান ভোজন সমাপন করিবার দিকে মনোনিবেশ করিলাম। ভোজন সামগ্রী প্রস্তুতই ছিল, আমি স্নানান্তে কাপড় বদলাইয়া, ভোজন শেষ করিলাম। দীর্ঘ সময় ট্রেণে আসিবার

পরে স্নান ব্যাপারটি বড়ই আরামপ্রদ মনে হইল। বোম্বাই সহরে ডিসেম্বরেও শীত অধিক নহে, আমাদের দেশের ফাল্গুন মাসের মত, সুতরাং স্নানে আরাম ব্যতীত কষ্ট হইবার কথা নহে। আহারের পরে বিশ্রাম করা হইল না, ভৃত্যকে জিনিষপত্র সহ আমার কামরায় রাখিয়া আমি এবং সেক্রেটারী বাবু বাড়ী খুঁজিবার জন্য বাহির হইলাম। তখনকার দিনে মোটর ছিল না, ঘোড়ার গাড়ীই এক মাত্র দ্রুত যান। বোম্বাইয়ের গাড়োয়ানের যে নমুনা প্রথমেই পাইয়াছি তাহাতে একটু ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু হোটেলের বাহিরে যাইবামাত্রই সম্মুখে অনেক গুলি ভিক্টোরিয়া দেখিলাম, কিন্তু পার্শী গাড়োয়ান দেখিতে পাইলাম না, একটু আশ্বস্ত হইলাম। একখানি নূতন গোছের গাড়ী দেখিলাম এবং তাহার অশ্বিনীকুমারও দেখিতে মন্দ নহে। কোচবাক্সে যিনি বসিয়া আছেন তিনি সুরাটের মুসলমান। তাহাকে "ভাড়া যায়েগা?" জিজ্ঞাসা করিতেই "হাঁ সাহেব।" বলিয়া উত্তর করিল এবং কোচবাক্স হইতে নামিয়া গাড়ীর গদী প্রভৃতি যথা সম্ভব ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। "কাহা চল্‌না হুজুর?" বলিয়া সে প্রশ্ন করিলে তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, একটি বাড়ী ভাড়া করিবার প্রয়োজন আছে, যে দিকে ভাল বাড়ী মিলিবে সেই দিকেই যাইতে হইবে। সে কহিল, সহরের মধ্যে অনেক বাড়ী পাওয়া যায়, কিন্তু সে সকল বাড়ী আমাদের পছন্দ হইবে না, ভাল বাড়ী যে দিকে পাওয়া যায় সেই দিকেই লইয়া যাইবে। সহরের মধ্যের বাড়ী আমাদের পছন্দ হইবে না তাহা সে কিসে অনুমান করিল জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে সে কহিল, "হামকো দেখনেই সে মালুম হো যাতা হ্যায়, সাহেব।" সে আমাদিগকে বালকেশ্বর, নেপিয়েন্স রোড, মালাবার, ওয়ার্ডেন রোড প্রভৃতি ইংরাজ ও বোম্বাইয়ের ধনিগণের পল্লী প্রায় সমস্তই ঘুরাইল, কিন্তু কোথাও এক মাস দুই মাসের জন্য ভাল বাড়ী ভাড়া দিতে চাহিল না। বড়ই বিপদে পড়িলাম।

আমাদের এই মূর্খ গাড়োয়ানটি দেখিলাম হৃদয়বান লোক; সে বুঝিয়াছিল, রোগী লইয়া আমরা অপরিচিত বিদেশে বিপদে পড়িয়াছি, বাড়ী না পাইলে রোগীর চিকিৎসা পথ্য শুশ্রূষা কিছুই হইবে না, সম্ভবতঃ সে মারা যাইবে। গাড়োয়ানটি আমাকে সাহস দিয়া কহিল, "হুজুর, হাম্ ঢূঁড়্‌কে কোঠি নিকালে গা, দোঘড়িকা অন্দর আপকো মকান্ মিল্ যায়েগা।" আমি কহিলাম, "চল বাপু যেখানে হয় একটা বাড়ী মিলাইয়া দাও।" গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া সে তাহার আস্তাবলের দিকে চলিল। সেখানে ঘোড়া বদলাইয়া, নানা গলি ঘুরিয়া ফিরিয়া একস্থানে উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সে দিকটার নাম বাইকালা এবং দেখিলাম সেখানে ভাল এবং বড় বাড়ী অনেক আছে, তবে অল্প সময়ের জন্য ভাড়া পাওয়া যাইবে কি না এই যা ভাবনার কথা। একটি বৃহৎ বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব, ফ্লাট লেঙ্গে?" ফ্লাট বুঝিলাম flat। আমি কহিলাম ফ্ল্যাটে আবশ্যক মত কামরা, স্নানের ঘর প্রভৃতি থাকিলে ফ্ল্যাটে কোন বাধাই নাই। সে কহিল, "তব ভিতর যাইয়ে, শেঠ সে পুছ লিজিয়ে, মগর ভাড়া শেঠ জাস্তি মাঙ্গেগা, আপ্ কম কহিয়ে গা।" আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অজ্ঞাত কুলশীল অপরিচিত লোক আমি, আমার অর্থব্যয় অধিক না হয় তৎপ্রতি ইহার দৃষ্টি কেন? তখন কিছু বুঝিলাম না, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম যে, লোকটির অন্তর বড়ই চমৎকার ছিল। আমি সে যাত্রা যতদিন বোম্বাইয়ে ছিলাম, ঐ ব্যক্তির গাড়ীই আমি নিত্য ব্যবহার করিয়াছি। আমরা যে বাড়ী লইয়াছিলাম সেই বাড়ীর আস্তাবলেই দিবারাত্রি তাহার গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া দিত এবং আমাদের সর্ব্ব প্রয়োজন সাধন করিয়া দিয়া যে বিপুল আনন্দ লাভ করিত, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে কাহারও বাকি থাকিত না। যে দিন আমি বোম্বাই ছাড়িয়া যাই, সে দিনে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে যখন সে বালকের ন্যায় ফুকারিয়া উঠিল, তখন আমরাও কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতেই একটি পার্শী

মহিলা বাহির হইয়া আসিলেন এবং ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি প্রয়োজনে আসিয়াছি। আমি কহিলাম, "দ্বারে নোটিশ দেখিলাম এই বাড়ী বা বাড়ীর অংশ ভাড়া দেওয়া হইবে, আমি সেই খোঁজ লইতে আসিয়াছি।" তিনি আদর করিয়া আমাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গিয়া, বসিবার ঘরে বসিতে বলিলেন এবং নিজে পর্দা সরাইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষণকাল পরে বাহির হইয়া আমাকে সেই কক্ষে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম সে ঘরে একটি প্রাচীন পার্শী ভদ্রলোক শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, বাতে চলৎ-শক্তি রহিত। তাঁহার পুত্র ও জামাতা সকলে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কেহ করাচী, কেহ জাঞ্জিবার, কেহ নেটালে গিয়াছে, বাড়ীতে স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং কন্যাগণ সহ তিনি রহিয়াছেন; বাড়ীর নীচতালায় তাঁহারা বাস করেন; উপর তালা ভাড়া দিবেন এবং অল্প দিনের জন্য দিতেও কোন বাধা নাই। পুত্রবধূ এবং কন্যারা আমাকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের সমস্ত ঘর গুলি দেখাইলেন। দেখিলাম সুন্দর বাড়ী, এবং প্রয়োজনীয় চেয়ার চৌকী কোচ কেদারা ম্যাটিং গালিচা, পালঙ্ক সমস্তই আছে, আমাদিগকে কেবল কয়টি বাতি সংগ্রহ করিতে হইবে। দ্বিতলের হল কামরা অতি প্রকাণ্ড। গাড়ী বারান্দার উপরের ঘরটির চারিদিকে কাচের সার্শী দেওয়া, ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করিতে পারা যায়। শয়ন ঘর গুলিও ভাল, স্নানাগার প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। বৃদ্ধ ভাড়া চাহিলেন দুই শত, দেড় শত টাকায় রাজি হইয়া গেলেন। বলিলেন, লেখা পড়া কিছুই করিতে হইবে না, ভদ্রলোকের কথাই যথেষ্ট। পার্শী বা অপর কোন জাতীয় ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে এমন ভোলা মহেশ্বর আমি কম দেখিয়াছি। সেই দিবসেই হোটেলে ফিরিয়া আমার জিনিষপত্র পাঠাইয়া দিলাম এবং ধর্ম্মশালা হইতে রোগী, ডাক্তার বাবু এবং অপরাপর ভৃত্যবর্গকে আনাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নূতন ভাড়ার ফ্ল্যাটে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

ক্রমশঃ

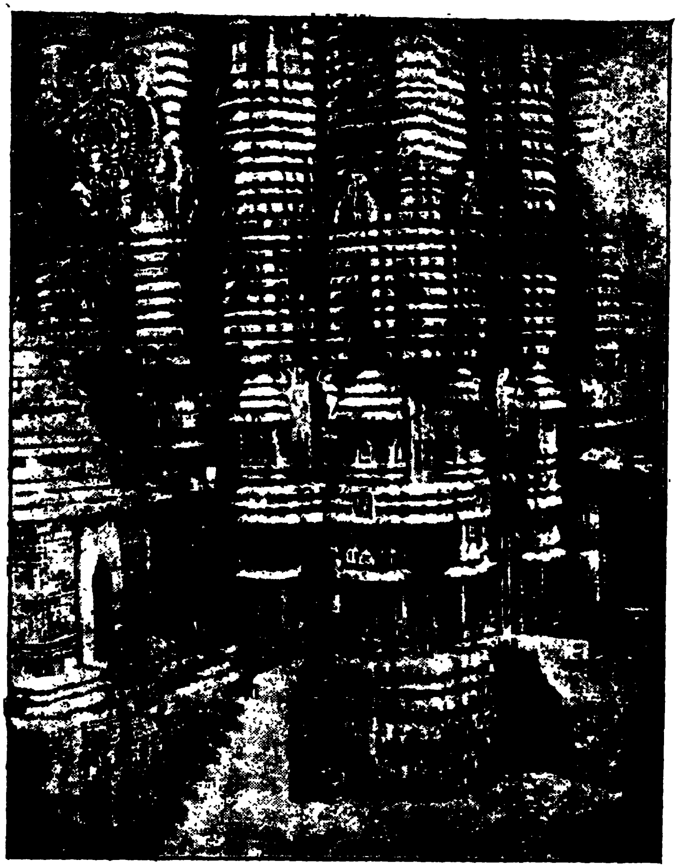
শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

মূর্ত্তি ও মন্দির

(রাধানগরে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশনে, ইতিহাস-শাখা-সভাপতির অভিভাষণ)

আপনারা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় মহাশয়কে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এই রাধানগর অধিবেশনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। দান পুণ্যের মত ইতিহাসের আলোচনাও নিজের বাড়ী হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত। রাধানগরের অধিবেশনে হুগলী জেলার ইতিহাসের আলোচনার সুব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার অপেক্ষা এরূপ আলোচনা পরিচালনের যোগ্যতর ব্যক্তির সহিত আমি পরিচিত নহি। প্রবীণ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং বন্ধুবর কুমার শরৎকুমার রায়ের সহিত যদিও আমার বরেন্দ্রের কিছু কিছু পুরাকীর্ত্তিচিহ্ন দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, রাঢ়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান আমার মোটেই নাই, কাজেই এই পদগ্রহণের যোগ্যতাও নাই। তবে যে দয়ার পরবশ হইয়া আপনারা আমাকে এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই দয়ার পরবশ হইয়া আপনারা আমার ভুল-ভ্রান্তিও মার্জ্জনা করিবেন এই ভরসায়, আমার প্রতি এইরূপ উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, আমি এই পদ গ্রহণে সাহস করিয়াছি।

আজ আমরা যে মহাপুরুষের জন্মস্থানে সম্মিলিত হইয়াছি, তিনি একটী উন্নত সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু, এবং



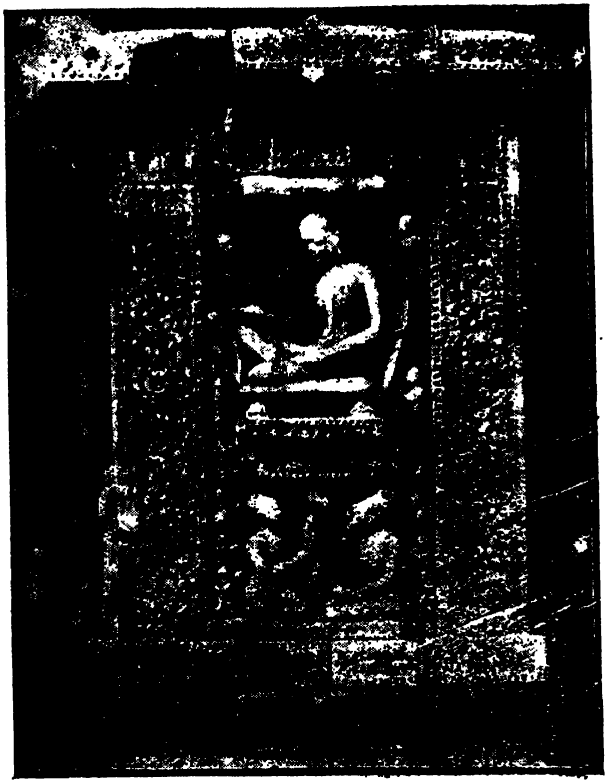
লিঙ্গরাজমন্দির, ভুবনেশ্বর

সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান গুরু। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মান্দোলনের ফলে এদেশে সাকার-নিরাকার উপাসনা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রায় শতবর্ষ কাল প্রবলভাবে চলিয়া এখন অনেকটা নীরব হইয়াছে। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দে সাকার উপাসনার আর এক দিক্ লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসের উপাদান এবং কমনীয় কলার নিদর্শনের হিসাবে এখন প্রাচীন দেবমূর্ত্তির বিচার হইতেছে। প্রাচীন মূর্ত্তির বিবরণ সঙ্কলনে এবং কমনীয়তা বিচারে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের দেশবাসীরা ইদানীং বিশেষ উত্তম-উৎসাহ দেখাইতেছেন। আপাততঃ আমারও ব্যবসা মূর্ত্তিসংগ্রহ এবং মূর্ত্তিবিচার। সুতরাং অদ্য প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তি ও মন্দির সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

১

ঋগ্বেদ সংহিতা লইয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের আরম্ভ। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতির সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তির জন্য ঋগ্বেদের মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানে মূর্ত্তির কোন স্থান নাই, কিন্তু মন্দিরের স্থানে অগ্নিগৃহের প্রয়োজন ছিল। বৈদিক যুগে সকল শ্রেণীর লোকেই যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন এমন কোন প্রমাণ নাই। যজ্ঞে অনধিকারী কোন কোন জাতির মধ্যে তখন মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত থাকাও সম্ভব। কিন্তু বৈদিক যুগের মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধীয় কোন নিদর্শন বস্তু এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। সুতরাং বৈদিক যুগে ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না। অবশ্যই অনেক বেদমন্ত্রে অনেক বৈদিক দেবতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা আছে। কিন্তু নিদর্শন বস্তু ব্যতীত শিল্পের বিচার হইতে পারে না।

বৈদিক যুগের শেষভাগ, উপনিষদের সময় হইতে হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে দুইটী আপাত-বিরোধী লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়; একটী লক্ষণ উন্নতিশীলতা, আর একটী লক্ষণ রক্ষণশীলতা। বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ ভাগে স্বর্গ কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানের এবং তপশ্চরণের বিধান আছে। উপনিষদে স্বর্গ কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে পুনঃপুনঃ জন্ম মরণের হস্ত হইতে



ভি.জরাজমন্দির, ভুবনেশ্বর

মুক্তি পাইবার জন্ত ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান সাধন বিহিত হইয়াছে। উপনিষদে স্বর্গ কামনা নিষিদ্ধ হইলেও যাগ-যজ্ঞ একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই; চিত্তশুদ্ধির জন্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার ব্যবস্থা হিন্দুর উন্নতিশীলতার সঙ্গে স্বাভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতার পরিচয় প্রদান করে।

উপনিষদের পর প্রাচ্য ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। উপনিষদের কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি এবং বৌদ্ধধর্ম্মের লক্ষ্যও জন্ম-মরণের হস্ত হইতে মুক্তি। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্মার (ব্রহ্মের) অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার মত প্রকাশ করেন নাই, পক্ষান্তরে আত্মা আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের উপদেশের সার কথা, অষ্টাঙ্গ সুনীতি মার্গ অনুসরণ করিলে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরীশ্বর সুনীতি পথ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ আদর্শ সত্ত্বেও, উপনিষদের ধর্ম্ম যেমন কর্ম্মের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে নাই, গোড়া হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মও জড়োপাসনার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ আগমে দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধ প্রথমতঃ যে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই মগধে এবং বিদেহে তৎকালে জনসাধারণের মধ্যে বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের প্রাধান্ত ছিল না, তখন প্রাধান্ত ছিল কোন মৃত মহাপুরুষের চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত স্তূপের এবং যক্ষ বা যক্ষীর আবাস চৈত্য বৃক্ষের উপাসনার। যখন বুদ্ধদেবের মহাপরি-নির্ব্বাণের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তখন আনন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"প্রভো (ভদন্তে)! আমরা তথাগতের মৃত দেহের কিরূপ সৎকার করিব।"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন—"হে আনন্দ, তথাগতের শরীর পূজা করিয়া নিজের মোক্ষের বাধা উপস্থিত করিও না। নিজের মোক্ষের চেষ্টায় তুমি আত্মনিয়োগ কর। তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ অনেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থ আছেন যাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।"

এখানে বুদ্ধদেব ভিক্ষুর পক্ষে শরীর পূজা নিষেধ করিয়াছেন, শরীর পূজাকে মোক্ষের অন্তরায় স্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু গৃহস্থেরা যে শরীর পূজা করিবে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না, এবং এ বিষয়ে যে বিধি নিষেধের অবকাশ আছে তাহাও তিনি মনে করেন নাই। অবশ্যই আনন্দ বুদ্ধের নিষেধ বাক্য শুনিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, বুদ্ধের দ্বারা ব্যবস্থা করাইয়া লইলেন, চক্রবর্ত্তী রাজার শরীরের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া লোকে যেমন তাহার পূজা করিয়া

থাকে, বুদ্ধের দেহের ভস্মাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তেমনি করিতে হইবে। চৈত্যবৃক্ষের পূজা সম্বন্ধে মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে এবং অন্যত্র বৈশালীর লিচ্ছবীগণকে বুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন, তোমরা যদি স্বজাতির মঙ্গল কামনা কর, তবে অন্যান্য সৎকর্ম্মের মধ্যে বৈশালীর উপকণ্ঠস্থিত চৈত্যবৃক্ষগুলিকে যথাবিধি পূজা করিও। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বুদ্ধের বচন ঠিক বিনিবদ্ধ হইয়াছে কিনা এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, কিন্তু শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা যে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের অনতি-কাল পরেই স্তূপ পূজা এবং বোধিবৃক্ষরূপে চৈত্যবৃক্ষের পূজায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারহুতের এবং সাঁচীর স্তূপের বেদিকায় (বেড়ায়) লিপিমালা তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। এই লিপিমালা পাঠে জানা যায়, যাহারা চাঁদা তুলিয়া এই সকল বেড়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী।

বুদ্ধদেব শরীর বা চৈত্যপূজা নিষেধ করিয়া না থাকিলেও প্রতিমার সংশ্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং সেই উপদেশ যে অনেকদিন পর্য্যন্ত কতক পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্‌গে (ক্ষুদ্রবর্গে) কথিত হইয়াছে, এক সময় বুদ্ধ রাজগৃহ নগরে বেণুবনে বাস করিতেছিলেন এবং ভিক্ষু-গণের বাসের জন্য বিহার নির্ম্মিত হইতেছিল। তখন অনাচারপরায়ণ ষট্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্ত্রী-পুরুষের প্রতিভান চিত্র (প্রতিকৃতি) অঙ্কিত করিয়া বিহারের দেওয়াল ভূষিত করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "এ যে ভোগসুখ রত গৃহীর মত আচরণ।" বুদ্ধ শুনিতে পাইয়া স্ত্রী পুরুষের চিত্র অঙ্কন নিষেধ করিয়া দিলেন এবং বিহারের শোভার জন্য মালা, লতা প্রভৃতি অঙ্কিত করিবার অনুমতি দিলেন। বিনয়পিটকের সুত্তবিভঙ্গে আছে (ভিক্ষুণী বিভঙ্গ, ৪১ পাচিত্তিয়) এক সময় বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীনগরে জেতবনে বাস করিতেছিলেন, তখন কোশলরাজ প্রসেন-



নটরাজ, খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

জিতের উদ্যানের চিত্রাগারে অনেক মনুষ্যচিত্র (প্রতিভান চিত্র) প্রদর্শিত হইতেছিল, এবং অনেক লোক তাহ[া] দেখিতে যাইতেছিল। এই জনপ্রবাহের সঙ্গে ষটবর্গীয় ভিক্ষুণীরাও দেখিতে গিয়াছিলেন। অমনি লোকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে পাইয়া বুদ্ধদে[ব] ভিক্ষুণী মাত্রকেই চিত্রাগার দেখিতে যাইতে নিষে[ধ] করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যখন মনুষ্য চিত্র দর্শন [ও] অঙ্কন নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে মনুষ্যাকা[রে] গঠিত প্রতিমা পূজাও নিষেধ করিয়াছিলেন, এ কথ[া] সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

২

স্তূপের এবং বোধিবৃক্ষের পূজা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মে



নাগ, খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

মলিনতার চিহ্ন স্বরূপ মনে হইলেও এই সম্পর্কেই প্রাচীন ভারতে কমনীয় শিল্প অভ্যুদিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সময়ের ভাস্কর্য্য নিদর্শনের মধ্যে অনুশাসন সম্বলিত স্তম্ভের শীর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্তম্ভের সঙ্গে উপাসনার কোনও সম্পর্ক ছিল কি না বলা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে ভাস্কর্য্য-কলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দে শুঙ্গ বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, এবং এই শুঙ্গশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দের মধ্যভাগে মধ্য-ভারতে। সারনাথ, পাটলিপুত্র এবং বিদিশার ভগ্নাবশেষের মধ্যে শুঙ্গশিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই যুগের প্রধান কীর্ত্তি, ভারহুত স্তূপের বেদিকা ও তোরণ, সাঁচীর প্রাচীন স্তূপত্রয়ের বেদিকা ও তোরণ, বোধগয়ার প্রাচীন বেদিকা এবং উড়িষ্যার উদয়গিরির গুহামন্দিরনিচয়ের কারুকার্য্য। এই সকল বেদিকার এবং তোরণের গাত্রে প্রাসাদ ও কুটীর বা কুটাগার অঙ্কিত দেখিয়া মনে হয় যে প্রাচীন কালের কুটীরই আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যযুগের বঙ্কিম শিখর-সম্পন্ন মন্দিরের মূল আদর্শ। শুঙ্গযুগের এই সকল বৌদ্ধ বেদিকার এবং তোরণের গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যের মধ্যে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। উপাস্য বস্তুর মধ্যে দেব-দেবীর প্রতিমা নাই, আছে স্তূপ, চৈত্যবৃক্ষ, বোধিবৃক্ষ এবং নানা প্রকার চিহ্নযুক্ত বেদি। কিন্তু দেবদেবীর যে সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহা উপাস্যরূপে অঙ্কিত হয় নাই, বুদ্ধের উপাসকরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং শুঙ্গযুগের ভাস্কর্য্য পরীক্ষা করিলে দুইটী সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয়। প্রথম, তৎকালে প্রতিমা নির্ম্মাণ রীতি প্রচলিত থাকিলেও প্রতিমা পূজারীতি বোধ হয় বিশেষ প্রচলিত ছিল না; প্রতিমার পরিবর্ত্তে দেবদেবীর আশ্রয়বৃক্ষ বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং মহাপুরুষের শরীরাবশেষ পূজিত হইত।

দ্বিতীয়—ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার পৌরাণিক লক্ষণ সকল তখনও পরিকল্পিত হয় নাই। প্রাচীন বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নানাশ্রেণীর দেবতার বিবরণ আছে। তন্মধ্যে বেদের ইন্দ্রাদি দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশ নামে স্থান লাভ করিয়াছে। শুঙ্গযুগের ভাস্কর্য্যে এই সকল দেবতা মনুষ্যাকৃতি, একটী মস্তক এবং দুইটী হস্তবিশিষ্ট, এবং পুরাণোক্ত বাহনের চিহ্নবিহীন। বৈদিক এবং পৌরাণিক দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের মূর্ত্তি বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইয়াছে। ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত প্রথম দেখা যায় শক-কুশাণ যুগের মথুরায় একখানি বৌদ্ধ চিত্র-ফলকে, এবং ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখাদি পৌরাণিক লক্ষণ অঙ্কিত হইয়াছে মধ্যযুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যে। পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত মূর্ত্তির মধ্যে শুঙ্গভাস্কর্য্যে একমাত্র দেখা যায় শ্রী মূর্ত্তি। শ্রী "পদ্মস্থা পদ্মহস্তা চ গজোৎক্ষিপ্তঘটপ্লুতা

আকারে শুঙ্গযুগের বেদিকায় এবং তোরণে পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইয়াছে। ফুশে বলেন, এই মূর্ত্তি এখনও শ্রীমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহা খুব সম্ভব গৌতম বুদ্ধের জন্মের সাঙ্কেতিক চিত্র। ফুশের সিদ্ধান্ত স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু শুঙ্গযুগের শ্রীর মূর্ত্তিতে পৌরাণিক লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতার প্রতিমায় পৌরাণিক লক্ষণের অভাব সপ্রমাণ করে, শুঙ্গযুগে এই সকল প্রধান দেবতার মূর্ত্তিকল্পনায় পৌরাণিক লক্ষণ প্রবেশ লাভ করে নাই। শুঙ্গরাজগণের সমসময়ের পঞ্চালের একজন রাজা অগ্নিমিত্রের মুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তি এই কথার সাক্ষ্য দান করে। অগ্নিমিত্রের মুদ্রায় অগ্নির মূর্ত্তির পার্শ্বে অগ্নির পৌরাণিক বাহনের কোন চিহ্ন নাই, এবং স্কন্ধের উপর মস্তকের স্থানে প্রজ্বলিত হুতাশন শিখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

শুঙ্গযুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য দেবদেবীর মূর্ত্তি উপাস্য দেবতার আকারে গঠিত হয় নাই; এই সকল মূর্ত্তিতে দেবভাবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না। এই সকল মূর্ত্তি মনুষ্যাকৃতি এবং মানুষভাব পূর্ণ। শুঙ্গশিল্পীর অঙ্কিত মনুষ্যাকৃতি স্বভাবসঙ্গত নহে। শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। বস্তুর রসোদ্দীপনী শক্তির নাম সৌন্দর্য্য। মনুষ্যের অবিকৃত স্বভাবতঃ সুন্দর। শুঙ্গশিল্পিগণের মনুষ্যাকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দোষের বিষয় বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে এইরূপ দোষারোপ সঙ্গত নহে। স্বভাবতঃ যাহা সুন্দর তাহার অবিকৃত প্রতিকৃতি অবশ্য সুন্দর হইবে। কিন্তু এরূপ নকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি যদি শিল্পের উদ্দেশ্য হয়, তবে শিল্প না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই, কেন না মূল বস্তু দেখিয়া সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যাইতে পারে। স্বাভাবিক পদার্থে যে সৌন্দর্য্য বা রসোদ্দীপনী শক্তি অনুভূত হয় না, সেই ভাবরসের অবতারণার জন্য শিল্পের সৃষ্টি। বাহন ভিন্ন এই ভাবরসের অবতারণা অসম্ভব। সঙ্গীতে এই ভাবরসের বাহন সুর, কাব্যে এই ভাবরসের বাহন শব্দ, স্থাপত্যে এই ভাবরসের বাহন গৃহ এবং চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে এই ভাবরসের বাহন স্বাভাবিক আকৃতি। কিন্তু কোথায় সেই বাহন স্বভাবের অবিকল নকল হইবে, আর কোথায় তাহা ইঙ্গিতে প্রদর্শিত হইবে, উদ্দেশ্যের হিসাবে এই বিচার করিবেন শিল্পী। যদি বাহনকে অবিকল স্বভাব-সঙ্গত না করিলে



মহিষমর্দ্দিনী, খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

রসোদ্দীপনের ব্যাঘাত না হয় তবে শিল্পী তাহা স্বভাব সঙ্গত করিবার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াও পারেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া শিল্পী ভারহুতের বেদিকা এবং সাঁচীর তোরণ বৌদ্ধ আখ্যায়িকার চিত্রের দ্বারা অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, "জাতকমালা"কার আর্য্যশূর তাহা এই দুইটী শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"শ্রীমন্তি সদ্‌গুণপরিগ্রহমঙ্গলানি
কীর্ত্ত্যাস্পদান্যনবগীতমনোহরাণি।

পূর্ব্বপ্রজন্মসু মুনেশ্চরিতাদ্ভুতানি
ভক্ত্যা স্বকাব্যকুসুমাঞ্জলিনার্চ্চয়িষ্যে।
শ্লাঘ্যৈরমীভি রভিলক্ষিতচিহ্নভূতৈ-
রাদেশিতো ভবতি যৎসুগতত্বমার্গঃ।
স্যাদেব রূক্ষমনসামপি চ প্রসাদো
ধর্ম্ম্যাঃ কথাশ্চ রমণীয়তরত্বমীয়ুঃ॥

"শ্রীসম্পন্ন, সদ্‌গুণময়, মঙ্গলময়, প্রশংসার্হ, অনিন্দ্য মনোহর শাক্যমুনির পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের চরিত-কথানিচয় ভক্তিসহকারে স্বরচিত কাব্যকুসুমাঞ্জলির দ্বারা অর্চ্চনা করিব।"

"এই সকল কীর্ত্তিকলাপ বুদ্ধত্বলাভের পথের চিহ্ন স্বরূপ, (এই সকল কীর্ত্তি কথার দ্বারা) সেই পথ উপদিষ্ট হইল। (এই কাব্য) কঠিন হৃদয় ব্যক্তিদিগকেও প্রসন্ন করিতে পারে। (ইহা) ধর্ম্মবিষয়ক আখ্যায়িকা-নিচয়ের রমণীয়তা সম্পাদন করিতে পারে।"

যে সকল শিল্পী ভারহুতের বেদিকায় এবং সাঁচীর তোরণে বুদ্ধের জন্ম জন্মান্তরের মনোহর কাহিনী সকল অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল নির্ব্বাণের পথের এই সকল চিহ্নের রমণীয়তা সম্পাদন। কারু-কার্য্যের হিসাবে এই সকল চিত্র নির্দ্দোষ না হইলেও এই সকল চিত্রে শিল্পী যে রমণীয়তা অর্থাৎ দর্শকের চিত্তকে রসার্দ্র করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

৩

শুঙ্গরাজ্যের অধঃপতনের অনতিকাল পরেই যেন প্রাচ্য ও মধ্যভারতে প্রাচীন শিল্পের ধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দে নির্ম্মিত যে কয়খানি মূর্ত্তি এযাবৎ সাঁচীতে, সারনাথে, এবং শ্রাবস্তীতে পাওয়া গিয়াছে তাহা মথুরার লাল পাথরের দ্বারা মথুরার কারখানায় নির্ম্মিত। দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্ররাজ্যে শুঙ্গশিল্পের ধারা আরও দুই শতাব্দীর অধিককাল অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রবহমান ছিল, এবং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে অমরাবতীর মর্ম্মরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যে



নাগ, খিচিং, ময়ূরভঞ্জ

উন্নতির চরম সীমায় পহুঁছিয়াছিল। মথুরায় ভূক্ত-শিল্পধারা একেবারে লুপ্ত না হইলেও খৃষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে শকক্ষত্রপগণের অধিকারে নবাভ্যুদিত গ্রীক-শিল্পের সহিত গুরুতর সংসর্গে আসিয়া প্রাচীন শিল্প নব কলেবর ধারণ করিয়াছিল। মথুরার শক-কুষাণ-যুগের শিল্পের সম্বৎসহ লিপিযুক্ত অনেক নিদর্শন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিলে মনে হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে মথুরায় যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেব-দেবী গড়নের একটী বৃহৎ কারখানা খোলা হইয়াছিল। কিন্তু এই কারখানার তৈয়ারী দেব-দেবীর মূর্ত্তি কলের তৈয়ারি জিনিষের মত প্রাণহীন ভাবরসহীন শুষ্ক পাথর। সুতরাং শিল্পরসের অবতারণার হিসাবে মথুরার শক-কুষাণ-

যুগের শিল্পগোষ্ঠীকে নিপুণ পাথরমিস্ত্রী ছাড়া আর বেশী কিছু, অর্থাৎ সৃষ্টিক্ষম প্রকৃত শিল্পী, বলা যায় না। তথাপি মথুরার প্রাচীন শিল্পিদিগের একটী কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে ভারত-শিল্পের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিয়াছে। এই কীর্ত্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য দেব-দেবীর প্রচলিত মূর্ত্তির আকৃতির উদ্ভাবন। মথুরার কারখানার বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনে করেন বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল গান্ধারে এবং মথুরার শিল্পীরা তাহা অনুকরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ মূর্ত্তি যেখানেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকুক, জৈন মূর্ত্তিনিচয় যে উদ্ভাবিত হইয়াছিল মথুরায় শক-কুষাণযুগের কারখানায়, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন না আর কোথাও এত প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। খুব সম্ভব পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি গড়ন প্রথমত মথুরায় এই যুগের আরম্ভ হয়। মথুরায় এইযুগের একখানি বৌদ্ধচিত্রফলকে ঐরাবত সহ ইন্দ্রের মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মথুরা হইতে আনীত এবং কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত লাল-পাথরের একখানি সিংহবাহিনী মূর্ত্তি এবং একটী জটামুকুট ত্রিশির (অর্থাৎ চতুর্মুখ) মহাদেব মূর্ত্তির ভগ্নাংশ শক-কুষাণ যুগের তৈয়ারি বলিয়া মনে হয়। মথুরা মিউজিয়মে রক্ষিত লালপাথরের দ্বারের একখানি পার্শ্বফলকের পশ্চাতে একটি অসম্পূর্ণ লিপি আছে। পাথরখানি চিরিয়া ছ'কালা করায় এই লিপির প্রত্যেক পংক্তির অর্দ্ধাংশ লুপ্ত হইয়াছে। এই লুপ্তাংশ পূরণ করিয়া আমি স্থানান্তরে দেখাইয়াছি, এই লিপিতে কথিত হইয়াছে যে, মহাক্ষত্রপ সোডাসের রাজত্বকালে একব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবের মহাস্থানে (অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্মস্থানে) একটী চতুঃশালা, তোরণ, এবং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালের রীতি অনুসারে এই তোরণ এবং বেদিকা অবশ্যই কারুকার্য্য এবং ভাস্কর্য্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল, এবং এই ভাস্কর্য্যের মধ্যে পৌরাণিক আখ্যায়িকার চিত্র থাকাও সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শক-কুষাণযুগে মথুরায় সহসা দেব দেবীর মূর্ত্তির গড়ন আরম্ভ হওয়ার কারণ কি?

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর, এই শক-কুষাণ-যুগেই আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর পশ্চিমার্দ্ধে মূর্ত্তি পূজা-রীতি প্রবলতা লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে মূর্ত্তি গঠিত হইত, বোধ হয় স্থানে স্থানে তাহা পূজিতও হইত; কিন্তু তখন যেন মূর্ত্তি পূজা প্রবলতা লাভ করে নাই, প্রবল ছিল স্তূপ, চৈত্য, বৃষ সিংহ গরুড়াদি ধ্বজ, এবং স্বস্তিক ত্রিশূলাদি চিহ্নের পূজা। শুঙ্গ-রাজগণের সময়ের দেশীয় রাজগণের মুদ্রার চিত্রও এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূল। দেবদেবী, যক্ষ, নাগ, এবং বুদ্ধ, তীর্থঙ্কর প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই অবশ্য চৈত্য ও চিহ্নাদির পূজা হইত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিমা পূজা প্রবল ছিল না বলিয়াই হয়ত দেব-দেবীর আকৃতি সম্বন্ধে কল্পনা-জল্পনা প্রবলতা লাভ করিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু শক-কুষাণ যুগে পৌত্তলিক বিদেশীয়গণের সংসর্গ-গুণে সম্ভবতঃ মথুরায় মূর্ত্তিপূজা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শক এবং পহ্লব রাজগণের মুদ্রায় যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে তন্মধ্যে কোন কোনটী হিন্দু দেবদেবী বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় কদফিসস প্রমুখ কুষাণ সম্রাটগণের মুদ্রায় পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তি সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় কদফিসস শৈব ছিলেন, এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দের তৃতীয় পাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুষাণরাজগণ মূর্ত্তির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের মুদ্রায় নাম সহ অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। তাঁহারা নিজেদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন, সম্ভবতঃ সম সময়ে রোমের সম্রাটগণের অনুকরণে প্রজা সাধারণের পূজার জন্য। মথুরার নিকটবর্ত্তী মট্ নামক স্থানে কয়েকজন কুষাণ সম্রাটের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে অনুমান হয় কুষাণ-প্রভাব আর্য্যাবর্ত্তে মূর্ত্তি পূজা প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

মথুরার শক-কুষাণ যুগের শিল্পিগণ মূর্ত্তির কায়া মাত্র গড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই কায়াতে

সজীবতা এবং রসোদ্দীপনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন মধ্য এবং প্রাচ্য ভারতের গুপ্তযুগের শিল্পিগণ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের প্রথম ভাগে প্রাচ্য ভারতে গুপ্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং চতুর্থ শতাব্দী সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত গুপ্তসম্রাটের পদানত হইয়াছিল। এই শতাব্দে রাষ্ট্রীয় একতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী মহত্তর ব্যাপার ঘটিয়াছিল; আর্য্যাবর্ত্তে প্রাচীন অর্ব্বাচীন, দেশীয় বিদেশীয়, সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষার সমন্বয়ের ফলে, যাহা এখন হিন্দু সভ্যতা নামে পরিচিত তাহা আবির্ভূত হইয়াছিল। কুষাণ সম্রাটগণের সময়েই এই সমন্বয়ের সূত্রপাত হয়। কুষাণ-যুগে যে এই ব্যাপার কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, শেষ কুষাণ সম্রাটের বাসুদেব নামেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক কার্ণ (ভট্টকর্ণ) দেখাইয়াছেন, ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট ভক্তিতত্ত্বের সহিত মহাযানসূত্র সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে নিবদ্ধ উপদেশের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কুষাণ-গুপ্তযুগে ভক্তির প্রচার শিক্ষা-দীক্ষা সমন্বয়ের নিশ্চয়ই বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যখন প্রাচীন জ্ঞানমার্গ এবং বৌদ্ধ-নীতিমার্গ প্রবল ছিল, তখন সাধকগণের মধ্যে যাহারা নিম্ন অধিকারী তাহারাই কেবল ধর্ম্ম-তৃষ্ণার তৃপ্তি সাধনের জন্য শিল্পের আশ্রয় লইত। কিন্তু ভক্তি সাকার ধ্যানকে সাধক সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরে পহুঁছাইয়া উচ্চাঙ্গের শিল্পের অভ্যুদয় সাধিত করিয়াছিল। মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ কল্পনা ঈশ্বর কল্পনা; এবং ঐশ্বরিক ভাবকে নয়নমনের গোচর করান মনুষ্যে শিল্পের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। গুপ্ত-যুগের তক্ষগণ মথুরার কারখানায় উদ্ভাবিত কায়া লইয়া সেই মহান্ লক্ষ্য সাধনের জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মহাব্রত সফল হইয়াছিল। ভারতের শিল্পী দেবভাব প্রকাশে যতটা সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন দেশের আর কোন যুগের শিল্পী ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তযুগে যে মন্দির ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণরীতি অর্থাৎ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রায় সহস্র বৎসর জীবিত ছিল। এই সুদীর্ঘ কালের আর্য্যাবর্ত্তের শিল্পের ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করাও এখানে অসম্ভব। এখানে কেবল দুই একটী উদাহরণ দিয়া উহার অন্তর্নিহিত রস-ধারার আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

এই মধ্যযুগের স্থাপত্যের পরিণতি শিখর বা মঞ্জরী বিশিষ্ট মন্দিরে। মন্দিরের নিম্নভাগ গর্ভগৃহ এবং উপরিভাগ শিখর নামে পরিচিত। গর্ভগৃহ গবাক্ষহীন; উহার ভিতরে আলোক প্রবেশের একমাত্র পথ সম্মুখের দ্বার। সুতরাং আধ আঁধার অথবা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে ভিন্ন গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য বস্তু বা প্রতিমা দর্শনের উপায় নাই। আঁধার অজ্ঞেয়তা সূচক, আধ আঁধার রহস্য সূচিত করে। মনুষ্যের প্রকৃত আরাধ্য বস্তু অজ্ঞেয় নয়, কিন্তু অতীন্দ্রিয় এবং রহস্যাবৃত; গর্ভ-গৃহের অভ্যন্তরের আঁধার সর্ব্বদাই উপাসককে এই তথ্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভারতীয় মন্দিরের নির্ম্মাণপদ্ধতির আর একটা বিশেষত্ব, উপরিভাগের ভার বহনের জন্য খিলানের পরিবর্ত্তে সমান্তরাল ভাবে প্রস্তর ফলক বা ইষ্টক সাজান হয়। হিন্দুরা যে প্রাচীনকালে খিলানের ব্যবহার জানিতেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। খিলান অতি প্রাচীনকালে ব্যাবিলনে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। গ্রীক শিল্পীরা ব্যাবিলনের নিকট হইতে অনেক বিষয় ধার করিয়া থাকিলেও খিলান গ্রহণ করেন নাই। তাহার কারণ, খিলান তাঁহাদের ভাবের এবং রুচির সহিত খাপ খায় নাই। হিন্দুরাও সেই নিমিত্তই মন্দিরে খিলান ব্যবহার করেন নাই। খিলান ঠেলা-ঠেলি, প্রতিযোগিতা, অধৈর্য্য সূচিত করে। আর ভার বহনের জন্য সমান্তরালভাবে সাজান প্রস্তরফলক বা ইষ্টক সূচিত করে শান্তভাব, সংযম, তিতিক্ষা। স্থাপত্যের অন্তর্নিহিত ভাব বিষয়ে এতদূর পর্য্যন্ত গ্রীক এবং হিন্দুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হিন্দুর মন্দিরের উচ্চশিখর প্রকাশ করে হিন্দুহৃদয়ের অন্য একটী ভাব,

—গর্ভ-গৃহস্থ আরাধ্য বস্তু লইয়া তৃপ্ত না থাকিয়া আকাশ ব্যাপী অনন্তের অন্তে পহুঁছিবার জন্ত ঊর্দ্ধমুখী প্রবল আকাঙ্ক্ষা। গথিক গির্জার শিখর সূক্ষ্মাগ্র খিলানের পৃষ্ঠারূঢ় হইয়া এই আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু গথিক আকাঙ্ক্ষার এই তীব্রতার সহিত যেন অসহিষ্ণুতা জড়িত আছে। হিন্দুর মন্দিরের শিখরে এই ঊর্দ্ধমুখী আকাঙ্ক্ষার সহিত সংযম এবং তিতিক্ষার সামঞ্জস্ত সাধিত হইয়াছে।

হিন্দুর প্রাচীন স্থাপত্য হিন্দু সভ্যতার স্বভাবগত আর একটী লক্ষণ প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য শিল্প-শাস্ত্রে মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে বিস্তর নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি পাঠ করিলে মনে হয় হিন্দুর স্থাপত্য নির্জীব নকলনবিশী; ইহাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি নিয়োগের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু যে সকল প্রাচীন মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় স্থাপত্যে হিন্দুর উদ্ভাবনী শক্তি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। যে সকল মন্দির এখনও বিদ্যমান আছে তাহাদের আকারে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়; এবং মন্দিরের শোভা সম্পাদক ভাস্কর্য্যে ত বৈচিত্র্যের সীমাই নাই।

আর্য্যবর্ত্তের মধ্যযুগের মন্দিরের মধ্যে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ১ নং চিত্রে এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে আরম্ভ করিয়া শিখরের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মন্দিরের পীঠ (plinth) নাই। গর্ভগৃহের প্রাচীর প্রাঙ্গণ হইতে একেবারে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। শিখর যদিও বঙ্কিম ভাবেই গড়া হইয়াছে, মন্দিরের উচ্চতা নিবন্ধন শিখরের বঙ্কিম ছাঁদ শীঘ্র লক্ষিত হয় না; মনে হয় যেন শিখরটি কাত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে শিখর ঈষৎ বাঁকা হওয়ায় সেই কাত ভাব চক্ষুর পীড়াদায়ক হয় না। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের আমলকের দিকে তাকাইলে বোধ হয় কেহ যেন দেহ মন প্রাণ ঊর্দ্ধে টানিয়া তুলিতেছে। এই বিরাট রেখদেউলের রেখা বা ছাঁদ যেমন মনোহর, ইহার সকল অংশই তেমন মানানসহি।

লিঙ্গরাজ মন্দিরের বহির্ভাগের কারুকার্য্য এবং ভাস্কর্য্য সুন্দরও বটে এবং দেখায়ও সুন্দর। অনেক মন্দিরের কারুকার্য্য সুন্দর হইলেও সুন্দর দেখায় না। তাহার কারণ, কারুকার্য্যের বাহুল্য বশতঃ কোন অংশই ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না বা উপভোগ করা যায় না। লিঙ্গরাজ মন্দিরের কারুকার্য্যে এইরূপ চক্ষুর পীড়াদায়ক বাহুল্য নাই। মন্দিরের গাত্রে যে পার্শ্ব দেবতার মূর্ত্তি, অষ্টদিক্‌পালের মূর্ত্তি এবং ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটির চারিদিকে মনোহর লতাকর্ম্ম আছে। কিন্তু লতাকর্ম্মের বাহিরে খানিকটা যায়গা কারুকার্য্য-হীন সাদা থাকায় এই প্রতিমা এবং লতাকর্ম্ম ভালরূপে দেখা যায়। ২ নং চিত্র লিঙ্গরাজ মন্দিরের গাত্রের এইরূপ একটী দৃশ্য। গুরুদেব শিষ্যগণকে উপদেশ দানে রত। এমন স্বভাবসঙ্গত সৌম্য মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

৪

হিন্দুর দেবতা-কল্পনার প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুর দেবতা একাধারে উপাস্ত এবং উপাসক। ঋগ্বেদে আছে যজ্ঞভাগী দেবতারা নিজেরা যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদ মতে স্বয়ং প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির জন্ত তপস্তা করিয়াছিলেন। মহাভারত পুরাণাদিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে শিব মহাযোগী, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি প্রয়োজনমত তপশ্চর্য্যা করিয়া থাকেন। মধ্যযুগের দেবদেবী মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শনে এই উপাস্য উপাসকের ভাবের সুন্দর মধুর মিলন দেখা যায়। দেবতার প্রতিমার কায়ায় উপাস্ত দেবতার লক্ষণ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিয়াছে গভীর ধ্যানমগ্ন উপাসকের ভাব। এক সঙ্গে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় "কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগ্ন।"

মধ্যযুগের হিন্দু শিল্পীরা নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতে এই ধ্যানের বা যোগের ভাব প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অনেক মূর্ত্তিতে ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহারা এই ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং অনেক মূর্ত্তিতে অন্য প্রকার ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন। এবার আমার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং, তাম্রশাসনোক্ত খিজ্জিঙ্গকোট্টের, ভগ্নাবশেষ খননের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান অধিপতির পূর্ব্বপুরুষ বশিষ্ঠগোত্রীয় ভঞ্জবংশীয় প্রাচীন নৃপতিগণ সম্ভবতঃ দশম একাদশ শতাব্দে খিচিংএর ঠাকুরাণীর বর্ত্তমান মন্দিরের সন্নিহিত ভগ্ন স্তূপে পরিণত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভগ্নস্তূপে কুড়াইয়া বা খনন করিয়া যে সকল প্রতিমার ভগ্নাংশ পাইয়াছি উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটির চিত্র এখানে প্রকাশ করিব।

কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বর গীতায় কথিত হইয়াছে, এক সময় সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, কপিল, কণাদাদি মুনিগণ নর-নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তখন নরঋষি অন্তর্হিত হইলেন এবং নারায়ণ তাপসবেশ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিলেন। এমন সময়ে শশাঙ্কশেখর শিব আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের অনুরোধ অনুসারে ঋষিগণের নিকট জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উপসংহারে শিব বলিলেন—

"সোঽহং প্রেরয়িতা দেবঃ পরমানন্দ সংশ্রিতঃ।
নৃত্যামি যোগী সততং যস্তদ্বেদ স যোগবিৎ॥"

"(জগৎ) প্রেরয়িতা (পরিচালক), পরমানন্দময় যোগী (যোগাভ্যাসরত) সেই আমি সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকি; যে তাহা জানে সে যোগবিৎ।" তার পর—

"এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ যোগিনাং পরমেশ্বরঃ।
ননর্ত্ত পরমং ভাবমৈশ্বরং সম্প্রদর্শয়ন্॥"

"এই বলিয়া যোগিগণের পরমেশ্বর ভগবান্ (শিব) পরম ঐশ্বর ভাব দেখাইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।"

৩ নং চিত্রে দেখা যাইবে একখানি নটরাজ প্রতিমার উপরের অংশ এবং পাদপীঠ কোন প্রকারে জোড়া দিয়া ফটো তোলা হইয়াছে। প্রতিমার দেহের অধিকাংশ তাগই এখনও পাওয়া যায় নাই। তথাপি এই ভগ্নাংশ দেখিয়া মনে হয় পুরাণের বর্ণনা যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নটরাজের মুখমণ্ডলে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ জাত যোগানন্দ সমাধির ভাব চমৎকার প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; কমনীয় দেহখানি ধীর গম্ভীরভাবে নৃত্যের ছন্দে বিশ্বলীলার অভিনয় করিতেছে। তামিল দেশের সুপ্রসিদ্ধ নটরাজ মূর্ত্তিতে গতিশীলতা প্রবলতর। খিচিংএর মূর্ত্তিতে গতির ও স্থিতির, জ্ঞানের ও কর্ম্মের, সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।

৫ নং চিত্র খিচিংএ প্রাপ্ত একখানি মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির নিম্নভাগ বড় অসাবধানে খোদিত হইয়াছে, বোধ হয়, আনাড়ির হাতের কাজ। কিন্তু উপরার্দ্ধ বড় সুন্দর। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে মহিষমর্দ্দিনী স্তবে উক্ত হইয়াছে—

"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবী বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥"

"হে দেবি, একা তোমাতেই চিত্তে কৃপা এবং সমরনিষ্ঠুরতা একত্র দেখা যায়; তুমি ত্রিভুবনে বরদায়িনী।"

এই মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে পুরাণোক্ত ভাব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবী যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠোর কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অনুরোধে এই নিষ্ঠুর অসুর বিনাশ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। প্রাচীন গ্রীক ভাস্করেরা যখন হিরেক্লসকর্ত্তৃক সিংহবিনাশের চিত্র বা অন্য কোনরূপ ঘটনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তখন নিধনকারী দেবতার মুখমণ্ডল কতকটা সৌম্য করিয়াছেন। কি প্রাচীন গ্রীসে কি ভারতবর্ষে দেবাসুরের যুদ্ধে অসুর-বিনাশের চিত্রে গীতার—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"

এই আদর্শই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রীক ভাস্কর্য্যে হত্যাকারীর মুখে কৃপা প্রকাশিত হয় নাই।

৬ নং চিত্র খিচিংএর সুপ্ত বড় মন্দিরের নাগমূর্ত্তি; বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কি দেখিতেছেন!

৪ নং চিত্রে আর একটী নাগ আরাধ্য দেবতার গলে মালা পরাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। মুখমণ্ডল আনন্দে ঢল ঢল।

যে মন্দিরের শোভা সম্পাদনের জন্য খিচিংএর (মহিষমর্দ্দিনী ছাড়া) এই কয়েকটী এবং আরও অনেক দেব-দেবীর এবং নাগনাগীর মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল তাহা আকারে ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর বা রাজারাণীর মন্দিরের অপেক্ষা বড় না হইলেও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় ছিল। যে কিছু ভগ্নাংশ আমরা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা অবলম্বন করিয়া চিত্রেও যে এই মন্দিরের পূর্ণাবয়ব দেখাইতে পারিব এমন সাহস করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে এই মন্দিরের গর্ভ-গৃহের বহির্ভাগের অলংকারে অসাধারণ কলা-কৌশল এবং সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়াবাড়ির এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিদর্শন অপেক্ষাকৃত বিরল। যে জিনিষটা দেখিতে ভাল লাগে সেই জিনিষটাকে অতি প্রকাশিত বা অতি স্ফীত করিয়া দেখান শিল্পে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার পরিচায়ক। অলঙ্কারের বাহুল্যও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিদর্শন। খিচিংএর বড় মন্দিরের কারুকার্য্যে এই ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা লক্ষিত হয় না, সকল অঙ্গই সংযতভাবে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এই মন্দিরের শিখরে অতি অল্প কারুকার্য্য ছিল। যে স্থানের অলঙ্কার সহজে দেখা যায় না সেই স্থানকে অলঙ্কৃত করা বিড়ম্বনা মাত্র। উচ্চ মন্দিরের শিখর কারুকার্য্য খচিত করা বৃথা পরিশ্রম। লিঙ্গরাজের মন্দিরের শিখরও প্রায় অলঙ্কার শূন্য। মন্দিরের সৌন্দর্য্যের ভিত্তি—গঠনের ছাঁদ এবং মানানসহি অঙ্গাবয়ব। যে অলঙ্কার সেই ছাঁদ এবং মানানকে, দর্শকের অগোচর করিয়া রাখে, সেই অলঙ্কার স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে যত সুন্দর এবং সরস হউক না কেন, মন্দিরের হিসাবে অনর্থক।

৫

সুন্দর মন্দিরের এবং মূর্ত্তির দর্শন ও মনন যেমন রসবোধ বৃত্তির প্রস্ফুরণের সহায়তা করে, তেমনি কার্য্যকরী বৃত্তির প্রস্ফুরণেরও সহায়তা করে। লিঙ্গরাজের মত মহান্ মন্দির গড়িতে ও সাজাইতে যে অসামান্য ধৈর্য্য, সাবধানতা এবং শ্রমশীলতার দরকার হইয়াছিল তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে স্মরণকর্ত্তার অভ্যাসগত জড়তা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা কতক পরিমাণে শিথিল না হইয়া পারে না। অন্য জাতির এই প্রকার কীর্ত্তি দেখিলে অনেক সময় নৈরাশ্যের উদয় হইতে পারে; কিন্তু নিজের জাতির নিজের জাতির মহান্ কীর্ত্তি হৃদয়ে আশার সঞ্চার না করিয়া পারে না। উড়িষ্যা কতটুকু দেশ! প্রকৃত প্রস্তাবে উড়িষ্যা কয়দিনের জন্যই বা একেবারে স্বাধীন রাজ্য ছিল! উড়িষ্যার রাজাকে হয় গৌড়াধিপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইত, নয়ত বেঙ্গুওভাষী দক্ষিণ কলিঙ্গের রাজার পদানত হইতে হইত। গঙ্গ-বংশীয়েরা দক্ষিণ কলিঙ্গ হইতে আসিয়া উড়িষ্যা জয় করিয়া থাকিলেও, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহারা উড়িয়াদিগের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যেমন প্রাচীন গ্রীসের কাছে রোম সাম্রাজ্যকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও শক, তুখার, হূণ প্রভৃতি আক্রমণকারি-দিগকে প্রাচীন হিন্দুদিগের অনুগত হইতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইতিহাসে দেখা যায় বাহুবলে যাহা অসাধ্য, শিক্ষা-দীক্ষার বলে অনেক সময় তাহা সাধ্য; শিক্ষা-দীক্ষার বলে স্বরাজ্য কেন, সাম্রাজ্য লাভ করাও যাইতে পারে।

যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তখন হিন্দুর শিক্ষা-দীক্ষা মূল হইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতনের চরমসীমায় পহুঁছিয়াছিল। তিনি যেমন একদিকে বেদান্তদর্শন, উপনিষদাদির মূলের আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করিয়া শিক্ষা-দীক্ষাকে মূলের দিকে টানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমন আর একদিকে

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের সহায়তা করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দের শিক্ষাদীক্ষাকে সময়ের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষাবিধানের প্রকৃত বিধাতা হইয়াছিলেন তাঁহারা বর্ত্তমান লইয়াই ছিলেন, অতীতের দিকে চাহিয়া, এদেশের লোকের ধাত হিসাব করিয়া, বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিহিত শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, বিদ্যার্থীকে ইংরেজী ভাষা এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আধটু সংস্কৃত বা আরবী ফার্সি শিখান, এবং জ্ঞানরাজ্যের কতকগুলি আবশ্যক খবর দিলান। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যে মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক বিকাশ সাধন সে কথা যেন তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ শিক্ষার ফলে, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার বিরুদ্ধে এখন দেশব্যাপী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে যেন শিক্ষা জিনিষটার উপরই বীতরাগ হইয়াছেন। অনেকে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য,—জাতীয় শিক্ষা কি? এ সম্বন্ধে নানা-মুনি নানা মত প্রকাশ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা মনে হয় তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। আমাদের মনে হয়, যে শিক্ষা জাতিগত আত্মজ্ঞান দান করে তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। আমাদের জননী জন্মভূমি আমাদিগের স্বভাবে কোন্ কোন্ দোষগুণের বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে কি প্রকার মতি-গতি শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিয়াছি, যে শিক্ষার দ্বারা তাহা সঠিক জানিয়া লওয়া যায় তাহাই জাতীয়-শিক্ষা। যে যুগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ণমাত্রায় আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই কুষাণ-গুপ্ত-যুগের সাহিত্য, শিল্প, এবং দর্শন আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত। এই যুগেই রামায়ণ মহাভারত বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; অশ্বঘোষ, আর্যশূর, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতির কাব্য রচিত হইয়াছে; বৌদ্ধ-দর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; ষড়দর্শনের প্রচলিত ভাষ্য সঙ্কলিত হইয়াছে; এবং হিন্দু আর্য্য-শিল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিল্পে সমাজের বাহ্য এবং অন্তর্জীবনের চিত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিবিম্বিত হয়, এবং দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্বও দৃষ্টিগোচর হয়। এই শিক্ষাসংস্কারে ইউরোপের দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণীয় এবং কতক পরিমাণে অনুসরণীয়। ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষার জন্ম হইয়াছিল গ্রীসে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দে। তারপর মেসিডনীয়েরা সেই শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন; রোম তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগে খৃষ্ট ধর্ম্মের অনুচর ইহুদীয় সঙ্কীর্ণতা তাহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুর্দ্দশা হইতে ইউরোপ মুক্তিলাভ করিয়াছে কি উপায়ে? খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে ইটালী প্রবর্ত্তিত "রেনায়সান্স" বা নব শিক্ষা—অর্থাৎ গ্রীসের পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা ইউরোপকে মুক্তিদান করিয়াছে। আমাদেরও মুক্তির জন্য কুষাণ-গুপ্তযুগের শিক্ষা দীক্ষার পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। কিন্তু এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিবে কে? যাঁহারা দেশের নায়ক, দেশের ব্যবস্থাপক, তাঁহারা গণের হিতসাধনে এত ব্যস্ত যে, জনে জনের উন্নতি না হইলে যে গণের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নহে একথা হিসাব করিবার তাঁহাদের যেন অবসরই নাই। সুতরাং এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে বাঙ্গালা সাহিত্যকে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালার শিক্ষা-দীক্ষায় যে প্রাণের চাঞ্চল্য অধিকমাত্রায় দেখা যায়, তাহার কারণ বাঙ্গলা সাহিত্য। বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গালীর ভরসা।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

ভণ্ডের সার্থকতা

(গল্প)

পৌষ মাসের সন্ধ্যার কনকনে ঠাণ্ডায় চারিদিক যেন আড়ষ্ট। কলিকাতা সহরের কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়া শীতের ভারে জড়-সড় হইয়া গুটি মারিয়া মাটীর বুকে লুটাইতে ব্যগ্র। কলিকাতার কারখানা-বহুল স্থানগুলির রাস্তা দিয়া চলিতে পথিক গণের নিঃশ্বাস ধোঁয়াটে বাতাসের বাষ্পচাপে বুকের ভিতর যেন আটকাইয়া যাইতেছে।

কলুটোলার '...' ষ্ট্রীটে এটর্ণি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সদ্য রং করা নূতন তেতলা বাড়ী বিদ্যুৎ আলো বুকে ধরিয়া গর্ব্বভরে হাসিতেছে। এটর্ণি মহাশয়ের আলোকোজ্জ্বল সসজ্জ অফিস ঘর বা বৈঠক খানায় ল্যাজারাস কোম্পানীর খাস কারখানার তৈরী চেয়ার সোফা কৌচে গুটিকতক ধনী মাড়োয়ারী ও বাঙালী মক্কেল বসিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে এটর্ণি মহাশয়ের শ্রীমুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছে।

সবুজ বনাত ঢাকা সুবৃহৎ সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের কাছে একটা গদী মোড়া চেয়ারে বসিয়া প্রৌঢ় এটর্ণি মহাদেব চট্টো চুরুট টানিতেছিলেন। মহাদেব বাবুর চর্ব্বি-বহুল বেঁটে চেহারার মাঝে সুবিশাল ভুঁড়ি এবং আকণ্ঠ বেষ্টিত গরম কাপড়ের মোটা ইংরেজি পোষাকে তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র হস্তপদমুণ্ড বিশিষ্ট সজীব ফুটবলের মত দেখাইতেছিল। বুকের উপর হীরক-খচিত টাইপিনে আঁটা রঙিন রেশমী টাই দুলিতেছে। আঙুলে হীরার আঙটি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। মুখের দাড়ি গোঁফ ক্ষৌর-মসৃণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখে লুব্ধ-চঞ্চল প্রখর দৃষ্টি। পুরু পুরু অধরোষ্ঠ দুটি প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতার ভারে যেন উল্টাইয়া পড়িতেছে! মানুষটির দিকে চোখ পড়িলেই মনে হয়, লোকটির সব দিক দিয়া যেন্নার ঝাঁক—বিপুল দম্ভ ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রবীণ এটর্ণির ডানদিকে বসিয়া তাঁহার নব-জামাতা নবীন এটর্ণি অরুণ বাবু। তাঁহার বেশ-ভূষার পারি-পাট্য শ্বশুরের বেশ-বিন্যাসের অনেক উচ্চে। অধিকন্ত বাড়ানো ভ্রূ, কামানো গোঁফ এবং ব্যারিষ্টারী ফ্যাশানের কেশ প্রসাধনে তাঁহার সুশ্রী তরুণ মুখমণ্ডল অধিকতর শ্রীমান। অরুণ বাবুর অদূরে তীমকান্তি অনন্ত কেরাণী বসিয়া আছেন।

এটর্ণি মহাদেববাবু মাড়োয়ারী মক্কেলদের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া সসম্মানে তাঁহাদের বিদায় দিলেন। তারপর বাঙালী মক্কেলদের একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার সেটার কি হল?"

বাঙালী মক্কেল বলিলেন, "আপনি যেমন যেমন শিখিয়ে দিয়েছিলেন, কান্তিবাবুকে ঠিক তেমনি গিয়ে বল্লাম—"

অনন্ত কেরাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "কি কি কথা বলেছিলেন আগে বলুন—"

বাঙালী মক্কেল বলিলেন, "বল্লাম কারবারে পাঁচ বছরের লোকসানে যা দেনা হয়েছে, তার অংশ নিতে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু বাবা মারা যাবার পর দশ বছরের লাভের অংশ আমাদের দিতে হবে।"

মহাদেব চট্টো বলিলেন, "হাঁ। তাতে কি বল্লেন?"

বাঙালী মক্কেল বলিলেন, "তিনি জবাব দিলেন, পাঁচ বছরে পনের হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, কিন্তু দশ বছরের লাভ মাত্র বারো হাজার। অর্থাৎ এখনো দেনা তিন হাজার বাকি!"

অরুণবাবু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "Impossible! কোর্টের আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন ও সব বদমাইসকে সিধা করা যাবে না। আপনারা নালিশ করুন।"

বাঙালী মক্কেলটি বিপন্ন ভাবে মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,"তাই করব মনে করছিলাম. কিন্তু মা কান্নাকাটি করছেন। বলছেন উনি আমার স্বর্গগত পিতার বহু দিনের হিতৈষী বন্ধু, আজ সামান্য দু পাঁচ হাজার টাকার জন্যে তাঁকে নালিশ ফ্যাসাদে ফেলে জব্দ করা উচিত হবে না।"

অরুণবাবু বক্রহাস্যে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। মহাদেববাবু উগ্র ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তাহলে আর আমার সময় নষ্ট করতে এসেছ কেন? বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে যদি মেয়েলি sentimentই বেশী মূল্যবান মনে কর, তাহলে আইন আদালত গুলোর কোন দরকারই নেই। আমরা বাপু ও সব আধ্যাত্মিক বুজরুকি বুঝি না, আমরা ও সব কথার কি বলব? হাঁ, এস আইনের দিকে, আমরা তোমার হয়ে লড়ছি। —না হয়, যা বোঝ কর।"

তিরস্কৃত ভদ্রলোকটি অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। অরুণবাবু অন্য একটি মক্কেলের দিকে চাহিয়া শ্লেষ-মিশ্রিত বাক্য হাস্যে বলিলেন, "এ দুনীয়ার একদল লোক আসে ঠকাতে, আর একদল লোক আসে ঠকতে। নিজের জোরে যিনি প্রথম দলে স্থান নিতে না পারেন, struggleএর চোটে তাঁকে দ্বিতীয় দলে গিয়ে পড়তেই হয়। কোন কৃত্রিম ভাবুকতাই জীবনের সে লোকসানকে ঠেকাতে পারে না, কি বলুন মশাই?"

মক্কেলটি এই মন্তব্যে মহা চরিতার্থ হইয়া মহাহ্লাদে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে, যা বলেছেন মশাই! এ দুনীয়ার নিয়মই হচ্ছে হয় ঠকো, নয় ঠকাও।"

তৃতীয় মক্কেলটি নিজের কোটের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে মৃদু-হাস্যে বলিলেন, "তবে নির্ব্বিবাদে পরকে ঠকাতে হলে পকেটে কিছু পয়সা থাকা চাই। খালি পকেটে ঠকাঠকির কারবারে নামলেই বিপদ! কেন-না ধরা পড়লে উদ্ধারের পথ থাকে না।"

মহাদেব চট্টো সুগম্ভীর মুখে বলিলেন, "উদ্ধারের আবার পথ থাকে না? সব দিকেই পথ! তবে ধার্ম্মিক পরমহংস হয়ে চল্‌তে গেলে কোন দিকে পথ দেখতে পাবেন না। নইলে বুদ্ধি থাকলে দেখতে পাবেন, পকেট খালিই আর থাক ভর্ত্তিই থাক, পয়সা চারিদিকে ছড়ানোই রয়েছে, শুধু কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। উপার্জ্জনের পথে ধর্ম্মভয়, চক্ষুলজ্জা থাকলে উপার্জ্জন হয় না।"

এই উপাদেয় যুক্তি মাহাত্ম্যে ঘরের সমস্ত লোকগুলি ক্ষণকালের জন্য যেন মন্ত্রমুগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বোধ করি সকলেই অতঃপর নিজ নিজ ভবিষ্যৎ উপার্জ্জনের অবাধ স্বচ্ছলতার সোনার স্বপ্ন একবার কল্পনা চক্ষে দেখিয়া লইলেন। ধর্ম্মভয়, নীতিজ্ঞান, চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি কৃত্রিম ভাবুকতাগুলা এ পৃথিবীতে উন্নতিকামী মানুষদের সমস্ত উন্নতির যে কত বড় প্রতিবন্ধক, সে তত্ত্বটা দিব্যচক্ষে সকলেই পরিষ্কাররূপে যেন দেখিতে পাইলেন। সুবৃহৎ তেতলা চারতলা বাড়ী, সুদৃশ্য মূল্যবান মোটর গাড়ী, ঘরের ভিতরের আরামপ্রদ আসবাব ও উজ্জ্বল বিদ্যুৎবাতি যে ধর্ম্মভয়, চক্ষুলজ্জা, নীতিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় না, এগুলি উপার্জ্জনের পথ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এ কথা লুব্ধ-বিহ্বল চিত্তে একবার সকলেই স্মরণ করিয়া লইলেন। ভিতরের দিকে একটা দম্‌কা ঝড়ে অনেক কুসংস্কার, কৃত্রিম ভাবুকতা ওলট পালট হইয়া গেল। কিন্তু সে ওলট পালটের সংবাদ কেহ কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না, সকলেই বিশেষ যত্নে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া নীরব রহিলেন।

এই অবকাশের ফাঁকে শোনা গেল, বাহিরের রাস্তায় একখানা ভাড়াটে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল এবং কে একজন করুণ-কণ্ঠে দরোয়ানকে প্রশ্ন করিল, "এই-ত ছত্রিশ বাই দুই নম্বর বাড়ী? মহাদেব বাবু বাড়ীতে আছেন?"

মুহূর্ত্তে মহাদেব বাবু টেবিলের কলিং বেল টিপিয়া দরোয়ানের উদ্দেশে সাঙ্কেতিক আহ্বান জানাইয়া নিজে উঠিলেন। ব্যস্ত চরণে পাশের কামরার দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, "মোহিতবাবু আপনার কাগজগুলি আর ফি'র টাকা অনন্ত কেরাণীর কাছে জমা দিয়ে

যান, আপনি পরশু সকালে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আর বসন্ত বাবু আপনি অনুগ্রহ করে কাল সন্ধ্যায় আসবেন, আজ আপনার মামলার কথা অরুণকে বুঝিয়ে দেন। আমি পরে সব ঠিক করব।"

দুয়ারের রেশমী পর্দা ঠেলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

২

মহাদেব বাবু পাশের কামরায় ঢুকিতেই বিপরীত দিক হইতে দরোয়ান ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল। বিনা প্রশ্নেই নিবেদন করিল, "খিদিরপুরসে জানানা সোয়ারী আয়া। আপ্ কা মুলাকাৎ মাংতে হ্যায়?"

"জানানা সোয়ারী?" বলিয়া মহাদেববাবু চিন্তিত ভাবে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "শোফারকো বোল্ দেও, হাম্ পাঁচ মিনিট্‌কা ভিতর গাড়ী মাংতা।"

"যো হুকুম"—বলিয়া দরোয়ান প্রস্থানোদ্যত হইয়া পুনশ্চ ফিরিয়া দাঁড়াইল। মাথা চুলকাইয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "উয়ো লোক হুজুরকো মুলাকাৎ মাংতে থে। কেয়া বোলেঙ্গে?"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হুজুর বলিলেন, "উয়ো লোক্‌কা হুকুম তামিল করণেকে ওয়াস্তে হাম তুমকো তলব্ নেহি দেতা। তোম্ পর্‌লে মেরা হুকুম দেখো—"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। দরোয়ান ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের দিকে ছুটিল।

মহাদেব বাবু অন্তঃপুরে ঢুকিতেই দেখিলেন, সিঁড়ির উপর হইতে একটি তেরো চৌদ্দ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ বালিকা নামিয়া আসিতেছে। অপ্রসন্ন মুখে তিনি বলিলেন, "এই রুজি, তোর মা কোথা?"

মেয়েটি বলিল, "মার মাথা ধরেছে, শুয়ে আছেন।"

মহাদেব বাবু বলিলেন, "কোথা?"

"দক্ষিণ দিকের ঘরে।"

"আচ্ছা। বাড়ীর সকলকে বলে দে, যেন কেউ এখন তোর মাকে বিরক্ত করতে যায় না। বাইরে থেকে মেয়েরা কেউ দেখা করতে আসে ত তোরা বাইরে থেকেই বিদেয় করে দিস, বুঝলি?"

"আচ্ছা।"

মহাদেব বাবু টক্ টক্ করিয়া উপরের দক্ষিণ দিকের ঘরে চলিলেন। ঘরের বিদ্যুৎ আলো নিবান ছিল, অন্ধকারে দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, "গিন্নি জেগে আছ?"

অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে উত্তর হইল, "আছি।"

"মাথা ধরেছে তোমার?"

"হুঁ।"

মহাদেব বাবু বলিলেন, "ভালই হয়েছে। তুমি শুয়ে থাক। খিদিরপুর থেকে মিহিরের মা এসেছেন। তুমি আজ আর ওঁকে দেখা দিও না। আমিও বাইরে চল্লুম। যেমন জ্বালাতে এসেছে, তেমনি জব্দ হয়ে ফিরে যাক্।"

অন্ধকারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া গৃহিণী সন্ত্রস্ত ভাবে বলিলেন, "পিসিমা নিজে এসেছেন? কৈ, কোথা?"

কর্ত্তা রুষ্ট স্বরে বলিলেন, "যেখানেই হোক। তুমি অত বাড়াবাড়ি কোর না। আমি বার বার বলেছি অত আমল দিও না, ওতেই ওদের আস্কারা বেড়ে যাচ্ছে। যদি ওরা বোঝে যে টাকা পাবার আশা নেই, তা'লে ওরা এমন করে বার বার উত্যক্ত করতে আসে না। বুঝতে পারছ আমার কথা?"

গৃহিণী একটু নীরব থাকিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন "বুঝতে ত পারছি। কিন্তু একদিন যে বড় বিশ্বাস করেই শুধু আত্মীয় বলেই বিধবার সর্ব্বস্ব ঝুলি ঝেড়ে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সে দিনের কথা—"

বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়িল! দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কর্ত্তা চাপা গর্জ্জন সহ বলিলেন, "চপ্‌রাও! মুখ সামলে! অত আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকলে আমার আর করে' খেতে হ'ত না। পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দাও অমনি বল্লেই হল? টাকা কি খোলামকুচি না কি?"

ভালমানুষ গৃহিণীর বুঝিবার পক্ষে এই তর্জ্জনটাই যথেষ্ট! তিনি স্তব্ধ রহিলেন।

কর্ত্তা রাগ সামলাইয়া নরম সুরে বলিলেন, "আইন-মতে আমার কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নেয়নি কেন? এভাবে জ্বালাতন করা, ওদের অন্যায়। টাকা ফেরৎ পাবার যদি ইচ্ছেই ছিল, তাহলে তখন টাকা হাতছাড়া করেছিল কেন?"

গৃহিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিহির ঠাকুরপোর বড্ড অসুখ শুনেছ ত? এই শীতের রাতে বুড়োমানুষ কষ্ট করে এসেছেন যখন, শুধু হাতে ফেরান কি ভাল?"

কর্ত্তা জুতা ঠুকিয়া বাঁধানো নকল দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "তোমার মত নচ্ছার মেয়েমানুষকে চাবুক দেওয়াই ঠিক! আমি এক পয়সাও দেব না, তোমার ক্ষমতা থাকে, বাপের ঘর থেকে টাকা এনে দাও। না হয় নিজে রোজগার করে দিতে পার ত দিও।"

অন্ধকারেই নিঃশব্দে গোপনে গৃহিণী চোখের জল মুছিলেন। কর্ত্তা প্রস্থানোদ্যত হইয়া তীব্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আমি একে সাত ঝঞ্ঝাটের মানুষ। কত কষ্টে মাথা খাটিয়ে সকল দিক সামলে চল্‌ছি। এমন করে না চললে তোমার ছেলেদের বিলেত পাঠানো, মেয়ের জন্যে এটর্ণি, ডাক্তার জামাই আনা মাথায় উঠ্‌ত। গুষ্টিশুদ্ধ ওই ফুটপাথে গে দাঁড়াতে হ'ত আজ, তার খোঁজ রাখ? বড় আদায় খয়রাৎ করবার পয়সা দেখছ! কিন্তু এ দিকে যে কি করে দিন চালাচ্ছি, তার খোঁজ রাখ না ত! ভাল চাও তো যা বল্‌ছি শোন। সাবধান, বাড়ী ফিরে যদি শুনি, আবার তেমনি করে লুচি মোণ্ডা খাইয়ে ওদের খাতির করেছ, তা হলে আজ তোমারি একদিন কি আমারই একদিন!"

কর্ত্তা ফিরিয়া চলিলেন। বারেন্দা দিয়া যাইতে যাইতে উচ্চ কণ্ঠে সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "আজ আমার ফিরতে রাত বারোটা হবে। বাড়ী এসে খাবার সময় হবে না, বড্ড কাব। আমার খাবার রেখো না।"

বাহিরে মোটর প্রস্তুত ছিল। নীচে আসিয়া খানসামার নিকট হইতে হ্যাট্ ও ছড়ি লইয়া মহাদেব বাবু তাড়াতাড়ি মোটরে উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটি ষোল সতের বৎসরের বালক আসিয়া প্রণাম করিল। ছেলেটির কৃশ মলিন মূর্ত্তি, দৈন্য-সূচক বেশ-ভূষা এবং পায়ের ছেঁড়া জুতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ভদ্রগৃহের ছেলে হইলেও বেচারার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ছেলেটির চোখে মুখে নিদারুণ উদ্বেগ ও ভীতির চিহ্ন; ছেলেটির মুখের দিকে চাহিলেই মনে হয় সে যেন কোন এক অজ্ঞাত অপরাধের বেদনায় সন্তপ্ত; অথবা যেন অনভ্যস্ত হাতে চুরি করিতে আসিয়া এইমাত্র সে হঠাৎ ধরা পড়িয়াছে!

ছেলেটি প্রণাম করিতেই মহাদেব বাবু তার দিকে চকিত কটাক্ষে একবার চাহিয়াই, প্রতিনমস্কারচ্ছলে টুপিটি দোলাইয়া দ্রুতপদে চলিলেন। ছেলেটি ত্রস্তে তাঁহার অনুসরণ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মা এসেছেন খিদিরপুর থেকে। একবার অনুগ্রহ করে দেখা করে যান।"

মহাদেব বাবু যেন শুনিতে পান নাই, এমনি ভাবে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "উঃ? আমার কিছু বল্‌ছ?"

ছেলেটির জিভ্ যেন জড়াইয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ,—মা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে।"

পরম অজ্ঞতার ভাণ করিয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, "মা কে?"

ছেলেটি প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "খিদিরপুরের মিহির বাড়ুয্যের ভাই আমি, অনিল বাড়ুয্যে। আমার মা—"

মহাদেব বাবু বলিলেন, "অ! তুমি অনিল? আমি চিন্‌তে পারি নি। তার পর, বাড়ীর সব ভাল ত?"

ছেলেটি কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে না, দাদার বড় অসুখ। সেই জন্যেই মা চিঠি লিখেছিলেন আপনাকে।"

অপ্রসন্ন হইয়া নিরুৎকণ্ঠে মহাদেব বাবু বলিলেন,

"হাঁ সে চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার জবাব দেবার মত কিছুই নেই বাবু, নইলে কি চুপ করে থাকি? তোমার মাকে বুঝিয়ে বলগে এর পর একদিন আমি অবকাশ মত গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব, আজ দেখা করবার সময় নেই। ঐ দেখ গাড়ী দাঁড়িয়ে, এখন জরুরী কাযে যাচ্ছি, এর পর রাত বারোটার ফিরব। আজ দেখা হবে না, তোমরা আজ বাড়ী যাও।"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোটরে উঠিয়া বসিলেন। সোফার মোটরে ষ্টার্ট দিয়া ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া বসিল। প্রস্থানোন্মুখ গাড়ী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ছেলেটি ছুটিয়া আসিয়া মোটরের পাশে দাঁড়াইল। উদ্বেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনার সঙ্গে মার দেখা করা আজ বিশেষ দরকার। আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমরা এইখানেই রইলুম।"

রুক্ষস্বরে মহাদেব বাবু বলিলেন, "থাক্তে পারো। কিন্তু আজ আমি ফিরব কি না সন্দেহ। তা ছাড়া অত রাতে ফিরে দেখাশোনা করা সম্ভব হবে না, আমার বাড়ীতেও আজ অসুখ বিসুখ। তোমরা এই সময় ফিরলেই ভাল করতে।"

হতবুদ্ধি বালককে দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারণের অবকাশ না দিয়া মোটর দৌড়িল।

৩

বাস্তবপক্ষে মহাদেব বাবুর কোন কাযই ছিল না। সুতরাং উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছ পাঁচটি বন্ধুর আড্ডায় ঘুরিয়া, শেষে ইংরেজি হোটেলে গিয়া মোটা দক্ষিণা দিয়া রসনা ও উদরের তৃপ্তিবিধান পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ গোলাপী নেশা লইয়া খোশ মেজাজে বাড়ী ফিরিলেন। রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা বাজিয়াছে। এত রাত্রে কোনও নির্লজ্জ পাওনাদার দুয়ারে ধরা দিয়া বসিয়া থাকিবে এমনটা আশা করা সুখবিলাসী মোটর বিহারী মূল্যবান পরিচ্ছদ মণ্ডিত মহাদেব বাবু অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

মোটর বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া থামিল। মহাদেব বাবু গাড়ী হইতে নামিতেছেন, এমন সময় মাথায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া আবার সেই ছেলেটি আসিয়া সাম্নে দাঁড়াইল।

বৈঠকখানায় মক্কেলের চিহ্ন নাই, হাতে কাযের ভিড় নাই, উদর পূর্ণ—সুতরাং মেজাজ তখন পরম শীতল। মহাদেব বাবু এবার স্বয়ং উপযাচক হইয়া বলিলেন, "কি হে অনিল, এখনো রয়েছ যে?"

অনিল শুষ্ক ম্লানমুখে বলিল, "মা আপনার জন্যে বসে রয়েছেন।"

গম্ভীর ভাবে মহাদেব বাবু বলিলেন, "অনর্থক বসে থাকা। চল বাড়ীর ভেতর।"

উভয়ে বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় রাস্তার ওদিকের ফুটপাথ হইতে একটা লোক ছুটিয়া আসিল। লোকটার চেহারা ষণ্ডামার্ক, পোষাক পরিচ্ছদ পশ্চিমা ভদ্রলোকের মত। নিকটে আসিয়া একটা ছোট সেলাম করিয়া লোকটা বাজখাই সুরে বলিল, "তোমার তল্লাসে সারা এটর্ণি পাড়া ক'দিন ঘুঁড়ছি মুশই, এইখানে নতুন বাসা নিয়েছ কেন?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, "তুমি কে বল দেখি? কাকে খুঁজছ?"

রক্ত চক্ষু ঘুরাইয়া লোকটা বলিল, "তোমায় গো মহাদেব বাবু তোমায় খুঁজছি। হামায় চিন্তে পারছ না? হামী তোমাদের পুরোণো দোস্ত পীর মহম্মদ। আজ পনরো রোজ জেল থেকে খালাস হয়েছি।"

জনাকীর্ণ রাস্তার দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া মহাদেব বাবু নিম্নস্বরে বলিলেন, "দেউড়ীর ভেতর এস। এখুনি পুলিসের লোক এসে পড়বে হয় ত।"

তিন জনে দেউড়ীর ভিতর ঢুকিলেন। দারোয়ান তটস্থ হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, মহাদেব বাবু বলিলেন, "বাহার যাকে খাড়া রও।"

দারোয়ান বাহিরে গেল। অনিলের দিকে চাহিয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, "ওহে তোমার মাকে একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি শীঘ্র যাচ্ছি। তুমি যাও।"

অনিল ভিতরে গেল। তার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া পীরমহম্মদ বলিল, "এ ছোকরা কি তোমার পাওনাদার আছে না জী ?"

শুষ্ক স্বরে মহাদেব বাবু বলিলেন, "না। ও ছোক্‌রা আমার আত্মীয়।"

বিকট হাস্তে পীরমহম্মদ বলিল "হাঁ হাঁ সে হামি শুনেছে। সেই বাংলায় ওর মায়ের দশ হাজার রূপেয়া মেরে দিয়েছ, না ? তুমি পাকা খেলওয়াড়্ বাবু সাহেব! আচ্ছা, ভালা হোক্। হামার আবি তিন চারশো রূপেয়া হাওলাৎ দেও তো।"

চমকাইয়া উঠিয়া শুষ্কমুখে মহাদেব বাবু বলিলেন, "তিনশো টাকা ? রামচন্দ্র বল! আমার বাক্সে আজ গোটা ত্রিশ টাকাও আছে কি না সন্দেহ।"

পীর মহম্মদ পাকা ব্যবসায়ী। মহাদেব বাবুর কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্মিত মুখে বলিল— "বাবু সাহেব তোমার শুগামি ঝুটা বাতে, ঔর আংরেজকা আইন আদালতে! লেকিন্ পীর মহম্মদের শুগামি—সাচ্চা ছোরার কাচ্চা ঘা'ও মে! ঝুট্ বাৎ মাৎ বোলো। যোহিত মিস্তির আজ সাম্‌কো বহুৎ পাঁচশো পঁচাশ রূপেয়া তোমার বাড়ীতে দিয়েছে, হামি খবর রাখে। চারশো রূপেয়া নিকালো বাবু, বহুৎ সুবিস্তা করে বলেছি। একরোজ হামার চার হাজার খাঁ'কে হামার জেল্‌মে ভেজিয়াছিলে, খেয়াল হ্যায় ?"

মহাদেব বাবু নীরস কণ্ঠে বলিলেন, "আমরা কি ইচ্ছা করে মক্কেলকে জেলে পাঠাই বাপু ? সেবার তোমার কেস্ খারাপ হয়ে গেল, আমরা অত চেষ্টা করলুম—"

উত্তেজিত হইয়া পীরমহম্মদ বলিল, "তোম্‌রা হরিহর উকিলকা ভুড়ি ফাঁড়কে হাম্‌রা দো হাজার রূপেয়া একরোজ নিকালে লিবই বাবু সাহেব! ও শালা হামারা সাৎ বহুৎ দাগাবাজি কিয়া! হম জেলকো নেহি ডর্‌তা, লেকিন জেলমে যব যানাই পড়া তব্ রূপেয়া কাহে ছোড়েঙ্গে ?"

ক্রোধের উত্তেজনায় পীর মহম্মদের হিন্দী ক্রমে উর্দ্দুতে চড়িতেছিল।

সহানুভূতি-বিগলিত কণ্ঠে মহাদেব বাবু বলিলেন "সেত বটেই, হরিহর বাবু তোমার অত টাকা খেয়ে ভাল কাষ করেন নি। কিন্তু আমার খাটুনি দেখেছ তো ? তোমার সঙ্গে নিয়ে দুপুর রাত পর্য্যন্ত ব্যারিষ্টার-দের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, নিজে ত আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তোমার জন্তে যত খেটেছি এত খাটুনি আর কখনো—"

বাধা দিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পীর মহম্মদ বলিল, "উস্‌মে মেরা কেয়া কাম্ হুয়া ? কুছ নেই—"

মহাদেব বাবু বলিলেন, "আহ-হা! সে কি আমাদের দোষ ? ডাক্তার কবিরাজ রোগী দেখে ওষুধ দেয়, পয়সা নেয়, তারপর রোগী যদি না সারে, তাহলে কি নিজের পারিশ্রমিক ফিরিয়ে দেয় ?"

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রূঢ় গর্জ্জনে পীর মহম্মদ বলিল, "জাস্তি বড়বড়াও মৎ! পীর মহম্মদকো পছান্তা নেহি ? দোস্তি মাঙ্গো তো চারশো রূপেয়া দে দেও, ব্যস্ চলা যাতা হুঁ। নেহি ত দুস্‌মনি মাঙ্গো তো, জান যায়েগা বাবুসাব। হাম্ সাচ্চা বাৎ বোলা, আব্ তোম্‌রা যো খুশী—বোল্ দেও।"

গায়ের কাপড় সরাইয়া পীর মহম্মদ ইঙ্গিতে দেখাইল,—কোমরে দীর্ঘ ছোরা! দারুণ শীতের রাত্রে মহাদেব বাবুর কপালে ঘাম ফুটিয়া উঠিল, দ্রুত নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। ইতস্ততঃ চাহিয়া একটু কাশিয়া শুষ্ক বিনীত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "না, না, ওসব কথা তুমি মনে করছ কেন ? তবে কি না— কথা হচ্ছে কি—"

পীর মহম্মদ বুঝিল, এই ভূমিকার শেষ পরিণামে বহু আপত্তিই বাহির হইবে। মুহূর্ত্তে সে ছোরা খুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তীব্র কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "মুঝে ঠিক বোল দেও রূপেয়া আভি মিলে গা, ইয়া নেহি ?"

মহাদেব বাবুর আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল।

পীর মহম্মদের সে কর্কশ কণ্ঠধ্বনি দেউড়ীর থিলানের গায়ে প্রতিহত হইয়া চারিদিকে যেন গম্ গম্ করিয়া উঠিল। মহাদেব বাবু স্পষ্টই বুঝিলেন এই গোঁয়ার গুণ্ডাটা আর যাই হউক,—এ ব্যক্তি আত্মীয়-বালক অনিলচন্দ্রের মাতা নহে। দুর্ব্বলকে ফাঁকি দিবার সময় অনেক ফুসুম খাটে, কিন্তু সবল যখন পদাঘাত করিয়া লইতে আসে, তখন আইন কানুন গুলা বড় বিশৃঙ্খল বোধ হয়? নিরুপায় ভাবে মাথা চুলকাইয়া ক্লেশ পীড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আচ্ছা থাম. গোল-মাল কোর না। তোমার টাকা দিচ্ছি। ওরে কে আছিস, অনন্তকে ডাক তো।"

প্রভুর আদেশ মত দরোয়ান বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। আদেশ মাত্রই "যো হুকুম" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া নিদ্রিত অনন্ত বাবু কেরাণীকে ডাকাডাকি জুড়িল। পীর মহম্মদ ছোরা যথাস্থানে রাখিল।

মহাদেব বাবু ইতস্ততঃ চাহিয়া করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "ভাখো পীর মহম্মদ, টাকাটা তোমায় দিচ্ছি বটে, কিন্তু এটা এক রকম ধার করেই দিচ্ছি। কথাটা গোপন রেখো, এমন কি আমার কেরাণী দরোয়ানের কাছেও একথা প্রকাশ কোর না। কথাটা জানা জানি হলে এখুনি চারিধার থেকে সব পাওনাদার ছুটাছুটি করে আসবে।"

অনন্ত কেরাণী চোখ রগ্ড়াইতে রগ্ড়াইতে বিশাল ভুঁড়ির ভারে হাঁসফাঁস করিয়া ছুটিয়া আসিল। মহাদেব বাবু ঢোক গিলিয়া ক্লিষ্ট ভাবে বলিলেন, "ওহে অনন্ত, শ তিনেক টাকা নিয়ে এস।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া পীর মহম্মদ বলিল "আউর্ এক শো?"

মিনতি-করুণ কণ্ঠে মহাদেব বাবু বলিল, "ভাখো, সেটা আর এক দিন এসে নিও। কাল সকালে উঠেই আমার সংসার খরচ আছে, তারপর বাড়ীতে আমার স্ত্রীর অসুখ—"

ঘণ্টা কতক আগে এই মহাদেব বাবু শিকারী সাজিয়া শিকার-মক্কেলকে বৈষয়িক ব্যাপারে সেন্টিমেন্টের অসারতা সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন। মূর্খ গুণ্ডা পীর মহম্মদ সে উপদেশ শুনে নাই, শুনিলে সম্ভবতঃ নিজের শিকারের উপর এখন সেই উপদেশ বর্ষণ করিয়া বলিত— "তোমার সংসার খরচ আছে, তোমার স্ত্রীর অসুখ, তাতে আমার কি? আমার বহুৎ টাকা গিলিয়াছ, আজ তার কিঞ্চিৎ উগ্রাইয়া না দিলে ছাড়িব না।"

কিন্তু পীর মহম্মদ লেখাপড়া শিখিয়া প্যাঁচালো বুদ্ধির জোরে গুণ্ডামি করিতে অভ্যস্ত নয়, তার গুণ্ডামি সোজাসুজি গায়ের জোরে। সুতরাং মহাদেব বাবুর অনুনয়ে কিঞ্চিৎ সদয় হইয়া বলিল. "আচ্ছা ভাইয়া, তুমারা খরচা রহনে দেও, আভি তিন শো লাও।"

একটা তুচ্ছ ব্যক্তিকে এটর্ণি প্রভুর সঙ্গে সমান বিক্রমে কথা কহিতে দেখিয়া অনন্ত কেরাণীর সুপ্তি-জড়িত মস্তিষ্ক যথেষ্ট বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তুচ্ছ পরিচ্ছদে আবৃত হইলেও লোকটা যে কোন একজন মহৎ ব্যক্তি না হইয়া যায় না, এটুকু অনুমান করিয়া সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া টাকা আনিতে ছুটিল।

তিন মিনিটের মধ্যে ত্রিশখানি দশ টাকার নোট আনিয়া, অনন্ত কেরাণী পীর মহম্মদের হাতে গণিয়া দিল।

টাকা পাইয়া পীর মহম্মদ অপেক্ষাকৃত মোলায়েম হইল। লম্বা সেলাম ঠুকিয়া বলিল, "দো হপ্তা বাদ আকে বাকী রূপেয়া লিয়ে যাব।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে দ্রুত পদে অদৃশ্য হইল।

৪

ঘড়িতে টং টং করিয়া বারোটা বাজিল।

চোর পলাইবার পর অনেকের বুদ্ধিই অনেক দিকে বাড়ে। মহাদেব বাবুরও বাড়িতে কসুর হইল না। ঐ গুণ্ডাকে দেউড়ী হইতে দক্ষিণা দিয়া বিদায় না করিয়া কোন গতিকে যদি ঘরের ভিতর আনিয়া বসান হইত, তারপর টেলিফোঁযোগে যদি পুলিসকে খবর দেওয়া

যাইত, তারপর—তারপর—ইত্যাদি অনেক কথাই মহাদেব বাবুর মনে হইল। কিন্তু অসময়ে সেগুলা মনে হওয়ায় তিন শো টাকার শোক, তিন লক্ষকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিল। মহাদেববাবু নিজের আঙুল কামড়াইতে লাগিলেন।

সত্য বটে, তিনি এক সময় বিপদগ্রস্ত অবস্থায় ঐ গুণ্ডাটাকে হাতে পাইয়া অতি অযথা পরিমাণেই তার রুধির শোষণ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া লোকটা এতদিনের পর গলায় আঙুল দিয়া অবলীলাক্রমে সে রুধির বাহির করিয়া লইবে, এ কি সহ্য হয়? এ দিকে ও সব শ্রেণীর লোককে চটাইলে ধন প্রাণ নিরাপদ নয়। হায়, কি বকুমারি করিয়াই আজ রাতে তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন।

এই আক্ষেপটার সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ হইল, অন্তঃপুরে আর একটা হতভাগিনী পাওনাদার অপেক্ষা করিতেছে! মহাদেব বাবুর বিষাক্ত মেজাজ আরও বিষাইয়া উঠিতেছিল—কিন্তু তখনই কি একটা কথা মনে পড়ায় তিনি আত্ম-সম্বরণ করিলেন। খানিকটা ভাবিয়া মনে মনে একটা মৎলব আঁটিলেন। তার পর মাথা দোলাইয়া নিজমনে উৎফুল্ল হইয়া স্বগত বলিলেন, "হুঁ, শাণিত ছুরি নিয়ে যে দাবী করতে এসেছিল তাকে ঠেকাতে পারিনি—সে লোকসান এবার সুদ সমেত উসুল করা যাক! নিরুপায় হয়ে চোখের জল নিয়ে যে দাবী করতে আসে, তাকে বুড়োআঙুল দেখানই বুদ্ধিমানের কায!"

ভীষণ গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়া তিনি বাহিরের অফিস ঘরে বসিলেন। ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "খিদিরপুর থেকে যারা এসেছে, তাদের এইখানে ডাক।"

মিনিট পাঁচেক পরে শঙ্কিত অনিলের সঙ্গে এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকিলেন। বৃদ্ধা অস্থি চর্ম্মসার। শোক, দুঃখ, দৈন্য, মনস্তাপ, এক সঙ্গে মিশিয়া যেন সজীব মূর্ত্তি ধরিয়া এই অভাগিনী বৃদ্ধার আপাদমস্তককে দেদীপ্যমান।

মহাদেব বাবু উঠিয়া কষ্টে সৃষ্টে কোন গতিকে একটা প্রণাম করিলেন। শীতার্ত্ত বৃদ্ধা দৌর্ব্বল্য কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া দুয়ারের কাছে জড়সড় হইয়া বসিলেন। অনিল শুষ্কমুখে তাঁহার পাশে বসিল। মহাদেব বাবু গম্ভীরভাবে নিজের আসনে বসিয়া চুরুট ধরাইলেন।

বৃদ্ধা কিছু বলিবার আগেই মহাদেব বাবু চুরুটে এক সুদীর্ঘ টান দিয়া বলিলেন, "আপনি এসেছেন খবর পেয়েছি অনেকক্ষণ। তাড়াতাড়ি এক যায়গায় বেরুতে হয়েছিল বলে দেখা করতে পারিনি। যে দুঃসময় যাচ্ছে আমার তা আর কহতব্য নয়। এখুনি গুণ্ডার ছুরিতে—"

কথাটা বলিয়াই সহসা রসনা সম্বরণ করিয়া তিনি ঘাড় উঠাইয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। কণ্ঠান্তরে বলিলেন—"এই, বারেণ্ডায় কে রয়েছে?"

নীলু চাকর দুয়ারের সামনে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমি। তামাক দেব?"

মহাদেব বাবু বলিলেন, "এখানে নয়। ওপরে সেজে রেখে এস। আর শোন, সবাইকে বারণ করে দাও, এ দিকে এখন যেন কেউ না আসে, বুঝেছ?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া নীলু প্রস্থান করিল।

মহাদেব বাবু বলিলেন, "অনিল, ত্যাখো ত ভাই, বারেণ্ডায় কেউ আছে?"

অনিল সন্ত্রস্ত ভাবে বারেণ্ডায় গিয়া চারিদিক দেখিয়া আসিয়া জানাইল, কেহ নাই।

মহাদেব বাবু তখন নিম্নকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বাড়ীতে কাউকে বলবেন না যেন, বাইরেও যেন কথাটা প্রকাশ না হয়। আপনার চিঠি পেয়েই সেই থেকে আমি টাকা যোগাড় করবার চেষ্টায় দিন রাত ঘুরছি। আজ অনেক কষ্টে এত রাত পর্য্যন্ত বসে থেকে এক জনের কাছে দু হাজার টাকা ধার পেলাম। রামবাগান ছাড়িয়ে মোটর একটা গলির কাছে দাঁড় করিয়ে আমার সোফার পেট্রোল কিনতে একটা দোকানে গেছে, হঠাৎ পাঁচজন গুণ্ডা এসে আমার উপর পড়ল! এই ছোরা মারে ত এই ছোরা মারে!—নেহাৎ পিতৃপুণ্যের জোরে প্রাণটা বেঁচে গেছে। শেষে দুহাজারকে দু হাজার টাকা নিয়ে ব্যাটারা দৌড় দিলে।"

সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধা হতভম্ব! অনিল উত্তেজনারুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তার পর? তারা ধরা পড়েছে?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, "কে ধর্‌বে তাদের? তাদের হাতে এক এক ছোরা। পুলিস তাদের দেখে সরে পড়ে; অন্যে এগুবে কি?"

আজ তিন বৎসর এই বৃদ্ধা ক্রমাগত তাঁহার বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি ও কান্নাকাটি করিতেছেন। বৃদ্ধার নাবালক পুত্র দুইটীর পড়াশুনা এবং সংসার নির্ব্বাহের সুবিধা করিয়া দিবার চুক্তিতে মহাদেব বাবু বৃদ্ধা পিসির কাছে বিনা খতে দশ হাজার টাকা ধার লইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি আর এক পয়সাও দেন নাই। পর দৈন্য-পীড়িতা আত্মীয়ের আকুল অশ্রুজল গৃহিণীর অনুনয় ও ধর্ম্মভয় প্রভৃতি নানা কারণে উত্যক্ত হইয়া মহাদেব বাবু এক সময় হাজার দুই টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এখন বৃদ্ধার জ্যেষ্ঠপুত্র মিহির কালাজ্বরে শয্যাশায়ী, ছেলেটীর চিকিৎসা-খরচ করাইবার সামর্থ্য বৃদ্ধার নাই। প্রাণের দায়ে ব্যাকুল বৃদ্ধা শেষ আশায় নির্ভর করিয়া মহাদেব বাবুর দ্বারে উপর্যুপরি আবেদন পাঠাইয়া শেষে নিজে আজ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই দারুণ শীতের রাত্রে ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে সঙ্গে করিয়া শীতার্ত্ত বৃদ্ধা সন্ধ্যা হইতে রাত দুপুর পর্য্যন্ত বড়লোক ভাইপোর দুয়ারে ধরা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এতক্ষণে যদি বা সাক্ষাতের অনুমতি পাইলেন, তবে সংবাদ যা পাইলেন —তা অতি শুভ!

বৃদ্ধা স্তম্ভিত নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। বড়লোক ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রয়োজনের সময় আত্মীয়ের উপকার করিবার ইচ্ছাতেই বড় বিশ্বাস করিয়া তিনি নাবালক পুত্র দুটির গ্রাসাচ্ছাদনের সম্বল, দশ হাজার টাকা ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। টাকাগুলি লইবার সময় শিক্ষিত সম্মানী উপার্জ্জনশীল ভ্রাতুষ্পুত্র কত প্রত্যুপকারের আশা দিয়া কত কৌশলময় বাক্য-বিন্যাসে বৃদ্ধার হাতে চাঁদ ধরিয়া দিয়াছিলেন। তারপর সে চাঁদের মহিমায় আজ তিন বৎসর বৃদ্ধার নাবালক পুত্র দুটি অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দুরন্ত রোগে শয্যাশায়ী হইয়া এক ফোঁটা ঔষধ পাইতেছে না, উপযুক্ত পথ্যের ত কথাই নাই। এদিকে এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা সহরে এটর্ণি বাবুর দুখানা তেতালা বাড়ী উঠিয়াছে, মূল্যবান মোটরগাড়ী হইয়াছে, উৎকৃষ্ট আসবাব পত্রে, উজ্জ্বল বিদ্যুৎ বাতিতে ঘর দ্বার হাস্যময় হইয়াছে। কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে এ সব হই য়াছে কেহ জানে না। কিন্তু হইয়াছে সুনিশ্চিত! সকল দিকের বড়মানুষী কায়দা বজায় রাখিবার জন্য ব্যয় নির্ব্বাহে তিনি সক্ষম। তাঁহার যত কিছু অক্ষমতা শুধু দরিদ্র বিধবা ও নাবালক পাওনাদারদের ন্যায্য প্রাপ্য ফিরাইয়া দিবার সময়!

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া মর্ম্মভেদী ক্লেশের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৃদ্ধা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তা হলে কি হবে বাবা? ছেলেদের ভিটেমাটী বিক্রী করে, সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে তোমার হাতে দশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলাম। তার পর আমার কপালদোষে, এখন তুমি দয়া না করলে—"

মহাদেব বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না থাকলে কোত্থেকে দেব?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "নেই বলো না বাবা! তোমার যা বাড়ী, গাড়ী—"

বাধা দিয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, "সব দেনার ওপর! সব দেনার ওপর! বল্লে হয়ত আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাস্তবিক বল্‌ছি, বাজারে একটু সুনাম আছে, ব্যবসার খাতিরে তাই ধার পাচ্ছি, তাই এসব করেছি।—এসব ঠাট বজায় না রাখলে যে আমার ব্যবসা চলবে না তাতো বোঝেন?"

ক্ষোভে দুঃখে নৈরাশ্যে বালক অনিল অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিশ্বাসঘাতক নরপশুর হাতে বড় বিশ্বাসে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া বিধবা দরিদ্র মাতা আজ কতদূর সাংঘাতিক অর্থক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তার প্রতিদিনের প্রতি অভাব, অনটন মনস্তাপ অশ্রুজলের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই বালক "মোরিয়া" হইয়া বলিল, "বেশ, তাহলে একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না। দেনার ওপর যদি এত বাড়ী গাড়ী ইলেক্‌ট্রি লাইট, ক্যান

টেলিফোঁ করতে পেরেছেন, তাহলে আরও কিছু দেনা করে গরীবদের দুঃসময়ে সাহায্য করুন দাদা!"

মহাদেব বাবু সপ্রতিভভাবে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তাইত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তোমাদের যে কপাল মন্দ— এই ত তোমাদেরই দুই হাজার টাকা হাতের ওপর থেকে গেল! লোকে জেনেছে, এখন আমার অনেক ধার হয়ে পড়েছে। তাই আর সহজে কেউ ধার দিতে চাচ্ছে না যে!"

অনিল বুঝিল ইহার উপর বাক্যব্যয় করা মূঢ়তা!

মহাদেব বাবু উঠিয়া বলিলেন, "আমি আর বসতে পারছি নে, এবার শুতে যাই। আপনারা যদি বাড়ী যান তো এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। দরোয়ান আর দেউড়ী খুলে রাখতে পারবে না।"

মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে অশ্রু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা কিছু দাও, আমার মিহিরের যে পথ্যি কিছুই হচ্চে না।"

বিরক্ত হইয়া মহাদেব বাবু বলিলেন, "সেই এক কথা তবু! আপনাকে দেখছি বুঝিয়েও বোঝান যাবে না। টাকা যোগাড় করলাম কিন্তু ভোগে লাগল না, আমি আর কি করি? নিজে যে মরতে মরতে বেঁচে গেছি, এই যথেষ্ট।"

নিরুপায় বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা স্বরূপ এই উপাদেয় গল্পটি শুনাইয়া মহাদেব বাবু উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "এই নীলে, দরোয়ানকে বল্, এঁরা এখুনি যাচ্ছেন। তার পর যেন দেউড়ী বন্ধ করে।"

অনিল উঠিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "একটা গাড়ী নিয়ে আসি মা—"

মা কাতর কণ্ঠে বলিলেন "গাড়ী ভাড়ার টাকা কৈ বাবা? ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে চারটি টাকা ধার পেয়েছিলাম, আসতে গাড়ী ভাড়া তিন টাকা আট আনা গেছে। মোটে আট গণ্ডা পয়সা আছে। এটা থাক কাল সকালে তোমাদের বাজার খরচ হবে।"

উদ্বিগ্ন ভীত বালক বলিল, "তা হলে কি করে যাবে মা?"

"হেঁটেই যাব বাবা, চল। দরোয়ান এখনি আবার দেউড়ী বন্ধ করবে। শীগ্‌গির চল।"

মহাদেব বাবু কথাগুলা শুনিয়াও শুনিলেন না। নিজের মনে উপরে উঠিয়া গেলেন। বুদ্ধি থাকিলে তিন শো টাকার লোকসানকে সদ্ব্যবহার করিয়া, দু হাজারের পাওনাদারকে কেমন কেমন স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করান যায় সে বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তিনি নিজের কৃতিত্বে বিশেষ গর্ব্ববোধ করিলেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ডের সানন্দ লম্ফের মাঝে সাহ্লাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল—গুণ্ডামি ও ভণ্ডামির জয় জয়কার! হয় গায়ের জোরে কাড়িয়া লওয়া, নয় বুদ্ধির জোরে ঠকাইয়া লওয়াই ত এ সংসারে—মানুষের কায!

এটর্ণি মহাশয় দোতালার উচ্চ গৃহে আরামদায়ক শয্যায় শুইয়া যখন নিজের মন বুদ্ধির সঙ্গে এমনি প্রীতিকর আস্ফালনে রত, তখন ফুটপাথে রাত দুপুরের প্রচণ্ড শীত-কুহেলিকার মাঝখান দিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে অবসন্ন পদে চলিয়াছিল—একটি ক্ষুধার্ত্ত বালক ও একটি সর্ব্বস্বান্তা, নৈরাশ্য-কাতরা বৃদ্ধা! উভয়ের নিরুপায় অশ্রু নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় চোখের ভিতর জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। সেই জমাট যন্ত্রণা-স্তূপের অস্তিত্ব এ পৃথিবীর স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক হৃদয়হীনরা ভণ্ডেরা হয়ত গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবে না, কিন্তু অলক্ষ্যে কোনও সংহার দেবতার কোনও রুদ্র অভিযান সেইখান হইতে সুরু হইবে কি না কে জানে। প্রতারিতা সর্ব্বস্বান্তা অভাগিনীর তপ্ত মর্ম্মব্যথা মাখা অসহায় অশ্রু—ভণ্ড-ভদ্রতার মুখোস পরা, পরস্বাপহারী দস্যুর দরবারে উপেক্ষিত হইলেও, সর্ব্বনিয়ন্তার ন্যায়বিচারালয় সে উপেক্ষার উপযুক্ত প্রতিশোধ দানে নিরস্ত থাকিবে কি না, সে প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর বোধ হয় ভবিষ্যৎ একদিন প্রত্যক্ষ দৃশ্যে দেখাইবে! আপাততঃ প্রতাপশীল ভণ্ডের প্রতাপে মুগ্ধ হইয়া সাধারণ মানুষ নির্ব্বিচারে ভাবিয়া লউক—এ পৃথিবীতে সার্থক শুধু ভণ্ডের ভণ্ডামি, এবং দৈত্যের গুণ্ডামি!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

নববর্ষের আবাহন

উষার অরুণরাগে তটিনীর কল কল তানে,
শ্যামল-বিটপ-কোলে বিহগের মধুময় গানে,
সমীর চঞ্চল-দেহ কুসুমের হাসির সুবাসে
প্রকৃতি সহাস মুখে 'নববর্ষ স্বাগত' সম্ভাষে।

সুপ্তি অলসতা ত্যজি পূত এ মঙ্গলময় ক্ষণে,
নবোদ্যমে নবছন্দে নবমন্ত্রে নব জাগরণে,
উদ্দাম আশার বশে নবোৎসাহে বাঁধিয়া হৃদয়
অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সাধিতে হইবে সমুদয়।

বিকলতা বিফলতা চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া,
শোকদুঃখ বিজড়িত স্বপ্নসম অতীত ভুলিয়া,
হাসিমুখে এস কর্ম্মি! হে আতুর, অকৃতি, হতাশ!
বিশ্বনিয়ন্তার পদে ঢেলে দাও প্রাণপূর্ণ আশ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দারার দুরদৃষ্ট

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

কল্পনাতীত ক্লেশ সহ্য করিয়া, বহু সৈন্য, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র প্রভৃতি সামরিক প্রয়োজন সাধনোপযোগী বহু প্রাণী দুস্তর লবণ মরুর মধ্যে মৃত্যুমুখে বিসর্জ্জন দিয়া সপরিবারে দারা কোন মতে কচ্ছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কালহরণ না করিয়া গুজরাটের রাজধানী আহম্মদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার মাত্র তিন সহস্র সৈন্য সঙ্গে ছিল। ইচ্ছা ছিল যে রাজধানী আহম্মদাবাদে পহুঁছিয়া কামান বন্দুক রসদ সৈন্য যানবাহন এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঔরঙ্গজীবের সহিত আর একবার বল পরীক্ষা করিবেন; এবং ভগবানের কৃপা হইলে ময়ূর সিংহাসন লাভ অসম্ভব না হইতেও পারে। বস্তুতঃ ধর্ম্মতের যুদ্ধে যশোবন্তসিংহ মূঢ়ের ন্যায় যুদ্ধ-নীতি অবহেলা করিয়া ঔরঙ্গজীবের কামানের মুখে রাজপুত অশ্বারোহিগণকে অনর্থক চালাইয়া না দিলে অযথা সৈন্য ধ্বংস হইত না, এবং সম্ভবতঃ পরাজিত হইয়া যশোবন্তের বন্দীরূপে শাজাহানের পদতলে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঔরঙ্গজীব ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন; কিংবা সামুগড়ের যুদ্ধক্ষেত্রে দারা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যধারণ করিয়া সেনার মধ্যভাগে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া যদি বাহিনী চালনা করিতেন তাহা হইলে জয়লক্ষ্মী যুবরাজ দারার কণ্ঠেই জয়মাল্য পরাইয়া দিতেন, তদ্বিষয়ে সে কালের যুদ্ধনীতি বিশারদ সেনাপতিগণ কেহই কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দারার দুরদৃষ্ট যে, যাহা হইতে পারিত তাহা হইল না, যাহা ঘটিবার নহে সেই ঘটনাই ঘটিয়া গেল; নতুবা যশোবন্তের ন্যায় সাহসী সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে মূঢ়ের ন্যায় বৃথা বীরগর্ব্ব প্রকাশ করিতে গিয়া স্বীয় সৈন্য স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়া পরাজিত হইবেন কেন, এবং জয় সিংহের ন্যায় প্রবীণ সৈন্যাধ্যক্ষ, বৃদ্ধ সম্রাট শাজাহানের উপদেশ এবং আদেশ লঙ্ঘন করিয়া

বিজাপুরকেরা মত গোপনে ঔরঙ্গজীবের পক্ষপাতী হইবেন কেন? সমস্তই বিধিলিপি, দারার গ্রহবৈগুণ্যের এবং ঔরঙ্গজীবের একাদশ বৃহস্পতির ফল। যাহা হউক, আহাম্মদাবাদে পহুঁছিলে দারার অদৃষ্ট দেবতা একবার তাঁহার দিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন। ঔরঙ্গজীবের শ্বশুর শাহনেওয়াজ খাঁ সে সময়ে আহম্মদাবাদের শাসনকর্তা, ধনাগার এবং সৈন্যসামন্ত সমস্তই তাঁহার অধীন; এই শাহনওয়াজ শাজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশের জন্য ঔরঙ্গজীবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, বিশেষ তাঁহার কন্যা তখন জীবিত ছিলেন না, সুতরাং জামাতার সহিত স্নেহ বন্ধনের স্বর্ণ শৃঙ্খল তখন ছিন্ন। বৃদ্ধ শ্বশুরকে দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজীব একবার কারাগারে বন্দী করিয়া কিছুকাল রাখিয়াছিলেন। এই সকল কারণে দারা আহম্মদাবাদে পহুঁছিবামাত্র, শাহনেওয়াজ তাঁহাকে যুবরাজ স্বরূপ অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গুজরাটের বাদশাহী বাহিনী রাজকুমারের সাহায্যার্থ নিয়োজিত করিলেন। বৃদ্ধবীর শাহনেওয়াজ স্বয়ং অসি হস্তে শাজাহান বাদশাহের মনোনীত ভবিষৎ রাজ্যাধিকারীর জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া দারার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শাহনেওয়াজ খাঁর দারাপক্ষ অবলম্বন করিবার অনেকে অনেক কারণ দিয়া থাকেন, কিন্তু দুরন্ত গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনে, অগ্নি বিকীরণকারী সূর্য্যের দুঃসহ তাপে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সম্ভ্রম এবং পরাভবের বেদনা বহিয়া পলায়নের অপমান যে রাজকুমার দারা কতই সহ্য করিয়াছেন, সে কথা ভাবিলে নিতান্ত পাষাণ হিয়াও বিদীর্ণ হয়, পাথরের চক্ষু গলিয়াও অশ্রু বাহির হইয়া পড়ে। বৃদ্ধবীর ধর্ম্মভীরু শাহনেওয়াজ যে দারার পক্ষ অবলম্বন করিবেন ইহা বিচিত্র নহে।

গুজরাটে মিথ্যা সংবাদ রটিল যে, সুজার সহিত যুদ্ধে ঔরঙ্গজীব পরাজিত হইয়া পাঞ্জাবের দিকে পলায়ন করিয়াছেন। দারা মনে করিলেন এই শুভ মুহূর্ত্তে সসৈন্যে আগ্রা আক্রমণ করিয়া বৃদ্ধ পিতা সম্রাট শাজাহানকে কারামুক্ত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবেন এবং স্বয়ং তাঁহার সিংহাসন নিম্নে বসিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য চালাইবেন। কিন্তু সেই বৃহৎ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিতে হইলে বৃহৎ আয়োজনের আবশ্যক। বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতে পারিলে তবে ঔরঙ্গজীব এবং তাঁহার পক্ষপাতী, ক্ষমতাপন্ন হিন্দুমুসলমানগণ ভীত হইয়া রাজকুমার দারার পথ ছাড়িয়া দূরে দাঁড়াইবে। কিন্তু শাহনেওয়াজের সৈন্যবল পাইলেও সে সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না, বন্দুক কামান অর্থ ও রসদ আরও অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক, সেই জন্য দারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ধন জন ও সামরিক দ্রব্য সম্ভার দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবার মত লোক কে আছে? তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের উপরে। ঔরঙ্গজীব সুবারূপে যখন দক্ষিণাত্যে ছিলেন সে সময়ে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দারা এই অভিযানের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং যুদ্ধান্তে সম্রাট শাজাহানের নিকট নানারূপ আবেদন নিবেদন করিয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণের অনুকূল সন্ধি করাইয়া দিয়াছিলেন। দারার বিশ্বাস, তাঁহার এই পূর্ব্ব সদয় ব্যবহার স্মরণ করিয়া সুলতানগণ তাঁহার সহায়তা করিবেন এবং ঔরঙ্গজীবের পূর্ব্ব শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার এই শুভ সুযোগ তাঁহারা ত্যাগ করিবেন না। এই সকল কারণে দারার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে প্রথমে গিয়া বিজাপুর গোলকুণ্ডার সৈন্যের সহিত নিজ সৈন্য সম্মিলিত করতঃ বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক রূপে আগ্রার পথে অগ্রসর হইবেন। এমন সময়ে মাড়োয়ারের রাজা যশোবন্তসিংহ তাঁহার রাজপুত সৈন্য দ্বারা পুনরায় দারাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠাইলেন এবং দারাকে আজমীরে সসৈন্যে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দারার উভয়সঙ্কট উপস্থিত হইল, কি করিবেন সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার

সহিত সম্মিলিত হওয়া সময় সাপেক্ষ এবং মুসলমানগণ দারার প্রার্থনানুরূপ সাহায্য দানে সম্মত হইবেন কি না তাহারও স্থির নিশ্চয়তা নাই—এদিকে যশোবন্ত স্বয়ং সাহায্য দানের সংবাদ পাঠাইয়াছেন; সুতরাং ইহা এক-রূপ নিশ্চিত এবং আহ্মদাবাদ হইতে আজমীর অল্প দূরের পথ, উভয় সৈন্যের সম্মিলন ঘটাইয়া আগ্রা-ভিমুখে সমরাভিযান করিতে বিলম্ব ঘটিবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া যশোবন্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ করাই সঙ্গত বোধ করিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে যাইবার সঙ্কল্প একরূপ ত্যাগ করিলেন; ইহাই হইল দারার সর্ব্বনাশের মূল।

মহারাজ জয়সিংহের ন্যায় রণদক্ষ সেনাপতি সে সময়ে আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। আবার কূটমন্ত্রণায় তিনি কৌটিল্য অপেক্ষাও মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। মন্ত্র-কুশল ঔরঙ্গজীব একথা বুঝিয়াই জয়সিংহকে পূর্ব্ব হইতে হস্তগত করিয়াছিলেন; জয়সিংহও চতুর-চূড়ামণি ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে গমন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না ভাবিয়া সহজেই ঔরঙ্গজীবের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষেত্রে যোগ্যের সহিত যোগ্যের যোজনা হইয়াছিল, ব্যাঘ্র নখর সুবর্ণমণ্ডিত হইয়া তীক্ষ্ণতর হইয়াছিল, শনিগ্রহের সহিত কুজগ্রহ যুক্ত হইয়াছিল, অমাবস্যার রাত্রিতে ভরণী নক্ষত্রের সংযোগ হইয়াছিল।

এই রাজা জয়সিংহ যশোবন্তকে ঔরঙ্গজীবের পক্ষভুক্ত করিবার জন্য নানা কল কৌশল প্রথমাবধিই করিতে-ছিলেন; সামুগড়ের যুদ্ধে দারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবার পর এবং সম্রাট শাজাহান ঔরঙ্গজীব কর্তৃক কারারুদ্ধ হইবার পরে জয়সিংহের প্রাণপণ চেষ্টা হইল যশোবন্তকে ঔরঙ্গজীবের দলভুক্ত করা; কখনও উপদেশ কখনও অনুরোধ, কখনও বা রাজরোষের ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি বহু ছল কৌশল চলিতে লাগিল।

ধর্ম্মতের যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর হইতে যশোবন্ত সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছিলেন। রাঠোরকুলের স্বাভাবিক বীর্য্য ও পরাক্রম ক্রমিক বোধহয় তাঁহার অন্তরের মধ্যে নিয়ত প্রধূমিত হইতেছিল। কিন্তু দারা তখন পলায়নপর, ঔরঙ্গজীব ভারতের সিংহাসনে সম্রাট্‌রূপে সমাসীন, বৃদ্ধ শাজাহান কারাবরোধে, যশোবন্ত একাকী ভারত সম্রাটের প্রতি-যোগিতা করিবার যোগ্য ব্যক্তি নহেন, সুতরাং তাঁহার অন্তরের রুদ্ধ রোষ তাঁহাকেই দগ্ধ করিতে লাগিল, ঔরঙ্গজীবকে স্পর্শও করিতে পারিতেছিল না। যখন এইরূপে রাজা যশোবন্ত সিংহ অবসরের প্রতীক্ষায় বসিয়া রুদ্ধরোষে অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজকুমার দারার গুজরাটে পঁহুছিবার সংবাদ আসিল। আরও সংবাদ আসিল যে শাহনেওয়াজ খাঁ দারাকে ধন এবং জনবল দ্বারা সাহায্য করিতেছেন এবং স্বয়ং অসি হস্তে তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যশোবন্তের রাঠোরোচিত রণলিপ্সা জাগ্রত হইয়া উঠিল, পূর্ব্বাপমানের প্রতিশোধের অবসর উপস্থিত দেখিয়া তিনি দারাকে আজমীরে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বীয় রাঠোর সৈন্য সজ্জিত করিয়া স্বয়ং প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এদিকে ঔরঙ্গজীবের হৃদয়-বন্ধু জয়সিংহ নীরব নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, যশোবন্তকে নানাপ্রকারে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া ঔরঙ্গজীবকে মাড়বার আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন। কারণ চতুরাগ্রগণ্য জয়সিংহ জানিতেন যে নিজের বিপদ উপস্থিত হইলে যশোবন্ত দারাকে প্রতিশ্রুত সাহায্য দান করিবার অবসর পাইবেন না, এবং হয়ত বা বাদশাহের আক্রমণ হইতে মাড়বারকে রক্ষা করিবার জন্য সম্রাট ঔরঙ্গজীবের সহিত সন্ধি করিতে তিনি বাধ্য হইবেন, ধন জন সহায় সম্পদ বিহীন দারার পুনরায় প্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না; হইলও তাহাই।

যশোবন্ত বাদশাহ কর্তৃক মাড়বার আক্রমণের সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া চিন্তায় পড়িয়া গেলেন, কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। জয়সিংহের প্ররোচনা, প্রলোভন প্রদর্শন, চলিতেই লাগিল। অস্থির মতি যশোবন্ত অনায়াসে দারাকে ত্যাগ করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। রাঠোর-রাজ যশোবন্তের

ক্ষত্রকুলোচিত বল বীর্য্যে হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, রণক্ষেত্রে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অগ্নিবর্ষী কামানের মুখে বুক পাতিয়া দিতে যশোবন্তের সমকক্ষ কেহই বোধ করি সে দিনে ছিল না। কিন্তু সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরণাগত পালন এবং বাক্যদান করিয়া সে বাক্য রক্ষার জন্ত প্রাণপণ প্রভৃতি রাজধর্ম্ম ও ক্ষাত্রধর্ম্ম যশোবন্তের হৃদয়ে স্থান পাইত বলিয়া মনে হয় না, নতুবা দারাকে আমন্ত্রণ করিয়া, সহায়তা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া অবশেষে তাঁহাকে সেই প্রাণসঙ্কট বিপদ সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ নিজের আপদ নিবারণের জন্ত জয়সিংহের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ঔরংজীবের সহিত সন্ধি করিতে পারিতেন না। আশ্রিত ক্ষুদ্র পারাবতকে রক্ষা করিবার জন্ত ক্ষত্রিয় রাজা স্বীয় বক্ষমাংস দান করিয়াছিলেন; শরণাগত দণ্ডী রাজাকে রক্ষা করিতে কৃষ্ণপদাশ্রিত একান্তভক্ত পাণ্ডবগণ সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এ সকল কথা পুরাণে পাওয়া যায়। যশোবন্তও ভারতের সেই ক্ষত্রিয় বংশেই জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তথাপি ক্ষত্রকুলোচিত একান্ত কর্ত্তব্য, আশ্রিত পরিপালন ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইলেন, ইহা দারারই অদৃষ্টের ফল ব্যতীত আর কি বলিব?

মনে হয় যশোবন্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া দারা যদি পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের সুলতানগণের সহিত সম্মিলিত হইতেন, তাহা হইলে বোধ করি শাজাহান-নন্দনগণের সোদর-সংগ্রামের ফল ভিন্নরূপ হইত এবং ভারতের ইতিহাস রূপান্তর গ্রহণ করিত। যাহা হইবার নহে তাহা হইবে না, সেই জন্তই দারার যশোবন্তের আমন্ত্রণ গ্রহণের দুর্ম্মতি উপস্থিত হইয়াছিল; জয়সিংহের স্তায় চিরসংগ্রাম বিজয়ী রাজনীতি-বিশারদ, ক্ষত্রকুল চূড়ামণি, বীরাগ্রগণ্য রাজাধিরাজ, বৃদ্ধ বাদশাহের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া তাঁহার প্রিয়তম পুত্র, ভারতের ভাবী সম্রাট, যুবরাজ দারার পক্ষ ত্যাগ করিয়া গোপনে ঔরঙ্গজীবের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন; আর দুর্দ্ধর্ষ বীর, রণদুর্ম্মদ যশোবন্ত ধর্ম্মতের ক্ষেত্রে হঠকারিতার জন্ত পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং রাজধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ যুবরাজকে অবশেষে অসীম সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যাহার চরম ফল হইল সদারাপত্তা দারার নৃশংস হত্যা। একজনকে আশা আশ্বাস দিয়া অবশেষে প্রয়োজনকালে নিরাশ করিলে ভগবানের স্তায়-বিচারে একদিন সেই কৃত কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়, ইহা মানব মাত্রেরই স্থির বিশ্বাস। যশোবন্তকে তাঁহার কৃত কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে ঔরঙ্গজীবের ক্রোধোপশমের জন্ত দারাকে অগ্নিমুখে আহুতি দান করিয়াছিলেন, ঔরঙ্গজীবের সে ক্রোধ যশোবন্তের জীবনে এবং জীবনান্তেও প্রশমিত হয় নাই। আফগানিস্থানে প্রেরণ করিয়া ছলপূর্ব্বক সৈন্য সাহায্য না দিয়া ক্রূরকর্ম্মা ঔরঙ্গজীব যশোবন্তের অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন এবং যশোবন্তের দেহাবসান পরে তাঁহার শিশুপুত্র এবং পত্নীকে দিল্লীতে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টার ক্রটিও তিনি করেন নাই। যশোবন্তের চিরবিশ্বাসী রাজপুত সেনাগণ প্রাণপণ না করিলে মাড়বারের রাজবংশের চিহ্ন পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজীব রাখিতেন কি না সন্দেহ। চিরন্তন রাজভক্তির পুরস্কার মহারাজ জয়সিংহও ঔরঙ্গজীবের নিকট পাইয়াছিলেন। সিংহাসনের যথার্থ উত্তরাধিকারী দারাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন জয়সিংহ। বাহ্লীক হইতে কেরল পর্য্যন্ত মোগল পতাকা চিরবিজয়ের মধ্য দিয়া জয়সিংহই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ছত্রপতি শিবাজির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দিল্লী রাজপ্রাসাদে সম্রাট আলমগীরের যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তন্দ্রা ছুটিয়া যাইতে লাগিল, তখন কোঙ্কন শৈলমালার দুরারোহ গিরিদুর্গপ্রাকারে মোগল পতাকা জয়সিংহই প্রোথিত করিয়াছিলেন। স্বজাতীয় বীর শিবাজি রাজা যখন হিন্দু রাজ্য স্থাপনের জন্য স্বীয় বক্ষরক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া পাত করিতেছিলেন, তখন ছলে বলে কৌশলে তাহার ব্যাঘাত ঘটাইবার অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন রাজা জয়সিংহ। ছত্রপতিকে কৌশলে দিল্লী আনিয়া বন্দী করিবার প্রধান সহায় ছিলেন রাজা জয়সিংহ। অবশেষে

মধ্যপথেই যখন বৃদ্ধ সেনাপতি জয়সিংহের মৃত্যু হয়, সে মৃত্যুও ঔরঙ্গজীবেরই কৃত কার্য্য। ইতিহাস যদি সত্যরূপে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে রাজকুলে, ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এক জীবনে জয়সিংহের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতার পাপাচরণ আর কেহই করে নাই। যাহার জন্য এই সকল পাপানুষ্ঠান সেই ঔরঙ্গজীবই জয়সিংহের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

যুবরাজ দারা আশান্বিত হইয়া সসৈন্যে আজমীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আজমীরের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, যশোবন্ত বা তাঁহার রাজপুত বাহিনীর কোন চিহ্নই সেখানে নাই। ইহার কারণ কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। নানারূপ চিন্তায় দারার মন আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। কিন্তু যথার্থ কারণ জয়সিংহ—ঔরঙ্গজীবের হিত কামনায় তিনি যশোবন্তকে নিয়ত তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য অযাচিত উপদেশ দিতে এক দিনের জন্যও ক্ষান্ত হন নাই। অবশেষে ঔরঙ্গজীবের দ্বারা মাড়োয়ার আক্রমণের ব্যবস্থা করাইয়া যখন ভয় প্রদর্শন করিলেন তখনই দারা যশোবন্ত কর্ত্তৃক একান্ত পরিত্যক্ত হইলেন। বিপদাপন্ন দারাকে আমন্ত্রণ করিয়া আজমীরে আনাইবার হেতু যে তিনিই; এ কথা যশোবন্ত ভুলিয়া গিয়া শরণাগত প্রতিপালনরূপ ক্ষাত্রধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করতঃ রাজকুমারের সাহায্যার্থ তাঁহার বা তাঁহার রাজপুত সেনার কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হেলিল না। শাজাহান বাদশাহের আনন্দদুলাল যুবরাজ দারা যখন সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন ছিলেন, তখন মাড়োয়ার রাজ্যে তাঁহার পাদস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা হইলে যশোবন্ত তাঁহাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রত্যুদ্গমনার্থ যশোবন্ত রাজ্যসীমার বাহিরে কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেন তাহা আজ অনুমান করা কঠিন। ভবিষ্যৎ সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দারার "তাম্‌জাম্‌" দণ্ড যশোবন্তের স্কন্ধে উঠিত কি না জানিনা। আজ সেই দারা রাজ্যের সীমান্তে পঁহুছিয়াও যশোবন্তের সাক্ষাৎলাভ দূরের কথা, দূত মুখেও কোন সংবাদ পাইলেন না, দারার অদৃষ্টচক্রের গতি এমনি করিয়াই ফিরিয়া গিয়াছিল।

মান অভিমানের সে সময় নহে, অপমানকে অপমান জ্ঞান না করিয়া দারা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিপার সেকোকে যশোবন্তের নিকট পাঠাইলেন এবং সময়ের সঙ্কীর্ণতা জানাইয়া সসৈন্যে সত্বর সজ্জিত হইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে দারার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। যশোবন্ত কুমার সিপারকে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া রাজপুরীতে মাত্র অতিথিরূপে স্থান দিলেন এবং তাঁহার সৎকারার্থ পানভোজন নৃত্যগীতের যথোচিত আয়োজন হইল; কিন্তু সমরসজ্জার কোন বিধিব্যবস্থাই হইল না, কেবল কালহরণ হইতে লাগিল। যদিও সিপার চতুর্দ্দশবর্ষীয় শিশু, এ সময়ে তাহার মাতার স্নেহশীতল অঙ্কে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবার কথা, স্বার্থান্ধ ধরণীর নরপিশাচগণের যুদ্ধবিগ্রহ হত্যা প্রভৃতির তাণ্ডব নৃত্যের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িবার তাহার সময় নহে, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে এই শৈশবেই তাহাকে দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শৈশবেই কোষমুক্ত তরবারি হস্তে বাহিনী পরিচালনভার গ্রহণকরতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার পার্শ্বরক্ষা করিতে হইয়াছে, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়নপর পিতার সহচররূপে অনশন অনিদ্রা ও পথশ্রমের কত দুর্ব্বিষহ যাতনা তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুঃখে ক্লেশে বেদনায় মানুষের বয়স বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ অল্প বয়সেই প্রবীণোচিত অভিজ্ঞতা লাভ হয়। সিপারের তাহাই হইয়াছিল এবং সেই অভিজ্ঞতার বলে যশোবন্তের ব্যবহার দেখিয়া সিপারের বুঝিতে বাকি থাকে নাই যে, রাজপুত নরপতি যশোবন্ত কেবল মিষ্টবাক্যে ও ব্যবহারে কাল হরণ করিতেছেন, তাহার পিতা দারাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। বালকের সেই সময়ের মনোভাব সহৃদয় জনের হৃদয় দিয়া বুঝিবার সামগ্রী, বলিয়া বুঝাইবার নহে।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানগণের রাজ্য

গ্রহণের চেষ্টা না করিয়া তাহার পিতা যে অব্যবস্থিত-চিত্ত যশোবন্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাজপুতানার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া মহাভ্রম করিয়াছেন, ইহা বালক সিপারের বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু তখন নিরুপায়, তাই সে সকল কথার উল্লেখ মাত্র না করিয়া গলদশ্রুনেত্রে, যোড়করে, একান্ত বিনয়ের সহিত, যশোবন্তকে বারবার যুদ্ধসজ্জার্থ সত্বর হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল, ঔরঙ্গজীবের অগ্নিবর্ষী কামানের লৌহপিণ্ডের কাল্পনিক ছবি যশোবন্তের মানসনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সিপারের সাশ্রুনেত্র আবৃত করিয়া ফেলিল, রাজপুত নরপতি রাজধর্ম বিস্মৃত হইয়া শরণপ্রার্থী অতিথিকে বিমুখ করিলেন!

এক দিন ছিল, যখন দারার তর্জ্জনীর এক ইঙ্গিতে শত শত যশোবন্তের নাম পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারিত। একদিন ছিল, যখন দারার প্রসাদকণিকা লাভের জন্য যশোবন্তের ন্যায় বহু রাজপুত নরপতি যোড়করে সিংহাসনের পাদপীঠতলে নত মস্তকে অপেক্ষা করাও সম্মানজনক বলিয়া জ্ঞান করিত। আর আজ সেই দারার দুলাল তাঁহার দ্বার হইতে হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে, কালের এমনই মহিমা! সিপার রাজপুরীতে অনর্থক অপেক্ষা করা আর সঙ্গত মনে করিল না; ঘোর দুঃসময়ে পিতার কোনপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য স্নেহলালিত সন্তানের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, রাজপুত্র বিদায় লইবার সময়েও অশ্রুধারায় অভিসিঞ্চিত হইতে হইতে যশোবন্তের নিকট শেষ-ভিক্ষা জানাইলেন, সমস্তই নিষ্ফল হইল!

এদিকে সিপারের বিলম্ব দেখিয়া দারা কখনও অশান্বিত কখনও বা হতাশ হইয়া ব্যাকুলনেত্রে পুত্রের পথের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দিন কাটাইতে ছিলেন, এমন সময়ে সিপার একাকী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিল।

মানুষ চেষ্টামাত্রই করিতে পারে, সে চেষ্টার ফলদাতা ভগবান। দারার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু বিমুখ বিধাতা ঈপ্সিত ফলদানে কৃপণ হইয়া তাহাকে যে সঙ্কটে ফেলিলেন তাহার চরম ফল হইল দারার পুত্রকলত্রের সহিত শোচনীয় অপমৃত্যু।

সিপারের নিকট দুঃসংবাদ পাইয়া দারা নিতান্তই ভগ্নমনোরথ হইলেন। দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা না করিয়া অব্যবস্থিতবুদ্ধি যশোবন্তের আমন্ত্রণ স্বীকারের নির্ব্বুদ্ধিতা তিনি এখন ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এখন আর বিজয়পুর গোলকুণ্ডা যাইবার সময় নাই, কারণ ঔরঙ্গজীবপ্রেরিত বাহিনী দারার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে; সমাগতপ্রায় শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য, সমভিব্যাহারী স্বল্প সৈন্য লইয়াই তাঁহাকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বল্প সংখ্যকের বৃহত্তর বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে গিরিদরী, শৈলসানু, নদীনালার অন্তরালে ব্যূহরচনা না করিলে পরাজয় সুনিশ্চিত। সেই জন্য দারা এবং শাহনেওয়াজ সেইরূপ স্থানের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে চর প্রেরণ করিলেন। চরগণের নিকট সংবাদ পাইয়া আজমীরের সন্নিকটবর্ত্তী শৈলমালার সন্নিহিত একস্থানে খনিত ভূপৃষ্ঠে তিনদিক বেষ্টন করিয়া দারা তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করতঃ শত্রুসৈন্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যের পশ্চাদভাগ উচ্চশৈলে সমাবৃত ছিল, সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যেরূপ স্থানে ব্যূহ রচনা করা, সমরকুশল সেনাপতির উচিত। দারা বর্ত্তমানে সেইরূপ সৈনাপত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন—প্রতিপক্ষের অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈন্যের আক্রমণের প্রতিরোধার্থ তিনদিকে ভূপৃষ্ঠ খনন করা হইয়াছে এবং পশ্চাতে প্রহরীস্বরূপ সমুন্নতশীর্ষ শৈলশ্রেণী। সামুগড়ের যুদ্ধে পরাভব দারার নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, বাহিনীর মধ্যভাগে তিনি না থাকিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বরক্ষীর সাহায্যার্থ স্থানভ্রষ্ট হইয়াই তিনি সর্ব্বনাশের আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু আজমীরের দিবসত্রয়ব্যাপী যুদ্ধে দারা যে সৈনাপত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, যে সাহস এবং বীর্য্যের সহিত সৈন্যচালনা

করিয়াছিলেন তাহাতে বিধাতা বিমুখ না হইলে ঔরঙ্গজীবের পরাজয় সুনিশ্চিত ছিল। খাজোয়ার যুদ্ধে ঔরঙ্গজীবের নিকট সুজা যে পরাজিত হইয়াছিলেন তাহাও ঔরঙ্গজীবের বীর্য্যে বা রণকৌশলে নহে, তাঁহার মিথ্যাচরণ এবং কাপট্যের বলে। স্বয়ং বিধাতা ময়ূরতক্তে বসাইয়া ভারতের রাজদণ্ড যাহার হাতে তুলিয়া দিবেন তাহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা মনুষ্যশক্তিতে সম্ভব হয় না।

সে দিনের যুদ্ধের রীতি বর্ত্তমান রণনীতি অপেক্ষা ভিন্নপ্রকারের ছিল। উভয় পক্ষের সৈন্য দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিলেই দুই পক্ষের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিত এবং প্রতিবারে বারুদ গোলা প্রভৃতি সামগ্রী কামানে দিয়া আওয়াজ করিতে বহুসময় লাগিত। আজ কামান বন্দুক সর্ব্বপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং বিষাক্ত বাষ্প প্রভৃতি দ্বারা নরহত্যার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়া যুদ্ধের ভীষণ ব্যাপারকেও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সেকালের যুদ্ধে বলবীর্য্য, সাহস, সৈনাপত্য দেখাইবার অবকাশ ছিল। দারার ভ্রমে সামুগড়ে জয়লাভ হইয়াছিল এবং কাপট্যের বলে খাজোয়ায় সুজা পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঔরঙ্গজীবের ন্যায় রণকুশল সেনাপতির বুঝিতে বাকি ছিলনা যে, বিশেষভাবে রণসজ্জা না করিলে, রণদক্ষ সেনাপতিগণকে নিজ পক্ষে না আনিতে পারিলে বারম্বার জয়লাভ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য দারার সহিত এই আজমীরের যুদ্ধে ঔরঙ্গজীব বিশাল সেনোদ্যোগ করিয়াছিলেন; শত্রুর শস্ত্রাঘাতে যাঁহাদের সর্ব্বশরীর অশনিতুল্য কঠিন হইয়াছিল তাদৃশ শত সমরবিজয়ী সেনাপতি জয়সিংহ, দিলির খাঁ, শায়েস্তা খাঁ, সেখ মীর প্রভৃতিকে ঔরঙ্গজীব সঙ্গে লইয়া দারার ক্ষুদ্র বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

আজমীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া ঔরঙ্গজীব তাঁহার "নাসীর" সৈন্যের নায়ক সফ্‌সিকন্ খাঁর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, দারা দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটের মধ্যে তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিয়া উভয়পার্শ্ব এবং সম্মুখ "নিখাত" দ্বারা বেষ্টন করতঃ ব্যূহিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী সেনাপতিগণ সভয়ে দেখিলেন যে বন্যার পার না হইলে সেই "নিখাত" উত্তীর্ণ হইয়া দারার কেশাগ্র স্পর্শ করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। দারার কামানশ্রেণী শৈলসানুদেশে সারি সারি সজ্জিত হইয়া মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, অশ্বারোহী পদাতিক যে কেহ দুঃসাহসে ভর করিয়া তাহার ব্যূহিত সৈন্য আক্রমণ করিতে যাইবে, দারার কামাননিঃসৃত উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড তাহাকে অচিরাৎ যমপুরীর প্রশস্ত তোরণ পার করিয়া সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের অতীত লোকে পহুঁছাইয়া দিবে। সসেনাপতি ঔরঙ্গজীব প্রমাদ গণিলেন; এবং দূর হইতে গোলাবর্ষণের চিরাচরিত প্রথায় কোন ফল হইবেনা কেবল বারুদ গোলার অপব্যয় হইবে বুঝিয়া, আক্রমণের অন্য পন্থা বাহির করিবার জন্য সেনাপতিগণকে একত্র করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

যে স্থান হইতে কামানের গোলাবর্ষণ করিলে অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইতে পারে, সেইরূপ স্থানে গুরুভার কামান লইয়া যাইতে এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া লক্ষ্য স্থির করতঃ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিতে ঔরঙ্গজীবের সেনাপতিগণের সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে তাহারা গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ভাল করিয়া লক্ষ্য স্থির হয় না, কেবল গোলা বারুদের অপব্যয় হইল, দারার ব্যূহিত সৈন্যের কোন অপকারই করা গেল না। প্রভাতে উভয় পক্ষ হইতে পুনরায় গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। মধ্যে মধ্যে দারার বাহিনীর অসমসাহসী অশ্বারোহী বীরগণ তাহাদের নিরাপদ "নিখাতে"র পশ্চাৎ হইতে বাহির হইয়া ঔরঙ্গজীবের সৈন্যশ্রেণীর উপরে বজ্রের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহাদের বর্শা এবং তরবারির আঘাতে এবং অশ্বের গতিবেগে ঔরঙ্গজীবের বহু গোলন্দাজ এবং বরকন্দাজ সৈন্য আহত ও বিনষ্ট করিয়া তাহাদের নিরাপদ ব্যূহের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে লাগিল। এরূপ যুদ্ধে

দারার পক্ষের সেনার অপচয় অতি সামান্যই হইতে লাগিল, ক্ষতি অধিক হইতেছিল ঔরঙ্গজীবের। ধর্ম্মত, সামুগড় ও খাজোয়ার বিজয়ী বীর ঔরঙ্গজীব মনে করিয়াছিলেন দারার মুষ্টিমেয় সৈন্য তাঁহার বিপুল বাহিনীর সম্মুখে ঝটিকাগ্রে তৃণের ন্যায় মুহূর্তে উড়িয়া যাইবে, এবং দিলীর, জয়সিংহ, শায়েস্তা খাঁ, সেখ মীর প্রভৃতি বহু সমরবিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিগণের সৈনাপত্যের গুণে দারাকে পরাভূত করা শিশুর ক্রীড়া অপেক্ষাও সহজ, কেননা দারা স্বয়ং সেনাপতিরূপে সৈন্যপরিচালনার পরিচয় সামুগড়ের সমর ক্ষেত্রে দেন নাই। কেবলমাত্র বৃদ্ধ শাহ নেওয়াজ খাঁ জরাপীড়িত দেহে একাকী এতগুলি রণকুশল সেনাপতির সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে? কিন্তু তাঁহার সে ভ্রম অচিরাৎ বিদূরিত হইয়াছিল। দারার বর্ত্তমান রণক্ষেত্র নির্ব্বাচন, সৈন্য সমাবেশ, ব্যূহরচনা এবং যুদ্ধকালে সৈন্যগণকে উৎসাহদান ও যুধ্যমান সৈন্যের পার্শ্ব ও পশ্চাৎ রক্ষার ব্যবস্থা দেখিলে কে মনে করিবে দারা যুদ্ধকৌশলে ও সৈনাপত্য গুণে তৎকালের কোন সেনাপতি অপেক্ষা হীন? বস্তুতঃ দিবসত্রয় অশ্রান্ত চেষ্টা ও বহু সৈন্য ধ্বংস করিয়াও ঔরঙ্গজীবের পক্ষের রণদুর্ম্মদ সেনাপতিগণ কিছুই করিতে পারিলেন না দেখিয়া দ্বিতীয় রজনীতে ঔরঙ্গজীব সমরসভা আহ্বান করিয়া সেনানায়কগণকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং ময়ূর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত ও রাজদণ্ড হস্তস্খলিত হইবার ভয়ে দুনিয়াবাজ বাদশাহ আলমগীর যথার্থই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ঔরঙ্গজীবের সেনাপতিগণের কোন দোষ ছিল না, তাহারা প্রাণপণ করিয়াই যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া যাহাকে বৃহৎ বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইবে, আশা যাহার নাই, তাহাকে হতাশের সাহসকে আশ্রয় করিয়াই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়—দারার আজ তাহাই হইয়াছে। বৃদ্ধ শাহনেওয়াজ এবং বালক সিপার মাত্র তাঁহার সহায়, সুতরাং দারার প্রাণপণ এবং ঔরঙ্গজীবের বেতনভোগী সেনাপতিগণের প্রাণপণ, এতদুভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। তাই দারা আজ দুর্জ্জয়, তাঁহার সৈন্য চালনার মধ্যে আজ কোন ছিদ্র নাই, তাঁহার সাহসের আজ অন্ত নাই, তাঁহার বীর বিক্রমের আজ অবধি নাই। এক দারা আজ শত দারা হইয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে—ইহা ঐতিহাসিকের কল্পনা নহে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা একান্ত সত্য কথা, কারণ যে দারার বিপুল বাহিনী সামুগড়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রহর বেলা অতীত হইবার পূর্ব্বেই বিধ্বস্ত হইয়াছিল, আজ সেই দারার ক্ষুদ্রতর বাহিনী অদ্ভুত বীর্য্যে তিন দিবস ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছে, ঔরঙ্গজীবের রণদক্ষ সেনাপতিগণ এবং বৃহত্তর বাহিনী কিছুই করিতে পারিতেছে না, ইহা কেবল মাত্র নিরাপদ স্থানে সৈন্য সমাবেশের ফল হইতে পারে না; ইহা বলবীর্য্য সৈনাপত্য, বিচার বিবেচনা, প্রাণপণ প্রচেষ্টা প্রভৃতির সমষ্টি ফল।

পরাজয় এবং পলায়নের অপমান ও দুস্তর লবণ মরু অতিক্রম করিবার দুঃসহ ক্লেশ, অর্থনাশ ও সেনাক্ষয় প্রভৃতি যতকিছু দুঃখ ছিল, দারা সে সমুদয়ই ভোগ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়া এবং কেবল মাত্র শাহনেওয়াজ খাঁর জরাদুর্ব্বল বাহুর উপরে নির্ভর করিয়া পুনরায় পরাজিত হইবার সম্ভাবনাই সমধিক এই কথা চিন্তা করিয়া, যুদ্ধশেষে যদি একান্তই পলায়ন করিতে হয় সে ব্যবস্থাও দারা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজকুমার দারার প্রিয়তমা মহিষী পরভেজ নন্দিনী নাদিরাবানু এবং পরিবারস্থ অপরাপর নারী বৃন্দকে দ্রুতগামী উষ্ট্র এবং হস্তী পৃষ্ঠে বসাইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত করিয়া "আনা সাগর" তীরে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন এবং ধন রত্ন যাহা কিছু ছিল তৎসমুদয় ও উষ্ট্র এবং অশ্বতর পৃষ্ঠে স্থাপিত করতঃ বিশ্বাসী অনুচর এবং খোজাগণের প্রহরায় রাখিয়া অবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন। উপদেশ ছিল যে, সমর ক্ষেত্র হইতে সংবাদ পাঠাইলে তাঁহারা দারা এবং সিপারের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিবেন, পথে কোনও সময়ে ইহাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

নির্ব্বন্ধ

(ত্রিপুরা জাতীয়া কোনও পার্ব্বত্য রমণীর নিরাশ প্রণয়সঙ্গীত অবলম্বনে)

মত্ত মরালী অবাধে জলেতে নামিয়ে সাঁতার কাটে ;
মুক্তর বিড়ালী,—জীবন থাকিতে গেল না জলের ঘাটে।
বন-তরু-লতা বসন্ত আসিলে নূতন পাতার সাজে ;—
গৃহেতে লাগানো দারুখণ্ড কভু জাগে না ঘরের মাঝে।

আমি যারে চাই,—তার ভালে যবে বিধাতা 'লেখন' লেখে,
নিঠুর বিধাতা লেখেনি সে 'লেখা' মোর কথা মনে রেখে।
ভুলি মোর নাম,—লিখে ফেলে দিল অদৃষ্ট-বারতা তার ;—
তাই মোর সাথে তাহার মিলন হবার নহেকো আর।

বিধাতা লিখিল ললাটে তাহার দৃঢ়-চিহ্ন মসী দিয়ে ;
আমার ললাটে এঁকে দিল শুধু সলিলের রেখা দিয়ে।
তার ভবিতব্য লিখিল বিধাতা বটবৃক্ষ-পত্র 'পরে ;—
বংশপত্রে আঁকা আমার কপাল দুলিছে পবন-ভরে।

মোর নাম ভুলি বিধাতা লিখেছে তাহার 'নির্ব্বন্ধ' রেশ ;
কি অভিসম্পাত দিব বিধাতায়, আজি যে জীবন শেষ !
অন্ধ বিচারের ফলেতে আমার আসিল আঁধার নামি ;—
ক্ষোভ !—বিধাতার হাতখানি আগে কাটিয়ে রাখিনি আমি !

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক।

জগাই

(গল্প)

আমার চার বছর বয়সের ছেলে ছুটুকে আমি এক মুহূর্ত্তও চোখের অন্তরাল করিতে ভাল বাসিতাম না। কত বিনিদ্র রজনী আকুল দীর্ঘশ্বাসে কাটাইয়া হৃদয়ের নীরব বেদনা হৃদয়ে লুকাইয়া—ছুটুকে পাইয়াছিলাম, তাই 'হারাই হারাই' ভয়ে আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া রহিত।

ছুটুর ক্ষীণ সুকুমার দেহ, অম্লান মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া মনে হইত ; ছুটু বুঝি এ জগতের নয়। শরতের শিশিরাপ্লুত শেফালি বৃন্তচ্যুত হইয়া আমার কোলে যেন আশ্রয় লইয়াছে—সংসারের খর দৃষ্টিপাতে আমার হৃদয়ানন্দ শেফালিগুচ্ছ কখন বা ম্লান হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় আমি ব্যগ্র হইয়া থাকিতাম।

যেখানে অপরিসীম উদ্বেগ, অনন্ত উৎকণ্ঠা, সেখানে নানারূপ বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। এত সাবধানতা, সতর্কতার মধ্যেও ছুটুর একদিন সামান্য একটু জ্বরভাব হইল। প্রথমে সর্দ্দি জ্বর ভাবিয়া উপেক্ষা করিলেও, জ্বর কিন্তু উপেক্ষণীয় হইয়া রহিল না।

ডাক্তারের পর ডাক্তার আসিলেন, ঔষধের পর ঔষধ আসিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই জ্বরের বিরাম হইল না। ছুটুর হাস্যালোকে আমার সমুজ্জ্বল অন্তরাকাশ, চিন্তার কালো মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

চিকিৎসকগণ চিকিৎসা শাস্ত্র আলোড়িত করিয়া রায় দিলেন ছুটুর ম্যালেরিয়া, স্থান পরিবর্ত্তনই ম্যালেরিয়ার একমাত্র মহৌষধ।

ছুটুর বাবা কহিলেন, "ছুটুকে নিয়ে আমরা সুন্দর-পুরেই যাই বীণা, গঙ্গার ধারে কিছুদিন থাক্‌লেই

ঝুটু সেরে উঠ্‌বে। নীরদরা সবাই পশ্চিমে বেড়াতে গেচে, খালি বাড়ী পড়ে রয়েচে, থাক্‌বারও অসুবিধা হবে না।"

কুসুমপুরে আমার স্বামীর বাল্যবন্ধু নীরদ বাবুর বাড়ী। নীরদ বাবু বহুদিন বহু চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। কারণ, আমি সহরের মেয়ে, আমার সুখের শৈশব, হাসিভরা কৈশোর, স্বপ্নময় যৌবনের প্রারম্ভ সহরেই অতিবাহিত হইয়াছে, আমার অপরিচিত, অজ্ঞাত পল্লীর যে চিত্রটি কল্পনার বলে আমি হৃদয় ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলাম—সেটা মোটেই আশাপ্রদ নহে। কাযেই স্বামীর প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইতে পারিলাম না।

তিনি আমার মনোভাব বুঝিয়া সহাস্যে কহিলেন, "কুসুমপুর যেতে চাচ্চি শুনে তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেল; সেটা নিতান্ত বনবাস নয় বীণা; সেখানে তোমার মত, আমার মত, ঝুটুর মতও ঢের লোক আছে।"

বলিলাম, "আছে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তারা চাষা, তাদের আবার সুখ দুঃখ, তাদের আবার ভাল মন্দ! চাষাদের আমি টেবী কুকুরের চেয়েও অধম মনে করি। চাষাদের ভিতর আমার যেতে ইচ্ছে করে না।"

স্বামী বলিলেন, "মানুষকে এত ঘৃণা করা ভাল নয় বীণা, চাষাদের মধ্যেও কত উদার মহৎ প্রাণ আছে,—যা শিক্ষিত সমাজে, সভ্য সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তুমি আর আপত্তি করো না। পাড়াগাঁয়ে কৃষকদের মধ্যে তোমাকে একটিবার নিয়ে যেতে আমার বড্ড সাধ হয়েচে। তুমি রাজী হলে আমার সাধও পূর্ণ হবে, ঝুটুও সেরে আসবে।"

ঝুটু সারিয়া আসিবে, সুস্থ সবল হইবে একথা ভাবিতেই আমার অন্তস্তল পুলক-প্লাবনে প্লাবিত হইল। মনের মধ্য হইতে অজানা স্থানের ভীতি; প্রাণের বিভীষিকা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "ঝুটু ভাল হবে বুঝলে কুসুমপুরে যেতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু সাবধান হয়ে, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যেতে হবে। ছেলে সারাতে গিয়ে সাপ, বাঘের মুখে তোমাদের তুলে না দিতে হয়!"

তাঁহার চোখ দুটি সকৌতুক হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাস্য-তরল কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি বীরজায়া, বীরেন্দ্রাণী বীণা, এখন আবার বীর জননীও হয়েচ; কাযেই প্রতিপদক্ষেপে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে বৈ কি! তাই বলে কুসুমপুরে তোমার সমর সাজে যেতে হবে না। সেটা সুন্দর বনও নয়, সাঁওতাল পরগণাও নয়, সাদা কথায় ছোট্ট একটি পাড়াগাঁ; ঝি জগার মাদের মত মানুষ সেখানকার অধিবাসী।"

জগার মা ঝুটুকে কোলে করিয়া এই দিকেই আসিতেছিল, তাহার নাম উল্লেখে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডেকেছিলেন কি বাবু?"

স্বামী কহিলেন, "তুমি কুসুমপুর দেখেচ জগার মা? সে জায়গাটা কেমন? পদ্মার ধারের কুসুমপুরের কথা কিন্তু আমি বলচি।"

জগার মা প্রফুল্ল হইয়া, হাত নাড়িয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "কুসুমপুর আবার দেখিনি? খুব দেখেচি বাবু! সেখানে আমার বোনঝিরা ঘর করেচে। বড্ড ভাল গাঁ, ঠিক যেন ইন্দিরের অমরাপুরী; কিবে ফলের বাগিচা, কিবে ধানের ক্ষেত; পদ্মার জল যেন থই থই করচে, ঢেউ গুলিই বা কি তারিপের—চারদণ্ড তাকিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়।"

আমি উৎসুক হইয়া কহিলাম, "কেবল ভাল ভালই তো করছো জগার মা! সেখানে কত বড় লম্বা সাপ আছে, কত বড় বাঘ আছে তা তো বলছ না?"

জগার মা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "এমন আজগুবি মিছে কথা তোমায় কে বলেচে মা? স্বয়ং মা পদ্মা যেখানে, সেখানে নাকি সাপ বাঘ আসিতে পারে! আসুক

না, এগুক না, এক চেউতেই বাছাধনদের পটল তুল্‌তে হ'বে।"

ভজার মায়ের পটল তোলার ভঙ্গীতে মুটু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাঁহারও অধরোষ্ঠে মৃদুহাস্য রেখা খেলিয়া গেল; আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

স্বামীর একান্ত ইচ্ছায়, ভজার মার সরস বর্ণনায় আমি কুসুমপুর যাইতে স্বীকৃত হইলাম। কয়েক দিন পর বোঁচকা বাঁধিয়া, বাক্স সাজাইয়া আমরা কুসুমপুর রওনা হইলাম। ঝি ভজার মা ও চাকর বহু আমাদের সঙ্গী হইল।

২

দূর হইতে যে স্থান মানব বর্জ্জিত বন্য জন্তুর আবাসস্থল ভাবিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, কাছে আসিয়া কুসুমপুরের নয়নাভিরাম দৃশ্যে স্নিগ্ধ-শ্যামল শোভা সম্পদে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। গ্রামের অধিকাংশই কৃষক, চারিদিকেই খড়ের কুটীর, ধানের মরাই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নীরদ বাবুর গৃহ পদ্মা হইতে বেশী দূর নহে। বাড়ীর দক্ষিণে বিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তরের শেষে অগণিত বৃক্ষশ্রেণী তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কৃষক পল্লী, বামে দিগন্ত প্রসারিত শস্যক্ষেত্র, কোনখানি স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত, কোন খানি বা শ্যাম শোভায় শোভমান। সম্মুখে তৃণশূন্য বালির চর, তাহারই শেষ প্রান্তে দুগ্ধ ধবলিত কাশের বন ধৌত করিয়া সীমাহারা আপনহারা তরঙ্গময়ী পদ্মা প্রবাহিতা।

পদ্মার তীর নীরের অপূর্ব্ব লহরী লীলা দর্শন করিয়া, কৃষকদের মেঠো সুরের উচ্ছ্বসিত গান শুনিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মধ্য দিয়া আমাদের কয়েকটা দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু সে আনন্দ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মুটুর অল্প জ্বর প্রবলভাব ধারণ করিল। স্বামী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ডাক্তারের অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, এটা চিকিৎসকশূন্য গ্রাম, গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে মহকুমায় ভিন্ন ডাক্তার নাই; ঔষধ নাই। মহকুমার ডাক্তারও রাত্রে গ্রামান্তরে যান না। সমস্ত শুনিয়া স্বামীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ চিন্তার ছায়ায় ম্লান হইয়া গেল। দুঃখে ক্ষোভে আমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলাম না, অকস্মাৎ আমার দুটী চক্ষে বরষার ধারা ছুটিল।

তিনি সস্নেহে আমার অশ্রুসিক্ত মুখ মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "ভয় নেই বীণা; কাল সকালেই আমি মহকুমা থেকে ডাক্তার আনাব। যেখানে উপায় নেই সেখানে ব্যাকুল হয়ে লাভ কি? এখানেও লোকের ছেলেপিলে আছে, তাদের কথা মনে করে শান্ত হও।"

তাঁহার সান্ত্বনায় আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত হইল না। আমার সহিত চাষার তুলনায় আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "চাষার সঙ্গে ভদ্রলোকের তুলনা হ'তে পারে না; তাদের আবার সুখ, দুঃখ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা! আমি তখনি এখানে আসতে চাইনি, তোমার বুদ্ধির দোষে আজ আমার এত বিড়ম্বনা, এত কষ্ট!

তিনি কি যেন বলিবার জন্য মুখ তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠের ভাষা পরিস্ফুট হইল না। মুটু জ্বরের প্রাবল্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—"জগাই দাদা, আমায় ধরে নিয়ে যাও, আমি চান করব, তোমার সঙ্গে জলে নেমে চান করব।"

আমি মুটুর জ্বরতপ্ত দেহটি বক্ষে জড়াইয়া ডাকিলাম, "মুটু কি বলছ মণি, জগাইদাদা কে?" মুটু আমার কথার প্রত্যুত্তর করিল না। অস্ফুট কণ্ঠে কয়েকবার জগাই দাদা জগাই দাদা বলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

ভজার মা বারান্দায় বসিয়া বাতি সাজাইতেছিল, মুটুর চিৎকারে সচকিত হইয়া শয্যাপ্রান্তে ছুটিয়া আসিল। কিয়ৎকাল মুটুর পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আপনি ভয় পেয়োনা মা; খোকাবাবু ভাল হবেন; রাতের ভিতর মা রক্ষাকালী জ্বর ছাড়িয়ে দেবেন। ডাক্তার কি করবে? যে রব্য ওর শরীলে"—বলিতে বলিতে

হঠাৎ থামিয়া গিয়া যোড়করে গলবস্ত্রে ভজার মা রক্ষাকালীর উদ্দেশে মাটীতে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

আমরা এ কালের শিক্ষাপ্রাপ্তা; শশ্মানকালী রক্ষাকালী, মূর্খদের কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা উপহাস করিতেই শিখিয়াছি; তাই ভজার মায়ের ভক্তি-উচ্ছ্বাসে আমার অপ্রসন্ন চিত্ত আদৌ প্রসন্ন হইল না; আমি বিরক্ত হইয়া তিক্তকণ্ঠে কহিলাম "এখানে গোলমাল করো না ভজার মা; এটা আমার গোলমালের সময় নয়; আমি কালী টালি কিছু মানি না; আমার ছেলের জন্তে তোমাকে কাউকে ডাকতে হবে না।"

ভজার মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে চলিয়া গেল।

স্বামী মুটুর মাথায় পাখায় বাতাস দিতে দিতে কহিলেন, "ভজার মা বড্ড দুঃখিত হয়ে গেল বীণা, বিশ্বাসীর বিশ্বাসে, ভক্তের ভক্তিতে সন্দেহ করতে নেই। ভজার মা মুটুকে তোমার চেয়ে আমার চেয়ে কম ভাল বাসে না।"

আমি রুক্ষস্বরে কহিলাম, "ছোটলোকের আবার ভালবাসা, তাদের স্নেহ মমতা! তারা টাকা ভালবাসে, অর্থের প্রত্যাশায় ভালবাসা দেখাতে আসে। আমি ওদের স্নেহ কখনো বিশ্বাস করি না, করবও না।"

তিনি কথা কহিলেন না, নিরুত্তরে ব্যথিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর মেলিয়া দিলেন।

৩

ভজার মায়ের রক্ষাকালীর কৃপাতেই হউক্ অথবা অন্ত কারণেই হউক্, পরদিন প্রভাতেই মুটুর জ্বর ছাড়িয়া গেল। মুটু কচিমুখে হাসির লহর তুলিয়া ভজার মার কোলে চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার বায়না ধরিল। এখানে আসিয়া মুটু আমার স্নেহাঞ্চল হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া বনে প্রান্তরে বেড়াইতেই ভালবাসিত। মুটুর এ পরিবর্তনে আমি খুসী না হইয়া একটু দুঃখিতই হইয়াছিলাম। মায়ের সুনিশ্চিত সুনিরাপদ স্নেহের কোল ভিন্ন ছেলের আকর্ষণের আবার কি থাকিতে পারে?

আমি মুটুকে বক্ষে চাপিয়া কহিলাম, "এখন বেড়াতে যায় না মণি, তোমার যে বড্ড অসুখ করেছে। অসুখ ভাল হলে ভজার মার সঙ্গে বেড়াতে যেয়ো।"

কুসুম-পেলব বাহু দুটিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের স্বরে মুটু কহিল, "অসুখ আমার ভাল হয়েছে মা, আমি এখুনি জগাই দাদার কাছে যাব।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, এ ত মুটুর জ্বরের প্রলাপ নহে, স্বপ্নের জড়িমা নহে, জগাই দাদা কে? কোন্ অপরিচিত অনাত্মীয় আমার চক্ষের অন্তরাল হইতে এমন করিয়া শিশু হৃদয়টি জয় করিয়া লইয়াছে?

আমি ভজার মাকে ডাকিয়া এ রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলাম, কারণ এখানে আসিয়া মুটু ভজার মার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সহজে বন্ধুর নিকটে ঘেঁসিতে চাহিত না। তাহার প্রসাধন, ভ্রমণ, স্নান, ভজার মা না হইলে সুসম্পন্ন হইত না।

আমার প্রশ্নে ভজার মা ম্লানমুখে সংক্ষেপে জানাইল, গ্রামের একটা আধ পাগলা লোককে বালচপলতা বশতঃ খোকাবাবু জগাই দাদা বলে। শিশুচরিত্র বালকের খেয়াল, তাহার মূল্য নাই। স্বামী ভজার মার কথাটা সমর্থন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, মুটুর আবোল-তাবোলে মানুষ আবার কাণ দেয়! ও বেড়াতে যেতে চাচ্ছে—মোটা কাপড় দিয়ে বেশ করে গা ঢেকে, ভজার মার কাছে দাও একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসুক। আর আর ডাক্তার ডেকে দরকার নেই, আমার মনে হচ্ছে এখন এম্‌নিই মুটু ভাল হ'য়ে যাবে।"

আমি স্বামীর আদেশ অবহেলা করিতে পারিলাম না। মুটু ভজার মার সহিত বেড়াইতে গেল; কিন্তু আমার মনের মেঘ কাটিল না। যে জগাই আমার মুটুর হৃদয়-আসন অধিকার করিয়া লইয়াছে—তাহার সংবাদ জানিবার জন্ত আমি উৎসুক হইয়া রহিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, স্বামীর অনুমান

মিথ্যা হইল না। সেই দিনের প্রবল জ্বরের পর হুটু ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিল। তাহার চোখের কোল দুটি ভরিয়া উঠিল, শ্বেত অধরোষ্ঠ রক্তিমাভা ধারণ করিল। তাহার পরিবর্ত্তনে আমার কুসুমপুরের প্রতি বিতৃষ্ণা বিমুখতা কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন অন্তর্হিত হইল। প্রভাতবায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মত, আনন্দে আমার হৃদয়টুকু ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেদিন ভজার মা পদ্মায় জল আনিতে গিয়াছিল, আমি হুটুকে স্নান করাইবার জন্ত তাহার গায়ের জামাটি খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম—হুটুর দক্ষিণ বাহুতে রাঙা সূতার সহিত একটি তামার মাদুলী বাঁধা রহিয়াছে। যাহা কখনও বিশ্বাস করি না, যে দ্রব্য সভ্য-সমাজে অতি হেয়, হাস্তকর—আমার পুত্র আমারই অজ্ঞাতে সে জিনিষ শরীরে ধারণ করিয়াছে! লজ্জায় ঘৃণায় আমার গর্ব্বোজ্জ্বল হৃদয় ধূলি-শয্যায় লুটাইয়া পড়িল, আমি ক্রোধভরে একটানে সূতা খুলিয়া মাদুলীটা প্রাঙ্গণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

হুটু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমার লাল গয়না ফেলে দিলে কেন মা? জগাই দাদা আমার লাল গয়না পরিয়ে দিয়েচে।"

বলিলাম, "জগাই দাদা কে হুট? সে কোথায় থাকে?"

ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে হুটু কহিল, "জগাই দাদা জলের ধারে থাকে মা, আমাকে আদর করে গয়না পরিয়ে দেয়, জগাই দাদার গয়না আমার হাতে বেঁধে দাও।" বলিতে বলিতে হুটু ছুটিয়া গিয়া প্রাঙ্গণ হইতে মাদুলীটি কুড়াইয়া আনিল।

আমি বিহ্বলের মত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বদুকে ডাকিয়া মাদুলীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বদু বলিল, সে কিছুই জানে না, খোকাবাবু সর্ব্বদা ভজার মার কাছেই থাকে, তাহার সহিতই বেড়াইতে যায়। একদিন দূর হইতে একটা ভিখারী গোছের বুড়ার কোলে সে খোকা বাবুকে দেখিয়াছিল।

আমি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সে বৃদ্ধ কে? সেই কি হুটুর জগাই দাদা? হুটুর সহিত তাহার এত বন্ধুত্বের কারণই বা কি? হুটু যদি তাহার স্নেহের পাত্রই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্নেহ ভালবাসা সংগোপন রাখিবার এত প্রয়াস কেন? ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ একটি কথা সুস্পষ্ট দিবালোকের মত আমার স্মৃতির দর্পণে ফুটিয়া উঠিল।

এখানে আসিবার পর দিন একটি কৃষকপত্নীর নিকট শুনিয়াছিলাম, অনেক কাল পূর্ব্বে এদেশে একবার ছেলেধরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পদ্মার বাঁকে নৌকা রাখিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ের সন্ধানে তস্করগণ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। অতিরঞ্জিত জনশ্রুতি ভাবিয়া সেদিন কৃষকপত্নীর কথায় কর্ণপাত করি নাই, কিন্তু আজ তাহার সেই মুখরোচক বাক্যবিন্যাস মিথ্যা বলিয়া অবহেলা করিবার ক্ষমতা আমার রহিল না। আমি যেন বিনা সংশয়ে ভজার মার হাতে হুটুকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু অশিক্ষিতা নিরক্ষরা ভজার মা অর্থের প্রলোভনে হুটুর যে অপকার করিতে পারে তাহা একবারও স্মরণ হয় নাই। ভজার মা বোধ হয় ছেলেধরাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া হুটুকে বশীভূত করিয়া লইতেছে, তাই এত গোপনতা, এত লুকোচুরি।

হুটুর হাসিভরা মুখপানে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, আমি স্পন্দিত বক্ষে হুটুকে কোলে লইয়া শয্যায় আশ্রয় লইলাম।

৪

প্রতিদিনের মত যথানিয়মে রৌদ্রতপ্ত ধরণীর বক্ষে অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া ঘনাইয়া আসিল। লক্ষ ফুলের পরিমল বহিয়া মন্দ সমীরণ আসন্ন সন্ধ্যার বারতা বিশ্বের দ্বারে জানাইতে লাগিল।

হুটু তাহার জামা জুতা হাতে লইয়া ডাকিল, "ভজুমা, আমার জামা পরিয়ে জুতো পরিয়ে আমার জগাই দাদার কাছে নিয়ে চল্। শীগ্‌গির করে নিয়ে চল্।"

ভজার মা তাড়াতাড়ি আরদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া দুটুর কাছে আসিতেই আমি বলিলাম, "দুটু আজ বেড়াতে যাবে না; জলো হাওয়ায় ওর সর্দ্দির মত হয়েচে। তুমি যাও কায কর গে।"

ভজার মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "খোকাবাবু কি ঘরে থাক্‌বে মা? ও যে কেঁদে কেঁদে অনর্থ করবে, পদ্মার ধারে না গিয়ে মাঠের দিক থেকে বেড়িয়ে আনলে হয় না?"

একবার সাধ হইল ভজার মাকে দুটুর জগাই দাদার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এ সমস্যার সমাধান করি, কিন্তু সাহস হইল না। আমি সব জানিতে পারিয়াছি জানিলে হয়ত উহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখন যাহা কৌশলে আয়ত্ত করিতে যত্নবান হইয়াছে, ভয় ভাঙ্গিলে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। এই আত্মীয়শূন্য, বান্ধবশূন্য স্থানে আততায়ীর হস্ত হইতে কে আমাদের রক্ষা করিবে? কাহার মাথা ব্যথা! আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, "একটু কাঁদে কাঁদবে, আমি ভুলিয়ে রাখব ভজার মা, তোমার ইচ্ছে হয় তুমি বেড়াতে যাও গে।"

ভজার মা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

দুটু হাতের জুতা ফেলিয়া দিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল—"আমি তোমার কাছে থাক্‌ব না মা, ভজু মার কোলে চড়ে জগাই দাদার কাছে যাব।" আমি আদর করিয়া, চুমো খাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে শান্ত হইল না, আমার স্নেহ বেষ্টনের মধ্যে ধরা দিল না।

দুটুর চিৎকারে স্বামী আমার নিকটে আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুটু কাঁদে কেন? ওকে বেড়াতে পাঠিয়ে দাও না। পদ্মার বাতাসে ওর কিছু অসুখ করবে না, এখানকার বাতাসই ওষুধের কায্ করে।"

তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমার অব্যক্ত বেদনা, অন্তরের উদ্বেগ সহসা উচ্ছ্বসিত হইল। তবু আজ আমি হৃদয়ের দ্বার তাঁহার কাছে খুলিতে পারিলাম না। আমার বিলক্ষণরূপে জানা ছিল, তিনি আমার সন্দেহ আমার অনুমান একটুও বিশ্বাস করিবেন না; ভ্রান্ত বলিয়া, আগাগোড়া ঘটনাবলী উপহাসের সহিত উপেক্ষা করিবেন। সমস্ত শুনিয়া ভজার-মা ত্বরায় নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করিবে। তাহার চেয়ে কাহাকে কিছু না জানাইয়া, অবিলম্বে এস্থান পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া আমি ছলনারই আশ্রয় লইলাম। তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলাম, "দুটুর সর্দ্দির মত হয়েচে, দুপুরে গা একটু গরম হয়েছিল, আজ আর বেড়াতে যেতে দেব না। আমার শরীরটাও ভাল লাগছে না, চল কাল ভোরের গাড়ীতেই আমরা কলকাতা চলে যাই। এখানে আর একমুহূর্ত্তও মন টিক্‌ছে না।"

তিনি পরিহাসের স্বরে বলিলেন, "আসা যত সোজা, ফেরা তেমন সহজ নয় বীণা! তোমার শরীরটা ভাল নয় বলচ, শরীরের দিকে চেয়ে দেখে বলচ, না, না দেখেই বলচ? দুটুর সর্দ্দি, গা গরম, এটাও তোমার উৎকট কল্পনা বীণা! দুটু যে সারা দুপুর আমার কাছেই শুয়ে ছিল, সর্দ্দি হলে, গা গরম হলে আমি কি টের পেতাম না? আজ বোধ হয় কেউ তোমার কাছে বাঘের গল্প করেচে, তাই ঘরে ছিপি আঁটার ব্যবস্থা করচ।"

আমি বলিলাম, "বাঘের ভয়ে নয়, আমার এখানে ভাল লাগছে না, আমি আর থাকতে পারচি না, এখানে থাকলে আমি মারা যাব। তুমি বাঁচবে না, দুটু শেষ হয়ে যাবে। চল কালই আমরা চলে যাই।" বলিতে বলিতে আমার অশ্রুজল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তাঁহার আগমনের সঙ্গেই দুটুর কান্না থামিয়া গিয়াছিল। দুটু জুতার মধ্যে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা, মা কাঁদে, মাকে বকো না।"

তিনি বিস্মিত হইলেন, ব্যথিত হইলেন। আমার হাতখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "কান্না কেন বীণা, কি হয়েছে আমার বল্‌বে না? সত্যি

তোমার এ জায়গায় থাকতে ভয় করচে, কিসের ভয় বীণা ?"

"কিসের ভয় জানি না, আমি এখানে আর থাকতে পারব না, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি কহিলেন, "আজ বীরুদের চিঠি পেলাম, আমরা এখানে এসেচি শুনে তারা বড় খুসী হয়েচে; আমাদের সঙ্গে দেখা করতেই তারা সস্ত্রীক শীগ্‌গির আসছে লিখেচে। আর তিন চার দিন অপেক্ষা ক'রে তাদের সঙ্গে দেখাটা না ক'রে যাওয়া কি ভাল হয় বীণা ?

বলিলাম, "তিন চার দিন আমি এখানে থাকব, তার বেশী থাকতে পারব না। মুটুকে আমি বাড়ীর বের হতে দেব না, ভজার মার সঙ্গেও নয়, যদুর সঙ্গেও নয়। এমন কি তোমার সঙ্গেও নয়।"

তিনি আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কিসে এত ভয় পেলে বীণা তা আমাকে গোপন কর কেন ? আগে তো তুমি এমন ছিলে না। তোমার যা খুসী তাই কর, আমি কিছু জানতে চাইব না।"

তিনি অভিমানে আমার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার অভিমান, আর্দ্র কণ্ঠস্বর, ছল ছল চক্ষু আমার অন্তরে পীড়া দিতে লাগিল। মুটুর কল্যাণ কামনায় আমি তাঁহাকে ডাকিতে পারিলাম না, আমার মর্ম্মোচ্ছ্বাস তাঁহাকে জানাইতে পারিলাম না, নীরবে রহিলাম।

৫

সে দিন দ্বিপ্রহর বেলা, স্বামী গৃহে ছিলেন না। স্নানাহারের পর মহকুমা দেখিতে গিয়াছিলেন। ভজার মা তাহার বোনঝির বাড়ী যাইবার নিমিত্ত আমার নিকট হইতে ছুটি লইয়াছিল। শয়ন কক্ষে মুটুকে লইয়া আমি শুইয়াছিলাম। বাহিরে যদু তাহার নবীন বন্ধু কালু চৌকিদারের সহিত বোধ হয় গঞ্জিকা দেবীর উপাসনা করিতেছিল।

এতক্ষণ বিছানায় শুইয়া মায়ের মুখে তেপান্তর মাঠের গল্প শুনিতে মুটুর ভাল লাগিল না; মুটু বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া দূরের বনরাজীর দিকে মুখ করিয়া আপন মনে বকিতে লাগিল। কখনও বা ঘুঘুর করুণস্বর অনুকরণ করিয়া মধুর কণ্ঠে ঘুঘু শব্দে নির্জ্জন গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তরু পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি, পাখীর সকরুণ বিলাপ, এবং পদ্মার কুলু কুলু কলোচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাসে আমার চক্ষু দুটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া মুদিয়া আসিল। ক্ষণকালের জন্য আমি সংসার ভুলিয়া; মুটুকে ভুলিয়া নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিলাম।

"জগাই দাদা, ও জগাই দাদা !"

"দাদামণি, দাদু আমার।" এ সম্বোধনে আমার সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। আমি বজ্রাহতের মত চমকিয়া কি দেখিলাম! মুটু জানলার মধ্য দিয়া হাত দুইখানি বাহিরে প্রসারিত করিয়া কাহাকে যেন জড়াইয়া ধরিয়াছে, বাহির হইতেও দুইটি বাহুর বন্ধনে মুটুকে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাঝখানে জানলার গরাদগুলি তেমনি অক্ষয় অটল হইয়া দুইটি হৃদয়ের মাঝখানে একটি ব্যবধানের বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

যে মুটুকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে তাহার প্রতি চাহিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমার শরীর বেতস পত্রের মত কম্পিত হইতে লাগিল।

লোকটির বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ বছরের অধিক হইবে না। রুক্ষ চুলগুলির অধিকাংশই সাদা হইয়া গিয়াছে। পরণে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র। চোখের দৃষ্টিটা যেন ভারী উদ্‌ভ্রান্ত, কাতরতাময়। ও যে মুটুর জগাই দাদা, ভজার মা যে উহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। আমি ভাল করিয়া লোকটাকে নিরীক্ষণ করিতে সবিস্ময়ে

দেখিলাম, বাতায়ন পার্শ্ববর্ত্তী টেবিলের উপর আমার সোণার হাত ঘড়িটা নাই। যে ঘড়ি লইয়াছে, সেই মুটকে অপহরণ করিবে এই আশঙ্কায় বিহ্বলের মত চিৎকার করিতে লাগিলাম, "চোর! কে কোথায় আছ রক্ষা কর! চোর।"

কিসের একটা উন্মাদনায়, কিসের আবেশে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমার চিৎকারে কে যে আসিয়াছিল, কে যে চোর ধরিয়াছিল আমি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যখন শান্ত হইলাম; লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন কালু চৌকিদার জগাইকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে; দূর বনপথ হইতে কেবল একটি আর্ত্তনাদ আমার কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে লাগিল—"আমায় মেরো না, আর মেরো না ভাই, আমি চোর নই।" সেই আর্ত্ত স্বরের সহিত যেন স্বর মিলাইয়া মুটু কাঁদিতে লাগিল—"আমার জগাই দাদাকে মেরে ফেল্লে রে, আমি জগাই দাদার কাছে যাব।" বেণুবনের শীর্ষ দুলাইয়া বাঁশ ঝাড়ের কম্পন তুলিয়া একটি বৃদ্ধ এবং একটি শিশুর ক্রন্দনের প্রতিধ্বনির মত বাতাস হা-হা করিয়া বহিয়া গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে গুরু গুরু মেঘ ডাকিতে লাগিল। আমি রোরুদ্যমান বালকের সম্মুখে পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বামী গৃহে ফিরিয়া ডাকিলেন, "বীণা, যদুর কাছে আমি সব শুনলাম। এত কাণ্ড হবে জানলে আমি কখ্খনো বাড়ী ছেড়ে যেতাম না। তুমি অমন হয়ে বসে আছ কেন? মুটু মাটিতে ঘুমিয়েছে, ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও।"

অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমাকে যেন কেমন বিবশা করিয়া ফেলিয়াছিল। মুট কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল আমি তাহা লক্ষ্যও করি নাই। স্বামীর আহ্বানে আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি মুটুকে বিছানায় রাখিয়া স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলাম। আজ অশ্রুজলের মধ্য দিয়া আমার আতঙ্ক, মুটুর জগাই দাদার প্রতি প্রাণের টান, ভজার মার গোপনতার প্রয়াস সমস্তই তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিলাম। তিনি একটু চিন্তা করিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "আমার মনে হচ্ছে—তোমার অনুমান একটাও সত্যি নয়, সবটাই ভুল। তোমার মহাভুলে হয় তো একটি নির্দ্দোষ প্রাণীর ভয়ানক যন্ত্রণা পেতে হবে। অনাত্মীয় অপরিচিত একটি ছেলেকে যে এত ভাল বাসতে পারে, সে কখ্খনো ছেলেধরা নয় বীণা, চোরও নয়।"

আমি বলিলাম, "সে যদি সাধুপ্রকৃতি হবে তাহলে কি উদ্দেশ্যে দুপুর বেলা এখানে এসেছিল? আর তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়িটা কেন অন্তর্দ্ধান হ'ল?"

"ঘড়ি তো তার কাছে পাওয়া যায় নি, মুটু হয় তো কেউ কোথাও রেখেছে। কি উদ্দেশ্যে সে এসেছিল তাও কি বুঝতে পারছ না বীণা? সে মুটুকে স্নেহ করে, হয়তো খুবই স্নেহ করে। তুমি এখন মুটকে ঘরের বের হ'তে দাও না তাই জগাই লুকিয়ে মুটুকে একবার দেখ্তে এসেছিল।"

কি নূতন কথা, কি অভাবনীয় কল্পনা! এমন কি হইতে পারে? নিম্ন শ্রেণীর চাষা, তারা কি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এমন নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে জানে! ভ্রম—স্বামীর মহাভ্রম, ভজার মাকে কঠোর শাস্তি দিয়া তাঁহার মন হইতে এ ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে।

আমি তখনই ভজার মাকে তাহার বোনঝির বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতে যদুকে পাঠাইয়া দিলাম।

৬

সন্ধ্যার পর বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিলাম। বর্ষার মেঘান্ধকারে ধরণী আবৃত হইয়া গিয়াছিল। গগনপট চন্দ্রমা শূন্য, নক্ষত্র শূন্য, মেঘে মেঘে মেঘময়।

শৃগালেরা সন্ধ্যা ঘোষণা করিয়া সেইমাত্র থামিয়াছে, কিন্তু ঝিল্লীর ঐকতান তখনও নীরব হয় নাই।

ঝোপে ঝোপে জোনাকীর মৃদু আলো এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল, পরক্ষণে নির্ব্বাপিত হইতেছিল।

এমন সময় বদুর সহিত ভজার মা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িয়া সে ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"আমি বদুর কাছে সব শুন্‌লাম মা। তোমরা যাকে ছেলেধরা ভেবে, চোর ভেবে থানায় পাঠালে,—তার কোন দোষ নেই, যত দোষ আমার। তোমরা কিছু বিশ্বাস কর না, ছোটলোককে ঘেন্না কর বলেই আমি এতদিন জগাইয়ের কথা তোমাদের বলিনি। তার কয়েদ হ'লে আমার কি দশা হবে গো, আমি যে পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরবো।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগাই কে? তার সঙ্গে টুটুর এত ভাব হল কি করে, আর মাদুলিই বা কোথায় থেকে এল?"

ভজার মা বলিল, "জগাই এই গাঁয়েরই চাষা, ওর কেউ নেই। সেবার ওলাওঠায় জগাইয়ের ছেলে, বৌ, মেয়ে সব মরে গেছে বাবু, কেবল একটি নাতী ছিল। সেই নাতীটিকে জগাই বড্ড ভালবাস্‌তো—বুকে করে মানুষ করেছিল, একদণ্ড চোকের আড় করতে পারে নি। সেই নাতীটি চার বছর বয়সে, আজ চার বছর হ'ল মা বাপের কাছে চলে গেছে। তারই শোকে জগাই ঘরে থাকতে পারে না, কাষ-কর্ম্মে মন দেয় না, পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। আমাদের খোকাবাবু দেখতে নাকি জগাইয়ের নাতীর মত, বয়সও তাই। জগাইয়ের বিশ্বাস—তার নাতীই খোকাবাবু হ'য়ে আপনাদের ঘরে জন্ম নিয়েচে, মায়া কাটাতে না পেরে তার ঠাকুরদাদাকে দেখা দিতে এসেচে।"

আমার বক্ষ আন্দোলিত হইতেছিল। আমি ব্যথিত হইয়া কহিলাম, "একথা আগে আমায় জানাও নি কেন ভজার মা?"

ভজার মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "ছোট লোকের ভালবাসা তুমি ভালবাসতে না মা, হয়তো জগাইয়ের কাছে খোকা বাবুকে যেতে দিতে না। সেই জন্যে মাদুলীর কথাও আমি তোমাকে বলিনি। খোকাবাবুর জ্বর ছাড়ে না শুনে জগাই সমস্ত দিন উপোষ ক'রে, অমাবস্যার নিশীথ রাতে মোহনপুরের শ্মশানে গিয়ে রক্ষাকালী মায়ের চরণ পুজোর বেলপাতা এনে খোকাবাবুর মাদুলী করে দিয়েছিল। মাদুলী অবিশ্বাস করলে ফলে না বলেই তোমায় বলিনি মা।—ক'দিন খোকাবাবুকে না দেখে জগাই অস্থির হ'য়ে আজ তাকে দেখতেই এখানে এসেছিল। ঘড়ি চুরির জন্যে নয়, খোকাবাবু তখন ঘড়িটা ভাঙতে গিয়েছিল বলে আমি সেটাকে সাবানের বাক্সের মধ্যে তুলে রেখেচি।"

ভজার মা উঠিয়া গিয়া গৃহ হইতে ঘড়িটি আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিল।

অকস্মাৎ আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। দেহের অভ্যন্তরে কর্ণ-কুহরের মধ্যে মৃত্যু রজনীর ঝিল্লি-ধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। হায়, কি করিয়াছি, শিক্ষাভিমানে বংশ-গৌরবে স্ফীত হইয়া কাহাকে ঘৃণা করিয়াছি, সন্দেহ করিয়াছি! একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, একটিবার অনুসন্ধান করাও দরকার বোধ করি নাই, অম্লান বদনে চোর অপবাদে তাহার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি! ভগবান, তুমি কি আমার এ অন্যায়, এ অপরাধ মাপ করিতে পারিবে?

অনুশোচনার তীব্র আগুনে পুড়িতে পুড়িতে আমি তাঁহার পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম "তাকে ফিরিয়ে আন, আমার সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে তাকে ফিরিয়ে আন।"

তিনি স্নেহভরে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "শান্ত হও বীণা, ছিঃ এমন কি করে! আমি এখুনি থানায় যাবার ব্যবস্থা করচি। থানা এখান থেকে ঢের দূর, আমার পথ ঘাটও চেনা নেই, বদুকে দিয়ে একখানা গরুর গাড়ীর খোঁজ করাচ্ছি। বদুকে নিয়েই আমার যেতে হবে, কিন্তু তুমি কি ভজার মাকে নিয়ে খালি বাড়ীতে থাকতে পারবে?"

বলিলাম, "পারবো, আর আমার ভয় নেই। তাকে শীগ্‌গির করে আমার কাছে ফিরিয়ে এনো।"

"আনতেই তো যাচ্ছি বীণা। পুলিশের হাত থেকে তাকে মুক্ত করতে পারব কি না তা ভগবান জানেন।" বলিতে বলিতে তিনি বাহিরে যাইবার বেশভূষা করিতে লাগিলেন।

জতার মা আসিয়া কহিল, "মা, বাবু যে এখন যাচ্ছেন, রান্না হয়নি, বাবুর খাবার কি হবে?"

"রাতে যদি ফিরতে পারি, ফিরে এসেই খাব। এখন আর দেরী করবার সময় নেই, পথ থেকেই গোরুর গাড়ী ঠিক ক'রে নেব, তোমরা সাবধান হ'য়ে থেকো জতার মা।"—বলিয়া বাক্সের মধ্য হইতে একটা নোটের তাড়া লইয়া তিনি বন্ধুর সহিত প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে জতার মা আমাকে শয়ন করিবার জন্ম ডাকিয়া গেল; কিন্তু আমি উঠিলাম না। আহার ভুলিয়া, নিদ্রা ভুলিয়া, শ্যামল সুন্দর বসুন্ধরার পানে চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। কাশ-শ্রেণীর প্রান্তে শান্ত পদ্মাবক্ষে শত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তরুতল হইতে ঝিল্লিরব শ্রান্ত হইয়া আসিল। বর্ষাসিক্ত বনের মৃদু গন্ধোচ্ছ্বাস গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল।

* * *

প্রভাতে স্বামী ফিরিয়া আসিলেন। আশঙ্কায় আতঙ্কে আমি তাঁহাকে একটি প্রশ্নও করিতে পারিলাম না। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার ভয় নেই বীণা। দারোগাকে দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে জগাইকে নিয়ে এসেচি। কিন্তু চুরি স্বীকার করবার জন্মে পুলিশের লোক মারতে মারতে, ডান হাতখানা একেবারেই ভেঙে দিয়েছে। আমি ডাক্তার দিয়ে তার হাত পরীক্ষা করে এনেছি। ডাক্তার বল্লেন, এত বয়সে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগবার আশা নেই। একটু ওষুধ দিয়ে হাতখানা বেঁধে দিয়েছেন।"

আমি তাঁহার সহিত স্বপ্নচালিতের মত বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলাম, ধুলার উপর জগাই বসিয়া রহিয়াছে, হুটু তাহার কোলে উঠিয়া ভাঙ্গা হাতখানায় ফুঁ দিয়া দিতেছে।

সেই প্রহারে জর্জ্জরিত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর উৎপীড়িত চাষার নিকটে সরিয়া গিয়া আমি অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিলাম, "জগাই, আমিই তোমার এত দুঃখ কষ্টের কারণ। হুটুর মুখের দিকে চেয়ে তুমি আমায় মাপ কর।"

জগাই মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টি আমার পানে প্রসারিত করিয়া, আমার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। একটু হাসিয়া অত্যন্ত সহজ স্বরে বলিল, "আমার নিজের পাপেই আমি কষ্ট পেয়েছি মা, আপনি ও কথা বলে আমার অপরাধ বাড়াইও না। এখন আমার কোন যাতনা নাই; আমার দাদামণিকে কোলে করে সকল দুঃখু শীতল হয়ে গেছে।"

বলিলাম, "যাকে পেয়ে তোমার এত কষ্টের অবসান হল জগাই, আজ থেকে তাকে আমি তোমার হাতেই দিলাম। এখন হুটুর ঘর, তোমার ঘর হল, হুটুর মা তোমার মা হল।"

জগাইয়ের মলিন মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞতাভরা সরল নেত্র আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া জগাই আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

সাহিত্য

(রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশনে, সাহিত্য-শাখা-সভাপতির অভিভাষণ)

বঙ্গসাহিত্যসেবকবৃন্দ,

সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন জানাইয়া প্রার্থনা করি—জয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সাহিত্য-সেবকগণের সেবা করিয়া আসিতেছি; তজ্জন্য সেবার যৎকিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিয়াছে; কিন্তু পৌরোহিত্য অনভ্যস্ত অনধিকারচর্চ্চা। আপনারা অনধিকারীর দুর্ব্বল মস্তকে সম্মানের উষ্ণীষ পরাইয়া দিয়া তাহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনাদিগের নিকট যে দুই চারিটী কথা বলিব, তাহা সভাপতির অভিভাষণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না,—তাহা সেবকের বিনীত নিবেদন।

আজ যে স্থানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি, তাহা সমগ্র বঙ্গবাসীর সুপরিচিত তীর্থক্ষেত্র। একদিন ইহা আচার্য্য অভিরাম ঠাকুরের লীলাস্থল ছিল; তাঁহার শ্রীপাট এখনও অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর ভক্তির অর্ঘ্যে সুরক্ষিত; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দ্বাদশগোপালের অন্যতম। এই স্থানে আবার বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রদূত, নব্যভারতের নবযুগপ্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। এই স্থানেরই অনতিদূরে সেনহাট গ্রামে বহুদিন পূর্ব্বে—১১৯২ সালে আর এক সাধক, ভক্ত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর দাস। তাঁহার 'জগন্নাথ মঙ্গল' ১২২৩ সালে লিখিত হয়। তাঁহার 'সঙ্গীত মাধব', 'প্রেম-সম্পুট' 'ভক্ত রত্নমালা' বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কার। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিতকার স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় এইখানে বসিয়া সংবাদ পত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। বহুদিনের বহুক্লেশের পথশ্রমের অবসানে তীর্থক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া মন্দিরচূড়া করিয়া থাকে, এই স্থানে, এই পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইয়া সেইরূপ উল্লাসে সর্ব্বাগ্রে ইহার জয়ধ্বনি করি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতে করিতে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি; তাহার কোনটীরই মীমাংসা করিতে পারি নাই; করিবার মত সেরূপ শক্তি সামর্থ্য নাই; সেরূপ স্পর্দ্ধাও প্রকাশ করিতে পারি না। সেই সমস্যাগুলিই সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করিব।

প্রথম সমস্যা—বর্ণ-বিন্যাস। পুরাতন পুথিতে বর্ণ-বিন্যাসের যে রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই যে পুরাতন রীতি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যে রীতি ধীরে ধীরে নব্য বঙ্গে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাকে পুনরায় পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অল্পদিন হইতে নবীন উদ্যম প্রকাশিত হইতেছে। 'কর্ম্ম' হইতে কাজের উৎপত্তি ধরিয়া লইয়া সেকালের লেখকগণ বর্গিক 'জ'কারের ব্যবহার করিতেন; 'কার্য্য' হইতে 'কাযে'র উৎপত্তি কল্পনা করিয়া, পরবর্ত্তী কালে অনেকে অন্তঃস্থ 'য'কারের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিলেন; এখন 'কাজের' বর্ণ-বিন্যাসে আমরা কোন্ রীতি অবলম্বন করিব,—ইহার সমাধান কঠিন নয়। কারণ, উভয় রীতির মূলেই ইতিহাস আছে। কিন্তু যে সকল বর্ণ-বিন্যাসের মূলে কোনরূপ ইতিহাস নাই, সেরূপ বর্ণ-বিন্যাস চালাইতে হইলে, শব্দের ইতিহাসের মূল সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমরা সে সকল স্থলে কোন্ রীতির অনুসরণ করিব? সংস্কৃত ও সংস্কৃতমূলক শব্দ পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর অনেক শব্দ দিন দিন অধিক মাত্রায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া তাহার শব্দদৈন্য দূর করিতেছে। তাহাদের বর্ণ-বিন্যাস কিরূপ হইবে? 'বঙ্গ' নামটি পুরাতন; তাহা পুরাকালে আমাদের দেশের একটি

সমগ্র দেশকে বুঝাইবার জন্ত ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার বর্ণ-বিন্যাস কিরূপ হইবে? এ বিষয়ে মীমাংসা আবশ্যক, মীমাংসা হয় নাই।

দ্বিতীয় সমস্যা—পদ-বিন্যাস। ইহাও বহু পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু নিতান্ত আধুনিক হইলেও, বিলক্ষণ জটিল। পদ-বিন্যাসের সঙ্গে রীতির সম্বন্ধ অপরিহার্য্য; রীতির সঙ্গে দেশের সম্বন্ধও সেইরূপ। পুরাকালে সংস্কৃত সাহিত্যে "গৌড়ী রীতি" প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল,—বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের উপরেও তাহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালীর সেই নিজস্ব রচনারীতি ছাড়িয়া দিয়া, পদ-বিন্যাস করিলে, অধিকাংশ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য হইবার আশঙ্কা আছে। যাত্রায়, কথকতায় সাধুশব্দ-বিন্যাসের আতিশয্য থাকিলেও কোন বাঙ্গালী অর্থবোধ করিতে কষ্ট বোধ করে না। ভাষাকে যতই স্বাধীন ও সরল করা হউক না কেন, তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে উচ্ছৃঙ্খল করা সঙ্গত কি না, তাহাই বিচার্য্য। আমরা যাহাকে মৃত ও যাহাকে জীবিত ভাষা বলিয়া থাকি, তাহাদের ঐরূপ নামকরণ করা ঠিক কি না, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। যে ভাষা সুসংযত, সুমার্জ্জিত, সুসংস্কৃত, তাহা মরে না বলিয়া, তাহাই জীবিত ভাষা বলিয়া কথিত হইতে পারে;—সংস্কৃত, আরবী, লাটিন, গ্রীক এই হিসাবে মৃত নয়, চির-জীবিত ভাষা। আধুনিক ভাষাগুলি শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া, নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে নিরন্তর অগ্রসর হইতেছে। এক যুগের রচনা অন্য যুগে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িতেছে সত্য, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন কি সজীবতার লক্ষণ নহে? আমাদের জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালা ভাষার গতি কি হইবে? ইহাকে যদি সজীব করিতে হয়, তবে নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে কি না? সে নিয়ম পুরাতন না হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু সকলকেই তাহা মানিয়া চলিতে হইবে কি না?

তৃতীয় সমস্যা—সুরুচি ও কুরুচি, সুনীতি ও কুনীতি। বঙ্গ সাহিত্য-সমাজে এই সুরুচি ও কুরুচি, সুনীতি ও কুনীতি লইয়া আলোচনা, আন্দোলন ও কোলাহল উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধানও আমরা দেখিতে চাই। বঙ্গসাহিত্য এক্ষণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নয়; বাঙ্গালা ভাষার তথা বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবকগণ নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহাদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। এ অবস্থায় কোন এক সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতির বৈলক্ষণ্যই সুরুচি কুরুচির মানদণ্ড হইতে পারে কি না, সে কথা চিন্তাশীল সুধিবৃন্দের বিচার্য্য। দেশের এই যুগ পরিবর্ত্তনের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার দ্বার উন্মুক্ত রাখিবে কি না, তাহা সম্প্রদায়-বিশেষের পুরাতন গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিবে কি না, নূতনের সংস্পর্শে আসিবে কি না, তাহার মীমাংসার সময় আসিয়াছে। তাই আপনাদের সম্মুখে কথাটা উপস্থিত করিলাম।

এই তিনটী সমস্যা সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে কোন পক্ষেরই পক্ষপাত কোন দিন করি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ভাষার গতি নিয়মিত করিবার জন্য আপনারা কি কোন চেষ্টা করিবেন না? যদি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—আর বিলম্বের অবসর নাই,—সময় আসিয়াছে।

এক্ষণে সাধারণ ভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিব। সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই কাব্যের কথা আসিয়া পড়ে;—সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে বলিবার চেষ্টা করিব।

কাব্য একটা ললিত কলা। কাব্য অনুভূতির সাহায্যে ভাবকে মূর্ত্তি দান করে। সুকবি ও বরেণ্য সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ড সত্যই বলিয়াছেন, "কাব্য এক শ্রেণীর ভাষ্য—জীবন-বেদের ভাষ্য;—মানব-মনের আনন্দদাতা, মানবের রক্ষাকর্ত্তা।" কাব্য ছাড়া বিজ্ঞানও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। এখন আমরা যাহাকে দর্শন ও ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতেছি, কালে কাব্য তাহারও স্থান অধিকার করিবে।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—"এখন আমরা যাহাকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিতেছি, তাহার অন্তরালে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে যে কাব্যরস বর্ত্তমান আছে, তাহাই ধর্ম্ম-শক্তির মূল প্রস্রবণ।" যে ধর্ম্ম অনুভূতির সাহায্যে পরব্রহ্মকে পাইবার সন্ধান দিতে পারিবে সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরূপে জগতে পরিগণিত হইবে।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র "সাধুকাব্যনিষেবনে"র উল্লেখ করিয়া, "অসাধু কাব্যের" প্রতি প্রসঙ্গক্রমে কটাক্ষপাত

করিয়া গিয়াছে। উৎকর্ষে কাব্য সাধু হয়, অপকর্ষে অসাধু হইয়া থাকে। গুণ, অলঙ্কার এবং রীতি—এই তিনটী কাব্যের উৎকর্ষের হেতু। ইহা কেবল সংস্কৃত-সাহিত্যের কথা নয়, সমগ্র মানব-সাহিত্যের কথা। ইহাকে বুঝিতে হইলে কবির মর্য্যাদা কোথায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। মানুষকে মানুষ করিবার উদ্দেশ্যেই মানব-সমাজের মজ্জাগত মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল দেশে সকল যুগে নানা-রূপ রাজবিধি ও সমাজবিধি উদ্ভাবিত হইয়াছে;—কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই। কারণ তাহা দণ্ডমূলক বলিয়া কেবল দণ্ড দান করিয়া আসিয়াছে—চরিত্র সংশোধনে মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে নাই। বিচারালয়, কারাগার, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সামাজিক প্রায়শ্চিত্ত এবং বাধ্যতামূলক লোকশিক্ষার ব্যবস্থা এই জন্য ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; কেবল কবির ব্যবস্থাই ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, তাহা দণ্ডমূলক নয়—সমবেদনা-মূলক। তজ্জন্য কবিই কেবল অলক্ষিত ভাবে অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের ক্ষতে সহানুভূতির শীতল প্রলেপ প্রদান করেন, মনুষ্যত্বের দিকে অজ্ঞাতসারে আকর্ষণ করেন,—মানুষকে মানুষ হইবার জন্য সাহায্য দান করেন। এই গুণে কবি মানব-বন্ধু—মানব-শিক্ষক—মনীষী ও ঋষি;—এই গুণে ব্যাস বাল্মীকি—ব্যাস বাল্মীকি। কবির এই সমুচ্চ পদমর্য্যাদা বিস্মৃত না হইয়া, কবি যদি কাব্য রচনা করেন, তবে তাহা সংসার-দাবদগ্ধ জনসমাজের পক্ষে চির শীতল অমৃত প্রলেপে পরিণত হয়। দণ্ডদানের দুঃখ ক্লেশের পরিবর্ত্তে পথভ্রান্ত মানবকে কবি স্নেহালিঙ্গনে সৎপথে আকর্ষণ করেন,—"ভোগে নহে ত্যাগে"—এই মহাশিক্ষায় মানবকে দেবত্বের দিকে পরিচালিত করিয়া থাকেন।

সত্যনিষ্ঠাই সাহিত্যের পবিত্র পন্থা। তাহাই সকল সমাজের মেরুদণ্ডকে সুদৃঢ় ও সবল করিতে পারে; তাহাকে কথায় হেঁয়ালিতে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে, সমাজকে পরিণামে পঙ্গু হইয়া পড়িতে হয়। তজ্জন্য সাহিত্যে সত্যনিষ্ঠা আবশ্যক। বঙ্গসাহিত্যের সম্মুখে আশার যুগ আসিয়াছে বলিয়া, এই কথা পুনঃ পুনঃ [illegible]

বলিয়াই পবিত্রতার কথাটা বিশেষ ভাবে ভাবিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

বল্কলাবৃতা, আশ্রমললামভূতা শকুন্তলার রূপ বর্ণনায় অমর কবি তাহাকে "মধুনবমনাস্বাদিত রসং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। পরিপূর্ণ মধুভাণ্ড হইতে কেহ এক বিন্দু তুলিয়া লইয়া আস্বাদন করিলে, তাণ্ডস্থিত অবশিষ্ট মধুর রস অল্প হইয়া যায় না, মিষ্টতা সমানই রহিয়া যায়;—তবে কবি এমন ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগে শক্তিক্ষয় করিয়াছিলেন কেন? সকলই থাকে, থাকে না কেবল পবিত্রতা,—তাহার অনাস্বাদিত মিষ্টতাই প্রকৃত মিষ্টতা,—এই কথাটুকু বুঝাইবার জন্যই কবি এত প্রয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যেও সেই পবিত্রতা আবশ্যক। না থাকিলে মিষ্টতার অল্পতা হয় না, কলাকৌশলের অপচয় হয় না, কিন্তু উপাদেয়তা নষ্ট হইয়া যায়। কলা-লালিত্যে মিষ্টতা চাই;—কিন্তু তাহাই সর্ব্বস্ব নয়,—সঙ্গে সঙ্গে উপাদেয়তাও অপরিহার্য্য। ইহার একটিকে মারিয়া, অন্যটিকে বাঁচাইয়া রচনা করিলে, তাহাতে সাহিত্য অঙ্গহীন হয়; যাহা আমাদের সম্মুখে অসাধারণ দেবত্বের আদর্শ ধরিয়া রাখিতে পারিত, তাহা সাধারণ মনুষ্যত্বের হীন আদর্শ ধরিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। যাহা আছে তাহার ফটোগ্রাফ এবং যাহা হইতে পারে তাহার আলেখ্য এক নয়, পৃথক্;—ললিতকলার হিসাবেও কোনটী অপরিহার্য্য, কোন্‌টী পরিহার্য্য, তাহার বিচার করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। কারণ, রসকে বড় সন্তর্পণে রক্ষা করিতে হয়, নচেৎ রস রস থাকে না, বিকৃত হইয়া সুরাসারের জন্মদান করে; তখন তাহার মিষ্টতা সুতীব্র মাদকতায় পরিণত হয়।

এখন বঙ্গসাহিত্যের ক্রীড়া-কৌতুকময় শৈশব-লীলার অবসান হইয়াছে,—এখন যাঁহারা ইহার সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত, কেহ কেহ বিশ্ববিখ্যাত, অনেকে রচনাশক্তিতে বিশ্বসাহিত্য-সেবকদলের মধ্যে উচ্চাসন লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইঁহারা কেবল আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের আশার প্রদীপ নন, সমগ্র মানব-সমাজের চিন্তাপ্রবাহের গতি নির্দ্দেশ করিবার উপযুক্ত শক্তিসামর্থ্যে শক্তিশালী। তাঁহাদিগকে সাদর অভি-[illegible]

কাব্যের আলোচনার পর নাটকের কথা বলা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহাও কাব্যের অন্তর্গত ;—শ্রাব্য নয়, দৃশ্য—এই-মাত্র পার্থক্য। নাটক সম্বন্ধে গতবর্ষের সাহিত্য বিভাগের সভাপতি শ্রদ্ধেয় রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ ; তাঁহার অধিক আমি নূতন কিছু বলিতে পারিব না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা নাট্য-সাহিত্যের, তথা বঙ্গ-রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্ম একটা বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে ; অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; রঙ্গালয়ের শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্ম একদিকে যেমন আয়োজন হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয়েরও ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করা যায়, অত্যল্প কালের মধ্যেই আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি আপনাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদরূপে নাটক উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সেই মূল উদ্দেশ্য অব্যাহত থাকিলেই নাট্য-সাহিত্য দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে,—এ কথা যেন বিস্মৃত না হই।

এক সময়ে বাঙ্গলার চিন্তাধারা পদ্যের ভিতর দিয়াই প্রধানতঃ প্রকাশিত হইত। গদ্য-সাহিত্যের প্রচলন বাঙ্গালায় কতদিন হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতে চাই না—বলিবার অধিকারীও আমি নই। তবে রাম-মোহনের জন্মভূমিতে দাঁড়াইয়া গদ্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। রাম-মোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-বঙ্কিমচন্দ্র-ভূদেব-কাঙ্গাল-হরিনাথ-কালীপ্রসন্ন সেবিত যে বঙ্গভাষা বাল্যে পাঠ করিয়া আনন্দ ও শিক্ষা পাইয়াছি, যৌবন হইতে আজ পর্য্যন্ত যে ভাষা-জননীর সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, সেই বঙ্গবাণীর বরবপু সাজাইবার জন্ম যাঁহারা যাহা দিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। তবে, এ কথা গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি যে, প্রাচীনকালে যে সকল মহামনীষী ভাষা জননীর মন্দির নির্ম্মাণকল্পে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবের ও ভাবুকতার সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর মন্দিরের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন, উপকরণ সংগ্রহের জন্ম তাঁহারা নানাদেশ হইতে মালমসলা আহরণ করিয়াছিলেন, নব নব রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া মাতৃমন্দিরকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন; এবং আমাদের চিরারাধ্যা বঙ্গবাণীর দেবীপ্রতিমা তাহার ভিতর প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিভরে মায়ের পূজায় আবাহন করিয়াছিলেন। সে পূজার রীতি আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য পুরাতন-প্রীতিতে। এই পুরাতন-প্রীতির বন্ধন এখনও ছিন্ন হয় নাই।

গদ্য সাহিত্যের ভিতর তিনটী বিষয়ে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

প্রথমে সন্দর্ভের কথা। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বের ন্যায় আজকাল চিন্তাশীল সাহিত্যবিষয়ক সন্দর্ভ বড় একটা বাহির হইতেছে না। যে জাতি ভাবুক ও চিন্তাশীল বলিয়া জগতের নিকট পরিচিত, সে জাতির সাহিত্য হইতে চিন্তাশীলতার ছাপ কি একেবারে মুছিয়া যাইবে? বঙ্কিম-মণ্ডলীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, পরবর্ত্তী বহু লেখকের সন্দর্ভে যে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইত, সেরূপ পরিচয় আজকাল ক্রমে ক্রমে দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল দার্শনিক লেখক—তাঁহার কাব্যে উপন্যাসে গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার উপন্যাসে চরিত্র বিশ্লেষণ যেমন আছে, চিন্তা করিবার সম্ভারও তাহাতে সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দার্শনিক সুচিন্তিত প্রবন্ধ আজকাল আর প্রকাশিত হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই চিন্তাশীলতার অভাবের কারণ অনুসন্ধানের সময় আসি-য়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহার যে কারণ অনুমিত হয়, তাহা আপনাদের নিকট বলিব। দারিদ্র্য-দুঃখ অভাব-ক্লিষ্ট আমরা চিন্তা করিতে পারি না—চিন্তা করিবার জন্ম যে সময় ব্যয় করা আবশ্যক, তাহা আমরা ব্যয় করিতে পারি না, সে অবসর আমাদের নাই, সে সাধনা আমাদের নাই, তাই আমরা চিন্তাশীল প্রবন্ধ পাইলেও গ্রহণ করি না। আমরা চাই সারাদিনের পরিশ্রমের পর একটু রস, একটু আনন্দ, একটু তৃপ্তি। সেটা পাই আমরা কথা-সাহিত্য হইতে। তাই আমরা কথা-সাহিত্যের অধিক মাত্রায় পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছি। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য, চিন্তাশীল প্রবন্ধাবলী প্রচারিত না হইলে

আমরা কেবল রস-সাহিত্য ধরিয়া মানুষ হইতে পারিব না। দেশ চায় ভাবের প্রেরণা, নূতন ভাবের সন্ধান। যে মনীষিক এই ভাবের সন্ধান দিতে পারিবেন তিনি আমাদের নমস্য হইবেন। তিনিই একদিন ভগীরথের ন্যায় নূতন ভাব-গঙ্গার প্রবাহ ছুটাইবেন, যাহার শীতল বারি পান করিয়া জাতি প্রাণরক্ষা করিবে। আর একটা কথা। যদি কথা-সাহিত্যের প্রতি সাধারণ লোকের অনুরাগই অধিক সূচিত হয়, তাহা হইলে কথা-সাহিত্যিকদিগের কর্ত্তব্য—অন্ততঃ উপন্যাসের ভিতর দিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া; কেবল রসসৃষ্টির দিকে মনোযোগ না দিয়া মানব-সমাজে নানাবিধ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। "গোরা" ও "পল্লীসমাজ" ভাল করিয়া পাঠ করিলে আমরা ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি।

কেবল রত্ন আহরণের জন্য দেশবিদেশে ছুটিলে চলিবে না; মানুষকে বাঁচিতে হইলে আহার করিতে হইবে। এই আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এদেশে এখন কৃত্রিমতার যুগ আসিয়াছে, খাঁটি জিনিষ এখন আর বড় মেলে না এখন ভেজালেরই দিন। তাই বলি, ভাব-জননীর প্রাণরক্ষার জন্য খাঁটি আহার্য্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। জগতের আহার্য্য-ভাণ্ডার হইতে বলকারক আহার্য্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। এই কার্য্য করিতে হইলে অনুবাদের আবশ্যক। বিশ্বসাহিত্যের যেখানে যা কিছু ভাল, তাহাই গ্রহণ করা উচিত। এই অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বদেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনুবাদ করিতে হইলে মূল হইতে অনুবাদ করাই যুক্তিযুক্ত। আর কেবল অনুবাদ করিলেও চলিবে না; দেশ, কাল পাত্রোপযোগী করিয়া অনূদিত বিষয়কে নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে।

এইবার কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই। নাটকের ও কথা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী একরূপ। উভয় হইতেই আমরা চিত্তবিনোদন ও শিক্ষা লাভ করি। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই; নাটক কার্য্য ও দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া চরিত্র ফুটায়, কথা-সাহিত্য সেরূপ করে না। কথা-সাহিত্য মানবমনে স্থায়ী অনুভূতি উদ্রেক করিয়া দিবার চেষ্টা করে। চরিত্র-সৃষ্টি, রসোদ্রেক ও উদ্দেশ্য, মানবজীবনের পরীক্ষিত সত্যগুলিকে কাল্পনিক বা প্রকৃত চরিত্র ও ঘটনার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট করা। সমাজবদ্ধ মানব-সংস্থিতির জন্য যে সমস্ত সমস্যা ঘটিয়া থাকে, উঠিয়া থাকে বা উঠিতে পারে, তাহাদের সমাধান করাও কথা-সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য। কোন কোন কথা-সাহিত্যিক উপন্যাসে অনাগত সমস্যা তুলিয়া থাকেন। কিন্তু এগুলিকে আমাদের দেশ কাল পাত্রোপযোগী না করিয়া উপস্থাপিত করিলে কোন দিনই চলিবে না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কথা-সাহিত্যিক না হইলে কেহই অনাগত সমস্যার কথা লিখিতে পারেন না।

কথা-সাহিত্যের দুইটী দিক আছে—উপন্যাস ও ছোট গল্প। ছোট গল্পে একটী ঘটনা বা মানবীয় একটী অনুভূতির অথবা একটী ঘটনা-ফলে উৎপন্ন কয়েকটী অনুভূতির সমাবেশ, ভাবের একতা ও পূর্ণতা থাকে। ফরাসী কথা-সাহিত্যিকদিগের মতে ছোট গল্পের উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য্য ও রসানুভূতির উদ্রেক করা—কোনরূপ শিক্ষার কথা ছোট গল্পে স্থান পায় না। আমেরিকার কথাসাহিত্যিকদিগের মতে ছোট গল্পের উদ্দেশ্য অল্প পরিসরের ভিতর সহজে একটা সজীব ভাবের উদ্রেক করা।

ছোট গল্পে কল্পনার প্রসার—অবাধ গতি ও স্বচ্ছন্দ লীলাভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট গল্পলেখককে জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিতে হয় না; ঔপন্যাসিককে তাহা দেখিতে হয়। ছোট গল্পলেখক জীবনের কোন একটা ঘটনা বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক অভিজ্ঞতা মনোজ্ঞ ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া সফলকাম হন। অভিজ্ঞতা ভূয়োদর্শন-সাপেক্ষ।

এক্ষণে উপন্যাস সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলিব। উপন্যাস দুই শ্রেণীর, ভাবগত (Idealistic) ও বস্তুগত (Realistic) বস্তুগত উপন্যাসে জীবনের পরীক্ষিত বাস্তব সত্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়; আর ভাবগত উপন্যাসে জীবনের উচ্চ আদর্শ বিবৃত হয়। বস্তুগত ঔপন্যাসিকদের লক্ষ্য থাকে ঘটনা ও চরিত্রের যথার্থ বর্ণনের দিকে, মানসিক ভাবের স্ফুরণের দিকে। অবস্থা বা ঘটনা তাঁহাদের নিকট চরিত্রবিকাশের সহায় মাত্র। কোন্ অবস্থায় মানব চরিত্র কি ভাবে ফুটিয়া উঠে, তাঁহারা তাহারই বর্ণনা করিয়া

আবার অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে, বস্তুপন্থীদিগের স্বাধীনতা বড় কম; কারণ, আপনার পরীক্ষিত বিষয় ভিন্ন তাঁহারা কোনও কথা বলিতে পারেন না। ভাবপন্থী ঔপন্যাসিকদের স্বাধীনতা কিন্তু খুব বেশী। কল্পনার মনোরথে চড়িয়া তাঁহারা যে সত্যের সন্ধান পান, তাহাই পাঠকদিগের নিকট উপস্থাপিত করেন। যতক্ষণ তাঁহাদের পাঠকেরা তাঁহাদের প্রতি আস্থাবান থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাদের সিংহাসন অপ্রতিহত থাকে। কিন্তু সত্যের পথ হইতে কিঞ্চিৎমাত্র দূরে সরিয়া গেলে, তাঁহাদের প্রতিপত্তি আর থাকে না।

এক্ষণে আমি শ্রীমান্ চারুচন্দ্র মিত্রের 'উপন্যাসে বাস্তবতা বনাম ভাবুকতা' প্রবন্ধ হইতে সামান্য একটু উদ্ধৃত করিয়া এ আলোচনা শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন,—

"জগতের বড় বড় মনীষীরা, বড় বড় ঔপন্যাসিকেরা নীতির পথ হইতে বিচ্যুত হন না। তাঁহাদিগকে নীতিবিদ্ (moralist) বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বাস্তব ঘটনাগুলিকে এরূপভাবে চিত্রিত—জীবনের কার্য্যগুলিকে এরূপভাবে অঙ্কিত করেন, যাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা দেখাইতে চান প্রত্যেক কার্য্য বা ঘটনার একটা নৈতিক দিক (moral bearing) আছে। পাপের প্রতি আস্থা কখনই তাঁহাদের লেখনী হইতে পাওয়া যায় না। জীবন সমস্যার সমাধান তাঁহারা করিয়া থাকেন। জীবন-বেদ আর্টিষ্টের তুলিকায় অঙ্কিত করিতে না পারিলে সফলকাম হওয়া যায় না। উপন্যাসের আখ্যান ভাগের ভিতর দিয়া চরিত্র বা নীতির কার্য্য চলিবে, জীবনের সমস্যাগুলি ঔপন্যাসিককে সমাধান করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু একদেশদর্শী ধর্ম্মপ্রচারকের ন্যায় মতবাদের অজুহাতে লেখক মহাশয়ের সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইতেছে, উপন্যাস চারিত্র নয়। উপন্যাসে চারিত্রের মতগুলির ব্যাখ্যান বা বিবৃতি আমরা চাই না;—চাই আমরা সমগ্র উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া জীবনের ব্যাখ্যা দেখিতে, মানবের চিন্তা, কার্য্য ও ভাবের ভিতর নীতির ছাপ দেখিতে। নৈতিক নিয়মবশে যাহাতে কার্য্যগুলি সম্পন্ন হয়, তাহা দেখিতে পাইলেই আমরা ধন্য হইব।"

এক্ষণে আমরা ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই। আধুনিক ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ধারণা যে, ইংরাজী ভ্রমণকাহিনীর অনুকরণে এ দেশে ভ্রমণকাহিনী প্রচারিত হইয়াছে। এ ধারণার মূলে কিন্তু সত্য আদৌ নাই। প্রাচীনকালে হিন্দু-মুসলমানেরা ধর্ম্মের জন্য তীর্থ ভ্রমণ করিতে যাইতেন, স্বাস্থ্যের জন্য কেহ কখনও যাইতেন না, কারণ তখনকার দিনে সকলের স্বাস্থ্য অটুট থাকিত। প্রাচীন ভক্ত কবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ব্রজ-পরিক্রমা' ও 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা' হইতে এই দুই স্থানের ভৌগোলিক তত্ত্ব বেশ জানিতে পারা যায়। রাজা রাজনারায়ণ ঘোষাল মহাশয় ইং ১৮০৯ সালে কাশী পরিক্রম করিয়া মনোজ্ঞ ভাষায় 'কাশী-পরিক্রমা' বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বিজয়রাম ১১৭৭ সালে তীর্থমঙ্গল গাহিয়াছেন। সেও আজ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এগুলি তৎকালে প্রচলিত রীত্যনুসারে কবিতায় রচিত। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সরল ভাষায় তীর্থ ভ্রমণের রোজনাম্চা লিখিয়া যান। আমরা ধারণাই করিতে পারি না যে, এরূপভাবে রোজনাম্চা বাঙ্গালায় সেকালে লিখিত হইয়াছিল। এ পুস্তকে কেবল তীর্থ-মাহাত্ম্য বা পৌরাণিক স্থান-সংস্থানের কথা আলোচিত হয় নাই—ইহাতে "নানা স্থানের সমাজ-চিত্র, লোকচরিত্র, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইতিকথা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়" বর্ণিত আছে।

এখন ভ্রমণ-কাহিনী লেখার ভঙ্গীটা একটু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে সাহচর্য্য (Laws of Association) নিয়মবশে ভ্রমণ-কাহিনী লিখিত হইয়া থাকে, এ পদ্ধতিতে যে কোন স্থানের বিষয় যাহা কিছু জানা প্রয়োজন তাহাই বিবৃত হয়। ইতিহাস, ভূগোল, উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয়, স্থানীয় অধিবাসীদের স্বভাব-চরিত্রের কথা, স্থান, কাল, পাত্র ও ভাবের সাহচর্য্যে মনোরম ভাবে লিখিত হয়। বড় বড় মনীষীদের চিন্তার ধারাও ইহাতে বেশ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত হয়।

একবার আমরা জীবনবৃত্ত বা জীবনচরিত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই। মানুষ হইতে গেলে—প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি তাহা বুঝিতে গেলে কেবল চরিত্র পাঠ

করিলে চলে না। চরিত্র পড়িয়া যদি সর্ব্বথা চরিত্রবান হওয়া যাইত, তাহা হইলে নীতিবিদ্যাভিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিতকে চরিত্রহীন দেখিতে হইত না। পুঁথিগত নীত বিদ্যাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে সম্মুখে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানস-চক্ষের সম্মুখে রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যোগ্য ব্যক্তির বাস্তব চিত্র। তাহাকে যোগ্য ব্যক্তি বলিব, যিনি জ্ঞানে ও কর্ম্মে, দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণে ও ত্যাগে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন—যাঁহার প্রেমানলে ঝাঁপ দিতে মানব-পতঙ্গ ছুটিতে ব্যগ্র—যাঁহার ছায়া-শীতল পাদমূলে বসিলে অশান্ত হৃদয় শান্ত হয়—যিনি নূতন ভাবের প্রেরণা দিয়া জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেন—যিনি সত্যের সন্ধান বলিয়া দেন। এইরূপ যোগ্য ব্যক্তির জীবন চরিত বিবৃত করা উচিত। অযোগ্যকে যোগ্যের আসন দিয়া, তাহাদের জীবন-চরিত ব্যাখ্যা করা কিছুতেই উচিত নয়।

বাঙ্গালা দেশে শতকরা যতজন নিরক্ষর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের কোন দেশেই ততজন দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত না হইলে, অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয় না—মানব পশুত্ব হইতে মানবত্বে উপনীত হইতে পারে না। এই জ্ঞানলাভ সাধন-সাপেক্ষ। ভারতে ইংরাজ-আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে। জ্ঞানমার্গে উপনীত হইবার ইহাই এক সময়ে একমাত্র সোপান বলিয়া স্থির হইয়াছিল। এতদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষাকে বাহন করিয়া বিদ্যা দান করা হইত। আশ্চর্য্যের বিষয়, জগতের কোনও দেশে বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান করা হয় না; এরূপ করাও অন্তদেশে সম্ভবপর নয়। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা এই উপায়কে এতদিন ছাত্রদিগের অন্তর্নিহিত শক্তি-বিকাশের চরম পন্থা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। সে দিনের কথা মনে পড়ে, যে দিন কুশাগ্রবুদ্ধি দূরদর্শী স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার পঠন-[illegible] হইয়াছিল। আর আজ মাতৃভাষার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে হইয়াছে। যদিও এম-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মগুলি এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা—বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যতদিন না চলিবে, ততদিন দেশের মঙ্গল হইবে না। বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা সময় সাপেক্ষ। জ্ঞানান্বেষণার্থী বিদ্যার্থীকে অকারণ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয়। উচ্চশিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা একে গুরুতর, তাহার উপর ভাষা-বিভ্রাটে অধিকতর কঠিন হইয়া পড়ে। এইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষা যাহাতে মাতৃভাষায় দান করা হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দিন। অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি হইবে।

আধুনিক নারী-জাগরণের দিনে দেশে স্ত্রীশিক্ষা কি ভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধেও দেশবাসীকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। আজকাল স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেহ আর সন্দিহান নন;—তবে তাহা কি ভাবে চলিবে, তাহাই বিচার্য্য। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সহিত আমরাও বলি,—"শত দোষ স্বীকার করিয়াও আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। ইহাতে পৃথিবীর কি উপকার বা অপকার হয়, তাহা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে অক্ষম হইলেও—এইটুকু বলিতে পারি যে, সাহিত্য ও শিল্পকলা পুরুষের ন্যায় রমণীর পক্ষেও অতি সুখের সামগ্রী, অতি আদরের বস্তু। তাহা যে কত অবসরের নিশ্চিন্ত আরাম, কত নির্জ্জনতার নিষ্কণ্টক সঙ্গী, কত নবরাজ্যের চিরোন্মুক্ত দ্বার, কত উচ্চাকাঙ্ক্ষার নীরব প্রণোদক, কত সুখদুঃখের মমতাপূর্ণ বন্ধু, কত মাধুর্য্যের অমৃত-প্রস্রবণ—তাহা যিনি জানিয়াছেন, তিনি কেন না ইচ্ছা করিবেন যে, সকল নারীই সেই সুধারস পান করুক;—করিয়া তাঁহাদের নারীত্ব মধুরতর, গভীরতর, উচ্চতর, উদারতর, স্নিগ্ধতর হউক।"

বাঙ্গালা ভাষার প্রসার কল্পে আর একটী কথা বলিতে চাই। পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে উর্দ্দু ও বাঙ্গালা

ভাষাই গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে সুদূর মফঃস্বলেও বাঙ্গালার স্থান ইংরাজী ভাষা গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ হইতে দেওয়া কোন মতে উচিত নয়। বাঙ্গালী হাকিমদের নিকট ইংরাজীতে সওয়াল জবাব করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। বাদী-প্রতিবাদী, সাক্ষী-সাবুদ, উকিল ও হাকিমেরা যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করেন, পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া যে ভাষায় প্রথম তাঁহারা বাক্যোচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই মাতৃ-ভাষা কি এত দীনা যে, ইংরাজীতে না বলিলে বক্তব্য বিষয় বুঝান যায় না? জেলার ইংরাজ হাকিমদিগকেও শুনিতে পাই, এদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া আসিতে হয়। তবে তাঁহাদের নিকটেই বা বাঙ্গলা ভাষা চলিবে না কেন? অবশ্য আইনের পারিভাষিক শব্দগুলি (legal terms) ইংরাজীতে বলিলে ক্ষতি নাই, কারণ এখন পর্য্যন্তও সর্ব্ব বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ বাহির হয় নাই। আমি আপনাদিগের নিকট ও বাঙ্গালার বার লাইব্রেরী-গুলির উকীল মহাশয়দের নিকট অনুরোধ করি, এ বিষয়ে তাঁহারা অবহিত হউন—ভাষার প্রসারকল্পে সহায়তা করুন।

সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি এখন আমাদের দেশের শক্তিস্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সংবাদ-পত্রের আলো-চনার উপর লোক আর নাসিকা কুঞ্চিত করেন না; তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় লইয়া সাধারণে এখন আলোচনা করিয়া সত্যের পথে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করেন। এই শক্তির অপব্যবহার করা যে উচিত নয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

আর আমি কিছু বলিতে চাই না; বলিবার সামর্থ্যই বা কোথায়? বঙ্গবাণীর সেবা করিবার জন্য আপনাদের সম্মুখে যে দণ্ডায়মান হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। তাহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ। যখন সম্মিলন-পরিচালক-সমিতির আহ্বান আমার নিকট উপ-স্থিত হয়, তখন আমি শয্যাশায়ী—অনন্ত পথের যাত্রী। আশা ছিল না যে, এ যাত্রা রক্ষা পাইব। ভগবানের কৃপায় ও আপনাদের শুভ কামনায় ধীরে ধীরে সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু লিখিবার পড়িবার পূর্ব্ব সামর্থ্য এখনও পর্য্যন্ত ফিরিয়া পাই নাই।

সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, মনের কথা মনের মত করিয়া বলিয়া উঠিতে পারিতাম না। যাঁহাদের চরণোপান্তে বসিয়া ভাষা-জননীর সেবামন্ত্রের উপদেশ লাভ করিয়াছিলাম, যে সকল সহোদরাধিক স্নেহপরায়ণ সেবকবৃন্দের সাহায্যে সেই সেবাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, তাঁহারা অনেকে এখন পরলোকগত। তাঁহারা বঙ্গভাষা সেবার জন্য যে উৎসাহপূর্ণ অক্লান্ত আকাঙ্ক্ষার হোমাগ্নি-শিখা জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দিনে দিনে অল্পে অল্পে আলোকসম্পাতশূন্য ধূমপুঞ্জে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে—এখন সকল দিক হইতে এক মর্ম্মন্তুদ হাহাকার—কেবল একটী কথাই নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে,—"তে হি নো দিবসা গতাঃ।" এমন দিনে এমন অবস্থায়, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, আপনাদিগকে কি বলিব—কি শুনাইব,—তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া স্থির করিতে পারিলাম না। কথা অপেক্ষা দীন নয়নের সজল দৃষ্টিপাতই সেবকের আবেদন অধিক পরিস্ফুট করিয়া থাকে। আমি সেই সেবকের মতই আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এক যাচ্ঞা আপনাদের কাছে, আর এক যাচ্ঞা জননী বঙ্গবাণীর কাছে করিতেছি। আপনাদের কাছে যাচ্ঞা এই যে,—আপনারা বঙ্গসাহিত্যকে তৃণের ন্যায় স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দিবেন না,—ইহার গতি নির্দ্দেশ করুন, রীতি নির্দ্দেশ করুন, নীতি সংস্থাপন করুন। ভাষা-জননীর কাছে যাচ্ঞা এই যে,—

"জননি-বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ চাহিনা মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটী অমল-কমল চরণে স্থান।"

শ্রীজলধর সেন।

ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী

ভারতবর্ষের বেদান্তদর্শন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই এই জগতের প্রকৃত 'কারণ'। এক চেতন কারণসত্তা হইতে এই জগৎ বিকাশিত হইয়াছে। জগতের যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তেরই অন্তরালে সেই ব্রহ্ম বস্তু অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারি দ্বারা ইহারা নিয়ন্ত্রিত শাসিত ও পরিচালিত হইতেছে। তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, কোন বস্তুই এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। কেন না, বস্তুমাত্রই তাঁহারি বিকাশ। যেটী যাহার বিকাশ, সেটী তাহাকে ছাড়িয়া থাকিবে কিরূপে? একই চৈতন্য-সত্তা, নানাবস্তুর মধ্য দিয়া, নিজেরই স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন; আপনারই পরিচয় প্রদান করিতে-ছেন। সুতরাং এ সকল বস্তু, তাঁহার পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য কোন বস্তুই তাঁহার স্বরূপে পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে না; পূর্ণ পরিচয় দিতে সমর্থ নহে। কিন্তু তথাপি জগতের বস্তু মাত্রেই, কিছু না কিছু, কোন না কোনরূপে,—সেই সত্য-সুন্দর পরমেশ্বরের পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের সমাচার বহন করিয়া আনিতেছে। সুতরাং তাহা হইতে, কোন বস্তুকেই পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না; স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারা যায় না। ভারতের বেদান্ত এই কথাই বলিয়া দিয়াছেন। বেদান্তের বিশ্ব-বিখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই তত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন

এই তত্ত্বটী বড় প্রাচীন। ঋগ্বেদের মধ্যেই সর্ব্বত্র এই তত্ত্বটী গূঢ়-ভাবে নিহিত রহিয়াছে। সূর্য্য-চন্দ্র, ইন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি জড়বস্তুর কথা ঋগ্বেদে আছে সত্য; কিন্তু জড়-বস্তু বুঝানই ঋগ্বেদের উদ্দেশ্য নহে। জড়কে অবলম্বন করিয়া, জড়ের অন্তরালবর্ত্তী সেই পরম-কারণ ব্রহ্মবস্তুর কথা নির্দ্দেশ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভাষ্যকারগণ, নিরুক্তকারগণ ঋগ্বেদের এই উদ্দেশ্যই জানিতেন। আমরা কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখেই, বর্ত্তমানে, এই কথা শুনিতে পাইতেছি যে, ঋগ্বেদে ব্রহ্মের কথা বিশেষ কিছু নাই, ঋগ্বেদে কেবল জড়বস্তুর স্তুতি ও বর্ণনা আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, সে কথা যাঁহারা মৎ-প্রণীত "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। আমরা সেই গ্রন্থে, বিশেষ যত্ন সহকারে, ঋগ্বেদের মধ্য হইতেই বিবিধ প্রমাণ বাহির করিয়া দেখাইয়াছি যে ঋগ্বেদ প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্মেরই স্তুতি প্রতিপাদক গ্রন্থ। ঐ সকল যুক্তি ছাড়াও, ঋগ্বেদে এ বিষয়ে আরো অনেক প্রমাণ আছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে একটী নূতন প্রমাণ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। পাঠক দেখিবেন বেদান্ত যে ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার মূ কথাগুলি সমস্তই ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করা চার্য্য নূতন কিছুই বলেন নাই। যাহা ঋগ্বেদে সংক্ষে ছিল, তিনি তাহারি বেদান্তে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য বারংবার বেদান্তে বলিয়া দিয়াছেন যে,— আমাদের এই একটা বড় দোষ যে আমরা এক বস্তুকে "অন্য" বস্তু বলিয়া ধরিয়া লই। এই আমার নিজের কথ ধরুন্। আমার নিজের একটী স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ আছে একটা স্বভাব আছে। ঐ স্বরূপটী আমার প্রকৃত বস্তু —উহাই আমার প্রকৃত আমিত্ব বা আত্মা। আমা সহস্র পরিবর্ত্তন হউক; আমার হাজার অবস্থা-ভেদ আসুক্ আমার ঐ স্বরূপটী ঠিকই থাকিয়া যাইবে; উহার কো পরিবর্ত্তন হইবে না। আমার এই অবস্থাভেদ গুলি আমার এই পরিবর্ত্তনগুলি, আমার সেই স্বরূপেরই না ভাবে পরিচয় দিয়া থাকে মাত্র। অবস্থার ভেদে, সে স্বরূপটীর ভেদ হয় না; সেই স্বরূপটী 'অন্য' একা কিছু হইয়া উঠে না। শুইয়া থাকা, কথা বলা, হাঁটি যাওয়া, নিদ্রা দেওয়া এগুলি আমার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ভেদ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল অবস্থার মধ্যে আ ত যে আমি, সেই আমিই রহিয়াছি। আমিই ত ক বলি, আমিই ত হাঁটিয়া যাই, আমিই ত নিদ্রা দে আমিই ত শুইয়া থাকি। এই সকল অবস্থাভেদের স সঙ্গে, আমি কি 'অন্য' একটা কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হই পড়িয়াছি? আমি যখন কথা বলিতেছিলাম, তখন আ কি সেই 'কোকিলেশ্বরই' ছিলাম না? আবার, আ যখন শুইয়া আছি, তখনও কি আমি সেই 'কোকি শ্বরই' নহি? অবস্থার ভেদে, প্রকৃত স্বরূপটীর ভেদ নাই। আমি 'অন্য' একটা কোন ব্যক্তি হইয়া উঠি না ইহাই প্রকৃত কথা। কিন্তু আমাদের প্রকাণ্ড দোষ যে, আমরা ঐ স্বরূপটীর কথা একেবারে ভুলিয়া যা এই অবস্থাগুলিকেই যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়া লা জরা-রোগ-গ্রস্ত, সুখ-দুঃখ-পীড়িত, ঐ যে মানু দেখিতেছি, আমরা উহাকেই ত মানুষ বলিয়া ধ করিয়া থাকি। জরা-রোগ, সুখ-দুঃখ—এগুলি যে অব মাত্র, এবং এগুলির অন্তরালে যে প্রকৃত স্বরূপটী আ —কৈ ইহা ত আমাদের মনে উদিত হয়

জরা রোগাদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার মধ্যে যে মানুষের স্বরূপটী ঠিক্ থাকে; কোন অবস্থাই যে সেই স্বরূপটীর কোন ক্ষতি করিতে পারে না,—একথাটী ত আমরা কখনই মনে আনি না। ইহাকেই শঙ্কর বলিয়াছেন—এক বস্তুকে 'অন্ত' বস্তু বলিয়া মনে করা। আমার স্বরূপটাই প্রকৃত বস্তু; উহাকে ভুলিয়া আমরা উহাকে সুখ দুঃখ, জরা-রোগাদি নানা প্রকার অবস্থাগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেছি। ইহাই আমাদের প্রকাণ্ড ভুল। শঙ্কর পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, এই এক বস্তুকে 'অন্য' বস্তু বলিয়া বোধ করা, এই যে "অন্যত্ব-বোধ" ইহার নাশ করিতে পারিলেই মুক্তি হইল।

কেবল যে আমরা জগতের বস্তু বা জীবকেই 'অন্য' বলিয়া মনে করি তাহা নহে। আমরা ব্রহ্মকেও 'অন্য' বলিয়া বোধ করি। আমাদের ন্যায়, ব্রহ্মেরও নিজের একটা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ আছে; একটা 'স্বভাব' আছে। এই স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। উহা নিত্য একরূপ। কিন্তু যখন তাঁহা হইতে এই বিবিধ দ্রব্য সমন্বিত জগৎ বিকাশিত হইল, তখন আমরা—ব্রহ্মও যেন 'অন্য' একটা কিছু হইলেন, ইহাই মনে করিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহার সেই স্বরূপের কথা ভুলিয়া গেলাম। এই জগৎটাই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিল। এ জগৎ ছাড়া আবার ব্রহ্ম কোথায়—এই বোধ দৃঢ়তালাভ করিল। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম—এই জগতের অন্তরালে অবস্থিত; এজগৎ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে; তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন জন্মাইতে পারে না। তাঁহার সেই স্বরূপের কথা ভুলিয়া, আমরা এই জগতের হর্ষ-শোক, সুখ-দুঃখ, কামিনী-কাঞ্চন, ধন-জন—এই গুলি লইয়াই উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছি। ইহাকেই শঙ্কর 'অন্যত্ব-বোধ' বলিয়াছেন। একবস্তুকে 'অন্য' বস্তু বলিয়া বোধ করা—ইহারই নাম। ব্রহ্মকে ভুলিয়া, তাঁহাকে এই জগৎ বলিয়া বোধ করা, অথবা সর্ব্বদা কেবল এই জগতের ধন-জনাদির চিন্তা ও কথায় ব্যাপৃত থাকা,—ইহাকেই বলে, একবস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া বোধ।

যতদিন না এই ভ্রম যাইবে, ততদিন মনুষ্য এই সংসারেই আবদ্ধ হইয়া রহিবে। মুক্তিলাভ ঘটিবে না।

এই তত্ত্বটী যে ঋগ্বেদেরই তত্ত্ব, তাহা প্রিয় পাঠক পাঠিকা, নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী দেখিলেই বুঝিবেন। ঋগ্বেদের একটা মন্ত্র এই—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজান;
'অন্যৎ' যুষ্মাকমন্তরা বভূব"।

আমরা এই মন্ত্রটীর অর্থ করিয়া শুনাইতেছি। যি
এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমা
তাবৎবস্তু জন্মিয়াছে, কেহই তাঁহাকে জানিতেছে না
কেন জানিতেছে না? কেন তাঁহাকে কেহই জানিতে
পারিতেছে না? শ্রুতি দ্বিতীয় চরণে তাহার কা
নির্দ্দেশ করিতেছেন।—'অন্যৎ যুষ্মাক মন্তরা বভূব'
তাঁহাকে জানিতে পারিতেছে না এই জন্য যে,—তি
এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, এই বিশ্বের অন্তরালে আ
গোপন করিয়া রহিয়াছেন। কিরূপে তিনি আপনা
লুকাইয়াছেন? শ্রুতি বলিতেছেন—'অন্যৎ যুষ্মাকং'।
যেহেতু তোমরা তাঁহাকে 'অন্য' বলিয়া বোধ করিতেছ
অর্থাৎ কথাটা এই যে, তোমরা সকলে তাঁহার নি
স্বরূপের কথা ভুলিয়াছ, তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ
এই বিশ্বের তিনিই কারণ। তোমরা সেই কার
সত্তাকে ভুলিয়া, জগতের কার্য্যবর্গকে লইয়াই ব্য
রহিয়াছ। তিনি যেন 'অন্য' কিছু হইয়া পড়িয়াছে
তোমরা ইহাই মনে করিতেছ! তিনি যেন সম্
পরিবর্ত্তিত হইয়া, একটা 'অন্য' বস্তুরূপে—এই জগৎরূ
—উপস্থিত হইয়াছেন, তোমরা ইহাই ভাবিতেছ। ত
তোমরা তাঁহাকে ভুলিয়া, এই জগতের বস্তু পাই
সর্ব্বদা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছ!' শ্রুতি এইরূপ ভুলিবা
কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকা দেখি
পাইতেছেন, শঙ্করাচার্য্য যাহাকে 'অন্যত্ব-বোধ' বলি
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অবিকল সেই কথা ঋগ্বেদের এ
বিখ্যাত মন্ত্রটীতে উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্
এই যে, শঙ্কর এই মহাতত্ত্বটী ঋগ্বেদের এই মন্ত্র হইতে
প্রথম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারই তিনি বিস্তৃত ব্যা
করিয়া মূলতঃ এই তত্ত্বের উপরেই তাঁহার বিখ্যাত মা
বাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু কিরূপে এই অন্যত্ব-বোধ জন্মে; কিরূপে এ
বস্তুকে 'অন্য' বস্তু বলিয়া বোধ করা সম্ভব হয়, সেই কথ
আলোচনা ব্যতীত, শঙ্করের মায়াবাদ সুস্পষ্ট হইবে ন
তাই আমাদের ইচ্ছা আছে যে, আগামীবারে সে
আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

বৈশাখ

রুদ্র তুমি, দীপ্ত তুমি, ক্ষিপ্ত তুমি, কণ্ঠে নীল
চরণতলে পঞ্চশরের নির্ব্বাপিত ভস্মলেশ,
মন্ত্রে যেন সুপ্ত হল বসন্ত সে মত্তশীল
প্রলয় তরে গুপ্ত হ'ল গহ্বরেতে দগ্ধ বেশ ;
রুদ্র তুমি ক্ষুদ্র নয় !
বহ্নি তব উত্তরীয়, বহ্নি তব অঙ্গময়।

অগ্নি বীণা বাজাও তুমি দীপক সুরে গাও হে গান,
রক্ত তব তপ্ত তালে সপ্তশত সূর্য্য ম্লান
অগ্নিশিখা পিঙ্গ জটা তুঙ্গ শিরে অভ্রছায়,
অগ্নি গোলা নক্র আঁখি বক্র চোখে শূন্যে চায় ;
রুদ্র তুমি ক্ষুদ্র নয় !
হস্তে জ্বলে ক্ষিপ্ত তেজে দীপ্ত মশাল বিশ্বময়।

মত্ত তব নর্ত্তনেতে ত্রস্ত ধরা কম্পমান,
নিঃশ্বাসেতে ঝঞ্ঝা ছুটে হুঙ্কারিয়া শঙ্খ তার,
ধূলির প্রলয়-গর্জ্জ মেঘের ঘূর্ণি উঠে দুর্ণিবার,
অন্ধকারে বনের মাঝে দ্বন্দ্ব করে দৈত্য-দান,
রুদ্র তুমি ক্ষুদ্র নয় !
মূর্ত্ত তুমি মৃত্যুরূপী, দৃষ্টি করে সৃষ্টি লয়।

স্তব্ধ জগৎ মরুর পারা শব্দহারা, কি নির্জ্জন,
তরুচ্ছায়া কুঞ্জমাঝে পক্ষী যেন মূর্চ্ছালীন,
লুপ্ত বিবর কুঞ্জকোণে কুণ্ডলিত সর্পগণ,
মুমূর্ষু এ পৃথ্বী যেন শুষ্কতালু শক্তিহীন .
রুদ্র তু ম ক্ষুদ্র নয় !
গণ্ডূষেতে নিঃশেষেতে সাগর তবেও তৃষ্ণা রয়।

রুদ্র তুমি, দীপ্ত তুমি, ক্ষিপ্ত তুমি ভয়ঙ্কর,
ঈশান কোণে পুঞ্জ মেঘে বিষাণ বাজাও বজ্রনাদ,
বর্শা হাতে বর্ষা ছুটে লক্ষ তব গুপ্তচর,
যক্ষ পিয়ার বক্ষ 'পরে রক্ত পিয়ে কি আহ্লাদ ;
রুদ্র তুমি ক্ষুদ্র নয় !
বিকট তব অট্টহাসি আগুন লাগে আকাশময়।

শ্রীহরিদাস মৈত্রেয়।

আমাদের কথা

চৈত্র সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, আমাদের প্রেস বিডন ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণ, দুই সপ্তাহকাল কাযকর্ম্ম বন্ধ থাকায়, ঐ সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশেও তদ্রূপ বিলম্ব ঘটিল, তাহার কারণ, নূতন ঠিকানায় আসিয়া, প্রেসে আমরা বিদ্যুদ্‌বল পাই নাই, বৃহৎ মেশিন কুলির দ্বারা হাতে ঘুরাইয়া একদিনের কাষ তিন দিনে সমাধা করিতে হইতেছিল। সম্প্রতি আমাদের সে কষ্টের অবসান হইয়াছে—১লা মে তারিখে আমরা বিদ্যুদ্‌বল প্রাপ্ত হইয়াছি—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা নিয়মিত সময় মধ্যেই প্রকাশ করিতে পারিব।

বর্ত্তমান সংখ্যায় সাহিত্য সম্মিলনের কয়েকটি অভিভাষণ প্রকাশিত হইল ; সেই কারণে, এ মাসে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত ও ধারাবাহিক সকলগুলি প্রবন্ধের স্থান করিতে পারিলাম না—আগামী সংখ্যায় সেগুলি আবার প্রকাশিত হইবে ; এজন্য লেখক এবং গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট আমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি।



পরীর দুঃখ

"Her soul is sad, her wings are weary."

—Tom Moore's

Paradise and the Peri.

Bengal Art Press,—Sikdarbagan.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ | ১ম খণ্ড
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১
১ম খণ্ড | ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্যে সু ও কু

পাঠকের মনে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি দ্বারা আনন্দ সঞ্চার করা যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। যাঁহারা আর্টের জন্যই আর্ট ("art for art's sake") এই মন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা সেই আনন্দ সঞ্চারকেই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করেন। আর যাঁহারা নীতি-বাদী, তাঁহারা আনন্দসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সুনীতির মহিমা প্রচার দ্বারা মনুষ্য সমাজের উন্নতিবিধান করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনে করেন। এখন সেই আনন্দ কিরূপ আনন্দ তাহা বুঝিতে হইবে।

সকল লোকের সকল বিষয়ে সমান আনন্দ হয় না ইহা সকলেই জানেন। বিভিন্ন লোকের প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের। একজন লোকের মদ খাইয়া আনন্দ হয়, আর একজন লোকের দাবা খেলায় আনন্দ হয়, আবার আর একজনের পুস্তক পাঠে আনন্দ হয়। পুস্তক পাঠের মধ্যেও আবার সকল লোকের সকল বই ভাল লাগে না। একজন বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়া আনন্দ পান, একজন ইতিহাস পাঠে আনন্দ পান, আবার আর একজন কাব্যানুশীলনে আনন্দ পান। সেই কাব্যের মধ্যেও আবার ইতর-বিশেষ আছে। কেহ বাল্মীকি, ভিক্টর হিউগো পড়িয়া আনন্দ পান, কেহ বা শেলি, সেক্সপীয়ার ডিকেন্স পড়িয়া আনন্দ পান, আবার কেহ বা রেনল্ড, জোলা পড়িয়া আনন্দ পান। এইরূপে পাঠকের রুচির বিভিন্নতার জন্য সাহিত্যেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট?

কাব্যের ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে তাহা দ্বারা কি প্রকার রসের সঞ্চার হয়—সেই রস (emotion) ক্ষণিক সুখপ্রদ না চিরানন্দ-প্রদ, সেই রস কত গভীর—মনুষ্য জীবনের উপর তাহার প্রভাব কত দূর বিস্তৃত, মানব জীবনের গূঢ় রহস্য সকল মীমাংসা করার সম্বন্ধে তাহা কতদূর সাহায্য করে ইত্যাদি। একজন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন—

"There is no surer test of the permanent worth of a book than this—Does it move our sympathy with the deepest things of human life? If it does not, whatever other virtues it may have, it is not great literature." * অর্থাৎ কোন পুস্তক স্থায়ী সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত কিনা তাহার পরীক্ষা এই, ঐ পুস্তক মনুষ্য জীবনের কোনও গভীর তথ্যের প্রতি আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে কি না? যদি তাহা না করে, তবে সে পুস্তকের অন্ত যত গুণ থাকুক, উহা উচ্চদরের সাহিত্য নহে ইহা নিশ্চয় জানিবে। উক্ত গ্রন্থকার আরও বলেন,—

"Emotions excited by the moral qualities or by the moral suggestions of material things are higher in rank, than those excited by purely material or sensible things. More briefly, moral emotion is of higher literary value than purely sensuous or æsthetic."—অর্থাৎ নৈতিক গুণের দ্বারা, অথবা জড় বস্তু হইতে প্রাপ্ত নৈতিক গুণের ব্যঞ্জনা দ্বারা, যে সকল রসের সঞ্চার হয়, তাহা, কেবলমাত্র জড় বস্তুর দ্বারা সঞ্চারিত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কেবল জড়-জগতের সৌন্দর্য্য অথবা শিল্পকলার সৌন্দর্য্য দ্বারা যে রসের সঞ্চার হয়, তাহা অপেক্ষা, উচ্চ নীতির সাহায্যে যে রস সৃষ্ট হয় তাহার মূল্য অনেক বেশী।

যদি বল, অধিকাংশ লোকের মনে আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে কি না, ইহাই সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচারের মাপকাঠি (standard) কারণ সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি কখনও বিকৃত বা দূষিত হইতে পারে না; যে কাব্য অধিকাংশ লোকের প্রিয়, তাহাকে মন্দ বলিব কিরূপে?

* Some Principles of Literary Criticism—By C. T. Winchester.

সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ সময় উপস্থিত হয়, যখন একজন সাহিত্য-সম্রাটের (great master) যুগ শেষ হইয়াছে, তাঁহার যেটুকু দান করিবার ছিল তাহা তিনি দান করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়াছে, তিনি আর নূতন কিছু দিতে পারেন না। অথচ তিনি যে সকল পাঠক পাঠিকার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারা নূতন জিনিষ চায়, কারণ নিত্য নূতনের পিপাসাই হইতেছে সাহিত্য রসিকের জীবন। সেই সময়ে কোনও সাহিত্যস্রষ্টা যে কোন একটা নূতন জিনিষ লইয়া বাজারে উপস্থিত হইবেন, অমনি তাহা লইয়া একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে, সে জিনিষের দোষ গুণ বিচারের আর অপেক্ষা থাকিবে না। তাঁহার সে জিনিষটা কাচ কি কাঞ্চন তাহা বুঝিতে কিছু বিলম্ব হইবে। এই কারণে উল্লিখিত সমালোচক (Winchester) লিখিয়াছেন,—

Popularity is no sure indication of permanence of a literary production. Popularity may arise from novelty. A book may be popular as it represents some contemporary movement— economic, political or religious. But "the surest recipe for popularity is an attractive mediocrity, for the mass of people bow respectfully to the great books and never read them." অর্থাৎ কোন পুস্তক সাধারণ পাঠকের প্রিয় হইলেই তাহাকে স্থায়ী সাহিত্য বলা যায় না। নূতন বলিয়া জনপ্রিয় হইতে পারে। আবার যদি কোন পুস্তক কোন অর্থ-নীতি, রাজ-নীতি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তাৎকালিক হুজুগ লইয়া জন্মগ্রহণ করে তবে তাহাও জনপ্রিয় হইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের নিকট মধ্যম শ্রেণীর রচনা যদি চমকপ্রদ হয়, তবে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর লাভ করে; কারণ অধিকাংশ লোকেই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পড়ে না, তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করে।

এক শ্রেণীর কাব্য পাঠের আনন্দকে মদের নেশার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মদ খাইলে মনে একটা প্রবল স্ফূর্ত্তি হয়, কামক্রোধাদি রিপু সকল উত্তেজিত হয়, এবং মানুষ ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভুলিয়া যেন এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। কোন কোন কাব্য পড়িয়াও পাঠক পাঠিকার মনে সেইরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মদ্য পানের যে উত্তেজনা তাহা ক্ষণস্থায়ী, নেশা ছুটিয়া গেলে আর সে সকল ভাব থাকে না, তখন পূর্ব্বেকার অবস্থা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। কাব্য পাঠের দ্বারা যে উত্তেজনা হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী। এমন কি যে সকল কাব্যে উচ্চাঙ্গের আর্ট (art) আছে, তাহা আমাদের হৃদয়ে তীব্র অনুভূতি জাগ্রত করিয়া এরূপ দাগ কাটিয়া দেয় যে, তাহা কখনও মিলাইয়া যায় না। যে কারণে মদ্যপান ঘৃণিত, যে সকল কাব্য মদ্যপানের ন্যায় কু-প্রবৃত্তির উত্তেজনা করে তাহারাও সেই কারণে ঘৃণার বস্তু সন্দেহ নাই।

অধিকাংশ কাব্যই নর-নারীর প্রেম অবলম্বনে রচিত। কারণ এক মতে প্রেমই মানব-জীবনের গভীরতম অনুভূতি ("deepest thing of human life") এবং সেই গভীরতম অনুভূতির প্রতি পাঠক পাঠিকার মনে সহানুভূতি জাগাইতে পারিলেই কাব্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু স্থল বিশেষে সেই প্রেম স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, কখনও আবার তাহা ঘোর নারকীয় ভাবে পরিণত হয়। যে কাব্য পাঠক পাঠিকার মনে স্বর্গের সুষমা বিস্তার করিয়া আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে তাহাই শ্রেষ্ঠ, আবার যে কাব্য নারকীয় প্রেমের অনুভূতি জাগাইয়া তাহাকে নরকের দিকে টানিয়া নামায় তাহাকে অবশ্যই নিকৃষ্ট বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, নর-নারীর বিবাহ ঘটিত পবিত্র দাম্পত্য-প্রেম অপেক্ষা ব্যভিচারকে কাব্যে উচ্চ স্থান দিতেছেন। তাঁহাদের দেখাদেখি, আমাদের বাঙ্গলা উপন্যাসেও এইরূপ ব্যভিচারের ছড়াছড়ি হইতেছে। সংপ্রতি বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক মিঃ গিলবার্ট ফ্র্যাঙ্কো তাঁহার এক বক্তৃতায় এই শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"Those writers seem to think that the human animal is only an animal; and that the love of a man for a woman or of a woman for a man is on exactly the same level as the loves of the cocks and the hens, the bulls and the cows, or the other beasts of the field.

"These younger novelists are not content to follow in the paths of the great masters. They are not content with the fine, pure love motives of a Dickens, a Scott, or a Thackeray. Instead they prefer to grovel in the mire of their own mean little imagination, to impute the worst motives rather than the best, to depict all that is vile in human nature instead of all that is beautiful.

"That is not the way in which great literature has been made in the past, nor is it the way in which great literature will be made in future. The mission of a novelist is not to cast down humanity, but to uplift it. And how can a novelist uplift humanity except by showing us that which is best in humanity—love ?

"For love is not, as the Barnyard school of novelists would have us believe—mere foolish sentimentality, any more than it is mere physical passion. On the contrary, man's love for woman and woman's love for man, or in other words, the

right of natural mate selecion, is mankind's highest natural attribute—the one istinct which separates him from the beast." *

অর্থাৎ—এই সকল লেখক বোধ হয় মনে ভাবেন, মানুষ কেবলই পশু বিশেষ, নরনারীর প্রেম কুক্কুট কুক্কুটীর, ষণ্ড-গাভীর অথবা অন্য প্রকার জন্তুর স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভালবাসার সমজাতীয় একটা মনোবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল নব্য তন্ত্রের উপন্যাস লেখক বড় বড় সাহিত্য-শিল্পীকে অনুসরণ করিতে চাহেন না। ইঁহারা ডিকেন্স, স্কট বা থ্যাকারের সৃষ্ট সুন্দর পবিত্র প্রেম লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। তৎ পরিবর্ত্তে ইঁহারা ভালবাসেন নিজ নিজ ক্ষুদ্র নীচ কল্পনা-পঙ্কে নিমগ্ন থাকিতে—কার্য্যের উচ্চাভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তে নীচাশয়তা আরোপ করিতে, মানবচরিত্রে যাহা কিছু সুন্দর তাহার পরিবর্ত্তে যাহা কিছু কদর্য্য তাহা অঙ্কিত করিতে। এই প্রণালীতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য অতীত যুগে সৃষ্ট হয় নাই, এবং এই প্রণালীতে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ভবিষ্যৎ কালেও সৃষ্ট হইবে না। উপন্যাস লেখকের জীবনের ব্রত হইতেছে, মানব জাতিকে নরকে নিক্ষেপ করা নহে, স্বর্গে উন্নয়ন করা। কিন্তু যে উপন্যাস লেখক মানব জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু যে প্রেম তাহা আমাদিগকে দেখাইতে পারেন না, মানবজাতিকে তিনি কি প্রকারে স্বর্গে উন্নত করিতে পারিবেন? এই শ্রেণীর উপন্যাসলেখক প্রেমকে আমাদের নিকট যে একটা পাগলের খেয়াল বলিয়া বুঝাইতে যান, বস্তুতঃ প্রেম তাহা নহে, আবার প্রেম কেবল কামজ মোহও নহে। পক্ষান্তরে, নরের নারীর প্রতি অথবা নারীর নরের প্রতি প্রেম—অথবা অন্য ভাষায় মানুষের জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিবার স্বাভাবিক অধিকার হইতেছে মনুষ্য জাতির উচ্চতম স্বভাবগত গুণ—এই একটি গুণের জন্যই মানুষ পশু হইতে পৃথক প্রাণী।

মিঃ গিলবার্ট ফ্র্যাঙ্কো ইংরেজ উপন্যাস লেখকদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী নকল-নবিশদিগের সম্বন্ধেও সে কথা বেশ খাটে। তাঁহারা প্রেমের পাশবিক ভাবকে উপন্যাসের আখ্যান বস্তু করিয়া সাহিত্যকে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সমাজকে কি প্রকারে কলুষিত করিতেছেন, তাহা আমার "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" পুস্তকে বিবৃত করিয়াছি। সংপ্রতি শ্রদ্ধেয়া মনস্বিনী ভগিনী শ্রীমতী সরলা দেবী আমার সেই পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"সত্য কথা এই—'সধবার প্রেম' ও 'বিধবার প্রেম' অর্থাৎ দুইয়েরই 'পরকীয় প্রেম' এদেশে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। পুরাকালে পুরাতন বিধায় চলিত, নূতনকালে নব্যবিধায় চলিতেছে—এই 'প্রেম' বস্তু হিন্দুর ঘরে ঘরে, সিন্দুকে প্যাটরায় লুকান। উপন্যাসে কাব্যে শুধু "চাতরে হাঁড়ি ভাঙ্গা" হইতেছে। কবিরা তাঁহাদের পাপকলুষিত হৃদয় হইতে পাপচিত্র উদ্ভবন করিয়া সমাজকে কলুষিত করিতে বসেন নাই, কিন্তু যে সকল পাপ সমাজের বর্ত্তমান বিকৃত অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী তাহার চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া সমাজ সংস্কারের ইঙ্গিত করিতেছেন।" *

শ্রদ্ধাস্পদ ভগিনী যাঁহাদিগের পক্ষে ব্রিফ্ (ওকালতী) গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা পড়িয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা আর্টের জন্য আর্টের সেবা করেন। সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তাঁহারা উপন্যাস লিখিয়াছেন, একথা বলিলে তাঁহাদিগকে যে স্কুলমাষ্টারের সমান করা হইল -অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে গালি দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় কথা, তাঁহারা "চাতরে হাঁড়ি ভাঙ্গিতেছেন" —এ কথাটাও তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসাসূচক নহে। বিষ্ঠার হাঁড়ি যদি কেহ হাটে ভাঙ্গে, পাঁচ আইন অনুসারে

* "Purifying Literutrue"—Forward, Feby. 27, 1924.

* "সিংহের বিবরে"— বঙ্গবাণী, ফাল্গুন ১৩৩০

নিশ্চয়ই সে দণ্ডনীয় হয়। আর সেই ময়লা সাফ্ করিবার জন্ত তখন হেলথ-অফিসার বা স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টারের তলব পড়ে। (এই দীন লেখকও সেই কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় খবরের কাগজে তাঁহার নাম হইয়াছিল "সাহিত্যের হেল্‌থ অফিসার"; শ্রীমতী সরলা দেবীও এখন তাঁহাকে "সেনিটারি ইন্‌স্পেক্টার" নামে অভিহিত করিয়াছেন।) ধরিলাম যেন পরকীয় প্রেম বস্তু "হিন্দুর ঘরে ঘরে সিন্দুকে প্যাঁটরায় লুকান আছে"—কিন্তু একজন উপন্যাস লেখক সেই অধম প্রবৃত্তিকে যদি তাঁহার উপন্যাসের আখ্যানবস্তু করিয়া তোলেন, তবে তাহা দ্বারা মানব সমাজকে স্বর্গে উন্নত করা হইবে, না তাহা দ্বারা তাহাকে নরকে নিপাতিত করা হইবে?—"And how can a novelist uplift humanity except by showing us that which is best in humanity—love?"

আমাদের নব্যতন্ত্রের ঔপন্যাসিকগণ যে পরকীয় প্রেম লইয়া কারবার করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর ঘরে ঘরে সিন্দুক প্যাঁটরায় লুকান নাই—তাহা যে দেশী নহে, বিলাতী, আমি তাহা অন্য আর একটি প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।* যাঁহারা সে প্রবন্ধ পড়েন নাই, তাঁহাদের সুবিধার জন্ত নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব:—

"কিন্তু আমাদের ঔপন্যাসিকগণ, সমাজে যাহা আছে, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা চাহেন বিলাতী প্রেম (love) আমাদের সমাজে আমদানী করিতে। এই জন্ত তাঁহারা দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসরবয়স্কা বালিকার পূর্ব্বরাগ ঘটান, অথবা সধবা বিধবা বা বারবনিতাকে উপন্যাসের মধ্যে টানিয়া আনেন। সধবা, বিধবা বা বারবনিতা পরকীয় প্রেমে আসক্ত হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে; সেরূপ ঘটনা সমাজে যে না ঘটে, এরূপও নহে। কিন্তু তাহারা যেরূপ প্রেমে "পড়ে" তাহার নাম "পীরিত"। আমাদের ঔপন্যাসিকগণ সেই "পীরিত"কে বিলাতী পোষাক পরাইয়া সাহিত্যে চালাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের সেই প্রেমচিত্র সমাজের প্রকৃত চিত্র নহে, তাহা সমাজের পক্ষে অসত্য।...... এই স্থানে কেহ হয়ত বলিবেন, ইঁহারা ত সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনই করিতেছেন। ইঁহাদের হাতে পড়িয়া যদি সেই স্থূল গ্রাম্য "পীরিত" refined হইয়া সভ্য-ভব্য বেশ ধারণ করে, তবে সে ত ভাল কথা; সাহিত্যে কুরুচির পরিবর্ত্তে ইঁহারা সুরুচির আমদানী করিতেছেন। আমি বলি—আপনি তবে বিলাতী প্রেমকে চিনিতে পারেন নাই। বিলাতী প্রেম কেবল refined পীরিত নহে, ইহার নিজস্ব মূর্ত্তিও আছে। এই বিলাতী প্রেম দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা রাখে না, যুক্তির রাস মানে না, দুষ্ট অশ্বের ন্যায় আরোহীকে প্রায়ই পগারে ফেলিয়া দেয়। উহাকে স্বাধীন প্রেম বলিতে চাহ ত বলিতে পার, কিন্তু উহার স্বেচ্ছাচারিতাই বেশী। আর উহা বড়ই বিশ্বাসঘাতক, শনির ন্যায় অতর্কিত ভাবে কাহার শরীরে কখন প্রবেশ করিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং এরূপ প্রেম সভ্যভব্য বেশধারী হইলেও ইহাকে সাহিত্যে আমদানী করা নিরাপদ নহে। তবে সমাজে যদি ইহা পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকিত, তবে কোন কথা ছিল না। আমাদের ঔপন্যাসিকগণ প্রেমের লীলা-বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্ত ইহাকে বাহির হইতে হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ঘরে বসাইতেছেন। * * *

"আমাদের কোন্ উপন্যাস লেখক মানব জীবনের ও প্রকৃতির কয়টা নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন? আমি ত দেখিতে পাই, বঙ্গ-সাহিত্যের উপন্যাস লেখকদিগের মধ্যে একজনও সেই উচ্চতম আদর্শ লাভ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কারণ, আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহার অধিকাংশই পাশ্চাত্য উপন্যাস লেখকগণের অনুকরণের অনুকরণ, অনুবাদের অনুবাদ। তাহাতে এ দেশীয় নর-নারীর জীবনের প্রকৃত রহস্য

* "উপন্যাসে প্রেমচিত্র"—মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩২৯।

উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করই দেখা যায়। এ দেশীয় নর-নারী বিলাতী আদর্শে গঠিত হইলে ভবিষ্যতে যেরূপ প্রেমের খেলা খেলিবে, যেরূপ courtship, coquetry, flirtation, jilting ইত্যাদি করিবে, তাহারই পূর্ব্বাভাস দেখা যায়। প্রবন্ধ লেখক বলেন, আনাতোল ফ্রান্স জোলার (zola) গ্রন্থসমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"জোলা ফরাসী নর-নারীর জীবন যে ভাবে দেখাইয়াছেন ও চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অসত্য এবং অসত্য বলিয়াই তাহা দুষ্ট।" আমিও বলি, আমাদের তথাকথিত realistic নভেল লেখকগণ বঙ্গীয় সমাজের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, তাহা অসত্য এবং সেই কারণেই তাহা সমাজ ও সাহিত্যের পক্ষে দূষণীয়। সমাজ রক্ষার খাতিরে, সমাজের কোনও সত্যকে উলঙ্গ করিয়া দেখাইলে আমরা তাহাকে ভয় করি না,—আমরা সত্যের নামে এই অসত্যের প্রচার জন্য ভয় করি।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ভুবন ভুলানো হাসি

অলস ব'লোনা, অপটু বলো না—নই ত বিলাসী বাবু,
একটুকু শীতে বৃষ্টি বা তাতে হইনা কখনো কাবু।
খেটে খেতে পারি উদয় অস্ত,
কাষ দেখে কভু হইনা ত্রস্ত,
শ্রান্তি না জানি, ক্লান্তি না মানি খেটে যাব বারমাসই,
ঘরে ফিরে যদি হেরিবারে পাই ভুবন ভুলানো হাসি।

মেজাজের দোষ দিওনা মিথ্যে, রুক্ষ নয় তা কভু।
অবনত শিরে সকলি সহিব যেমনি হউন প্রভু।
ঊর্দ্ধতনের ভ্রুকুটি শাসন,
করিতে পারিব মাথার ভূষণ,
জীর্ণ করিতে পারিব সকল লাজ লাঞ্ছনা রাশি,
ঘরে ফিরে যদি পাই দেখিবারে জীবন জুড়ানো হাসি।

মর্য্যাদা জ্ঞান নাহি মোর অত, নই আমি অভিমানী,
সব কাযে আমি গণি বিশুদ্ধ, শ্রমেরে ধর্ম্ম জানি।
হেয় অযথা বলি কোন কাযে
যেমাক করিয়া ত্যজিব না লাজে,
হতে পারি আমি মুটে কি মজুর, অথবা মাঠের চাষী,
ঘরে ফিরে যদি হেরিবারে পাই নয়ন ভুলানো হাসি।

বিশ্রাম নাই বলিয়া কখনো করিব না হা হুতাশ,
ক্ষতি নাই, মোর হোকনা জীবন সশ্রম কারাবাস।
মিলে না যোগ্য পারিশ্রমিক
বলিয়া জীবনে দিবনাক ধিক্
উন্নতি নাই বলিয়া কখন হব না পক্ষপাতী,
ঘরে ফিরে যদি দেখিবারে পাই কুন্দ ফুটানো হাসি।

বিরহ আমারে অপটু করেছে, অলস করেছে এত,
কারো কথা হায় সহেনাক গায়, মেজাজ হয়েছে তেঁত।
বিরহ ঘটায় ত্রুটী পরমাদ
আনায় শ্রান্তি যত অবসাদ—
কাযে গাফিলতি হবে না আমার যত কর করমাসই
ঘরে ফিরে যদি হেরিবারে পাই নিখিল ভুলানো হাসি।

শ্রীকালিদাস রায়।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে বাঙ্গালী

আজকাল বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বাহির করিতে হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন আমাদের এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের পদতলে বসিয়া শত সহস্র ছাত্র শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিত। তাঁহাদের বিদ্যা ও জীবনের পবিত্রতার খ্যাতি দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। সুদূর চীন, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য হইতে ধর্ম্ম ও জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রগণ তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য আগমন করিত। তাহারা আবার কৃতবিদ্য হইয়া স্বদেশে যাইয়া এই সকল গুরুর যশোকীর্ত্তন করিত। তাহা শুনিয়া সেখানকার রাজারা ঐ বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি পণ্ডিতদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া ধর্ম্ম সংস্কার ও প্রচার করাইবার জন্য, তাঁহাদের আহ্বান করিতে লোক প্রেরণ করিতেন। কোন পণ্ডিত বা যাইতেন, আর কেহ বা এত ব্যস্ত থাকিতেন যে বিদেশ গমনের সময় পাইতেন না—তবে উপদেশাদি প্রেরণ করিতেন।

সাহেবই হউন আর বাঙ্গালীই হউন, আমাদের দেশের যাঁহারা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই এই সকল পণ্ডিতদের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল মাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিই নিবদ্ধ আছে। বাঙ্গালার Cultural history বা সভ্যতার ইতিহাস জানিতে হইলে, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও পণ্ডিতমণ্ডলীর বিবরণ সংগ্রহ করা যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা শশাঙ্ক সম্বন্ধে যাঁহারা সম্পূর্ণ এক অধ্যায় লেখেন, তাঁহারা ঐ নৃপতিরই সমসাময়িক, বৌদ্ধ ভারতের তদানীন্তন গুরু বাঙ্গালী শীলভদ্র সম্বন্ধে দুই চারি পংক্তি লেখাও স্থান ও সময়ের অপব্যয় মনে করেন। পাল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তিন চার খানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সময়ের মহাপণ্ডিত শান্ত রক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্বন্ধে দুই তিনটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। এক মাত্র মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ব্যতীত অপর কাহারও দৃষ্টি এ বিষয়ে এপর্য্যন্ত পতিত হয় নাই।

আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া যোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী যে কেবল মাত্র বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণ করিত তাহা নহে, সে চীন, তিব্বত, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি সুদূর দেশে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ ধন ধান্য, বিদ্যা পাণ্ডিত্যে ভারতের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। যে যুগে কর্ণ সুবর্ণের বীর নৃপতি শশাঙ্ক বঙ্গের বাহিরেও রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই যুগেই বাঙ্গালীর আদি গৌরব শীলভদ্র জীবিত ছিলেন। শীলভদ্র সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে তিনি দন্তভদ্র, দন্তদেব বা দন্তসেন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অল্পবয়সেই নানা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া সুপণ্ডিত হইলেন। কিন্তু হেতু বিদ্যা, শব্দ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অথর্ব্ববেদ বা সাংখ্যদর্শন তাঁহার মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত করিতে পারে নাই। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি "শব্দ বিদ্যা সংযুক্ত শাস্ত্র" প্রণেতা ধর্ম্মপালের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। পরে তিনি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা বলে বন্ধুগণকে

যুদ্ধ করিয়া ও সদ্ধর্ম্মের শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হয়েন।

চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-সাং এই বাঙ্গালী গুরুর পদতলে বসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তাঁহার যাবতীয় সমস্তার সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হুয়েন সাং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয়ে সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবেন বলিয়াই, কত দেশ কত নদী কত পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পথে কাশ্মীরে পৌঁছিয়াই তিনি তাঁহার মনের সন্দেহ মিটাইবার জন্ত যে পণ্ডিতদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাহার সমস্তার সমাধান করিয়া দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী আচার্য্য শীলভদ্র অতি সরল ভাবে তাঁহাকে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। হুয়েন সাং ১০৩ বৎসর বয়স্ক ঐ জরাজীর্ণ পণ্ডিতকুলচূড়ামণির নিকট ৫ বৎসর কাল শিক্ষালাভ করিলেন। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য। তাঁহাদের উভয়েরই মনের উদারতার কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সে যুগের লোকেরা—বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নেতৃবৃন্দ, নিজের ধর্ম্মের শাস্ত্র ব্যতীত, অন্ত ধর্ম্মের গ্রন্থাদি আলোচনা করাকে পাপ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শীলভদ্র নিজে মহাযান মতাবলম্বী হইয়াও, বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তান্ত শাখার শাস্ত্র বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের সমগ্র বিদ্যাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এখন এই বিদেশী ছাত্রটির নিকট তাঁহার চিরজীবনের সাধনার ধন অর্পণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ছেলে—বৌদ্ধই হউন আর যাই হউন—তিনি যে চীনদেশের এক ব্যক্তিকে বেদ পড়াইলেন, ইহা তাঁহার মনের কম উদারতা ও তেজস্বিতার পরিচায়ক নহে। হুয়েন সাং আবার পাণিনির ব্যাকরণও শীলভদ্রের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার উদ্দেশ্ত ছিল ভারতের সমগ্র cultureকে আয়ত্ত করিয়া চীনদেশে তাহার প্রচার করা। তিনি কেবল মাত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে নিজের মনকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁহার নিজের লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে ও তদীয় একজন ছাত্র লিখিত জীবনচরিতে শীলভদ্রের গুণ ও বিদ্যাবত্তার কথা পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালীর গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্ত শীলভদ্রের আগ্রহ ছিল। কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মা স্বয়ং হিন্দু হইলেও অশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হুয়েন সাংকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজরাজ্যে একবার লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। হুয়েন সাং বিধর্ম্মীর রাজ্যে যাইতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব শীলভদ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকগণের সেইখানেই সর্ব্বাগ্রে গমন করা উচিত। হুয়েন সাং গুরুর আদেশে কামরূপ গিয়াছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্ত সেখানে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নালন্দার সকল পণ্ডিতই কিন্তু আর শীলভদ্রের মত উদার প্রকৃতির ছিলেন না। হুয়েন সাংয়ের পাণ্ডিত্য প্রতিভাকে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে ঈর্ষ্যা করিতেন। তাই যখন সেই চীনদেশীয় পরিব্রাজক আবার চীনে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন, তখন সকলেই তাহাতে আপত্তি করিলেন। মিথিলা হইতে যে জন্ত নব্য স্তায়ের গ্রন্থ বাহিরে আনিতে দেওয়া হইত না, ঠিক সেই জন্তই হুয়েন সাংকে ভারতীয় বিদ্যা লইয়া বিদেশে যাইতে দিতে পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালী শীলভদ্রের ইচ্ছা ছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মকে দেশদেশান্তরে প্রচার করা। তাই তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে হুয়েনসাং যদি দেশে ফিরিয়া যান তবে চীনের স্তায় সুবিস্তৃত দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যথার্থ জ্ঞান অচিরকাল মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। এই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। হুয়েন সাংও দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শীলভদ্রের আশা পূর্ণ করিলেন। চীনের বৌদ্ধগণের মধ্যে তিনি এমন এক নবজীবনের সঞ্চার করিলেন যে তাহাতে তাঁহারা অনুপ্রাণিত

হইয়া জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্ত গমন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ প্রচারের মূলে একজন বাঙ্গালীর কৃতিত্ব রহিয়াছে, এই কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে।

ইহার পর, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে আবার আমরা বাঙ্গালীর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বিবরণ অবগত হই। তিব্বতের রাজা Thi-srong-den-tsan দুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিতকে তাঁহার রাজ্যে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। তাঁহারাই সেখানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরূপে স্থাপন করেন। এই দুইজন বাঙ্গালীর মধ্যে একজন ছিলেন গৌড় নিবাসী মহাপণ্ডিত শান্ত রক্ষিত। শীলভদ্রের ন্যায় তিনিও নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষের সেই শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের আসন বাঙ্গালী পণ্ডিতদের আয়ত্তে বহুবার আসিয়াছে। আর আজ যে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা আহূত হইয়া বিদ্যা দান করিতেছেন, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে নূতন নহে। যাহা হউক, শান্ত রক্ষিতকে তিব্বতের অধিবাসিবৃন্দ মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তাঁহাকে তাহারা আচার্য্য বোধিসত্ত্ব নামে সম্বোধন করিত। শান্তরক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের জন্ত ও তাহাদের জীবনে সংযম শিক্ষা দিবার জন্ত নিয়মাদি প্রণয়ন করেন।

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহোদয় তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুলিখিত "Indian Pandits in the Land of snow" নামক গ্রন্থে যেমন উল্লিখিত বিবরণটি প্রদান করিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালীর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আর একটী সংবাদ দিয়াছেন—"In the 9th century many learned pandits from Bengal were invited to Tibet by King Ralpachan and employed by him in translating Sanskrit works into Tibetan." অর্থাৎ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা রাল্‌পাচান বঙ্গদেশ হইতে বহুপণ্ডিত আহ্বান করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা হইতে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

তিব্বতে বাঙ্গালীরা যে কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে। যখন সে দেশের বৌদ্ধধর্ম্ম বীভৎস ব্যভিচারে পরিপূরিত হইয়া গিয়াছিল, তখনও একজন বাঙ্গালী যাইয়া তাহার সংস্কার সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালীর নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। Pag som son-sang নামক তিব্বতীয় বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের নবসংস্কারে লা-চেন, লো-চেন, রাজা যেশীহড্ ও অতীশ প্রধান ছিলেন। কিন্তু ইহাদের চারিজনের মধ্যে আবার বঙ্গদেশবাসী অতীশই খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতেন। অতীশ ৯৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১০৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমণীপুর বা বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতার নাম প্রভাবতী। বাল্যকালে তাঁহারা অতীশকে চন্দ্রগর্ভ নামপ্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে জেতারি নামক পণ্ডিতের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হীনযান শ্রাবকের তিনটি পিটক, বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতের ত্রিপিটক, মাধ্যমিক মতবাদের দর্শন শাস্ত্র, যোগাচার্য্য মতবাদ ও চারি প্রকার তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালে দিগ্বিজয়ী পরাভব করিতে না পারিলে পাণ্ডিত্যের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইত না। অতীশ একজন দিগ্বিজয়ীকেও পরাভূত করেন। কিন্তু ধর্ম্মের জন্ত যাঁহাদের অন্তর ব্যাকুল হয়, তাঁহারা শুষ্ক বিদ্যার ভার বহন করিয়া বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারেন না। অতীশ ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণগিরির রাহুল গুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

রাহুল গুপ্ত তাঁহাকে ত্রিশিক্ষা প্রদান করিলেন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি ওদন্তপুরীয় বিহারে ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে ৩১ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুর আসনে উন্নীত হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার অন্তরের ধর্ম্মপিপাসা মিটিল না। ভারতবর্ষের মধ্যে কেহই এই নবীন সাধকের সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না; তাই তিনি সুবর্ণদ্বীপে গমন করিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন, এই সুবর্ণদ্বীপ বর্ম্মাদেশেরই নামান্তর। সুবর্ণদ্বীপে তিনি অশেষ বিদ্যালাভ করিয়া যখন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন পালাসাম্রাজ্যের অধীশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন।

অতীশ রাজানুরোধক্রমে সেই মহাসম্মানজনক পদ গ্রহণ করিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে বহু ছাত্র আসিয়া অতীশের নিকট শিক্ষালাভ করিতেন। এইরূপ একদল তিব্বতীয় ছাত্র অতীশের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে যাইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে তিব্বতের রাজা যোশীহড বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিবার জন্ত কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি ভারত-প্রত্যাগত ছাত্রগণের মুখে অতীশের কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া, তাঁহাকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রথমবারে যে চীনদেশীয় পরিব্রাজক দল তাঁহাকে লইতে আসিল, তাহারা শুনিল যে, অতীশকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। তাঁহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাবকে লোকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবে—তিনি কি কখনও সঙ্ঘারাম ছাড়িয়া বিদেশে যান? এই কথা শুনিয়া তাঁহারা নিবৃত্ত হইয়া দেশে চলিয়া যান। দ্বিতীয় বারেও রাজা বহু অর্থ দিয়া Roya tson-gru-sageর নেতৃত্বে একদল ধর্ম্ম প্রচারক অতীশকে আনিবার জন্ত প্রেরণ করেন। তাঁহারা আসিয়া অতীশকে বহু অর্থ উপঢৌকন দিয়া নিজেদের প্রস্তাব বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিলেন। [illegible] ঐশ্বর্য্য ও বিলাসকে পদাঘাত করিয়া পবিত্র ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি আর সামান্ত অর্থ লোভে মুগ্ধ হয়েন? অতীশ তাঁহাদিগকে সমস্ত অর্থ ফেরত দিলেন, কিছুই গ্রহণ করিলেন না; আর, দেশ ছাড়িয়া যাইতেও অস্বীকার করিলেন। ইহাতে তাহাদের নেতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন অতীশ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে, তাঁহাদিগকে অপমান করিবার জন্ত তিনি অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েন নাই; তবে তিনি তিব্বতে যাইতে পারিবেন না।

ইঁহারা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে পর, রাজা যোশী হড্ পুনরায় অতীশকে আনিবার জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের সংকল্প অচল, অটল—অধ্যবসায় অনন্যসাধারণ। কিন্তু এবার যখন তিনি কোন সুবর্ণখনি হইতে স্বর্ণ আহরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শত্রু এক রাজা আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। শত্রুর কারাগারে রাজা যোশীহড্ প্রাণ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, অতীশকে যেন পুনরায় তাঁহার নাম করিয়া আহ্বান করা হয়—যেমন করিয়া হউক, অতীশের দ্বারা যেন তিব্বতীয় ধর্ম্মের সংস্কার করান হয়।

এবারে Nag-tcho নামে একজন তিব্বতীয় পণ্ডিত অতীশকে লইতে আসিলেন। ইনি একখানি গ্রন্থে অতীশের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেখানিকেই উপজীব্য করিয়া উল্লিখিত ও নিম্ন লিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। Nag-tcho বিক্রমশিলা মহাবিহারে উপস্থিত হইয়া তিব্বতীয়গণের জন্ত যে ভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহারা স্বদেশীয় এক পণ্ডিতের সহিত যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যে বৃদ্ধ স্থবির আচার্য্য রত্নাকরের মনস্তুষ্টি যদি Nag cho সাধন করিতে পারেন, তবে তাঁহার দ্বারা অতীশকে তিব্বত গমনের জন্ত আদেশ করান যাইতে পারে। Nag-tcho রত্নাকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বহুদিন পরে তাঁহাকে মনের অভি-

লাব জ্ঞাপন করিলেন। রত্নাকর অতীশকে তিব্বত যাইতে আদেশ দিলেন। অতীশকে ঐ সময়ে পুনরায় Nag tcho প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিলেন—অতীশ পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও তাহার এক কপর্দ্দক গ্রহণ করিলেন না। তিনি গুরুর আদেশ ও তিব্বতবাসীদের একান্ত আগ্রহ অবহেলা করিতে না পারিয়া, এবার তথায় গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তবে তখন তাঁহার হস্তে বহু বিহারের ভার ছিল বলিয়া, তৎক্ষণাৎই যাইতে পারিলেন না। কিছু বিলম্ব হইল।

অতীশকে যেরূপ সমারোহের সহিত তিব্বতবাসিগণ আহ্বান করিয়া লইয়াছিল, তাহারও উজ্জ্বল চিত্র Nag-tcho এবং—তাঁহার গ্রন্থের ভাব লইয়া লিখিত "Indian Pandits in the Land of snow" নামক গ্রন্থে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন।

তিব্বতের রাজা অতীশকে জোভোজী বা প্রভু স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতেন—সম্ভ্রমভরে কদাচ নাম গ্রহণ করিতেন না। অতীশ পঞ্চদশ বর্ষ কাল তিব্বতে বাস করিয়া সেখানকার ধর্ম্মকে সুসংস্কৃত করিলেন। সেখানে আজ্ঞার নূতন সংস্করণ করিলেন ও লোকের নৈতিক চরিত্রের সংশোধনের চেষ্টা করিলেন। তিনি তিব্বতের যে সকল বিহারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, আজও তিব্বতবাসীরা, তাঁহার স্মৃতি সযত্নে সেই সকল স্থানে রক্ষা করিয়াছে। তিব্বতীয় লামাধর্ম্মের গুরু ব্রামটন তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি তিব্বতে বহু গ্রন্থ রচনা করেন—তন্মধ্যে "বোধি পথ প্রদীপের" আলোকে আজও তথাকার লোক ধর্ম্ম পথ নিরূপণ করিতেছে। তাঁহার ধর্ম্ম মতের প্রভাব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা যায়। Sir Charles Eliot তাঁহার নব প্রকাশিত Hinduism and Buddhism গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"It may seem a jest to call the teaching of Atisa a reform, for he professed the Kalachakra, the latest and most corrupt form of Indian Buddhism; but it was doubtless superior in discipline and coherency to the native superstitions united with debased Tantrism which it replaced."

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীয়া বিশুদ্ধ মহাযান ধর্ম্মের অধিকারী নয়; কেন না, তখনও তাহারা দৈত্য দানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্র যানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন।"

নেপালেও বাঙ্গালীরা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। কাহ্নপাদ, লুই, ভুসুক প্রভৃতি বৌদ্ধ লেখকগণের স্মৃতি আমাদের দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, নেপালে কিন্তু তাঁহারা আজও পূজিত হন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তথা হইতে তাঁহাদের দোঁহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গসাহিত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদে মণ্ডিত করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত কল্যাণী নগরের শিলালিপি পাঠ অবগত হওয়া যায় যে, পেগানেও তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অর্ণবযানে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার করেন। আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কাত্যায়ন গোত্রের একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্য দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিংহলে. বৌধাগম চক্রবর্ত্তীর পদলাভ করিয়াছিলেন। (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত Modern Buddhismর ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালীরা পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী

(জীবন চরিত)

শৈশব, বাল্য ও যৌবন। ধনবান পিতা মাতার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে সচরাচর যেমন আদর যত্নে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের পুত্র সেইরূপ যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সিদ্ধার্থ পরিবার পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী শ্রাবক ছিলেন। ধনের প্রথমাবধি অপ্রতুলতা ছিল না, তদুপরি শিশুর গর্ভবাস কালে নানা ধন-রত্নের আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ নবজাত শিশুর জন্য পাঁচজন সেবিকা নিযুক্ত করিলেন। একজন দুগ্ধপান করাইত, একজন স্নান করাইত, একজন বস্ত্র পরাইত, একজন শিশুর সহিত খেলা করিত, ও একজন ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইত।

কেবল সে কালে নহে, একালেও রাজপুত রাজা ও ধনবানদের শিশুদের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন বয়স্কা ও জাতীয়া সেবিকা নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন অতি অল্পই হইয়াছে। দুগ্ধপান করাইবার সেবিকা দুই প্রকার হয়। (১) যাহারা কেবল গো-দুগ্ধ পান করায় ও (২) যাহারা আপন স্তনদুগ্ধ পান করায়। প্রথম প্রকার সেবিকা এমন হওয়া উচিত, যাহার ২।১টি সন্তান হইয়াছে, সন্তান পালন করিবার ক্ষমতা ও বহুদর্শিতা আছে, গোছাইয়া শিশুর ক্ষুধা বুঝিয়া খাওয়াইতে পারে, ও শিশুপালন বিদ্যার কিছু জ্ঞান আছে। দ্বিতীয় প্রকারের, অর্থাৎ স্তনদুগ্ধ পান করাইবার জন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, নীরোগ, নির্দ্দোষ স্বভাবের ধাত্রী নির্ব্বাচন করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের শিশুকে, বিশেষতঃ পুত্রসন্তানকে, সাহসী ক্ষত্রিয় কন্যার দুগ্ধই পান করান হয়। পূর্ব্বকালে লোকে বিশ্বাস করিত, ও এখনও অনেকে বিশ্বাস করে যে, ইতর জাতীয়া বা [illegible] করিলে শিশু ক্ষত্রিয়ের প্রধান গুণ সম্পন্ন অর্থাৎ সাহসী বীর হইতে পারে না। সেই জন্য স্তনদুগ্ধ পান করাইবার ধাত্রী বিশেষ অনুসন্ধান ও বিচার করিয়া নিযুক্ত করা হয়। শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে এইরূপ ধাত্রীরা বিশেষ সম্মানের পাত্রী বিবেচিত হইয়া থাকে। শিশু ভবিষ্যতে রাজা হইলে, ধাত্রী রাজমাতার সম্মান লাভ করে। এ নিয়ম কেবল ভারতে নহে, মধ্য এশিয়াতেও প্রচলিত। বাবরের সহিত যে তুর্কীরা ভারতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও ঠিক এই রীতি প্রচলিত ছিল। তাহারাও বিশ্বাস করিত যে, যে ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ রাজকুমার পান করে, তাহার চরিত্রের মতই রাজকুমারের চরিত্র হইয়া যায়। অতএব সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সাহসী পিতা মাতার কন্যাকেই এ কার্য্যে নিযুক্ত করিত। তুর্কীরা স্তনদাত্রী ধাত্রীকে অনকা ও তাহার কোলে সে সময়ে যে পুত্র থাকে তাহাকে রাজপুত্রের কোকা বলে। রাজপুত্র সিংহাসন লাভ করিলে এই কোকা সম্ভ্রম লাভ করিয়া কোকল্ তাশ্ খাঁ হইয়া যান। কোকার সহোদরেরাও কোকা নামে সম্মানিত হইয়া থাকেন। কোকার পিতাকে অৎকা অথবা অৎকা খাঁ বলে।

স্নান করান ও কাপড় পরান কার্য্যে প্রায় অঙ্গ-সেবা-পরায়ণা নিপুণা নাপিত কন্যাদের নিযুক্ত করা হয়। রাজপুতনাতে ধনবান ক্ষত্রিয়দের সেবার কার্য্য নাপিতের একচেটিয়া, এমন কি বঙ্গদেশের রাঁধুনি ব্রাহ্মণদের কাযও রাজপুতনাতে নাপিতেরা করিয়া থাকে; তাহাদের সচরাচর রাঁধুনির জাতি বলে। খেলা করিবার জন্য মিষ্টভাষিণী, সচ্চরিত্রা, সাহসী, সুন্দরী, সদ্বংশীয়া কিশোরী, ধর্ম্মভীরু ক্ষত্রিয়বালা নির্ব্বাচিত হয়। বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য নীরোগ, সবল, সৎস্বভাবা, সন্তানবতী নাপিত কন্যা বা ক্ষত্রিয়কন্যা নিযুক্ত করা হয়।

ভীরু, ধর্ম্মজ্ঞানহীনা অসচ্চরিত্রাকে কোনও কাযে নিযুক্ত করা হয় না। জৈনদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের ছুৎ বিচার নাই। অস্পর্শীয় ছাড়া, যে কোনও জাতীয় জৈনি, অন্য জাতীয় জৈনির প্রস্তুত অন্ন একসঙ্গে বসিয়া গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য, বিবাহ আপন আপন জাতিতেই হয়।

মহাপুরুষদের শৈশব সম্বন্ধে যেমন নানা প্রকার সম্ভব ও অসম্ভব গল্প রচিত ও প্রচলিত হইয়া থাকে, বর্দ্ধমান সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়াছিল। ঐ সকল গল্প অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য হইতে পারে না, তবে উহাদের সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় বলা অন্যায় হয়। ঐ সকল গল্প যাহার সম্বন্ধে রচিত হয় তাহার কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকাশিত না হইলেও রচনা কালের লেখক ও সাধারণ পাঠকের চিন্তাস্রোত ও রুচির এমন নিখুঁত চিত্র আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাবস্থায় গোপবালাদের সহিত আদিরস পূর্ণ প্রেমালাপ ও ক্রীড়া বর্ণনাতে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার কথা জানিতে পারা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক মহাভারতকার এ সকল কথা কিছুই লেখেন নাই। কিন্তু ভাগবত রচনা কালের—সে কাল মহাভারত রচনার যত কাল পরেই আসিয়া থাকুক—লেখক ও পাঠকের চিন্তাধারা ও রুচির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানের শৈশবের সকল গল্পে [যাহা তাঁহার মোক্ষের প্রায় তিন শত বৎসর পরে পুস্তকাকারে লেখা হইয়াছে, এবং ইহার পূর্ব্বে কতক গাথারূপে কতক গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বাচনিক সংবাদ রূপে প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে] তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অসাধারণ বল, সাহস ও বৈরাগ্যের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

বর্দ্ধমান একদিন তাঁহার সমবয়স্ক কয়েকটি বালকের সহিত মাঠে খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ এক প্রকাণ্ড মত্ত হস্তী তাহাদের আক্রমণ করিল। অন্য বালকেরা যে যেদিকে পথ পাইল ছুটিয়া পলাইতে লাগিল, কিন্তু নির্ভীক বর্দ্ধমান পলাইবার নামও করিলেন না। হস্তী নিকটে আসিলে তিনি তাহার শুণ্ড [বা দন্তে] ভর দিয়া কৌশলে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, হস্তী চালকদের মত বসিলেন এবং অল্পকালমধ্যে তাহাকে বশীভূত করিলেন।

অন্য একদিন বর্দ্ধমান আপনার সমবয়স্ক কয়েকটি বালকের সহিত এক মাঠে "আমলি-পিপলী" নামক খেলা খেলিতেছিলেন। একজন নিকৃষ্ট শ্রেণীর দৈত্য, বর্দ্ধমানই ভাবী তীর্থঙ্কর কিনা সন্দেহ করিয়া পরীক্ষা করিতে আসিল, এবং তাঁহাকে বল পূর্ব্বক আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইল ও তাঁহাকে লইয়া আকাশে অতি উচ্চে উড়িয়া গেল। অন্য বালকেরা ভয় পাইয়া কেহ পলাইয়া গেল, কেহ চেঁচাইতে লাগিল, কেহ পিতাকে সংবাদ দিতে ছুটিল; কিন্তু বর্দ্ধমান একটুও ভীত হইলেন না। তিনি দৈত্যকে শাস্তি দিতে সঙ্কল্প করিলেন ও তাহার চুল ধরিয়া এমন পীড়িত করিলেন যে, দৈত্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিল এবং তাঁহাকে নামাইয়া কোনও মতে প্রাণ লইয়া পলাইল। বর্দ্ধমানের খেলার সাথীরা এইরূপ নানা ঘটনা দেখিয়া তাঁহাকে "বীর" বলিয়াই সম্বোধন করিতে লাগিল। তাহারা বর্দ্ধমানের পিতৃদত্ত নাম অপেক্ষা বীর বা মহাবীর বলিয়া সম্বোধন করিবার পক্ষপাতী হইল।

বর্দ্ধমানের মোক্ষের দুইতিন শত বৎসর পরে জৈন সম্প্রদায়ের দুই শাখা—দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর—হইয়া গিয়াছে। ঠিক কোন সময়ে ও কি কারণে হইয়াছে সে সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে; কিন্তু কোনটি সত্য বলা যায় না। বর্দ্ধমান স্বয়ং বস্ত্রত্যাগী নগ্ন সন্ন্যাসী ছিলেন। দিগম্বর শাখার যতি ও মুনিদের এখনও নগ্ন থাকিবার ব্যবস্থা, কিন্তু এরূপ সাধু এখন আছেন কি না সন্দেহ! থাকিলে, বন জঙ্গলে ২।১ জন থাকিতে পারেন, লোকালয়ে নাই। তাঁহাদের নিয়মগুলি যেমন কঠোর, সেইরূপ অতি কঠোরতার সহিত সেগুলি পালন করিয়া থাকেন বা করিতেন। এ শাখায় শ্রাবক সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প। শ্বেতাম্বর শাখার মুনি যতিরা আড়ম্বরহীন শ্বেত বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত

রাখেন। এই দুই শাখার লোকেরা বর্দ্ধমানের জীবন কাহিনী এবং জীবনের ঘটনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, যা করিতে ভাল বাসেন। দিগম্বরেরা কঠোরতার পক্ষপাতী, কিন্তু শ্বেতাম্বরেরা অনেকটা কোমল বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন, দিগম্বরেরা বলেন বর্দ্ধমানের শৈশবাবস্থা হইতেই ঘোর বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। তিনি আট বৎসর বয়সেই পার্শ্বনাথস্বামী-নির্দিষ্ট জৈনগৃহস্থদের দ্বাদশ শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি বাল-ব্রহ্মচারী ছিলেন; পিতা মাতার জীবিতাবস্থাতেই, তাঁহাদের সাদর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, কঠোর সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্বেতাম্বরেরা বলেন যে, যদিও তিনি শৈশবাবস্থা হইতেই মনে মনে বৈরাগ্য পোষণ করিতেন, তথাপি পিতা মাতার জীবন কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। শ্বেতাম্বরেরা বলেন, বর্দ্ধমান গর্ভবাস কালে একদিন ভাবিলেন, তাঁহার নড়া চড়াতে তাঁহার গর্ভধারিণীর না জানি কত কষ্ট হইতেছে, অতএব তিনি এক দিবারাত্রি নড়েন নাই। কিন্তু তাঁহার গর্ভধারিণী অন্যরূপ ভাবিলেন। তিনি মনে করিলেন পেটের সন্তান মরিয়া গিয়াছে। এই সন্দেহে তিনি এত কাতর হইলেন যে, একান্তে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মাতার দুঃখ দেখিয়া গর্ভস্থ বীর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একটু নড়িলেন। অমনি প্রসূতিও অশ্রু বিসর্জ্জন ত্যাগ করিয়া আনন্দিতা হইলেন। এই ঘটনা দ্বারা বীর মাতৃস্নেহের গভীরতা অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই মাংস পিণ্ড প্রতি মাতার যখন এত স্নেহ ও মমতা, তখন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার সময়ে না জানি তাঁহার কত কষ্ট হইবে। বীর সেই সময়েই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহার মাতার জীবিতাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিবেন না, সাধারণ সংসারী যুবকের মত সংসারে লিপ্ত থাকিবেন; মাতার আনন্দের জন্য বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিবেন। পরে তাঁহার দেহান্তের পর জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য ও স্বয়ং মোক্ষলাভের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। [জৈনেরা বিশ্বাস করেন যে, তীর্থঙ্করেরা ভ্রূণাবস্থা হইতেই পূর্ণ জ্ঞানী, অতএব মাতৃগর্ভে বাসকালেই জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানী আত্মা মাতৃ-স্নেহের গভীরতা সম্বন্ধে কেন অজ্ঞান ছিলেন তাহার বিচার করিতে পারিলাম না। জৈনধর্ম্মে বিদ্বান কোন মহাশয় বিচার করিয়া দিলে বাধিত হইব। আমি জৈন গ্রন্থে যেরূপ পাইয়াছি সেই রূপই লিখিলাম— লেখক]

শিক্ষা। বর্দ্ধমান স্বামীর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, কেননা সে কালে জীবনী লেখার নিয়ম ছিল না। তথাপি তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার আভাস তাঁহার উপদেশাবলী হইতে পাওয়া যায়। তাঁহার মোক্ষের প্রায় তিনশত বৎসর পরে সংক্ষিপ্ত জীবনীও লেখা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে আজকালকার অনুসন্ধিৎসুর তৃপ্তি হয় না। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার কথা কোথায়ও নাই। হিন্দুদের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণকেও সন্দীপনী ঋষির টোলে ৬৪ দিন বাস করিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইয়াছিল। এই সমাপ্ত শব্দ হইতে বোধ হয় পূর্ব্বে অন্য স্থানে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের শিক্ষার কথা তাঁহার জীবনীতে আছে। কিন্তু জৈনেরা বলেন তীর্থঙ্করেরা জন্মাবধি পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনই হয় না। বর্দ্ধমানের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যাক বা না যাক, তিনি যে এক জন অদ্বিতীয় বেদ বেদান্তবেত্তা, সাহিত্যিক, নৈয়ায়িক ও দার্শনিক ছিলেন তাহা তাঁহার শিক্ষাদানের নানা গল্পে প্রমাণিত। একবার গৌতম ইন্দ্রভূতি প্রমুখ একাদশ জন দেশের প্রধান বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বড় বড় টোলের আচার্য্যগণ তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন। কাহারও কথা কহিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রত্যেকের নাম ধরিয়া নিকটে আসিতে বলিলেন। নিকটে আসিলে সেই

ব্যক্তি কোন্ কোন্ শ্রুতির অর্থ ভুল বুঝিয়া সিদ্ধান্তে সন্দিহান ছিলেন জানাইয়া দিলেন এবং সেই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া তাহার সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন। এই গল্পে দুইটি কথা প্রমাণিত হইতেছে। প্রথম—তিনি পরের মনের কথা জানিতে পারিতেন ও দ্বিতীয়তঃ সাহিত্য কোষ ও বেদে অদ্বিতীয় বিদ্বান ছিলেন। তাঁহার উপদেশাবলী অর্দ্ধ মাগধী বা সে সময়ের দেশের প্রচলিত ভাষাতেই লিখিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই জন্য জৈনদের সকল প্রাচীন গ্রন্থই পালী ভাষাতে লেখা।

যৌবন।—শ্বেতাম্বরেরা বলেন, তিনি প্রথম যৌবনে কৌণ্ডিন্য গোত্রীয়া যশোদা নাম্নী ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন। অনুজা ব প্রিয়দর্শনা নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই কন্যার কৌশিক গোত্রজ জমালী নামক এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল ও শেশাবতী বা যশোবতী নাম্নী এক কন্যার জন্ম হইয়াছিল। জমালী কিছুকাল বর্দ্ধমানের মতাবলম্বী প্রচারক ছিলেন কিন্তু পরে কোন-কারণে মত পরিবর্ত্তন করিয়া স্বয়ং মত স্থাপন কর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত নামগুলি ছাড়া তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, দৌহিত্রী সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু জানা নাই। দিগম্বরেরা এ বিবাহের কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে তিনি বালব্রহ্মচারী ছিলেন।

পিতা মাতার সমাধি। সিদ্ধার্থ পরিবার পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী শ্রাবক ছিলেন। জৈন ধর্ম্মে এক বিধি আছে যে, শ্রাবক যখন দেখিবে তাহার দেহ ক্রমে অপটু হইতেছে, আর বেশীদিন কর্ম্মক্ষম থাকিবার আশা নাই, তখন শ্রাবক পারতপক্ষে গৃহে বাস না করিয়া মন্দিরে বসিয়া আত্মচিন্তা ও মোক্ষচিন্তা করিবে। শ্রাবক ইচ্ছা করিলে গুরুর কাছে আপন জীবনের সমস্ত পাপ স্বীকার (Confession) করিয়া অনেকটা পাপের বোঝা কমাইতে পারে। এরূপ পাপ স্বীকার বাধ্যতা মূলক নহে; শ্রাবকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পরে, ইচ্ছা হইলে সঙ্কল্প করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারে। শ্রাবক একটি পবিত্র স্থান নির্দ্দেশ করে, অর্থাৎ এমন স্থান খুঁজিয়া পরিষ্কার করিয়া লয়, যেখানে পোকা মাকড় ডিম ইত্যাদি জীব বা অপবিত্র বস্তু নাই। পরে কিছু কুশ বা ধানের খড় সংগ্রহ করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া, ধুইয়া শুকাইয়া লয়। এই খড় বা কুশ পাতিয়া শয্যা রচনা করে। পরে, সঙ্কল্প করিয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়া তৃণশয্যা গ্রহণ করে। শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে তাহার আত্মীয় কুটুম্বগণ দেহরক্ষা করিবার সঙ্কল্পত্যাগ করিতে নানাপ্রকারে অনুরোধ করিয়া থাকে, কিন্তু একবার সঙ্কল্প করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলে আর ত্যাগ না করিতেই উত্তেজিত করে। কেননা শ্রাবককে এইরূপে শয্যাগ্রহণ করিবার পর আবার ত্যাগ করিলে ধর্ম্মে ও সমাজে চিরজীবন পতিত হইয়া থাকিতে হয়। ক্রমে অন্নজল অভাবে শ্রাবকের শরীর শুষ্ক হইয়া জীবদেহ ত্যাগ করে। এরূপে দেহত্যাগকে সমাধি বলে। জৈনরা এরূপ সমাধিকে অতি সম্মানীয় ও বাঞ্ছনীয় মৃত্যু বিবেচনা করে। আজকাল এরূপ স্বেচ্ছামৃত্যু বা সমাধি বিরল হইলেও মধ্যে মধ্যে দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়। সমাধির সংবাদ পাইলে দেশ দেশান্তরের শ্রাবকেরা দর্শন করিয়া ধন্য হইতে আসে। সিদ্ধার্থ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়ে এক সঙ্গে সমাধিস্থ হইলেন। তখন বর্দ্ধমানের বয়স ২৮।২৯ বৎসর হইবে।

বর্দ্ধমান পূর্ব্বাবধি গৃহত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ছিলেন, কেবল পিতা মাতার সমাধির অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সমাধির পর আর গৃহে থাকিতে চাহিলেন না। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতা মধ্যে গাঢ় প্রীতি ছিল। বর্দ্ধমান অগ্রজের অনুমতি না লইয়া কিছু করিতেন না, তিনি এখন অগ্রজ নন্দীবর্দ্ধনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নন্দীবর্দ্ধন বলিলেন;—"আমি জানি তুমি বাল্যাবস্থা হইতে সংসারে বিরক্ত; কিন্তু এই মাত্র মাতা পিতা উভয়ে সমাধিস্থ হইলেন, আর এই সময়ে তুমি যদি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ কর, তাহা হইলে নিন্দুক সমাজের লোকে বলিবে আমি

তোমার বিষয়ের লোভে তোমাকে কষ্ট দিয়া গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলাম। তুমি আমার অনুরোধে আর এক বৎসর [মতান্তরে দুই বৎসর] গৃহে বাস করিয়া আমাকে এই ভিত্তিহীন দুর্নাম হইতে রক্ষা কর। তাহার পরও যদি তোমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত না হয়, তবে তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই করিও।" বর্দ্ধমান তাহাই স্বীকার করিলেন। জৈন গ্রন্থে আছে যে, এই এক বৎসর কাল তিনি প্রত্যহ এককোটী আট লক্ষ সুবর্ণ দান করিতেন; অর্থাৎ ৩৬০ দিবসে তিনি ৩৮৮, ৮০৩০০, ০০০ সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন। ভাবী তীর্থঙ্করের দান তাঁহার উপযুক্ত হওয়া চাই, সেই কারণে দানের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচরেরা পৃথিবীর সকল প্রোথিত ধন আনিয়া যোগাইয়া থাকেন। এই সময়ে বৈশ্রমনের কুণ্ডলধর, লৌকান্তিক দেবতা ও পঞ্চদশ কর্ম্মভূমির মহার্দ্ধিক দেবতারা সংসারী লগীর মধ্যে সুপ্ত তীর্থঙ্করকে স্তুতি ও জয়গান করিয়া জাগ্রত করিয়া থাকেন। [এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, জৈন শাস্ত্র মতে জম্বুদ্বীপে কর্ম্মভূমি মাত্র তিনটি,—ভারত, আর্য্যাবর্ত্ত ও বিদেহ]

দীক্ষা। নির্দ্ধারিত এক বৎসর অতীত হইলে বর্দ্ধমান জ্যেষ্ঠ সহোদর ও অন্য সকল গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করাই স্থির করিলেন। সেই সময়ে লৌকান্তিক দেবতারা প্রাচীন নিয়ম মত নিম্ন লিখিত শব্দে তীর্থঙ্করের স্তুতি ও জয়গান করিতে লাগিলেন;—"হে জগতের আনন্দদায়ী! তোমার জয় হউক। হে মঙ্গলদায়ী ক্ষত্রকুল বৃষভ, তোমার জয় হউক। হে জগৎ নাথ! জাগ্রত হও, উত্থান কর, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বজীবের হিতকর ধর্ম্ম স্থাপন কর। জগতের সকল জীবের হিত ও কল্যাণ সাধন কর।" ইত্যাদি॥

বীর সংসার প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই [অর্থাৎ বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই] অভোগিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এই অভোগিক জ্ঞান অবধিজ্ঞানাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু প্রায় কাছাকাছি সমান। ভগবান আপন এই জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে তাঁহার নিষ্ক্রমণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি আপন ব্যবহারের রৌপ্য সুবর্ণ ইত্যাদি নানা রত্ন, মণি, মুক্তা প্রবালাদি দুঃখীদের দান করিলেন ও অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা দশমীর দিন, দ্বিপ্রহরের এক যাম পরে, সুব্রত দিবসে, বিজয় মুহূর্ত্তে, চন্দ্রপ্রভা নামক সংস্র সেবক-বাহিত চতুর্দ্দোলে উঠিয়া দেবতা, অসুর, মনুষ্য, আত্মীয়, কুটুম্ব, দেশবাসী সহিত শঙ্খবাদক, বন্দী, স্তুতিকারকগণে পরিবৃত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন। সঙ্গীরা স্তুতি ও জয়গান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"হে জগতের আনন্দদায়ী তোমার জয় হউক, তুমি আপন অসীম জ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিও, শ্রমণের ধর্ম্ম পালন করিও, আপন ও আমাদের প্রধান শত্রু কর্ম্মফলকে তপস্যা দ্বারা জয় করিও। হে জগজ্জয়ী, তুমি কেবল জ্ঞান দ্বারা ত্রিজগৎ জয় করিও। পূর্ব্ব জিনদের প্রদর্শিত মোক্ষলাভ করিও, এবং সকল বাধা সংহার করিও। হে ক্ষত্রিয় সিংহ! তোমার জয় হউক। তুমি বহু দিবস, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু, বহু বৎসরার্দ্ধ, বহু বৎসর ধরিয়া কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিও না। সকল প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া ধর্ম্মপালন করিও।"

বীর এইরূপে বহু দেবতা, সুরাসুর, নাগরিকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কুণ্ড গ্রামের মধ্য দিয়া জ্ঞাতিদের ষণ্ডবন [দিগম্বর মতে সারথি খণ্ড] নামক বনে নির্দ্দিষ্ট অশোক তরু মূলে উপস্থিত হইলেন। তিনি চতুর্দ্দোল ত্যাগ করিয়া একটি পূর্ব্ব প্রস্তুত পাণ্ডুশিলা অর্থাৎ পঞ্চকোণ বিশিষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহাসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া অল্পক্ষণ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন। এই প্রস্তর সিংহাসন খানি এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব দিকে তাহার একটি ভুজ ও পশ্চিম দিকে একটি কোণ ছিল। ইহার পূর্ব্বে তিনি আড়াই দিন নির্জ্জলা উপবাসী ছিলেন। পরে, একে একে আপনার শরীরের সকল অলঙ্কার ও ভূষণ ত্যাগ করিলেন। বৈশ্রমণ দেব [ইন্দ্র] অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত বসন ও ভূষণ গুলি সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং অলঙ্কার গুলি এক খানি বহু মূল্য সুবর্ণ সূত্র গ্রথিত বস্ত্রে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। পরে, বীর দক্ষিণ ও বাম দিকের

মাথার চুল গুলি পাঁচ মুষ্টিতে (১) তুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র চুল গুলি মাটিতে পড়িতে দিলেন না, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি হীরকের বাটীতে রাখিলেন ও ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তাহা ক্ষীরোদ সাগরে লইয়া গেলেন। বীর চুল তুলিয়া মুক্তাত্মা ঈশ্বরগণকে (২) প্রণাম করিলেন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি কখনও পাপ কর্ম্ম করিবেন না। এইরূপে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পবিত্র জীবন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই ক্রিয়া সমস্ত মনুষ্য ও দেব সমাজ চিত্রবৎ নিস্তব্ধ হইয়া দাড়াইয়া দেখিতেছিলেন। প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর দেবরাজের ইঙ্গিতে সকলে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। আবার, পবিত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার সময়ে দেবরাজের আদেশে মনুষ্য ও দেবাসুরেরা নিস্তব্ধ হইল।

গ্রন্থ বিশেষে দীক্ষার সময়ের একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, যখন বীর আপনার সকল ধন, রত্ন, বসন, ভূষণ দান করিলেন, তাহার পর সোমদত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল, "আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, আমাকেও কিছু দান করুন।" তখন তাঁহার কাছে আর কিছুই ছিল না, কেবল দেবরাজ ইন্দ্র দত্ত একটি স্বর্গীয় বসন বা বহির্ব্বাস ছিল। তিনি তাহার অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া সোমদত্তকে দান করিলেন। সোমদত্ত স্বর্গীয় বসন পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল ও আপনার বন্ধু এক তন্তুবায়কে দেখাইল। তাঁতি বলিল, অপরার্দ্ধ সংগ্রহ করিতে পারিলে তোমার একটি সুন্দর অঙ্গাবরক হয়। কিন্তু সোমদত্ত ব্যবসায়ী ভিক্ষুক হইলেও নূতন সন্ন্যাসীর কাছে অপরার্দ্ধ চাহিতে লজ্জিত হইল। সোমদত্ত বীরের কাছে আসিয়া দেখিল তিনি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে কিছু ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে পথ হাঁটিতেছেন; তাঁহার বাহ্যজ্ঞান মোটে নাই ও তাঁহার স্কন্ধ হইতে ইন্দ্রদত্ত বসনের অপরার্দ্ধ খানি ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে। সোমদত্ত তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। যখন স্কন্ধ হইতে বসনটি পড়িয়া গেল, তখন তাহা লইয়া পলাইল। এ গল্পটি বোধ হয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিন্দাকারী কোনও ব্যক্তির রচিত। কেননা আচারাঙ্গ সূত্রের প্রথম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যয়নের প্রথম উদ্দেশ্যের প্রথম ও তৃতীয় গাথাতে এই ইন্দ্রদত্ত বসনের তের মাস পর্য্যন্ত ধারণ করিবার, অথবা ত্যাগ না করিবার কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

শ্বেতাম্বরেরা বলেন, ভগবান মহাবীর এইরূপে সংসার ত্যাগ করিবামাত্র মনঃপর্য্যায় জ্ঞানলাভ করিলেন। এই জ্ঞানের বলে তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় যুক্ত [ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ] সকল জীবের মনের কথা জানিতে পারিলেন। কিন্তু দিগম্বরেরা বলেন তাঁহাকে ঐ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি দীক্ষার পর ছয় মাস কঠোর কায়োৎসর্গ [তপস্যা—কৃচ্ছ্রসাধন] করিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। তিনি এই ছয় মাস একাসনে নিশ্চলভাবে বসিয়া ছিলেন। ছয় মাসের পর তিনি কুলপুর নামক নগরে গিয়াছিলেন। কুলপুরের রাজা কুলাধিপ তাঁহার দুই পাদ প্রক্ষালন করিয়া ক্ষীর [পায়স] খাইতে দিলেন। ইহার পর তিনি বনে প্রবেশ করিয়া দ্বাদশ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিলেন; কিন্তু কোন মতেই সফল হইতে পারিলেন না। তখন মালবদেশের প্রধান নগর (৩) উজ্জয়িনীতে গিয়া সেখানকার মহাশ্মশানে কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করিলেন।

(১) অন্যান্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা দীক্ষার পূর্ব্বে নখ ত্যাগ করিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া চুল ত্যাগ করেন। কিন্তু জৈনেরা শরীরের প্রতি মমতা শূন্যতা প্রমাণ করিতে চুল টানিয়া তুলিয়া ফেলেন। তাহা করিলেও কেবল পাঁচ মুষ্টিতে সব চুল ওঠা সম্ভব বোধ হয় না।

(২) জৈন শাস্ত্র মতে মোক্ষ প্রাপ্ত মুক্তাত্মারাই ঈশ্বর নামে পরিচিত। জগৎ সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বর তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বরের সংখ্যা অনন্ত।

(৩) এখানে হিন্দুদের দেবতা ও দেবী—রুদ্র ও রুদ্রাণী—জৈনমতে তপস্যাতে বিঘ্নকারী "মার" স্বরূপ। সকল দেবতাই তীর্থঙ্করের সেবা ও পূজা করিয়া থাকেন।

এই সময়ে রুদ্র ও রুদ্রাণী তাঁহার তপস্যাতে ব্যাঘাত জন্মাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রলোভনে না ভুলিয়া দ্বিতীয় বার বনে গিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিলেন ও কিছু পরে মনঃপর্য্যায় জ্ঞানলাভ করিলেন।

এই জ্ঞান লাভ করিবার পর তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আপনার শরীরের সেবা করিব না, আমি ধীর ভাবে মনুষ্য দেবতা, ও অন্তজীব দত্ত সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিব।" এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পর, সূর্য্যাস্তের এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তিনি কুমার গ্রামে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আপন দেহের মায়াত্যাগ করিয়া কেবল আত্মচিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দোষশূন্য প্রব্রজ্যা কালে, দোষ রহিত স্থানে বিশ্রাম, মন ও ইন্দ্রিয় শাসন করিয়া সম্বর ত্যাগ ও পবিত্র জীবন যাপন করিয়া নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি তেরমাস কাল পার্শ্বনাথ স্বামী নির্দ্দিষ্ট মতানুযায়ী কৌপীন, বহির্ব্বাস ও কম্বধারী ছিলেন। কিন্তু তাহার পর নিজের সর্ব্বস্বত্যাগের মতস্থাপন করিলেন, ও সেই নিয়ম মতে স্বয়ং বস্ত্রত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নগ্ন থাকিতে লাগিলেন।

জৈনগ্রন্থে উপরি উক্ত ঘটনাকে "দীক্ষা" বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু দীক্ষা অপেক্ষা "গৃহত্যাগ" বলিলেই ঠিক হয়। সকল সম্প্রদায়েই দীক্ষাদাতা গুরুর উপদেশ মত সাধনা করিতে হয়, কিন্তু তীর্থঙ্করের গুরু নাই, তাঁহারা জন্মাবধি পূর্ণ জ্ঞানী, অতএব তাঁহাদের শিক্ষাও নাই দীক্ষাও সম্ভব নহে। তিনি গৃহত্যাগ করিয়া, কাহারও শিষ্য না হইয়া, পার্শ্বনাথস্বামীর স্থাপিত মতানুসারে তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন অথবা আত্মচিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাবকেরা ও জৈন যতিরা রীতিমত গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকেন।

নগ্নতা। মহাবীর স্বামীর নগ্নবাস সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক উঠিয়াছে। কেহ বা ইহাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ অতি উত্তম বলিয়াছেন; আবার কেহ সামাজিক নীতি বিগর্হিত লজ্জাশূন্য পশুবৎ আচরণ বলিয়াছেন। এমন কি পরবর্ত্তীকালে, জৈনরাও দুই সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নগ্নবাসের পক্ষপাতী [অর্থাৎ দিগম্বর সম্প্রদায়ের] সাধু ও সাধ্বীরা নগ্ন থাকেন। কিন্তু কার্য্যতঃ আজকাল নগ্না সাধ্বী ত পরের কথা একটীও নগ্ন সাধু আছেন কিনা সন্দেহ। যে সম্প্রদায় সাধুদের জন্য আড়ম্বরহীন শ্বেতবস্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত। শ্বেতাম্বর সাধু কৌপীন বহির্ব্বাস ইত্যাদি ধারণ করিয়া থাকেন।

যে সময়ে বীর সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে দেশে সাধারণ জৈন সম্প্রদায়ে পার্শ্বনাথস্বামীর মত প্রচলিত ছিল। পার্শ্বনাথ স্বামীর মতে জৈন সাধু অথবা নির্গ্রন্থরা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের মত গৈরিক কৌপীন, বহির্ব্বাস, কন্থা, জলপাত্র ও দণ্ড ধারণ করিতেন। মহাবীরও তেরমাস পর্য্যন্ত ঐরূপ বেশেই ছিলেন, পরে নিজের মতস্থাপন করিয়া দিগম্বর থাকিতে লাগিলেন। কিন্তু আধুনিক দিগম্বরেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন এরূপ ক্রিয়া স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, দীক্ষার সময়ে বীরের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না, পরে জ্ঞান হইলে বস্ত্রত্যাগ করিলেন। কিন্তু তীর্থঙ্কর মাত্রেই পূর্ণ জ্ঞান সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি ভ্রম আরোপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। তাঁহাদের যেমন কোনও প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ জন্মাবধি তাঁহারা ভ্রম করিতে পারেন না। ইহা ছাড়া নিজের নিয়মই পালন করিয়া থাকেন; পরের মতের, এমন কি, পূর্ব্ব তীর্থঙ্করদের মতেরও বশবর্ত্তী হয়েন না।

একজন আধুনিক [সম্ভবতঃ দিগম্বর সম্প্রদায়ের] জৈন লেখক নগ্নবাস সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভগবান যখন সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং সাধুরাও ত্যাগ করিয়া থাকেন, তখন "সর্ব্বস্ব"র মধ্যে লজ্জাও

ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব সাধুদেরও সেইরূপ করা উচিত। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কোনও একটি দ্রব্য সম্বন্ধে পোষণ করিলে তাহার সর্ব্বস্বত্যাগ হয় না। এখানে লজ্জাকে "দ্রব্য" মধ্যে গণনা না করিলেও বস্ত্রকে গণনা করা যাইতে পারে। সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া লজ্জা অথবা লজ্জা আবরক বস্ত্র ধারণ করিলে তাহার অন্যায় আচরণ করা হয়। সাধু যখন সুখ দুঃখ, ক্লেশ, মায়া, মোহ, রাগাদি সকল অবস্থাই ত্যাগ করিলেন, তখন লজ্জা পোষণ করিবেন কেন? তিনি বাইবেলের গল্পের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, যতদিন আদম ও ঈভ পবিত্র ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের নগ্নতা জ্ঞান বা লজ্জা ছিলনা। নগ্নতাজ্ঞান হইতেই, অর্থাৎ অপবিত্র হইতেই তাঁহারা আচ্ছাদিত হইলেন। অপবিত্র হইয়া স্বর্গ হইতে পতন হইল। অতএব নগ্নতাই পবিত্র, আচ্ছাদনই অপবিত্র। [তর্কশাস্ত্র মতে এ যুক্তি ন্যায় কি অন্যায় হইল সুধীবৃন্দ তাহার বিচার করিবেন।] তিনি আরও বলিয়াছেন যে বাহ্যজ্ঞান হীন সাধুই নগ্ন থাকিবার অধিকারী, যাহার আপনাকে নগ্ন বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহার নগ্ন থাকিবার অধিকারই নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ এরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন সাধু দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অন্যস্থানে বলিয়াছেন যে নগ্নবাস না করিলে মোক্ষলাভ হয় না, অতএব মোক্ষলাভের জন্য সাধুকে এত বিভোর হইয়া আত্মচিন্তা করিতে হইবে যে, বহির্জ্জগতের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না, তবে সে মোক্ষলাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। তাঁহার কথা সত্য হইলে ঐরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন সাধু ছাড়া শ্রাবকেরাও মোক্ষাধিকারী নহেন। অর্থাৎ শ্রাবকেরা নগ্ন সাধু সঙ্গ করিয়া মোক্ষের পথে অগ্রসর হইবেন মাত্র। ভবিষ্যৎ জীবনে স্বয়ং নগ্ন থাকিয়া মোক্ষলাভ করিবেন। কিন্তু জৈন ধর্ম্মমত এত সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হয় না। কোন কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমত বলে যে, কেবল তাহাদের মতের লোকদেরই মুক্তি সম্ভব, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মুক্তি সম্ভব নহে। কিন্তু জৈনাচার্য্যেরা বলেন :—

নাশাম্বরত্বে ন সিতাম্বরত্বে ন তর্কবাদেন চ তত্ত্ববাদে।
ন পক্ষসেবাশ্রয়ণেন মুক্তিঃ কষায় মুক্তিঃ কিলমুক্তিরেব॥
[উপদেশ তরঙ্গিণী]

অর্থাৎ মোক্ষ দিগম্বর অবস্থাতে নাই, শ্বেতাম্বর অবস্থাতেও নাই, তর্কজালেও নাই, তত্ত্ববাদেও নাই, স্বপক্ষ সমর্থনেও নাই। মোক্ষ কেবলমাত্র কষায় (ক্রোধ, মান, মায়া, ও লোভ) হইতে মুক্তিতেই আছে।

যদিও মহাবীর স্বামী স্বয়ং নগ্ন থাকিতেন, ও সাধুদের নগ্নবাসই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্থান বিশেষে আচ্ছাদনের অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহার গণধর অর্থাৎ প্রধান শিষ্যগণ মধ্যে কেবল মাত্র দুই জন তাঁহার নির্ব্বাণের সময়ে ও পরে জীবিত ছিলেন। এই দুইজন মধ্যে কেবল মাত্র সুধর্ম্মন শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। এই সুধর্ম্মন মহাবীর স্বামীর মুখে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা আপন শিষ্য জম্বুস্বামীকে বলিয়াছিলেন। সেই উপদেশাবলীর কতকগুলি আচারঙ্গ সূত্র নামে প্রসিদ্ধ। তাহার এক স্থানে [স্কন্ধ ১, অধ্যয়ন ৭, উদ্দেশ ৭] তিনি বলিয়াছেন :—

"অচেলকের [নগ্ন সাধুর] মনে যদি এইরূপ চিন্তা উদিত হয় যে আমি শরীরে তৃণ ও কণ্টকের আঘাত, শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ, মাছি মশা ও অন্য পোকা মাকড়ের দংশন ও নানা প্রকার শারীরিক কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আমার গোপনীয় অঙ্গের আচ্ছাদন ত্যাগ করিতে পারি না, তাহা হইলে সে আপন গোপনীয় অঙ্গ একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে পারে।"

টীকাকারেরা লিখিয়াছেন, এই আচ্ছাদন বস্ত্রের নাম "কটিবন্ধন" অথবা "চোলপট্টক"। ইহা সাধুর হাতের এক হাত লম্বা ও চার অঙ্গুলী চওড়া হইতে পারে॥

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়।

এককালে জৈন সাধু মাত্রেই দিগম্বর ছিলেন। কোন্ কালে ও কিরূপে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল

সে সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত দুইটি সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তবে কোনটি ঐতিহাসিক সত্য, বলা যায় না। প্রথম—মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের সময়ে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তখন রাজার গুরু ২৪০০০ সাধু সহিত পাটলীপুত্রে ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে এত সাধুর ভিক্ষা সংগ্রহ অসম্ভব হওয়াতে রাজগুরু ১২০০০ সাধু লইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন ও অপরার্দ্ধকে উত্তর ভারতে নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকিতে অনুমতি দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত গুরুর সহিত নগ্ন সাধুরূপে দক্ষিণে গিয়াছিলেন। আধুনিক মহীশূর রাজ্যে শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে তাঁহার গুরু নির্ব্বাণলাভ করিলেন। সেখানে তাঁহার সমাধি ও চন্দ্রগুপ্তের তপস্যা কুটীর এখনও আছে। দ্বাদশ বর্ষ পরে গুরুর প্রধান শিষ্য সাধুদের লইয়া উত্তর ভারতে ফিরিয়া আসিলেন ও দেখিলেন উত্তরের সাধুরা শ্বেত বস্ত্র ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উত্তরের সাধুরা বলিলেন আমাদের ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিতে হইত, আমাদের অনেক শিষ্য হইয়াছে, তাহাদের রমণীদের উপদেশ দিতে হইত, অতএব বস্ত্র ধারণ না করিলে ধর্ম্মপ্রচার অসম্ভব হয় সেই জন্য এইরূপ করিয়াছি। দিগম্বর সাধুরা বস্ত্র ধারণ করিতে অস্বীকার করিলেন; অতএব দুই সম্প্রদায় হইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ—এক জৈন ধর্ম্মাবলম্বিনী রাজকুমারীর গুজরাটের এক শৈব রাজার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। রাণীর পিতৃকুলের গুরু অনেকগুলি সাধুর সহিত রাজধানীর নিকট দিয়া যাইতেছেন সংবাদ পাইয়া রাজা আপনার পাত্র মিত্রের সহিত অভ্যর্থনা করিতে গেলেন, কিন্তু উলঙ্গ দেখিয়া ঘৃণায় ফিরিয়া আসিলেন। রাণী সাধুদের শ্বেতবস্ত্র পাঠাইয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন ও বলিয়া পাঠাইলেন, আপনারা নগরে না প্রবেশ করিয়া চলিয়া গেলে লোকেরা জৈন ধর্ম্মকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। সাধুরা সেই অবধি শ্বেত বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

নগবালা

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেমের চিত্র।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে যাহা বিবৃত করিলাম, তাহাতে উদ্যান, পুষ্প, সৌরভ, সঙ্গীতে প্রেমের রাজ্য রচিত ছিল বটে এবং সেই প্রেমরাজ্যে যুবক যুবতীর অবিলম্বিত আলিঙ্গন ও চুম্বন ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বোধ হয় আমরা আমাদের প্রেমিক পাঠকগণের মনস্তুষ্টি করিতে পারি নাই; কেন না তাহা নিছক প্রেমচিত্র ছিল; অনাবিল প্রেম অর্থের নিক্কণ শোনে না; তাহা সর্ব্বস্ব দানে চির দরিদ্র; তাহা ভাবে না যে অর্থে কোনও সুখলাভ হইবে।

আমরা প্রেমচিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া একবার অকৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু আমাদের অধ্যবসায় আছে। আমরা আবার চেষ্টা করিয়া দেখিব যথার্থ প্রেমচিত্র আঁকিতে পারি কি না।—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।"

রমেশ ও জ্যোতিঃপ্রকাশ উদ্যান মধ্যে সেই বেঞ্চের

দেখিয়া উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া আপন আপন বাটীর দিকে ফিরিল। জ্যোতিঃপ্রকাশের পকেটে পয়সা ছিল, সে ট্রাম গাড়ীতে উঠিল। বলশালী রমেশ পদব্রজে চলিল।

রমেশের ক্ষুদ্র সংসারে আর কেহ ছিল না; কেবল মা ও স্ত্রী ছিল। পাঁচ বৎসর আগে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল; তদবধি সে দরিদ্রতায় নিষ্পেষিত হইতেছিল। পিতা সওদাগরি আফিসে সামান্ত বেতনের কেরাণী ছিলেন। সামান্ত পৈতৃক গৃহ ব্যতীত স্ত্রী পুত্রের জন্ত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিহীন রমেশও অধিক বেতনের চাকুরী লাভ করিতে পারে নাই। সে দালালের আফিসে মুহুরীগিরি করিয়া যে বিশ টাকা বেতন পাইত, তাহাতে কলিকাতার মত স্থানে থাকিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কত শক্ত কায তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু রমেশ এই শক্ত কায হাসিমুখে নির্ব্বাহ করিত।

ভগবান দরিদ্র রমেশচন্দ্রকে দুইটি অপার্থিব সম্পদের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার অগাধ মাতৃভক্তি ছিল, আর প্রণয়িনী পত্নীর জন্ত তাহার সরলহৃদয়ে অহরহঃ যে প্রেম সঞ্চারিত হইত, তাহার তুলনা এই পৃথিবীতে নাই। এই দুই সম্পদে সে দারিদ্র্যের কৃষ্ণচ্ছায়াকে চিরোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার সামান্ত বাটীতে সর্ব্বদা ভক্তি ও প্রেমের যে বন্তা বহিত, তাহাতে দারিদ্র্যের সমস্ত মলিনতা বিধৌত হইয়া যাইত; তাহাদের সামান্ত খাদ্য সামগ্রীকে মধুর রসে প্লাবিত করিয়া দিত।

এই ভক্তি ও প্রেম বক্ষে বহন করিয়া, সে বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল, "মা"।

গর্ভধারিণী ব্যতীত অন্তা স্ত্রীলোককে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলে, তাহার হৃদয়েও পরমানন্দের সঞ্চার হয়। আপন গর্ভধারিণীকে পুত্র যখন মা বলিয়া সম্বোধন করে, তখন তাহার হৃদয় মধ্যে যে আনন্দের ঢেউ উঠে, যে অপার্থিব সুধারাশি ক্ষরিত হয়, যে মহা আশীষবাণী বক্ষ মধ্যে গুঞ্জন করিয়া উঠে, তাহার তুলনা ত স্বর্গেও নাই।

মাতা সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া তুলসীতলায় ঠাকুরের নিকট পুত্রের জন্ত মঙ্গল কামনা করিতেছিলেন। পুত্রের সুধাপূর্ণ আহ্বান শুনিয়া পুত্রের মুখ দেখিবার জন্ত প্রদীপ হস্তে ছুটিয়া আসিলেন। পুত্রকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিয়া ডাকিলেন, "বৌমা একখানা পাখা নিয়ে একবার এস ত মা।"

বৌমা পাখা লইয়া পূর্ব্বেই নিভৃতে হাজির ছিল। এক্ষণে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর আদেশ পাইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল এবং স্বামীকে বীজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বধূর নাম মালতী। মালতী শ্যামবর্ণা যুবতী; শ্যামা মালতী লতার মতই স্নিগ্ধ। মালতী শ্যামবর্ণা হইলেও রূপসী। যাহারা সৌন্দর্য্যের উপাসক তাহারা সহজেই বুঝিবে যে, সুগৌর গাত্রকান্তিই সর্ব্বদা রমণীর সৌন্দর্য্যের নিদর্শন নহে; বুঝিবে যে পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য এবং অম্লান মনস্তুষ্টিই রমণীগণকে মধুরা করিয়া থাকে। মালতীর এই দুই সম্পদই ছিল। মূল্যবান উপাদেয় আহার ধনিগণকে যে স্বাস্থ্যদান করিতে পারে না, তাহা দরিদ্রা মালতী তাহার সামান্ত আহারেই লাভ করিয়াছিল, তাহার উপর শাশুড়ীর যত্নে, স্বামীর আদরে তাহার মনস্তুষ্টিরও অভাব ছিল না।

মালতী শাশুড়ীর নিকট শিক্ষা করিয়াছিল যে স্বামী স্ত্রীলোকের পক্ষে দেবতা। দেবদর্শন করিতে যাইবার সময় যেমন উৎসব বসন পরিতে হয়, স্বামীকে দর্শন করিতে যাইবার সময়, তেমনই উৎসব বসন পরিয়া যাইতে হয়; আনন্দময়ের মন্দিরে যেমন হাসিমুখে যাইতে হয় তেমনই হাসিমুখে স্বামীকে দেখিতে হয়। দরিদ্রা মালতীর উৎসব বসন ছিল না। কিন্তু সে সর্ব্বদা পরিমার্জ্জিত গাত্রে নির্ম্মল পরিষ্কৃত পরিধেয় পরিয়া বিমল স্নিগ্ধ রক্তাধরে মধুর হাসি ভরিয়া স্বামীর কাছে আসিত। কদাচ কর্দ্দমলিপ্ত বা তৈল হরিদ্রাদি রন্ধনোপকরণলিপ্ত বসনে তাহার প্রাণের দেবতার কাছে আসিত না।

রমেশ পরিতৃপ্ত নয়নে সেই ব্যজনরতা নির্ম্মলার সস্মিত মুখ দেখিল, অবগুণ্ঠন মধ্যে, ফানুস মধ্যে দীপ শিখার ন্তায় তাহার প্রেমোজ্জ্বল বিশাল নয়নের দীপ্তি

দেখিল; মধুর রক্তাধরে আনন্দের চিরোজ্জ্বল প্রভা নিরীক্ষণ করিল। মহা প্রেমানন্দে তাহার সরল হৃদয় ভরিয়া গেল—সে দারিদ্র্যের সব গ্লানি ভুলিয়া গেল।

কিন্তু রমেশ দরিদ্র হইলেও মালতী তাহাদের সংসারে কোনও অভাব দেখিতে পাইত না। তাহার একদিনের বাক্য শুনিলে ইহা প্রতীতি হইবে। একদিন তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী পুত্রের কোন সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, মালতীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি দেখে নিও আমার আশীর্ব্বাদে রমেশের খুব ভাল হবে।" এই কথা শুনিয়া মালতী লজ্জাবনত মুখে উত্তর করিয়াছিল, "আর ক ভাল হবে মা? মায়ের সেবায় উনি যে দেবতার চেয়ে বড় হয়েছেন, আমাদের ত কোন অভাব কোন অসুখ নেই।"

অবান্তর কথায় আমরা গল্পের সূত্র হারাইয়া ফেলিতেছি। এক্ষণে ও সব কথা ত্যাগ করিয়া মাতা পুত্রকে নিকটে পাইয়া কি বলিলেন, আমাদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে।

মাতা বধূকে পুত্রের ব্যজনে নিযুক্ত রাখিয়া কহিলেন, "তুই কোথায় গিয়েছিলি? এ যে ঘামে নেয়ে উঠেছিস।"

রমেশ বলিল, "আজ মা কোম্পানীর বাগানে জ্যোতিঃ প্রকাশের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে আসবার সময় জ্যোতিঃপ্রকাশ ট্রামগাড়ীতে এলো। আমার পকেটে পয়সা ছিল না তাই এইটুকু রাস্তা হেঁটে এসেছি। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, তোমরা ভাববে বলে একটু জোরে চলে এসেছি, তাই ঘেমে গেছি।"

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাস্তায় বেরুবার সময় কিছু পয়সা নিয়ে বেরুস না কেন?"

রমেশ কহিল, "আগে আগে বেরুতাম। কিন্তু দেখেছি, পকেটে পয়সা থাকলেই খরচ হয়ে যায়। রাস্তার ধারে ফল মূলটা দেখতে পেলে লোভ সামলাতে পারিনে, কিনে ফেলি। শেষে মাসের শেষে টানাটানি পড়ে যায়।"

মাতা বুঝিলেন পুত্র কাহার জন্য ফলমূল ক্রয় করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। বুঝিয়া মাতৃভক্ত পুত্রকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে বলিলেন, "এখন উপরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নাও গে। বৌমা, যাও ত মা ভিজে জামাটা খুলে নিয়ো।"

মালতীর ব্যজন বড় মিষ্ট। প্রেমসিক্ত হাতের গুণে পাখার বাতাস কি এত মিষ্ট এত স্নিগ্ধ হইয়াছিল? অথবা সে পাখাখানা পূর্ব্ব হইতে শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়াছিল? রমেশ সেই বাতাসে বড় পরিতৃপ্ত হইতেছিল; তাহা যেন মালতীর প্রেমপূর্ণ আদরের ন্যায়, অথবা দেবতার আশীর্ব্বাদ বৃষ্টির ন্যায় তাহার গাত্রে বর্ষিত হইতেছিল। এক্ষণে মাতার আদেশ পাইয়া সে একটু বিশ্রাম লাভের জন্য উপরে উঠিল।

উপরে দুইটি কক্ষ ছিল। একটিতে মাতার জন্য শয্যা রচিত ছিল। অন্যখানিতে মেঝের উপর রমেশের শয্যা বিস্তৃত ছিল। উভয় শয্যাই মালতীর গুণে পরিপাটি ও নির্ম্মল। কক্ষটিতে দুই একটি পেটিক ও দারু নির্ম্মিত বাক্স ছিল। রমেশ উপরে উঠিয়া অন্ধকারে আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিল।

মালতী আর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া উহা হস্তে লইয়া রমেশের অনুসরণ করিয়াছিল। সে রমেশের কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজের হাস্যোজ্জ্বল মাধুরীতে ও দীপালোকে কক্ষটি আলোকিত করিল। হস্তস্থিত মৃৎপ্রদীপটি মার্জ্জিত স্বর্ণের ন্যায় একটি পিত্তল নির্ম্মিত পিলসুজের রাখিল। হস্তাঙ্গুলিপ্ত তৈল ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে মুছিল। রক্তাভ পদতলের ধূলি একটি ছিন্ন চটে ঝাড়িল। তাহার পর রমেশের পায়ের কাছে শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিল, যেন মূর্ত্তিমতী হাসি আসিয়া রমেশের নয়নাগ্রে বিরাজিত হইল।

মালতী রমেশের জামার দিকে তাকাইয়া বলিল, "তোমার জামাটা খুলে আমার হাতে দাও; এখন বাইরে হাওয়ায় শুকুতে দিই, কাল দুপুর বেলা ওটা সাবান দিয়ে কেচে দেবো এখন।"

রমেশ বলিল, "কাল দুপুর বেলা? কাল আমি আফিস যাব কি পরে?"

মালতী। কেন তোমার আর একটা জামা আছে।

রমেশ। সেটা পরবার মত নেই, ছিঁড়ে গেছে।

মালতী। ছেঁড়ে নি, সেলাই খসে গিয়েছিল, তা আমি সেরে কেচে তুলে রেখেছি। তোমাকে এনে দেখাচ্ছি, দেখ যদি সেটাতে না চলে তাহলে এই জামাটা আজ রাত্রেই কেচে দেব।

রমেশ। তা আর কায নেই। তাহলে যে আমার কাছে আসতে তোমার অনেক দেরী হয়ে যাবে।

মালতী হাসিল, সে হাসিতে প্রেমরাশি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কহিল, "তা না হয় একটু দেরী হল। কিন্তু জামা কাচতে হলে কর্শা হ'ল কি না দেখবার জন্তে প্রদীপটা নীচে নিয়ে যেতে হবে, তোমাকে খানিকক্ষণ অন্ধকারে থাকতে হবে।"

রমেশ বলিল, "তুমিও থাকবে না—আবার প্রদীপটাও থাকবে না? এ যে অমাবস্যার আকাশে মেঘের ঘনঘটা হবে! না না তোমার রাত জেগে জামা কাচতে হবে না; আমি একলাটি অন্ধকারে থাকতে পারব না। তার চেয়ে আমি সেই ছেঁড়া জামাটা পরেই কাল আফিসে যাব।"

মালতী তাহার অনুপস্থিতি আশঙ্কায় স্বামীকে শঙ্কিত দেখিয়া মনে মনে অতিশয় আনন্দিতা হইল, প্রকাশ্যে একটু হাসিল মাত্র। সেই মৃদু হাসি দেখিয়া রমেশ হৃদয় মধ্যে অনুভব করিল যে, বুঝি সেই স্নিগ্ধ হাসিতে ঘনঘটাকীর্ণ অমাবস্যার আকাশও জ্যোৎস্নারাশিতে ভরিয়া যায়। স্বামীকে সেই অনুভূতির মধ্যে রাখিয়া মালতী হাসিমুখে বলিল, "পুরাণ জামাটা পরা চলবে; আমি বরং এনে দেখাই।" এই বলিয়া সে রমেশের আদরমাখা হস্তের আকর্ষণ হইতে আপন কোকনদবৎ করপল্লব মুক্ত করিয়া, সত্বর পেটক খুলিয়া একটি অমল জামা রমেশের হস্তে আনিয়া দিল।

রমেশ জামা দেখিয়া বুঝিল যে, একমাস কাল আর একটি জামা ক্রয়ের ব্যয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে। ইহাতে সে হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়া পত্নীকে প্রশংসমান নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "বাঃ, এযে একেবারে নূতন জামা হয়েছে!"

প্রীতিতে মালতীর বক্ষ ভরিয়া গেল। কিন্তু মুখে সে কোনও কথা বলিল না।

রমেশ আবার তাহার করতল আপন করতল মধ্যে গ্রহণ করিয়া বলিল, "এখন আমার ভাবনা আর নেই। এখন তুমি একটু বস।"

মালতী বসিয়া বলিল, "এস তোমাকে আর একটু বাতাস করি"

রমেশ বলিল, "না, না, বাতাস আর করতে হবে না! তুমি শুধু বস। আমি তোমাকে দেখি; তোমাকে দেখলে আমার গ্রীষ্ম থাকে না।"

বাস্তবিক মালতীর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিলে রমেশের গ্রীষ্ম থাকিত না; তাহার হাসিমাখা মুখের দিকে তাকাইলে তাহার ক্ষুধা থাকিত না। সে একাই সমস্ত পরিতৃপ্তি আনিয়া দিত। শীতের শীতল দিনে দরিদ্র রমেশের পক্ষে সে ফ্রিকেট ফ্লানালের কায করিত, নিদাঘের তপ্ত দিনে সুশীতল মলয়মারুতের কায করিত।

দুইজনে দুইজনকে দেখিল; দেখিতে দেখিতে যেন তাহারা উভয়ের সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া গেল। উভয়ে উভয়ের মধুর কথা শুনিল, শুনিতে শুনিতে যেন তাহাদের কর্ণ মধুরতায় ভরিয়া গেল। কতক্ষণ পরে রমেশ চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "মা যে একলা নীচে রয়েছেন।"

মালতী ধীরে ধীরে বলিল, "হাঁ, এতক্ষণ মালা জপে ছিলেন। এইবার বোধ হয় মালা জপা হয়ে গেছে। এইবার আমি নীচে যাই, কেমন? রান্নাবান্নার যোগাড় দেখি গে।"

রমেশ কহিল, "চল, আমিও নীচে যাই। সেখানে মার সঙ্গে গল্প করব; আর তুমি রাঁধবে, তোমার চুড়ির টুন টুন শব্দ শুনবো। বড়লোকেরা শুনেছি, সন্ধ্যার সময় গল্প করে আর গান শোনে। আমিও আজ বড় লোক হব, মার সঙ্গে গল্প করব, আর তোমার চুড়ির সঙ্গীত শুনব।"

স্বামীর উক্তিতে মালতী প্রীতা হইয়াছিল; কিন্তু সে মুখে কেবল বলিল, "যাও ঠাট্টা করতে হবে না।" এই বলিয়া সে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট নিয়ে চলিয়া গেল।

বলাবাহুল্য রমেশ তাহার পশ্চাতে আসিয়া মাতার সহিত গল্প করিয়াছিল এবং পত্নীর চুড়ির টুন টুন সঙ্গীতও শুনিয়াছিল।

কিন্তু আমরা এ কি করিতেছি? এই কি মধুর প্রেমের চির রঙ্গিন চিত্র হইল? ইহাতে কোকিল কূজিত সরোবর শোভিত মধুকর গুঞ্জিত পুষ্পোদ্যান কৈ? ইহাতে রসিক যুবক যুবতীর প্রেমরসসিঞ্চিত মধুর বাক্য বিন্যাস কৈ? ইহাতে ভুজঙ্গ অথবা পুষ্পমালা নিন্দিত বাহুর কোমল বন্ধন কৈ? ইহাতে চঞ্চল তড়িত্তুল্য চকিত কটাক্ষ কৈ? যুবজনের চিরবাঞ্ছিত মধুরস-সিঞ্চিত কোমল রক্তাধরের চুম্বন কৈ? তা ছাড়া গোড়ায় গলদ;—নায়িকা যে স্বকীয়া! পরকীয়া না হইলে আবার প্রেম?—ছোঃ। ছি ছি আমরা ঠাকুর গড়িতে বাঁদর গড়িলাম। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও। আমরা যত্ন করিয়াছিলাম; কিন্তু এই দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ বয়সে এই কম্পিত হস্ত লইয়া তোমাদের অভিলষিত প্রেমচিত্র আঁকিতে পারি নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নাবালিকা বধূ।

জ্যোতিঃপ্রকাশ সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিয়া, আদ্দির পাঞ্জাবী আবৃত বক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতির্ম্ময় আলেখ্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিল; এবং বহির্ব্বাটীর কক্ষটিতে মলিন মাদুরের উপর, জীর্ণ তক্তাপোষে শুইয়া পড়িয়া তাহার ধ্যানে আপনাকে নিযুক্ত রাখিল। আহা! রমণীর এত রূপ সে ত আগে কখনও কোথায় নয়ন-গোচর করে নাই। জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপাগ্নির প্রবল জ্যোতিতে পৃথিবীর লোক দিশাহারা হইয়া যায়; সেই রূপাগ্নির তাপে, বোধহয়, গৌরীশঙ্করের মাথার চির-সংহত তুষাররাশিও গলিয়া যায়। সেই জ্যোতিঃ সেই তাপ হৃদয়ে পুরিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ কেমন করিয়া স্থির হইয়া থাকিবে? সে কেবলই অস্থির চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল,—এই সুষমাময় অবয়ব কি প্রসূনদলের লালিত্য দিয়া রচিত হইয়াছিল? অথবা, স্বর্গের কোনও অপ্সরী সৌন্দর্য্যের লীলা দেখাইবার জন্য মর্ত্তলোকে নামিয়া আসিল?

কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপের ধ্যান করিতেছিল কেন? সে কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে? জ্যোতির্ম্ময়ী কি জাতি, বা অন্যপ্রকারে বিবাহযোগ্যা কিনা, সে এই সকল বিবরণ ত কিছুই জানে না। সে এ সকল কিছুই জানিতে চাহে না; সে জানিত, প্রেমের জাতিভেদ নাই; আর অন্য প্রকারের বাধা অতিক্রম করিতে যথার্থ প্রেম কখনই পরাঙ্মুখ হয় না। সে সেই প্রেমাবেগ কোন ক্রমেই সম্বরণ করিতে পারিবে না; সে জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিবেই;—স্বয়ং হিমালয় তাহার বিবাহ-পথে বাধা হইয়া দাড়াইলেও, তাহার প্রচণ্ড প্রেমের অমিত বেগ, ডিনামাইটের মত, সে বাধা চূর্ণ করিয়া, ধূলির আকারে ব্যোমপথে উড়াইয়া দিবে; স্বয়ং ভারতসাগর আসিয়া, যদি তাহার বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়, তবে,—সে বাপমার একপুত্র, প্রাণের ভয়ে কখন জলে নামিয়া সন্তরণ শিক্ষা করে নাই; কাযেই সে সাঁতরাইয়া ভারতজলধি পার হইতে পারিবে না; কিন্তু,—সে রুদ্ধপ্রেম হৃদয় হইতে এমন তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির করিবে যে, তাহার তাপে মহাসমুদ্রের সমুদায় লবণাম্বু বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। সে অন্ধকার ঘরে, মলিন মাদুরের উপর শুইয়া, দেবতাগণকে সাক্ষী করিয়া সত্যই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, যেমন করিয়া হউক, সে সুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিবেই। কি উপায়ে সে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে, সে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। প্রথম বাধা.........

সে একটা মহা লজ্জার কথা। তাহা ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিবার নয়; কিন্তু না বলিলেও আমাদের এই আখ্যায়িকা অঙ্গহীন হইবে। তাই জনান্তিকে তোমাদের কর্ণের গোপন গহ্বরে অত্যন্ত চুপি চুপি বলিব।

সেই মর্ম্মান্তিক লজ্জার কথাটা এই। প্রায় চারি

বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ যখন শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, সে তখন এক পল্লীগ্রামবাসিনী, অশিক্ষিতা, নোলকপরা, একাদশবর্ষীয়া, নাবালিকা বালিকাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু সে লজ্জার কথা, সে, রমেশ প্রভৃতি তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সমাজেও প্রকাশ করে নাই।— কৃষ্ণমানা একাদশবর্ষীয়া বালিকাকে, তাহার মত উচ্চশিক্ষিত, চশমালঙ্কৃত যুবক বিবাহ করিয়াছে, এ কথা জানিতে পারিলেও যে বন্ধুসমাজ ছি-ছি-কার করিবে!

এই বিবাহটা এইরূপে ঘটিয়াছিল। পশ্বাদির মৃতদেহ দেখিলে, গৃধ্রগণ যেমন ছুটিয়া আসিয়া তাহার উপর পতিত হয়, সংবাদপত্র পাঠ করিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ বি, এ, সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে এই শুভসংবাদ অবগত হইয়া কন্যা-অভিভাবকগণের লোলুপ দৃষ্টি তেমনই তাহার উপর পতিত হইল। অনেক লোকের প্রস্তাবের পর, একজনের প্রস্তাব রামপ্রাণ বাবুর মনোনীত হইল। জ্যোতিঃপ্রকাশের মাতাও একটি নোলক পরা টুকটুকে পুত্রবধূ পাইবার জন্ত, এবং তদ্দ্বারা আপন অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিবার জন্ত অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য শিক্ষিত জ্যোতিঃপ্রকাশের এরূপ প্রেমহীন বিবাহে আদৌ কোনও উৎসাহ ছিল না; এবং প্রথমে সে বিবাহ করিতে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছিল। রামপ্রাণবাবুও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ক্ষতি হইবে, আশঙ্কা করিয়া প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। অবশেষে এই সুবিধাজনক বিবাহ প্রস্তাব পাইয়া সহজেই রাজি হইলেন। পল্লীগ্রামের এক হাবভাব চাতুরী বিহীনা, অপরিণতবয়স্কা, বালিকা বধূ পাইয়া ভাবিলেন, বধূর বয়স অল্প, বিশেষতঃ এক্ষণে সে পিত্রালয়ে থাকিবে, সুতরাং শ্রীমানের পড়াশুনার কোনও ক্ষতি হইবে না; অধিকন্তু, যৌতুক বাবদ চারি হাজার টাকা নগদ পাওয়ায় পুত্রের এম, এ,—বি, এল, পড়িবার সমূহ ব্যয় তাহা হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। পুস্তকাদি ক্রয় করিবার জন্ত, এবং সোনার হাত ঘড়ী ও হীরকাঙ্গুরীয়, স্বর্ণবোতাম, চশমা, পাঞ্জাবী, লপেটা, রুমাল, এসেন্স সিগারেট্ প্রভৃতি ক্রয় জন্ত, এবং বন্ধুবর্গকে চপ্ কাটলেট ইত্যাদি দ্রব্য খাওয়াইবার জন্য, নগদ যৌতুক হইতে, হাজার টাকা প্রাপ্ত হওয়ায়, শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রকাশও আর শুভবিবাহে কোনও আপত্তি করে নাই।

এইরূপ চারিবৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিঃপ্রকাশের বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপে যৌতুকের অর্থের কিয়দংশ সে পিতার নিকট উৎকোচ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, নিজের উৎকট সখ মিটাইল; বন্ধুবর্গের রসনা-তৃপ্ত জন্ত উক্ত অজানিত দ্রব্যের ভোজনাগারে ব্যয় করিল, সিগারেট ফুকিল, গন্ধ উড়াইল; এইরূপে কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকের কষ্ট-সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ উদারাময়ে ও সিগারেটের ধূমে পরিণত হইল। কিন্তু তাহার বন্ধুবর্গের মধ্যে একজনও ঘুণাক্ষরে জানিল না যে, জ্যোতিঃপ্রকাশের বিবাহ হইয়াছে।

শুধু বিবাহই হয় নাই। কলেজ বন্ধ থাকিলে জ্যেষ্ঠ শ্যালকের সাদর আহ্বানে, সে মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে যাইয়া জামাতার মহা আদর লাভ করিয়াছে। আর—আর পত্নীর প্রেম! তাহা কি লাভ করে নাই? তোমরা বিস্মিত হইও না, আমরা বলিব, হাঁ সে পত্নীপ্রেমও লাভ করিয়াছিল। তোমরা অবিশ্বাস করিলেও, এখনও আমাদের এই পুণ্য দেশে পল্লীগ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বালিকাগণ, এগার বার বৎসরেই "বর"কে ভালবাসিতে, যত্ন করিতে, ও ভক্তি করিতে পারে। এই ভালবাসা, এই যত্ন, এবং এই ভক্তি মাতৃগর্ভ হইতে তাহাদের রক্তে মিশিয়া থাকে।

যে বধূর সহিত জ্যোতিঃপ্রকাশের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার নাম নগবালা। বিবাহের পরেই একদিন সন্ধ্যার পর নগবালা ঠাকুরমার নিকট শুইয়া ছিল। নানা কথার মধ্যে ঠাকুরমা তাহাকে প্রশ্ন করিলেন যে, বরকে তাহার পছন্দ হইয়াছে কিনা? এই প্রশ্ন শুনিয়া নগবালা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল; কিন্তু ঠাকুরমার কাণের কাছে তাহার লজ্জারক্ত নোলক

পরা মুখখানি আনিয়া চুপি চুপি বলিয়াছিল, 'হাঁ, খুব পছন্দ হ'য়েছে।' পছন্দ হইবারই কথা;—এ পছন্দ স্বামীর গুণের উপর নির্ভর করে না; ইহা রূপজ মোহ নহে; ইহা যৌবন সুলভ আকর্ষণও নহে; ইহা হিন্দুবালিকার জন্মগত সংস্কার।

জ্যোতিঃপ্রকাশও কি নগবালাকে সেই বয়সে ভাল-বাসিয়াছিল? কেমন করিয়া বাসিবে? সে তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া চাহিয়াও দেখে নাই, বধূ সুরূপা কি কুরূপা।—সৌন্দর্য্যহীনা, অশিক্ষিতা, একাদশ বর্ষীয়া, নাবালিকা বালিকাকে কি শিক্ষিত যুবক তাহার চশমালঙ্কৃত চক্ষুদ্বারা চাহিয়া দেখে? সে মুখ ত চাহিয়া দেখিবার সামগ্রী নহে।

কিন্তু এখন ত নগবালা আর একাদশ বর্ষীয়া বালিকা নহে। এক্ষণে সে পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী; বিধাতা তাহার দেহপটে যৌবনের রং ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে নগবালার পছন্দটা, জ্বাল দেওয়া দুধের মত, ঘন হইয়া গাঢ় প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার স্ফুটোনোন্মুখ যৌবন জ্যোতিঃপ্রকাশের দেখিবার সামগ্রী হইয়াছিল; এবং সংপ্রতি শ্বশুরালয়ে যাইয়া, তাহাকে সে মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছিল; এবং তাহাকে আদর না করিয়া থাকিতেও পারে নাই। কিন্তু সে তাহার লজ্জাবিজড়িত বাক্যে প্রেমের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পায় নাই, এবং সে বাক্যে শিক্ষা গৌরবেরও সন্ধান পায় নাই।

তাহার পর, বাটী ফিরিয়া ইডেন বাগানে বেড়াইতে গিয়া তাহার সর্ব্বনাশ হইল; তাহার দেহমধ্যে পাপ প্রবেশ করিল।—সে সুশিক্ষিতা, প্রেমরসপূর্ণ, যৌবনো-চ্ছ্বাসময়ী জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিল; তাহার শিরায় শিরায় নূতন প্রেমের প্রবল বন্যা বহিল। সেই বন্যায় বালিকা নগবালার ব্রীড়া-সংকুচিত মূর্ত্তি কোথায় ভাসিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকমলের কথা।

কয়েক দিন পরে, জ্যোতিঃপ্রকাশ রমেশের সঙ্গে আবার সেই বাগানে বৈকালিক ভ্রমণে গিয়াছিল।

সেদিনও সেখানে মলয় পবন, ভাগীরথী জলকণা স্পর্শে শীতল হইয়া বহিতেছিল, পুষ্পিত কুঞ্জে কুঞ্জে প্রসূনপুঞ্জ তেমনই হাসিতেছিল; সঙ্গীতের স্বরলহরী তেমনই বিজাতীয় উদ্দীপনা আনিয়া দিতেছিল এবং আলোকমালা তেমনই দীপ্তি প্রদান করিতেছিল। কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রেমতীক্ষ্ণনয়নে শত অনুসন্ধান করিয়াও আজ সেখানে জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিতে পাইল না। খুঁজিতে খুঁজিতে সে কেবল কৃষ্ণকমলকে একটি বেঞ্চের উপরে একাকী সমাসীন দেখিল। সে কতকটা আনন্দিত হইয়া সেই বেঞ্চের নিকট আসিল।

রমেশকে দেখিয়া কৃষ্ণকমল সৌজন্য সহকারে নমস্কার করিল; এবং তাহার পার্শ্বে তাহাদের বসিবার স্থান করিয়া দিল।

রমেশ প্রতিনমস্কার করিল। এবং জ্যোতিঃপ্রকাশের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের পার্শ্বে উপবেশন করিল। আজ তাহার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ী ছিল না; কারণ অপরিচিত ভদ্রমহিলা সঙ্গে থাকিলে, কথা কহিবার পক্ষে, ভদ্রতার যে বাধা থাকে, আজ আর সে বাধা ছিল না। আজ রমেশ কৃষ্ণকমলের সহিত কথা কহিল; তাহার এবং তাহার ভগিনীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল; জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত তাহার পরিচয় ঘটাইয়া দিল।

এক্ষণে কৃষ্ণকমলের সহিত জ্যোতিঃপ্রকাশের পরিচয় ঘটায়, উভয়ে উভয়ের সহিত সদালাপ করিবার সুযোগ হইল। কিয়ৎকাল সদালাপের পর, কৃষ্ণকমল আপন পকেট হইতে সুদৃশ্য সিগারেটের কৌটা বাহির করিয়া, এবং তাহা হইতে দুইটি সিগারেট লইয়া, একটি জ্যোতিঃপ্রকাশকে দিল, এবং অপরটি রমেশকে দিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল; কিন্তু রমেশ সিগারেট প্রত্যাশী নহে জানিয়া, নিজেই উহা মুখ ভঙ্গিমা সহকারে, সুকৌশলে আপন অধরপুটে গ্রহণ করিল। পরে দেশলাই জ্বালিয়া, সেই একই কাটীতে জ্যোতিঃ-

প্রকাশের মুখস্থিত সিগারেটটি ধরাইয়া দিয়া, নিজের অধরধৃত সিগারেটটিও জ্বালাইয়া লইল। যে ভাবে কৃষ্ণকমল এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিল; তাহাতে তাহার সিগারেট খাওয়ার পারদর্শিতা সম্বন্ধে, বোধ হয়, কেহই সন্দিহান হইবে না।

কৃষ্ণকমলের নিকট সেই সিগারেট প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাহার সরস ও মধুর সদালাপে, জ্যোতিঃ-প্রকাশ মুগ্ধ হইয়া গেল; মনে করিল, পৃথিবীর মধ্যে, কৃষ্ণকমল তাহার সব চেয়ে আত্মীয়।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া, রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং বলিল, "আজ আমার কাষ আছে। আমি যাই।"

কৃষ্ণকমল সাদরে জ্যোতিঃপ্রকাশের হস্তধারণ করিয়া, রমেশকে বলিল "তুমি যাও; আমরা একটু পরে যাব।"

রমেশ প্রস্থান করিলে, রমেশের দারিদ্রতা ব্যঞ্জক পরিচ্ছদের দিকে অবজ্ঞাকষায়িত লোচনে তাকাইয়া তাহার দারিদ্র্য জন্য তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণকমল বলিল, "নেহাৎ hand to mouth। ওর সঙ্গে আমাদের পোষাবে না। চলুন জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবু, একটা refreshment room এ গিয়ে একটু তাজা হয়ে নেওয়া যাক। কলেজস্কোয়ারে যে নূতন refreshment room খুলেছে, বড় neat and clean—চলুন, সেইখানে যাওয়া যাক; সেখান থেকে দু cup চা খেয়ে বাড়ী ফেরা যাব।"

কৃষ্ণকমল কখনও বিদ্যামার্গে পরিভ্রমণ করে নাই; সে কেবল ভগিনীর করকমল ধরিয়াই সংসারপথে বিচরণ করিয়াছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষা-দালালদের সঙ্গে মিশিয়া দুই চারিটি ইংরাজি বাক্য শিখিয়াছিল; তাহাই তাহার অশিক্ষিত বাঙ্গালার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার ইংরাজি ভাষার দৌড় দেখাইতে চেষ্টা করিত। যাহারা ইংরাজি ভাল জানে না, তাহারাই কথা কহিতে বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজির অনাবশ্যক বুকনি দেয় ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ কৃষ্ণকমলের দুই পেয়ালা চা খাইবার প্রস্তাবে কিছু চিন্তিত হইল। ভাবিল, তাহার পকেট-স্থিত ব্যাগে সে ত কেবল মাত্র আট আনা পয়সা লইয়া বাহির হইয়াছিল; তাহারও কতক ইতিপূর্ব্বেই ট্রাম ভাড়ায় ও সিগারেটে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহার ব্যাগে চারি আনা মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই চারি আনা পয়সা ত প্রায় সবই ফেরত যাইবার ট্রামভাড়ায় ব্যয় হইয়া যাইবে। তাহা হইলে, সে চা খাইবার অর্থ কোথায় পাইবে? এই অভাব তাহার বস্ত্রাদির পারি-পাট্যের সহিত মোটেই মানাইল না! জ্যোতির্ম্ময়ীর ভ্রাতার নিকট তাহার পকেট শূন্যতার সংবাদ দিতে অপমান ভয়ে তাহার গণ্ডযুগল উত্তপ্ত হইয়া রাঙা হইয়া উঠিল। এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার সে কোন উপায় দেখিতে পাইল না।

কৃষ্ণকমলের বিদ্যার অভাবটা বিধাতা ধূর্ত্ততার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃপ্রকাশকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়াই সে সেই ধূর্ত্ততার বলে সহজেই নূতন বন্ধুর অর্থসঙ্কটের গোপন কথা হৃদয়ঙ্গম করিল। সে চতুরতার সহিত বলিল, অবশ্য আপনি টাকা নিয়ে আজ বাড়ী থেকে বেরুতে পারেন নি। সকল ভদ্রলোকেরই মাঝে মাঝে এরকম ছোট খাট mistake হয়ে থাকে। Never mind! তার জন্যেই ত আমরা বন্ধুবান্ধব আছি। আমার টাকা আপনার টাকা; আবার আপনার টাকা আমার টাকা। আজকে অনুগ্রহ করে আমাকেই আমাদের সমস্ত ব্যয়টা নির্ব্বাহ করতে দিন। আবার যেদিন আমার পকেট শূন্য থাকবে, সে দিন আপনি খরচ করলে আমি কিছুই আপত্তি করবো না।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ কৃষ্ণকমলের হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।"

অতঃপর তাহারা কলেজ স্কোয়ারে সেই নূতন ভোজনালয়ে যাইবার জন্য ট্রাম-গাড়ীতে আরোহণ করিল। জ্যোতিঃপ্রকাশ ট্রামভাড়া দিবার জন্য আপন পকেটে হাত দিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণকমল সশব্দে আপন পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দুইজনের দুইখানি

টিকিট ক্রয় করিয়া, একখানি জ্যোতিঃপ্রকাশের হস্তে অর্পণ করিল।

যথাস্থানে তাহারা ট্রাম হইতে অবতরণ করিল; এবং ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। সেখানে জ্যোতিঃ-প্রকাশের বসিবার জন্ম কৃষ্ণকমল একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া নিজে অন্য একটি চেয়ারে বসিল।

হোটেলের পরিচারকেরা তাহাদের কি আবশ্যক জানিবার জন্ম নিকটে আসিলে কৃষ্ণকমল নিতান্ত পরিচিতের ন্যায় তাহাদিগকে আদেশ করিল:—কিন্তু কেবলমাত্র দুই পেয়ালা চা আনিতে বলিল না, পরন্তু চপ কাটলেট এবং অন্যবিধ খাদ্য আনিবার ফরমাইস করিল। এবং তাহারা ঐ ঐ খাদ্য আনিলে দুই নবীন বন্ধুতে মিলিয়া, তাহা মহানন্দে আহার করিল। আহার শেষ করিয়া তপ্ত চা পানের দ্বারা আপনাদের কণ্ঠনালী পরিষ্কার করিয়া লইল। চা পান করিতে করিতে দুই বন্ধুতে মিলিয়া অনেক গল্প করিল। কৃষ্ণকমলের গল্প শুনিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ বুঝিল সে মহাধনী সন্তান; আবার জ্যোতিঃপ্রকাশের গল্প শুনিয়া কৃষ্ণকমল বুঝিল যে তাহার নবার্জ্জিত সুহৃৎ নিতান্ত নির্ধন নহে; তবে তাহার পিতা কিছু ব্যয়কুণ্ঠ, তেমন সুবিদ্বান ও সুশীল পুত্রের জন্যও সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে কাতর।

রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময়, কৃষ্ণকমল হোটেলের পাওনা একটাকা বার আনা জ্যোতিঃপ্রকাশের সম্মুখেই পরিশোধ করিল। তাহার পর উভয় বন্ধুতেই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কৃষ্ণকমল জ্যোতিপ্রকাশকে একটি সিগারেট দিয়া এবং তাহা ধরাইয়া দিয়া, নিজে সিগারেটের ধূমপান করিতে করিতে আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীর রূপ এবং কৃষ্ণকমলের সৌজন্যের কথা ভাবিতে রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় বাড়ী ফিরিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দারার দুরদৃষ্ট

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অদৃষ্ট দেবতার অপ্রসন্ন দৃষ্টি মানুষের উপরে যখন পতিত হয় তখন বিদ্যা বুদ্ধি পুরুষকার প্রভৃতি কিছুই কোন কার্যেই লাগে না, করায়ত্ত সিদ্ধি হস্তস্খলিত হইয়া পড়ে, যাহা ঘটিবার নহে তাহাই ঘটিয়া যায়; কোন্ দুর্লক্ষ্য ছিদ্রপথে দুর্ভাগ্য প্রবেশ করিয়া আমাদের সকল সাধনা ব্যর্থ করিয়া দেয় আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দারার ভাগ্য দেবতা প্রসন্ন হইলেন না, একান্ত সাধনার সিদ্ধিলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না, যে পরাভবের আশঙ্কা করিয়া তিনি পলায়নের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহাকে সেই পলায়নই করিতে হইয়াছিল; রাজদ্রোহী ঔরঙ্গজীবকে শৃঙ্খলিত করিয়া বিজয় গর্ব্বে রাজপুরী প্রবেশ করতঃ পিতা শাজাহানের পদতলে বিদ্রোহীকে উপস্থাপিত করা এবং যথাকালে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ময়ূর তক্তে আরোহণ তাঁহার কপালে ঘটিল না।

দুই দিবস ক্রমাগত রাত্রি দিন যুদ্ধের পরেও ঔরঙ্গজীব যখন দেখিলেন যে, ওরূপ প্রণালীতে যুদ্ধ করিলে কেবল সৈন্য ক্ষয় এবং শেষ ফল পরাভব সুনিশ্চিত, তখন গোপন আক্রমণের পন্থা আবিষ্কারের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। দারার সৈন্যের উভয় পার্শ্ব দুরারোহ শৈলের

দ্বারা রক্ষিত সুতরাং সম্মুখ আক্রমণ ব্যতীত উপায় নাই, কিন্তু সে আক্রমণের ফল দুই দিবস পর্য্যন্ত দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়া গোপনে পর্ব্বতারোহণ করতঃ অতর্কিত ভাবে দারার পার্শ্ব আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণের জন্ত সেনাপতিগণকে আদেশ দিলেন।

জম্বুর পার্ব্বত্য অংশের রাজপুত-রাজ রাজরূপসিংহ ঔরঙ্গজীবের একতম সেনানায়ক ছিলেন। পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী রাজপুতগণ পর্ব্বতারোহণে পটু; রাজরূপের এক সহস্র রাজপুত সৈনিক রাত্রির অন্ধকারে গোপনে পর্ব্বতোপরি নিঃশব্দে আরোহণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে অশ্বারোহী সৈন্তের দ্বারা যুগপৎ আক্রমণের ব্যবস্থা করা হইল। দারার সৈন্তের উভয় পার্শ্ব শৈলশ্রেণীর দ্বারা সুরক্ষিত মনে করিয়া, দারা বা শাহ্‌নেওয়াজ সেদিক হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা করেন নাই, তাঁহারা সম্মুখে শত্রু দেখিয়া সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। দিলীর খাঁ, শায়েস্তা খাঁ, জয় সিংহ, সেখ মীর প্রভৃতি ঔরঙ্গজীবের সেনাপতিগণ তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়া ক্রোধে অন্তরে অন্তরে জ্বলিতেছিলেন, সম্মুখে দারার সৈন্ত দেখিয়া প্রতিশোধ কামনায় নিজ নিজ বল সহ প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হইলেন। শাহ্‌নেওয়াজ, দারা ও সিপার অনুরূপ বীর্য্যে তাঁহাদের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতেছিলেন; এই সজ্ঘর্ষে উভয় পক্ষের বহু সৈন্ত ধ্বংস হইয়া গেল, ঔরঙ্গজীবের অসমসাহসী রণকুশল সেনাপতি সেখ মীর সাংঘাতিক আঘাতে আহত হইয়া হস্তী পৃষ্ঠেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

দারার ব্যূহের সম্মুখভাগে যখন এই মহামার চলিতেছে, তখন নিঃশব্দ ধীর পদক্ষেপে রাজরূপের রাজপুত সৈন্ত শৈলারোহণ করিয়া দারার ব্যূহের পার্শ্ব আক্রমণ করিল। দারা ও শাহ্‌নেওয়াজ সভয়ে দেখিলেন, যাহা অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন তাহাই সম্ভব হইয়াছে, দুর্ভেদ্য বলিয়া ব্যূহের যে অংশ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই অংশ ভেদ করতঃ রাজরূপের রাজপুত সৈন্তের রূপ ধরিয়া দারার দুর্ভাগ্য মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল।

সম্মুখ ও পার্শ্ব হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইলে সে আক্রমণ নিবারণ সহজসাধ্য নহে। কিন্তু শাহ্‌নেওয়াজ ও তাঁহার পুত্র, দারা স্বয়ং ও সিপার কেহই ভীত হন নাই, বিপদের সময়ে দ্বিগুণ সাহসে ভর করিয়া তাঁহারা সৈন্ত চালনা করিতে লাগিলেন এবং সৈন্তগণকে উৎসাহিত করিবার জন্ত নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া শত্রুর কামান ও বন্দুকের মুখে বারম্বার যাইতে লাগিলেন। এই সময়ের ধ্বংস লীলার বর্ণন দুঃসাধ্য। উভয় পক্ষের সৈন্তের স্তূপীকৃত মৃতদেহ পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া উঠিল; মৃতদেহের উপরে দাঁড়াইয়া সেনা ও সেনাপতিগণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজীবের সাহসী সেনাপতি সেখ মীর মরণাহত হইয়াও স্বীয় সৈন্তকে উৎসাহিত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। দিলীর খাঁ তীরবিদ্ধ হইয়া রক্তস্রাবে দুর্ব্বল দেহ হইলেও রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন নাই। ফলতঃ দিলীর ও সেখ মীরের অমানুষিক সাহস এবং অলৌকিক প্রভুভক্তির বলেই ঔরঙ্গজীব এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, নতুবা ঔরঙ্গজীবের চতুরতা এবং বিপুল বাহিনীর বলে কিছুই হইতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন যে ঔরঙ্গজীব অর্থ দ্বারা দারার তোপখানার সিপাহীগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন এবং দারার কামান হইতে লৌহগোলা নিঃসৃত না হইয়া কেবল ফাঁকা শব্দই বাহির হইয়াছে। একথা কতদূর সত্য তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। তবে ছল চাতুরী কাপট্য প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ব্যাপারে ঔরঙ্গজীব সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন; যুদ্ধের গতি দেখিয়া, দারার সৈন্যের অমুরবীর্য্য দেখিয়া, অর্থদ্বারা গোলন্দাজগণকে বশ করা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে বরং স্বাভাবিক। অমিত বিক্রমে শাহ্‌নেওয়াজ ও তাঁহার পুত্র যুদ্ধ করিতেছিলেন, শত্রুপক্ষের গোলা আসিয়া বৃদ্ধ বীর শাহ্‌নেওয়াজ খাঁর নশ্বর দেহ রেণু রেণু করিয়া ফেলিল। অধর্ম্ম-আশ্রয়ী জামাতা ঔরঙ্গজীবের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধ সম্রাটের আনন্দদুলাল ও সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী দারার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের বাঞ্ছিত রণমৃত্যু লাভ করিয়া শাহ্‌নেওয়াজ স্বর্গে চলিয়া গেলেন; তাঁহার বীর পুত্রও পিতার অনুগামী

হইলেন। পিতাপুত্র উভয়েই দারার অরধণ বক্তারগণের পরিশোধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রবীণ সেনাপতি শাহ্‌নেওয়াজ এবং তাঁহার বীর পুত্রের মৃত্যুতে দারার হতাবশিষ্ট সেনাগণ ভীত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। দারার অন্যান্য সেনানায়কগণও কেহ হত এবং আহত হইয়া একে একে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। সিপার ও দারা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় সৈন্যগণকে বূহিত করিয়া ঔরঙ্গজীবের বিপুল সেনা-তরঙ্গাভিঘাতের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন জয়ের আশা একান্তই তিরোহিত হইয়াছে, সে সময়ে রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সেনার সমুখীন হওয়া এবং যমমন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করা একই কথা। সেরূপ স্থলে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া লইতে পারে এরূপ বীর জগতে আছে কিনা সন্দেহ। দারার স্বল্প সংখ্যক হতাবশিষ্ট সেনা তখন ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল; ক্ষুব্ধ, স্তব্ধ মর্ম্মাহত দারা এবং কুমার সিপার চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ঔরঙ্গজীবের বাহিনীর জয়োল্লাস ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের ললাটলিপির লেখকের উদ্দেশে কি বলিতেছিলেন কে জানে? সে সময়ে পিতা পুত্র দুই জনেই শত্রুপরিবেষ্টিত রণক্ষেত্রে উদাসীনবৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন, শত্রুসৈন্যের কর-নিক্ষিপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের একটিমাত্র উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড আসিয়া যে উভয়েরই জীবন শেষ করিয়া দিতে পারিত সে দিকে তাঁহাদের লক্ষ্যই ছিল না। সম্ভবতঃ রাজকুমার দারা ভাবিতেছিলেন যে এই রণপরাজিত, লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত জীবনের সেইভাবে শেষ হইয়া যাওয়াই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলকর। নিতান্ত অনুগত প্রভুভক্ত যে কয়টি ভৃত ও সৈন্য তখনও জীবিত ছিল, তাহারা প্রভুর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া যায় নাই; তাহারাই দারা ও সিপারের অশ্বের মুখ ফিরাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য বারম্বার সানুনয় অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এবং প্রিয়তমা নাদিরা বানুর কথা স্মরণ করিয়া পিতা পুত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া রাত্রির অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন।

জয় পরাজয়ের বার্ত্তা বায়ুরও অগ্রে ধাবিত হয়। "আনা সাগরে"র তীরে যেখানে দারার অবশিষ্ট ধনরত্ন, রাজমহিষী নাদিরাবানু এবং পরিবারস্থ অপরাপর রমণীগণ সহ বিশ্বাসী খোজা প্রহরীগণ অপেক্ষা করিতেছিল, সেখানে এই দুঃসংবাদ পঁহুছিতে বিলম্ব হয় নাই। পরাজয়ের বার্ত্তা শুনিয়া রমণীগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু রোদনে কালক্ষেপ করিবার সময়টুকুও তখন নাই। দারার পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে খোজা প্রহরীগণ নির্দ্দিষ্ট দিকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল, ঔরঙ্গজীবের সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিবে সেই ভয়ে ধীর গতিতে যাইবারও উপায় নাই! বহুক্ষণ পরে অন্য পথ দিয়া দারা ও সিপার আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

ঔরঙ্গজীবের সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ, বামে পশ্চাতে সকল দিকই শত্রুসৈন্যদ্বারা বেষ্টিত, কেবল কচ্ছের দুস্তর লবণমরু যে দিকে, সেই দিকে গেলে হয়ত আপাততই শত্রুহস্তে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং গত্যন্তর বিরহিত দারা সেই পথেই যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে দারার হতাবশিষ্ট সৈন্যগণের মধ্যে অধিকাংশই, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া পলায়নক্লেশ সহ্য করা অপেক্ষা ঔরঙ্গজীবের পক্ষাবলম্বনই শ্রেয় বলিয়া মনে করিল; যে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য দারার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে, কচ্ছমরুর দুরন্ত ক্লেশের ভয়ে আর অগ্রসর হইল না। কেহবা দারার নিকট বিদায় লইয়া, কেহবা কিছু না বলিয়াই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল; যাইবার সময় দারার দ্রব্য সামগ্রী ধন রত্ন যে যাহা পাইল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। বিধাতা বিমুখ হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে!

রণক্লান্তি, পরাজয়ের অপমান, প্রাণভয়ে পলায়ন, সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশায় জলাঞ্জলিদান—ইহার কোন একটির বেদনাই মানুষের অসহ্য; দারার দুরদৃষ্টের

ফলে এই সকল গুলি একত্র হইয়া রাজকুমারকে কি যাতনা দিতেছিল তাহা তাঁহার অন্তরাত্মাই জানিত! এই পুঞ্জীভূত দুঃখের উপরে দুঃখ, প্রাণপ্রিয়া মহিষী নাদিরাবানুর মারাত্মক উদরাময়। অনুচরবর্গ সঙ্গে নাই, হাকীম বৈদ্য নাই, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা হইবার উপায় নাই, সম্মুখে কচ্ছের দুরন্ত লবণমরু, যেখানে পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও একবিন্দু পানীয় জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। একবার এই দুস্তর ও বিস্তীর্ণ লবণপ্রান্তর পার হইয়া আসিবার সময়ে ইহার ভীষণ ক্লেশ ইহাঁরা অনুভব করিয়াছিলেন; বহু হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর এবং মনুষ্যের পিপাসায় প্রাণবিয়োগের শোচনীয় দৃশ্য ইহাঁদিগকে সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে হইয়াছে, অথচ কোন উপায়ই করিতে পারেন নাই। ক্ষুৎপিপাসার ক্লেশ রাজপরিবারকেও সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে আশা ছিল একবার এই পথটুকু পার হইতে পারিলে গুজরাট বা দাক্ষিণাত্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সিংহাসনের জন্য সকল সময়ে লিপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু আজ রণনির্জ্জিত হৃতসর্ব্বস্ব, নৈরাশ্যপীড়িত দারা, মুমূর্ষু মহিষীকে সঙ্গে লইয়া সহায় সম্পদহীন নিতান্ত দীনের ন্যায় সেই দুস্তর পথে যাত্রা করিয়াছেন, প্রাণঘাতী শত্রুসৈন্যের অশ্বপদ ধ্বনি প্রতি মুহূর্ত্তে যমদূতের পদশব্দের ন্যায় কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বরের পক্ষে ইহা কি ভীষণ, তাহা কে বুঝাইবে এবং কে বুঝিবে? দুগ্ধফেণনিভ কুসুমকোমল শয্যায় যাহার নিদ্রা হইত কি না সন্দেহ, আজ অনাবৃত তপ্তমরুবালুকা তাহার সুখশয্যা; গুলাব, কেওড়া মিশ্রিত তুষার-স্নিগ্ধ বারি যাহার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিত কি না জানিনা, আজ চর্ম্মাধারে কদর্য্য পানীয় তাহার নিকট স্বর্গ-মন্দাকিনীর অমৃত ধারা; রঙ্গ মহলের কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেও শ্রান্তিহেতু যাহাকে চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করিতে হইত, আজ দুস্তর মরুবালুকা পার হইবার জন্য সে একটি উষ্ট্র, অশ্ব বা অশ্বতরের কাঙ্গাল! বস্তুতঃ যে পুঞ্জীভূত দুঃখে দারা আশীর্ষ নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা সম্মুখযুদ্ধে তিনি রণমৃত্যু লাভ করিলে তাঁহার পক্ষে সে মরণ মঙ্গলেরই হইত। কিন্তু আশা কুহকিনী, মানুষের শেষতম নিমেষ পর্য্যন্ত তাহাকে নৃত্য করাইতে ছাড়ে না; এই কুহকিনীর মোহমন্ত্রেই দারা এত দুঃখের পরেও পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন —আশা যে তাঁহার অতিবৃদ্ধ পিতামহ হুমায়ুনের ন্যায়, পারস্য হইতে সহায়তা লাভ করিয়া সিংহাসন উদ্ধার করিয়া লইবেন!

কিন্তু আজমীর হইতে পারস্য বহু দূরে। পশ্চাতে ঔরঙ্গজীবের সেনাপতিগণ দ্রুতবেগে আসিতেছে, এবং দ্রুতগামী দূতদ্বারা সকল স্থানের রাজা জমীদারকে ঔরঙ্গজীব আদেশ দিয়াছেন যে দারা যাহারই এলাকার মধ্য দিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে সেই যেন তাহাকে বন্দী করিয়া পশ্চাদ্ধাবিত সেনাপতি-গণের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করে। সৈন্যসামন্ত, অনুচর রক্ষিগণের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই দারার সঙ্গে আছে, এমতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তিই দারাকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারে। সুতরাং তাঁহাকে অতি সাবধানে পথ চলিতে হইতেছে এবং সকল দিকেই বিপদাশঙ্কা থাকায়, কচ্ছমরুর পথ ব্যতীত অন্য কোন দিকে যাইবার উপায় তাঁহার একেবারেই ছিল না। আসিবার সময়ে যে সকল রাজা জমীদার সর্দ্দারগণ দারাকে রাজোচিত সম্মান দেখাইয়া তাহাদের সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়াছিল, সহায় সম্পদহীন পরাজিত ও পলায়নপর দারাকে এবারে তাহারা কোন সাহায্যই করিল না; এমন কি যে সকল রাজপুত সৈন্য দারা তাঁহার ধনরত্ন রক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারাই ধনভাণ্ডারবাহী উষ্ট্র অশ্ব ও অশ্বতরগণকে আপনাপন বসতভবনের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল, দারার কোন শক্তিই নাই যে এই লুণ্ঠনকারী দস্যুগণের হস্ত হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাগুলি পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন। দারার অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, মহিষী নাদিরা-বানুর চিকিৎসার্থে যে ইউরোপীয় ডাক্তার তাঁহার সঙ্গে ছিল, মরুপথে চলিবার জন্য তাঁহার নিমিত্ত একটি

উষ্ট্র বা অশ্বতর পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে দারা পারিলেন না। অগত্যা চিকিৎসকের রোগিনীর সঙ্গে যাওয়া ঘটিল না!

লোকচক্ষু দিবাকরের অস্তগমনের সময় আসিলে সহস্রকর দ্বারা গগনতলকে ধারণ করিয়াও তাঁহার অস্তগিরির অন্তরালে পতন নিবারণ হয় না, মানুষের অভ্যুদয় ও পতনও তদনুরূপ। দারার "তারা" আজ অস্তগমনের জন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য? এবং ঔরঙ্গজীবের আজ বৃহস্পতি কেন্দ্রী, তাহার অভ্যুত্থানের প্রতিরোধ করে এমন শক্তি জগতে কাহার আছে? অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বন্ধু শত্রু হইয়া দাঁড়ায়; যে যশোবন্ত, দারার পক্ষ হইয়া ধর্ম্মতে ঔরঙ্গজীবের সহিত সমর করিয়াছে, যে যশোবন্ত দারাকে স্বেচ্ছায় আজমীরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল,—স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া জয়মাল্য দারার কণ্ঠে পরাইবে, সেই যশোবন্ত ঔরঙ্গজীবের আদেশে আজ দারার পলায়নের পথ রুদ্ধ করিবার জন্ত সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছে, জয়সিংহের সহিত একত্র হইয়া দারাকে বন্দী করিবার জন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। হায়রে মানবের স্বার্থ, হায়রে তাহার প্রয়োজনানুরোধী কপট প্রীতিবন্ধনের তিক্ত, নির্ম্মম পরিণাম!

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন বিশ্রামার্থ তরুতলে বা পথপ্রান্তে দারা সপরিবারে উপবিষ্ট, তখন সংবাদ আসিল শত্রু সমাগতপ্রায়। আর বিশ্রাম ঘটিল না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দিনান্তের ক্ষুধার কদর্য্য আহারটুকুও পথপ্রান্তেই নিক্ষেপ করিয়া, পীড়িতা নাদিরা এবং বালক সিপারকে সঙ্গে লইয়া দারা প্রাণভয়ে রজনীর অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। এরূপ দুর্ঘটনা একদিন নহে, বহুদিন ঘটিয়াছে। বহুদিন পিপাসার বারিকণা এবং ক্ষুধার অন্নপিণ্ড ওষ্ঠপ্রান্তে তুলিয়া ধরিবার সময়টুকু পাওয়াও এই বিধিবিড়ম্বিত রাজ পরিবারের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আজমীরের সন্নিকটবর্ত্তী গোকলার গিরিসঙ্কটে দিবসত্রয় ব্যাপী ঘোর সময়ের পরে দারা যখন মুষ্টিমেয় সেনা ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে সপরিবারে পলায়ন করেন, তখন পশ্চাদ্ধাবিত জয়সিংহ তাঁহাকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই দারাকে পলায়নের অবসর দিয়াছিলেন। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে—শাহানশাহ বাদশাহ শাজাহানের বিশেষ অনুগ্রহভাজন প্রবীণ রাজা জয়সিংহ, বাদশাহের আনন্দ দুলাল রাজকুমার দারাকে এই যৎসামান্ত অনুগ্রহ দেখাইবেন ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে; কারণ সকলেই জানিত যে, দারা বন্দীভাবে ঔরঙ্গজীবের নিকট আনীত হইলে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ঔরঙ্গজীব কি ব্যবস্থা করিবেন। মুরাদের প্রতি যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া সকলে জানিত যে ঔরঙ্গজীবের ভ্রাতৃবর্গ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণের যে কেহ ঔরঙ্গজীবের কবলগত হইবে তাহার দেহপিঞ্জরের মধ্যে প্রাণবিহঙ্গ অধিকক্ষণ থাকিবে না। অসি, অগ্নি, অহি—যে কোন উপায়ে তাহার হত্যা অচিরে সাধিত হইবে। বৃদ্ধ জয়সিংহের এইরূপ ভ্রাতৃহত্যা ও রাজহত্যার মুখ্য হেতু হইবার অনিচ্ছা হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যথার্থই জয়সিংহ ইচ্ছাপূর্ব্বক দারাকে পলায়নের অবসর দিয়াছিলেন ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ইতিহাসে আছে বলিয়া মনে হয় না। দারার পশ্চাদনুসরণ করিতে রাজা জয়সিংহের কিছু বিলম্ব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার কারণ ছিল; আহম্মদাবাদের রাজকোষ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিলম্ব হয়, এবং কচ্ছের দুস্তর লবণ মরু বৃহৎ বাহিনীর সহিত পার হওয়াও সময়সাপেক্ষ; দারার সহিত মুষ্টিমেয় মনুষ্য; অপর পক্ষে জয়সিংহ হস্ত্যশ্ব পদাতি সমন্বিত বৃহৎ সেনাভাগ লইয়া চলিয়াছেন; সঙ্গে ভারবাহী উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতি বহু সংখ্যক পশু, অগণিত গুরুভার আগ্নেয়াস্ত্র অপার মরুবালুকা পার করিয়া লইয়া যাওয়াও কি কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার সময়ে জয়সিংহের ভারবাহী বহু পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে সকল পুনরায় সংগ্রহ করিতেও তাঁহার বহু সময়ক্ষেপ হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে জয়সিংহের বিলম্বিত গতি

ইচ্ছাকৃত এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। একজন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে, অপরে তাহাকে বন্দী করিবার জন্ত তাহার অনুসরণ করিতেছে, এতদুভয়ের গতির পার্থক্য হওয়াই নিতান্ত স্বাভাবিক এবং হইয়াও থাকে। সুতরাং ঔরঙ্গজীবের ভক্ত বন্ধু মৃজা রাজা জয়-সিংহের ললাটে স্বেচ্ছায় দারার পলায়নের শুভসুযোগ করিয়া দিবার কলঙ্ককালিমা লেপন করা সঙ্গত হইবে না —বিলম্ব যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অনিবার্য্য কারণে, জয় সিংহের স্বেচ্ছাকৃত নহে। যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত জয়সিংহ দারার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন, যেরূপে সকল পথ বন্ধ করিয়া দারাকে বিপন্ন করিয়াছিলেন, যেরূপে ছলে কৌশলে যশোবন্তকে ঔরঙ্গজীবের পক্ষভুক্ত করিয়া দারার সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সে সকল কথা চিন্তা করিলেও দারার প্রতি দয়াপ্রকাশের অপবাদ জয়সিংহকে দেওয়া যায় না। জয়সিংহ বীর ছিলেন, সৈনাপত্যগুণে অদ্বিতীয় ছিলেন, রাজনীতিতে বিশারদ ছিলেন; কিন্তু কপটতায় ঔরঙ্গজীবের সমকক্ষ না হইলে, তাহার প্রীতিভাজন হওয় তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। পাপে কুণ্ঠাহীন ঔরঙ্গজীবের ভক্তবন্ধু কপট চূড়ামণি জয়সিংহ যে ভ্রাতৃহত্যা ও রাজহত্যার পাপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে লিপ্ত হইবার আশঙ্কায়, শক্তিসত্বে দারার প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাকে পলায়নের অবসর দিয়াছেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না, এবং সম্ভবতঃ সে কথা সত্যও নহে। কারণ, তাহা হইলে সে সংবাদ ঔরঙ্গজীবের কর্ণগোচর হইত এবং স্বেচ্ছাকৃত সেই অপরাধের জন্ত একান্ত স্বার্থপর পরম পাপাচারী স্বজনহন্তা ঔরঙ্গজীব জয়সিংহের প্রতি সমুচিত দণ্ডের ব্যবস্থা কোন না কোনও সময়ে করিতেন। যশোবন্তের অপরাধ ঔরঙ্গজীব কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরেও রাজরোষ তাঁহার বিধবা পত্নী ও শিশু সন্তানকে দগ্ধ করিবার জন্ত শ্মশানের অনলশিখার স্তায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী বা গুণবান কেহ তাঁহার পরম উপকারী হইলেও তাহার নিস্তার ছিল না, সেই জন্ত মীরজুমলার অকাল মৃত্যু ঘটিল। ঔরঙ্গজীবের সিংহাসন প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম সহায় ছিলেন বীরাগ্রগণ্য মীরজুমলা, তাঁহার অসি এবং উপদেশ বলেই সমরক্ষেত্রে ঔরঙ্গজীব রক্ষা পাইয়া-ছিলেন, নতুবা সুজার ক্ষিপ্ত রণহস্তীর পদতলে ঔরঙ্গ-জীবের পাপ লীলার সেই দিবসেই অবসান হইত। সেই মীরজুমলা আসামের অভিযানকালে প্রার্থিত সেনাবলের অভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত হইয়া যখন ঢাকায় ফিরিলেন, তখন তাঁহার জীবন দীপ নির্ব্বা-পিত প্রায় হইয়াছে। তাদৃশ উপকারী বীর বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে বাদশহ ঔরঙ্গজীব স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিলেন এই ধারণায় যে, তেমন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যদি কখনও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইলে তাঁহার বিপদের আশঙ্কা আছে; সে কণ্টক বিদূরিত হওয়ায় বাদশাহ নিঃশঙ্ক চিত্তে নিদ্রা যাইতে পারিবেন। তখন দারা সুজা মুরাদ সকলে পরলোকে, দিল্লীর রাজসিংহাসন নিরাপদ, সুতরাং মীরজুমলার ইহলোকে থাকিবার আর প্রয়োজন নাই।

এইরূপ যাহার চিত্তবৃত্তি, কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র যাহার অন্তরে নাই, ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রগণের হত্যা যে নির্ম্মমচিত্তে ঘটাইয়া তুচ্ছ সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করত শান্তিলাভ করে, বৃদ্ধ পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট সংক্ষিপ্ত জীবনকালকে সংক্ষিপ্ততর করিতে যাহার ইহপরকালের কোন প্রকার ভয়ই অন্তরে উদয় হয় না, সোদর-সংগ্রামের সহায় বীর বীরপুত্রকে যে যাব-জ্জীবন কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পারে, সেই ঔরঙ্গজীব জয় সিংহের স্বেচ্ছাকৃত গুরুতর অপরাধের দণ্ডবিধান না করিয়া নীরবে তাহা পরিপাক করিবে ইহা উন্মাদের কল্পনা।

দুঃসহ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুপথে, চতুর্দ্দিক হইতে বিতাড়িত হইতে হইতে, পীড়িতা পত্নী ও পুত্রকন্যাগণসহ দারা কি অসীম ক্লেশে দিন কাটাইতেছিলেন, তাহা যে বিধাতা সেই ক্লেশ তাঁহার কপালে লিখিয়াছিলেন তিনিই জানেন। অসহ্য কষ্টে, ঔষধ পথ্যের অভাবে, পীড়িতা নাদিরার

পীড়া বৃদ্ধি পাইল, তাঁহার জীবন প্রদীপের তৈলটুকু প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল, তখনও দীর্ঘপথের শেষ সীমারেখা দেখা যায় না। নাদিরাবানু পরভেজের কন্যা, সর্ব্বগুণান্বিত রাজচক্রবর্ত্তী আকবর শাহের প্রপৌত্রী, জন্মাবধি দিল্লী রঙমহলের অতুলনীয় সুখ-সম্পদে লালিতা, ভারতের ভাবী সম্রাট্ দারার প্রিয়তমা মহিষী। যে দিল্লীর রঙমহলে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না, মলয় মারুত মন্দ গতিতেও সে ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশ করিতে পারে কি না সন্দেহ, আজন্ম সেই সুখৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ পুরীতে পালিত বর্দ্ধিত হইয়া ভাগ্যদোষে নাদিরা আজ যে অপার দুঃখ সাগরে পতিত হইয়াছে, তাহাতে এতদিন যে সে জীবিত রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

নাদিরার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান আজ পিতারই ন্যায় বিতাড়িত হইতে হইতে দেশে দেশে ফিরিতেছে, তাহাকেও বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনিবার জন্য নররাক্ষস ঔরঙ্গজীবের ফৌজ তাহার পশ্চাতে ফিরিতেছে।

দারার সামুগড়ে পরাজয়ের সংবাদ যখন পহুঁছিল, তখন সমভিব্যাহারী সেনাপতি জয়সিংহ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া রাজপুত বাহিনী সহ বিজয়দৃপ্ত নবীন বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অপর সেনাপতি দিলির খাঁ যদিও বা সুলেমানের সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, জয়সিংহের দুষ্টবুদ্ধি ও প্ররোচনায় তিনিও তাঁহার রোহিলা দল লইয়া, নবোদিত সূর্য্যপদে অর্ঘ্যদান করিবার জন্য আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। সৈন্যবল বিহীন সুলেমানের, পিতার সাহায্যার্থ দিল্লীর পথে যাত্রা করিবার সুযোগ রহিল না, কারণ তখন দিল্লী ও আগ্রার পথ ঔরঙ্গজীবের সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ। নিরুপায় সুলেমান গাহড়বাল রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, আশা যে, সেখান হইতে যদি সৈন্য সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে পিতার সহায়তার জন্য সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। গাহড়বাল রাজ সেরূপ সাহায্যদানে ——— করায় সুলেমানের মনের আশা মনেই বিলীন হইয়া গেল, পিতামাতার সহিত আর জীবনে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল না।

জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমানের এই দুরবস্থার কথা যখন নাদিরার নিকট পহুঁছিল, তখন মাতার অন্তরের মধ্যে দুঃখ শোক বেদনার কি তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা মাতৃহৃদয় ভিন্ন আর কে বুঝিতে বা অনুমান করিতে পারে? আধিব্যাধি উভয়ে মিলিয়া আজন্ম সুখলালিতা রাজরাণী নাদিরা বায়ুকে উন্মূলিতা লতার ন্যায় দিন দিন পরিশুষ্ক করিয়া তুলিতেছিল। তদুপরি অনশন ও পথশ্রমে আজ তাঁহার মৃত্যু আসন্ন, যমদূত একেবারে আজ শিয়রে বসিয়া হস্তপ্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

জয়সিংহ এবং বাহাদুর খাঁ কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে, দারা নিরাপদস্থানের অন্বেষণে সিন্ধুনদের অপর তীরে পার হইয়া গেলেন। পরপারে দারা না যাইতে পারে সেজন্য জয়সিংহ পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু সে ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই দারা সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দারার ইচ্ছা ছিল বোলান গিরি সঙ্কটের মধ্য দিয়া কান্দাহারের পথে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, কোন এক নিরাপদ স্থানে থাকিয়া নাদিরাকে কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম দিবেন; কারণ রাজমহিষীর দেহের বর্ত্তমান অবস্থায় বোলান গিরিসঙ্কটের পথে যাওয়া এবং যমদ্বারে যাওয়া একই কথা। দারার সমভি-ব্যাহারিণী অপরাপর স্ত্রীবৃন্দও গিরিসঙ্কটের ক্লেশের ভয়ে, তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক লুণ্ঠন এবং স্ত্রীজাতির চরম অপমানের ভয়ে সে পথে যাইতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন। দারার অন্তরে একটি ক্ষীণ আশার সঞ্চার হওয়ায় তিনিও ভারতবর্ষের সীমান্ত পার হইয়া কান্দাহারের পথে পারস্যে যাত্রা করিতে সহসা ইচ্ছুক ছিলেন না; তিনি ভাবিতে-ছিলেন, এই পার্ব্বত্য প্রদেশের কোনও এক জমীদারের সহায়তায় কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কান্দাহার দুর্গে (যেখানে "খোজা" বসন্ত তখনও পর্য্যন্ত তাহার প্রভু দারার আগমন প্রত্যাশায় ঔরঙ্গজীবের সৈন্যের আক্রমণের

প্রতিরোধ করিতেছিল) উপস্থিত হইবেন এবং সেই দুর্গে রাজমহিষী নাদিরা এবং অপর নারীবৃন্দকে রাখিয়া, কান্দাহার হইতে আরও সৈন্য সংগ্রহ করতঃ আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন—হয়ত বা সে বারে ভাগ্য দেবতা প্রসন্ননয়নে তাঁহার দিকে চাহিতেও পারেন। অদৃষ্টের চক্র ত ঘুরিয়াও থাকে—"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমি ক্রমেণ" ইহাও ত মহাজন বাক্য—কুহকিনী আশা এই কথা তাঁহার কাণে কাণে কহিতেছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

দৈনিক নিদ্রা দীর্ঘ নিদ্রা ও যোগনিদ্রা

(২)

আমরা দেখাইয়াছি যে ত্রিবিধ নিদ্রার লক্ষণ সকল সম শ্রেণীর এবং পরস্পরের সহিত তুলনীয়। দৈহিক লক্ষণ তুলনা করিয়া আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, ও-সকল যেন একের পর অন্যে ক্রম বিবর্ত্তিত—দীর্ঘ নিদ্রা যেন অপর দ্বিবিধ নিদ্রার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ঐ মধ্যবর্ত্তী অবস্থার হেতু কি? উহা অবগত হইলেই দৈনিক নিদ্রার এবং যোগনিদ্রার হেতুও কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে।

হেতু নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথমত কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। তাহার মধ্যে প্রধান কথাগুলি উল্লেখ করিতেছি। (১) দীর্ঘনিদ্রিত হইবার কিছু পূর্ব্বে জীবগণ দেহের নানা স্থানে মেদ (fat) সঞ্চয় করে। নিদ্রিতাবস্থায় তদ্দ্বারাই যথাসম্ভব দেহ পোষণ হয়। (২) যে সকল প্রাণী এক দেশ হইতে অন্য দেশে ভ্রমণ করে এবং পুনরায় সে দেশ হইতে স্বদেশে চলিয়া যায়, * সেই সকল প্রাণী দীর্ঘনিদ্রাগত হয় না। উহারা স্বদেশে আহারের অসম্ভাব হইলেই অন্য দেশে ভ্রমণ করিতে যায়। যে দেশে যে প্রাণীর আহার যে ঋতুতে অপ্রাপ্য অথবা দুষ্প্রাপ্য হয়, সে দেশ হইতে সেই প্রাণী সেই ঋতুতে অন্য দেশে গমন করতঃ আহারান্বেষণ করে। আহারান্বেষণই প্রাণীগণের দেশভ্রমণের * প্রধান কারণ। যে সকল দেশভ্রমণ করে না তাহারাই প্রায়শঃ দীর্ঘনিদ্রাগত হয়; যাহারা দেশভ্রমণ করে তাহারা দীর্ঘনিদ্রাগত হয় না। এ কথার অর্থ এই যে, আহারের অসম্ভাব হইলেও যে সকল প্রাণী আহারান্বেষণে দেশান্তর ভ্রমণে বহির্গত হয় না তাহারাই দীর্ঘনিদ্রাগত হয় এবং যে কাল পর্য্যন্ত আহার অপ্রাপ্য অথবা দুষ্প্রাপ্য থাকে সে কাল নিদ্রিত অবস্থাতেই কাটাইয়া দেয়। পরে যখন ঐ কাল অন্তে আহার সুপ্রাপ্য হয় তখন তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ইহা জীবন রক্ষার একটী কৌশল মাত্র। দীর্ঘনিদ্রাগত না হইলে উহারা অনাহারে মরিয়া যাইত; এই নিমিত্ত দেহে মেদ সঞ্চয় করিয়া দীর্ঘনিদ্রাগত হয়, এবং নিদ্রিত অবস্থাতে ঐ মেদ দ্বারা শরীর রক্ষা করে। ঐ অবস্থায় কোন কর্ম্ম করে না বলিয়া কর্ম্মজনিত দেহক্ষয় না। (৩) তৃতীয় কথা এই যে, যে প্রাণী এক দেশে এক ঋতুতে দীর্ঘনিদ্রাগত হয়, সেই প্রকার † প্রাণী অন্য দেশে অন্য ঋতুতে দীর্ঘনিদ্রিত হইতে পারে; অথবা সেই প্রকার অপর প্রাণী মোটেই দীর্ঘনিদ্রিত হয় না এরূপও হইতে পারে। ইহা হইবারই কথা। কারণ আহার সকল দেশে একই ঋতুতে অপ্রাপ্য অথবা দুষ্প্রাপ্য হয় না; অথবা

* Migratory animals.

* Migration.

† Variety.

কোন প্রাণীর আহার সর্ব্বত্রই সুলভ হইতে পারে। এ কথার সত্যতা দীর্ঘনিদ্রাগত প্রাণিগণের শ্রেণী, গণ * ও প্রকার বিবেচনা করিলেই প্রতীয়মান হয়। ইহাদিগের মধ্যে কতিপয় প্রাণীর উল্লেখ করিতেছি। মশা, মাছি, ছারপোকা, মাকড়সা, কেন্নে অথবা কেন্নে, বোল্‌তা, বিছে অথবা চেলা, গুবরে পোকা এবং তদ্রূপ কঠিন আবরণ যুক্ত অন্য কয়েক প্রকার পোকা, গুগ্‌লি, শম্বুক, টিক্‌টিকি, গিরগিটি, ভেক, সর্প, কাছিম, মৎস্য, সজারু, ইন্দুর, বাদুড়, মর্কট, বানর, মানুষ—ইহারা দীর্ঘনিদ্রাগত হয়। এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে কীট অবধি স্তন্যপায়ী জীব পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর জীবই দীর্ঘনিদ্রাগত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল শ্রেণীর সকল গণের অথবা সকল প্রকারের সকল জীবই দীর্ঘনিদ্রিত হয় না। কীটের মধ্যে মশা মাছি দীর্ঘনিদ্রিত হয়, কিন্তু অন্য অনেক কীট হয় না। শম্বুকগণ মধ্যেও অনেক প্রাণী ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। সরীসৃপগণ মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। ইন্দুরে দীর্ঘনিদ্রিত হয় কিন্তু ছুঁচা হয় না। বানরগণ মধ্যে কতিপয় প্রাণী ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অন্য হয় না। অবশেষে মানুষের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, কোনপ্রকার মানুষই দীর্ঘনিদ্রিত হয় না; কেবল ইউরোপীয় রুসিয়ার Pskov প্রদেশের কৃষকগণ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতে প্রায় সমস্ত শীত ঋতু কাটাইয়া দেয়। † উহাদিগের পরিবারস্থ এক এক জন পালা করিয়া জাগিয়া থাকে এবং নিদ্রিতগণকে একবার মাত্র জাগাইয়া একটু রুটি খাওয়াইয়া দেয়। মানুষের নানা উপায়ে আহার সংগ্রহ হইয়া থাকে; এবং মানুষ একদেশ হইতে অন্য দেশেও আহারান্বেষণ করিতে যায়। সুতরাং দীর্ঘনিদ্রিত হইয়া জীবন রক্ষা করা তাহার আবশ্যক হয় না। (৪) চতুর্থ কথা এই যে, যে সকল প্রাণী সর্ব্বত্রই দেহের প্রয়োজনীয় তাপ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় তাহারাই দেশান্তর গতায়াত করিতে পারে। যাহারা চতুষ্পার্শ্বস্থ তাপের সহিত দেহ তাপের প্রয়োজনীয় মাত্রা রক্ষা করিতে অসমর্থ তাহারাই দীর্ঘনিদ্রাগত হয়। মানুষ চিরতুষারাবৃত অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশেও দেহের প্রয়োজনীয় ৯৮॥ ডিগ্রী তাপ রক্ষা করিয়া থাকে; এবং অগ্নিকুণ্ডবৎ সাহারা প্রদেশেও ঐ পরিমাণ তাপই রক্ষা করে। নচেৎ শীত প্রধান দেশে চতুষ্পার্শ্বস্থ হিমের অনুপাতে দেহতাপ হ্রাস হইয়া মারা যাইত; এবং অত্যুষ্ণ দেশে চতুষ্পার্শ্বস্থ তাপের আধিক্য হেতু দেহতাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া মারা যাইত। চতুষ্পার্শ্বস্থ উত্তাপ যত কমই হউক, অথবা যত অধিকই হউক, মানুষ এবং অন্যান্য অনেক প্রাণী সে অবস্থায় মধ্যেও স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দেহ তাপ স্থির রাখিতে পারে। এ নিমিত্ত তাহারা দেশান্তর ভ্রমণ করতঃ আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সরীসৃপ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর চতুষ্পার্শ্বস্থ হিমে দেহ-তাপ কমিয়া যায়, অথবা চতুষ্পার্শ্বস্থিত উষ্ণতা বশতঃ দেহতাপ বর্দ্ধিত হয়, তাহারা দেশভ্রমণ করতঃ আহারান্বেষণ করিতে পারে না। স্বদেশেও শীত অথবা গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রয়োজনীয় দেহ-তাপ স্থির রাখিতে সমর্থ হয় না। এই হেতু তাহারাই প্রায়শঃ দীর্ঘনিদ্রাগত হয়। নচেৎ তাহারা অত্যন্ত শীত সময়ে দেহ তাপ কমিয়া এবং অত্যন্ত গ্রীষ্মের মধ্যে দেহ তাপ বাড়িয়া মারা যাইত। কিন্তু ঐ কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

এই চারিটী প্রধান কথা স্মরণ রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, অনাহারই দীর্ঘনিদ্রার প্রধান হেতু। আহারের অভাব বশতঃই দীর্ঘনিদ্রা অবলম্বন করিয়া জীবগণ মৃত্যু হইতে আত্মরক্ষা করে। এই অবস্থায় শ্বাস চলে না, জ্ঞান থাকে না, মলমূত্র ত্যাগ হয় না; সুতরাং ইহাকে প্রায় মৃত্যুর ন্যায়ই দেখা যায়; কিন্তু দেহ পচে না বলিয়া ইহাকে মৃত্যু বলা যায় না। বিশেষতঃ দীর্ঘনিদ্রা ভঙ্গ হইলে যখন পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসে, পূর্ব্বের অভিজ্ঞতাও পুনরাগত হয়, তখন

* Species.

† Ency. Brit: 11th Edition, Vol XIII page 445.

জ্ঞান কিছুমাত্রও থাকে না এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান ও চৈতন্য কোন এক বিশেষভাবে নিশ্চয়ই থাকে। সেই ভাবকে কূটস্থ ভাব বলা না গেলেও প্রচ্ছন্ন ভাব বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে যোগনিদ্রার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এ অবস্থাতেও নিশ্বাস চলে না, মলমূত্র ত্যাগ হয় না; বাহ্যতঃ জ্ঞান থাকে না বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও চৈতন্য উভয়ই বিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। নচেৎ কোন কারণ বশতঃ যোগাবস্থা ভঙ্গ হইলে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিত না। এই বিশিষ্ট অবস্থা কি? দেহের দিক হইতে দেখিলে যোগনিদ্রার লক্ষণ সকল পিটুটারি গণ্ডের (Pituitary gland) পূর্ব্বাংশ আয়তনে ছোট হইলে অথবা ঐ গণ্ডের রস-ক্ষরণ ক্রিয়া অত্যন্ত কমিয়া গেলে জীবদেহে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তদ্বৎ। প্রকৃত পক্ষেও দীর্ঘনিদ্রিত প্রাণিগণের ঐ গণ্ড পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে উহার রসক্ষরণ অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। যোগ অভ্যাস করিবার প্রথম অবস্থা হইতেই অল্পাহারী হইতে হয়। তাহাতে ঐ গণ্ডের রসক্ষরণ কমিয়া যাইবে, ইহা অনা-য়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও অনাহারই প্রধান কারণ। দৈনিক নিদ্রাও অনাহার হইতে আগত হইতে পারে। দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলে মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে। * দীর্ঘনিদ্রার ত প্রধান কারণই অনাহার; তাহা উপরে দেখাইয়াছি। সুতরাং ত্রিবিধ নিদ্রারই মূলে অনাহার রহিয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে। অনাহারে দেহ-যন্ত্র দুর্ব্বল হয়, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তা'র পর, বাহ্যজ্ঞান অর্থাৎ বিষয় জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ। যোগিগণ ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করায় বিষয় জ্ঞান গ্রহণ করেন না। সুতরাং জগতের নানা বিষয়ক অনুভূতি এবং তন্মূলক জ্ঞান তাঁহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। কেবল মাত্র যে পূর্ব্ব সংস্কার ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা যোগাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হন, একাগ্র তন্ময় চিত্তে তাহাই ধ্যান করেন। তদ্ধেতু কালসহকারে তাহাতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া যান যে, তাহাই একমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে, অন্য সকল জ্ঞানই লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাই প্রত্যক্ষীভূত হয়; তাঁহারা তাহার সহিত যেন এক হইয়া যান। ঐ পূর্ব্বসংস্কার ও বিশ্বাস কি? তাহা আর কিছুই নহে, যোগবলে অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে এবং ক্রমে সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত হইয়া যোগী ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। ঈদৃশ দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতেই যোগাভ্যাসের প্রবৃত্তি জন্মে, এবং এই দৃঢ়বিশ্বাসের ফলেই পূর্ব্বসংস্কারের অনুরূপ ব্রহ্ম পদার্থে যোগী লীন হইয়া যান। এই ফল বিশ্বাসমূলক। উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইতে পারে, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে একাগ্র তীব্র আকাঙ্ক্ষাও জাত হয়। বিশ্বাস এবং আকাঙ্ক্ষার প্রবলতাহেতু তদনুরূপ ফল প্রাপ্তি অথবা ফলপ্রাপ্তির ন্যায় ধারণা, কেবল পারমার্থিক বিষয়ে নহে, ঐহিক বিষয়েও অনেক সময় দেখা যায়। শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। আমরাও প্রায় প্রত্যহই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। রোগীর যে চিকিৎসকের উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁহার ঔষধে যেরূপ উপকার হয়, অন্যের ঔষধে তদ্রূপ হয় না। একজন অহিফেন-সেবীকে তাঁহার স্ত্রী খয়ের-বড়ি প্রায় এক মাস যাবৎ খাওয়াইয়াছিলেন, তাহাতে অহিফেন যথা সময়ে না পাইলে অহিফেনসেবিগণের দেহে যে সকল যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তাহার কিছুই হয় নাই; কারণ তাঁহার স্ত্রী অহিফেনের বড়ি দিতেছে এইরূপই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। অশ্বত্থ গাছের নীচে একজন শূলবেদনার রোগী গভীর বিশ্বাসে দুই তিন দিন অনাহারে পড়িয়া ছিল। ঐ বৃক্ষের অসাধারণ দৈববল শক্তিতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রকৃত-পক্ষেও সে ঐরূপ করিয়াই যোগমুক্ত হইয়াছিল। একটী ইউরোপীয় মহিলা পুত্রের মা হইবার প্রবল

* অন্য কারণেও মানুষ ঘুমাইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু সে পৃথক কথা।

আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। তাঁহার একসময় কোন কারণে মাসিক স্ত্রীলক্ষণ বন্ধ হওয়াতে তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং নিশ্চিত বিশ্বাস করিলেন যে তিনি অন্তঃস্বত্বা হইয়াছেন। কয়েক মাস পরে প্রাতে তাঁহার একটু একটু বমি হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। পরে ক্রমে নীচের পেট স্ফীত হইতে লাগিল, স্তনে দুগ্ধ আসিল। অবশেষে যথা সময়ে প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে ডাক্তার দেখিলেন যে জরায়ুর মুখ একটুও প্রশস্ত হয় নাই। তিনি তখন অস্ত্রব্যবহারের নিমিত্ত রোগিণীকে ক্লোরোফর্ম্ম ঘ্রাণ করাইলে, বড় একটা শব্দ হইয়া স্ফীত পেট ছোট হইয়া গেল এবং ঐ গর্ভাবস্থা যে সম্পূর্ণই অলীক তাহা বুঝা গেল। এরূপ একটা দৃষ্টান্ত ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত অজিতনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকটও শুনিয়াছি। হাওড়াতে তিনি ঐরূপ একটা রোগিণী পাইয়াছিলেন। যাহা হউক দৃঢ় বিশ্বাস এবং একান্ত কামনার ফল শুধু গ্রন্থাদিতে নহে, দৈনন্দিন জীবনেও অনেক সময় প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এ ফল অনেক সময় সত্যই লাভ হইয়া থাকে; কখনও বা কাল্পনিক হইয়া যায়।

আমার ন্যায় অনধিকারী ব্যক্তির যোগ সিদ্ধির ফল সম্বন্ধে কিছুই বলা সঙ্গত হয় না। তথাপি দৈনিক নিদ্রায় দীর্ঘনিদ্রায় এবং যোগনিদ্রায় লক্ষণ সকল তুলনা করিলে এবং পিটুটারি গণ্ডের রসক্ষরণের হ্রাসবৃদ্ধির ফল সকল বিবেচনা করিলে এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও একান্ত কামনায় প্রত্যক্ষ ফল সকল লক্ষ্য করিলে, যোগাবস্থায় যাহা চরম ফল, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া, সে ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হওয়া যায় না। অন্ততঃ যিনি যোগাভ্যাসে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহার নিজের নিকট আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রাপ্তি সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; এবং প্রকৃত পক্ষেও ঐ ফল সিদ্ধ হইতে পারে, ইহাও অনুমান করিবার কারণ আছে। আত্মাই এক মাত্র সৎ পদার্থ, ইহা এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিতেছেন। বস্তু পদার্থ কিছুই নহে। বৈজ্ঞানিকগণ এখন প্রায় সমস্বরেই বলিতেছেন, "বস্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্তু।" * এ কথা সত্য হইলে, শক্তিই একমাত্র সৎপদার্থ। ইহা অন্ধ শক্তি নহে, এ কথা জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ এখন বিশদরূপে বুঝাইতে সমর্থ হইতেছেন। এই শক্তিকেই আত্মা শব্দে অভিহিত করা যায়। আত্মাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া লইয়াছে। দেহও যে তাহারই রচনা, ইহা ভ্রূণ তত্ত্ব হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, দেহকোষে সীমাবদ্ধ হওয়াতেই আত্মার শক্তিহানি হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করা যায়। সুতরাং অনাহার এবং ইন্দ্রিয়দ্বার রোধদ্বারা দেহের বন্ধ ছেদ করিলে আত্মা যে স্বীয় শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে এবং পরমাত্মায় লীন হইবে, ইহা অবিশ্বাস করা ত সঙ্গতই নহে, বরং বিশ্বাস করাই সঙ্গত। বস্তু পদার্থের অসারত্ব প্রমাণ হইলেই এ সিদ্ধান্তও অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সে প্রমাণ এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণ বিশদরূপেই করিয়াছেন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

শ্রীশশধর রায়।

* Matter is composed of electrons, and electrons × × are not matter.—Modern Theory of Physical Phenomena, by Righi.

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঐ বাড়ীর রন্ধনশালার ব্যবস্থাও চমৎকার ছিল, সুতরাং সন্ধ্যার সময়ে আসিয়াও আমাদের বা রোগীর কোন কষ্ট হয় নাই। বাড়ীর গৃহিণী এবং তাঁহার পুত্রবধূ ও কন্যাগণের দ্বারা অনেক বিষয়ের সহায়তা পাইয়াছিলাম। সে রাত্রির জন্ত আলোর ব্যবস্থা তাঁহারাই করিলেন, বলিলেন, পরদিন সে ব্যবস্থা আমরা করিয়া লইলেই চলিবে। ফলতঃ সে দিবস ঐ গাড়োয়ানের সাহায্য না পাইলে আমরা এই ভদ্র বাড়ীওয়ালার সন্ধান পাইতাম না এবং না পাইলে ধরমশালায় রোগীর বড় কষ্ট হইত। সঙ্গে রোগী থাকিবার জন্ত বাড়ীর গৃহিণী এবং অন্তান্ত নারীবর্গের সহানুভূতি এবং সহায়তা অনেক পাইয়াছিলাম, রোগীর পথ্যাদি বিষয়ে তাঁহারা অনেক আনুকূল্য করিয়াছিলেন, সে সকল ঋণ অপরিশোধ্য। আর্ত্ত আতুর পীড়িতের জন্ত নারীর অন্তর সর্ব্বদাই কাঁদিয়া থাকে এবং এই আর্ত্তের সেবায় রমণীর দেশ বিদেশ, আপন পর, জাতি বিজাতি জ্ঞান নাই—শোক, দুঃখ, বেদনাময় সংসারে ইহা মানবের অমূল্য সম্পদ।

ভাবিয়াছিলাম সঙ্গের যিনি পীড়িত হইয়াছিলেন, তিনি সহজেই আরোগ্যলাভ করিবেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের ডাক্তার বাবু একদিন বিমর্ষ মুখে আমাকে জানাইলেন, রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং নাড়ীর গতিও মন্দ, পরামর্শের (Consultation) জন্ত ভাল ডাক্তারের আবশ্যক। সবে মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে পহুঁছিয়াছি, কিছুই এবং কাহাকেও তখন চিনিনা। বাড়ীওয়ালা ও তাঁহার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কে সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল চিকিৎসক। তাঁহারা বাহাদুরজী এবং সেখানকার মেডিক্যাল কলেজের Ist. Physician এক ইংরাজ ডাক্তারের নাম করিলেন। বাহাদুরজীর নাম ত এলাহাবাদে মেশো মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, এবং তাঁহার নামে চিঠিও ছিল। কিন্তু ডাঃ রায়ের পত্রের জন্ত হয়ত বাহাদুরজী তাঁহার প্রাপ্য দর্শনী লইবেন না, এবং রোগীরও ইচ্ছা বুঝিলাম যে ইংরাজ ডাক্তারকেই আনান হয়। সুতরাং তাহাই করা হইল। আমি ও সেক্রেটারী বাবু উভয়ে সেই ডাক্তারের সন্ধানে বাহির হইলাম। আমার গাড়োয়ানটি দেখিলাম "সব জান্তা"; বিনা ক্লেশে সোজা ইংরাজ ডাক্তারের বালকেনার-স্থিত কুঠিতে গাড়ী লইয়া হাজির করিল। প্রয়োজন লিখিয়া "চিট্" পাঠাইতেই লোক আসিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেল। ডাক্তার সাহেবকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলাম; রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা বলায়, আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি আসিলেন। রোগীকে অনেক সাহস ভরসা দিলেন বটে, কিন্তু যাইবার সময় আমাকে এবং ডাক্তার বাবুকে বলিলেন "He is desperately ill, but I hope we shall be able to pull him round."

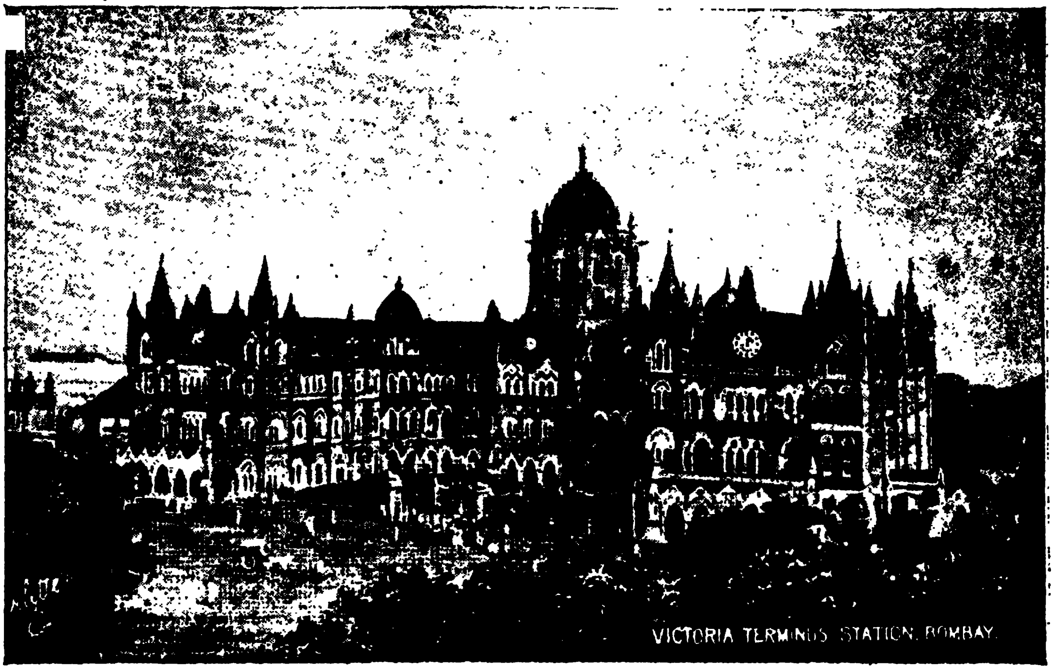
যাহা হউক, প্রায় এক মাসের চিকিৎসায় শুশ্রূষায় তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু পথ্য বিষয়ে তাঁহাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম। ডাক্তারগণের উপদেশ, পক্ষী জাতীয়ের মধ্যে যেটি নিষিদ্ধ, সেইটির সুরুয়াই তাঁহার পথ্য। কিন্তু তিনি কোন মতেই তাহাতে স্বীকৃত নহেন। অগত্যা পারাবত বলিয়া নিষিদ্ধ পক্ষিমাংসের রসই চালাইতে লাগিলাম এবং প্রতিবারে শপথ করিয়া বলিতে লাগিলাম উহা পায়রা, পায়রা পায়রা—'প' বর্গের আত্মক্ষর, শেষাক্ষর নহে। একদিন তাঁহার অবস্থা এমন মন্দ হইয়াছিল যে আমি গোপনে শবদাহের স্থান পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সেখানে সর্ব্বত্র শবদাহ করিবার ব্যবস্থা নাই এবং সমুদ্রতীরেও শবদাহের স্থান নাই। কুইন্স রোডের উপরে, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থান আছে, আবশ্যক কাষ্ঠ ইত্যাদি সেইখানেই পাওয়

যায়। পার্শীদিগের শবের ব্যবস্থা অন্তরূপ। টাওয়ার অফ্ সাইলেন্‌স নামক ইষ্টকাদি নির্ম্মিত বেদিকার মত ছোট বড় কয়টি মঞ্চ ম্যালাবার হিলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে—শবদেহ সেইখানে লইয়া ঐ মঞ্চের উপরে স্থাপন করিবামাত্র গৃধ্রের দল আসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা নিঃশেষে ভোজন করিয়া ফেলে। অবশিষ্ট যদি কিছু থাকে তাহা জল দ্বারা ধৌত করিয়া দিলে মঞ্চের নিম্নস্থ নালা দিয়া একেবারে সমুদ্রগর্ভে চলিয়া যায়, এবং শবাধার পরিষ্কৃত হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শবাধারগুলি পরিণত বয়স্ক লোকের শবদেহের জন্য এবং ছোটগুলি শিশু ও বালকদের নিমিত্ত নির্ম্মিত।

শবদাহের স্থান দেখিয়া আসিয়া আমার মন বড়ই বিষন্ন হইয়া পড়িল। ভাবিলাম লোকের মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্মশান দেখিয়া বোধ করি অমঙ্গলের কার্য্য করিলাম। যদি বা এই ভদ্রসন্তানের মৃত্যু নাও হইত, আমার এই অপকার্য্যে বুঝি অশুভকে আমি ডাকিয়া আনিলাম। একান্ত আত্মগ্লানিতে অন্তর ভরিয়া উঠিল, ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে অশুভ হরণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, কোন বিপদ হইল না, সেই দিন crisis কাটিয়া গেল, তাহার পর হইতে তিনি ক্রমেই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

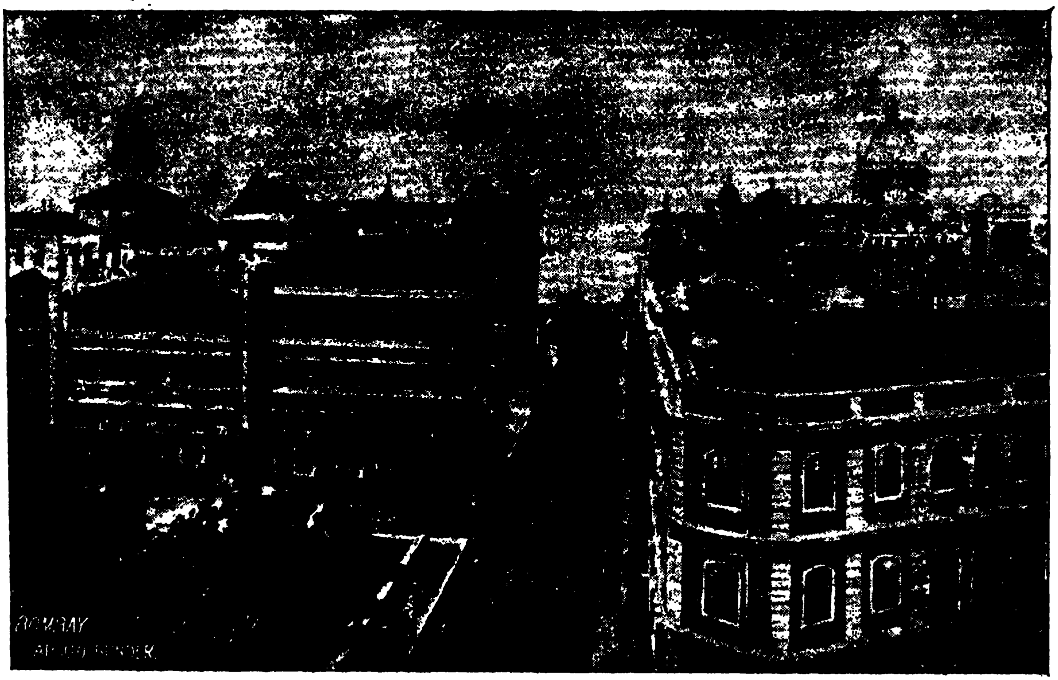
পূর্ব্বে বলিয়াছি রোগীর পথ্য লইয়া বিপদে পড়িয়াছিলাম। যখন তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার কুপথ্য করিবার স্পৃহা এতই বলবতী হইয়া উঠিল যে, সে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। ঐ ভদ্রলোকের বাড়ী নাটোরের সন্নিকটবর্ত্তী এক পল্লীগ্রামে। নাটোরের সন্দেশের খ্যাতি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এবং সে সন্দেশও নানাপ্রকারের। শৈশবাবধি তিনি ব্রাহ্মণোচিত মিষ্টান্নভোজনের ক্ষমতাকে এতই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, জলযোগের জন্য তাঁহাকে দুই তিন সের সন্দেশ দিলেও তিনি কখনও না বলিতেন না। দীর্ঘকাল-ব্যাপী রোগভোগ ও অনশনের পর তাঁহার ক্ষুধা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, দ্বাপরের কৃষ্ণার্জ্জুন থাকিলে, যদি তাঁহারা খাণ্ডববন খাইয়া ফেলিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদরস্থ অগ্নিদেবতা নিরতিশয় তুষ্টিলাভ করিতেন সন্দেহ নাই। নাটোরের সন্দেশের ন্যায় সন্দেশ বঙ্গদেশের অন্য কোন স্থানেই পাওয়া দুষ্কর, বোম্বাই প্রদেশে তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। তথাপি যে সকল মিষ্টান্ন নামধারী অখাদ্য সামগ্রী সেখানে পাওয়া যায়, তাহাই ভৃত্যদ্বারা গোপনে আনাইয়া আহার করিবার সন্ধানে তিনি ফিরিতে লাগিলেন। হরিচরণ নামক আমার এক ভৃত্যকে তিনি গোপনে আদেশ করিয়াছিলেন; পীড়ার সময় হরিচরণ দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করিয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছে, সুতরাং কুপথ্য করিবার সহায়তা করিয়া পুনরায় শুশ্রূষার কষ্ট ভোগ করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। সে আসিয়া ডাক্তার বাবুকে ও আমাকে গোপাল বাবুর (ভদ্রলোকের নাম গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) এই সদিচ্ছার কথা জানাইল। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাঁহার নিজের কোথাও যাইবার শক্তি নাই, সেই জন্য হরিচরণের নিকট অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি প্রত্যেক চাকরকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া সন্দেশ আনিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু আমাদের ভয়ে কেহই স্বীকার করে নাই। অবশেষে আমাদের নিকট কাকুতি মিনতি, সর্ব্বশেষে বালকের ন্যায় আব্দার এবং রোদন! আমি যথার্থই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, বুঝিবা গোপাল বাবুর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। ডাক্তার বাবু কহিলেন, উহা টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত পীড়ার ধর্ম্ম, রোগের অবসানে কিছুদিন ঐরূপ ক্ষুধা এবং লোভ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অল্পকাল পরে শরীর একটু সবল হইলেই ওসকল লক্ষণ দূর হইয়া যায়। হইলও তাহাই। গোপাল বাবুর পীড়ার সময়ে তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া দীর্ঘকালের জন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতে আমরা কেহই পারি নাই; তিনি সুস্থ হইলে সকাল সন্ধ্যা দ্বিপ্রহর কেবল ঘুরিয়া বেড়ানই আমাদের কাষ হইল।

বোম্বাই সহর অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ইংরাজরাজ ইহা অপর ইউরোপীয় পূর্ব্বাধিকারীর নিকট পাইয়াছেন এবং সেই সময় হইতেই ইহার বর্ত্তমান সমৃদ্ধির সূচনা এইরূপ শুনা যায়। কলিকাতা যাহার নিকট সুপরিচিত, বোম্বাই দেখিয়া তাহার বিস্ময় জন্মিবার



বোম্বাই—ভিক্টোরিয়া টার্মিনস ষ্টেশন

বিশেষ কারণ নাই। তবে সেদিনে কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাইয়ের ঘর বাড়ীগুলি বৃহত্তর ছিল এবং কলিকাতায় ত্রিতল গৃহের সংখ্যাই সামান্য, বোম্বাইয়ের ত্রিতল ছাড়িয়া সপ্ততল সৌধও সেদিনে দেখিয়াছি। সেখানে চৌল বলিয়া এক জাতীয় গৃহ আছে, যাহার অভ্যন্তরে দুই তিন শত পরিবার অনায়াসে বাস করে এবং রন্ধনাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় কার্য্য উহারই মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে; জানি না সেই কারণেই সেখানে প্লেগ মৌরুসী পাট্টা লইয়া বসিয়াছিল কি না। বোম্বাই নগরীর সংস্থান বড়ই মনোহর। চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত সালসিটি দ্বীপের একতম এই বোম্বাই। সে জলও বিল, খাল নদী নালার জল নহে, আরব সাগরের উত্তাল তরঙ্গময় জলরাশি—যত দূর চক্ষু যায় কেবল জলের পর জল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বোম্বাই হইতে পোতারোহণে যাত্রা করিয়া আরবের উপকূলে মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে প্রায় এক সপ্তাহ সময়ের প্রয়োজন হয়, বোম্বাইয়ের পদপ্রান্তস্থিত সিন্ধু সলিলের বিস্তৃতির অনুমান ইহার দ্বারাই হইতে পারে। কেবল সিন্ধুই ইহার একমাত্র সৌন্দর্য্য নহে—এই সাগর সলিল ভেদ করিয়া "মালাবার" শৈল উর্দ্ধে উঠিয়াছে—যাহার শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইলে ধন জন সৌধ সমন্বিত এই মহানগরীর অপূর্ব্ব শ্রী নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। ইহার একদিকে মহাসমুদ্রের অনন্ত সলিলরাশি তরঙ্গাভিঘাতে নিয়ত চঞ্চল, অপরদিকে উপসাগরের স্থির অবিকম্পিত বারি কদাচিৎ বাত সংস্পর্শে ঈষৎ স্ফীত। এই উপসাগরের অগভীর স্থির জলে অপরাহ্ণে বিলাসী ইংরাজ ও ধনী দেশীয়গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলাসতরণীগুলি যখন পালভরে হংসীর ন্যায় চলিয়া যায়, সে দৃশ্যও মনোরম; আমাদের কলিকাতায় সাগর শৈলের সঙ্গমও নাই, বোম্বাইয়ের Yacht clubএর পালভরা সুন্দরী বিলাস তরণীরও একান্ত অভাব।



বোম্বাই, অ্যাপলো বন্দর

কোলাবা হইতে চৌপাটি পর্য্যন্ত চারি পাঁচ মাইল পথ হইবে। সমুদ্রসৈকতে এই চার পাঁচ মাইল দীর্ঘ বাঁধ (embankment) রহিয়াছে। সেই বাঁধের উপর দিয়া বোম্বাইয়ের মারাঠী, মাড়োয়ারী, মুসলমান, গুজরাটী, ভাটিয়া, পোর্ত্তুগীজ সর্ব্বপ্রকারের সহস্র সহস্র নরনারী দব্রজে বায়ুসেবনার্থ ভ্রমণে বাহির হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অসংখ্য নরনারীর মধ্যে ইংরাজ বা ফিরিঙ্গীর সংখ্যা অতি অল্প, নাই বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে না। সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য দেশীয় লোকের অধীনে থাকায় সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত ব্যবসায়ী ইংরাজ সেখানে একরূপ নাই।

বিন্ধ্যের দক্ষিণে স্ত্রীলোকের 'পর্দ্দা' নাই। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, গুজরাট, মালাবার সর্ব্বত্রই বিশিষ্ট ভদ্র এবং ধনী পরিবারের নারীগণও কার্য্যোপলক্ষে বা বায়ুসেবনার্থ রাজপথে, সমুদ্রসৈকতে, অব্যাঘাতে ভ্রমণ করিয়া থাকেন; উত্তর ভারতে এবং বাঙ্গালা দেশেই পর্দ্দার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে উত্তর ভারতবর্ষে ও বাঙ্গালায় মুসলমান প্রাধান্য ছিল এবং তাঁহাদের অনুকরণে কিংবা হয়ত বা অন্যান্য কারণে এই পর্দ্দাপদ্ধতির প্রচার হইয়া থাকিবে।

বোম্বাই সহরের সমস্তই আধুনিক। পুরাতনের মধ্যে কেবল হস্তিগুম্ফা (Elephanta Caves) বাস্তবিকই ইহা পুরাতন এবং টঙ্কাস্ত্রদ্বারা কঠিন পর্ব্বতগাত্র বিদারণ বিদ্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষ কি নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল এই হস্তিগুম্ফা তাহার একতম উদাহরণ। এলোরা, অজন্তা, নীনা, কার্লা খণ্ডগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গুম্ফা পরে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এই হস্তিগুম্ফাই আমি প্রথমে দেখিয়াছিলাম এবং ভারতীয়গণের তক্ষণ-দক্ষতায় বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলাম।

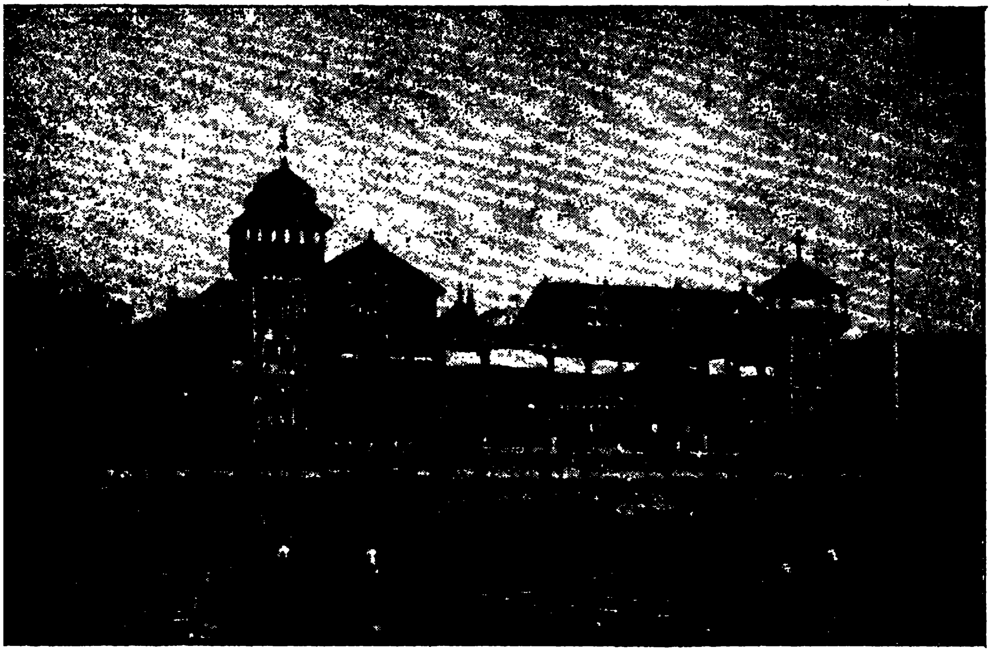
হস্তিগুম্ফা দেখিতে জলপথে যাইতে হয়। কেহ কেহ পালের নৌকায় কেহ বা ষ্টীমারযোগে যাইয়া থাকে। পালের নৌকায় বিলম্ব হয়, গতায়াত এবং সেখানে



হস্তিগুম্ফার প্রবেশদ্বার

দেখিতে যে সময় লাগে তাহাতে প্রায় প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। সেইজন্ত আমরা নৌকায় না গিয়া ষ্টীমারে যাইবারই ব্যবস্থা করিলাম। এক পার্শীর ষ্টীমার ঠিক হইল, গতায়াতে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া বন্দোবস্ত হইল। যখন পার্শীর সহিত কথাবার্ত্তা হইতেছে, আমার সেই পূর্ব্ববর্ণিত ঠিকাগাড়ীর গাড়োয়ান আমাকে ইঙ্গিতে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া উহার ষ্টীমার লইতে নিষেধ করিল। বলিল, সেই পার্শী লোক ভাল নহে, তাহার ষ্টীমার ভাল এবং লোককে ঠকাইয়া ভাড়া অধিক লইয়া থাকে, অপেক্ষা করিলে ভাল লোকের ভাল ষ্টীমার সে ভাড়া করিয়া দিতে পারিবে। দেখিলাম পার্শী জাতির উপরই এই সুরাটের মুসলমানটির বিজাতীয় বিদ্বেষ রহিয়াছে। আমি মনে করিলাম সেই বিদ্বেষের জ্বালাতেই এ ব্যক্তি ওরূপ বলিতেছে, বস্তুতঃ সেই পার্শী ভদ্রলোক মন্দলোক নাও হইতে পারে। পরে দেখিলাম, গাড়োয়ান যাহা বলিয়াছিল সেই কথাই সত্য, আমার অনুমান ঠিক নহে।

পরদিবস প্রাতে আহারাদি শেষ করিয়া অাপলো বন্দরের ঘাটে আসিলাম। দেখিলাম ষ্টীমার প্রস্তুত রহিয়াছে এবং পার্শীটিও সেখানে উপস্থিত আছেন। যাইবামাত্র তাহার টাকা চাহিলেন এবং বলিলেন ভাড়া না দিলে ষ্টীমারে উঠিতে পারা যাইবে না। ভদ্রবেশধারী পার্শীটির নিকট হইতে এরূপ কথা আমি প্রত্যাশা করি নাই। মনে মনে একটু বিরক্তি বোধ করিলাম। ভাবিলাম যাইব না; কিন্তু প্রস্তুত হইয়া গিয়া ষ্টীমার ঘাট হইতে ফিরিয়া আসাও ঠিক মনে হইল না। অপরাহ্ণ পাঁচটার মধ্যে সেই ঘাটে ষ্টীমার ফিরিবে এই ব্যবস্থা ছিল, তদনুসারে আমার গাড়োয়ানকে ঐ সময়ে গাড়ী আনিবার আদেশ দিয়া, আমরা দুর্গানাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। বলা বাহুল্য ভাড়ার টাকা পার্শী আগেই লইল।



"রয়াল বম্বে ইয়ট্ ক্লাব"

যাইবার সময় কোন বাধা বিঘ্ন হইল না, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যেই যথাস্থানে ষ্টীমার পহুঁছিল। আমরা নামিয়া গন্তব্য পথে চলিলাম। পথ নতোন্নত সমুদ্রতল হইতে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় উঠিয়াছে, সেই কঠিন শিলাগাত্র তক্ষণ করিয়াই এই গুম্ফার সৃষ্টি। পাহাড় ছোট বড় যে রূপই হউক, পথ বন্ধুর হইবেই। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে বন্ধুরপথে চলিতে শ্রম বিলক্ষণই হইল এবং পিপাসায় আমরা সকলেই কাতর হইয়া পড়িলাম। কিন্তু জল কোথায় জানি না। চারিদিকে দেখিতেছি অফুরন্ত লবণাম্বু! গাইড সর্ব্বত্রই আছে। ষ্টীমার হইতে নামিবামাত্র সেই দ্বীপেও গাইড সঙ্গ লইয়াছিল। তাহাকে পানীয় জলের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে একস্থানে লইয়া গেল। দেখিলাম সেখানে নির্ম্মল সুমিষ্ট ঝরণার জলের একটি অতিক্ষুদ্র চৌবাচ্চা রহিয়াছে, সকলে সেই জলই পান করে। সঙ্গে একটি গ্লাস ছিল, সকলে সেই জল আকণ্ঠ পান করিয়া তবে চলৎশক্তি ফিরিয়া পাইলাম।

গিরিগুম্ফার নিকট গিয়া আমরা সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। ইৎপূর্ব্বে আর কখনও তক্ষণশিল্পের কোন নিদর্শন দেখি নাই, ইতিহাস পাঠ করিয়া এবং লোকমুখে শুনিয়া ইহাদের অস্তিত্বের বিষয় অবগত ছিলাম মাত্র। প্রথম দর্শনে আনন্দ, বিস্ময়, গর্ব্ব, কত ভাবের উদয় যে মনের মধ্যে হইতে লাগিল তাহা আজ ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য তক্ষণদক্ষতা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলাম এবং এই শিল্পদক্ষতা যাহারা দেখাইয়া গিয়াছে তাহারা এই ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি এবং সেই ভারতের হিন্দুকুলে আমার জন্ম বলিয়া গর্ব্বে যথার্থই স্ফীতবক্ষ হইতেছিলাম।

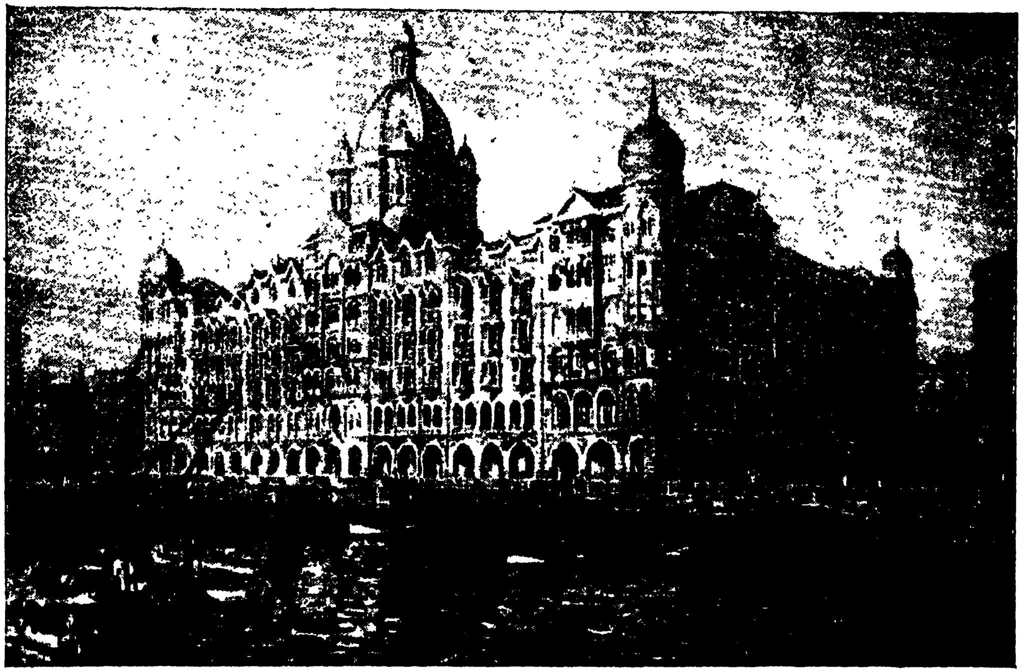
হস্তিগুম্ফার ভিত্তি, স্তম্ভ, ছাদ, গৃহতল সমস্তই এক বিশাল শিলাখণ্ড হইতে খোদিত। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ পৃথক্ ভাবে প্রস্তুত করিয়া একত্র সংবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই, তক্ষণ শিল্পের সাহায্যে শৈলাঙ্গ ছেদন করিয়া



বোম্বাই, মিউনিসিপল হল (বামে) ও ভিক্টোরিয়া টার্মিনস ষ্টেশন (দক্ষিণে)

কঠিন গিরিগাত্রকে এই আকার প্রদান করা হইয়াছে। —কেবল ইহাই নহে, গুহাভিত্তিতে যে সকল সূক্ষ্ম কারু-কার্য্য রহিয়াছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য এবং গিরিগাত্রচ্ছেদন করিয়া যে সুবৃহৎ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও অপূর্ব্ব। পাষাণে এরূপ কোমলতা সন্নিবেশ এবং প্রস্তর মূর্ত্তির মুখে ভাবের এতাদৃশ অভিব্যক্তি আমি তৎপূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। বস্তুতঃ হস্তিগুম্ফার এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি ভারতীয় তক্ষণশিল্পের অপূর্ব্ব সম্পদ। অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তিটি আকারে প্রকাণ্ড, কিন্তু আধ হর আধ গৌরী এই মূর্ত্তির প্রতি অবয়ব এমন সুন্দর সুঠাম, গৌরীগাত্রের এবং শিব অঙ্গের আভরণ ও জটাজূট, শিঙা, ডমরু প্রভৃতি আবশ্যক সকল সামগ্রী এমনি সুন্দর করিয়া নির্ম্মিত যে, মোম বা মৃত্তিকা দ্বারাও সেরূপ গঠন সম্ভব কি না সন্দেহ। এই আশ্চর্য্য কলাকৌশলময় গিরিগুম্ফা এবং সমুদ্র পরিবেষ্টিত, পত্রপুষ্প গুল্মলতা পরিশোভিত দ্বীপের আপাদশীর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে দেখিতে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া গেল। আমরা ত্বরান্বিত হইয়া ষ্টীমারে চড়িলাম, ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

কিছুদূর আসিয়া দেখিলাম বায়ু প্রবল হইয়াছে এবং বায়ুর প্রতিকূলেই আমাদিগকে যাইতে হইবে। ষ্টীমার ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহার কলকব্জাও বিশেষ বলশালী নহে। বায়ুপ্রভাবে অগভীর উপসাগরেও উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র তরণীরও তরঙ্গাভিঘাতে নাভিশ্বাস উপস্থিত; নৌকার দোলন এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সোজা হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব। সকলেই সমুদ্র পীড়ার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতেই, একটি যে ক্ষুদ্র ক্যাবিন ছিল তাহার মধ্যে আশ্রয় লইলেন, আমি একাকী ডেকের উপরে বসিয়া লবণাম্বুরাশির তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। মন্থরগামিনী তরণী কিছুদূর অগ্রসর হইতেই শ্যামায়মানা সন্ধ্যার অন্ধকারে সাগর-বক্ষ আঁধার হইয়া গেল এবং সারেঙ্গ হঠাৎ কল বন্ধ করিয়া দিয়া নোঙ্গর ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।



তাজমহল প্যালেস হোটেল, বোম্বাই

কল বন্ধ হওয়ায় নৌকার দোলন এত বৃদ্ধি পাইল যে চৌকিতে বসিয়া থাকাও দুষ্কর হইল।

সারেঙ্গকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে ষ্টীমারের বয়লার পুরাতন, অতিশয় গরম হওয়ায় ফাটিয়া যাইবার মত হইয়াছে, যদি ফাটিয়া যায় তবে আরোহিগণের প্রাণের আশঙ্কা, সুতরাং বয়লার ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত নোঙ্গর করিয়া থাকিতে হইবে, কাল প্রাতে কোন সময়ে ষ্টীমার আপলো বন্দরে পহুঁছিতে পারে। এতক্ষণে বুঝিলাম গাড়োয়ান যাহা বলিয়াছিল সেই কথাই সত্য। পুরাতন জীর্ণ ষ্টীমারে গতায়াতে অসুবিধা হইতেই পারে এবং তাহা হইলে ভাড়া পাইবার সম্বন্ধে গোল হইবে, সেইজন্য ষ্টীমারের মালিক পার্শী মহাত্মা আগেই ভাড়া আদায় করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ষ্টীমারে আহার্য্য কিছুই নাই—পাঁচ সাত ঘণ্টার মধ্যে ফিরিব, সুতরাং আমরাও কোন ব্যবস্থা করিয়া যাই নাই, এরূপ যে ঘটিতে পারে তাহা কল্পনাতেও আসে নাই, কারণ যেখা লোকে sailing boat এ সর্ব্বদা গতায়াত করিতেে কোন বিপদ হয় না, সেখানে ষ্টীমারে আসিয়াও এম আপদগ্রস্ত হইব ইহা কে ভাবিতে পারে? সারেঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলাম এখন কি উপায় হইবে? কহিল, তাহার ষ্টীমারের জালিবোট আছে, তাহাতে বসি মাঝগাম্ বন্দরে নামিয়া যাইতে পারা যায়; আপ বন্দরে যাইতে বিলম্ব হইবে কারণ দূরপথ এবং ব প্রতিকূল। আমরা দেখিলাম, বায়ু এবং যেবতা উত্তর প্রতিকূল, নতুবা অসময়ে এরূপ ঝটিকার মত প্রবল ব বহিবে কেন এবং গাড়োয়ানের নিষেধ সত্ত্বেও আম বহু ষ্টীমার থাকিতে ঐ পার্শী মহাত্মার ষ্টীমার লা কেন? যাহা হউক জালিবোটে যাওয়াই স্থির করিলা সমস্ত রাত্রি অনাহারে, কেবল মাত্র দোল খাইয়া ষ্টীমা থাকা অসম্ভব মনে হইল, কারণ সে বয়সে ক্ষুধার ক্লে

কম ক্লেশ মনে হইত না, এবং তদুপরি বয়লার ফাটিতে পারে সে ভয়ও ছিল।

ক্ষুদ্র জালিবোটে কোনমতে আমরা কয়জন বসিলাম। দুইজন দাঁড়ি দাঁড় বাহিতে লাগিল এবং একজন মাঝি হাল ধরিয়া রহিল। ষ্টীমার হইতে জালিবোটে ঝড়ের সময়ে নামাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদি বা কোনমতে বোটে নামিলাম, চলিবার সময়ে তরঙ্গবেগে ক্ষুদ্র বোট উলটি পালটি খাইতে লাগিল। কখন কখনও একটু আধটু জলও নৌকার মধ্যে উঠিয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। সেই সময়ে পার্শী নৌকা-ওয়ালাকে যে আশীর্ব্বাদটা করিতেছিলাম তাহা আর বিস্তার করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, সে মনের কথা মনই জানে, আর জানেন তিনি যিনি অন্তর্যামী।

মাঝগাম বন্দর অপেক্ষাকৃত নিকট হইলেও সেখানে পঁহুছিতে প্রায় দেড়ঘণ্টা কালেরও অধিক লাগিয়া গেল। যখন উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের উপরে নৌকা উঠে এবং তরঙ্গ অপসৃত হইলে নৌকা নামিয়া যায়, সে দোলন, এবং পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে দোলন এই উভয়বিধ গতি মিলিয়া ক্ষুদ্র তরণীখানির সম্মুখ গতি বড়ই বিলম্বিত হইতে লাগিল। সমুদ্র-পীড়ার ন্যায় লক্ষণ সকলেরই দেখা গেল, কেবল প্রবল বাতাস ছিল বলিয়া কষ্টদায়ক সমুদ্র পীড়া সর্ব্বসম্পূর্ণ লক্ষণ হইতে পারিল না। যাহা হউক কোন মতে গিয়া মাঝগাম বন্দরে পঁহুছিলাম। আমাদের গাড়োয়ান পূর্ব্বব্যবস্থা মত আপলো বন্দরে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা হইতে অপেক্ষা করিতেছিল। যখন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গেলেও আমাদের ষ্টীমার বন্দরে আসিয়া পঁহুছিল না, তখন কোন বিপদ ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত আমাদের কোন খোঁজ নাই, তখন সে জলপুলিশে গিয়া খবর দিয়াছে এবং বলিয়াছে যে "বিদেশীয় কয়জন ভদ্রলোক অমুক পার্শীর পুরাতন ষ্টীমারে এলিফ্যান্টা গিয়াছে, বেলা পাঁচটায় এখানে ফিরিবার কথা, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহারা ফিরিল না, নিশ্চয়ই কোন বিপদ হইয়াছে, তোমরা তোমাদের ষ্টীমার লইয়া অনুসন্ধান কর, যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি লিখিত এজাহার করিতেছি।" আমাদের জন্য পুলিসের বিশেষ ব্যস্ততা ছিল না, কিন্তু গাড়োয়ান তাহাদিগকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া তাহাদের জলপুলিশের ষ্টীমার প্রস্তুত করিয়া এলিফ্যান্টার পথে রওনা হইবে, এমন সময়ে আমরা মাঝগাম হইতে আপলো বন্দরে গিয়া পঁহুছিলাম এবং আমাদের গাড়োয়ানের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম। আমার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সে "খোদা বাচায়া, শেঠ তোম আয়েহো, এৎনা দের কাহেকো হুয়া?" ইত্যাদি বহু প্রশ্ন এক সঙ্গে করিতে করিতে জেটির দিকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িল এবং পুলিসের কর্ম্মচারীকে আমাদের আগমন সংবাদ জানাইয়া, সঙ্গে করিয়া আমাদের নিকটে তাহাকে আনিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিল। পুলিস কর্ম্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে আমি সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পার্শীর নামে অভিযোগ আনিবার ইচ্ছা আমাদের আছে কি না। আমি দেখিলাম বিদেশে মামলা মোকদ্দমা করিয়া একটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িবার কোন প্রয়োজন নাই, শারীরিক কষ্ট যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, পুনরায় ঘরের টাকা ব্যয় করিয়া মামলা করিতে হইবে এবং মামলার ফলও অনিশ্চিত। আমরা অস্বীকার করায়, আমাদের সুরতী গাড়োয়ানটী মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল যে বাঙ্গালী শেঠের নিকট পার্শীটি কিঞ্চিৎ শিক্ষা পায়। তাহার কথায় বার্ত্তায় বুঝিয়াছিলাম যে সমগ্র পার্শী জাতির উপরে তাহার বড়ই বিদ্বেষ ছিল। জানি না একটি সম্প্রদায়ের সমগ্র লোকের উপরে তাহার এরূপ বিজাতীয় ক্রোধ কেন জন্মিয়াছিল। আমি সুদূর বিদেশবাসী, আমার সহিত এই গাড়োয়ানের কখনও কোথাও পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না, হোটেলের দ্বারে গাড়ী খুঁজিবার সময় হঠাৎ তাহার সহিত দেখা, সম্মুখেই তাহার গাড়ী উপস্থিত ছিল সুতরাং তাহার গাড়ী খানিই ভাড়া করা হইল, অন্য কেহ সম্মুখে থাকিলে হয়ত তাহার গাড়ীই লওয়া হইত—এইরূপ পথের পরিচয় ত জীবনে কত হইতেছে কত যাইতেছে তাহার শেষ নাই সীমা নাই। কিন্তু এ ব্যক্তির সহিত একদিনের

সেই দৈবাৎ পরিচয় এমন অকৃত্রিম সেব্য সেবক সম্বন্ধে পরিণত হইবে, আমার আপদ বিপদের চিন্তামাত্র তাহাকে অস্থির অধীর করিয়া তুলিবে, ইহার কারণ অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। যাহাকে একান্ত প্রিয় জ্ঞানে হৃদয়াসনে বরণ করিয়া লইয়াছে, স্নেহ প্রীতি মমতা যাহা কিছু হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী সমস্তই যাহাকে নিঃশেষে দান করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, মানুষ অনেক সময়ে তাহার নিকট হইতে নিদারুণ বেদনা লাভ করিয়া জীবন্মৃতের ন্যায় শেষ নিমেষ পাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে! আবার ঘটনাধীন বারেকের চারিচক্ষুর সম্মিলনে যে "তারা মৈত্রী"র উদ্ভব হয়, তাহা আয়ুষ্কাল স্থায়ী হইয়া জীবনকে সরল ও সার্থক করিয়া দেয়—সংসারের এই বৈচিত্র্য কেন কে বলিবে? এ সমস্যার সমাধান তিনিই করিতে পারেন যিনি সংসারে এই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

বেলা প্রায় নয়টার সময় আহার করিয়া এলিফ্যাণ্টা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম এবং রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত পর্ব্বতপ্রস্রবণের শীতল বারি ব্যতীত জঠরস্থ হুতাশনে অন্য কোন প্রকার আহুতি দিবার সুযোগ হয় নাই। মনে হইতে লাগিল, রামায়ণ বর্ণিত কুম্ভকর্ণ, মহাভারতের ভীম বা খাণ্ডবভোজী স্বয়ং দেব বৈশ্বানরকেও পরাজিত করিতে পারা যায়। তাড়াতাড়ি গাড়ীতে বসিয়া বাড়ী ফিরিলাম। দ্রৌপদীবৎ রন্ধনপটু ঈশানচন্দ্র ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া, আমাদের বিলম্বে উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল কাটাইতেছিল, যাইবামাত্র সোপকরণ অন্নের থালা সম্মুখে আনিল। অন্নের থালায় এবং ব্যঞ্জনের বাটিতে সে রাত্রির ভুক্তাবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাতে একটি মূষিকের পর্য্যন্ত পেট ভরিত কিনা সন্দেহ। আহার যেরূপ কুম্ভকর্ণের মত হইল, নিদ্রাও তদনুরূপ। বিছানায় অঙ্গস্পর্শ হইবামাত্র চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল এবং স্বপ্নবিহীন সুষুপ্তির মধ্যে কখন রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই। বাড়ীওয়ালা পার্শী ভদ্রলোকের প্রাঙ্গণে ক্রীড়াশীল শিশু পৌত্র পৌত্রীগণের হাস্য কলরবে চক্ষুরুন্মীলন করিলাম।

বোম্বাইয়ের "রাজাবাই টাওয়ার" একটী দর্শনীয় সামগ্রী।
বৃত্তিদাতা প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ তাঁহাদের মাতার পুণ্যস্মৃতি
চিরজীবী করিয়া রাখিবার জন্য এই "টাওয়ার" নির্ম
করিয়া দিয়াছেন। ইহার শীর্ষদেশে আরোহণ করি
কেবল বোম্বাই সহর নহে, সহরের চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য
দেখা যায়। এই টাওয়ারের উচ্চ চূড়া হইতে আ
সাগরের তরঙ্গসঙ্কুল অপার জলরাশির দৃশ্য বড়ই মনোর
মিউনিসিপ্যাল হল এই সহরের আর একটি গগনস্প
সৌধ, ইহার গম্বুজে আরোহণ করিলেও চতুর্দ্দিকে দি
চক্রবাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি অবাধে প্রসারিত করিয়া দেওয়া যা
আজিকার দিনে ইলেক্ট্রিক্ এবং হাইড্রলিক্ লিফট্ যেখা
সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়—এমন কি বহু ধনী লোকে
আবাসগৃহেও লিফ্টের ব্যবহার প্রচলিত হইয়া গিয়াছে
কিন্তু এ যেদিনের কথা সেদিনে কেবল বোম্বাইয়ে
মিউনিসিপ্যাল হলের গম্বুজে চড়িবার জন্য একটি লিফ
দেখিয়াছিলাম এবং সেই লিফ্ট যোগেই সৌধশিখ
চড়িয়াছিলাম। নতুবা চক্রাকার সোপানশ্রেণী (
সিঁড়ি) আরোহণ আমার সাধ্যে কুলাইত না। লো
আকারে যেরূপ একটি ঘর, বসিবার জন্য একখানি সে
রহিয়াছে, সেই ঘরের নিকটে যাইবামাত্র liftman আম
দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিল এ
নিজেও প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।
ব্যক্তি গৃহকোণের এক স্থানে হাত দিবামাত্র খট কা
একটা শব্দ হইল এবং সমগ্র ঘরখানি সোফাসহিত আমা
লইয়া সোঁ সোঁ শব্দে উপরের দিকে উঠিতে লাগি
তৎপূর্ব্বে কখনও ওরূপ ব্যাপার দেখি নাই; সত্য
বলিতে হইলে আমাকে আজ স্বীকার করিতে হইবে
প্রথমটা বড়ই ভয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু লজ্জায় liftman
কিছু বলি নাই। ইচ্ছা হইতেছিল বলি যে আমার উ
কাষ নাই, আমাকে মাতা ধরিত্রীর স্থির অঙ্কে নামা
দাও। কিন্তু বলা হইল না। সংসারে অনেক সময়ে
বলি করিয়া অনেক কথাই বলা হয় না। এবং তাহার
দুঃখ বেদনাও বড় কম হয় না। তবে liftmanকে বলি
করিয়া না বলায় দুঃখ কিছু হয় নাই বরং সৌধশির হ
যে দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহাতে আনন্দই

করিয়াছি। আজ বোম্বাই সহরে বহু উচ্চচূড় সৌধরাজি আকাশ ভেদ করিয়া তাহাদের গর্ব্বোন্নত মস্তক উর্দ্ধে তুলিয়াছে। সেদিনে রাজাবাই টাওয়ার, মিউনিসিপ্যাল হল, ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন প্রভৃতি চারি পাঁচটি প্রকাণ্ড সৌধ সহরের বাবুয়ানা অংশে (fashionable quarter) ছিল, দেশীয়গণের আবাসের জন্ত অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন অংশে চৌল নামক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাত আট তালা গৃহ ছিল, যাহার গঠন প্রণালী এবং বাহ্যশোভা দেখিয়া প্রাসাদ সৌধ প্রভৃতি নাম তাহাদিগকে দেওয়া যায় না। আজকাল সে সকল চৌলের অদৃষ্টও ফিরিয়া গিয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্লেগ আসিয়া বোম্বাই সহরে বহুলোক ক্ষয় করিয়াছে। কিন্তু সহরের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা সেই হইতেই হইয়াছে। আজ সমুদ্রতীরস্থ সৌধরাজি দেখিলে মন মুগ্ধ হয়, চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া কঠিন হয়। সে দিনে Yacht Club-এর সুন্দর অট্টালিকা Green's Restaurantএর দশ তালা ইমারত, পার্শী ধনকুবের টাটার প্রাসাদনিন্দী "তাজ প্রাসাদ" (Tajmahal Palace Hotel) কল্পনার অতীত সামগ্রী ছিল। কোলাবা বন্দরের আলোকস্তম্ভ (light house) সহরের দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে একতম। লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্ত বোম্বাইয়ের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত বহু ট্রেণ যাতায়াত করে, কলিকাতায় সেরূপ Circular line নাই। সহরের মধ্যে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইবার জন্ত রেলে চড়িবার সুযোগ কলিকাতায় হয় না, সেই জন্ত কোলাবায় যাইবার সময়ে গ্রাণ্টরোড ষ্টেশনে রেলে চড়িয়া কোলাবা ষ্টেশনে নামিলাম। সমুদ্রের উপলাস্তীর্ণ সৈকতভূমির উপর দিয়া অনেকদূর গেলে Light house পাওয়া যায়। আমরা কয়জনে একত্রে সেই প্রস্তরময় বন্ধুর পথে কষ্টে চলিতে লাগিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে জোয়ার আসিয়া পড়িল, আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, ত্বরান্বিত হইয়া ফিরিতে ফিরিতেও পাদুকা এবং পায়জামা ভিজিয়া গেল। সিক্তবসনে ও সিক্ত পদে আমরা ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। সে যাত্রা আর Light house দেখা হইল না, পরে দেখিয়াছি।

বোম্বাইয়ের আর একটি দৃশ্য বড়ই সুন্দর; বাঙ্গালায় সূতার ও পাটের যে সকল কল আছে, তাহা কলিকাতায় নহে, কলিকাতা হইতে দূরে গঙ্গাতীরে সে সকল কল অবস্থিত। হাবড়ার কলগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থিত। কিন্তু বোম্বাই সহরের মধ্যেই বহুতর কলের কার্য নিত্য চলিতেছে এবং প্রতি কলে বহু সহস্র লোক কায করিতেছে। সন্ধ্যায় কলগুলি বন্ধ হইলে সহস্র সহস্র কুলী কলঘরের উষ্ণ বদ্ধবায়ু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যখন রাজপথে সারিবদ্ধ হইয়া একত্রে আনন্দ কলরবে তাহাদের আবাস গৃহের দিকে চলিয়া যায়, সে দৃশ্য বড়ই মনোরম।

বোম্বাই প্রদেশের সকল পুরুষের মস্তকে কোন না কোন প্রকার শিরস্ত্রাণ রহিয়াছে এবং সে সকল শিরস্ত্রাণ বিচিত্র বর্ণের; ঐ প্রদেশের ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেই রঙ্গীন কাপড় পরিয়া থাকে এবং কাপড় পরিবার ধরণও তাহাদের বিভিন্ন। বিচিত্র বর্ণের শাড়ী ও শিরস্ত্রাণে সমগ্র রাজপথগুলি রঙ্গীন হইয়া উঠে; সমুদ্রগর্ভে মজ্জমান সন্ধ্যারবির বর্ণচ্ছটাজনিত আকাশের শোণিমার সহিত রাজপথবিহারী নরনারীর বস্ত্রের বর্ণবৈচিত্র্য সম্মিলিত্য হইয়া সমগ্র নগরীকে এক অপূর্ব্ব শোভা দান করে যাহা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার সামগ্রী নহে। তাদৃশ বিচিত্র বর্ণ-বিভায় অপর কোন নগরী প্রতি সন্ধ্যায় তেমন উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে কি না জানি না,—শ্বেতবস্ত্রের দেশ আমাদের বাঙ্গালায় যে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ নাই ইহা নিশ্চিত।

বোম্বাই সহরে কাফি এবং চাএর দোকান কলিকাতায় পানের দোকানের স্তায় রাজপথের মোড়ে মোড়ে রহিয়াছে, এবং সে সকল দোকান প্রাতে ছয়টা হইতে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা লোকে পরিপূর্ণ। চা কাফির এত চলন বুঝি ভারতের অন্ত কোন স্থানে নাই। মিশর, আরব, চীন, জাপানে আছে কি না আমি জানিনা, কারণ সে সকল দেশ আমি দেখি নাই।

বোম্বাই সহরে জগতের প্রায় সমস্ত দেশের মানুষ বাস করিতেছে। এই সহরকে পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—ইরাণী, আরবী, মিশরী, তুর্কী, চিনা, জাপানী, বোখারী, বোগদাদী, ক্যাসগারী, ইয়ারকন্দী, ভুটানী, কাশ্মীরী কিছুরই অভাব নাই। বুঝি এই সকল চা পান বিষয়ে মহামহোপাধ্যায়গণের সহবাসে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সকলে ঐ কার্য্যে বিশারদ হইয়া উঠিয়াছে। সেথ মেম্স রোড, গ্রাণ্ট রোড প্রভৃতি বহু জনাকীর্ণ মহল্লায় যে সকল চা কাফির দোকান আছে, সন্ধ্যার পরে সে সকল স্থানের অধিকাংশ দোকানে হারমোনিয়ম সহকারে গীতবাদ্য হইয়া থাকে এবং ঐ সময়ে আলোর ঘটা প্রায় দেওয়ালীর মত। এ সহরে থিয়েটারের সখও কম নহে; গুজরাঠী, মারাঠী, পার্শী নানা সম্প্রদায়ের লোকের থিয়েটার রহিয়াছে এবং সকলগুলিই প্রতিদিন দর্শকে পরিপূর্ণ, স্থানাভাবে অনেকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। পার্শীদিগের থিয়েটারই আমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হইল এবং কেবল বর্ত্তমানে নহে সে দিনেও পার্শী থিয়েটারের দৃশ্যপট গুলি বড়ই সুন্দর ছিল, বোধ হয় সেরূপ সুন্দর দৃশ্যপট আজও কলিকাতার অনেক বাঙ্গালা থিয়েটারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

গোপাল বাবুর পীড়ার জন্য বাধ্য হইয়া বোম্বাইয়ে অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল। কাযের মধ্যে দুই বেলা ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন প্রাতঃকাল উদ্দেশ্যবিহীন অলস ভ্রমণের সময়ে চৌপাটীনামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী মহল্লায় ভারতের বিখ্যাত চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মার বাড়ীর দ্বারে তাঁহার নাম লিখিত প্রস্তরফলক দেখিলাম। তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। ফটক পার হইয়া গৃহের সম্মুখস্থিত উদ্যানের লোহিত কঙ্করময় পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

পতিতার কাহিনী

(গল্প)

আমি পতিতা! পতিতা—সমাজের চোখে; পতিতা সরকারের খাতায়! আর ধর্ম্মতঃ? ভগবান কোথায় তুমি—উত্তর দাও! থাক্—সে বিচার একদিন হবে' খন। আমি এখন পতিতাই! তাই হোক!

আমার এ পতিতার কাহিনী—সতী সাধ্বী পুরনারীরা তোমাদের না হয় শুনে কায নেই। কিন্তু ওগো অসভ্যতার প্রেতমূর্ত্তি পুরুষজাতি, যদি তোমাদের ধর্ম্ম থাকে, তবে ধর্ম্মতঃ এ কাহিনী শুনতে তোমরা বাধ্য! মাতৃগর্ভ হতে পতিতার সৃষ্টি হয় নি।—তোমরাই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা! তোমাদেরই অবিচারে ব্যভিচারে উৎপীড়নে প্রলোভনে আমাদের উৎপত্তি। কার জন্তে নিরাশ্রয়া সরলা, পাপের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে নরকের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়? কার জন্তে সমাজের তলে তলে ভ্রূণহত্যার রক্তনদ প্রবাহিত হচ্ছে? কার জন্তে বিধবা দড়িতে ঝোলে, আগুনে পোড়ে, বিষ খায়, গঙ্গায় ডোবে?

যে নরকে আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও একদিন দুর্গতি ভোগ করতে হবে, সেই নরকের কীটও আমাদের ঘৃণা করতে পারে,—কিন্তু তোমরা পার না! সুতরাং সুরুচির ভণ্ডামী ত্যাগ করে আমার এ কাহিনী শোন!

আমিও একদিন তোমাদেরই ঘরে মা বোনের মতন শ্বশুরবাড়ীর পুণ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলুম। তখন আমার বয়স হবে চোদ্দ পনেরো। যৌবনের রঙীন নেশায় আবেশ

সবে জাগছিল, তখন কেবল সংসারের কুটনো কোটা বাটনা বাঁটা ঠাকুর ঘরের নৈবিদ্যি সাজানর মত গতময় কাযে মনের তৃপ্তি হত না। অথচ শাশুড়ী ঐ কাযগুলোই আমার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য বলে জেনেছিলেন এবং জানিয়েও-ছিলেন। তাঁর ছেলে অর্থাৎ আমার স্বামী, পুলিশকোর্টে ওকালতী করতেন। তখন শুনতুম এবং বুঝেওছিলুম, পুলিশকোর্টের উকীলরা নাকি সব দিন বাড়ী আসতে পারে না—বিশেষত শনিবারটা। এই ধারণা নিয়ে, আধ পেটা খেয়ে এবং শাশুড়ীর ঘরের মেঝের রাত্রি কাটিয়ে, ক্রমে রোগা হয়ে পড়লুম। আমি নাকি সুন্দরী ছিলুম। তাই পাড়ার পাঁচজনে যখন আমার শাশুড়ীর বধূ ৎসল্যের পরিচয় না পেয়ে আমার পূর্ব্ব রূপ ও স্বাস্থ্যের তুলনা করে জিজ্ঞাসা করত—আমি কেন এমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছি, তখন শাশুড়ী ঠাকুরাণী দোষটা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে বলতেন—"খাচ্চন দাচ্চেন, তবু যে কেন মরা কাট হচ্চেন বলতে পারিনে।" দোষারোপটা এইখানেই শেষ হলে বাঁচতুম। আমার ছেলেপুলে হচ্চে না, আমি বন্ধ্যা—এ অপবাদটাও সঙ্গে সঙ্গে পেতে হত। তখনও শ্বশুরবাড়ীর ভয় ভাঙেনি, তাই এ সব চুপ করে সহ্য করতুম। নয়ত আমার যেমন রাগী মেজাজ, তাতে হয়ত একটা কাণ্ড করেই বসতুম!

স্বামীর মূর্ত্তি আমার কাছে কতটা অপরিচিত ছিল শুনলে হয়ত তোমরা বিশ্বাস করবে না—হাসবে। এক দিন রবিবারে দুপুর বেলা আমার স্বামীর শোবার ঘরে বসে কি করছি, এমন সময় আমার স্বামী (পরে জানতে পেরেছিলুম) টলতে টলতে ঘরে ঢুকচেন। দেখে "মাগো একটা মাতাল" বলে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম—আর তার ফলও হাতে হাতেই পেয়েছিলুম।

স্বামীর প্রহারে অচেতন হওয়ার পর যখন জ্ঞান হল, তখন শুনলুম, শাশুড়ী বাঘিনীর মত ভীষণা হয়ে গাল দিচ্চেন—"হারামজাদি ছোট লোকের মেয়ে—এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার ছেলে মাতাল? বেশ করেচে। তোর বাবার পয়সা খেয়েচে?" ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি বলচি, স্বামীর স্বভাবের পরিচয় পেয়ে মনে যে ব্যথা পেয়ে-ছিলুম, তাতে শরীর ও মন অসাড় হয়ে গেছল। প্রহারের ব্যথা বা বাক্যের জ্বালা সব তলিয়ে গেছল।

বাপের বাড়ীর চুলোয় তেমন কেউ থাকলে আজ আমার এ কাহিনী লিখতে হত না। তাই আবার পিঠের ব্যথার সহস্রগুণ ব্যথা মনে নিয়ে সংসারের দাসীপনা করেও দিনের পর দিন কাটাতে লাগলুম।

দুঃখময় জীবনের ভারে যখন বড্ড নুয়ে পড়তুম, তখন মনে হত আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়োই। কিন্তু জানিনা এ পৃথিবীর আকাশে বাতাসে কি একটা অদ্ভ মাদকতা ছিল, যা ছেড়ে যেতে মন চাইত না। যখন বড় কষ্ট হত, তখন ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতুম। তাতে যেন অনেকটা জ্বালা নিবে আসত!

কিন্তু শাশুড়ীর জন্যে এ শান্তিটুকুও সব সময় ভোগ করতে পারতুম না।

"সোমত্ত বউ ছাতে ছাতে বেড়াবে—এ ত ভাল নয়!" "কুলক্ষণ" বলে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কত ভর্ৎসনা করতেন। তিনি ভাবতেন ঘরকন্নার কায ছাড়া তাঁর সোমত্ত বউয়ের পক্ষে এ সংসারে আর সবই অনাবশ্যক। যদি একটু লুকিয়ে বই পড়তুম অমনি যেন গন্ধ পেয়ে কোথা থেকে বাঘিনীর মত তেড়ে এসে তা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন।

এই রকমে বছর পাঁচ ছয় আলিয়ে পুড়িয়ে আমার শাশুড়ী দুদিনের জ্বরে বাকরোধ হয়ে হঠাৎ মারা গেলেন। আমি যেন—স্বীকার করছি—খানিকটা মুক্তির আস্বাদন পেলুম। দিন দুই পরে আমার ননদেরা পোষ্টকার্ডে খবর পেয়ে বাপের বাড়ী এসে মড়াকান্নার বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিলেন। আমি তখন তেতালার ছাতে বসে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আকাশের নীল রং দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছিলুম!

ননদেরা বোধ হয় আমার এ ব্যবহারের খবর পেয়ে-ছিলেন। তাই খানিক পরে আমার মেজো ননদ মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত ভার করে আমার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "তোমার আপদ তো দূর হয়েছে,

আর আকাশও তো পালাচ্চে না, তা এখন একবার নীচে এলে ভাল হয় না?"

ইচ্ছা হল বলি "আকাশ পালাবে না সত্যি, কিন্তু কিন্তু আপদ একেবারে দূর হয়েচে কৈ?" কিন্তু তা না বলে' ননদের শ্লেষের উত্তরে শুধু বল্লেম, "তোমাদের কান্না শেষ হয়েচে?"

ননদ বাঘিনীর মত ভীষণা হয়ে বল্লেন, "আমরা ত বউ নই যে লোক-দেখানো কান্না কাঁদতে এসেছি।"

আমি একটু হেসে বল্লুম, "কোন কোন শাশুড়ীর গুণে লোক দেখান কান্না কাঁদতেও বৌয়ের প্রবৃত্তি হয় না।"

ননদ আবার গর্জ্জে উঠে বল্লেন, "কেউ তোমায় কাঁদতে বলচে না—তোমার আপদ গেচে, দাদাকে বলে বাড়ীতে থিয়েটার দাও।" ননদ রাগে দুম্ দুম্ করে নেমে গেলেন।

২

বিজ্ঞানের দু'পাতা পড়ে লোকে বলে ভূত নেই, কিন্তু ভূত আছে—অন্ততঃ তার প্রভাব আছে। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ভেবেছিলুম অমূলক অযথা সন্দেহের অত্যাচার থেকে রক্ষে পেলুম। কিন্তু তা হল না—তিনি ভূত হয়ে আমার স্বামীকে আশ্রয় করে আমায় জ্বালাতে লাগলেন। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, বিশেষতঃ চরিত্রহীন স্বামীর সন্দেহ যে কি জ্বালার তা যে ভুক্তভোগী সেই জানে! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে তার কতকটা উপমা। যে অকথ্য কুকথা সাধারণ মানুষে মুখে আনা ত দূরের কথা, মনে আনতেও নিজের কাছে ছোট হয়ে যায়, সেই সব অকথ্য কুকথা বলে স্বামী আমায় সন্দেহ করে জ্বালাতে লাগলেন।

শিশির আমাদের পাশের বাড়ীর অতুল বাবুর ছেলে। তার বয়স বার তের হবে। আমি যখন বউ হয়ে আসি তখন স বছর ছয় সাতের। সে আমায় কাকীমা বলে ডাকত। ছুটি ছাটা থাকলে গল্পের লোভে সে আমার কাছে এসে বাস্তো। এই ঘটনা একদিন স্বামী আমার কাছে থেকেই জান্তে পেরে, যে কদর্য্য বিশ্রী একটা কথা বল্লেন, তা মনে করলে আজও ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। চরিত্রহীন পুরুষের মন যে কত নীচ হতে পারে, সে দিন প্রথমে বুঝতে পারলুম। তার পর থেকে শিশির গল্প শুনতে এলে নানা অছিলা করে তাকে বিদায় দিতাম, কিন্তু সুবিধা পেলে সে গল্প শুনতে আসতেও ছাড়ত না। একদিন কোন আপত্তিই খাটল না। তার কাকুতি মিনতি দেখে একটা গল্প বলতে হল। গল্পটা শেষ হয়-হয়, এমন সময় হঠাৎ দেখলুম স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে। বুঝলুম, তিনি ইচ্ছে করেই নিঃশব্দে এসেছিলেন। চোখোচোখি হতেই তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "বেশ!" এই বলেই তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। শিশির বেচারী সেই গম্ভীর আওয়াজে থতমত খেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি ত স্বামীর গুণ জানতুম—পাছে ফিরে এসে আবার কি বলে বসেন তাই শিশিরকে বললুম—"তুমি এখন বাড়ী যাও।" যাবার সময় বেচারা মুখ শুকিয়ে বল্লে—"বাবাকে কাকা বলে দেবেন না ত কাকী-মা?...আমি তো পড়া তৈরী করে এসেচি!"

আমি তাকে অভয় জানিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি বিদায় দিয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে বললুম—"তোমার কি হ'ল?...মুখ অত গম্ভীর কেন?"

দুই চোখে নিরুদ্ধ রোষের খানিকটা আভাস দিয়ে তিনি বল্লেন—"এর উত্তর কাল পাবে!" কথাটা শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। ভাবলুম পুরুষ জাতটা বদমেজাজী, কি জানি কি করে বসে! তাই একটু নরম-সুরে বললুম, "তুমি পাগল হয়েচ? আজ আমার ছোট ভাই নিতাই যদি থাকত, তো সেও ওর চেয়ে বড় হ'ত!" উত্তরে স্বামী যে কথা বল্লেন, তা আমি পতিতা রমণী হলেও বলতে পারব না! সেই কথা শুনে, আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত রাগে এমন রি-রি করতে লাগল যে, আমি নিজেকে সামলাতে পারব না জেনেই আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

পরদিন স্বামী উত্তর দিলেন বটে—কিন্তু তার সবটুকুই ভুল। আমি কিন্তু সেই ভুল উত্তরের যে প্রত্যুত্তর দিয়েছিলুম, তা আগা-গোড়া এমন নির্ভুল চোস্ত—এমন

মুখের মত যে, তা ভাবলে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে।

সেদিন শনিবার। কোর্টের ফের্তা স্বামীর আমার বাড়ী আসবার কথাই নয়। তবু পূর্ব্ব দিনের কথাটা মনে করে মনটার মধ্যে একটা অস্পষ্ট ভয় কেমন যেন তাল পাকিয়ে উঠ্‌ছিল।

বিকালের দিকে আমি রান্নাঘরের রকে বসে,—কত কি ভাবছিলাম। ঝি উনুনের জন্যে কয়লা ভাঙছিল। হঠাৎ একটা মোটর এসে আমাদের সদর দরজায় হাঁপাতে লাগল। স্বামী ফিরলেন ভেবে মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল। মনের আবেগে আমি মাঝের দরজার দিকে খানিকটা ছুটে গেলুম...বেশী দূর যেতে হল না, দেখলুম স্বামী অন্দরে ঢুকে পড়েছেন, আর তাঁর সঙ্গে—এই আমাদের দলের—একটি সুন্দরী শয়তানী!

না-সুখ না-দুঃখের অবস্থাকে 'নির্ব্বাণ' বলে, না? এক ভিস্তি যেমন কোন্ এক বাদশার অনুগ্রহে কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাদশাগিরি পেয়েছিল, আমিও তেম্‌নি আমার স্বামীর অনুগ্রহে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে বুদ্ধদেবের সুকঠোর সাধনালব্ধ সেই 'নির্ব্বাণ' পেয়ে বসেছিলুম!

তারপর 'নির্ব্বাণের' নেশা কেটে গেলে শুনলুম স্বামী বলচেন—"ইনি হচ্চেন 'মায়া' থিয়েটারের সেই বিখ্যাত মিস্ 'মঞ্জু'...এঁর ওখানেই আজ আমার নিমন্ত্রণ... আজ আর আমি বাড়ি ফিরচি না, তুমি না হয় আজ শিশিরকে গল্পের নেমতন্ন কোরো।" স্বামীর কথা শেষ হতে দেখলুম তাঁর সহচরী খানিকটা চাপা হাসি রুমালে মুছে নিয়ে বল্লে—'আসি, নমস্কার!'

আমি একটা কথারও উত্তর দিতে পারলুম না। পাথরের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম মাত্র! তারা আমার চোখের সামনে সাহেবী কেতায় হাত ধরাধরি করে চলে গেল। তখন আমি আপন মনে বল্লাম—"আচ্ছা।"

৩

পুলিশ কোর্টের উকীলের ভূতপূর্ব্ব স্ত্রী আমি নির্ম্মল-কুমারী যে কেমন করে' এখন বীডন্ ষ্ট্রীটের উপরকার নীল চিক ঢাকা বারান্দার 'আঙুরবালা'তে পরিণত হয়েছি তার বিস্তৃত বিবরণ দিতে চাই না। সে ইতিহাস এত বিষাক্ত,—এত তীব্র, যে তা উদ্‌ঘাটিত করলে তার নিশ্বাসে ঘরে ঘরে অন্তঃপুরের হাওয়া পর্য্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠবে। আর তার ফলে হয়ত আমার মত অনেক অভাগী পতি-ভক্তির শিকল ছিঁড়ে' আমার পথে ছুটে আসতে উৎসাহ পাবে। আমি চাই না সে উৎসাহ দিতে। আমি চাই, স্বামী জাতটাকে সতর্ক করে দিতে। ওগো নারীর 'পরম গুরু'র দল! দেবতা হতে চাও তো সত্যিকার দেবতা হও!

যাক্, এখন আমি আমার কথা বলি। এই যে আমি এ পথে উল্কার মত ছুটে এসেছিলুম—কিসের জন্যে? নবল অলংকারে রূপের ডালি সাজিয়ে, নৃত্যগীতে পশু-গুলোর বুকে ভোগলালসার দাবানল সৃষ্টি করতে কি? তা নয়।—সেই যে আমার স্বামী, আমার শ্বশুরের সাত পুরুষের ভিটেয় দাঁড়িয়ে আমার অপমান করে গেছেন,—সে অপমানের শোধ দেবার জন্যে আমি আমার তিন-কুলের মুখে কালী মাখিয়ে এসেছিলুম! সে অপ-মানের শোধ আজও তো নিতে পারলুম না!

আপশোষে ধিক্কারে আরও দু'মাস কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। দেখি,—আমার স্বামীর এক এটর্ণি বন্ধু এসে আমার দ্বারে অতিথি! আঙুরবালার গানের খ্যাতি তাঁর কাণে যাওয়ায়, তিনি নাকি গান শুনতে এসেচেন!

আমার গানের খ্যাতি তাঁর কাণে পৌঁছুতে এত দিন লাগল জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটু হেসে বল্লেন—"না, তোমার গানের খ্যাতি অনেক পৌঁছেছিল। আমি তখন ওয়ালটেয়ারের হাওয়ায় ভাঙা শরীর মেরামত করতে ব্যস্ত ছিলুম।" আমি বল্লুম "জানেন ত, ড্যামেজ্‌ড্ জিনিস খুব সাবধানে রাখতে হয়!" তিনি বল্লেন—"তাই-ত আর বড় একটা এদিকে আসিনা...তবে নেহাৎ গান শোনবার বাতিকেই যা আসা।"

আমি মনে মনে স্থির করলুম, এঁর দ্বারাই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়ে নিতে হবে।

তারপর আরও তিনমাস কেটে গেছে। আজ আমার ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। কাশীপুর অঞ্চলে এটর্ণিবাবুর বাগনবাড়ীতে পার্টির ব্যবস্থা করিয়েছি। আমি আর এটর্ণিবাবু, মোটরে করে' যাবার পথে, তাঁর পুলিশকোর্টের উকীল বন্ধুটিকে গাড়ীতে তুলে নেব স্থির হয়েচে। এ সব আমারই চক্রান্ত!

বেলা তিনটায় লগ্ন স্থির হয়েচে! আমি আজ খুব মনের মত করে সাজ-গোজ করলুম।

ঠিক সময়ে এটর্ণিবাবু এসে উপস্থিত হলেন। আমি সেই ভুবন ঝলসান রূপ নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লুম। গাড়ী ভোঁ ভোঁ শব্দে ছুটলো, আর আমি রাস্তার দুধারে রূপের আগুন ছড়িয়ে চকিতে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলুম।

এইবার আমার বুকের রক্ত তালে তালে নাচতে লাগল। মনে হতে লাগল, ভীষণ আনন্দের টন্‌টনানিতে বুঝি হৃদপিণ্ডটা ফেটে পড়বে। ক্রমে গাড়ীর গতি ঢিলে হয়ে এল…ঐ অদূরে আমার শ্বশুরবাড়ীর চিলের ছাদ দেখা যাচ্চে!—তার পর—আর কিছুই মনে নেই!…গাড়ী যখন বাড়ীর কাছে থামল, আমি নাকি তখন অজ্ঞান।

হায়! এত চেষ্টা করেও, আমার দেখে আমার ভূতপূর্ব্ব স্বামীর মুখের ভাবটা কেমন হয়েছিল তা দেখতে পেলুম না। এটর্ণি বাবুর মুখে শুন্‌লুম, আমার মূর্চ্ছিত মুখের পানে চেয়ে স্বামী নাকি চম্‌কে উঠেছিলেন, আর তাঁর মুখখানা নাকি ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল …তিনি নাকি টল্‌তে টল্‌তে কোনও কথা না বলে' ভিতরে চলে গেলেন, এটর্ণির সঙ্গে আর দেখা করেন না!—যা চেয়েছিলুম, সবই হ'ল—কেবল নিজের চোখে দেখবার সখটুকু মিটল না!…

দু'দিন পরে শুনলুম, তিনি সেই দিনই বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেছেন! ঠিকই করেচেন! এ না করলে আমাকে তাঁর আরো অপমান করা হত। এই আত্মহত্যা করেই তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন,—তিনি তাঁর পত্নীকে অপমান করে' কতদূর অন্যায় করেছিলেন তা এখন বুঝতে পেরেচেন।

এইবার আমার পালা!

তিনি আত্মহত্যা করলেন আমার জন্যে! আর আমি তা নীরবে সহ্য করব?…তার উত্তর দেব না?—এ হতে পারে না! এত ভালামানুষ আমি নই—হতে পারব না!

তোমরা হয়ত আমার এ কাহিনী শুনে আমাকেই দোষ দেবে ও বলবে, "তোমার স্বামী যতই দোষ করুক না কেন, তা বলে তোমার অমন করাটা কিছুতেই ভাল হয় নি।" সে ভাল মন্দর বিচার তোমরা কোরো, আমার উগ্র প্রকৃতিতে সইতে না পেরে যা করেছিলুম, তাই এক বর্ণ না বাড়িয়ে বল্লুম। এখন দোষ দিতে হয় দিও, আহা বলতে হয় বোল, আমি শুনতে আসব না।

এ কাহিনী তোমাদের কাণে পৌঁছবার আগেই আমার দেহ মড়াকাটার ঘরে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে, পরে কাশী মিত্তিরের ঘাটে, অন্য সব "গাদার মড়া"র সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যদি পরজন্ম থাকে, আর যদি সেখানে স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমি পতিতা কি না।

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

সবাই সমান

ধনী ও দরিদ্র মাঝে অর্থের প্রভেদ,
রাজা ও প্রজার মাঝে ক্ষমতার ভেদ।
সম্মানের ভেদাভেদ জ্ঞানী মূর্খ মাঝে,
সবল দুর্ব্বল মাঝে শক্তি ভেদ আছে।

সাধু ও পাপীর মাঝে ধর্ম্মের প্রভেদ;
কিন্তু এক স্থানে নাই এই ভেদাভেদ।
অতিশয় পুণ্যভূমি—সে যে রে শ্মশান,
তার কাছে ছোট বড় সবাই সমান।

শ্রীদীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

সমালোচনার

সমালোচনা বলিতে বিষয়-বিশেষের সম্যক্ আলোচনা বুঝায়। সুকুমার কলার বিষয়ীভূত যাহা কিছু প্রচারিত হয় তাহা বুঝাইবার, তাহার দোষগুণ বিচার করিবার চেষ্টার নাম সমালোচনা। রসানুভূতির (appreciation) অর্থও কতকটা তাই। রসানুভূতি ও সমালোচনার পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত পদ্ধতিতে দোষ ও গুণ বিচারিত হয়। রসানুভূতিতে কেবলমাত্র গুণ-ব্যাখ্যানই হইয়া থাকে। কবি, চিত্রকর, নাট্যকার ও শিল্পীকে বুঝাইবার, তাহাদের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার ও অনুভূতির সাহায্যে রস-ব্যাখ্যা করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। সমালোচনায় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা থাকে। তীক্ষ্ণধী সমালোচক বিচারক। তাঁহার রায় বিচার-সহ হওয়া চাই। সহজ-জ্ঞান, বিচক্ষণতা, রসবোধ, সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব-জ্ঞান এবং মার্জ্জিত রুচির বলে সমালোচক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সত্য-সন্ধ নিরপেক্ষ সমালোচকের কষ্টিপাথরে আর্ট, শিল্প, কাব্যাদি যাচাই হইয়া তাহাদের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, ঐ সকল বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ প্রচারিত হয়। প্রকৃত সমালোচনা তাহাই, যাহার দ্বারা নিরপেক্ষভাবে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। প্রকৃত সমালোচনার ফলে শিক্ষার বিস্তার হয়, ভাবুক লেখকের ও কবির সৌন্দর্য্যানুভূতি ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের একটা দুর্ব্বলতা আছে যে, সে অপরের বিচারফল নতমস্তকে গ্রহণ করিতে পারে না। অহং-জ্ঞান ও অভিমান এই দুর্ব্বলতার মূলে বিদ্যমান। যতক্ষণ সমালোচক আমাদের কার্য্যের উৎকর্ষ দেখান, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পক্ষপাতী, আর যখনই তিনি আমাদের দোষ দেখান, তখনই তিনি আমাদের শত্রু হইয়া পড়েন। ভূয়োদর্শন, ভূয়ঃপঠন, বিচার-বিশ্লেষণ-শক্তি, সাহিত্যের রসবোধ না থাকিলে ও মার্জ্জিত রুচি সম্পন্ন না হইলে কেহ প্রকৃত সমালোচক হইতে পারে না। সত্যের প্রতি অচলা নিষ্ঠা না থাকিলে সমালোচক হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

চিত্র, শিল্প ও কাব্যাদির বর্ণিতব্য বিষয় মানবজীবনের অনুভূতি ও ভাবের অভিব্যক্তি। যখন সমালোচককে এইগুলি বিশ্লেষণ করিতে হয়, তখন মনে হয়, মনোবিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত সত্যগুলির সহিত সমালোচকের সম্যক্ পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক। কোন্ অবস্থায় কিরূপ অনুভূতির স্ফুরণ সম্ভবপর, কোন্ মানসিক ভাবের বহিঃপ্রকাশ কিরূপে হইয়া থাকে, কোন্ ইচ্ছা মানুষকে কি ভাবে কার্য্যে প্রণোদিত করে, তাহা ভালরূপে জানা না থাকিলে জীবনের অনুভূতি ও বেদনার সমালোচনা করা ধৃষ্টতামাত্র। এ ছাড়া লেখক-সৃষ্ট চরিত্র বা অনুভূতির ব্যাখ্যা সমালোচককেই করিতে হয়। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ না হইলে এরূপ কার্য্য কেহ সুসম্পন্ন করিতে পারে না। লেখক বা চিত্রকরের ব্যক্তিত্ব, যাহা রচনা বা চিত্রের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহাই সমালোচক আমাদের নিকট বিবৃত করিয়া দেন, উহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, সাহিত্যিক স্রষ্টাদের ন্যায় চরিত্র সৃষ্টি না করিলেও সমালোচকেরা জীবন-বেদের ব্যাখ্যা করিয়া নূতন ভাবের সন্ধান দেন। স্রষ্টার সৃষ্ট চরিত্রের অপূর্ণতা দেখাইয়া চরিত্রকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার পন্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহারাও সৃষ্টি-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন।

এখন দেখিতে হইবে সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচনার আবশ্যকতা আছে কি না। অধুনা মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় প্রতিদিন যেরূপ ভূরি ভূরি পুস্তক ও চিত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে, তাহা একজীবনে পাঠ করা বা দেখিয়া ওঠা

বড় সহজ ব্যাপার নয়; কে বলিয়া দিবে ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি অধীতব্য ও দ্রষ্টব্য। মনীষী বেকন একদিন বলিয়াছিলেন, "কতকগুলি পুস্তক কেবল পড়া চাই, কতকগুলি গলাধঃকরণ করা চাই, আর কতকগুলি পুনঃ পুনঃ পড়া ও আয়ত্ত করা চাই।" এ কথার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আর এই বাণী বঙ্গভাষায় প্রকাশিত পুস্তকাবলীর প্রতি সম্পূর্ণ প্রযুজ্য। তাই বলি, ভাল ও মন্দ বাছাই করিবার ভার লয় কে? সমালোচকেরা এই কার্য্যের ভার লইয়া থাকেন।

এখন দেখিতে হইবে সমালোচকদের হস্তে এই ভার দেওয়া সঙ্গত কি না? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, লেখক ও পাঠকদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি সমালোচকের স্থান নাই। পাঠক লেখকের রচনা পড়িয়া স্বয়ং তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন, সমালোচক এই দুই জনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইবেন কেন? এই 'কেন'র উত্তর দিবার একটু চেষ্টা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, সমালোচকের কায বড় সহজ নয়। আজ কাল অনেক স্থলে আলোচ্য পুস্তক ভাল করিয়া পাঠ না করিয়া সমালোচক সমালোচনা করিয়া থাকেন। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ নন, অনেক সময় দেখা যায় তিনিই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ন্যায় মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। আবার কেহ কেহ মাসিক বা সাময়িক পত্রের প্রকাশিত সমালোচনার প্রতিধ্বনি করিয়া আপনাদের দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। সমালোচকের প্রথম কর্ত্তব্য সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া একাধিক বার আলোচ্য পুস্তক পাঠ করা। সমালোচক প্রথম পঠনেই যে লেখকের ভাবের সহিত পরিচিত হইবেন সকল সময় এরূপ মনে করা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যে অনেকগুলি অপাঠ্য। কতকগুলি কেবল মাত্র বিষয়-বিশেষ বা চরিত্র-বিশেষের জন্য পাঠ করা উচিত। প্রকৃত সমালোচকদের নিকট হইতে এই দুই শ্রেণীর পুস্তক সম্বন্ধে আমরা যথোচিত সাহায্য পাইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তক সম্বন্ধে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, ঐগুলির ভিতর যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহার যথাযথ চিত্র সমালোচকদের নিকট হইতে পাইয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। গুরুভোজনে শরীর যে অসুস্থ হয় একথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। গুরুভোজনের দায় হইতে ইঁহারা আমাদিগকে অব্যাহতি দেন। আর কতকগুলি যুগান্তকারী পুস্তক আছে, যাহা ভাষা ও ভাবের নূতনত্বে জগৎকে মোহিত করিয়া দেয়, নূতন আলোক-সম্পাতে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়, জ্ঞানমার্গে মানবকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এ শ্রেণীর পুস্তক সকলেরই পাঠ করা উচিত। কিন্তু একটা কথা বলিতে চাই, ভাবের অগ্রদূত কবি বা মনীষী সাধনবলে যে অমূল্য রত্ন পাইয়া জগতে বিলাইয়া দেন, তাহার সন্ধান সাধারণে কি করিয়া রাখিবে? গতিশীল জগতে অগ্রগামী ভাবের সহিত পরিচিত না হইলে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। আর কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই
পড়ে থাকা পিছে
মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।

পিছনে পড়িয়া থাকা, আর পদে পদে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা। জীবন্মৃতের অবস্থা শোচনীয়। তাই বলি, জগতের নূতন ভাবধারার সহিত পরিচিত হইয়া মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এ কার্য্যে সমালোচকই আমাদের সহায়ক হইতে পারেন; কারণ জগতের যাহা কিছু নূতন প্রকাশিত হইতেছে, সর্ব্বাগ্রে তিনিই তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁর কথামত আমরাও তাহা পাঠ করিয়া যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যাঁহারা বলেন লেখক ও পাঠকের মধ্যে সমালোচকের স্থান নাই তাঁহাদের কথাটা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। এ বিষয়ে আরও একটা ভাবিবার কথা আছে। সাধারণ লোককে নানা-

বিধ কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে-হয়। পাঠ করিবার অবসর তাহাদের বড় থাকে না। আর যেটুকু থাকে, সে সময়ে কতগুলিই বা পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায়? সেই স্বল্প অবসরটুকু বাজে বই পড়িয়া নষ্ট করা কি উচিত? না, সেই সময়ে প্রকৃত সমালোচক-প্রশংসিত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা ও তৃপ্তি লাভ করা যুক্তিসঙ্গত?

সমালোচক আমাদের যেরূপ সহায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ তিনি আবার আমাদের ভাবের নিয়ামক হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তার হন্তারকও হইতে পারেন। কথাটা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে চাই। সমালোচকের লেখা পাঠ করিয়া অনেক সময়ে আমরা তাঁহার চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া থাকি। তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিচারসহ কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখি না। আবার তিনি যদি বিশ্রুতকীর্ত্তি সমালোচক হন, তবে ত কথাই থাকে না। তাঁহার মতের প্রতিধ্বনি করিতে আমরা অতিমাত্রায় ব্যগ্র হই—অলক্ষ্যে তাঁহার মতানুসারে আমরা কার্য্য করিয়া থাকি। আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে তাঁহারই নিকট বলি দিই। সমালোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিবার সময় তাঁহারই চক্ষু দিয়া আমরা দেখিয়া থাকি, তাঁহারই চিন্তায় প্রভাবিত হইয়া আমরা আমাদের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। তিনি যে ধারাবশে চিন্তা করেন, আমরাও সেই ধারার খাতে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিই। তাঁহার ভুল-ভ্রান্তির দিকে আমরা অবহিত হই না। তাঁহার চিন্তার সূত্রগুলিকে আমরা তর্ক ও রসশাস্ত্রের আইনানুসারে বিচার করি না। এরূপ ক্ষেত্রে সমালোচক আমাদের সহায়ক না হইয়া আমাদের স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধক হন। লেখকের ভাবের সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় করিয়া না দিয়া, সমালোচক তাঁহারই স্বকপোলকল্পিত চিন্তার ধারার সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দেন। লেখকের ভাবের সহিত পরিচিত হওয়া পাঠকের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি এবং বিশ্লেষণ সাহায্যে যে সমালোচক এই কার্য্যে আমাদের সহায়তা করেন, তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। আর যে দূরদর্শী সমালোচক লেখকের দোষগুণ দেখাইয়া সত্যের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, লেখকের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করিবার চেষ্টা করেন, আমাদের নিকট তিনি অধিকতর ধন্যবাদের পাত্র। দোষ যিনি দেখাইয়া দেন, তাঁহার মত বন্ধু আমাদের আর কে আছে? ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুল-ভ্রান্তি মানুষেরই হয়। লেখকেরা যে অভ্রান্ত এ ধারণা কি করিয়া তাঁহাদের মনের ভিতর যে জাগিয়া উঠে তাহা বলিতে পারি না। অন্য কেহ যে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক জানিতে পারেন না, বা তাঁহাদের অপেক্ষা বোধ-শক্তি অন্যের প্রখর হইতে পারে না, এ কথাটাই বা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না কেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। জ্ঞানী, বহুদর্শী সমালোচকদের নিকট হইতে তাঁহারা যে উপকৃত হইতে পারেন, ইহাও তাঁহাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদেরই দেশের কবি বহুদিন পূর্ব্বে উপদেশচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন—'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার লুকান রতন।' লুপ্তরত্নের সন্ধান করা সকলেরই উচিত। সমালোচকের লেখনীর ভিতরও যে 'লুকান রতন' থাকিতে পারে না তাহা কে বলিতে পারে? যুক্তিযুক্ত কথা যিনিই বলিবেন, তাঁহার কথাই শ্রবণ করা ও বিচার করিয়া দেখা লেখক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

মনে রাখিতে হইবে, শিষ্ট সমালোচনার উদ্দেশ্য নূতন আলোক-সম্পাত করা—লেখকের অনুজ্জ্বল ধারণাকে নূতন তথ্য ও জ্ঞানগর্ভ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উজ্জ্বল করা—লেখকের রচনা, বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্য ও রসানুভূতির পরিচয় দেওয়া। এক কথায় বলিতে গেলে লেখকের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে পরিচিত করিয়া দেওয়া প্রকৃত সমালোচকের কায। লেখকের অন্তর্নিহিত ভাবের সন্ধান করাই কিন্তু সমালোচকের একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। লেখকের অপূর্ণ ভাবকে পূর্ণতা দান করা, সৃষ্ট চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করা, লেখকের চিন্তার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-

সাধন ও তাঁহার কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করা সমালোচকের অবশ্য করণীয়। সুলেখক ও প্রসিদ্ধ বরেণ্য সমালোচক অধ্যাপক হড্‌সন সাহেব এই কথাই বলিয়াছেন—"The chief function of criticism is to enlighten and stimulate." তিনি আরও বলিয়াছেন, বড় কবি যেমন তাঁহার হৃদয়ের অনুভূতির সহিত আমাদের পরিচয় করিয়া দেন, বড় সমালোচকও আমাদিগকে তেমনই সাহিত্যের রসবোধ করাইয়া দেন ও সত্য—শিব—সুন্দরের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। বিশেষজ্ঞ সমালোচক তাঁহার অধীত বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসার-ফলে যে কথা প্রচার করেন তাহার সত্যতা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ কোন লেখক মহাশয় কি দিতে পারেন? বিচার বিশ্লেষণ করাই যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহারা যে ঐ বিষয়ে কালে অধিকতর দক্ষ হন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অনুমাত্র কারণ নাই। ভাবুক বিশ্লেষণ শক্তিসম্পন্ন উদারহৃদয় বহুদর্শী সমালোচকের কথা কি বিনা যুক্তিতে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসঙ্গত? এ সম্বন্ধে আমি মনীষী হড্‌সন সাহেবের যুক্তিপূর্ণ রচনা হইতে জ্ঞানগর্ভ কয়েক ছত্র ভাষান্তরিত করিয়া আমরা বক্তব্যকে স্ফুটতর করিব। তিনি বলেন, "আমরা কোন পুস্তক পাঠ করিয়া যাহা বুঝিব, প্রকৃত সমালোচক যে তাহা অপেক্ষা বেশী বুঝিবেন, একথা স্বীকার করা শিষ্টাচার সঙ্গত; এবং একথা মনে চিন্তা করা কি নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয় যে, এরূপ শক্তিধর সমালোচকের সাহায্যে আমরা অধীত পুস্তক হইতে সৌন্দর্য্য ও শক্তির উৎস অনায়াসে বাহির করিতে পারিব না? এ কথা খাঁটি সত্য যে তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা একরূপ অন্ধই থাকিয়া যাই। অনেক সময় সমালোচক আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের সন্ধান দেন। লেখকের ভাবকে মূর্ত্তি দান করিয়া তাহার ভিতর জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিয়া দেন। আমরা লেখকের নিকট হইতে যে অস্পষ্ট ধারণা লইয়া আসি তাহাকে তিনি সুস্পষ্ট করিয়া দেন। কোন কোন সময়ে সমালোচক আমাদের পথ-প্রদর্শক, বিপথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে নূতন পথে চালিত করেন। আবার অনেক সময় তিনি আমাদিগের মহোপকারী বন্ধু। পরিচিত বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়া আমাদিগকে সংসারপথে কতকটা অগ্রসর করিয়া দিবার পক্ষে সাহায্য করেন। লেখকের রচনাবলী নূতন করিয়া পাঠ করিবার প্রবৃত্তি তিনিই দান করেন। আবার যখন তিনি লেখকের মতকে খণ্ডন করেন—তাঁহার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখনই তিনি তাঁহাকে অধিকতর সাহায্য করেন। লেখকের ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সমালোচক তাঁহাকে শিক্ষা দেন ও সত্যপথে চালিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার সহিত আমাদের মত-পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সাহচর্য্যে আসিয়া আমরা শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি যে লাভ করিব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"—কথাগুলি আমি সকলকেই অবহিত ভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

প্রকৃত সমালোচক সাধারণ রুচির পরিবর্ত্তক। যুগে যুগে রুচির যে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহার মূলে সমালোচকের মঙ্গল হস্ত সুস্পষ্ট বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন বাঙ্গালা দেশের রঙ্গালয়ের কথা। পাশ্চাত্য জগতের রঙ্গালয় গুলির ন্যায় আমাদের দেশের রঙ্গালয়গুলি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের পদবাচ্য না হইলেও, প্রকৃত সমালোচকদিগের সমালোচনার ফলে ঐ গুলি সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইতেছে —নাট্য সমালোচকগণের আলোচনার ফলে দেশের লোকের রুচি সৎনাটক দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। আদর্শ নাটকের পরিকল্পনা, স্থানকালোপযোগী বেশভূষা, স্থানোপযোগী দৃশ্যপটাদি-সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে রঙ্গমঞ্চের অধিকারীরা সমালোচকদের লেখনীর ফলে অবহিত হইতেছেন। রুচিবিগর্হিত নৃত্যগীত স্থলে মনোমোহকর লীলায়িত দেহভঙ্গির সচল গতি ও রসপূর্ণ সঙ্গীত দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চের কর্ম্মকর্ত্তাদের

নিকট তাঁহারা যে বিকৃত রুচির পোষকতা করিতেছেন, এ অভিযোগ করিলে তাঁহারা হাসিয়া উত্তরে বলিতেন, "সাধারণে যাহা চায়, আমরা তাহাই দিতেছি।" তখনকার সমালোচকগণের তীক্ষ্ণ তর্করাজি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিত না যে সাধারণ রুচির পরিবর্ত্তন তাঁহারা অক্লেশে করিতে পারেন ও পূর্ব্বে বহুবার করিয়াছেন। কবিবর গিরিশচন্দ্র যখন ধর্ম্মমূলক নাটক বাহির করিয়াছিলেন তখন কি রঙ্গমঞ্চগুলি লোকাভাবে শূন্য থাকিত? যাহা হউক, সময় ফিরিয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত নটেরা ও রঙ্গমঞ্চের অধিকারীরা একথা এখন বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা সাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন করিতে পারেন এবং বুঝিয়া, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। আশা করি আমরা অচিরে বঙ্গরঙ্গমঞ্চগুলিকে শিক্ষার অনুকূল প্রতিষ্ঠানরূপে দেখিতে পাইব। নাট্যসমালোচক রঙ্গমঞ্চের রুচিকে উন্নত করিতে ও রঙ্গালয়ের গতিকে উচ্চ আদর্শের দিকে পরিচালিত করিতে পারেন।

সাহিত্যে সর্ব্বদা কিন্তু সুষ্ঠু সমালোচনা পাওয়া যায় না। সুষ্ঠু সমালোচনা প্রাতঃকালের তালের রসের ন্যায় মধুর স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর; আর বিদ্বেষপ্রণোদিত একদেশদর্শী সমালোচনা মধ্যাহ্নে ঐ রসের বিকৃতি, উগ্র মদিরার ন্যায় প্রখর, জ্বালাময়। কল-সমালোচক বিশ্ববিশ্রুত রাস্কিন সাহেব সত্যই বলিয়াছেন, মন্দ সমালোচকের ন্যায় অনিষ্ট জগতে কেহ করিতে পারে না। কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখা উচিত, যে কোন কারণেই হউক না কেন, যদি কোনও সমালোচক লেখকের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন—সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া নিছক নিন্দা বা স্তুতি করেন, বা অনাবশ্যক ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কুৎসা প্রচার করেন, তাহা হইলে, কিংবা ক্ষমতাশালী লেখকের শক্তির অপব্যবহার দেখিলে কি বলিতে হইবে সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা নাই? দু চারিজন অক্ষম সমালোচকের হস্ত-কণ্ডূতি দেখিয়া কি আমরা সমালোচক-শ্রেণীর উপরে খড়্গহস্ত হইব, কিংবা সমালোচনা-প্রথাকে উঠাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির করিব?

অভ্রান্ত মানব জগতে পাওয়া যায় না। সমালোচনতত্ত্ব এখনও পরীক্ষিত বিজ্ঞানের স্তরে উঠে নাই সত্য। তাই বলিয়া কি সমালোচনা-কার্য্য এখন বন্ধ থাকিবে? আর কখন কখন একযুগের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি অন্য যুগে ভ্রমাত্মক বলিয়া স্থির হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের ত কোনদিন নিশ্চেষ্ট থাকিতে কেহ দেখে না। তাঁহারা সত্য-নির্দ্ধারণের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেন, ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কোন বৈজ্ঞানিকের গৌরব কোন দিন হ্রাস হয় না। সমালোচকদের অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তমতের জন্য তাঁহাদের গৌরবও কোন দিন হ্রাস হইবে না। মন্দ সমালোচকের সমালোচনায় দোষ যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সেগুলি চিন্তাশীল সমালোচকের সুষ্ঠু সমালোচনাকে কোন দিন চাপিয়া রাখিতে পারিবে না।

সাহিত্যে সমালোচনা উঠিয়া গেলে একটা অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। বিশ্বের ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার যাহাদের সময় ও সুবিধা নাই এমন পাঠকদের, মহামনীষীদের ভাবধারার সহিত পরিচয় কি করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিবে? উভয়ের মধ্যে ভাবের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে। সৌন্দর্য্য ও রসবিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পাঠক সম্পূর্ণ রস উপভোগ করিবার জন্য—তথা শিক্ষা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পুস্তক পাঠ করিবেন। সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী মনীষীরা সমালোচকদিগের অভিমত না চাহিতে পারেন, কারণ তাঁহারা জানেন সংবাদপত্র-পরিচালকেরা তাঁহাদের পুস্তকের পরিচয় যে কোন ভাবে দিবেনই; কিন্তু যশের উচ্চশিখরে যাঁহারা এখনও উঠিতে পারেন নাই, সেই সকল নবীন সাধকের সিদ্ধির ঘোষণা কে করিয়া দিবে? লেখকের গুণ-ব্যাখান দেখিলে তাঁহারা স্বয়ং যে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন একথা সত্য। আবার অনেক নবীন সাহিত্যিকের মুখে শুনিয়াছি, পত্রিকাসম্পাদক বা সমালোচকেরা যদি তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাদের পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন, তাঁহাদের দোষ ও ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপকার করেন; সাধারণ পাঠক নূতন লেখকের নামের সহিতও

পরিচিত হইবার সুযোগ পান। তাঁহারা বলেন, নীরবতা ও উপেক্ষা তাঁহাদের ধৈর্য্যের সীমাকে লঙ্ঘন করে। কথাটার ভিতর যে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সাহিত্য, জাতীয় জীবনের মুকুর—জাতীয় জীবনের চিত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির সভ্যতা ও 'অনুশীলনের' (culture) ধারা সহজে বুঝিতে পারা যায়। আজকাল কিন্তু আমাদের সাহিত্যে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও সংযমের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। অধুনা যে সকল চিত্র ও "সমস্যা" কথা-সাহিত্যে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশ বিদেশীয় অনুকরণে চিত্রিত ও লিখিত। উহাদের ভিতর অনেকগুলি যে কাল্পনিক বা আমাদের দেশোপযোগী নয়, তাহা চিন্তাশীল পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। এই সকল অনাগত সমস্যা আমাদের দেশের ধাতুতে সহিবে কি না তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। নচেৎ এগুলি বাঙ্গালীর চিরন্তন সমস্যা সকলকে চাপিয়া ফেলিবে। এগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় বাঙ্গালী বুঝি আপনাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাই দুঃখের সহিত বলিতে হয়, যে দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, পূর্ণচন্দ্র, ঠাকুর দাস, কালীপ্রসন্ন, যোগীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্রের ন্যায় কুশাগ্রবুদ্ধি তীক্ষ্ণধী সমালোচকের সমালোচনার ফলে ও শেষোক্ত দুই জনের অব্যর্থপ্রমাথী বিদ্রূপ-বাণে সাহিত্যিকেরা সত্যের পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারিতেন না, আজ তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানে সাহিত্যিকেরা কোন্ পথে চলিতেছেন? সাহিত্যের আবর্জ্জনা তাঁহারা দূর করিয়া দিতেন। আজ তাঁহাদের অভাবে বঙ্গ-সাহিত্য কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে কি ভাসিয়া যাইবে? তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী কি প্রকৃত সমালোচনা করিতে শিখিবে না—গুণের আদর করিবে না—প্রকৃত মনীষার পূজায় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিবে না— অসুন্দরকে পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরের উপাসনা করিবে না—অসত্যকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে দৃঢ় বন্ধনে ধরিয়া রাখিতে শিখিবে না—আপাতমনোরম লালসা বর্দ্ধক চিত্রের স্থলে বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য দ্যোতক ভাবোদ্রেককারী চিত্র স্থাপিত করিবে না? বাঙ্গালী কি আর্টের অজুহাতে অশ্লীল অস্বাস্থ্যকর চিত্র অঙ্কিত করিবে? বাঙ্গালী কি সৎ সাহিত্যের প্রচার করিয়া সমাজ ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবে না?" *

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

* বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে পঠিত।

নারী

ফুল যথা ফুটি বনে সুগন্ধ বিলায়—
নিজ বক্ষ মধু দিয়া মধুপে বাঁচায়,
রূপে করে জগতের চিত্ত বিনোদন,
ঝরে যায় অবশেষে আসিলে মরণ।
নারী তথা গৃহে গৃহে ফুলের মতন
স্নেহের মধুর ধারা করিয়া ক্ষরণ,
দিয়া নিজ বক্ষ-ক্ষীরে তনয়ে বাঁচায়,
কমলার সম গৃহে লক্ষ্মীশ্রী ফুটায়।
হৃদিক্ষেত্রে প্রেম ফল্গু বহে পতি-তরে,
গুরুজনে সেবা ভক্তি প্রাণপণে করে।
যবে তার সব কায হয় সমাপন,
মৃত্যু রচি দেয় চির বিশ্রাম শয়ন।
জাহ্নবী তাহারে বক্ষে ধরি সযতনে
গাহিয়া সতীর জয় বহে কলস্বনে।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী

[২]

আমরা এই প্রবন্ধের বিগত সংখ্যায় বলিয়াছি যে, আমরা প্রকৃত বস্তুটাকে ভুলিয়া, 'অস্ত' একটা বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি; সেই 'অস্ত' বস্তুতেই মজিয়া রহিয়াছি। আমার যেটা প্রকৃত 'স্বরূপ' তাহাকে ভুলিয়া গিয়া, আমার এই সুখ-দুঃখ-সমাকীর্ণ, জরা-রোগ-গ্রস্ত দেহটাকেই সার বস্তু ভাবিয়া লইয়া, উহারই সেবায় উহারই পরিচর্য্যায়, উহারই সুখ-দুঃখে একেবারে মজিয়া গিয়াছি। এইরূপ, যাহা নিত্য, যাহা সার, যাহা প্রকৃত বস্তু—সেই ব্রহ্ম-তত্ত্বকে ভুলিয়া গিয়া—এই শব্দ-স্পর্শ-সমাকুল, শত-বাসনা-মুখরিত সংসারটাকেই সার বস্তু বলিয়া উহাতেই আসক্ত হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু কৈ, উহাকে ত ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। এই যে ধন-জন, কামিনী-কাঞ্চন, বিষয়-বিভব, পদ-মান-গৌরব;—কৈ উহারা ত চির-স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। এই যে দেহ-মন,—যাহার পুষ্টি-বিধানার্থ, যাহার সুখ-বৃদ্ধির জন্ত, যাহার ভোগের নিমিত্ত,—আমরা নিরত ব্যাপৃত ও একান্ত যত্ন-পরায়ণ রহিয়াছি;—কৈ সেই দেহটাকে চিরদিন ধরিয়া ত রাখিতে পারিতেছি না। আমাদের শত যত্ন-চেষ্টা সত্ত্বেও, উহারা আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইতেছে। এ সকল বস্তুর অবস্থাই এইরূপ; ইহারা চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল, অস্থির। অথচ আমরা এমনই মোহান্ধ যে উহাদিগকেই সার ভাবিয়া, উহাতেই মত্ত হইয়া রহিয়াছি। এই সংসারই আমাদিগের যথা-সর্ব্বস্ব; এই দেহটাই আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে,—যাহা প্রকৃত-পক্ষে অসার, তুমি তাহাকেই যখন সার ভাবিয়া লইয়াছ, তখন তোমার ত এ দশা হইবেই! উহা ত তোমাকে ছাড়িয়া পলাইবেই! উহার অন্তরালে যেটা রহিয়াছে, সেইটাই প্রকৃত বস্তু, সার বস্তু। সেটাকে যখন তুমি ভুলিয়াছ, তখন তোমার ত এ দশা হইবেই! যাহা নশ্বর, যাহা বিনাশী,—তাহাকে কি ধরিয়া রাখা যায়?

প্রত্যেক বস্তুরই দুইটা অংশ আছে। ইহা ভুলিলে চলিবে কেন? প্রত্যেক বস্তুরই একটা অপরিবর্ত্তনীয়, স্থির, নিত্য অংশ আছে। অপর একটা উহার পরিবর্ত্তনের অংশ। যেটা অপরিবর্ত্তনীয় অংশ—সেইটাই প্রকৃত বস্তু যেটা উহার পরিবর্ত্তনের অংশ,—সেটা কখনই স্থির থাকে না; উহা সর্ব্বদাই অবস্থান্তরিত হয়;—এক অবস্থা ছাড়িয়া নিয়ত অপর অবস্থা গ্রহণ করে। প্রথমটাই প্রকৃত বস্তু; আর অপরটা—সেই বস্তুর গুণ-ক্রিয়াদি। কোন দ্রব্যেরই গুণ ও ক্রিয়াগুলিকে, দ্রব্যের যেটা প্রকৃত স্বরূপ তাহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে—পৃথক করিয়া লইতে পারা যায় না। দ্রব্যের এই যে গুণ ও ক্রিয়াগুলি,—ইহারা এক অবস্থা ছাড়িয়া অন্য অবস্থা গ্রহণ করে; উহারা এক ভাবে কখনই স্থির থাকে না; ইহাদের রূপ বা আকারের সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হয়। আমরা কিন্তু দ্রব্যের এই গুণ ও ক্রিয়াগুলিকেই, দ্রব্যের এই অবস্থা-ভেদকেই 'দ্রব্য' বলিয়া মনে করি। এইখানেই আমাদের ভ্রম। এই স্থানেই আমরা ভুল করি। এই গুণ ও ক্রিয়াদি ছাড়া যে দ্রব্যের একটা স্থির স্বরূপ আছে, সে কথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই।

একটা বস্তু, এক অবস্থা ছাড়িয়া অপর একটা অবস্থা গ্রহণ করিল। আমরা পূর্ব্বাবস্থাটাকে 'কারণ' (cause) বলিয়া নির্দ্দেশ করি এবং পরের অবস্থাটাকে তাহার 'কার্য্য' (effect) নামে নির্দ্দেশ করি। সোণার একটা ডেলা বা পিণ্ডকে গড়িয়া পিটিয়া স্বর্ণকার একটী সুদৃশ্য বলয় নির্ম্মাণ করিল। আমরা ঐ ডেলাটাকেই বলয়ের 'কারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ডেলাটা,

বলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা; এবং বলয়টা, সেই ডেলারই পরবর্ত্তী অবস্থা। সুতরাং আমরা সেই পূর্ব্ব-গামী অবস্থাটাকেই, পরবর্ত্তী অবস্থার কারণ বলিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে, ঐ দুইটাই সুবর্ণেরই দুইটা অবস্থা ভেদ মাত্র। পিণ্ড এবং বলয়—এই দুইটী, সুবর্ণেরই অবস্থা-ভেদ। সুতরাং এ স্থলে সুবর্ণই প্রকৃত 'কারণ'। এক সুবর্ণই ঐ দুই অবস্থা ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সুবর্ণই এস্থলে প্রকৃত বস্তু; এই সুবর্ণই উহার পিণ্ডাবস্থা ত্যাগ করিয়া, বলয়াকার ধারণ করিয়াছে। অবস্থার ভেদে, বস্তুর যেটী প্রকৃত স্বরূপ তাহার কোন ভেদ হয় না। সুবর্ণের যেটী প্রকৃত স্বরূপ, উহা আপন স্বরূপে ঠিক্ থাকিয়া, নানাবিধ অবস্থা গ্রহণ করে। ইহাই প্রকৃত কথা। সেই স্বরূপটাই হইতেছে প্রকৃত 'কারণ'। অবস্থাগুলি কেহই 'কারণ' নহে। অথচ আমরা বস্তুর স্বরূপটীর কথা ভুলিয়া, ঐ অবস্থাগুলিকেই বস্তু বলিয়া মনে করিয়া লই এবং ঐ অবস্থা-গুলিরই একটীকে 'কারণ' এবং অপরটীকে তাহার 'কার্য্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এই স্থানেই আমাদিগের ভুল। এইরূপে, অবস্থাগুলিই আমাদিগের নিকটে বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। যেটি প্রকৃত স্থির বস্তু তাহাকে ভুলিয়া, এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাগুলির উপরেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া পড়ে। বস্তুর প্রকৃত যেটী স্বরূপ তাহার উপরে দৃষ্টি না রাখিয়া, আমরা বস্তুর গুণ ও ক্রিয়াদির উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ফেলি এবং ঐ গুণ ও ক্রিয়াদিকেই আমরা বস্তু বলিয়া ধরিয়া লই। এই প্রকারেই আমরা এক বস্তুকে 'অন্য' বস্তু বলিয়া মনে করি। ঋগ্বেদ আমাদিগকে সংক্ষেপে এই কথাটাই বলিয়া দিয়াছেন। শঙ্কর এই কথারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা বেদান্তে করিয়া গিয়াছেন।

আর একটা কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই যে আমরা বস্তুর গুণ ও ক্রিয়ার কথা বলিয়া আসিলাম, এই সকলের মধ্য দিয়াই কিন্তু বস্তুটী আপন স্বরূপের পরিচয় দিয়া থাকে; নিজের স্বরূপটীকে বুঝাইয়া দেয়। গুণ ও ক্রিয়াদির দ্বারাই, আমরা বস্তুর স্বরূপটীর কিছু কিছু পরিচয় পাই। বস্তুটী, এই সকল গুণ ও ক্রিয়া দ্বারাই আপন স্বরূপের আংশিক পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

জগতে যে সকল 'নাম-রূপাদি' বিকাশিত রহিয়াছে, এই সকল নাম-রূপ ব্রহ্মেরই স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নতুবা তাঁহার স্বরূপ কিছুই বুঝা যাইত না। সুতরাং এই সকল নাম-রূপ, ব্রহ্মবস্তুকে ছাড়িয়া তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, থাকিবে কি প্রকারে? অথচ আমরা নাম-রূপাদি লইয়াই নিয়ত আচ্ছন্ন রহিয়াছি। ইহারা তাঁহারই পরিচায়ক; ইহারা তাঁহারই স্বরূপের বিকাশ;—একথাটী আমরা মোটেই মনে রাখি না। আমরা এই নাম-রূপ গুলিকেই স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লই এবং উহাদিগকে লইয়াই সারাজীবন ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। উহারাই যেন এক একটা স্বাধীন, স্বতঃ-সিদ্ধ বস্তু,—ইহাই আমাদিগের বোধ। এই খানেই আমাদিগের ভ্রমের বীজ।

নাম-রূপাদি কোন বস্তুই, ব্রহ্মের স্বরূপের পূর্ণ-বিকাশ নহে; ইহারা তাঁহার আংশিক বিকাশ মাত্র। সুতরাং, ব্রহ্মবস্তু, এই সকল নাম-রূপাদি হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু নাম-রূপাদি কোন বিকাশই ব্রহ্মবস্তু হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না। কেন না, যাহা তাঁহাকেই বিকাশ করিতেছে, তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-ভাবে থাকিবে কি প্রকারে?

ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে অনন্ত, অব্যয় (inexhaustible), তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, ক্ষয় নাই, সীমা নাই। এই পূর্ণ-ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ কদাপি সম্ভব নহে। যাহা অব্যয়, যাহা অক্ষয়; তাঁহাকে ক্ষয় করিবে কে? কোন বস্তুই, কোন বিকারই, কোন অবস্থাই, কোন নাম-রূপাদি,—সেই পূর্ণভাণ্ডারের ক্ষয় করিতে সমর্থ নহে; কেহই সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের ব্যয় সাধনে সমর্থ নহে। কেহই, কোন বস্তু, সেই পূর্ণ-ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ-বিকাশ করিতে পারে না। গীতা আমাদিগকে কি বলিতেছেন, শুনুন—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং ॥"

ভগবান বলিতেছেন—

'এই নির্ব্বোধেরা মনে করিতেছে, আমি, এই জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছি। যাহারা এইরূপে মনে করিয়া লয়, তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। আমি প্রকৃত-পক্ষে অব্যক্ত-ই রহিয়াছি, কেননা আমি অব্যয়, অনন্ত। জগতে আমার অভিব্যক্তি কতটুকু? এই দেশ কালে বদ্ধ জগৎ—আমার অনন্ত অব্যয় ঐশ্বর্য্যের কতটুকু বিকাশে সমর্থ? আমি অব্যয়; সুতরাং আমি জগতের অতীত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমার অতি সামান্য মাত্র অংশ, এই জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত রহিয়াছে। সুতরাং যাহারা আমার পূর্ণ-স্বরূপের কোন খবর রাখে না, তাহারাই ভাবে যে, এই জগৎই আমার বিকাশ। তাই এই মূঢ়রা এই জগতের বস্তু-গুলি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। হায়! ইহারা জানেনা যে, এ জগতের কোন বস্তুই মানবাত্মার পূর্ণতৃপ্তি জন্মাইতে পারে না।'

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই জগৎ তাঁহার আংশিক অভিব্যক্তি। সুতরাং এ জগতের কোন বস্তুকেই স্বতঃসিদ্ধ, স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, তাঁহারই বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রুতি বলিয়া দিয়াছেন যে, ব্রহ্মবস্তু অন্তরালেই রহিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি যাহা, তিনি তাহাই আছেন; তিনি 'অন্য' কিছু হন নাই। এই জগৎ দেখিয়া, তোমরাই ভুল করিয়া মনে করিতেছ যেন 'অন্য' একটা কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে! বাস্তবিক পক্ষে, এজগৎ 'অন্য' কোন বস্তু নহে। এজগৎ তাঁহারি স্বরূপের বিকাশ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়া দিয়াছেন—

"ন হি বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তুত্বং ভবতি।"

বিশেষ একটা আকার ধারণ করিল বলিয়াই যে বস্তুটা 'অন্য' একটা কিছু হইয়া উঠিল তাহা নহে। উহা পূর্ব্বেও যে বস্তু ছিল, এখনও সেই বস্তুই রহিয়াছে। বস্তুর আকার বা বস্তুর গুণ ও ক্রিয়াদি ত বস্তু নহে। উহাদের সমষ্টি দিলেই ত বস্তুকে পাওয়া যায় না। বিশেষ আকারের মধ্যে, নানাবিধ গুণ ও ক্রিয়াদির মধ্যে,—বস্তুর যেটা প্রকৃত স্বরূপ, সেটা আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। গুণ ক্রিয়াদির মধ্য দিয়া সেই স্বরূপেরই পরিচয় পাইয়া থাকি। জগতের প্রতি বস্তু, প্রত্যেক নাম রূপ, তাঁহারি অভিব্যক্তি, তাঁহারি বিকাশ, তাঁহারি পরিচায়ক। জগৎ কোনও স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু নহে। জগৎ—ব্রহ্ম বস্তুরই অভিব্যক্তি, জগৎ ক্রমোর্দ্ধভাবে তাঁহারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুতরাং এজগৎ একটা 'অন্য' কোন বস্তু, একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র পদার্থ;—এরূপ মনে করিতে পার না। এরূপ মনে করিলেই ভুল হইল। শঙ্কর ইহাকেই 'ভ্রম-জ্ঞান' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম এই জগতের অন্তরালে আপন স্বরূপে ঠিক থাকিয়া, প্রতি বস্তুর মধ্য দিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন; আপন স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন। সুতরাং তিনি যাহা তাহাই আছেন; তিনি 'অন্য' একটা কিছু হইয়া উঠেন নাই। তিনি যাহা তাহাই রহিয়া, আপনাকে নানাভাবে অভিব্যক্ত করিতেছেন। কোনও অভিব্যক্তি, তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি করিতে পারিতেছে না।

এইরূপে, এই জগতে ব্রহ্মদর্শন করিতে হয়। শ্রুতির ইহাই উপদেশ। জগৎ যদি ব্রহ্মের কথা ভুলাইয়া দিয়া কেবল শব্দ-স্পর্শ রূপ-রসাদির কথাই চিত্তে অহরহঃ জাগাইয়া তোলে, তাহা হইলেই জগতে ব্রহ্মদর্শন হইল না; তাহা হইলে শব্দ-স্পর্শ, রূপ-রসাদির দর্শনই হইল। শ্রুতি যাহাকে 'অন্যত্ব বোধ' বলিয়াছেন, তাহাই হইল। শঙ্কর বলেন, এরূপ দর্শনকেই আমি ভ্রম-জ্ঞান শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এ ত ব্রহ্মদর্শন নহে; ইহা 'অন্য'-দর্শন। তুমি জগৎকে একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তু,—একটা 'অন্য' বস্তু, বলিয়া দেখিতেছ। এ জগৎ ত স্বাধীন নহে; ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এ জগৎ থাকিতে পারে না। এ জগৎ ত ব্রহ্মের বিকাশ, ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং জগতে ব্রহ্মকেই দেখিতে হইবে, তাহা হইলে আর জগতের স্বাধীন সত্তা থাকিবে না। জগৎ

তাহা হইলে ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত—ব্রহ্মেরই পরিচায়ক হইয়া উঠিবে। সর্ব্ববস্তুর মধ্য দিয়া এক ব্রহ্মসত্তাই দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। তখন, জগৎকে একটা 'অন্ত' বস্তু বলিয়া প্রতীতি থাকিবে না। যতক্ষণ জগৎ তোমার নিকট একটা 'অন্ত,' বস্তু; ততক্ষণ ব্রহ্ম এবং জগৎ – উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু জগৎ যখন ব্রহ্মের অভিব্যক্তি বলিয়া, বিকাশ বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে, তখন আর বিরোধ কোথায়? কেন না, তখন ত আর ব্রহ্মব্যতীত কোন কিছুই 'অন্ত,' একটা বস্তু বলিয়া বোধ থাকিবে না। তখন সর্ব্বত্র সকল বস্তুত একমাত্র ব্রহ্মবস্তুরই বিকাশ বলিয়া দৃঢ় বোধ উপস্থিত হইবে। সুতরাং বিরোধ কোথায়?

জগৎকে 'অন্ত' বলিয়া বোধ করিলে, ব্রহ্মের সঙ্গে কিরূপে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সেই বিরোধের সমাধানই বা কিরূপে সম্ভব, ভাষ্যকার তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেটী না বুঝিলে, জগতে 'অভ্রান্ত' দর্শনের স্থলে, ব্রহ্ম দর্শনের যে তত্ত্ব শ্রুতিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া পরিস্ফুট হইবে না। আমরা, ভাষ্যকারের সেই ব্যাখ্যার কথা আগামীবারে পাঠক-পাঠিকাকে শুনাইব।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ত্তীকালের মথুরা

মথুরা অতীব প্রাচীন নগর। বৈদিকযুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও রামায়ণ বা মহাভারতীয় যুগের কোনরূপ বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, যথা - মন্দিরাদির প্রাচীর বা ভিত্তি, ব্রাহ্মণ্য ভগ্ন দেবমূর্ত্তি, শিলালেখ, অথবা তৎকাল প্রচলিত কোন প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি এখানে আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের সময়ের দুই চারিটা ও কুশান সম্রাট্‌গণের সময়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন (Relic) পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মথুরার দক্ষিণে অবস্থিত মধুবনে কয়েকটা গ্রীক-প্রভাব-পরিস্ফুট গান্ধার শিল্পের নমুনাও মিলিয়াছে। এইসকল প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভগ্ন বা অভগ্ন নিদর্শন মাত্র; তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। তবে, মথুরার যাদুঘরে বিষ্ণু, সূর্য্য, ব্রহ্মা, শিব, হর-পার্ব্বতী, মহিষমর্দ্দিনী, লক্ষ্মী, ইন্দ্র, গিরিধারী, বলদেব, প্রভৃতি যে কতকগুলি ছোট বড় ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণু ও সূর্য্যের সংখ্যাই অধিক। সেই মূর্ত্তিগুলির গঠন-প্রণালী ও লিপি প্রভৃতি দেখিয়া পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক ও শিল্পবিজ্ঞা-বিশারদেরা এবং প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন যে, সেইগুলি গুপ্ত সম্রাট্‌গণের সময়ে বা তৎপরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত, কোন কোনটা বা মুসলমান আমলেও গঠিত। *

* কেহ যেন মনে না করেন যে গুপ্ত সম্রাটদিগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তির অস্তিত্ব ছিল না। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে চাণক্য তনয় কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত প্রণীত অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে গ্রাম নগর বা দুর্গাদির চারিদিকে কুমারী প্রভৃতি কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য দেবমূর্ত্তি স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। গ্রীক শিল্পী হেলিওডোরস গঠিত একটি বিষ্ণুধ্বজ আজিও বিদিশা নগরীতে বিদ্যমান আছে সেটি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে গঠিত। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে শক-সত্রপ সোদাসের মুদ্রায় প্রস্ফুট কমলের উপর উপবিষ্ট একটি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, দুই পার্শ্ব হইতে দুইটা হস্তী শুণ্ডে কুম্ভ ধরিয়া সেই রমণীকে অভিষেক করিতেছে। কেহ এটিকে বিষ্ণুর শক্তি মহালক্ষ্মী বা শ্রী বলেন, কেহ শিবের শক্তি কমলা বলেন, আবার কেহ এটিকে বুদ্ধদেবের জননী মায়া দেবীর মূর্ত্তি বলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শক সম্রাট কদফীস দ্বিতীয়ের মুদ্রায় বৃষভারূঢ় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি সুস্পষ্ট অঙ্কিত আছে। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, খৃষ্ট জন্মের বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সকলগুলি না হউক, কতকগুলি ব্রাহ্মণ্য দেবতার রূপ-কল্পনা ও মূর্ত্তি গঠন আরম্ভ হইয়াছিল।

এক ফুট প্রশস্ত করতল, বা ২।৩ ফিট উচ্চ বুদ্ধদেবের মুণ্ড, সুদীর্ঘ ভগ্ন হস্তপদাদি যাহা যাদুঘরে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, যদি সেই গুলা দণ্ডায়মান মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ হয় তবে সেই মূর্ত্তিগুলি উচ্চে ২০।২৫ ফিটের ন্যূন হইবে না। তখনকার ভাস্করেরা অতি বিশালকায় প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিসকল গঠন করিতে পারিত।

চৈনিক পরিব্রাজকদিগের বর্ণনা হইতে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মথুরা প্রদেশে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাধান্য ছিল। তৎপূর্ব্বেও যে, এখানে ঐ দুই ধর্ম্ম প্রবল ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রত্যক্ষদর্শী চৈনিক পরিব্রাজকদিগের লেখা ও তৎসঙ্গে যাদুঘরে রক্ষিত আবিষ্কৃত বিভিন্ন ও বিচিত্র গঠনের ধ্বংসাবশেষগুলি মিলাইয়া আমরা কল্পনা নয়নে মথুরার এইরূপ একখানি চিত্র দেখিতে পাই—

যমুনার উত্তরতীরে সুচারু কারুকার্য্য-খচিত পাষাণ-বিরচিত সুরম্য-ছত্রবিমণ্ডিত পতাকা পুষ্পমাল্যে বিভূষিত জৈন ও বৌদ্ধস্তূপগুলি স্থানে স্থানে সমুন্নত রহিয়াছে। সুগত সেবকেরা দলে দলে সোপান পথে উঠিয়া রেলিং বেষ্টিত দুই তিন তলা পরিক্রমাপথে পূজোপহার হস্তে বিচরণ করিতেছে। নিকটবর্ত্তী ফল-পুষ্প বেষ্টিত সঙ্ঘারামের ভিতর অঙ্গনের চারিদিকে যতিগণের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বা প্রকোষ্ঠ (Cell] তদগ্রে পাথরের স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত বারান্দা, কোন কোন অঙ্গনের ভিতর সুরম্য মন্দির মধ্যে বুদ্ধদেবের বা তাঁহার শিষ্যবর্গের অথবা মঠ প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট্ বা সম্রান্ত জনগণের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। * বিভিন্ন মঠে পীতবসন পরিহিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা কোথাও অভিধর্ম্ম, সূত্র বা বিনয়পীঠক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে নিরত। কোথাও বা বিরাটকায় দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদদেশে মুণ্ডিতশীর্ষ অর্হৎেরা অবনত মস্তকে প্রণাম করিতেছে। কোথাও বা শ্রমণেরা ভিক্ষা-ভাজন স্কন্ধে লইয়া তথাগত-গাথা গান করিতে করিতে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। কোথাও বা ভাস্করেরা সুবৃহৎ পাষাণ খণ্ড লইয়া বিশালকায় মূর্ত্তি ও স্তম্ভ প্রভৃতি শিল্পকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। কোথাও বা তন্তুবায়েরা সুবর্ণ রেশম ও কার্পাস সূত্র লইয়া সূক্ষ্ম বসন বয়ন করিতেছে। কোথাও বা নগরের বহির্দ্দেশে কৃষিক্ষেত্রে কৃষকেরা সর্ব্বজ্ঞ গীতি গাহিতে গাহিতে হল চালন করিতেছে। সকলেই যেন হিংসা বিদ্বেষ বিহীন। সর্ব্বত্রই যেন সুখ সাম্য শান্তি বিরাজ করিতেছে। প্রভেদ কেবল বৌদ্ধেরা মুণ্ডিতশীর্ষ ও পীতবাস, জৈনেরা কেশ শোভিত ও শ্বেতাম্বরধারী।

এই চিত্রের সহিত বৈষ্ণব পুরাণ বর্ণিত "গোপ গোপী গবাবৃত" শৃঙ্গ বেণু নিনাদিত, শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত মুখরিত কালিন্দীকূলে কদম্বমূলে, কুম্ভকক্ষে বা গোরস পসরাশিরে হরিদর্শন-চঞ্চলা প্রেমভক্তি বিহ্বলা ব্রজাঙ্গনা সমলঙ্কৃত ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবমন্দির শোভিত, জনসাধারণের চিরপরিজ্ঞাত মথুরা বা বৃন্দাবন দৃশ্যের কোনই সাদৃশ্য নাই।

এই প্রভেদ কেন হইল, কবে হইল, এখন আমরা তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গুপ্ত সম্রাটগণের ও তৎপরবর্ত্তী যুগের ইতিহাস দিতে হইবে, নতুবা বিষয়টা বুঝিবার সুবিধা হইবে না।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ভারতে গুপ্ত সম্রাটগণের অভ্যুদয়। ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবং হিংসাবহুল অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইঁহাদের সময় হইতে ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইতে লাগিল এবং জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি অপরাপর ধর্ম্মগুলি নবজাগরিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রদীপ্ত প্রভায় ম্লানতর হইয়া যাইতে লাগিল।

৩১৯ খৃষ্টাব্দে ১ম চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে উপবিষ্ট

* মাঠগ্রাম ও দুর্গাকুণ্ড প্রভৃতি কয়েক স্থানে এইরূপ ধরণের মঠ দেখা গিয়াছে। সেইগুলি এখন ভগ্ন, মৃত্তিকা-নিমগ্ন ও বন জঙ্গলাকীর্ণ।

হইয়া গুপ্তাব্দ প্রচলন করেন। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন অশোকের পিতামহ কৌটিল্য চাণক্যের শিষ্য, মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ও এই গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত নামক রাজারা পৃথক বংশের ও বিভিন্ন সময়ের লোক।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০—৩৭৫) ইনি ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। স্বয়ং দিগ্বিজয়ী বীর, সুপণ্ডিত কবি, ও প্রিয় সঙ্গীতানুরক্ত সম্রাট।

ইনি বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া পাঞ্জাবসীমা হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। দিগ্বিজয় করিয়া মথুরানগরী ইঁহার অধিকার ভুক্ত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ভুজবিক্রম জন্য সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলিলেও বলা চলে। ইনি কৌশাম্বীর অশোক নির্ম্মিত স্তম্ভগাত্রে পালি ভাষার লিখিত অনুশাসনতলে নিজের বীরত্ব কীর্ত্তি সংস্কৃত শ্লোকে খোদিত করিয়াছেন। সেই স্তম্ভটী এখন প্রয়াগ দুর্গের অভ্যন্তরে রহিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে রঘুর যে দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় ব্যাপার হইতে সংগৃহীত। দিগ্বিজয়ের পর ইনি মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধান করেন। যজ্ঞান্তে ইনি দক্ষিণাস্বরূপ ব্রাহ্মণ দিগকে যে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন তাহাতে যজ্ঞের যূপ ও অশ্ব অঙ্কিত আছে। ইঁহার অপর সুবর্ণ মুদ্রাগুলি সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগের পরিচায়ক, সম্রাট বীণা হস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট।

সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ৩৬০ খৃষ্টাব্দে সিংহলের অধিপতি মেঘবর্ণ নানা মণিরত্ন উপহার সমেত একজন রাজদূতকে ইঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে সিংহল ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি ভারতের বহির্দেশ হইতে তীর্থ যাত্রীরা বুধগয়ায় যাইয়া থাকিবার স্থান পায় না, সেই জন্য সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত যেন বোধিদ্রুমের নিকট সিংহল রাজের ব্যয়ে একটি মঠ বা পান্থশালা নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন। সমুদ্রগুপ্ত সানন্দচিত্তে অনুমতি দিলে সিংহল রাজের অর্থে বোধিদ্রুমের উত্তর দিকে একটি ত্রিতল ও তিনটী সমুন্নত চূড়াবিশিষ্ট সুদৃশ্য পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মণিরত্ন বিজড়িত বুদ্ধদেবের কনক প্রতিমাও স্থাপিত হইয়াছিল। এখন, কাল প্রভাবে সে মঠটী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেবল উহার ভিত্তিটা মাত্র কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের বসুবন্ধু নামে একজন বৌদ্ধগ্রন্থ রচয়িতা অমাত্যের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই সকল হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বৌদ্ধদিগের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। সমুদ্রগুপ্তের পর, কুমারগুপ্ত ও আদিত্য সেন প্রভৃতি আরও কয়েকজন গুপ্ত সম্রাট ইঁহার দেখা দেখি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান দেবতা বিষ্ণু, সেই জন্যই বুঝি ঐতিহাসিকেরা গুপ্ত সম্রাটদিগকে বৈষ্ণব বা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুপ্তবংশীয় অনেক সম্রাটেরাই আদিত্য পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা—তৃতীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (২য়)—বিক্রমাদিত্য; ৪র্থ সম্রাট কুমারগুপ্ত—মহেন্দ্রাদিত্য; ৫ম সম্রাট স্কন্দগুপ্ত—বিক্রমাদিত্য; ৬ষ্ঠ সম্রাট পুরগুপ্ত—প্রতাপাদিত্য; ৭ম সম্রাট নরসিংহগুপ্ত—বালাদিত্য; ৯ম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৩য়)—দ্বাদশাদিত্য; ১০ম সম্রাট বিষ্ণুগুপ্ত—চন্দ্রাদিত্য নামে খ্যাত ছিলেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণু ও সূর্য্য কোথাও এক দেবতা, কোথাও বা পৃথক দেবতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উভয়েরই নাম আদিত্য। পুরাণে ইঁহারা বিভিন্ন আকৃতি ও সম্পূর্ণ পৃথক্ দেবতা। গুপ্ত সম্রাটগণের এই আদিত্য পদবী দেখিয়া, কিংবা বিষ্ণুপ্রধান অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন বলিয়া কি কারণে ঐতিহাসিকেরা ইঁহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়াছেন তাহা বলিতে পারিলাম না। তবে চন্দ্রগুপ্ত (২য়) এবং স্কন্দগুপ্ত উভয়েই এক একটা করিয়া বিষ্ণুধ্বজা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে কথাটা ক্রমে বলিতেছি।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

প্রাণের দরদ

ওরে মরদ ! এতই দরদ এখনো এই প্রাণের তরে আছে ?
যে প্রাণ লুটে পায়ের তলে দিবস নিশি আপন মরণ যাচে !
নিত্য যে প্রাণ খেৎলে ছ'পায়
রক্তে তোদের আঁকছে ললাটিকা ;
বক্ষ চুষে সজীব রসে
জ্বালছে তালে দারুণ গর্ব শিখা !
তোদের মরণ-কাঁদন পেশায়
জাগছে তারা বিভব নেশায় ;
রিক্ত তোদের প্রাণ পিয়ালা শুকিয়ে ওঠে
তাদের আগুন আঁচে !
– দরদ এতই এখনো কি আছে ?

তোদের সুধা কণ্ঠে পুরে,
দিচ্ছে শুধু কেউটে সাপের ছোওয়া—
অনাদরের গৌরবেতে
ভাবিস কোথা অমন আদর খোওয়া।
মাতৃপরাণ নষ্ট করে,
পুত্রে যারা হস্তে ধরে ;
আগুন জ্বালা ছাড়া আবার কি আশা আর আছে
তাদের কাছে ?
—দরদ এতই এখনো কি আছে ?

চক্ষে যাদের উল্কা সমান
মলয়, দেহে দহন পরশ আনে—
শীত বরষার অভিসারে
যাদের প্রাণে নিঠুর বেদন হানে !
ছুঁহাত পাতি অন্ন বলে
ভাসায় ধরা নয়ন জলে !
তাদের মরণ বাণের ছোঁয়াচ শরণ মাগি নিত্য-মরণ বাঁচে
—দরদ এতই এখনো কি আছে ?

মা, মেয়ে আর পত্নী যাদের
ধরছে সদা অপমানের বোঝা ;
ওরে নিলাজ ! ও অসহায় !
মিছেই তাদের ভগবানে খোঁজা !
হোঃ হোঃ তাদের বাঁচাই কি আর ?
লোপ পেয়ে যাক চিহ্ন সবার !
বিশ্ব আজ এ বক্ষ চাপা অপমানের বোঝার শোধণ যাচে !
ওরে মরদ ! এতই দরদ এখনো এই প্রাণের তরে আছে ?

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

পরিচয়

(গল্প)

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, দোল-পূর্ণিমা, দুই এক দিন থাকিতে মেসের রসিক ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া অনাথবাবু গিরিডিতে আসিয়াছেন। রসিক এবার বি-এ পাশ করিয়া উকিল হইবার আশায় ল-কলেজে যাতায়াত করিতেছে। উকিল হইতে পারিলে, একদিন হাইকোর্টের জজ হইবার আশাও যে আছে, তর্কের সময় এমন

কথাও রসিকের মুখ হইতে মাঝে মাঝে বাহির হয়। সুতরাং তার আশাটা "এয়ারোপ্লেনে" চড়িয়া যে খুব উচু দিয়া চলিতেছিল তার কোনও সন্দেহ নাই। কোন দিন নীচের দিকে চাওয়ার যে কোনও প্রয়োজন আছে—একথাটা রসিক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল।

রসিকের ভগিনীপতি নরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানে অস্ত্রের কাজ করেন। অনেক দিন হইতে এখানে স্থায়িভাবেই বসবাস করিতেছেন। বন্ধুদ্বয় নরহরি বাবুর বাটীতেই উঠিয়াছেন। সেদিন সন্ধ্যার পর যখন তাঁহারা সহর বেড়াইয়া বাসায় ফিরিলেন, তখন নরহরি বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন, এবং অত্যন্ত তন্ময়ভাবে সর্ব্ব অবসাদ অপহরণকারী চুরুট টানিতেছিলেন। যুবকদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া তিনি বইখানি খোলা অবস্থায় টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিলেন। আঙ্গুলের টোকা দিয়া চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া লইয়া একটীবার বেশ ভাল করিয়া টানিয়া লইলেন। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—"রসিক দেখছি খুব হাঁটতে পার। সেই খেয়ে বেরিয়েছিলে, জলটল খাবার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছ। এদিকে আমাকে, তোমরা কোথায় গিয়েছ, তার জবাবদিহি কর্‌তে কর্‌তে হায়রান হতে হয়েছে।"

রসিক বলিল, "আমরা ত ছেলেমানুষ নই যে পথ হারাবো—সুতরাং এত বেশী চিন্তা কেন?" বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

নরহরি মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি না হয় আজ বাদে কাল উকীল হবে, জবাবদিহি, তর্ক, কৈফিয়ত দেওয়া তোমার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবসা দাঁড়াবে—কিন্তু আমরা হলাম তাই ব্যবসাদার মানুষ, অত সত্যতার ধার ধারি না। জবাবদিহি বড় একটা কারও কাছে কর্‌তে হয় না। তবে কি জান, আজ খাস গবর্ণমেণ্ট থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কৈফিয়ত তলব হচ্ছে কি না—তোমার পাশকরা বুদ্ধির দৌড় এখনও সেখান পর্য্যন্ত পৌঁছবার সৌভাগ্যলাভ করেনি। আর বড় দেরীও নেই, ছেলের বাজার যে রকম গরম, তাতে তোমার যে হাতে এবং পায়ে শীগ্‌গির শিকলের বেড়ী পড়বে তার কোনও সন্দেহ নেই।" বলিয়া বেহারাকে ডাকিলেন এবং রসিকের বন্ধু অনাথ বাবুকে হাত পা ধুইবার জল দিতে আদেশ করিলেন। অনাথ হাসিয়া বলিল, "রসিক যে প্রতিজ্ঞা করেছে, উকিল না হয়ে বিয়ে করবে না। সে খবর বুঝি আপনি জানেন না?"

২

নরহরি বাবু বেশ দশ টাকা রোজগার করেন, সুতরাং মনটা সর্ব্বদাই প্রসন্ন। লোকটি খুব সৌখীন। তাঁহার বৈঠকখানা সুন্দরভাবে সুসজ্জিত—কতকগুলি মূল্যবান জিনিষের আড়ম্বরে ঘরটী মোটেই ভারাক্রান্ত নয়। বিনা প্রয়োজনে একটী দ্রব্যও সেখানে স্থান পায় নাই। সমস্ত আসবাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ঘরের একটী প্রান্তে একখানি সুন্দর দুইটী মানুষ শুইবার উপযুক্ত মেহগিনির খাট, তাহার উপর দুগ্ধ ফেননিভ একটী শয্যা তাহাতে একটা নেটের মশারী বাঁধা রহিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটী সেক্রেটারিয়েট টেবিল। চারিখানি সুন্দর চেয়ারে টেবিলখানি ঘেরা। পূর্ব্বদিকে দেওয়ালের গায়ে একটী কাপড় রাখিবার আলনা। তাহার পার্শ্বে একটী টুপী ও ছড়ি রাখিবার ষ্ট্যাণ্ড। ইহাতে তিনটী টুপী রহিয়াছে—দুইটী হ্যাট ও একটি নাইট ক্যাপ। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের নিকট একটী আলমারী। উত্তরদিকে তিনটী বড় বড় গ্লাসকেস, তাহার ভিতর কেবল বই। বইগুলি বেশ সুন্দর বাঁধান। ইংরাজি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত বই আছে। সমস্ত ঘরটা মাদুরে মোড়া, তাহার উপর একখানি সুন্দর কার্পেট বিস্তৃত। দেওয়ালের গায়ে অনেকগুলি চিত্র, কিন্তু প্রায় সকল গুলিতেই প্রাকৃতিক দৃশ্য। কেবল একখানি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের, একখানি বিবেকানন্দের, এবং একখানি বঙ্কিম বাবুর মূর্ত্তিচিত্র। টেবিলের উপর একটী ঝিনুকের কাগজ চাপা। একটী কোণে একটী টীপয় আছে, সেটী

জরির কায করা একখানি সুন্দর রেশমী কাপড়ে ঢাকা। গৃহের কোথাও এতটুকু ধুলা বা ময়লা পড়িয়া নাই। ঘরটী গৃহবাসীর চিত্ত প্রসন্নতার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

নরহরি রসিকের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া একটু জোর গলায় হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করাই ত পুরুষের লক্ষণ! কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেই যে তা রক্ষা করতে হবে এমন কোন লেখা পড়া করে' যদি কোন দিন প্রতিজ্ঞা করতে হত, তা হলে রসিক কেন, অনেকেই এই অসভ্য শব্দটাকে কোন দিন মনের কাছে আসতে দিতেও রাজী হত না।"

এমন সময়ে ঝি আসিয়া রসিককে অন্দর মহলে ডাকিয়া লইয়া গেল। অনাথ হাত মুখ ধুইয়া নরহরি বাবুর পার্শ্বের চেয়ারখানিতে উপবেশন করিলে নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন "শুনলাম আপনিও নাকি বি-এ পাশ করে এম-এ পড়ছেন?"

অনাথ বলিল, "একটা যা হোক ত করতে হবে।"

এই সময় বেহারা চা ও মিষ্টান্ন আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। নরহরি বলিলেন, "আসুন চা খাওয়া যাক।" চা খাইতে খাইতে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "একটা যা হোক করতে হবে বলে কি বাপের টাকা গুলোর এম-এ পাশের পড়া পড়তে হবে? এরূপ প্রশ্ন করায় আপনি হয়ত আমাকে অসভ্য মনে করছেন। আমিও জানি এরূপ প্রশ্ন করবার আমার কোন অধিকার নেই, কিন্তু দেখুন আপনি রসিকের বন্ধু সুতরাং আমি আপনাকে ছোট ভাইয়ের মনে করছি বলেই এতটা সাহস করছি।"

অনাথ বলিল, "যখন ছোট ভাই মনে করেন, তখন এ প্রশ্ন আপনি নিশ্চয়ই করতে পারেন। এম-এ পড়ে বিশেষ কোন লাভ নেই একথা খুব সত্যি। শেষে প্রোফেসারী বা হেড মাষ্টারী ছাড়া যদি কিছু জোটে তা বিশেষ সুপারিশের জোর থাকলে।"

নরহরি বলিলেন, "আপনার সত্য অথচ অকুণ্ঠিত অভিমত শুনে আমি বিশেষ আনন্দিত হলাম। এম, এ পাশ করতে যে টাকা ব্যয় হয়, সে টাকায় একটা ভাল স্বাধীন ব্যবসা করে দেশের, নিজেরও যথেষ্ট উন্নতি করতে পারা যায় না কি?"

অনাথ বলিল, "ব্যবসা করতে যত টাকা লাগে, এবং ব্যবসা করার অভিজ্ঞতা এ দুইয়ের আমার কোনটিই নেই, সুতরাং আপনার কথার সম্পূর্ণ স্বাধীন উত্তর দিতে পারলাম না। তবে একথাও শুনতে পাই, মাড়োয়ারীরা নাকি লোটা ও কম্বল এবং সাহেবেরা হ্যাট ও কোট নিয়ে বাঙ্গলা দেশে এসেছিল। আজ তাদের কেউ কেউ অপরজন রাজার সমতুল্য ঐশ্বর্য্যবান।"

নরহরি বলিলেন, "ঠিক বলেছেন। একজন দেশের রাজা, অপর রাজার সমতুল্য—কেবল ব্যবসার খাতিরে। ক'জন ইংরাজ বিলাত থেকে এম এ পাশ করে এ দেশে ব্যবসা করতে এসেছে? কয়জন মাড়োয়ারী ইস্কুল, কলেজের গেট পর্য্যন্ত গিয়েছে? কিন্তু তাঁদের ব্যবসা বুদ্ধি দেখে বণিকের জাত ইংরাজ পর্য্যন্ত আজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এক একজন মাড়োয়ারী পাগড়ীর ভিতর হতে লক্ষ টাকা অক্লেশে বার করে দেবে; কিন্তু এ দেশে খুব নামজাদা জমিদার বা রাজাকে এক সঙ্গে লক্ষ টাকা বার করতে হলে বিষয় বন্ধক বা ধার করা ভিন্ন তাঁর অন্য উপায় নেই। কাদের অবস্থা ভাল বল? যদিও লেখা-পড়া শেখার বিরোধী কোন দিন আমি নই, কিন্তু লেখাপড়া কেবল শিক্ষার জন্যেই—মনের উন্নতি, জাতির উন্নতি এবং মনুষ্যত্ব লাভের জন্যেই একান্ত প্রয়োজন।"

এই সময় রসিক আসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অনাথের পাশে বসিয়া তাহাকে বলিল, "বলি ব্যাপার কি,দাদাবাবুর সঙ্গে যে খুব তর্ক জমিয়ে তুলেছ?"

অনাথ রসিকের কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "আপনি যে লেখাপড়ার কথা বলছেন, সে রকম লেখা পড়া শেখার মত স্কুল কলেজ কোথায় পাবেন বলুন? আজকালকার শিক্ষা হচ্ছে কোন রকমে ইউনিভার্সিটির সীল-মোহর করে ছাড়-পত্র পাওয়া—যে যেমন ছাড়-পত্র নিয়ে বেরুবে, সে সেই রকম একটা কাযের জন্য উমেদারী করবার অধিকার পেতে

পারবে। নতুবা উমেদারী করলেও কেউ তার কথায় কর্ণপাত করে' অনর্থক সময় নষ্ট করতে রাজি হবে না।"

নরহরি বলিলেন, "আপনি ঠিক বুঝেছেন। তথাপি এমনি পাশ করার নেশা যে, এতগুলি টাকাও জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এই পাশের পশ্চাতে অম্লান বদনে ব্যয় করছেন। এই পাশ করার এমন শক্তি নেই যে কোন দিন আপনাকে সে একটা স্বাধীন উপার্জ্জনের পথ দেখিয়ে দিতে পারে।"

অনাথ বলিল, "কথাটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু উপায় কি? সকলের ত আর ব্যবসা করবার মত শিক্ষা বা মূলধন নেই।"

নরহরি বলিলেন, "একথা মানতে পারলাম না। কোন দিন কি শেখার জন্যে বা মূলধনের জন্যে চেষ্টা করেছেন? যতখানি যত্ন, পরিশ্রম বা অর্থব্যয় উকিল ডাক্তার হবার জন্যে করেন, তার শতাংশের একাংশও কি নিজের পায়ে ভর দিয়ে স্বাধীন হবার জন্যে করেছেন?"

রসিক এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। সে বলিল, "ব্যবসা করলেই যে লাভ হবে এমন কোন কথা নেই, বা ব্যবসা করেই সকলে বড়লোক হচ্ছে একথাও খুব সত্যি নয়। অনেকে ব্যবসা করতে গিয়ে একেবারে পথের ভিখারীও ত হচ্ছে! কিন্তু লেখাপড়া শিখলে সেটা আর এ জীবনে যাবার নয়। তাই লেখাপড়ার পিছনে যত টাকাই ব্যয় করুন না, সেটা একেবারে নষ্ট হবার কোন আশঙ্কা নেই।"

নরহরি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হবু উকিলের পূর্ব্বরাগটা মন্দ হয় নি বটে! কিন্তু যে বিদ্যা প্রয়োজন মত অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম, সে বিদ্যার ব্যবসাক্ষেত্রে কতটুকু মূল্য? সকলেই কি লেখাপড়া শিখে উকিল, ব্যারিষ্টার বা ডাক্তার হয়? যদি না হয় তবে বাকী গুলোর অদৃষ্টে কি দাঁড়ায়? তাহাদের বিদ্যা কি কাযে আসে? শেষে দাসত্ব ভিন্ন অন্য কোন পথ ত নেই। বাকী যেগুলি, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি হন, তাঁরা সকলেই কিছু টাকা রোজগার করিতে পারেন না। যাঁরা পারেন, তাঁদেরও এই ব্যবসাদার ধনীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয়। রীতিমত শিখে ব্যবসা করলে কোন দিন ফেল হতে হয় না। একবার ব্যবসা শিখতে পারিলে তার মূলধনের জন্যেও আটকায় না।"

অনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতদিন এই অভ্রের কায করছেন?"

নরহরি বলিলেন, "আজ আঠারো বৎসর। বি-এস-সি পড়তে পড়তে আমার অসুখ হয়—হাওয়া বদলাতে বাবা আমাকে এখানে আনেন। এখানে প্রায় আমাকে এক বৎসর থাকতে হয়। সেই সময় আমার একজন মাড়োয়ারীর সঙ্গে এখানে পরিচয় হয়। তাঁর কাছে আমার অভ্রের কায শেখা।"

এই সময় একটী ১৩,১৪ বৎসরের মেয়ে আসিয়া বলিল, "বাবা, এখন কি আপনাদের খাবার দেওয়া হবে?"

নরহরি বাবু যুবকদ্বয়ের মুখের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার নীরব প্রশ্ন বুঝিয়া অনাথ বলিল, "এখনো ত বেশী রাত হয়নি? আপনারা কি সকাল সকাল খান?"—বলিয়া একবার মেয়েটীর মুখের দিকে সে চাহিল। প্রশ্নটি শুনিয়া বালিকার অধরপ্রান্তে একটী মৃদু হাসি লুকাইয়া ফিরিতেছে। তাহার মুখ খানি খুব সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের অপূর্ব্ব লাবণ্য অদম্য উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কোঁকড়ান কালো চুলের রাশি নিবিড় ঘন মেঘের মত পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া, বিদ্যুৎস্ফুরণের মত তাহার সংযত হাসিটী নয়ন-পথে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। নরহরিবাবু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রসিক বলিল, "এটী আমার বড় ভাগ্নী। দাদাবাবু লেখা-পড়ার যতই নিন্দা করুন কণিকাকে বাড়ীতে বেশ লেখা-পড়া শিখিয়েছেন।"

মাতুলের প্রশংসায় কণিকা মাথা নীচু করিয়া

তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইল। একটা অ[illegible] লজ্জা অকস্মাৎ কণিকার সমস্ত সাহস যেন [illegible] করিয়া লইল!

রসিক আদর করিয়া ভাগিনেয়ীকে নি[illegible] বাহুবেষ্টনের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "কেন রে এত তাড়া? তুই বুঝি আজ রেঁধেছিস্?"

কণিকা লেখা পড়া শিখিলেও নবাগত অতিথির সম্মুখে মুখ তুলিয়া অসঙ্কোচে কথা বলিতে পারিতেছিল না, সুতরাং ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "তা বলবো কেন?"

অনাথ বলিল, "তা না বল্‌লে আমরা খাব কেন? কে রেঁধেছে না জেনে খেতে আছে? তোমার মামা আমাকে বলেছেন কণিকা খুব ভাল রাঁধতে শিখেছে।"

কণিকা মামার দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "মামা আমার হাতের রান্না খেয়েছেন একথা আমার ত মনেই পড়ে না।"

এ কথা শুনিয়া সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অনাথ বলিল, "তুমি যদি রান্না করতে না জান, তবে কেন বলছ তোমার হাতের রান্না তোমার মামা খেয়েছেন কিনা মনে পড়ে না। এই খানেই ত নিজেকে ধরা দিলে!"

কণিকা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনিও কি মামার মত উকিল হবার চেষ্টা করছেন?"

আবার সকলে হাসিয়া উঠিলেন। মেয়েটীর বিবাহোচিত বয়স হইলেও তাহার বালিকা-সুলভ নির্ম্মল সরল হাসি ও শিশু-ভাবটী তাহাকে অনাঘ্রাত কুসুমের পবিত্রতায় সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে।

কণিকা এই সময় একখণ্ড অভ্র পিতার হাতে দিয়া বলিল, "আজ আমি খাদ্ দেখতে গিয়েছিলাম, দেখুন বাবা কেমন অভ্র বেরিয়েছে। আমার বোধ হয়, এদিকটায় কেবল লালই আছে, আর খুব বড় বড় থান পাওয়া যাবে।"

সকলের দৃষ্টি তখন সেই অভ্র খণ্ডের উপর আবদ্ধ হইল। নরহরি অভ্রটী হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। "রাত্রে ঠিক্ বোঝা যাচ্ছে না" বলিয়া কণিকাকে মাথের আলোটা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। কণিকা দেওয়ালের গায়ের একটী সুইচ টিপিয়া দিতেই দিনের মত আলো হইয়া উঠিল।

অনাথের এতক্ষণ আলোর দিকে মোটেই খেয়াল ছিল না। সহসা দিনের মত আলো হইতে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি! আপনাদের এখানে কি ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট আছে? আমি যেন পথে কেরাসিন তেলের আলো দেখে এলাম বলে মনে হচ্ছে।"

কণিকা মৃদু হাসিতে মুখটী আরও সুন্দর করিয়া বলিল, "যা দেখেছেন তাও সত্যি, এবং এটা যে ইলেট্রিক আলো এটাও সত্যি—আর এখানেও যে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট নাই এ কথাও সত্যি।"

অনাথ বলিল, "বুঝলাম সবই সত্যি। কিন্তু বুঝলাম না, এ আলো কোথা থেকে আসছে।"

কণিকা বলিল, "এটা আমাদের নিজের বাড়ীর আলো।"

নরহরি বলিলেন, "সে যা'ক্—কণিকা, ম্যানেজার এ অভ্র সম্বন্ধে কি বলেন?"

কণিকা বলিল, "তিনি বলেন তাঁরও খুব বিশ্বাস এদিকটায় লালই বেরুবে।"

নরহরি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আমার প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার অর্ডার হাতে। তা আর বাজার থেকে কিনতে হবে না।"

অনাথ ও রসিক উভয়েই একটী অর্ডার ২৫ লক্ষ টাকার শুনিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া এই পিতা পুত্রীর মুখের পানে হর্ষবিহ্বল বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের মনের মধ্যে বহুবিধ চিন্তার তড়িৎ-প্রবাহ মুহূর্ত্তের ভিতর সহস্র কল্পনার রংমশাল জ্বালাইয়া দিল। রসিক জানিত না যে তাহার ভগিনীপতি কত বড় ব্যবসা করেন। অভ্রের ব্যবসা করেন, দুই পয়সা উপার্জ্জন করেন, ইহার অধিক

তাহার জানা ছিল না। তাহার ওকালতী পাশ করার অহঙ্কার ও গর্ব্ব যেন ঘূর্ণী-বাতাসের মুখে শুষ্ক পাতার মত কোন অজ্ঞাত দেশে নিমেষে উড়িয়া গেল। সাহস করিয়া রসিক যেন আর নরহরি বাবুর দিকে তাকাইতে পারিতেছিল না।

অনাথ বলিল, "আপনাদের নিজের বাড়ীর জন্ত ইলেক্‌ট্রিক্ রাখতে ত অনেক ব্যয় পড়ে?"

নরহরি ধীর স্বরে উত্তর করিলেন, "এ আলো বাড়ীর জন্যে নয়, কারবারের জন্যে। যখন কাযের ভিড় পড়ে তখন সারারাত্রি কায চলে। তেলের আলোয় অভ্র চেনা যায় না। কাল সকালে আপনাকে কারখানা দেখাব। দেখুন না, এই অভ্রটা থেকে নানা রকম মূল্যের অভ্র বেরুবে। এই একখণ্ড থেকে ৫০০০ টাকা মণের অভ্রও বেরুতে পারে! যারা অভ্র চেনে এমন লোক এদেশে খুব কম পাওয়া যায়।"

অনাথ অভ্রটা হাতে করিয়া, বানরের কণ্ঠে মুক্তার মালার অবস্থার মত তাহার কোন মূল্যই বুঝিতে পারিল না। সে লজ্জায় সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, "অভ্রের এত দাম?"

কণিকা বলিল, "আপনি অবশ্য জানেন যে অভ্র ভারতবর্ষের একচেটিয়া ব্যবসা?"

পরাজিত সৈন্যাধ্যক্ষের মত সে অত্যন্ত চাপা গলায় উত্তর দিল, "না।"

কণিকা আবার বলিল, "আর আশ্চর্য্য যে, ভারতবর্ষের এই অঞ্চলেই উৎকৃষ্ট অভ্র পাওয়া যায়। চলুন না, একদিন খনি দেখে আসবেন।"

রসিক এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। তার মনে হইতেছিল একি স্বপ্ন?

৩

অনাথ বাহিরের ঘরে মেহগিনি খাটখানির উপরে শুইয়া ছিল। রসিক আহারাদির পর তাহার দিদির সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গল্প করিতেছিল। বোধ হয় অনেক রাত হইয়া গেছে বলিয়া অনাথকে আর সে বিরক্ত করিতে বাহিরে আসে নাই। অনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া রহিল। নিদ্রাদেবী জানি না কি কারণে তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন। নিদ্রা-বিহীন নয়নে শয্যায় পড়িয়া থাকা ক্রমেই তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকের জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। একটি স্নিগ্ধ অথচ মধুর বাতাস পুষ্পগন্ধে হিল্লোলিত হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে এমন একটা সুখ-স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছিল যাহা তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া একটা আনন্দ রাগিণীকে গুণ গুণ করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছিল। জানালার বাহিরে সুন্দর একটা পুষ্পোদ্যান। সেখানে গোলাপ, বেল, যুঁই ও চামেলীর ভিড় লাগিয়াছে; তাহার উপর জ্যোৎস্না সেদিন যেন নিজেকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ঢালিয়া দিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। যতদূর দৃষ্টি চলে, মেঘ লেশ-হীন নির্ম্মল অম্বরে দ্বাদশীর চন্দ্র নক্ষত্র-রাজি পরিবৃত হইয়া দানসত্র খুলিয়া বসিয়াছেন। নীরব নিস্তব্ধ রজনী। মাঝে মাঝে দুই একটা কুকুরের চিৎকার এবং থাকিয়া থাকিয়া বায়সের কণ্ঠস্বরও শ্রুত হইতেছিল। অদূরে পরেশনাথ পাহাড় ও অন্যান্য পর্ব্বতশ্রেণী প্রকৃতির পাহারায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কি গভীর নিস্তব্ধতা! কি বিপুল জ্যোৎস্না-প্লাবন! হৃদয়, মন, নয়ন সব যেন নিস্পন্দ হইয়া এক সঙ্গে এই সৌন্দর্য্য সাগরের অতল তলে তলাইয়া যায়।

জীবনটা যে সত্য সত্যই উপভোগের বস্তু এবং সেটা যে কেবল ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট লাভের অশান্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বন্দী নয় এ কথাটা আজ অনাথ যেন অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর ভাবে বুঝতে পারিল। নানা প্রকার চিন্তা এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া তাহার মনটাকে ঘেরিয়া ফেলিল। সে আবার শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। নানা প্রকার চিন্তার পর মনে মনে বলিল, আচ্ছা! আমি এম-এ পড়ছি কেন? আমার লেখা পড়া শেখার মধ্যে কিছু করার কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পথ নেই। পড়তে হয়, সকলে পড়ছে আমিও সেই সঙ্গে ঠিক স্রোতের মুখে গা ভাসান দিয়ে চলেছি? আমার দ্বারা

অর্থ উপার্জ্জ কি সুবিধা হইতে পারে? আমি দেশের কোন ক আসিতে পারি?

অর্থকরী বা কার্য্যকরী বুদ্ধি বা বিদ্যা এ উভয়ের কোনটাই ত আমার নেই। কণিকা বালিকা, সেও যা শিখেছে আমার বিদ্যা তাহার কাছে অতি তুচ্ছ; নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সে অভ্র সম্বন্ধে কেমন তার বাপের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল। কণিকা স্মিতহাস্তে ও আনত নয়নে যখন মাঝে মাঝে আমার মুখের প্রতি চাহিতেছিল, সে দৃষ্টি যেন তীরের মত আমার উচ্চ-শিক্ষার অহংকার ও গর্ব্বকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতেছিল। সে বলিল, "অভ্র আমাদের দেশের একচেটিয়া ব্যবসা, বোধ হয় আপনি জানেন? ছি! আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। অথচ আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ছাত্র!

অনাথের মনে হইল আজই রাত্রিতে পত্র লিখিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, নূতন জীবনের সূত্রপাত করিবে। তার পর সে ঘুমাইয়া পড়িল।

নিদ্রিতাবস্থায় অনাথ এক অপরূপ স্বপ্ন দেখিল যেন সে নরহরি বাবুর কারখানা দেখিতে গিয়াছে কণিকাও তার পিতার সঙ্গে আছে। কারখানা সম্বন্ধে তাহার এতখানি জীবনে কোন অভিজ্ঞতাই ঘটে নাই। সুতরাং কারখানা পরিদর্শনের সময় তাহাকে নিছক আহাম্মুখ বনিয়া যাইতে হইয়াছে। কারখানা দেখা ব্যাপারে কণিকাই যেন অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আর সেই গুজ্রাটী ম্যানেজার তাহার সহকারিতা করিতেছে। নরহরিবাবু তাঁহাদের পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছেন, অনাথ যেন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গাধাবোটের মত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। হাজার হাজার কারিকর তাহার মুখের প্রতি একটা কৌতূহল উদ্দীপ্ত করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাকাইয়া আছে। এক একটী অভ্রখণ্ড কণিকা কারিকরগণের হাত হইতে লইয়া যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছে, অনাথ যেন তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিতেছে না। সমস্ত কারখানাটী যেন তাহার চক্ষের নিকট বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইতেছিল। রৌদ্র-কিরণ সম্পাতে অভ্রখণ্ডগুলি উজ্জ্বল পরিহাস যেন লুটপুটী খাইতেছিল। অনাথ আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। ছুটিয়া পলাইয়া আসিবে মনে করিয়া যেমন একটী পা বাড়াইয়াছি, অমনি আগ্রহ ভরে কণিকা যেন তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "কোথা যাচ্ছেন, এখনও ত কিছু দেখা হয় নি!" তাহার স্পর্শে আনাথের সমস্ত শরীর যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে যেমন বলপূর্ব্বকহাতখানি টানিয়া লইতে যাইবে অমনি তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

নিদ্রা ভঙ্গে অনাথ দেখিল পুবের জানালার ফাঁক দিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়াছে। পশ্চিমের জানালা দিয়া প্রভাতের শীতল বায়ু ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিতেছে। তখন তাহার কপালে ও নয়নের কোণে স্বেদ জমিয়া রহিয়াছে। সে শয্যায় উঠিয়া বসিতেই দেখিল, কণিকা টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। কণিকা বলিল, "মামা বেড়াতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনি উঠেছেন কিনা দেখতে। আপনি ততক্ষণ তৈরী হোন, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।"—বলিয়া কণিকা চলিয়া গেল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দুল্‌বে এস !

প্রাণের দোলায় প্রাণের ঠাকুর
দুল্‌বে এস !
আজ যে ঝুলন হাজার দোলন—
দুল্‌বে এস !
অশ্রু হাসির আলোক ছায়ায়,
হর্ষ ব্যথার মিলন মেলায়,
দুঃখ সুখের লীলায় খেলায়,
দুলবে এস !
আভীর বালার চরণ নূপুর
বাজে না হেথায় মধুর মধুর,
নীরব নিঝুম সারা মন-পুর—
দুলবে এস !
নিবিড় নীরদে নভঃ ঢাকা আজ,
ধরে নি ধরণী মোহিনীর সাজ,
পথ চেয়ে তবু আছি রসরাজ,—
দুলবে এস !
আমার সকল শয়ন স্বপনে,
আমার সকল বচন মননে,
আমার সকল জীবন মরণে,
দুলবে এস !

৺জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ।

বিপ্লবপন্থী

(গল্প)

"এ কাযে ব্রতী হ'লে রীতিমত একাগ্রতা থাকা দরকার!" পিছনদিকে মুখ ফিরাইয়া ধনঞ্জয় দেখিল, বিপিন তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—নগর-প্রান্তে একখানি বহুকালের পুরাণো বাড়ী। তাহারই নীচের একখানি অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে একটা তক্তপোষের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ধনঞ্জয় বসিয়া ছিল। সাম্‌নে একটা হ্যরিকেন জ্বলিতেছিল, তাহার চিম্‌নির অর্দ্ধেকটা প্রায় ঝুলায় ভরিয়া গিয়াছে।

বিপিনের এই কথায় ধনঞ্জয় একটা বেশ বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস চাপা দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "বোস।" পরে বিপিন বসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি একাগ্রতার অভাব তোমরা দেখ্‌লে আমার কাযে?"

সে-প্রশ্নের কোনরূপ জবাব না দিয়া বিপিন কহিল, "তবে, এমন করে' বসে' ভাবছিস্ কি? দেখলেই মনে হয়, ভয়ের চাপে তুই বুঝি ভেঙে পড়ছিস্।"

ভয়?—ধনঞ্জয়ের চোখ দু'টা মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই আবার অতি ম্লান একটু হাসিয়া সে কহিল, "ভয়কে গলা টিপে অনেকদিন মেরে ফেলেচি। অথচ, তার চেয়েও লঘু একটা জিনিষকে যেন আমি কোনোমতেই মন থেকে উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে পাচ্ছিনে,—কিছুতেই না।"

"কি বল্ দেখি?"

"স্মৃতি।"

"প্রেমে পড়েছিস্ বুঝি ?"—বলিয়া বিপিন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিতে ধনঞ্জয় বিরক্ত হইয়া কহিল,—"না বুঝ্‌তে পারিস্, চুপ করে' থাক্ বিপিন। কিন্তু অমন অট্টহাসি হেসে এর পবিত্রতাটুকু নষ্ট করিস্ নে।"

বিপিন গম্ভীর হইয়া কহিল, "আচ্ছা, চুপ করলুম। শুনি এবার তোমার প্রেমের গুঞ্জনটা—"

ধনঞ্জয় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—"না। তা শুনে বা শুনিয়ে কোন লাভ নেই। সেই চিরদিনের একঘেয়ে ইতিহাস। ভগবান্ আমায় পয়সা দেন নি, কিন্তু তাই বলে' হৃদয়ের তৃষ্ণাও কিছু কম করে' পাঠান নি। ঐখানেই এক মস্ত অবিচার। তাদের দোষ কি ? সে ধনীর ঘরের রূপসী মেয়ে; ধনীর ঘরেই তার বিয়ে হ'য়ে গেল। তার ভাই প্রবোধ ছিল আমার সহপাঠী। না-বুঝে সেও আমায় আদর করে' তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল; না-বুঝে আমিও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলুম।"

বিপিন কহিল, "দোষ দু'পক্ষেরই।"

ধনঞ্জয় মৃদুস্বরে কহিল, "মান্‌তে চাইনে। তোমরা বল্‌বে, আমার হতে পড়্‌লে সে অসুখে থাক্‌তো; আমি বল্‌বো তা নয়। সব মানুষ কিছু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্যকে টেনে আনে না। আমার ভবিষ্যৎ কতবড় ছিল, তা কে বল্‌বে ? কিন্তু সে ভবিষ্যতের মুখে আজ এক প্রকাণ্ড হিমালয়ের আড়াল তুলে দিয়েচি।" বলিয়া সে কেমন এক অদ্ভুত রকমে হাসিতে লাগিল। বিপিনের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

টিং টিং টিং। দেওয়ালে আঁটা ঘণ্টাটা তিনবার বাজিয়া উঠিল। ধনঞ্জয় ও বিপিন দু'জনেই বরাবর উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বিতলের একখানি বড় ঘরে কেরোসিনের উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। চেয়ারের উপর উপর হেলান্ দিয়া উপরের কড়িবরগার দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া একটী বলিষ্ঠ যুবা বসিয়া। তাহার গায়ে একটী টুইলের হাতকাটা পিরাণ। ইহাদের দেখিয়া যুবক খাড়া হইয়া বসিল। বলিল, "দরজা বন্ধ করে' দিয়ে বোস।" ধনঞ্জয় ও বিপিন মেঝের-পাতা মাদুরের উপর বসিয়া উৎসুক হইয়া এই যুবকের দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবক বলিল, "কৃষ্ণনগরের দল ধরা পড়েছে।"

বিপিন ও ধনঞ্জয় উভয়েই কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। দলপতি যুবক কহিল, "পুলিশ এখন রীতিমত তদন্ত চালাবে। আমাদের এ আস্তানা ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হতে হবে। কিন্তু, খুব নীরবে।"

২

বাঙলায় বিপ্লব-বাদীদের উচ্ছেদ করিবার জন্য তখন সরকার মহলে মহা হাঁকডাক পড়িয়া গিয়াছে। একদিকে বিদ্রোহীদের লোমহর্ষণ কার্য্যাবলী, অপর দিকে পুলিশের কড়াকড়ি, এই দু'য়ের মাঝে পড়িয়া বেচারা নিরীহ গৃহস্থের দল একেবারে তটস্থ হইয়া পড়িয়াছে।

ধনঞ্জয় এবং বিপিন উভয়েই বিপ্লবপন্থী। কৃষ্ণনগরের দল ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-আড্ডা ছাড়িয়া—বাঙলা দেশ ছাড়িয়া—একেবারে বিহার অঞ্চলে পলাইয়া গেল। সঙ্গে আর বড় কেহ রহিল না, মাত্র এই দুইজন। বিপিন দেখিতে শীর্ণ ছিল। বরাবর রাঁচীতে আসিয়া ধনঞ্জয় পরিচয় দিল, তাহার রুগ্ন বন্ধুকে লইয়া সে বায়ু-পরিবর্ত্তনে আসিয়াছে। সেখানে বসিয়া তাহারা প্রতিনিয়ত খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল; এই সমস্ত বিদ্রোহীদের সংস্পর্শে যে-যেখানে আছে, তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পুলিশ দোষী নির্দ্দোষ নানান্ লোকের উপর কত জোর-জুলুমই না করিতেছে!

তখন সবে বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িয়াছে। শীতের আমেজের সঙ্গে সঙ্গে ছোটনাগপুরের স্বাস্থ্যকর বাতাস বড় মধুর হইয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। সেদিন দাওয়ায় বসিয়া ধনঞ্জয় ও বিপিন গল্প করিতেছিল। আকাশের উপর সপ্তমীর চাঁদ ম্লান জ্যোৎস্না ছড়াইতে

ছিল। ধনঞ্জয় বলিতেছিল, "তুমি কিন্তু ভাল কর নি। আমি ধরা পড়ি, ফাঁসিতে ঝুলি, দুঃখ করবার কেউ নেই—কিন্তু, তোমার মা—"

বিপিন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; পরে গলা নামাইয়া বলিল, "দেখ্‌চি, দেশের কায তোমার জন্তে নয়। বুকের ভিতর প্রেমের ফোয়ারা নিয়ে এখানে এসে তুমিই ভাল কর নি। তাই আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, যদি এখনি একটা বড় রকমের কাযের হুকুম এসে পড়ে, তুমি হয়ত' একেবারে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠবে!"

ধনঞ্জয় হাসিয়া কহিল, "তার পরিচয় একদিন নিশ্চয়ই পাবে। বড় ঠাণ্ডা; চল, ভিতরে যাই।"

দু'জনে উঠিয়া ভিতরে যাইবে, এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্ত্তেই ডাকহরকরা একখানা চিঠি দিয়া গেল।

ঘরের ভিতর আসিয়া হরিকেনের আলোয় দুইজনে উৎসুক হইয়া চিঠি খুলিয়া পড়িল। এবং পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই দুইজনেই হিম—নির্ব্বাক হইয়া গেল। চিঠিতে মাত্র এই কয়ছত্র লেখা ছিল;—

"নামজাদা টিকটিকি যোগেন সরকার হাজারীবাগ থেকে কলকাতায় তদন্তে আসছে—তাকে শেষ কর। নইলে অনেক গলদ বেরিয়ে পড়বে।"

চিঠিতে কাহারও নাম সহি নাই; নীচে শুধু একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন। চিঠি পড়িয়া কেহ কথা কহিতে পারিল না। শুধু একবার পরস্পরের সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া দুইজনে তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে ধনঞ্জয় হঠাৎ যেন অতিরিক্ত রকম উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল,—"ব্যস; হুকুম এসেছে। এইবার দেখ্‌, তোদের চেয়ে আমি কাযের লোক কম, কি বেশী!"—বলিয়া ধনঞ্জয় নিজের ট্রাঙ্ক খুলিয়া রিভলভারটা বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে বসিয়া গেল।

৩

তারপর পাঁচদিন কাটিয়াছে।

কলিকাতায় কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে একজন ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছিল,—হাজারীবাগের খুনের নূতন খবর বেরুল বাবু—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান—ইত্যাদি। দলে-দলে লোক আসিয়া ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র কিনিয়া লইতেছে। সেই ভিড়ের ভিতর হইতে একটী ফিট্‌ফাট ভদ্র যুবক একখানি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কিনিয়া বরাবর ফুটপাথ দিয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে আপনার মনে অগ্রসর হইল; কোনওদিকে দৃক্‌পাত করিল না। ইহারই নাম ধনঞ্জয়।

কোন এক হিন্দু বোর্ডিংএর একখানি ঘরে ধনঞ্জয় একাকী আসিয়া উঠিয়াছে। নিজের ঘরে ফিরিয়া সে জামা কাপড় বদ্‌লাইয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। নূতন সংবাদের ভিতর তাহাতে কিছুই ছিল না; কেবল এখানে সেখানে কতকগুলা তদন্তের খবর। কাগজ মুড়িয়া ধনঞ্জয় খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল। এবং তাহার সেই নিমীলিত চোখের অন্ধকারের ভিতর হইতে সেদিন রাত্রের সেই ভয়াবহ অন্ধকারের মূর্ত্তিখানাই যেন সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। রেল লাইনের নিকট সেই নির্জ্জন রাস্তায় যখন সে যোগেন সরকারের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া প্রথম গুলি ছুটাইল, তখন সেই বিকট গর্জ্জনে তাহার নিজেরই আত্মা যেন বুকের নীচে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। চারিদিকে শুধু শব্দ হইল, পালা—পালা—! সকলে যে-যেদিকে পারিল পলাইল। গাড়ীর ভিতর হইতে যোগেন সরকার ছুটিয়া বাহিরে আসিল; এবং সেই মুহূর্ত্তে উপর্য্যুপরি গুলির আঘাতে সেইখানেই পড়িয়া গেল। গাড়ীর ভিতর হইতে আরও কে যেন বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল; যেন নারীকণ্ঠের একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ সেই নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিল বলিয়া মনে হইয়াছিল। কে জানে, হয়ত ঠিক, হয়ত' বা

ভুল!—ভাবিতে ভাবিতে ধনঞ্জয়ের সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

কিন্তু থাক। জীবনে যে ব্রত লইয়া সে বসিয়াছে, তাহার সাধনায় সে একটা অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছে। কিসের দুর্ব্বলতা? এ কাষ সে ছাড়িয়া দিবে? কেন ছাড়িয়া দিবে? বিপিন তাহাকে সেদিন অকর্ম্মণ্য বলিয়া শ্লেষ করিয়াছিল; ধনঞ্জয় প্রমাণ করিয়াছে, তাহাদের অনেকেরই চেয়ে সে সাহসী এবং কর্ম্মঠ।

আর বেশীক্ষণ এম্নি ভাবে পড়িয়া পড়িয়া চিন্তা করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। ঘরের দ্বার খুলিয়া বারান্দার উপর সে একটু পায়চারি করিতেছে, এমন সময় অপর একটা লোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দ্বিতীয় লোকটীও কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"আপনার নাম ধনঞ্জয়বাবু না?"

ধনঞ্জয় হাসিয়া কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ প্রবোধবাবু, সেই 'ধনঞ্জয়'। তা তুমি এখানে যে?"

প্রবোধ বলিল—"এই ঘরখানা তোমার বুঝি? এস না, ভিতরে গিয়ে সব বল্‌ছি!"

দুইজনে আসিয়া ঘরের ভিতর বসিল। প্রবোধ কহিল,—"আমি এইমাত্র এ বোর্ডিংএ এসে উঠ্‌ছি। উঃ কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি!"

ধনঞ্জয় অন্যমনস্কে উত্তর দিল,—"হ্যাঁ।" পূর্ব্বস্মৃতির চাপে তাহার বুকখানা যেন নত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার সহপাঠী এবং সতীর্থ এই প্রবোধই একদিন তাহাকে তাহাদের পরিবারে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে দিয়া তাহার প্রাণে আশার চাঁদনী ফুটাইয়াছিল। সে মুখ তুলিয়া চাহিল;—ইহার মুখের উপর এখনও যে সেই কচি মুখখানির ছাপ সুস্পষ্ট ফুটিয়া রহিয়াছে!

ধনঞ্জয় কহিল, "তোমায় বড় শুক্‌নো দেখাচ্ছে!"

"শুক্‌নো?"—ম্লান হাসি হাসিতে গিয়া প্রবোধের চোখ দিয়া দু'ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে বলিল—"কেন, তুমি শোন নি বুঝি, আমাদের বড় আদরের বোন্ প্রতিমার শোচনীয় মৃত্যু?"

ধনঞ্জয় স্তম্ভিত হইয়া গেল।

প্রবোধ কহিল,—"যোগেন্দ্র সরকারের ছেলের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে হ'য়েছিল কিনা! সি-আই-ডি'র যোগেন্দ্র সরকার হে! সেদিন রাত্রে হাজারীবাগ থেকে প্রতিমাকে সঙ্গে ক'রে তিনি কল্‌কাতায় আসছিলেন, তারপর পথে"—বলিয়াই প্রবোধ রুমালে মুখ চাপিল।

—ধনঞ্জয়ই তবে সহস্তে প্রতিমাকে খুন করিয়াছে!

মিনিটখানেক সমস্ত নিস্তব্ধ। হঠাৎ ধনঞ্জয়ের কণ্ঠস্বরে প্রবোধ চমকিয়া উঠিল। তাহার মূর্ত্তির পানে চাহিয়া প্রবোধের আপাদমস্তক কাঁপিয়া গেল। সে ভয়ে খাট ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। ধনঞ্জয় হাতের রিভলভারটা প্রবোধের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—"কি, পারবে? এই গুলি; আর লক্ষ্য কর—এই বুক। নাও!"

প্রবোধ কহিল,—"কি বল্‌ছ ধনেন্?"

ধনঞ্জয় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরে বলিল,—"না, তোমার কাষ এ নয়। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও ঘর থেকে—"

প্রবোধ সভয়ে চীৎকার করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা বিকট শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে রিভলভারের ধুমে সেই ছোট ঘর আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বোর্ডিংএর সমস্ত লোক ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, ধনঞ্জয়ের বিশাল দেহ রক্তস্রোতে ভাসিতেছে।

সন্ধ্যাবেলায় কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজওয়ালারা হাঁকিতে লাগিল—"মেসের বাসায় বিষম কাণ্ড বাবু—রেবালবারে আত্মহত্যা—"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হাওদা শিকার

অনেক শিকারী মনে করেন, শিকার করিবার সময় জানোয়ারের ঘাড়ের উপর গিয়া না পড়িলে বাহাদুরী কিছু কম হয়। কিন্তু বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত, কোন সময়েই কোন শিকারের একেবারে ঘাড়ের উপর গিয়া হাতী লইয়া পড়া উচিত নয়। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা তো আছেই, অধিকন্তু হাতীর উপর হইতে খাড়া ভাবে, ঘাস কি ঝোপ জঙ্গলে, নীচের দিকে কিছু দেখা যায় না বলিয়া শিকার করা চলে না। একটু দূর হইতেই বরং তের্‌ছা ভাবে ভাল দেখা যায়; কাযেই শিকারীর একটু দূরে থাকাই ভাল। একবার এই ভাবে বাঘের ঘাড়ে গিয়া পড়াতে, আমাদের সঙ্গীর এক শিকারীর যেরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতেছি।

বাঙ্গালা ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূমিকম্পের পর, কিংবা তৎপর বৎসর আমরা "হুহুং এর থলে" (থল একটী জল সমাকীর্ণ বহুদূর বিস্তীর্ণ জঙ্গলে) শিকার করিতে যাই। সেবার আমাদের পার্টিতে মন্থবাবু, মহেশবাবু ও আমি ছিলাম। আমাদের ইচ্ছা ছিল, থলে শিকার করিবার পর, হুহুংএর মধ্য দিয়া, পূর্ব্বাভিমুখে সিলেটের দিকে কতকদূর অগ্রসর হইব। আমাদের বাহাদুরপুর কাছারীর নিকটবর্ত্তী পোড়াপুঁটিয়া গ্রামে, একটী অতি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের ধারে, আমরা প্রথম 'ক্যাম্প' করি। এই জলাশয়টা এককালে বহতি নদী ছিল, পরে উহার স্রোত বন্ধ হইয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে। যাহারা হাজারিবাগের লেক (Lake) দেখিয়াছেন, তাহারা ইহার বেশ ধারণা করিতে পারিবেন।

আমরা বরাবরই 'থলে' যাইবার পথে, এই স্থানে ২।৩ দিন হণ্ট করিয়া (থাকিয়া) যাইতাম; কারণ ইহার নিকটেই লেপার্ডের খুব ভাল ভাল কয়েকটী জঙ্গল আছে। বহুদূর বিস্তৃত স্বভাবসুন্দর এই জলাশয়ের তীরে সারি সারি তাঁবু পড়িয়া, স্থানটীকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিত। আমরা এই স্থানে দুই দিন থাকিয়া ৩।৪টী বাঘ মারিয়া, 'থলে' চলিয়া গেলাম। আমাদের অঞ্চলে 'থল' Hog-deer শিকারের একটী প্রসিদ্ধ স্থান।

থলে বাঘের (tiger) বড় বড় প্রিয় জঙ্গল আছে। ঐ সব জঙ্গলে অনেক সময়ই টাইগার পাওয়া যায়। ইহা ছাড়: 'থলের' নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে অনেক ছোট ছোট জঙ্গল আছে, তাহাতেও সময় সময় দুই একটী লেপার্ড পাওয়া যাইত। কিন্তু সেবার কি জানি কেন, বহু লেপার্ড আসায়, এই সব জঙ্গল ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। যে জঙ্গলেই যাইতাম, ২।১টী করিয়া লেপার্ড পাওয়া যাইত। একদিন ৫টা পর্য্যন্ত পাইয়াছিলাম। সেবার বাঘের এত আমদানী দেখিয়া, আমরা বেথবরেই নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জঙ্গল ঠেঙ্গাইয়া বেড়াইতাম এবং প্রতিদিনই ২।৩টী করিয়া লেপার্ড পাইতাম। সেবার এই স্থানে ৪৫ দিনে ১৪,১৫টী লেপার্ড শিকার হয়।

এইরূপে একদিন 'চালিতাথালি' গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন জঙ্গলে গিয়া একটি লেপার্ত পাই। ঐস্থান আমাদের 'ক্যাম্প' হইতে ৫।৬ মাইল দূরে ছিল। জঙ্গলটী বেশ ঘন এবং একটী শুষ্ক নালার মধ্যে অবস্থিত ছিল। লম্বায় প্রায় ২ ফার্লং এবং চওড়ায় কোন কোন স্থানে ১ ফার্লং কোথাও বা কিছু কম হইবে।

সেদিন আমাদের কি অযাত্রা ছিল যে, বাঘটাকে

কিছুতেই মারিতে পারিতেছিলাম না। আমরা তিন জনে উহার উপর বহু গুলি বর্ষণ করিয়াও কিছুই করিতে পারিলাম না; কারণ একে ঘন নল বন, তাহার মধ্যে আবার খুব ঘন ঘন শুল্রার ঝোপ ঝির জন্মাইতেছিল। (শুল্রা একরূপ বুনো কাঁটা গাছ। ইহার এক একটা ঝোপের মত হয় ও সাদা সাদা ফুল হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Bush rose বলে।) এক ঝোপ হইতে আর এক ঝোপে লাফাইয়া যাইবার সময়, Snap shot ছাড়া অন্য কোন রকম উপায়ই ছিল না। (যে সব আওয়াজের সময় বন্দুকের নল জানোয়ারের দিকে রুখু করিয়া চোক না বুজিয়াই আওয়াজ করা হয় তাহাকে snap shot বলে। ইহাতে অনেক সময় বন্দুক বুকে লাগান যায় না। খুব অভ্যাস না থাকিলে এইরূপ shot মারা যায় না।) ক্রমাগত বাঘের পাছে পাছে পাছে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে জঙ্গল অনেকটা পা'ট হইয়া আসিয়াছিল। যতই জঙ্গল পা'ট লইতে লাগিল, বাঘের বিক্রম যেন তত বাড়িতে লাগিল। তখন আর সহজে তাহারা এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে বাহির হইতে চায় না। ঝোপের নিকট হাতী গেলেই, 'চার্জ্জ' করিয়া একেবারে হাতীর মাথায় লাফাইয়া উঠে। এই ভাবে বাঘেরা ক্রমাগত 'চার্জ্জ' করিয়া ৫।৭ টা হাতীকে বেশ 'ঘা'ল' করিল। ইহার পর লাইনের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল; মাহুতদের মনেও প্রবল ত্রাস উপস্থিত হইল। কোন কোন মাহুত "পীরের বাঘ, মারিয়া কায নাই," কেহ বা "ইহা দেবাংশী, ইহাকে মারা যাইবে না," ইত্যাদি যাহার মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিতে লা'গল। মূল কথা মাহুতেরা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল বলিয়াই, এইরূপ নানা উপদেশ দিতেছিল। আমাদের নিশানার উপর উহাদের বিশেষ আস্থা ছিল, কিন্তু এখানে ক্রমাগত বিফলতায় 'বোধ হয় উহাদের মন দমিয়া গিয়াছিল। এর পর আমরা স্থির করিলাম, 'বীটর' হাতী ছাড়া আমাদের তিন হাওদা নিয়াই চেষ্টা করিয়া দেখিব। তদনুসারে হাওদা তিনটী পাশা-পাশি করিয়া, আমরা এ ঝোপ সে ঝোপ দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

মহেশ বাবুর হাওদা, রাজা জগৎকিশোরের 'শম্ভু প্রসাদ' নামক দাঁতলার (tusker) উপর ছিল। বোধ হয় 'শম্ভুপ্রসাদ' বাঘের ঘাড়েই পাড়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, অথবা কি কারণে বলিতে পারি না, হঠাৎ বাঘের ডাক শুনিয়া মহেশ বাবুর হাওদার দিকে তাকাইয়া দেখি, বাঘ 'শম্ভুপ্রসাদের' মাথায় উঠিয়া কামড়াইয়া ধরিয়াছে; কিন্তু শরীরটা হাতীর কাণের পাশ দিয়া ঝুলিতেছে। হাতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহার প্রকাণ্ড কাণ দুইটা ফাঁক করিয়া মেলাইয়া দিয়াছে। (এই ভাবে হাতীর কাণ ফাঁক করিয়া দাঁড়ানকে, কাণ ফাঁদাইয়া দাঁড়ান বলে।) সেই সঙ্গে সঙ্গে মহেশ বাবু, হাওদার সম্মুখে ঝুঁকিয়া, 500 Express rifle দিয়া বাঘকে নিশানা করিতেছিলেন। হাতীর কাণে বাঘ ঢাকা পড়িয়া গেলেও তিনি মনে করিতেছিলেন, বাঘকেই নিশানা করিতেছেন। আমরা এই অবস্থা দেখিয়া ক্রমাগত চেঁচাইয়া গুলি মারিতে নিষেধ করিতেছি; কিন্তু তাঁহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মহেশ বাবু এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, আমাদের চীৎকার তাঁহার কাণে পৌঁছে নাই। তিনি দম্ করিয়া হাতীর কাণেই গুলি করিয়া বসিলেন। বন্দুকের আওয়াজে বাঘ হাতী ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া আর এক ঝোপের ভিতর ঢুকিল। এদিকে মাহুতও "আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছে" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দেখা গেল যে Express এর shell গুলি, হাতীর কাণে লাগিয়া, ফাঁটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে ও তাহারই কয়েক টুকরা মাহুতের পায়ে বিঁধিয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্য যে মাহুতের কেবল মাত্র চর্ম্মভেদ করিয়াছিল, কিন্তু হাতীর কাণ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দৃষ্টে মহেশ বাবুর মুখ চুণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতী সরাইয়া নিয়া, হাওদা খুলিয়া ফেলা

হইল। হাতীর কাণের বড় বড় শিরা হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছিল। হাওদা বসাইতে যে সময় লাগিল আমার মনে হইল, ইহাতেই বুঝি ২।৩ ঘটী রক্ত পড়িল। ইহার পর হাতীকে 'ক্যাম্পে' নিয়া নদীতে ফেলিয়া লোহা পোড়া দাগ দিয়া, তবে রক্তস্রাব বন্ধ করা হয়। অজস্র রক্তস্রাবে হাতীকে সেদিন একটু অবসন্ন বোধ করায়, এক বোতল No. 1 ব্রাণ্ডি একেবারে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পর দিন হইতে, হাতীর আর বিশেষ কোন দুর্ব্বলতা অনুভব করি নাই। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত খুব কম হইলেও এক কলসী রক্ত পড়িয়াছিল। এত রক্তপাতেও ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ছাড়া, আর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। হাতী ছাড়া অন্য কোন জানোয়ার হইলে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল।

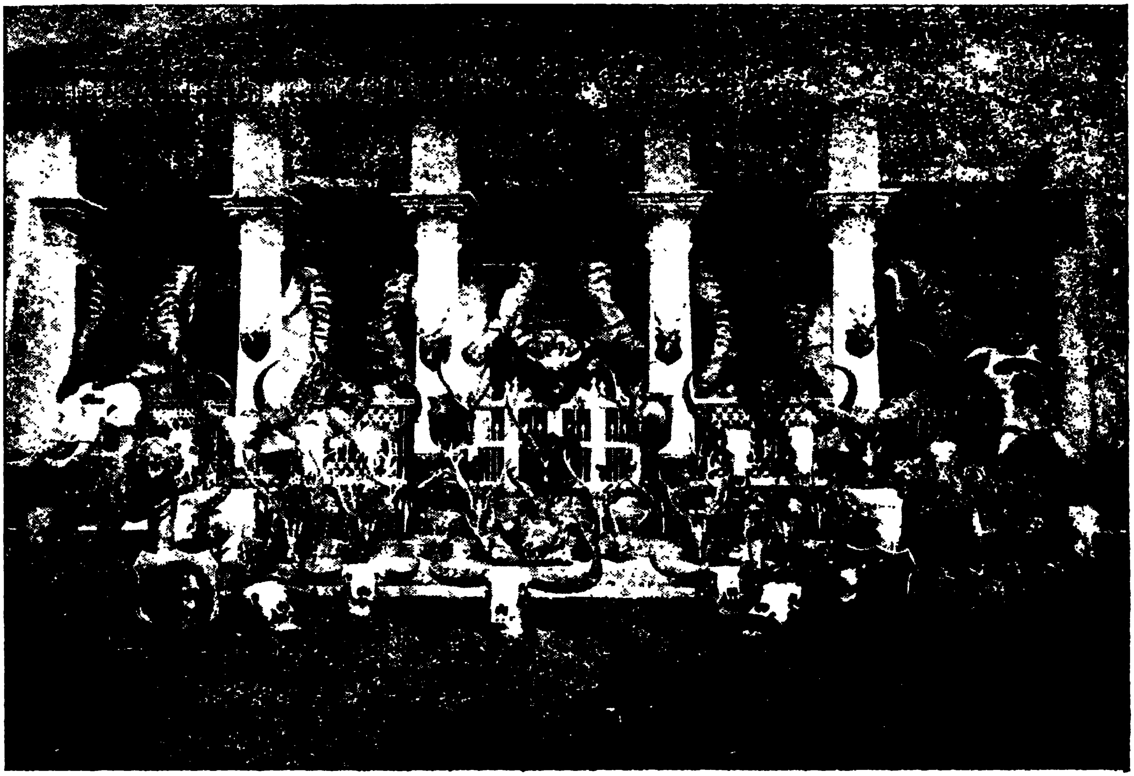
মাহুতকে ৫।৭ দিন ক্যাম্প হাঁসপাতালেই থাকিতে হইয়াছিল। বেচারা আরোগ্য লাভ করিয়া, আড্ডাস্থিত অন্যান্য মুসলমানদিগকে, খুব বড় একটা 'খোদার' সিন্নি' দিয়া ভোজ দিয়াছিল। তবে এই অর্থ মহেশ বাবুর পকেট হইতে বাহির হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না।

বাঘটা এই ভাবে আমাদিগকে 'নাকাল' করিয়া, পরে আর কিন্তু মোটেই কষ্ট দেয় নাই। বোধ হয় সে তখন মনে করিয়াছিল "আর কেন, তোমাদের যত ক্ষমতা দেখা গেল, এখন অস্ত্র ত্যাগ করিলাম।" তবে ভীষ্মদেবের মত সে কাহাকেও 'শিখণ্ডি' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। লেপার্ড হইলেও, ইহা মাপে প্রায় ৮ ফিট্ ছিল। এত বড় লেপার্ড সচরাচর খুব কমই দেখা যায়।

সচরাচর গ্রামে শিকার করিবার সময় এত দর্শক জুটিয়া যায় যে, তাহাদের যন্ত্রণায় শিকার করা মুস্কিল হইয়া পড়ে। ইহাদের দুই হাতে ঠেলিয়াও সরান যায় না। অধিকন্তু কোমরে হাত দিয়া, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া, তামাসা দেখিতে বিশেষ পটু। যদিও হাতী দিয়া একদিক হইতে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, তখনই আবার দৌড়িয়া অন্যদিকে যাইয়া ভিড় করে। অধিকন্তু জঙ্গলে কোন কিছু নড়িয়া উঠিলেই "ঐ বাঘ, ঐ বাঘ" করিয়া চেঁচাইয়া উঠে, আবার কোন কোন সময় হঠাৎ 'বাগডাশা' কি 'শেয়াল' জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পড়িলে, "বাঘ বাঘ" বলিয়া সকলে মিলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে থাকে; তখন কে কাহার ঘাড়ে পড়ে ঠিক থাকে না। ইহার পর তখনই আবার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, হাসিয়া অস্থির করিয়া তোলে, ও পুনরায় আসিয়া ভিড় করিতে থাকে। ইহাদের দ্বারা শিকারের কোন সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় মানুষ এড়াইয়া গুলি করা কঠিন হইয়া উঠে। এই অবস্থায় কোন কোন সময় ২১ জনকে জখমও করে।

একবার আমাদের বাড়ীর অদূরবর্ত্তী 'খাটুরী' গ্রাম হইতে একটা লেপার্ডের খবর পাইয়া, ২টা 'বাচ্চা' হাতী লইয়া শিকার করিতে যাই; তখন আর অন্য হাতী বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না। গ্রামে পৌঁছিলে, একটা অর্দ্ধশুষ্ক পুষ্করিণীর পাড়ে কতকগুলি বাঁশ ঝাড়, কাঁটা বন ও আগাছায় পরিপূর্ণ জঙ্গলে বাঘ আছে বলিয়া শুনিতে পাইলাম।

যাহা হউক, অতি অনায়াসেই উহার খোঁজ পাওয়া গেল। এক গুলিতেই উহার পিছনের এক খানা পা খোঁড়া করা গেল। ইতি মধ্যেই ঐ জঙ্গলের আস পাশ ৩।৪শত লোকে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। কাঁটা জঙ্গলের মধ্যে দুইটি মাত্র হাতী দিয়া আমি কিছুতেই বাঘটিকে কাবু করিতে পারিতেছিলাম না। অথচ এই সব লোকের চীৎকারে বাঘও একস্থানে স্থির থাকিত না। তখন যাহা হয় হউক মনে করিয়া যাই একটু অগ্রসর হইব, খানিক দূরে বনের একেবারে নিকটেই এক ধোপা প্রকাণ্ড একটি কাপড়ের বোচকা পিঠে লইয়া উঁকি ঝুঁকি দিয়া "ঐ বাঘ ঐ বাঘ" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠামাত্রই দেখিলাম যে বাঘটি বিদ্যুতের মত উহার বোচকার উপর লাফাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ধাক্কায় ধোপা,



আমাদের ট্রোফির অপরাংশ

বোচকা ও বাঘ সমেত উপুড় হইয়া পপাত ধরণীতলে। বাঘের পেছনের পা, ধোপার উরুদেশে ও সম্মুখের পা, কাঁধের উপর ছিল। উহার এইরূপ বিপদের সময়ও অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়াছিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে "ধোপারে বাঘে খাইল, ধোপারে বাঘে খাইল," বলিয়া চীৎকার শোনা যাইতেছিল। কিন্তু সৌভাগ্য যে ইহার পরই বাঘটা ধোপাকে ছাড়িয়া পুনঃ জঙ্গলে যাইবার সময় আমার দ্বিতীয় গুলিতে ভবলীলা সাঙ্গ করিল।

আমার মাহুত কিন্তু মহা খুসী হইয়া বলিতেছিল, "যেমন শালা অযাত্রা ধোপাকে বারবার নিষেধ করিয়াছিলাম, তেমনই উহার খুব আকেল হইয়াছে।" সত্য কথা বলিতে কি ধোপার সহিত মাহুতের এই নূতন সম্পর্ক স্থাপনে আমার বিশেষ ক্রোধের কারণ হয় নাই। ইহাকে মুক্তাগাছা আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে আমার ১০।১২ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বাঘ যে অত বড় হিংস্র জন্তু ইহারাও শিকারের সময় প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে অত্যন্ত হায়রাণ হইয়া, কোন কোন সময় বা ভীত হইয়া এরূপ অস্বাভাবিক চরিত্রের পরিচয় দেয়, যাহাতে নিজেদেরই অবাক হইয়া যাইতে হয়। নিম্নের গল্প তিনটি হইতে তাহা বিশেষরূপে বুঝা যাইবে।

১। বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে আমাদের মুক্তাগাছাস্থ সকলের বাড়ীই চুরমার হইয়া যায়। তখন পর্য্যন্তও কাহারও বাড়ী সংস্কার হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে মুক্তাগাছা টাউনের উপর আমাদের



হাতী চারা আনিতেছে

বাড়ীর অতি নিকটে সামান্ত একটু জঙ্গলে একটি লেপার্ড আসিয়াছিল, প্রাতে রাজা জগৎকিশোরের এক কর্ম্মচারী ৺গিরিশচন্দ্র রায় আসিয়া সংবাদ দেন যে, তিনি তাঁহার বাসা হইতে আসিবার সময় উহাকে ঝোপের মধ্যে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়াছেন। আমি রাজাকে খবর দিলাম। তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যাইতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহার "চমকতারা" নাম্নী প্রসিদ্ধ শিকারী হস্তিনীটা আমার জন্ত পাঠাইয়া দেন। ঐ একটি মাত্র হাতী নিয়াই আমি শিকার করিতে যাই।

সেখানে গিয়া দেখি বাঘ থাকিবার মত কোন জঙ্গল নাই, কেবল কতকগুলি আটসেওড়া, কচু ও ভাটি গাছে স্থানটি পরিপূর্ণ। দূর হইতেই বাঘ দেখিতে পাইয়া গুলি করি, ফলে উহার পিছনের একটি দাবনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বাঘও কুকুরের মত লেংচাইতে লেংচাইতে মিউনিসিপাল রোড দিয়া দৌড়িয়া যাইতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, মুক্তাগাছা টাউনের উপর বাঘ আসিয়াছে আমি শিকার করিতে যাইব ইহা পূর্ব্বে হইতেই প্রচার হওয়ায় ৩।৪ শত লোক ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা রাস্তা দিয়া বাঘের পিছনে খানিক দূর গিয়াই দেখিতে পাইলাম, বাঘটি এখানকার অন্ততম ভূম্যধিকারী আমার দাদা মহাশয় ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের অন্দর বাড়ীর ভগ্ন প্রাচীরের মধ্য দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। পিছনে পিছনে আমরাও হৈ চৈ করিয়া যাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলাম। ভূমিকম্পে স্থানে স্থানে প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়ায় প্রবেশ করিতে আমাদের কোনই অসুবিধা হয় নাই। আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ২।৪ শত দর্শকেও বাড়ীর ভিতর পূর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়ায়, বাড়ীর মেয়েরা—যে যাঁহার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার শিষ্ট শান্ত দাদা মহাশয় বাহির বাড়ীতে এই সংবাদ পৌঁছিবা মাত্রই এমন ভাবে তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন যে, তন্মধ্যে বাঘ প্রবেশ করা দূরে থাকুক বায়ু প্রবেশ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। "চাচা আপন বাঁচা" নীতি অবলম্বন করিয়া বোধ হয় তিনি বাড়ীর আর কাহারও খবর নেওয়ার অবসর পান নাই। এই তো গেল বাড়ীর কর্ত্তার অবস্থা। এখন বাঘের অবস্থা কি হইল তাহা দেখা যাক।

আমরা আঙ্গিনায় ঢুকিয়া আর বাঘ দেখিতে পাইলাম না। তবে বাঘ গেল কোথায়? তখনই স্থির করিয়া লইলাম, আঙ্গিনার দক্ষিণ দিকের ভাঙ্গা দোতালা দালানেই বাঘ ঢুকিয়া থাকিবে। ঐ দালানের সব কোঠারই দরজা বন্ধ ছিল, কেবল একটি লোহার গরাদ দেওয়া জানলোর ৪।৫টি শিক ছিল না; ঐ স্থান দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকিবে মনে করিয়া, কিরূপে উহাকে বাহির করা যায় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোন্ বীর পুরুষ দরজা খুলিয়া আহত বাঘের মুখে যাইবে?

অথচ বাঘ সত্য সত্যই তথায় আছে কি না, তাহা খোঁজ করিতেও যাওয়া দরকার। যাহা হউক, অনেক দেলাশা ভরসা দিয়া, আমারই এক ভৃত্য দীনুকে এক লাঠি হস্তে, দরজা খুলিয়া ঢুকাইয়া দিলাম। দরজা খুলিবামাত্রই বহু দিনের আবদ্ধ ঘর হইতে, দুর্গন্ধে ও চামচিকা উড়িবার ফট্ ফট্ শব্দে, অস্থির করিয়া তুলিল। একটু পরেই, অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া আসিলে, ভিতর হইতে দীনু বলিল যে, কিছুই দেখা যায় না; কেবল স্তূপাকারে কতকগুলি 'চাটাই' ও পাট কাঠি পড়িয়া আছে, এই মাত্র। ইহা বলিয়াই তাহা 'চাটাই ২।৩ খানা উল্টাইয়া, লাঠি দিয়া আন্দাজেই খোঁচা দিতে লাগিল। একটু পরেই চেঁচাইয়া বলিল যে, কিসের উপর খোঁচা লাগে বুঝা যায় না, কিন্তু যেন বেশ নরম তুল্ তুল্ করে। বাহির হইতে আমরা "বাঘের গায়ে খোঁচা লাগিলে কি সে চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে? ভাল করিয়া দেখ্" বলায়, দীনু 'চাটাই' গুলির ভিতরে হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, কি যেন একটা কিছু হাতে নিয়া বাহির হইয়া আসিতে আসিতে বলিল "কি যেন একটা শুইয়া আছে, উহার লোম ছিঁড়িয়া আনিয়াছি।" আমি তো লোম দেখিয়াই অবাক্! বাস্তবিকই কতকগুলি পীত ও কালো রংএর লোম। তবে কি বাঘ ওখানে ঢুকিয়া মরিয়া গিয়াছে? নচেৎ জখমী জ্যান্ত বাঘের লোম ছিঁড়িয়া আনিয়া দীনু সশরীরে ফিরিয়া আসিবে, ইহাই বা বা কেমন কথা? আবার মনে করিলাম ঐ রংয়ের কোন কুকুর বোধ হয় ওখানে শুইয়া আছে। কিন্তু তাহাই কি একটা কথা?



হাতী স্নান করিতেছে।

যাহা হউক, অতঃপর দরজার সম্মুখে, আমি বন্দুক নিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। ২।৩ টা লম্বা বাঁশ, তাহা জানালার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া, ২।৩ জনে ক্রমাগত খোঁচাইতে লাগিল। একটু পরেই হড় মড় করিয়া বাঘটা আমার হাতীর সম্মুখে দরজা দিয়া লাফাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মাত্র অবসর না দিয়া উহাকে আবার গুলি করিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এবারও সে অল্প কালের জন্ম অব্যাহতি পাইল বটে, কিন্তু উহার নীচের চোয়াল একেবারে উড়িয়া গেল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই, ডাক দিয়া বাম দিকে একটু গিয়াই, দোতালার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু সিড়ির মোড়েই আমার ২।৩ জন পদাতিক, লাঠি হস্তে শূন্য দোতালা পাহারা দিতেছিল। অত্যধিক সাহসী কি না, নতুবা এত লোক প্রাঙ্গণে থাকিতে, উহারা পূর্ব্ব হইতেই ওখানে থাকিবে কেন? বাঘটা কিন্তু মোড় পর্য্যন্ত উঠিয়া, দোতালাও নিরাপদ নয় ভাবিয়া, উহাদের একজনকে আঁচড়াইয়া, ওখান হইতে এক লাফে আমার অনুজ শ্রীমান যতীন্দ্রনারায়ণের বাড়ীর ভিতর গিয়া

পড়িল। তখন সেখান হইতেও চেঁচামেচি শুনা যাইতে লাগিল। আমরা তো আর হাতী সহ সিঁড়ির উপর উঠিতে পারি না, কি ভাঙ্গা দেয়াল ডিঙ্গাইতেও পারি না। কাযেই ঘুরিয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে বাঘটা, সেখান হইতে খানিক দূরে গিয়া কতকগুলি কলাগাছের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

যাহা হউক, ইহার পর অনায়াসেই উহার ভব যন্ত্রণা দূর করিয়াছিলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার পর, দাদা মহাশয়ের ওখানে বেশ কিঞ্চিৎ জলযোগ করা গেল এবং ৩৪ দিন পর, দিদি ঠাকুরাণীর নিকট হইতেও আমার এই বাহাদুরীর পুরস্কার স্বরূপ, একটী ভোজ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে দাদা মহাশয়কে এক ঘরে করিয়াছিলাম; যেহেতু তিনি সময়কালে দিদি ঠাকুরাণীকে, বাঘের হাতে দিয়া, নিজে দরজা বন্ধ করিয়া, আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

২। অনেকদিন আগেকার কথা, তখনও ময়মনসিংহ—জামালপুর 'রেল' হয় নাই। আমরা সেবার জামালপুর হইতে সুরু করিয়া, ক্রমাগত ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে আসাম গোয়ালপাড়া অবধি শিকার করি। বাড়ী হইতে বরাবর গাড়ীতেই জামালপুর যাইয়া, পরে সেখান হইতে ক্রমাগত হাতীতে যাই।

ইস্‌লামপুর নামক স্থানে ক্যাম্প করিয়া, আমরা কয়েকদিন শিকার করি। আমাদের জিলায় এই ইস্‌লামপুর, কাঁসার বাসনের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

একদিন কোন জঙ্গলে, হঠাৎ দুইটী বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল। জঙ্গলটী খুব বড় না হইলেও, ঘন-সন্নিবিষ্ট নলবন ছিল। ২।৩ বার বীট করিবার পরই, মাহুতেরা ২টী বাঘ দেখিতে পাইল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমাদের অদৃষ্টে দর্শন লাভ ঘটে নাই। মাহুতদের 'ঐ বাঘ' 'ঐ বাঘ' চীৎকারে একটী বাঘ হঠাৎ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া, মাঠের মধ্যে দিয়া ভোঁ দৌড় দিল।

এখানে একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এই জঙ্গলটীর চতুর্দ্দিকেই প্রকাণ্ড মাঠ ছিল ও আমরা শিকারে গিয়াছি বলিয়া, বহু দর্শক তখন তথায় তামাসা দেখিতে জুটিতেছিল; যেমন সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে মাঠে বহু দর্শক ছিল বলিয়া, আমরা আর তখন তাহাকে গুলি করিতে পারিলাম না; দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলাম। বাঘের দৌড় দেখিয়া, দর্শকগুলিও সকলে এক বেগে 'ঐ বাঘ' 'ঐ বাঘ' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠায়, বাঘ আরও জোরে দৌড়াইতে লাগিল। ঐ মাঠের বহুদূরে এক খাসী বাঁধা ছিল, বাঘটী দৌড়াইতে দৌড়াইতে গিয়া খাসীর ঘাড় মট্‌কাইয়া আর এক জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। এত বড় মাঠ থাকিতে যে কেন খাসীর উপর বিক্রম প্রকাশ করিল বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমরা স্থির করিলাম যখন আর একটা এই জঙ্গলে আছে, তখন উহাকে শেষ করিয়া ইহার খোঁজ করা যাইবে। আমরা লাইন করিয়া ক্রমাগত জঙ্গল ভাঙ্গিতে লাগিলাম, কিন্তু হায়! সকলই বিফল হইল। বন সমভূমি করিয়া ফেলিলাম, তথাপি বাঘ বাহির হইল না। শেষে এরূপ অবস্থা হইল যে বনের চিহ্ন মাত্র রহিল না। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, বাঘ কোথায় গেল? কেহ বলে এটাকেও মাঠ দিয়া যাইতে দেখিয়াছি, কেহ বলে জঙ্গলের মধ্যে গর্ত্ত আছে তাহাতে ঢুকিয়াছে। এই ভাবে যাহার যাহা মনে আসিতেছিল সে তাহাই বলিল।

জঙ্গলের মধ্যে গর্ত্ত থাকাই সম্ভব মনে করিয়া, নিকটবর্ত্তী দর্শকদের জঙ্গল উল্টাইয়া দেখিতে বলা হইল। তাহারা উৎসাহের সহিত বন উল্টাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ ওলট্‌ পালট্‌ করিতে করিতে হঠাৎ একজন 'বাঘ' 'বাঘ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর সেখানে গিয়া দেখা গেল, বেচারা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

গুলি করা হইল না, অথচ বাঘ মরিয়াছে—ইহাই তখন সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল। সমস্যা তখন পূরণ করে কে?

বাঘটাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখা গেল যে, উহার

মাথার খুলি গুঁড়া হইয়া গিয়াছে, নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে

তাহার পর শ্রীযুক্ত রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য বাহাদুরের 'চন্দনতারা' নাম্নী এক হস্তিনীর পায়ে রক্তের দাগ দেখিয়া সমস্যা পূরণ হইয়া গেল। 'চন্দনতারা'র পদতলে পিষ্ট হইয়া বেচারা ইহ জীবনের সকল সাধ মিটাইয়াছে। সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের হস্তে নিহত হইলে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু জন্মান্তরীন কর্ম্মফল তাহাকে অন্য দিকে টানিয়া নিয়া গেল।

তাহার পর আমরা ইহার সঙ্গিটীকেও ইহার পথ-বর্ত্তী করিয়া, তাহার বৈধব্য শোক দূর করিয়াছিলাম।

৩। আর একবার আমাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বেগুন-বাড়ী নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের চরে কয়দিন হইতে বাঘের খুব দৌরাত্ম্য শোনা যাইতেছিল। আমাকে ২।৩ দিন সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও হাতীর অভাবে শিকারে যাইতে পারিতেছিলাম না। কয়দিন পরে তিনটীমাত্র হাতী সংগ্রহ করিয়া শিকারে বাহির হইলাম। এই তিন হাতীর মধ্যে কোনটাই হাওদার মজবুদ ছিল না। যাহা হউক, একটার উপর হাওদা দিয়া যাইয়া দেখা গেল, ব্রহ্মপুত্রের চরে খড় ও ঝাউ জঙ্গলে বেশ পাকা-পোক্ত হইয়া বসিয়া অনেক গো-বংশ ধ্বংস করিয়াছে।

সেখানে মাত্র দুই টুক্‌রা জঙ্গল ছিল। একটির ২৫।৩০ গজ দূরেই আর একটি ছিল। আমাদের সঙ্গে মোটেই হাতী তিনটী, তাহার দুই হাতী দিয়া জঙ্গল বীট করিয়া এক হাতী stopএ রাখিলে, জঙ্গল ভাঙ্গা চলে না। যাহা হউক, কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল। আমরা বীট করিতে আরম্ভ করিলে দূর হইতেই এক জঙ্গল হইতে অপর জঙ্গলে চলিয়া যায়; কাজেই, মারার কোন সুবিধা হইতেছিল না। যদি কখনও আমি দুই জঙ্গলের মধ্যে stopএ (নাকায়) দাঁড়াইয়া অন্য হাতী দুইটীকে জঙ্গল বীট করাই, তখন আর বাঘ বাহিরই হয় না। আমরা আবার সেই জঙ্গলে গিয়া তিন হাতী দিয়া বীট করা আরম্ভ করিলেই অন্য জঙ্গলে চলিয়া যায়। এইরূপ ক্রমাগত ঘোরাঘুরিতে অত্যন্ত বিরক্ত ও হায়রাণ হইয়া পড়িলাম, কিন্তু বাঘ মারিতে পারিলাম না। আর একটু চেষ্টার পরই দৈবাৎ একটীকে একবার সুবিধামত বাহির হইতে দেখিয়া, এক স্ন্যাপ-শটেই নিঃশেষ করিলাম। কিন্তু আরও ২।৪ বার চেষ্টা করিয়া অপরটীকে কিছুতেই মারিতে পারিলাম না।

পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বনের চতুর্দ্দিকে শুক্‌না খড়ে আগুন ধরাইয়া দিলাম। দশ বারো মিনিটের মধ্যেই সমস্ত খড় পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বাঘ বাহির হইতে দেখা গেল না। আমার বিশ্বাস ছিল, আগুন দিলেই কোন একদিক দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। এই সময় কোন একজন লোক বলিয়া উঠিল 'ঐ যে বাঘ পড়িয়া আছে।'

সেখানে যাইয়া আমরা কালো ছাল্ নাই কুকুরের মত কি একটা দেখিলাম। খুব নিকট গিয়া দেখিলাম, ব্যাঘ্রপ্রবর পুড়িয়া ঝল্‌সিয়া গিয়াছে; শরীরে লোমের চিহ্নমাত্র নাই, সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে, উপুড় হইয়া পড়িয়া আমার দিকে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছে ও নিঃশব্দে দাঁত বাহির করিতেছে। আমি তো দেখিয়াই অবাক্! উহাকে তখন মারিতেও ঘৃণা বোধ হইল। পরে চরের উপস্থিত দর্শক মুসলমান-গণের লগুড়ঘাতে উহার দাহ যন্ত্রণার অবসান হইল।

এই সকল ঘটনা হইতে আমার বেশ ধারণা হইয়াছে যে, নিকটবর্ত্তী স্থানে ভাল জঙ্গল না থাকিলে অধিকাংশ সময়ই ইহারা হাতীর পদতলে পিষ্ট হইয়া বা আগুনে পুড়িয়া মরিতে রাজী, তবু ফাঁকায় বাহির হইতে চায় না। কিন্তু কদাচিৎ ইহার বিপর্য্যয় যে না দেখা যায় তাহা নহে। কিন্তু তাহার সংখ্যা কম।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

অজন্তা

গোধূলির সময় আমরা এলোরা পরিত্যাগ করিলাম। ঊর্দ্ধে নিকটে ও দূরে, এব দিক্‌চক্রবালে ছিন্ন ভিন্ন মেঘপুঞ্জ লক্ষ্যহীন তরীর মত স্বচ্ছন্দ-গতিতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহার উপরে অস্তাচলশায়ী মুমূর্ষ সূর্য্যের কিরণপাতে রঙের যে অপরূপ খেলা চলিতেছিল তাহা অবর্ণনীয়। দূরে গিরিকূটে মূর্চ্ছিত তপনের শেষ রশ্মিটুকু দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। মেঘগুলিও পাণ্ডুর হইয়া আসিল।

নবমীর শশী আকাশে উদিত হইলেন; সেই মধুর আলোকে শঙ্কর কিরীটস্থিত চন্দ্রের ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি



কারলি চৈত্যের অভ্যন্তর দৃশ্য



এলোরার সৌন্দর্য্য মনকে কেমন একটা বেদনামিশ্র মোহময় আনন্দে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শিল্পীর শিল্প রহিয়াছে, কিন্তু এলোরার সেই গরিমা কোথায়? মানবের লুপ্ত গরিমা আবার ফিরিয়া আসিবে কিনা কে জানে? স্বভাব কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য হারায় নাই। চলিতে চলিতে নূতন দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আবার দৌলতাবাদের দুর্গাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। শারদ জ্যোৎস্নায় মণ্ডিত গিরিদুর্গকে দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রসর হইলাম। ষ্টেশনে ফিরিতে কিছু রাত্রি হইল।

ভবঘুরে প্রাণিবর্গের প্রাসাদ 'ওয়েটিং রুম'। আমরা সেই প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। খাইবার হাঙ্গামা ছিল না। কাজেই নিশ্চিন্তচিত্তে ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে আলাপে ঘণ্টা খানেক কাটাইয়া দেওয়া গেল। তিনি মান্দ্রাজী খৃষ্টান, বেশ সদালাপী। তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি আবশ্যক জিনিষের তামিল ভাষার প্রতিশব্দ জানিয়া লইলাম, দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে তাহা কাজে লাগিয়াছিল।

প্রাতের গাড়ীতে আমরা মানমাড়ে ফিরিয়া আসিলাম।



অজন্তা। দশাবতারে শিবের তাণ্ডব নৃত্য

● Pachora Jamner Branch line এ পাহুর নামক ষ্টেশনে সন্ধ্যার সময় নামিলাম। যদি বলেন এ কর্ম্মভোগ কেন? যাইবার পথে পাহুরে নামিয়া অজন্তা দেখিয়া গেলেই তো হইত? তাহার উত্তর—গ্রহের ফের!

প্রায় সমস্তদিন এক প্রকার অভুক্ত অবস্থায় কাটাইয়াছি। আজ মহারাষ্ট্রীয়েরা দশমীর উৎসব করিতেছে—সব ছুটী, তাতে দোকান বন্ধ—অন্ন-ভোজী বাঙ্গালীর চক্ষুস্থির! চা ও পুরীতে যতটা সরস রাখিতে পারে, আমরা ততটাই সরস ছিলাম।

দেহ ও মনের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে তাহা প্রতিপন্ন করিতে ছাত্রপাঠ্য পুস্তক-প্রণেতৃগণ অল্প আয়াস স্বীকার করেন নাই। আজ প্রায় অনেকটা তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। অঙ্গারীভূত অন্নের ধূম যে বিচারশক্তিকে কলুষিত করিয়া বীভৎস কল্পনা জাগাইয়া তোলে তাহা পূর্ব্বে অবিদিত ছিল। যখন ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন যে অজন্তা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে, তবে লেনার (গুহা) এক ক্রোশের ভিতর, রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে দিয়া গিয়াছে, তখন এক বন্ধুবরের কল্পনা উদ্দাম হইয়া পড়িল। কল্পনা নয়নে দেখিলাম—প্রথম দৃশ্য—দুর্ভেদ্য বনরাজি অভ্রস্পর্শী গাছগুলি বড় বড় হাত বাড়াইয়া জড়াজড়ি করিয়া কুস্তি করিতেছে। দেখিয়া, আমাদের কেন, সূর্য্যেরও সেখানে ঢুকিতে ভয় হইতেছে। সব চেয়ে দুর্ভাগ্য, সঙ্গে টাকা কড়ি রহিয়াছে—এবঞ্চ আমরা সব ছিন্নমুণ্ড হইয়া পড়িয়া আছি! পট পরিবর্ত্তনে আর এক দৃশ্য—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষণ্ডা গণ্ডা গাল পাট্টাওয়ালা গুণ্ডা গাড়ী আটক করিয়া গলায় পা দিয়াছে আর আমাদের সাত হাত জিভ্ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বলিলাম—"আপনি জ্যোতিষজ্ঞ, যদি জিভ্ বাহির করিয়া মরার কথাই কপালে লেখা থাকে, তবে কে তাহা রোধ করিবে? আপনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেই অন্ধকার বনপ্রদেশের জন্য দেশালাই মোমবাতি ও মাখমের কৌটা কাটা ছুরি লণ্ঠন; আমার কপালে যাহা আছে তাহা হইবেই!"

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া একটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উপরস্থিত সেতু অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলায় আসিলাম। প্রকাণ্ড হাতা, জনমানবহীন, বসতিহীন, নির্জ্জন প্রদেশ। চৌকিদার গ্রামে গিয়াছে উৎসব করিতে—গাড়োয়ান গেল তাহার সন্ধানে একেবারে অগস্ত্য যাত্রায়। বাঙ্গলা বন্ধ। এই অস্বচ্ছন্দতা আরও বৃদ্ধি পাইল বন্ধুবরের রোমাঞ্চ



বুদ্ধের প্রলোভন (২৬ নং চৈত্য)

করগবেষণায়। এইরূপ স্থলই হত্যাকাণ্ডের পক্ষে প্রকৃষ্ট-রূপে উপযোগী, সাবধানে না থাকিলে পিতৃদেবের পবিত্র নামোচ্চারণ করিবারও অব-কাশ মিলিবে না। পরে আবিষ্কৃত হইল যে সব ঘর গুলিই খোলা, কেবল ভেজান ছিল। অনেক বৎসর অধ্যাপনার প্রকৃত পরিচায়ক!

আজ বিজয়া। এতক্ষণ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মধুর সম্মিলন হইতেছে। মায়ের পূজা শেষ হইয়াছে, প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইয়াছে, ছেলেরা রাঙতা মুকুট সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। কোথাও হয়তো বেলপাতায় আলতা দিয়া দুর্গা নাম লেখা হইতেছে; হয়তো বা যাত্রা করিয়া গুরুজন প্রণাম করিতে সকলে বাহির হইয়াছেন। আজ আর দ্বন্দ্ব, কোলাহল নাই; প্রেম প্রীতি স্নেহের উৎস খুলিয়া গিয়াছে; প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, কৌতুক আজ সকল দৈন্য সকল দুঃখকে পরাভব করিয়া বিজয়ী হইয়াছে। এই দূর দেশে আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলাম।

মধুপান করিয়া যখন চৌকিদার ফিরিল তখন দশটা। সেই রাত্রিতেই, পরদিন ভোর চারিটায় সময় বাহির হইবার জন্য, টোঙা যোগাড় করিয়া আনিল। দুধ ও সামান্য সব্জীও লইয়া আসিল। আমাদের মস্তকে পনস কল ভঙ্গ করিয়া ও সামান্য প্যাঁচ খেলিয়া গাড়ীভাড়া কিছু অতিরিক্ত আদায় করিয়া লইলেও আমরা তাহার নিকট বাস্তবিক কৃতজ্ঞ; এই নির্ব্বান্ধব দেশে যে এত শীঘ্র যানের আয়োজন হইবে তাহা আমাদের স্বপ্নাতীত ছিল।

ভোর সাড়ে তিনটার সময়ে উঠিয়া সকলে তৈয়ার হইয়া লইলাম। বারান্দায় টোঙাওয়ালা ও চৌকিদার ঘুমাইতেছিল, প্রাঙ্গণে গাড়ী ঘোড়া ছিল। কাজেই আর কোন দেরী হইল না। তিনজনে এক গাড়ীতে ঠাসাঠাসি হইয়া বসিয়া চড়াই উৎরাই করিতে করিতে যখন প্রায় ৭টার সময় গুহা হইতে দেড় ক্রোশের ব্যবধানে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন "ত্রিমূর্ত্তি"র শুধু "কেবলাত্মা" হইতে বাকি ছিল! দক্ষিণদিকে ছোট পথ দিয়া ফারদাপুরের ডাক বাঙ্গলায় যাওয়া যায়, সাধারণ ভদ্র গুহাযাত্রী এইখান হইতে গুহাদর্শন করিতে পারেন। ইহার সন্নিকটেই নিজাম দরবারের নির্ম্মিত সুন্দর প্রাসাদোপম আশ্রম আছে—তাহা বোধহয় অ-সাধারণ ব্যক্তিগণের নিমিত্ত।

কিয়দ্দূরে বামদিকে রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়া অজন্তা গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। আমরা দক্ষিণ দিকে 'লেনার' (গুহার) চলিলাম। এক এক জায়গা এত উঁচু নীচু যে গাড়ী হইতে নামিতে হইল। পাহাড়ের কোলে কোলে চলিতে হইল। এইখান হইতেই ষ্টেশন মাষ্টার বর্ণিত

অরণ্য প্রদেশ আরম্ভ। কোথায় সে দিনকর-রশ্মি-লোপী পথিক-হৃদয়-ত্রাসী মহীরুহ শ্রেণী? তাহার পরিবর্ত্তে দেখিলাম মনোরম হৃদয়হারী প্রাকৃতিক দৃশ্য! দুই পার্শ্বে ক্ষেত্র তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে, ক্ষুদ্র জাতীয় পীত শুভ্র লোহিত নানা বর্ণের কার্পাস কুসুম ও অন্যবিধ শস্যের কিৎ পত্র মিলিয়া এক অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে; পাতায় পাতায় মুক্তা বিন্দুসম শিশিরবিন্দু পাহাড়ের অন্তরালে চক্ চক্ করিতেছে; কোথাও রবিকর-সম্পাতে ঝল্মল্ করিতেছে;—মনে হইতেছে আকাশের ইন্দ্রধনুকে চূর্ণ চূর্ণ করিয়া তাহারই রেণুরাশি যেন সকল দিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। এই পথে আর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আমরা দেখিলাম, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি দুরারোহ একটা পর্ব্বত,—তাহার নিম্ন দিয়া উপলখণ্ড-সঙ্কুল ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বিনী ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। ইহা অতিক্রম করিয়া বৃক্ষশ্রেণীর তলায় তলায় আরও কিছুদূর গিয়া গুহার নিকট আসিলাম। এমন সুন্দর, নীরব, নির্জ্জন, স্বভাব-শোভায় সমৃদ্ধ স্থান খুব কমই দেখিয়াছি। এ যেন কোনও ঋষির তপোভূমি। উচ্চ পর্ব্বত একেবারে খাড়া তিনশত ফুট উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে; পরস্পর সম্মুখীন দুই পর্ব্বত খণ্ড অর্দ্ধবৃত্তাকারে পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলকে যেন অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রুদ্ধপথে কেবল ভক্ত সাধকেরই যেন প্রবেশাধিকার। স্রোতস্বিনী পর্ব্বতের উপর দিয়া আসিয়া ধারা দিয়া সেইখান হইতে পড়িয়া প্রবাহিত হইতেছে। বনজাত সহস্র পাদপ ও লতাবিতানে ঘেরা এই প্রদেশটী ধ্যান ও উপাসনার জন্যই যেন রচিত হইয়াছে। একটা কোমল বনজ গন্ধে বাতাস ভরিয়া রহিয়াছে। কত ভক্তের ভক্তি-নিবেদন, কত সাধকের প্রাণের আরাধন, কত পুণ্যময়ের প্রার্থনার লীলা-ক্ষেত্র এই পুণ্যতীর্থ ভূমি। কত শত শিল্পীর ভক্তি ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ উপচার মূর্ত্ত হইয়া এই গিরিগুহা গুলির অভ্যন্তর ভাগ চিত্রিত করিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? হায়, ভারতের যে শিল্পকলা তুঙ্গস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা বুঝি ভক্ত শিল্পীর একান্ত আত্ম-নিবেদন, তাহাতে বুঝি অহঙ্কার নাম গন্ধও ছিল না; তাই বুঝি স্বপ্রতাপ-প্রচার-কুণ্ঠ শিল্পী লোকচক্ষুর অন্তরালে এই পূত প্রদেশে আত্মগোপন করিয়াছিলেন!

কোন সুদূর অতীতে, খৃষ্টের আবির্ভাবের বহু—বহু পূর্ব্বে, মনুষ্যাবাস সম্পর্কবিচ্ছিন্ন গিরিকন্দরের এই নিভৃত প্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থাপিত নৈসর্গিক গিরিগহ্বর হয়তো কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু সাধন ক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। হরিদ্বারে গঙ্গা যেমন পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রান্তর বিদীর্ণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এখানেও অনেকটা সেইরূপ দেখা যায়। কন্দরের অন্তিম ভাগে সু-উচ্চ গিরিপ্রপাত; স্রোতস্বিনী উচ্চ বনপ্রদেশ হইতে বেগে আসিয়া প্রপাতে আহত হইয়া সপ্তবেণীর মত সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া পতিত হইতেছে। এ যেন দ্বিতীয় গঙ্গা, হিমালয়ে শঙ্করের জটা উন্মুক্ত করিয়া উন্মাদিনী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমে এই ঋষিকল্প ভিক্ষুগণের মহিমা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। অজন্তা, শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। কত ভক্তের দানে এই কঠিন শৈলের কোলে কোলে কোলে চৈত্য ও বিহার গড়িয়া উঠিল।১

চৈত্য ও বিহার সম্বন্ধে দুই একটা কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মসঙ্ঘ ছিল, এবং সেই সঙ্ঘ এতদূর সম্মানিত হইত যে, তাহা বুদ্ধ ও ধর্ম্ম, অপর দুই রত্নের (অথবা শরণ্যের) সহিত সমান আসন অধিকার করিয়াছিল। ইঁহাদের ধর্ম্মাচরণ ব্রাহ্মণ ও জৈনদিগের মত ব্যক্তিগত ছিল না; পরন্তু সাঙ্ঘিক (Congregational) ছিল; সকলে একসঙ্গে মিলিয়া উপাসনা করিতেন। এই ধর্ম্মসভারই (Assembly Hall অথবা Chapter House) নাম হইতেছে—চৈত্য গৃহ। আপনারা জানেন যে অনেক গৃহস্থ ত্রিশরণগত হইয়া বুদ্ধদেবের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন—তাঁহাদিগকে 'উপাসক' বলা হইত। যাঁহারা 'আগার' পরিত্যাগ করিয়া 'অনাগারী' হইতেন তাঁহাদিগকে ভিক্ষু বলা হইত।—ইঁহারা একেবারে ধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতেন। অতএব একই

১। Havell's Ancient and Medaeval Architecture of India—পৃঃ ১৮১—১৮২ দ্রষ্টব্য।

উপাসনা গৃহে মিলিত হইলেও উপাসক ও ভিক্ষুদের ভিতর স্বাতন্ত্র্য সূচিত করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, চৈত্যগৃহের নির্ম্মাণ পদ্ধতির ইতরবিশেষ ঘটিয়াছিল। লম্বা একটি হলঘর কল্পনা করুন। ইহার একপ্রান্ত অর্দ্ধবৃত্তাকার। ভিতরে স্তম্ভের উপর ছাদ। স্তম্ভ ও বহির্ভাগ ভিত্তিগাত্রের মধ্যে একটি পথ অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়া আসিয়াছে। ইহাকেই প্রদক্ষিণ পথ কহে—এই পথে উপাসক বামাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করে ও শ্রবণান্তর বাহির হইয়া যায়। দুই স্তম্ভশ্রেণীর অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। তাহাদের সম্মুখে 'চৈত্য' (Shrino) থাকে। অতএব এই চৈত্যগুলি হইতেছে সঙ্ঘের উপাসনা মন্দির। বিহার গুলিতে সঙ্ঘভুক্ত ভক্তগণ বাস করিতেন।

এলোরা, অজন্তা, আজাই, নাসিক এবং অন্যান্য স্থলেও পাথর খুদিয়া গুহামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানি। এই সব মন্দির পর্ব্বতগাত্রে খনিত করিবার কারণ কি? উহার উত্তরে হ্যাভেল বলেন যে—পাশ্চাত্যদের নিকট এই মন্দিরগুলি অদ্ভুত (grotesque) ঠেকিলেও, তাহাতে ইহা সূচিত করিত—ভোগীর বিলাসস্পৃহা, শিল্পীর তক্ষণ-কুশলতা, ব্যক্তি অথবা সঙ্ঘের বিশিষ্ট ভক্তিপ্রবণতা। গৃহনির্ম্মাণকৌশল সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পরও যখন গুহামন্দির নির্ম্মাণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তখন তাহার কারণ দেশের আবহাওয়া ও ভূতত্ত্বের সহিত সম্পর্কিত। এ দেশের রৌদ্র এত তীব্র যে স্বতঃই মানুষের প্রাণ চায়—সূর্য্যের তীব্রতা ও উত্তাপ কমাইতে। যদি আলো ও বাতাস প্রবেশের কোন অন্তরায় না থাকে, তবে গুহা-মন্দিরগুলি একাধারে ছাত্র ও সন্ন্যাসীদের পক্ষে আদর্শ আশ্রম। বর্ষার অনবরত ধারা নিবারণ অথবা গ্রীষ্মের দেহদাহী উত্তাপ নিরোধ করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ধর্ম্মের কঠোর সাধনার দিকটাই যে এই আশ্চর্য্য গিরিগুহা ও বিহার গুলিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে; —পরন্তু যে ভক্তি মানবকে ভগবানের শ্রীচরণে, তাহার শ্রেষ্ঠ, প্রেষ্ঠ, পবিত্রটিকে—নিবেদন করিতে বলে, সেই ভক্তির ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়।

হীনযানগণের সৌধশিল্প সরল, অনাড়ম্বর, অলঙ্কার-বিরহিত। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর প্রায় এক শত বৎসর পরে বৌদ্ধগণ তাঁহাদের চৈত্য গৃহ ও বিহারগুলির আলঙ্কারিক সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত প্রাচীন বৈদিক বিধি অনুষ্ঠান প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—হ্যাভেল এই মত পোষণ করেন। বম্বে ও পুনার নিকট কার্লির চৈত্যগৃহ হীনযানদিগের স্থাপত্যবিদ্যার চরম নিদর্শন। একটি প্রতিকৃতি দিলাম।

চৈত্যের প্রধান প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে যে খিলানযুক্ত বাতায়ন দৃষ্ট হয়, তাহাকে সূর্য্য-বাতায়ন (Sun window) কহে। উহার অপর নাম পদ্ম-পত্র-খিলান (lotus leaf arch)। হ্যাভেল ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"বৈদিক স্তোত্রগুলির কাব্যসৌন্দর্য্যের দ্বারা উদ্দীপিত যে প্রতীক এই বাতায়ন নির্ম্মাণ শিল্পে নিয়োজিত হইয়াছিল তাহা সূর্য্যের অথবা পদ্মের প্রতীক। ইহা অনভ্র নির্ম্মল আকাশে দূর চক্রবালে সমুদ্র, হ্রদ অথবা নদের উপরে সূর্য্যের উদয় অথবা অস্ত সূচিত করিতেছে। ধর্ম্মতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে ইহা ব্রহ্মা, বুদ্ধ, অথবা শিবের প্রতীক; এবং যখন মূর্ত্তিপূজা ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইল তখন উহা আসনে উপবিষ্ট দেবতার ভামণ্ডল বলিয়া গৃহীত হইল। ভক্তের চক্ষুতে এই আকার পদ্মপত্রের বলিয়া মনে হইল। বুদ্ধদেব অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে তাঁহার সাধনার ফললাভ করিয়াছিলেন; বৌদ্ধগণ তাহাতে অশ্বত্থপত্রের সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন।

পূর্ব্বে এই সূর্য্যবাতায়ন অলঙ্কারহীন ছিল। পরে —যেমন অজন্তায় ও অন্যান্য স্থানে—তাহাতে অলঙ্কার যুক্ত হইল। খিলানের বহির্ভাগের দুই অন্ত মকরের মুখ হইতে নির্গত হইতেছে; এই মকরের দ্বারা সৃষ্টি-সমুদ্র সূচিত হইতেছে—যে সমুদ্র হইতে প্রাতে সূর্য্যদেব উদিত হইয়া সন্ধ্যায় পুনরায় নিমজ্জিত হন। বাতায়নের মুকুট-রাহু পৈশাচিক হাস্য করিতেছে—ইহা শিবের তামস গুণের প্রতীক। কখন কখন ইহার পরিবর্ত্তে কেবল অবলোকিতেশ্বরের মস্তক দৃষ্ট হয়।

কখন কখনও চৈত্যের ভিতরেই, কিন্তু সাধারণতঃ

চৈত্যের বাহিরে সংলগ্ন হইয়া ভিক্ষুদের আবাসগৃহ বিহার নির্ম্মিত হইত। চৈত্যের ভিতরে বিহার, চৈত্যকে বেষ্টন করিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিহার কখনও দ্বিতল ত্রিতল এমন কি সপ্ততল করিয়াও (ভুলবিনয়—সপ্তভূমক পাসাদো) নির্ম্মিত হইত। চীন পরিব্রাজক নালন্দাস্থিত চারিতল বিহারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

অজন্তাতে গুহা নং ৯, ১০, ১৯ ও ২৬ হইতেছে চৈত্য। বাকিগুলি বিহার। ৮ হইতে ১৩ নং পর্য্যন্ত গুহা হীনযান দিগের; এবং খ্রীঃ পূঃ ২০০ হইতে খৃঃ ১৫০ বৎসর অর্থাৎ সার্দ্ধ তিনশত বৎসরের ভিতর এগুলি রচিত হইয়াছিল। বাকি গুহাগুলি মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কিত। ৬ ও ৭ নং গুহার রচনা কাল খৃঃ ৪৫০ ও ৫৫০ এর অন্তবর্ত্তী। ১৪ হইতে ২০, ২১ হইতে ২৯ এবং ১ হইতে ৫, ৫০০ ও ৬৪২ খৃষ্টাব্দের ভিতর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হ্যাভেলও বলেন যে, সর্ব্বপ্রথমে ১৩, ১২, ১১, এবং ৮ নং বিহার এবং পরে ৯ ও ১০ নং চৈত্য নির্ম্মিত হয়। ইহাদের নির্ম্মাণকাল খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দী। এই গুহাগুলির অক্ষ উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্ব দিকে রহিয়াছে। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আদি হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত, কঠোর মন্ত্রের সাধক, তাঁহারা বুদ্ধদেবকে উদীয়মান সূর্য্যহিসাবে পূজা না করিয়া তাঁহার পরিনির্ব্বাণকে ধ্যেয় করিয়া লইয়াছিলেন, সেই পরিনির্ব্বাণ রাত্রির আকাশের সূচক উত্তর দিকের সহিত সম্পর্কিত। তাঁহাদের কঠোর সাধনা চৈত্যগৃহের অলঙ্কারবিহীন স্তম্ভগুলিতে দ্যোতিত হইতেছে।

৯ ও ১০ নং গুহার চিত্রের সহিত সাঞ্চির তোরণে উৎকীর্ণ তক্ষণশিল্পের নাকি সম্পর্ক আছে। উত্তর আন্ধ্র নৃপতিগণের দ্বারা প্রতিপালিত শিল্পিগণ কর্ত্তৃক রচিত। বেশীর ভাগ চিত্র চালুক্য নৃপতিগণের আমলে রচিত হইয়াছিল। কতকগুলি বাকাতক নৃপতিগণের আমলের।

আগামী সংখ্যায় আমরা চিত্রগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করিব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীকালীপদ মিত্র।

সত্যবালা

(উপন্যাস)

একাদশ পরিচ্ছেদ

নানা চিন্তা

বাহিরে বৃষ্টি ও ঝড় সমান বেগে চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মেঘের বিকট গর্জ্জনও শোনা যাইতেছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, ইহাই নিনার রন্ধনকার্য্যের সময়—গুহাকক্ষের একটি মাত্র দ্বার বন্ধ করিয়া, ভিতরে উনান ধরাণো চলে না, নিনা বরাবর বাহিরেই ঐ কাযটি সমাধা করিয়া থাকে। তাই সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলিল, "তাই ত! এ দুর্য্যোগে রান্না বান্নার কি উপায় করি? আমি বাড়ী ছিলাম না, আজ বিকালে তোমার চা পর্য্যন্ত খাওয়া হয় নাই;—তোমার খুব ক্ষুধা পাইয়াছে বোধ হয়? আমার ত পাইয়াছে।"

কিশোরী বলিল, "পাইলে আর উপায় কি? বৃষ্টি থামুক, তার পর রান্না বান্নার যোগাড় করিলেই হইবে। এখন দুইজনে গল্প করা যাক এস।"

নিনা বলিল, "খালি পেটে কি আর গল্প ভাল লাগে? ঠিক হইয়াছে। হাট হইতে কিছু ফল কিনিয়া আনিয়াছি—তাহাই কাটিয়া দিই তুমি খাও।"—বলিয়া নিনা উঠিয়া, কক্ষকোণে রক্ষিত তাহার সেই বাজারের ঝুড়িটি হইতে গোটাকতক আপেল ও ন্যাসপাতি বাহির

করিয়া আনিল। কিশোরী সেই তাজা সরস ফলগুলি হাতে করিয়া নাড়িয়া দেখিতে লাগিল—কলিকাতার পেশোয়ারি ফলওয়ালার দোকানের দীর্ঘকাল পূর্ব্বে আহরিত অর্দ্ধশুষ্ক ফল নহে—সম্ভবতঃ সেই দিন প্রাতেই সেগুলি তাহাদের বৃক্ষজননীর বক্ষচ্যুত হইয়াছে। প্রদীপের আলোকে একটি আপেলের রক্তিমচ্ছটার প্রতি প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কিশোরী বলিল, "রঙটি কি সুন্দর! এমন সুন্দর জিনিষটি কাটিয়া খাইতে মায়া হয়!"

নিনা একটি ন্যাসপাতির বুকে ছুরি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "আচ্ছা, যে সুন্দর নয়, তার প্রতি তোমার কোনও মায়া দয়া হয় না, নয়?"

কিশোরী এ প্রশ্নের গূঢ় ইঙ্গিত বুঝিল। বলিল, "তা জানি না; কিন্তু ঈশ্বর বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর জিনিষগুলিই আমার চোখের সামনে আনিয়া দেন।" —বলিয়া এমন ভাবে নিনার মুখ পানে সে চাহিল, যাহাতে সেই সুন্দর জিনিষগুলির মধ্যে সম্প্রতি কোনটি তাহার চোখের সামনে উপস্থিত সে বিষয়ে নিনার মনে কোনও সংশয় না থাকে।

ফলভক্ষণ এবং এইরূপ কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, নিনা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, বৃষ্টির বেগ অনেকটা কম হইয়া গিয়াছে, ঝড় আর নাই, আকাশে মেঘের রঙও বিলক্ষণ ফিকা হইয়া আসিয়াছে, কিছুক্ষণ মধ্যেই বৃষ্টি বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। হইলও তাহাই। নিনা তখন উনুন ধরাইয়া চায়ের জন্য গরম জল চড়াইয়া দিয়া, রন্ধনের উদ্যোগে মনোনিবেশ করিল।

আহারাদি শেষ হইলে, রাত্রি প্রায় ১০টার সময়, কিশোরী নিনার নিকট বিদায় লইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গুহা-কক্ষে শয়ন করিতে গেল। নিনা সে ঘরে গিয়া, বিছানা কম্বল ঠিক করিয়া দিয়া, কিশোরীর জন্য পানীয় জল, আলো জ্বালিবার উপকরণ প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল।

কিশোরী শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। নিজের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যের কথা এবং নিনার কথা—পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটি বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রথমেই নিনার বিপুল ধনরত্নের কথা তাহার মনে হইল। উহা লাভ করিতে পারিলে, চিরজীবনের জন্য—এবং বংশাবলীক্রমেও—দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়! এ কি সাধারণ প্রলোভন? এ প্রলোভনকে জয় করা কি সহজ কার্য্য? যে দিন কিশোরী নিনার গোপন ধনভাণ্ডার নয়নগোচর করিয়াছে, সেইদিন হইতেই এই প্রলোভন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আর শুধুই কি নিনার ধনরত্ন? তাহার অকৃত্রিম সেবা যত্ন, তাহার তরুণ হৃদয়ের অকপট ঐকান্তিক ভালবাসা—এ সকলের চিন্তাও ক্রমে তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করিল। সে মনে মনে বলিল, "আমি একদিন দেশে ছিলাম,—ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর অধিবাসী ছিলাম—সে সব কি সত্য, না স্বপ্ন? এ জন্মে? না, সে সব আমার বিগত জন্মের কথা? এখন মনে হয় আমি এই হিমালয় বক্ষেই জন্মিয়াছি ও মানুষ হইয়াছি। অন্ততঃ ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে এই হিমালয় বক্ষেই আমরণ আমাকে কাটাইতে হইবে। সত্যবালাকে ভালবাসিয়া ছিলাম—তাহাকে বিবাহ করিব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম—সে সবও যেন সেই পূর্ব্বজন্মেরই কথা—এজন্মে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে। তবে আর কেন? পূর্ব্বজন্মের সে স্মৃতি ধরিয়া থাকিলে আর ফল কি? এজন্মে যাহা করণীয় তাহাই করা ভাল। আমি নিরাশ্রয়—পাহাড়ে জঙ্গলেই অবশিষ্ট জীবন আমার কাটাইতে হইবে, কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিব তাহার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাই না;—বোধ হয় ঈশ্বর দয়া করিয়া, নিনাকেই আমার সহায় স্বরূপ আনিয়া দিয়াছেন। নিনা তার হৃদয় মন দিয়া আমায় চাহিতেছে—আমিও তাহার সেবা যত্নে, মুগ্ধ হইয়াছি—তবে আর কেন? আর দ্বিধা করিয়া ফল কি, নিনাকে বিবাহই করি।

অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রমে কিশোরীর মনে হইল, আমি যে নিনাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, আমি কি তাহাকে ভালবাসি? ভালবাসা যে কি পদার্থ, তাহার জ্ঞান এখন আর কিশোরীর "পুঁথিগত" মাত্র নহে—দার্জ্জিলিঙে দুই মাসকাল সে আসল জিনিষটিরই

[অ]নুভব লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই অনুভূতির [স]ঙ্গ, নিজ বর্ত্তমান মনোভাবের তুলনা করিয়া দেখিল, [উভ]য়ে অনেক তফাৎ—দুইয়ে তুলনাই হয় না—একটি যেন [আ]কাশের চন্দ্র—অপরটি যেন মাটীর প্রদীপ। এ অবস্থায় [নি]নাকে বিবাহ করা তাহার উচিত কিনা, সে তর্কও [কি]শোরীর মনে উঠিল। ইংরাজি ও বাংলা উপন্যাস [প]ড়িয়া এ সম্বন্ধে যে ধারণা তাহার মনে স্থান লাভ [ক]রিয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা বেশীক্ষণ টিকিল না; [ব]ংশাবলীক্রমে যে ধারণা রক্তের সঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে, [যা]হা তাহার অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া আছে—তাহাই জয়-[যু]ক্ত করিল। আগে প্রেম করিয়া পরে বিবাহ—এ ব্যবস্থা [ক]বে আর এ দেশে ছিল? বিবাহের পর, একত্র বাসে, [স]রল হৃদয় সুচরিত্র নরনারীর মনে প্রেমসঞ্চার স্বাভাবিক [নি]য়মের বশেই হইয়া থাকে—অধিকাংশ স্থলেই তাহা হয়। অল্পাংশ যাহাদের হয় না, তাহারা ব্যতিক্রম, এবং দম্পতীর দুর্ভাগ্যই উহার কারণ। কিশোরী মনেমনে বলিল, আমি যদি নিনার সম্পদের লোভে মাত্র উহাকে বিবাহ করিয়া, ক্রমে কৌশলে উহার যথাসর্ব্বস্ব নিজায়ত্ত করিয়া লইয়া, উহার প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্যপালন না করি, উহার সহিত অসদ্ ব্যবহার করি, তবে বটে আমি পাপে লিপ্ত হইব। কিন্তু তাহা তো আমার উদ্দেশ্য নহে। না—না—আমার মনের কোনও অন্ধকার কোণেও সে ভাবের লেশমাত্র নাই।

সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিশোরী স্থির করিল, নিনাকে বিবাহ করিয়া এই দেশে বসবাস করাই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপে মনস্থির হইলে, যখন সে ঘুমাইয়া পড়িল, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরের মধ্যভাগ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কে তুমি?

পরদিবস মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, গতরাত্রির নিদ্রাল্পতা বশতঃ, কিশোরী নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

"নাক্সালামা! নাক্সালামা!"

কবাটে সঘন করসন্তাড়ন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিনার কণ্ঠস্বরে কিশোরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কেন, নিনা?"

"ঘুম কি তোমার ভাঙ্গিবে না? বেলা পড়িয়া গেল যে!"

"এই যে উঠি"—বলিয়া কিশোরী গাত্রোত্থান করিয়া নিজ বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইল; তারপর দ্বার খুলিয়া দেখিল, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে একবারে ঢলিয়া পড়িয়াছেন।

নিনা বলিল, "তুমি যাও, ঝরণায় গিয়া হাত মুখ ধুইয়া এস; আমার উনুন ধরিয়াছে, এইবার চায়ের জল চড়াইয়া দিই?"

"দাও।"—বলিয়া কিশোরী ঘরে ঢুকিয়া তাহার তোয়ালে প্রভৃতি বাহির করিয়া আনিল। নিনা জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরিতে বেশী দেরী হইবে না ত?"—"না, দেরী হইবে না।" বলিয়া কিশোরী প্রস্থান করিল।

অনেকটা নামিয়া গেলে তবে পূর্ব্বকথিত ঝরণা পাওয়া যায়। নামিতে নামিতে কিশোরী দেখিল, গতকল্যকার সেই ভ্রমণকারীর দল, এখনও সেই স্থানেই রহিয়াছে। লোকজন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রাতে এই ছাউনি নিনাও দেখিয়াছিল। কাহাদের ছাউনি, উদ্দেশ্যই বা কি তাহা নিনাও কিছু অনুমান করিতে পারে নাই।

ক্রমে কিশোরী যখন ঝরণায় পৌঁছিল, তখন নিম্নভূমির দৃশ্য আর একটু স্পষ্ট হইল। উপর হইতে মানুষগুলিকে কুকুর বিড়ালের মত ছোট দেখাইতেছিল, এখন ছাগল ভেড়ার মত দেখাইতে লাগিল। তাহাদের পানে চাহিতে চাহিতে কিশোরী হস্তমুখাদি ধৌত করিতে লাগিল,—এবং ভাবিতে লাগিল, যদি উহারা ইংরাজ পুলিসই হয়—আমায় ধরিবার জন্যই আসিয়া থাকে, তবে ত, উহারা এ অঞ্চলে থাকা পর্য্যন্ত আমার খুব সাবধানে থাকিতে হইবে। কিন্তু আমাকে উহারা চিনিবে কি করিয়া? তা, সে উপায় না করিয়াই কি উহারা বাহির

হইয়াছে? সম্ভবতঃ মল্লিক তাহার বা ঘোষ সাহেবদের কোনও ভৃত্যকে, আমার সনাক্ত করিবার জন্য উহাদের সঙ্গে পাঠাইয়াছে।—কিশোরী তাড়াতাড়ি কাষ শেষ করিয়া লইয়া, জলের ছোট বালতীটি ভরিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর উপরে উঠিয়া একটা বাঁকের নিকট পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইল, অল্প কিছু উপরেই টাটুঘোড়ার পৃষ্ঠে একজন শ্বেতকায় পুরুষ, ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে নামিতেছে। লোকটাকে দেখিবামাত্র কিশোরীর আপাদমস্তক ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, যেখানে আমি থাকি, সেই দিক হইতেই ত নামিতেছে। এখন পালাই কোথায়? লুকাইবার স্থান ত কাছে কোথাও দেখিতেছি না। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অশ্বারোহী কিশোরীকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "হেলো লামা! দাঁড়াও দাঁড়াও।"

কিশোরীর বুকটি ভয়ে গুরগুর করিয়া উঠিল—কিন্তু তখন আর না দাঁড়াইয়া উপায় নাই। সুতরাং সে দাঁড়াইল।

সাহেব আরও কাছে আসিয়া, সম্ভবতঃ বা সিকিমী ভাষায় কতকগুলা কি বলিল, কিশোরী তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ইংরাজীতে বলিল,—"ও ভাষা আমি বুঝি না।"—বলিয়াই তাহার মনে হইল, ছি ছি, এ কি করিলাম? ইংরাজি কেন বলিলাম? এ যে নিজের গলায় নিজেই ফাঁসি পরাইলাম!

অশ্বারোহী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর ইংরাজীতে বলিল, "বাই জোভ! এই দূর হিমালয়ে, একজন দেশী লোকের মুখে ইংরাজি ভাষা শুনিব, ইহা ত অপ্রত্যাশিত! তা, লামাজী! তুমি কি এ প্রদেশের লোক নও, সিকিমী ভাষা বোঝ না? তুমি কোন্ দেশের লোক তবে?"

কিশোরী এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া বলিল, "আমি তিব্বতীয় ভাষায় কথা কহি।"

সাহেব আরও নিকটে আসিয়া বলিল, "ওঃ, তবে তুমি তিব্বতের লোক? ভালই হইল। তোমার কাছে তিব্বতের অনেক খবর জানিতে পারিব।"

কিশোরী জিজ্ঞাসিল, "কেন, তুমি কি তিব্বত যাত্রী? তোমার সঙ্গে আর কে আছে?"

সাহেব নিম্নদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখ, আমাদের ছাউনি। ওখানে আমাদের দলের সকলে আছে। আমরা তিনজন শ্বেতকায় পুরুষ—বাকী সকলে দেশীয় লোক, দোভাষী, পথপ্রদর্শক, বাবুর্চি, কুলি প্রভৃতি।"

সাহেব তখন আরও নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল; কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের উদ্দেশ্য কি জানিতে পারি কি? শুধু কি সখের ভ্রমণ?"

সাহেব বলিল,"আমরা আমেরিকাবাসী;—ভৌগোলিক পরিষদের সভ্য। আমরা ভৌগোলিক আবিষ্কার জন্য বাহির হইয়াছি—তিব্বত ভেদ করিয়া আমরা চীনদেশে যাইব।"

এ কথা শুনিয়া কিশোরীর দেহে প্রাণ আসিল—চলিত কথায় বলিতে গেলে, ঘাম দিয়া তাহার জ্বর ছাড়িল।

"তোমার নাম কি?"

"লাজালামা।"

"আমার নাম জন রটেনহাম। আমি ফিলাডেলফিয়ার লোক। তুমি তিব্বতি, কিন্তু এমন ইংরাজি শিখিলে কেমন করিয়া?"

কিশোরী সংক্ষেপে উত্তর দিল, "আমি দার্জ্জিলিঙে গিয়াছিলাম। তোমরা এখানে কতদিন থাকিবে?"

"কাল সারাদিন আমরা আছি। পর্শু প্রাতরাশের পর আমরা তাঁবু তুলিব। নিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইতে কিছু খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা উদ্দেশ্য—ভারবাহী মানুষ ও পশুগণকে কিছু বিশ্রাম দেওয়াও উদ্দেশ্য বটে। এখান হইতে কিছু দূরে যে গ্রামখানি আছে, কি নাম তাহার, কাংপাচেন বুঝি? সেখানে খাদ্যদ্রব্য কিরূপ পাওয়া যাইতে পারে অনুসন্ধান জন্য আমি তথায় গিয়াছিলাম, এখন ছাউনিতে ফিরিতেছি।"

বলিয়া সাহেব টাটু চালাইল। দুই চারি কদম গিয়া, আবার টাটু দাঁড় করাইয়া মুখ ফিরিয়া বলিল, "তুমি এখানে

...দের কোথাও থাক বোধ হয়? কাল সকালে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া তুমি যদি চা পান কর, তবে আমরা অত্যন্ত খুসী হইব। আসিবে?"

কিশোরী বলিল, "চেষ্টা করিব—ধন্যবাদ।"

"আসিও। গুড্ বাই।"—বলিয়া সাহেব ঘোড়া চালাইয়া দিল।

কিশোরী ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। সাহেব ক্রমে তাহার দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। কিশোরী মনোমধ্যে নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মুখ খুলিল।

কিশোরী মঠে আসিয়া পৌছিতেই নিমা বলিল, "দেখ, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একজন শ্বেতকায় পুরুষ, টাটু ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ দিকে গেল। নিম্নে ঐ যে তাঁবু পড়িয়াছে, সে বোধ হয় ঐ তাঁবুরই লোক।"

কিশোরী জলের বালতী নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি যাহার কথা বলিতেছ, তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে কাংপাচেন গ্রামে গিয়াছিল, সেখান হইতে ফিরিতেছে।"

নিমা অত্যন্ত কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় দেখা হইল? কি কথাবার্ত্তা হইল? তুমি উহার ভাষা বুঝিতে পারিলে?"

কিশোরী তখন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় নিমার কাছে প্রায় সমস্তই বলিল—কেবল প্রকাশ করিল না, সাহেবকে দেখিয়া প্রথমটা তাহার মনে কি ভয় হইয়াছিল, এবং কেন হইয়াছিল।

নিমা পেয়ালায় চা ঢালিয়া বলিল, "ঐরূপ শাদা মানুষ আমাদের এ দিকে মাঝে মাঝে আসে বটে আমি শুনিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। উঃ—কি শাদা! মাগো! দেখিলে ভয় করে। তাহারা কি চরিত্রের লোক তাহাই বা কে জানে! তুমি কি স্থির করিলে? কাল উহাদের তাঁবুতে যাইবে নাকি?"

কিশোরী বলিল, "যাইবার ইচ্ছাই ত আছে।"

নিমা বলিল, "তোমার এই দুর্ব্বল শরীর, অত পথ নামিয়া আবার উঠিয়া আসিতে তোমার বড় কষ্ট হইবে যে!"

কিশোরী কিছু বলিল না—নীরবে চা পান করিতে লাগিল। যাওয়া সম্বন্ধে তাহার মনেও একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, সাহেব যাহা বলিল, সে কথা যদি সত্য না হয়—উহারা যদি ভৌগোলিক আবিষ্কারক না হয়—যদি ইংরাজ পুলিসই হয়—আমাকে ধরিবার এই কৌশল যদি অবলম্বন করিয়া থাকে—তাঁবুতে গিয়া যদি দেখি যে মল্লিকের অথবা ঘোষ সাহেবের একজন ভৃত্য উপস্থিত আছে—সে যদি বলে, এই ব্যক্তিই আসামী, ইহাকে আমি চিনি। তখন কি হইবে?

চা পান শেষ হইলে নিমা বলিল, "তুমি বস। আমি ঝরণায় গিয়া মুখহাত ধুইয়া আসি।" বলিয়া সে তাহার বস্ত্রাদি ও জলের ঘড়াটি বাহির করিয়া আনিল।

কিশোরী হাসিয়া বলিল, "নিমা, ঐদিকে যাইতেছ, ঐ ছাউনির সাহেবেরা যদি তোমায় একা পাইয়া ধরিয়া লইয়া যায়?"

নিমা দাঁড়াইল। বলিল, "ঠিক বলিয়াছ। আমি তবে অস্ত্র লইয়া আসি।"—বলিয়া সে আবার ঘরে গিয়া এক খানি বৃহৎ চক্‌চকে ছোরা বাহির করিয়া আনিয়া, তাহা আন্দোলিত করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমার এই ছোরা, শাদা মানুষের রক্তের আস্বাদন কখনও পায় নাই। উহারা যদি আমায় ধরিতে আসে, তবে সে আস্বাদন পাইতে পারিবে।"—বলিয়া ছোরাখানি কটিবন্ধে সংলগ্ন করিয়া ঘড়াটি লইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

কিশোরী বসিয়া বসিয়া কেবলই সেই তাবু-বিহারীদের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। বাস্তবিকই যদি উহারা ভৌগোলিক আবিষ্কারক হয়, তবে উহারা কিশোরীর মাস খানেক পরে দার্জ্জিলিঙ ছাড়িয়াছে। উহাদের নিকট সেই সময়কার, কলিকাতা ও দার্জ্জিলিঙে প্রকাশিত কতক-

গুলি সংবাদ পত্র থাকা খুব সম্ভব। সেই কাগজগুলিতে হয়ত বা সেই খুন ও তাহার তদারক সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া যাইতে পারে। তাহা দেখিবার জন্ত কিশোরীর মনটা বড়ই চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু মনের দ্বিধাও ঘুচে না। উহারা ইংরাজ পুলিস হইবে ইহা কি সম্ভব? ইংরাজ ও আমেরিকা বাসীর উচ্চারণ ও বচনভঙ্গির পার্থক্য বিষয়ে কিশোরী কিছুই জানিত না—সুতরাং সেদিক দিয়া সে কোনও সাহায্য পাইল না। তবে তাহার মনে হইল, তাহার স্থায় সামান্ত ব্যক্তিকে ধরিবার জন্ত ব্যয়কুণ্ঠ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট যে এত টাকা খরচ করিয়া এতদূরে পুলিশ অভিযান পাঠাইবে, ইহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

নিনা ঝরণা হইতে ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অন্তদিন যেমন তাহার হাসিখুসী ভাবটী থাকে, আজ আর তাহা নাই—আজ তাহার মুখখানি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। কিশোরীও আজ তদ্রূপ—তাহারও চিত্তচাঞ্চল্য তাহার মুখে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

আজ শুক্লা দ্বাদশী—পাহাড়ের অন্তরাল হইতে চন্দ্রোদয় হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশ বিমল জ্যোৎস্নায় যেন হাসিয়া উঠিল। কিশোরী বলিল, "চল নিনা, বাহিরে গিয়া আমরা একটু বসি।"

উভয়ে গিয়া এক প্রস্তর খণ্ডের উপর পাশাপাশি বসিল। দুই চারি কথার পর কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল "নিনা, আজ তুমি এমন গম্ভীর কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

নিনা বলিল, "তোমারই বা মুখ এতখানি গম্ভীর কেন?"

ইহার উত্তর দেওয়া কিশোরীর পক্ষে কঠিন। এ পর্য্যন্ত কোনও কথা নিনাকে ত ভাঙ্গিয়া বলা হয় নাই—এখন কি তাহা বলা যায়? পাছে উহারা ইংরাজ পুলিস হয়, আমাকে ধরিতে আসিয়া থাকে, বলিলে আমূল বৃত্তান্ত সবই বলিতে হয়,—সত্যবালার কথা বলিতে হয়। কিন্তু সত্যবালার সমস্ত বিবরণ জানিলে, নিনা যদি বলে, "তবে আর তোমায় আমি চাই না—তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার"—তখন কি হইবে? এই সুদূর হিমালয় বক্ষে, অনাহারে অনাশ্রয়েই ত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অতএব কিশোরী স্থির করিল, নিনাকে সে কথা খুলিয়া বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। অথচ একটা কিছু উত্তর দিতে হইবে; তাই সে বলিল, "কিন্তু তুমি আজ এমন গম্ভীর কেন তাহা ত বলিলে না?"

নিনা বলিল, "তুমি উহাদের তাঁবুতে যাইবে শুনিয়া অবধি আমার মনটা কেমন খারাপ হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হইতেছে, ওখানে গেলে তুমি আর ফিরিয়া আসিবে না, উহাদের সঙ্গে জুটিয়া, চলিয়া যাইবে।"

কিশোরী বলিল, "চলিয়া যাইব কেন?"

"উহাদের সঙ্গে জুটিলে, তুমি অনায়াসে কত দেশ দেখিতে পাইবে। উহারা ইংরাজ সরকারের পাশ লইয়া আসিয়াছে, কেহই উহাদের আটকাইতে পারিবে না—যে দেশে যাইবে সে দেশের রাজাই উহাদিগকে খাতির করিবে, কোনও বিষয়ে কোন অসুবিধা হইবে না—এই প্রলোভনে যদি তুমি উহাদের সঙ্গী হও? তখন আমি কি করিব বল? আর ত আমি তোমায় দেখিতে পাইব না!"—বলিতে বলিতে নিনার চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ইহা দেখিয়া কিশোরী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। নিনার একখানি হাত নিজ দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "ছি ছি নিনা, তুমি কি পাগল হইলে? তুমি কাঁদ কেন? আমি তোমায় ছাড়িয়া চলিয়া যাইব? না—না, তাহা কখনই যাইব না।"

নিনা মুখ তুলিয়া ভারি গলায় বলিল, "এ কথা কি সত্য বলিতেছ? তুমি কোনও দিন আমায় ছাড়িয়া যাইবে না?"

"হাঁ নিনা, আমি সত্যই বলিতেছি—আমি কোনও দিন তোমায় ছাড়িব না, যদি—যদি—চিরদিন তোমার নিকট থাকিবার অধিকার আমি পাই।"

শেষের কথাগুলি নিনা ভাল বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি? কোন অধিকারের কথা তুমি বলিতেছ? কে তোমায় সে অধিকার দিবে?"

কিশোরী বলিল, "অধিকার বুঝিতে পারিলে না নিনা ? তুমি যদি আমার বিবাহ করিতে—আমার ধর্ম্মপত্নী হইতে—সম্মত হও, তবেই ত চিরদিন আমরা দুইজনে একত্র থাকিতে পারি। নচেৎ, কেমন করিয়া থাকিব ?"

নিনা বলিল, "ওঃ, বিবাহের কথা বলিতেছ ? তা, আমি ক কোনও দিন বলিয়াছি যে তোমায় বিবাহ করিব না ?"

কিশোরী নিনার এই সরল প্রত্যুত্তরে মুগ্ধ হইয়া, পুনরায় তাহাকে বক্ষে বাঁধিয়া বলিল, "তবে তুমি আমায় বিবাহ করিবে ? তুমি আমার হইবে নিনা ?"

"আমি ত তোমারই আছি।"—বলিয়া নিনা কিশোরীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

কিশোরী নিনার মুখখানি তুলিয়া ধরিল। জ্যোৎস্না-লোকে দেখিল, তাহার চক্ষু দুইটি মুদ্রিত। "চোখ বুজিয়া আছ কেন ? চোখ খোল—চোখ খোল"—বলিতে বলিতে কিশোরী তাহার ওষ্ঠে ও উভয় গণ্ডে বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল।

দ্বাদশীর চন্দ্র তখন আকাশের বেশ উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া পর্ব্বতের শিখরে শিখরে আলোক বর্ষণ করিতেছে। নিনা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল—তথাপি উভয়ের কর-সম্মিলনের বিচ্ছেদ ঘটিল না।

কিশোরী বলিল, "আমাদের বিবাহে, এ দেশের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কোনও আপত্তি হইবে না ত নিনা ?"

নিনা বলিল, "না, আপত্তি হইবে কেন ? বুদ্ধদেবকে তুমি ত মান ?"

"মানি বৈকি। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে তাঁহাকে ঈশ্বরের একজন অবতার বলিয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি।"

নিনা কিশোরীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, মুখখানি তুলিয়া বলিল, "সে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা, কতদিন হইতে তোমার মনে জন্মিয়াছে বল দেখি ?"

কিশোরী বলিল, "আমার অসুখের পর হইতে। আর, তোমার ?"

"আমার ইচ্ছা হইয়াছে—তোমার অসুখের সময় হইতেই। জ্বরের ঘোরে তুমি প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতে; আমি তোমার কাছে বসিয়া তোমার মাথায়, পায়ে হাত বুলাইতাম, সে সময় হইতেই আমার মনে মনে সাধ যে তুমিই আমার স্বামী হও।"

"ভাগ্যিস, নিনা, আমার পীড়া হইয়াছিল!"—বলিয়া কিশোরী, নিনাকে বুকে জড়াইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

নিনা নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "চল, ঠাণ্ডা পড়িতেছে—ঘরে গিয়া বসা যাক্।"

"চল"—বলিয়া কিশোরী উঠিল। উভয়কে প্রবেশের সময় উভয়েই দেখিতে পাইল, উপরের রাস্তা হইতে কে একজন লোক, মঠের দিকে নামিয়া আসিতেছে। দেখিয়া দুজনেই দাঁড়াইল। লোকটা মঠের দিকেই আসিতেছে। নিকটে আসিতেই চেনা গেল সে ফুরচিং।

কিশোরী বলিল, "কি ফুরচিং—এত দেরী ?"

ফুরচিং বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে মালাপামা! ঘোড়া কিনিবার জন্য যে টাকাগুলি লইয়া গিয়াছিলাম, সাইস তাহা চুরি করিয়া লইয়া কোথায় পলাইয়া গিয়াছে।"

কিশোরী ও নিনার প্রশ্নের উত্তরে ফুরচিং ক্রমে ক্রমে সব কথাই বলিল। যেদিন সেই গ্রামে পৌঁছে, সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। পরদিন অনেকগুলি ঘোড়া দেখা হইল, কিন্তু কোনটিই পছন্দ হইল না। লোকে বলিল, দিন দুই অপেক্ষা করিতে পারিলে, গ্রামান্তর হইতে ভাল ভাল ঘোড়া বিক্রয়ার্থ আসিবে। পরদিন সন্ধ্যায় ফুরচিং দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চ্যাং পান করিয়া, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখে, তাহার কোমরে টাকার থলিও নাই, সাইসও অদৃশ্য। দুই দিন ধরিয়া অনেক অনুসন্ধানেও তাহাকে না পাইয়া, অবশেষে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিনা বলিল, "আচ্ছা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন তুমি বিশ্রাম কর।"—বলিয়া সে রন্ধনের আয়োজনে ব্যাপৃত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

হাসি

হাসি! তোমার শুভ্রবুকে অপ্সরাদের বাস,
স্বর্গলোকের তুমি,
সোণার কাঠি ধরার তুমি, আনলে আলোর রাশ.
জাগলো মর্ত্ত তুমি।

এলে তুমি, জাগলো আলো অসীমকালের বুকে,
সূর্য্যতারার দলে
ছড়িয়ে গেল আলোর বাণী; শিশুর কচিমুখে
আলোর ধারা চলে।
শুভ্র তোমার পরশখানি, নীল আকাশের পরে
জ্যোৎস্না বসনখানি
ছড়িয়ে দিল; ফুলের দলে দিলে কোমল করে
রঙিন রেখা টানি।
মোহন তব তুলির রেখা সান্ধ্যগগনপটে
আঁকলো সোণার ছবি;
তোমার আলো পূব সাগরের ধূসর উষার তটে
ছড়িয়ে দিল রবি।
তরুণীদের কালো চোখের কাজল-ভরা দিঠি
তোমার পরশ পেয়ে;
উঠলো জ্বলে; সান্ধ্য-তারা হাসলে মিটি মিটি
তোমার পানে চেয়ে।
তুমি যেথায় আসনখানি পাত নাই গো রাণি।
সেথায় অন্ধকার,
শ্মশানঘাটে মরণনাথ করছে কাণাকাণি,
উঠছে হাহাকার;
তোমার বাণী নাইগো যেথা, সেথায় অশথশাখে
পেচক কেঁদে মরে;—
পোড়ো বাড়ীর ভাঙা প্রাচীর বাতাস তারই ফাঁকে
কাঁদে হাহা স্বরে।
তুমি যেথায় নাইগো, সেথা পুকুর পাড়ের বনে
কাঁদে শিবার দল;
মাঠের মাঝে শকুন সেথা পথের কুকুর সনে
বাধায় কোলাহল।

অন্ধকারার খুনীর কালো পাষাণ হিয়ার মত
হাতহীনের মুখ;
শয়তানেরই লীলা সেথায় চলছে অবিরত
—নরক তাহার বুক।

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

রাণাকুম্ভ

ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও ৫৯।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগদাধর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৫৪ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ১৲

নাটক হিসাবে মন্দ হয় নাই, তবে ঐতিহাসিক নাটকের ঘটনা গ্রহন ও রচনা প্রণালী হিসাবে খুব ভাল বলিতে পারি না; আরও কিছুদিন সাধনার পর দেখিয়া শুনিয়া লিখিলে নাটকখানি হয়ত বেশ ভাল হইত। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা নাটকে যথেষ্ট আছে, কিন্তু এই অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে ফুটিয়াছে অল্প। মামুদ শা, রাণাকুম্ভ, মীরাবাই ও রমাবাই ছাড়া উল্লেখ যোগ্য চরিত্র খুঁজিয়া পাইলাম না। বিজলী চরিত্র নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য, নাটকীয় দৃশ্য হিসাবে হয়ত খুব জাঁকাল মনে করিয়াই লেখক এক মন্তপকে শবদেহের পাশে দাঁড় করাইয়া তাহার দ্বারা একজন কর্ত্তিতা মৃতা যুবতীর মুখ চুম্বন করাইয়াছেন। দৃশ্যটি নিতান্ত অস্বাভাবিক ও বীভৎস। চতুর্থ অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্যের নীলসিংহের বিজলীকে চুম্বন দৃশ্যও অস্বাভাবিক। নাটকান্তর্গত গানগুলিরও প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

মা—কাব্য

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। হিন্দুস্থান প্রেসে শ্রীললিত মোহন গুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪৩ পৃষ্ঠা, কাগজে বাঁধা, মূল্য ॥০

উচ্ছ্বাসময় কাব্য, পাঠে আনন্দিত হইয়াছি। প্রথম কবিতা—

ঘুমাতে ছিল সাধ ঘুমিয়ে গেল তাই,
ঘুচেছে রোগ শোক আর ত বাধা নাই।
শান্ত জলধির বক্ষে রেখে পা,
মৃত্যু কোলে আজ ঘুমিয়ে প'ল মা।

—— হইয়াছে।

গৃহবৈদ্য

চিকিৎসা পুস্তক। ১০।৩ এ, হ্যারিসন রোড হইতে এস, রায় এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ৪২ পৃষ্ঠা মূল্য ।৴০

লেখক আমাশয় ও ওলাউঠা রোগ বিবরণ ও তাহার প্রতিষেধক ঔষধের বর্ণনা সহজ ও সরল ভাষায় করিয়াছেন। পল্লীবাসী গৃহস্থের ঘরে একখণ্ড এই বই থাকিলে, সময়ে অনেক কাযে লাগিবে।

অর্থ সমস্যা ও সমবায়

বগুড়া রায় প্রেসে মুদ্রিত। ১৫ পৃষ্ঠা মূল্য—৴০

অর্থ সমস্যা সাধনের কোন বিশেষ উপায় বা ইঙ্গিত ইহাতে দেখিতে পাইলাম না। বইখানি আরও বড় করিয়া বিস্তৃত ভাবে লিখিলে ভাল হইত।

মনুষ্যত্ব লাভ

শ্রীসত্যাশ্রয়ী প্রণীত ও দিমাইতপুর-পাবনা শাশ্বত সংবাদ কার্য্যালয় হইতে অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। হিমাইতপুর-সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। ছোট আকারের ২৭২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা মূল্য-১॥০

পুস্তক খানিতে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রবন্ধাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। মানব জীবনের লক্ষ্য, কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কি, গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তাহা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচিত হইয়াছে, স্মরণীয় ব্যক্তিগণের জীবনের আদর্শের সঙ্গে মানুষকে মনুষ্যত্ব লাভের জন্ত আকৃষ্ট করা হইয়াছে। সকল প্রবন্ধই সুলিখিত, সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। পুস্তকখানি পাঠে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শান্তিকামী, কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই এই পুস্তক পাঠে আনন্দিত হইবেন।

ধর্ম্ম

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য-বিভারত্ন প্রণীত ও কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, আর্য্য পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা মেট্কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত। ১৬ পেজী-৯৩ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ৸০

এখানি ধর্ম্ম-সম্পর্কিত প্রবন্ধ-সমষ্টি। মানব জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য কি প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়া উচিত, ভারতীয় ধর্ম্মের আদর্শ, আশ্রম-ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির বর্ণনাত্মক সমালোচনা সরল ভাষায় করা হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই পাঠে তৃপ্ত হইবেন।

সালোমে

অনুবাদক-শ্রীশৈলেশনাথ বিশী বি, এল্। প্রকাশক দি বুক কোম্পানী, ৪।৪ এ কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা গৌরাঙ্গ প্রেস মুদ্রিত। ৯১ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য লেখা নাই।

অস্কার ওয়াইল্ডের নাটক সালোমের অনুবাদ। অনুবাদ, সুতরাং পুস্তক সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ অনাবশ্যক। তবে এটুকু বলিতে ক্ষতি নাই যে, বইখানি বাংলা পাঠক সমাজকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দান করিতে পারিবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

স্বরাজের পথে

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। ২২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত ও প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ১১৫ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য লেখা নাই।

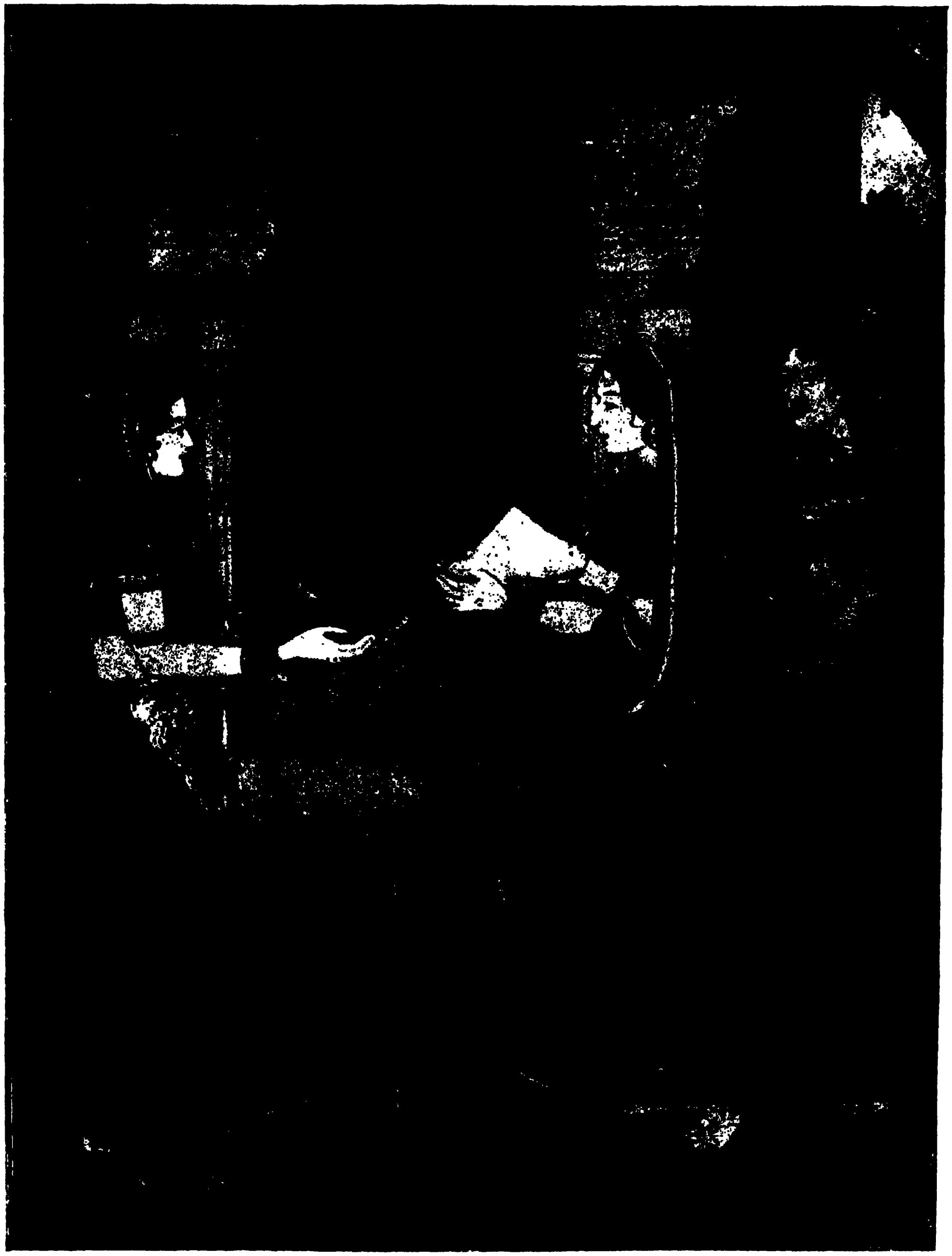
পুস্তক খানিতে ১০টি প্রবন্ধ আছে, সব প্রবন্ধই সুলিখিত, কিন্তু সব বিষয়ে লেখকের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না।

স্বরাজের গোড়ায় ধোঁয়া দিতে দিতে অনেকে যে সব বড় বড় কথা বলিতেছেন, তাহার অধিকাংশই বাঁধহীন আশা। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক স্বরাজের ইতিহাস জানিবার জন্য গ্রীস স্পার্টা রোম প্রভৃতির ইতিহাস চর্চ্চা খুবই করিয়াছেন, কিন্তু ঘরের কথা ভারতের ইতিহাস চর্চ্চার সময় তিনি পান নাই, কারণ ভারতেতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এক স্থানে লেখক বলিয়াছেন, "স্ত্রীও আপন সত্তাকে বজায় রাখুক নিজের নিজত্বকে ফুটাইয়া তুলুক।" সে কেমন করিয়া? যে দেশের বালিকাব্রতের মন্ত্র সীতার মত সতী হই, পৃথ্বীর মত ধৈর্য্যশীলা হইবার জন্য যে দেশের ছোট ছোট মেয়েরা প্রার্থনা করে, যে দেশের মেয়েদের দ্রৌপদীর মত "রাঁধুনী" হইবার কামনা, "রামের মত পতি" পাইতে যাহারা উৎসুক, তাহাদের কর্ম্মজীবন ও চরিত্র গঠনের জন্য কোন্ আদর্শ লেখক দেখাইতে চান? মিস্ নাইটিঙ্গেল, মেরি কার্পেণ্টার, মিসেস্ প্যাঙ্খার্ষ্টের আদর্শে তাহারা নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবে, না,—সুলভা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা, অদিতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে? ২৮ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন,—"ভারতবর্ষ আজ আর রোগী নয়," কিন্তু আমরা যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখি,—রোগ আমাদের কোথায়, দুঃখ কিসের, দৈন্য কতখানি; তখন ভয়ে শিহরিয়া উঠি। ক্ষুৎপিপাসায় মৃতকল্প, কঙ্কালসার অগণ্য নরনারী দৈন্যের তাড়নায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তবু কি আমরা নীরোগ? লেখক কেপ্‌লার সেক্সপীয়র হোমর আলোচনা করিয়াছেন, কালিদাস পাঠান্তে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহার চিন্তাশক্তির দৈন্য এইখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারতীয় আদর্শের তুলনায় অন্য এই শ্রেণীর লেখকেরা কথায় কথায় ইউরোপ আমেরিকায় ছোটেন, আদর্শ মানব দেখাইয়া দরিদ্র দেশবাসীকে বিস্মিত করিবার জন্য সেক্সপীয়র, ইবসেন, সেলী, কার্লাইলকে টানিয়া আনেন,—ইঁহারা যে শ্রেষ্ঠ মনীষী একথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের আদর্শ কি কিছুই নাই?

"কান্তি"।

কলিকাতা
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মন্দির-পথে

Bengal Art Press. 41, Shikdar Bagan.

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে

মানসী ও মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩১

১ম খণ্ড
৩য় সংখ্যা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মরণে

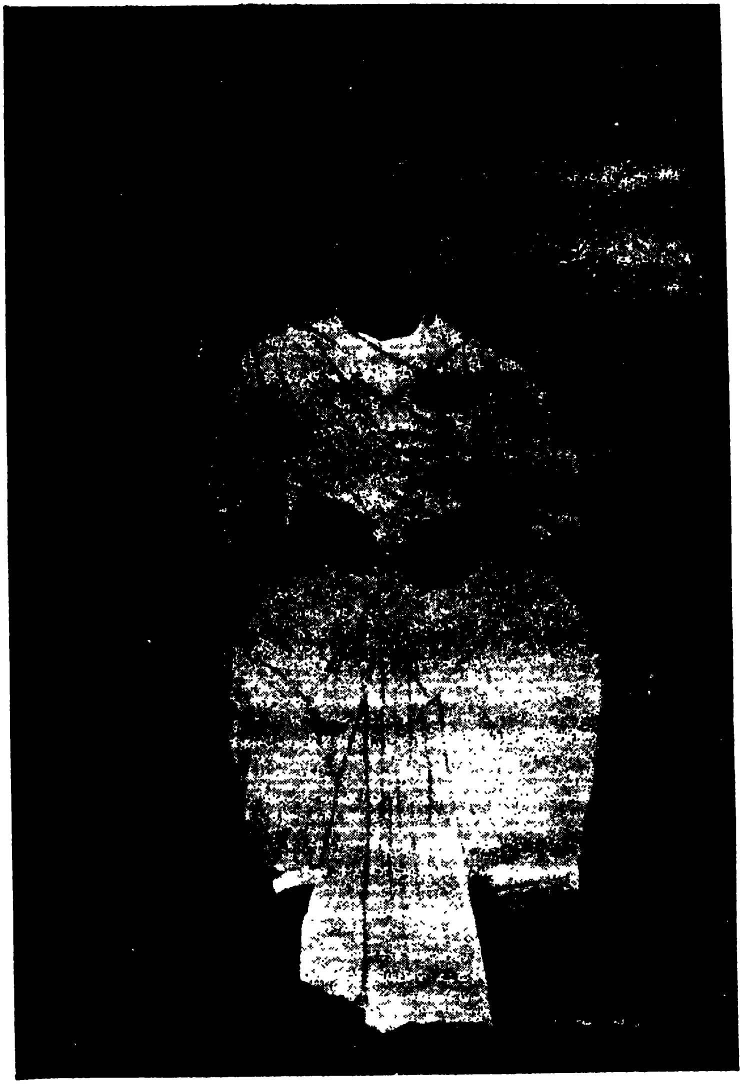
দিবা দ্বিপ্রহরের দীপ্ত কিরণে নির্ম্মল নীল নভস্তল উদ্ভাসিত, দিগন্তের শেষ সীমারেখার সন্নিকটেও বিন্দু-মেঘের ক্ষীণ সন্দেহ পর্য্যন্ত নাই, এমন সময়ে গগন-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভীমনাদী বজ্র যদি কোনও মানুষের মাথার উপরে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে, কি হইল, কেমন করিয়া হইল, বুঝিবার পূর্ব্বেই সে মানুষের যেমন মুহূর্ত্তে সমস্ত শেষ হইয়া যায়, সমগ্র বাঙ্গলার আজ সেই অবস্থা। বাঙ্গলার বুকভরা ধন, বাঙ্গালীর মাথার মণি, সুস্থকায় সবলেন্দ্রিয় আশুতোষ মহাকালের ত্বরিতাহ্বানে নিমেষার্দ্ধে ঊর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন, বিনা মেঘে এই বজ্রাঘাতে বাঙ্গলার আজ সব শেষ হইয়া গিয়াছে, কি হইল, কেমন করিয়া হইল, বুঝিবার সময় টুকুও বাঙ্গালী পায় নাই! বিধাতা এমন কঠিন বজ্র কি আর কখনও কাহারও বুকে হানিয়াছেন? আমাদের যাহা কিছু ছিল ধীরে ধীরে সমস্ত হারাইয়া আমরা আজ নিঃস্ব, কাঙ্গাল হইয়াছি। সেই কাঙ্গালের কুটীরে সাত রাজার ধন একটি মাণিকই ছিল; আজ, কাল আসিয়া অতর্কিত ভাবে সেই অমূল্য নিধি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। বাঙ্গলার আশুতোষ, ভারতের আশুতোষ আর নাই—এ 'নাই' যে কি 'নাই' তাহা বলিবার ভাষা নাই; চন্দন-চিতার উপরে বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব সেদিন দগ্ধ হইয়া গেল। চিতা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর বুকের চিতানল কে নিবাইবে, কবে নিবাইবে? কখনও কি নিবিবে?

জীবলোকে জন্ম জীবন, জরা মরণ, আবির্ভাব তিরোভাব—চিরন্তন নিয়ম; রাজরাজেশ্বরের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ হইতে ভিখারীর উটজ সংলগ্ন তৃণাস্তীর্ণ ভূখণ্ড পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জন্মজনিত আনন্দরোল এবং বিয়োগের হাহাকার নিত্য ঘটনা। হাস্য ও রোদন দৈনন্দিন ব্যাপার। কিন্তু যে চলিয়া গেলে দেশের সকলের সব ফুরাইয়া যায়, তাহার যাওয়া কি সাংঘাতিক ব্যাপার তাহা সেই হতভাগ্যেরাই জানে, যাহাদের বক্ষ পঞ্জর

বিদীর্ণ করিয়া দিয়া, দেশজননীর ক্রোড় শূন্ত করিয়া সেই সারাৎসার, দ্বৈতহীন, লোকোত্তর মানুষটি চলিয়া গিয়াছে। আবার সে যাওয়া কি আকস্মিক, কি হৃদয়বিদারী! যখন আজন্ম কর্ম্মবীর সুস্থ সবল দেহে যোগিজনোচিত একাগ্রতার সহিত কর্ম্মের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন তস্করোচিত নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে বঙ্গের অজ্ঞে কালকিঙ্কর আসিয়া বাঙ্গলার কোহিনুর অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, বাঙ্গালী জানিতে পারিল না, কখন তাহার কণ্ঠমালার মহামণি অপহৃত হইয়াছে, কখন তাহার গৃহের রত্নদীপ নিবিয়া গিয়াছে, কখন তাহার হৃদ্‌গগনের পূর্ণ চন্দ্রমা কাল মেঘে চিরদিনের জন্ত ঢাকা পড়িয়াছে, কখন বাঙ্গলার পঙ্কজ-রবি অস্তমিত হইয়াছে! এমন বুকভাঙ্গা দুঃখ আর কখনও কেহ কি পাইয়াছে? হায় দুর্ভাগ্য দেশ, বিধাতার সকল গুলি বজ্র কি তোরই শিরে ভাঙ্গিয়া পড়িবার জন্ত সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া আছে?

আশুতোষ বাল্যাবধি সকলগুলি পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—কেবল তাহা দ্বারা তাঁহাকে বুঝা যাইবে না, বর্ষে বর্ষে একজন করিয়া পরীক্ষায় প্রথম হয়; ব্যবহার-শাস্ত্রের ব্যবসায়ে তিনি কৃতী ছিলেন, কেবল তাহাদ্বারা আশুতোষের পরিমাপ হইবে না, ব্যবহারাজীব আরও ছিলেন বা আছেন; ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়াধীশরূপে তাঁহার অনেকের উর্দ্ধে স্থান ছিল, মাত্র তাহাতেও তাঁহাকে বুঝা যাইবে না—তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দিকে দৃষ্টি দান করিতে হইবে। কিন্তু দীপ্ত দিবাকর-সদৃশ অমলিন বুদ্ধিশালী, অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন তেজস্বী পুরুষের দিকে চাহিয়া দেখিতেও আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়! তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার প্রশস্ত বক্ষ-কবাটের অন্তরালে যে বিশাল হৃদয় ছিল, ধ্যান নয়নে তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে হইবে,—যে হৃদয়ের রক্তপ্রবাহ অনাচার অতি-আচার দেখিলে ঝটিকা তাড়িত প্রবাহিনীর তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় উন্নত নর্ত্তনে স্ফীত হইয়া উঠিত—আবার যে হৃদয় পীড়িতা দেশজননীর দুর্দ্দশায়, দেশবাসীর নিরন্ন অবস্থায়, তাহার সমস্ত শোণিত প্রবাহকে নয়নের দ্বার দিয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত করিয়া দিত, সেই লোকোত্তর জনের দুর্দ্ধর্ষ, বজ্র-কঠিন এবং পুষ্প-পেলব হৃদয় খানিকে মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; উপাদেয় অন্তর মন হৃদয় মস্তিষ্কের সমষ্টিতে যে মহামূর্ত্তি ধ্যান নয়নের সম্মুখে সমুপস্থিত হয়, আশুতোষের স্বরূপ তাহাই। একদেশ দেখিয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা অন্ধের হস্তী-দর্শন চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল।

বিদ্বজ্জন-বরেণ্য, বিমল বিপুল বুদ্ধিসম্পন্ন, ঋষিবৎ ভবিষ্যদ্দর্শী আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন, দেশের এবং দেশবাসিজনের সর্ব্বদুঃখ বিমোচন করিতে হইলে কুন্দেন্দু-কান্তিমতী, তুষার-হার-ধবলা, বীণাদণ্ডমণ্ডিতভুজা, জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনায় দেশস্বজনের অন্ধতমসাচ্ছন্ন হৃদয়কন্দর আলোকোদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে হইবে, বিদ্যার প্রভাবে জনমনের অবিদ্যা বিদূরিত করিতে হইবে, তাহা হইলে সকল ভয় সকল দ্বিধা, সর্ব্ব সঙ্কোচ সকল বন্ধন বিমুক্ত হইয়া শ্যামা বঙ্গজননীর বহু কোটি সন্তান মানুষ হইবে, তাহাদের দুঃখ দূর হইবে। এই মঙ্গলময় কার্য্যে আশুতোষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের এই মঙ্গলব্রত পালন করিতে তাঁহাকে কত দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, কত বিবাদ বিতণ্ডা যুদ্ধ বিগ্রহে নিজেকে নিয়ত নিয়োজিত রাখিতে হইয়াছে তাহার সীমা নাই। কিন্তু এই অসাধারণ তেজস্বী, অলৌকিক প্রতিভাশালী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীর্য্যবান মহাপুরুষ একদিনের জন্তও কর্ত্তব্যপথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। একদা এক দুঃসময় আসিয়াছিল যে দিনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে ভারতের প্রধানতম রাজ-পুরুষের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আপতিত হইল—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ছলে তাহার স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টায় এক পরিষৎ গঠিত হইয়াছিল, লর্ড কর্জ্জনের ন্যায় মনস্বী জনের মস্তিষ্ক প্রসূত এই ব্যাপার; আমাদের সৌভাগ্যবলে বঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপ আশুতোষ সেই পরিষদে আসন



পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
(১৩২৩ সালে মানসীর জন্ত বিশেষভাবে গৃহীত ফটো হইতে)

গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভারতের উচ্চতম রাজপুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় সে দিনে আশুতোষ যাহা করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবৃতির প্রয়োজন নাই, শিক্ষিত মাত্রেরই তাহা পরিজ্ঞাত। আশুতোষের ন্যায় স্বাধীনচেতা, স্বদেশের মঙ্গলকামী, তর্ক বিচারে কুশাগ্রধী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য সে দিনে বিদ্যাপীঠের শুভকামনায় প্রাণপাত না করিলে, বাঙ্গলার সারস্বত তীর্থের কি দুর্গতি হইত কে জানে? সে দিনে রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয়গণের পরিবর্দ্ধমান অতৃপ্তি ও অসন্তুষ্টির শ্রেষ্ঠতম কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা!—তাই সেই শিক্ষার মূলে, নিতান্তপক্ষে কুঠারাঘাত করিতে না পারিলেও, ছুরিকার আঘাতে তাহাকে আহত এবং দুর্ব্বল করিয়া রাখা বাঞ্ছনীয়! দেশের একান্ত কল্যাণকামী আশুতোষের বীরবাহু সে দিনে গাণ্ডীব ধারণ করিয়া আততায়িগণকে নিরস্ত না করিলে সরস্বতীর চরণাশ্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদ্মের কতগুলি দল ঝরিয়া পড়িয়া আজ তাহাকে কতখানি রিক্ত দীন শোভাহীন করিয়া তুলিত সে কথা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। আশুতোষ সব্যসাচী অর্জ্জুনের ন্যায় এক হস্তে সারস্বত কুঞ্জের শত্রু সংহার করিয়াছেন, অপর হস্তে নিপুণ উদ্যানপালের ন্যায় নানা বৃক্ষ রোপণ এবং তন্মূলে জল সেচন করিয়া সে নিকুঞ্জের অনুপম শোভা সম্বর্দ্ধনার্থ প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। একদিন ছিল এই বিদ্যাপীঠে শিক্ষিত বঙ্গসন্তান স্বীয় পিতার নিকট মাতৃভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জাবোধ করিতেন, সতীর্থের সহিত বাক্যালাপ করিতে মাতৃভাষাকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করাই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আশুতোষ এই বিকৃত শিক্ষার বিষময় ফল মানসনেত্রে অবলোকন করিয়া প্রতিপ্রসবের জন্য যত্নবান হইলেন, এবং ধীরে ধীরে সংস্কার আরম্ভ করিয়া আজ বঙ্গসরস্বতীর গৌরবান্বিত স্বর্ণ সিংহাসন রচনা করিয়া দিয়াছেন; পরীক্ষার্থী আজ বঙ্গভাষায় পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষতম উপাধি গ্রহণ করতঃ নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছে! যতদিন নিখিল শাস্ত্রাধ্যাপনের জন্য বঙ্গের বিদ্যাপীঠ বাঁচিয়া থাকিবে, বাঙ্গালীর ভাষা থাকিবে, ততদিন বাঙ্গলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী আশুতোষের এই কীর্ত্তিস্তম্ভ তাহার সমুন্নত শীর্ষ ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিশ্বজনের নিকট প্রচার করিবে—আশুতোষ বাঙ্গালার কি ছিলেন, বাঙ্গালীর কি ছিলেন এবং চির উপেক্ষিতা বঙ্গভাষার জন্য কি করিয়া গিয়াছেন।

একদিন ছিল, যে দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, উপাধিধারী যুবজনকে অন্ন সংস্থানের জন্য কোন কষ্ট করিতে হইত না, শিক্ষা সমাপনান্তে সমাবর্ত্তনের পরেই ইংরাজ রাজপুরুষগণ এই সকল শিক্ষিত তরুণবৃন্দকে সমাদরের সহিত রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শিক্ষার সম্মান রক্ষা করিতেন এবং দুঃস্থ ভদ্রপরিবারের উদরান্নের চিন্তা দূর করিয়া দিতেন। ক্রমে যখন শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শিক্ষিত যুবকেরা যখন রাজপুরুষগণের দপ্তরে দপ্তরে ভীড় করিয়া অবশেষে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে লাগিল, তখন আশুতোষের অন্তর করুণায় কাঁদিয়া উঠিল। নিরন্নের মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিতে তিনি যেরূপে ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা এব প্রথম উপাধি পরীক্ষার পরে শিক্ষণীয় বিবিধ বিষয়গুলি নিমিত্ত, অভিনব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত; ইহাতে অন্ততঃ কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের কিছুকালের জন্য অন্নচিন্তা বিদূরিত হওয়া তাহারা নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ পাইল এই কার্য্য করিতে আশুতোষকে বহু লোকের বহু গঞ্জন সহ্য করিতে হইয়াছে, অর্থ সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু দেশবাসী শিক্ষিত ভদ্র সন্তানের অন্নকষ্টে যাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সে আশুতোষ নিজের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা গঞ্জনার দিকে দৃক্পাত করিবেন কেন? স্বদেশ-প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, স্বদেশীর হিতার্থে এই প্রকার নীরব কর্ম্ম আর কয়জন করিবে বা করিতে পারিবে জানি না। আশুতোষের অভাবে সদ্যঃসমাবৃত্ত বঙ্গের শিক্ষিত যুবকগণের যে কি অভাব ঘটিল, তাহারা কি অন্তরঙ্গ বন্ধু হারাইয়া আজ কি গভীর বেদনায় তাহাদের হৃদ্মর্ম্ম মথিত হইতেছে

তাহা তাহারাই জানে। কবে, কেমন করিয়া, কে আসিয়া তাহাদের ব্যথিত হৃদয়ের উপরে স্নেহহস্ত বুলাইবে, সে কথা অন্তর্য্যামী ভগবান ভিন্ন আর কে বলিবে?

সংসারে অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে, উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তি নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না; অভ্রভেদী সৌধ শিখরে যাহার বসতি, কুটীরবাসী দরিদ্র তাঁহার প্রাসাদ প্রাঙ্গণের প্রথম প্রাচীর পার হইতেও পারে না। কিন্তু সম্মানার্হ উচ্চপদে সমারূঢ় কাঙ্গাল-বাঙ্গালার আশুতোষ, আশুতোষের ন্যায় কাঙ্গালের বন্ধু ছিলেন। বালক বৃদ্ধ যুবা দীন দুঃখী আর্ত্ত ক্ষুধিত ক্লিষ্ট অত্যাচার পীড়িত—যে কেহ যে সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছে, আশুতোষ তাঁহার প্রীতিসুধাসিক্ত বিরাট বক্ষতলে উদার পরিরম্ভে সকলকেই গ্রহণ করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়াই থাকিতেন, যথাযোগ্য শান্তি সান্ত্বনা দয়া সকলেই লাভ করিয়াছে। "নাত্রপাত্রঃ পরীক্ষ্যঃ স্যাৎকালঃ নিয়মঃ ক্বচিৎ" এই শাস্ত্রবাক্য আশুতোষের জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাই আজ সমগ্র বঙ্গদেশ অশ্রুনীরে অন্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছে।

ইংরাজী শিক্ষার কি উপাদেয় ফল ছিলেন বাঙ্গালার এই আশুতোষ! ইংরাজী বিদ্যালয়ে তাঁহার বিদ্যারম্ভ, ইংরাজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শেষতম পরীক্ষাসমূহে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার শিক্ষা শেষ হয়। ইংরাজের যাহা ভাল, ইংরাজী শিক্ষার যাহা উত্তমতম, তৎসমুদয় আশুতোষ পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার দূষিতাংশ তাঁহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে নাই। ইংরাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহাদের নির্ভীকতা, ইউরোপীয়গণের স্বদেশহিতৈষণা, একান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিরলস একাগ্রতার সহিত দৈনন্দিন ভূরি কর্ম্ম সমাপনের অলৌকিক ক্ষমতা, সমস্তই আশুতোষের ছিল এবং এত অধিক পরিমাণে ছিল যে, ইউরোপীয় কোন এক ব্যক্তির মধ্যে এরূপ গুণরাশির একত্র সমবায়ের দৃষ্টান্ত আছে কি না সন্দেহ। পক্ষান্তরে অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে ধর্ম্মে কর্ম্মে এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর একটিও আছে কি না তাহা আমি জানি না। ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠাসম্পন্ন স্বদেশপ্রেমিক আশুতোষকে কেহ কোন দিন বিদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতে দেখে নাই। বিদ্যাপীঠের কর্ম্মোপলক্ষে এক সময়ে ইউরোপীয় বহু বিদ্বজ্জনের সহিত আশুতোষকে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল; নিশি-দিন ইউরোপীয়গণের সহিত একত্রে কার্য্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণের পরিধানে ধুতি ভিন্ন অন্য কোন পরিচ্ছদ দেখা যায় নাই। বঙ্গজননীর একান্ত মাতৃভক্ত শ্রেষ্ঠতম সন্তান আশুতোষ যে একাগ্র নিষ্ঠার সহিত দেশজননীকে সমগ্র অন্তর দিয়া ভালবাসিতেন সেই নিষ্ঠাবশেই স্বদেশের আচার ব্যবহার, অশন বসন সমস্তই সবলে সংরক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন—ব্রাহ্মণ কোন অবস্থাতেই কাহারও অনুরোধে উপরোধে স্বীয় গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া উৎপথগামী হন নাই। তিনি জানিতেন যাহা আমার নিজস্ব তাহাতেই আমার গৌরব, অপরের নিকট হইতে ঋণদ্বারা প্রাপ্ত বসন-ভূষণ সাজ-সজ্জা দীনতারই পরিচায়ক, উহা দ্বারা ঋণদাতা উত্তমর্ণের নিকট হইতে গৌরবলাভ অসম্ভব।

যে বিদ্যাপীঠ সংগঠনে, শিক্ষার সংস্কারে, আশুতোষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার বড় সাধের সেই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কেহ আঘাত করিতে উদ্যত হইলে এই বীর্য্যবান্ বীর ব্রাহ্মণ অপহৃত-শাবক শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন এবং হৃদয়ের শোণিত-তুল্য প্রিয় তাঁহার সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ কল্পে অতি প্রচণ্ড শক্তি সমূহের সহিত সংগ্রামার্থ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায়পক্ষের জয় দুন্দুভি বাজিয়া না উঠিত, যে পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী গগন-গাত্রে বর্ণ বৈচিত্র্যে উড্ডীন না হইত, ততক্ষণ এই ব্রাহ্মণ বীরের জ্যা-নির্ঘোষের নিবৃত্তি ছিল না। সম্পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই দ্রোণকল্প বীর ব্রাহ্মণ আশুতোষ অকালে অকস্মাৎ স্বর্গপুরে প্রয়াণ করিলেন, বাঙ্গলার ভাস্বর ভাস্কর মধ্যগগনে পঁহুছিয়াই অস্তগমন করিল।

যে অন্ধকারে বাঙলা দেশ আজ নিমজ্জিত হ'ল, সে অন্ধকারে পথ দেখাইবার উপযোগী জ্যোতিষ্ক আবার কবে বঙ্গের গগনাঙ্গনে উদিত হইবে, মনস্বিবিদ্যুৎহারীভের ন্যায় শাসনশাস্ত্র-বিশারদ আশুতোষ আবার কবে আসিবে, বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী ব্রাহ্মণগুরু আবার আমরা কবে পাইব তাহা তিনিই জানেন, যিনি বিশ্বের সকল বিধি-বিধানের বিধাতা।

হে পরলোক-নব-প্রবাসী আশুতোষ, নন্দনের আনন্দ বনজাত মন্দার মাল্যে তোমার ললাট বিভূষিত করিয়া সুরপুরে মনীষার রত্ন সিংহাসনে তোমাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য সুরললনাগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে; যাও আশুতোষ, তোমার উপযুক্ত আসন অধিকার করিতে পুষ্পক আরোহণে গমন কর। কিন্তু আমরা তোমাকে আবার চাই। হিন্দু আমরা—মুক্তি বিশ্বাস করি এবং জন্মান্তরেও আমরা আস্থাবান। তোমার নির্ব্বাণ মুক্তি আমরা কামনা করি না, জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া নব-কলেবরে নবীন তেজোদীপ্ত বীর মূর্ত্তিতে আমরা আবার আমাদের কাঙ্গাল বাঙ্গলায় তোমার পুনরাবর্ত্তন প্রার্থনা করি। তুমি না আসিলে তোমার অসমাপ্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার দ্বিতীয় জন ত আমাদের আর নাই! বাঙ্গলায় "ইন্দ্রপাত" হইয়া গিয়াছে, সেই ইন্দ্রের পুনরাগমনের পথের প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া সমস্ত বাঙ্গলা নয়নজলে ও নিরুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিবে, এই কথা তোমার স্বর্গপুরে বসিয়া তুমি স্মরণ করিও, এই আমাদের শেষ মিনতি।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিয়োগে

জননি বঙ্গ আজি মা তোমার ঘোর দুর্দ্দিন—দারুণ দুখ,
আশুতোষ তব বংশপ্রদীপ নাই যে, ভাবিতে বিদরে বুক!
বৃঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ নিটোল স্বাস্থ্য কুশাগ্রধী
ভীষ্ম সমান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বীর্য্যেতে যুগ-সব্যসাচী;
তেজে ক্ষত্রিয়, জ্ঞানে ব্রাহ্মণ, বিশ্বামিত্র-শক্তিমান,
ভারতের চির সনাতনী বাণী পেয়েছিল হেথা মূর্ত্তি প্রাণ।
বিশাল ভারতে বিজ্ঞতম যে বিজ্ঞাভিমান ছিল না তাঁর,
বিপুল অর্থ অর্জ্জন করি বিলাস বাসনা হয়নি যাঁর।
দেশ-সেবা আর পর উপকার জীবনের যার আছিল ব্রত;
জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া,দেশের হিতসাধনেতে সদাই রত।
কুসুম হইতে ছিল সুকুমার কোমল মধুর চিত্তখানি,
বজ্র-কঠোর বিশ্বাস ছিল, অবিকম্পিত সরল বাণী।
উপেক্ষিতা এ বঙ্গভাষার শিরে পরাইল মুকুট কেবা,
বঙ্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কেউ হেন করেছে সেবা?
বাঙ্গালী জাতির হিমালয়, ওগো, জ্ঞান মনীষার তাজমহল,
তেজের সূর্য্য, করুণার শশী, পবিত্রতার তুলসী দল!

জ্ঞানযোগ আর কর্ম্মযোগেতে
বিপুলা সিদ্ধি লভিলে তুমি!
তব আদর্শ ছড়ায়ে পড়ুক
—ধন্য হউক ভারতভূমি!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।



সার আশুতোষ চৌধুরী

গত ২৩শে মে কাছারিতে গিয়া শুনিলাম আশুতোষ নাই—তাঁহার পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই সদালাপী, অমায়িক, তীক্ষ্ণধী, বিচার-বিশ্লেষণপটু ব্যবহারজীবীর মধুর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাঙ্গালী আর শুনিতে পাইবে না। সেই সৌম্য, শান্ত, অজাতশত্রু ঋত্বিকের প্রণবধ্বনি আর উদ্গীথিত হইবে না। বাঙ্গালী—শুধু বাঙ্গালী বলি কেন—সমগ্র ভারতবাসী আর শুনিতে পাইবে না সেই মহা পুরুষের ভাবব্যঞ্জনা। দেশের ও দশের উপকারের জন্ম প্রাণপাত চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছেন—দেশকে স্বাধীনতার অমৃত আস্বাদ দান করিতে যাঁহারা ব্যগ্র, তিনি তাঁহাদের অগ্রণী। সেই চিন্তাশীল ভাবুকের ভাব-প্রেরণায় দেশ উদ্বুদ্ধ হইত। দেশের দুর্দ্দিনে যখন দেশবাসী তাঁহার দ্বারস্থ হইত, তখন আগ্রহের সহিত তিনি সৎপরামর্শ দান করিতেন। উত্তুঙ্গ হিমালয়ের ন্যায় চরিত্রের দৃঢ়তায় তিনি অটল ছিলেন, আবার দুঃখীর দুঃখ মোচনে, অভাবগ্রস্তের অভাব দূরীকরণে, সহানুভূতির শীতল বারি-সেচনে তাপিত প্রাণ স্নিগ্ধ করিতে তাঁহার মঙ্গলহস্ত সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিল। দেশের মঙ্গল-কামনায় ধ্যানরত যোগীর ন্যায় তিনি আত্ম-জীবন সর্ব্বদা

নিয়োজিত করিতেন। শক্তি তাঁহার অপরিমিত ছিল, উৎসাহ তাঁহার অদম্য ছিল—চরিত্রের বল প্রভূত ছিল; আর সর্ব্বোপরি ছিল তাঁহার তাজা সরল প্রাণ।

দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলির উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। রত্নগর্ভা বঙ্গজননী বাঙ্গালীর গৌরব আশুতোষকে হারাইয়া আজ রোরুদ্যমানা; বিষণ্ণা। তাঁহার দেশবাসী ভ্রাতারা আজ ম্রিয়মাণ—দুঃখে উদ্বিগ্নমন। বাঙ্গলার আজ বড় দুর্দ্দিন। শোকে মুহ্যমান তাঁহার বাঙ্গালী ভ্রাতারা আজিকার দিনে তাঁহার পূত পবিত্র চরিত্র-কাহিনী বিবৃত করিতে পারে না—তিনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে প্রতিনিয়ত উপস্থাপিত করিতেন, সে চিত্রও বাঙ্গালী আজ জগতের সম্মুখে ধরিতে পারিবে না। দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, শিক্ষা, ধর্ম্ম, সাহিত্য, আর্ট ও সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন—সাফল্যকে করায়ত্ত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাহারই একটু আভাস দিবার প্রয়াস পাইব।

শিক্ষার কথাই প্রথমে বলা উচিত। শতকরা দুই তিন জনও যেখানে শিক্ষিত নয়, সেখানে শিক্ষার বিস্তার জন্য যিনি চেষ্টা করেন, তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াও তিনি ভারতের চিরন্তন শিক্ষা-প্রণালীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বহুদিন যাবৎ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, আশুতোষ ইহার উন্নতির জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মীরূপে আমরা তাঁহাকে অনেকবার কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। বঙ্গ-বিভাগের সময় জাতীয় শিক্ষার আলোচনায় তাঁহাকে যোগদান করিতে দেখিয়াছি—আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহিত একযোগে, কি করিয়া আমাদের জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ গঠিত করিতে পারা যায়—কি করিয়া বাঙ্গালীকে শিক্ষার বিমল আনন্দ দান করিতে পারা যায়—কি করিয়া বাঙ্গালী যুবককে কৃতবিদ্য ও মানুষ করিতে পারা যায়,—তাহার চেষ্টায় মনোযোগী হইতে দেখিয়াছিলাম। ব্যবহারাজীবের অবসর খুব অল্প সত্য; কিন্তু সেই অল্প অবসরের মধ্যেও তিনি শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যাহা দিয়া গিয়াছেন, সে প্রকার দান বড় কম নয়। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ অনুষ্ঠানের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। সার রাসবিহারীর মৃত্যুর পর তিনি ঐ পরিষৎ-সমিতির সভাপতি পদে বৃত হন। বাঙ্গালা দেশে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রচলন জন্য যে সকল মনীষী চেষ্টা করিয়াছেন; সার আশুতোষ তাঁহাদের অন্যতম। ১৩১১ সালে বিদুষী সরলা দেবী মহোদয়া আমাদের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে কয়েকটী প্রশ্ন আশুতোষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, এখানে তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—"যদি আমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চাই, আমাদের গুটিকতক কার্য্য করা উচিত। দেশে ভাল স্কুল চাই। দেশের স্কুল দেশীয় লোকের দ্বারা চালান উচিত। নিম্ন-শ্রেণীতে বাঙ্গলার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। স্কুলেই মন ও চরিত্র গঠন হয়। একটী কি দুইটী ভাল স্কুল স্থাপন করা সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয়। তবে আমরা সেদিকে কোন চেষ্টাই করি না। স্কুলেই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে পরে উচ্চশিক্ষার পথ সহজ হইতে পারে। বহু সংখ্যক ছাত্রের পক্ষে উচ্চশিক্ষা দুরাশা মাত্র। বিলাতের আদর্শ দেখ। সেখানে য়ুনিভার্সিটীতে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে যায়। মনে রাখা উচিত যে, বিলাতে ধনী লোকের অভাব নাই—ধনের অভাব নাই। ইউনিভার্সিটীতে এক একটী কলেজ প্রচুর অর্থশালী। তাহাতেও অধিক ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্য আসে না। উচ্চশিক্ষা সৌখীন শিক্ষা নহে। তাহার জন্য অনেক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ ও শিক্ষা প্রয়োজন। তাহা সবিশেষ কষ্টসাধ্য। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বহু অর্থও প্রয়োজন। আমাদের সে অর্থ নাই। সেইরূপ শিক্ষা

দিবার উপকরণও নাই বলিলে চলে। কিন্তু ভাল স্কুল কেন হয় না বলিতে পারি না। জাতীয়তার মূল জাতীয় শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষা স্কুলে আরম্ভ হয়। উচ্চ শিক্ষা বিশেষ কোন জাতি কিংবা প্রদেশের নহে। আমরা অর্থলাভের জন্ত উচ্চ শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সে পথ দিন দিন অবরুদ্ধ হইতেছে। অর্থলাভ উচ্চশিক্ষার দ্বারা সহজে হয় না। সেইজন্ত আমাদিগকে Technical Educationএর দিকে মন দিতে হইবে। Technical school গুটিকতক স্থাপন করিতে পারিলে—অনেকটা পথ পরিষ্কার হইয়া আসে। আমার বিশ্বাস উচ্চশিক্ষা কঠিন বলিয়া আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। ডাক্তার সরকারের Science Association আছে। এখানে কতকগুলি বড় বড় কলেজ আছে। সকলে একত্র হইয়া একটা বড় বিশ্বালয় স্থাপন হয় না কি? শিক্ষা শিক্ষকের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আজকাল এ দেশে অনেক ভাল উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায়। শিক্ষার জন্ত তাঁহাদিগের সাহায্য প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া এ দেশে এখন শিক্ষা সম্বন্ধে কি করা উচিত, তাহা সাব্যস্ত করা প্রয়োজন।" (ভারতী ভাদ্র ১৩১১) আর তিনি বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে ও আগ্রহের ফলে জগদ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে শিক্ষাপরিষদে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা কয়েকটা সুন্দর শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমরা পাইয়াছিলাম।

রাষ্ট্রনীতিতে তিনি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সার সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত স্বরূপে তিনি জাতীয় মহাসমিতিতে বহু বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়াছেন। তিনি 'নরম' দলভুক্ত ছিলেন। সে বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগনীতির বিরুদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার তর্কশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। যখন তিনি দেখিতেছেন পরাজয় অনিবার্য্য, জনসঙ্ঘ যাহা চায়, তদ্বারা জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত, তখনও নির্ভীক আশুতোষ মর্ম্মে মর্ম্মে যে সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, বা কাহারও অপ্রীতিকর হইবে বলিয়া সে কথা বলিতে নিরস্ত হন নাই। এই ঘটনার পর হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে দুই দলের সৃষ্টি হইয়া যে বিরোধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠিয়াছিল—যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহা ভাঙ্গিবার ও দূর করিবার জন্ত আশুতোষের চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। শান্তি স্থাপনকল্পে সে সময়ে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্ত সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, বাস্তবিকই যাঁহারা জগতে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী, তাঁহারাই সুখী ("Blessed are the peacemakers") জাতির নব-জাগরণ দিনেও তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যুবকদের হৃদয়ে উৎসাহের বন্যা ছুটাইতে কোনদিনই কেহ তাঁহাকে বিরত দেখে নাই। 'গরম' দলের লোকেরা যখনই কোন আকস্মিক বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সৎপরামর্শ চাহিতেন, তখনই তিনি সরলপ্রাণে সদুত্তর দিতেন। সর্ব্বত্রই তিনি দানবীর ছিলেন। আধুনিক জাতীয় সম্মিলনের অনুষ্ঠানের সহিতও তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ১৯০৪ সালে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার সভাপতি রূপে তিনি যে সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সে কথাটীর উল্লেখ এ প্রসঙ্গে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথাটা এই, "পরাধীন জাতির রাষ্ট্রনীতি নাই।" (A subject nation has no politics.)

১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পত্নী বাসন্তী দেবী যখন পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হন, তখন আশুতোষ বজ্রগম্ভীর স্বরে কাউন্সিল সভায় পুলিশের অবিমৃষ্যকারিতা ও হঠকারিতার ফলে যে কি ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইবে, তাহার চিত্র সুন্দর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে পশ্চাদপদ হন নাই।

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। পুরাতন 'ভারতী ও বালক,' ও 'ভারতী'র পৃষ্ঠা খুলিলেই

তাহার লিখিত প্রবন্ধাবলীতে তাহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক প্রবন্ধগুলি তিনি বেশ সরল করিয়া লিখিতে পারিতেন। এই সরলতা ও সজীবতা তাঁহার জীবনের সহচর ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় ২৭ বৎসর পূর্ব্বের লিখিত, 'হিন্দু আর্য্য কি না' প্রবন্ধে তাঁহার গবেষণার গভীরতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে দিনাজপুর সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার বঙ্গভাষার প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কিছুদিন বিলাতের 'ঈগল' পত্রিকা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সামাজিক উন্নতি-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, বোধ হয় তিনিই প্রথমে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা প্রতিভাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া, রাঢ় ও বরেন্দ্র সমাজের মিলন স্থাপনের সূত্রপাত করেন।

সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী-প্রতিষ্ঠিত "সংগীত সঙ্ঘের" তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার পত্নীর-বিয়োগ হয়, তখন হইতে এই প্রতিষ্ঠানটীকে সজীব রাখিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। পত্নীর স্মৃতি রক্ষার ইহা অন্যতম উপায় বলিয়াই বোধ হয় তিনি মনে করিতেন।

আশুতোষের শিল্পানুরাগ—বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগ—অনন্যসাধারণ ছিল। ভারতীয় শিল্পের প্রচারের জন্য তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ শিল্পের বৈশিষ্ট্যও তিনি বন্ধুবান্ধবকে সর্ব্বদা বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন। ১৯২২ সালে কাউন্সিলে যখন ভারতীয় শিল্পের প্রচারের জন্য নির্দ্ধারিত অর্থ কমাইবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তিবলে বিরুদ্ধবাদীদের মত খণ্ডন করেন। তাহার কয়েক ছত্র এখনও আমাদের কর্ণে যেন বাজিয়া উঠিতেছে। তাঁহার ভাবার্থ এই:—"সহজ সংস্কারবশে সকল জিনিষ শিখিতে পারা যায় না। যত্নের সহিত অনুশীলন না করিলে, সাধনায় সমাহিত না হইলে, অনেক জিনিষ আয়ত্ত করিতে পারা যায় না। সেই সকল জিনিষের ভিতর শিল্প অন্যতম। ভারতবাসীকে শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য Society of Oriental Art যে চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন এবং কাউন্সিলের সে অর্থ সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

ব্যবহারাজীবরূপে ও কলিকাতা হাইকোর্টের জজীয়তী করিয়া তিনি যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার যেরূপ অর্থাগম হইত, তাহা ছাড়িয়া যখন তিনি জজীয়তী গ্রহণ করেন, তখন যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাও অনেক ব্যবহারাজীবের আদর্শ হইবার উপযুক্ত।

ধর্ম্মে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানবতার পূজা ভগবানের আরাধনার নামান্তর, ইহা তিনি জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তিনি মানবের সেবার অধিকার পাইলে আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। ধর্ম্মে তিনি মেকী আদৌ পছন্দ করিতেন না—সত্য বলিতে কি, মেকীর উপর তিনি সর্ব্বদা খড়্গহস্ত ছিলেন। অনেক তথা-কথিত ধার্ম্মিক তাঁহার সংস্রবে আসিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

মৃত্যুর দুইমাস পূর্ব্বে আশুতোষের মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় ওয়ালটেয়ারে ছিলেন; ডাক্তারের পরামর্শ মতে তখন কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার পর শরীরের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা একটু ভাল বলিয়াই সকলেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু কে জানিত, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ক্ষণবিকীর্ণ উজ্জ্বল আভার ন্যায় তাঁহার জীবন-দীপও ক্ষণেকের জন্য উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। হঠাৎ হৃদ্-যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনন্তধাম যাত্রী আশুতোষ, যাও অমরধামে চির-শান্তি লাভ করিতে। যাঁহার জন্য সারা বাঙ্গালাদেশ দুঃখিত, তাঁহার অভাব মোচন হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য, যাহা যায়, তাহার স্থান শীঘ্র পূর্ণ হয় না। আশুতোষ! তোমার শান্ত প্রফুল্লচিত্ত, তোমার মুক্ত উদার পরদুঃখকাতর প্রাণ, তোমার বিনয়, তোমার আদর্শ পূত পবিত্র চরিত্র, তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার বিপক্ষ-মত-সহনশীলতা, তোমার ধৈর্য্য ও উদারতা, দধীচির মত তোমার স্বার্থ-ত্যাগ, তোমার অনাবিল স্বদেশ-প্রেম বাঙ্গালীর আদর্শ হউক। এ সকল সদ্‌গুণ বাঙ্গালীকে মানুষ করিবার পক্ষে সহায়তা করুক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।*

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

* ১৩৩১, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আশাহত

(গল্প)

বিপত্নীক পরম বাগদী গরবীকে ঘরে আনিল কেবল দুই বৎসরের রুগ্ন পুত্র গোবরাকে রক্ষা করিবার জন্য। নতুবা এই পরিণত বয়সে আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না।

গ্রামের লোকে বলিল, পরম খুব জিতিয়াছে। গোবরার আসল মার চেয়ে গরবীর মুখ চোখের শ্রী অনেক ভাল। রঙ্‌টাও বেশ ফর্সা।

প্রতিবেশীদের এইরূপ আলোচনায় পরম হৃদয়ের কোণে একটু গর্ব্ব অনুভব করিলেও, ছেলেটা নূতন মার মধ্যে বিশেষ কোন মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে কিছুতেই তাহার কাছে ঘেঁসিতে চাহিল না। পূর্ব্বে খেলিবার মোহে যদিও এক আধবার ভূমিতে পদার্পণ করিত, কিন্তু নূতন মা আসিবার পর হইতে সে বাপের জীর্ণ পঞ্জর ক'খানাকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল করিয়া তুলিল।

এক পয়সার বাতাসা কিনিয়া দিয়া, নানাবিধ খেলনার প্রলোভন দেখাইয়া, দৈত্য, দানা জুজু প্রভৃতি বীভৎস মূর্ত্তির আবির্ভাবের ভয় প্রদর্শন করিয়াও গরবী যখন সেই একরত্তি ছেলেটাকে কোনক্রমে বশীভূত করিতে পারিল না, তখন গোবরাকে তাহার নিকট ফেলিয়া রাখিয়া মাছ ধরিতে যাইবার জন্য স্বামীকে পরামর্শ দিল। গরবীর পরামর্শ সমীচীন বলিয়া পরম গ্রহণ করিতে পারিল না। কোন উত্তর না দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গরবী স্বামীর প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আমাকে বুঝি বিশ্বেস করতে পারলি নে?"

পরম বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিল, "তুই কি গোবরার মা নস, গরব?"

গরবী শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল, "কি জানি!"

গরবীর খোঁচাটা পরমের হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। ছেলেটার একমাত্র উপায় স্থির করিয়া যাহাকে স্বগৃহে বরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহারই নিকট গোবরাকে রাখিয়া যাইতে তাহার অবিশ্বাস?

পরম সমস্ত রাত্রি মনে মনে সঙ্কল্প করিল, কাল যেমন করিয়াই হউক সে মাছ ধরিতে বাহির হইবে—গোবরা কাঁদিলে সে কোনও প্রকারে তাহাতে কাণ

দিবে না। কতক্ষণ কাঁদিবে? বাপকে না পাইলেই তাহাকে বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হইবে।

সকালে উঠিয়া পরম দেখিল, তখনও গোবরার ঘুম ভাঙে নাই। নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া পরবীকে বলিল, "গোবরা রইল, দেখিস্।"

পরবী একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই।"

পাছে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে, পরবী কিছু মনে করে, এই ভয়ে পরম আর বাক্যব্যয় না করিয়া জালখানি ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘর হইতে গোবরার কান্নার সুর শোনা গেল, "বাবা, বাবা গো—"

"ঐ রে, হতভাগা ছেলে আবার বায়না ধরেছে!" বলিয়া পরবী পরমকে সত্বর প্রস্থান জন্ত ইসারা করিল।

পরম অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া জালখানা নামাইয়া রাখিয়া ডাকিল—"পরব!"

পরবী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আবার কি হ'ল?"

"একবার চা'লের হাঁড়িটা বের কর্ ত।"

"কেন রে?"

"কর্ না।"

পরবী ঘর হইতে চালের হাঁড়িটা বাহির করিয়া আনিল। পরম উপুড় করিয়া সমস্ত চালগুলি দাওয়ার উপর ঢালিয়া ফেলিয়া বলিল, "এই যে, এখনো আট দশ সের মজুদ।"

"তবে আর ভাবনা কি?" বিদ্রূপস্বরে কথাগুলা বলিয়া, চা'লগুলি পুনরায় হাঁড়িতে পূরিয়া লইয়া পরবী গৃহে প্রবেশ করিল। পরম গোবরাকে কোলে লইয়া বেড়াইতে গেল। সেদিন আর তাহার মাছ ধরিতে যাওয়া হইল না।

২

পরবী ভাবিয়াছিল, গোবরাকে সে শীঘ্র আপনার করিয়া লইবে। অনভ্যস্ত পুরুষহস্তের বিশৃঙ্খল পরিচর্য্যায় শিশুর রুগ্নতা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। নিয়মিত স্নানাহার ও ঔষধ পথ্যে তাহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য বিদূরিত করিয়া একটি সবল পুষ্টকায় সন্তানের মাতৃস্থান অধিকার করিবার তাহার বিশেষ ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেটা যখন নূতন মায়ের নাম শুনিলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল এবং পিতার সুদৃঢ় স্নেহ-বেষ্টনী অনাবিল মাতৃ-স্নেহকে শিশুর নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন পরবী মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইল। শৈশবে ক্রীড়াপুত্তলির কৃত্রিম জননীর অভিনয় করিয়া নারী আপন হৃদয়ে গোপনে যে স্নেহভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া রাখে, প্রাপ্ত বয়সে তাহা উজাড় করিয়া বিলাইয়া দিবার জন্ত সে একটি যোগ্য পাত্রের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। পরবীরও তাহাই হইয়াছিল। তাহার সঞ্চিত স্নেহ সম্ভার পরমের অক্ষয় স্নেহাবরণে প্রতিহত হইয়া যতই ফিরিয়া আসিতে লাগিল, ততই তাহা জমাট বাঁধিয়া হৃদয় মধ্যে শক্ত হইয়া বসিতে লাগিল। পরবী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সে আর এ অনধিকার চর্চ্চা করিতে যাইবে না। এত বড় ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করিয়াই বা তাহার লাভ কি?

পরবী সকালে উঠে, ঘর দুয়ার ঝাঁট দেয়, গৃহকর্ম্মগুলি নীরবে সম্পন্ন করিয়া যায়, কিন্তু গোবরার সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ উদাসীন।

পরম অনেকবার ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে পরবীর হাতে সমর্পণ করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে গোবরার সম্মুখে "রাঙা মায়ের" অসংখ্য গুণবর্ণন করিয়াছে, তাহার কাছে থাকিলে প্রতিদিন অপরিমিত সন্দেশ পাইবার ভরসা দিয়াছে, কিন্তু তবুও সেই বালখিল্য জীবটীর মনটা কোন মতেই নরম করিতে পারে নাই।

নিরুপায় পরম অবশেষে পরবীর প্রস্তাবেই সম্মত হইবে স্থির করিল। গোবরাকে তাহার মায়ের কাছে রাখিয়া সে কাযে চলিয়া যাইবে। কিন্তু

যখন মনে হইল যে, গরবী ছেলেমানুষ, সন্তান প্রতিপালনে এখনও অপটু, বিশেষতঃ গৃহকর্ম্মে তাহাকে সমস্তদিন এরূপ ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় যে ছেলেটার উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের যথেষ্ট অবসর তাহার নাই, তখন তাহার মনের অভিপ্রায়টা কার্য্যে পরিণত করিবার আশা দূরে চলিয়া গেল।

গোবরাকে গরবীর নিকট হইতে পৃথক করিয়া একান্ত নিজের করিয়া রাখাটাও সে সুযুক্তি বিবেচনা করিল না। সে গরবীর স্বামী, তাহার সব জিনিসেই যখন গরবীর সমান অধিকার, তখন যেটি নিতান্ত আপনার সেটি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে তাহার অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ, গোবরাকে তাহার মায়ের কাছে রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় পরমের পা যেন কোন মতেই চলিতে চাহিত না।

গরবীর মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইতে না পারে এজন্য সে বোকা ছেলেটার নানারূপ কাল্পনিক দোষের উল্লেখ করিয়া নিজের অপরাধ ক্ষালনের বিধিমত চেষ্টা করিত। প্রকৃত ব্যাপারকে মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া পরম গরবীর নিকট কেবলই উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িতে লাগিল। গরবীর তাচ্ছিল্য ব্যঞ্জক মৃদু হাসিতে পরম নিজের লজ্জা ও কুণ্ঠা আরও বাড়াইয়া তুলিল।

গোবরা কোন মতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না দেখিয়া, পরম গরবীকে ভরসা দিল যে দু'চার দিন পরেই গোবরা নিজের মাকে চিনিয়া লইতে পারিলে আর ভাবনার কারণ থাকিবে না। কিন্তু গোবরা নিজের মা চিনিবার পূর্ব্বেই মজুদ চাউলের কলসীটা একেবারে শূন্য হইয়া আসিল।

প্রতিবেশীর উঠানের নীম বেগুন কাঁচালঙ্কা অবলম্বন করিয়া গরবী এতদিন স্বামীপুত্রের অন্নের উপকরণ সজ্জিত করিয়া দিয়া, নিজে কেন ভাতেই কাটাইয়া দিয়া আসিতেছিল। এইবার তাহারও অভাব হইল।

সেদিন তখনও ভাল করিয়া প্রভাত হয় নাই, শীতের কুয়াসায় চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গরবী ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, নিজের গায়ের কাঁথাখানা তুলিয়া রাখিল। নিশ্বাসের শব্দে বুঝিল পরম ও গোবরা অকাতরে ঘুমাইতেছে। ঘরের আগড়খানা ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেই শীতের প্রভাতের এক ঝলক ঠাণ্ডা পরমের উন্মুক্ত মুখখানায় গিয়া লাগিল। পরম চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, গরবী বাহিরে চলিয়া গেল।

গোবরার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে পরম চাপা স্বরে ডাকিল—"গরব!"

কোন উত্তর না পাইয়া গাত্রাবরণখানা গোবরার উপর ভাল করিয়া চাপাইয়া দিয়া পরম বাহিরে চলিয়া আসিল। দেখিল, গরবী জালখানা ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে।

পরম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। এ গৃহে আসিবার পর গরবীর জালস্পর্শ এই প্রথম। নিজে ঘরে বসিয়া থাকিয়া, গরবীকে পরপুরুষের সহিত মাছ ধরিতে পাঠাইবার লজ্জাকর কল্পনাটা তাহার প্রাণে একটা দারুণ অপমান জাগাইয়া তুলিল। ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আগে হতভাগাটাকে মরতেই দে।"

গরবী ফিরিয়া দেখিল পরম উঠিয়া আসিয়াছে। সেও ইহাই চায়। মাছ ধরিতে যাইবার ইচ্ছা গরবীর মোটেই ছিল না। ইচ্ছা করিলে পরমের উঠিয়া আসিবার অনেক আগেই সে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু নানা ছলে বিলম্ব ঘটাইয়া এবং জাল গোছাইতে অনাবশ্যক শব্দ তুলিয়া পরমের উঠিয়া আসিবার অপেক্ষা করিতেছিল। অভাবের কথাটা মুখে না বলিয়া কার্য্যে জানাইয়া দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য।

বাস্তবিক পরম অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল। তাহার মন বলিতেছিল, গাঁয়ের লোক শুনিলে বলিবে কি? একটি স্ত্রী ও একমাত্র রোগা ছেলে পুষিবার যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার আবার এ বয়সে বিবাহের সাধ কেন?

একরূপ জোর করিয়াই গরবীর হাত হইতে জাল খানা ছিনাইয়া লইয়া পরম বলিল, "খুব হয়েছে, বলা

বাগদীর ছেলের মাথাটা আর হেঁট করিসনে। ফিরে যা।”

গরবী মুখখানা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, “ঘরের স্ত্রীকে কেন ভাত খাইয়ে রাখলে বুঝি মাথাটা খুব উচুঁ হয়?”

পরমের এতক্ষণে জ্ঞানের সঞ্চার হইল। ঘরে চাল ছিল, অন্ত উপকরণগুলি কোথা হইতে যোগাইতেছে, সে এতদিন তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই। গরবীর মুখে কেন ভাতের কথা শুনিয়া তাহার সব পরিষ্কার হইয়া আসিল। মিনতির স্বরে বলিল, “কিছু মনে করিস্‌নে গরব, এই আমি চল্লাম।”

পরম চলিয়া গেল। কিন্তু একরশি পথ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে, সে যখন তিনবার ফিরিয়া আসিয়া গরবীকে গোবরার সান্ত্বনা সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিয়া গেল, তখন গরবীর অন্তরটা অভিমানে ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সে কি সন্তান পালনে এতই অক্ষম? ছেলেকে কিরূপে সান্ত্বনা দিতে হয় সে বিষয়ে সে কি এতই অজ্ঞ? ডাক দিয়া বলিয়া উঠিল, “আমি কিন্তু এত বঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে পারব না, বলে রাখছি।”

পরম পলাইয়া গেল। তাহার পা দু’খানা পুনরায় বাড়ীর দিকে ফিরিবার উপক্রম করিলেও, সে প্রাণের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া তাহাতে বাধা দিল। পালেদের বটতলায় আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। যেন একটা একঘেয়ে ভাঙা গলার কান্নার সুর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—“বাবা, বাবা গো—” সে প্রাণপণে উভয় কর্ণ রুদ্ধ করিয়া বিলের পথে ছুটিয়া চলিল।

৩

মাছ ধরিয়া, বেচিয়া, হাট হইতে চা’ল তরকারি সংগ্রহ করিয়া পরম ফিরিতে বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। কাছে আসিয়া সে একবার কাণ পাতিয়া শুনিল কেহ কাঁদিতেছে কিনা। কোনও শব্দ না পাইয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, সমস্ত বাড়ী-খানা গম্ গম্ করিতেছে। গরবী দাওয়ার এককোণে বসিয়া মাথা নত করিয়া ভাঙা আয়না ও চিরুণীর সাহায্যে কেশ রচনা করিতেছে। প্রতিদিন এতক্ষণ গোবরার চীৎকারে সমস্ত পাড়া মুখরিত হইয়া থাকিত। জঠরের শূন্যতা যতই বাড়িয়া যাইত, তাহার ক্রন্দনের সুর ততই উচ্চে উঠিত। আজ এখনও উনানে হাঁড়ি না চড়িলেও গোবরার সাড়া শব্দ নাই।

জিনিসগুলি গরবীর সম্মুখে নামাইয়া দিয়া পরম চোরের মত জিজ্ঞাসা করিল, “গরব, গোবরা ঘুমিয়েচে নাকি?” গরবী মুখখানা না তুলিয়াই বলিল “আমি তার কি জানি।”

পরম আগড়টা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে মাথা গলাইয়া দেখিল, গোবরা নিশ্চন্ত নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। সে নিজের বালিশটার শুইয়া আছে, পিঠে তাহার মায়ের বালিশটা সন্তর্পণে ঠেকান। কাঁথাখানা এমন পরিপাটী ভাবে চাপান রহিয়াছে যে, ছেলেটার গায়ে তাহার বিন্দুমাত্র ভার নাই, অথচ এমন নিশ্ছিদ্র যে, শীত প্রবেশের এতটুকু পথ নাই। চোখে কাজল, কপালে খয়েরের টিপ, নাকে রসকলি পরিয়া গোবরা রাজপুত্রের ন্যায় আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিসের স্বপ্ন দেখিয়া এক এক বার হাসিয়া উঠিতেছে।

পরমের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, “মা নইলে কি ছেলের যত্ন হয়!”

নিশ্চিন্ত চিত্তে পরম তামাক সাজিতে বসিয়া গেল। গরবী দুম্ দুম্ করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার সম্মুখে এক বাটী তেল রাখিয়া দিয়া আয়না চিরুণী গুলি গুটাইতে লাগিল।

নির্ব্বাপিত কলিকাটি নামাইয়া রাখিয়া, খানিকটা তেল নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতে করাইতে, পরম জিজ্ঞাসা করিল, “গরব, ছেলেটা আজ একবারও কাঁদেনি, নয়?” স্বামীর দিকে পিছু ফিরিয়া গরবী উত্তর দিল, “না, আজ সে পণ্ডিত হয়েছে।”

“তার রাক্ষুসে ক্ষিদে আজ কোথা গিয়েছে বল্ দেখি?”

গরবী কথা কহিল না।

পরম চাহিয়া দেখিল, একটা বাটীতে দুধের দাগ। সে বুঝিল, আজ এখনও গোবরার ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই কেন। জিজ্ঞাসা করিল, "গবর, দুধ কোথায় পেয়েছিলি রে?"

গরবী গম্ভীর হইয়া বলিল, "ননীর মার গাইএর দুধ। আমাকে খেতে দিয়েছিল।"

পরম চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "তাই বুঝি সবটাই খেয়ে ফেলেছিস্?"

"আমার দুধ, খাই আর ফেলে দিই, তা নিয়ে লোকের কায কি?"

পরম তৈল মর্দ্দন শেষ করিয়া পুকুর ঘাটে স্নান করিতে চলিয়া গেল। সেদিন তাহার যেরূপ তৃপ্তি সহকারে ভোজন হইল, বহুদিন সেরূপ হয় নাই। তাহার কর্ম্মশ্রান্ত অবসন্ন জীবন একটা স্নিগ্ধ শান্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া গেল। গরবীর প্রতি শ্রদ্ধায় তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল।

গরবী কিন্তু ধরা দিতে চাহিল না। পরমের অতি সতর্কতার ফলে তাহার মাতৃহৃদয় অবিশ্বাসের গুরু অপমানে যেরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিল, সে তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া পরম তাহার প্রতি এতদিন যে গুরুতর অবিচারটা করিয়া আসিয়াছে, কিরূপে সে তাহার প্রতিশোধ লইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

পরম কাযে চলিয়া গেলে, গোবরা সুর ধরিল—"বাবা, আমি যাব!"

গরবী বলিল, "যা না, কে তোকে ধরে রেখেছে?"

চতুর্দ্দিকে চাহিয়া, গোবরা বাপের কোন সন্ধান না পাইয়া চুপ করিল।

গরবী ডাকিল "গোবরা!" গোবরা চমকিয়া উঠিয়া মায়ের মুখের দিকে সভয়ে চাহিল।

"দুধ খাবি?"

গোবরা কয়দিন হইতে দুধের আস্বাদ বুঝিয়াছিল। সে নিজের পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "খিদে।"

গরবী হাসিয়া, উঠিয়া গোবরাকে টানিয়া কোলে লইল। গোবরা তাহার কোল হইতে নামিয়া পড়িবার জন্ম বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। গরবী জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া খানিকটা বাসি দুধ জ্বাল দিতে বসিয়া গেল।

গোবরা সম্মুখে দুধের বাটী দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। গরবী বলিল, "যদি না কাঁদিস্, রোজ তোকে দুধ খেতে দেব।" রোজ দুধ খাইতে পাইবার আশায় গোবরা আপাততঃ চুপ করিল। দুধের বাটীটায় চুমুক দিয়াই গোবরা একগাল হাসিয়া গরবীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল—"মা!"

গোবরার মুখে বহুদিন বাঞ্ছিত মা শব্দ শুনিতে পাইয়া গরবীর পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একটা আনন্দের বিদ্যুত্তরঙ্গ খেলিয়া গেল। গোবরার মসী-মলিন গণ্ডদ্বয়ে সে অজস্র চুম্বন আঁকিয়া দিল।

গোবরার স্বাস্থ্যোন্নতির অভিলাষে ননীর মার উপহারের বেনামে, পরমের কষ্টার্জ্জিত চাউলের কিয়দংশ বিনিময়ে, গরবী যে দুধটুকু সংগ্রহ করিতেছিল, তাহার সাহায্যেই আজ মা ও ছেলের মধ্যে একটা আপোষ হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আজকাল সুধী-সমাজে মাঝে মাঝে এক নূতন বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য East এবং West অর্থাৎ প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সদ্ভাব প্রমাণিত করা। যাঁহারা বলেন যে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের কোন কালে অসদ্ভাব ছিল না এবং থাকিবেও না আমার বিবেচনায় তাঁহারা সমাজ, ধর্ম্ম এবং রাজনীতি সম্পর্কীয় ব্যবধান সমূহ উপেক্ষা করতঃ কেবল ভাব-রাজ্যেরই বিচার করিয়া থাকেন। দেশগত, জাতিগত এবং সমাজগত পার্থক্যের সুদৃঢ় প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কেবল ভাব সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে সর্ব্ব-দেশ, সর্ব্বজাতি এবং সর্ব্ব লোকের একটিমাত্র সাধারণ সংযোগসূত্র দৃষ্ট হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? এই ঐক্য বা সমন্বয় মানবজাতির আত্মিক অবস্থা এবং ইহাই মানবের জাতীয় ভিত্তি। কবির দৃষ্টিতে আমি তুমি ভেদ নাই, দেশ কাল ভেদ নাই, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ভেদ নাই। ভাবুক এবং সাধারণ লোকের প্রভেদ এই যে, ভাবুক তাঁহার হৃদয়বীণার একটি মাত্র ঝঙ্কারে ভাব-সমুদ্রে যে হিল্লোল তুলিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা আয়াসসাধ্য। এই জন্যই কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) এর কবিতা পড়িয়া প্রাচ্যের লোকের মনে হয়, তিনি তাহাদিগের মতই একজন; আবার কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রসাস্বাদন করিয়া প্রতীচ্যের লোকেরও তাঁহাকে তাহাদিগের মতই একজন ভাবা স্বাভাবিক। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার নিকট বিশ্ব-মানবের যে একই সুর ধরা পড়িবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিতে চাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে Revealed religion এবং Religion of the Church নামে ধর্ম্মের দুইটি বিভাগ আছে। পাশ্চাত্য-ক্ষেত্রে এই দুই বিভাগের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া সংঘর্ষ চলিয়াছিল। ভারতবর্ষেও উপনিষদ্ ও গীতার ধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্ম নামে প্রচলিত দেশাচারের মধ্যে ঐরূপ সংঘর্ষ বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। যাঁহারা revealed religion বা প্রত্যাদেশমূলক ধর্ম্মের উপদেষ্টা, তাঁহাদের পরস্পরের মতগত পার্থক্য সামান্য। গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ, বাইবেলের উপদেষ্টা যীশুখ্রীষ্ট এবং কোরাণ শরিফের উপদেষ্টা মহম্মদ, সকলেরই মূল শিক্ষা এক। Religion of the Churchএর পক্ষে কিন্তু তাহা নয়। এইখানেই ধর্ম্মের নামে বিবাদ বিদ্বেষ, উচ্চনীচ ইতর-ভদ্র জ্ঞান,—এইখানেই হিন্দু মুসলমান, হিন্দু-খ্রীষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ ভেদ। এই ভেদ-জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই Rudyard Kipling বলিয়াছেন যে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সদ্ভাব অসম্ভব। আর, আমাদের মনস্বী রবীন্দ্রনাথ কবির অন্তর্দৃষ্টিতে ইহারই প্রতিবাদে বলিয়াছেন, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মিলন অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার পক্ষে এই বিশ্বাস স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক বলিয়াই দেশ-বিদেশে তিনি এই মতের প্রচার করিতেছেন।

জগতে আমরা তিন প্রকারের সাধক দেখিতে পাই—যাঁহারা কবি, যাঁহারা দার্শনিক এবং যাঁহারা ধর্ম্ম-সংস্কারক। তিনজনে তিন বিভিন্ন পথের পথিক হইলেও তিনেরই উদ্দেশ্য এক,—মঙ্গলময়ের মহিমা কীর্ত্তন। যিনি কবি হইয়া বলেন "আমি দার্শনিক নহি" তিনি আত্মবঞ্চনা করেন; আবার যিনি ধর্ম্ম-সংস্কারক হইয়া বলেন যে, তিনি কবি বা দার্শনিক নহেন, তিনিও ভুল বলেন। ইঁহাদের তিন জনকেই Seer আখ্যা দেওয়া যায়। তিন জনেই প্রত্যাদিষ্ট। কবি Seer না হইলে তাঁহার কাব্য-কলা নিষ্ফল, দার্শনিক তর্ক-শাস্ত্রের অন্তরালে চিন্ময়ের অনন্ত সত্তার উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার তর্কের জালও বৃথা। আর, ধর্ম্ম-সংস্কারকের ত কথাই নাই। প্রত্যাদেশ ব্যতীত ধর্ম্মোপদেষ্টা হওয়ার স্পর্দ্ধা বিড়ম্বনা। শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মহম্মদ ইঁহারা সকলেই Seer। ভাবময়ের

অনন্ত ভাব-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা অবতাররূপে গণ্য হইয়াছেন। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের যে যোগের কথা বলা হইতেছে, তাহার মূলেও কবি, দার্শনিক ও ধর্ম্ম-সংস্কারের অন্তর্দৃষ্টি দেখিতে পাই। এই দৃষ্টির কাছে সাম্য ছাড়া বৈষম্য নাই, যোগ ছাড়া বিয়োগ নাই, harmony ছাড়া discord নাই। শুধু প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য কেন, চরাচর বিশ্ব এখানে এক। কবি রবীন্দ্রনাথ এই মহামিলন মন্ত্রের প্রচারক। দর্শনের দিক দিয়া নয়, সংস্কারের দিক দিয়াও নয়, কাব্যের ভিতর দিয়া তিনি যে অনন্তের সাক্ষাৎ (vision of the enternal) পাইয়াছেন, তাহার বলে তিনি প্রাণের কথা মর্ম্মস্পর্শী ভাষাতেই বলিতে পারেন এবং সেই জন্তই পৃথিবীর লোক আজ বিস্মিত ও মুগ্ধনেত্রে তাঁহার কথা শুনিতেছেন।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ একাই যে বিশ্বমানবতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত তাহা নয়। পাশ্চাত্য ক্ষেত্রে তাঁহার গৌরব রবি ভাস্বর হওয়ার পূর্ব্বে আর এক মহাত্মা, স্বামী বিবেকানন্দ, উপনিষদ্ ও বেদান্তের গূঢ় তত্ত্বসমূহ ব্যক্ত করিয়া প্রতীচ্যের লোককে—আমেরিকাবাসীকে—বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। এ ত গেল এ কালের কথা। প্রাচীন কালেও প্রাচ্যের রত্ন-সম্ভার লাভ করিয়া প্রতীচ্যের লোক যে পুনঃ পুনঃ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। যখনই প্রতীচ্য জাতি প্রাচ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তখনই তাহা নবজীবন লাভ করিয়াছে। প্রাচ্যই এক সময়ে জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল। অনেকের বিশ্বাস, আত্মম্ভরিতার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যজাতি সমূহ ভারতবর্ষের জ্ঞান গরিমাকে স্বীকার করিতে চাহেন না, পরন্তু ভারতবর্ষকে যথাসাধ্য চাপা দিতেই চাহেন। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই উক্তিতেও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায়। জার্ম্মাণ দার্শনিক Professor De Wulf তাঁহার History of Medieval Philsophy গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"The tenth century was indeed the brightest in the Byzantine world, as it was the darkest in the west. Still the spirit that moved the Byzantine culture of this century had not the fresh promise of originality. Its scholars had no higher ambition than to save from oblivion the grand literary legacy they inherited from the ancient world by collecting all the works in existence in their own time. And needless to say, philosophy, no less than other human sciences, profited much from this preserving care."— p. 224

—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৈজান্তীয় সভ্যতা উন্নতির সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিলেও ঐ শতকে পশ্চিমদেশ সকল গাঢ় অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত ছিল। তথাপি যে আলোক পাইয়া উক্ত সভ্যতার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা হইতে ভবিষ্যতে কোন নূতন মত প্রতিষ্ঠার উপযোগী মৌলিকতা প্রকাশ পায় নাই। প্রাচীন যুগ হইতে পণ্ডিতেরা যে অমূল্য সাহিত্য-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষাকল্পে তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থগুলির উদ্ধার সাধন করেন, তদ্ভিন্ন তাঁহাদের অপর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই ছিল না। বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের এই উদ্যমের ফলে অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত দর্শনশাস্ত্রও রক্ষা পাইয়াছিল।

এই স্থলে "ancient world" বলিতে যে প্রাচ্য জগৎ বুঝাইতেছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উক্ত গ্রন্থের অপর এক স্থলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দর্শনশাস্ত্র উপলক্ষ্যে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"The sudden and widespread outburst of philosophical speculation which lights up the opening years of the thirteenth century is traceablre to three main causes (১) the introduction of the western intellectual world to a rich and hitherto unknown philosophical literature

etc. For the second and even for the third time, the West discovered a portion of the philosophical treasure of ancient Greece. At the same time it came into contact with the genius and works of a strange race."—p.243.—অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দার্শনিক চর্চ্চা প্রসূত যে আলোকরশ্মি অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল, অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহার তিনটি প্রধান কারণ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য-জ্ঞান-জগতের সহিত এপর্য্যন্ত অপরিজ্ঞাত এক পূর্ণ ও পরিণত দার্শনিক সাহিত্যের পরিচয় ইত্যাদি। এইবার লইয়া, দুই, এমন কি তিনবারের জন্য প্রাচীন গ্রীসের তত্ত্বভাণ্ডারের সহিত প্রতীচ্যের পরিচয় হইয়াছিল। আবার ঐ সময়েই উহার সহিত এক নূতন জাতীয় লোকের প্রতিভা এবং গ্রন্থরাজির সংস্পর্শ ঘটে।

উদ্ধৃত অংশে "rich and hitherto unknown philosophical litterature" কথায় প্রাচীন গ্রীক জাতির দার্শনিক সাহিত্য এবং "strange race" বা নূতন জাতীয় লোকের কথায় আরব জাতিই বুঝাইতেছে। যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রাচ্যের জ্ঞান-সম্পত্তি লাভ করিয়াই প্রতীচ্য যে পুষ্ট হইয়াছিল, তাহা ঐ গ্রন্থে এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ যে কেবল একদেশ-দর্শী অথবা আভিজাত্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচ্যের প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের উল্লেখ করেন না, তাহা নয়, ভারতবর্ষের উল্লেখ না করার কারণও যথেষ্ট। জ্ঞান বিস্তারের পক্ষে দূরত্ব সামান্য অন্তরায় নয়, তদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাব এবং আচার ব্যবহারও এ বিষয়ে বাধা জন্মায়। বর্ত্তমান সভ্যতার বহুপূর্ব্বে যে জ্ঞানবর্ত্তিকা পূর্ব্বদেশ সমূহে প্রদীপ্ত হইয়াছিল, তাহার মূল যে ঠিক কোন্ দেশে ছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষেই উহার আদি উৎপত্তিমূল এবং বৈদিক সভ্যতাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল। হইতে পারে, কিন্তু প্রতীচ্যখণ্ড যে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে ইহার সন্ধান পায় নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি ইজিপ্ট, ইটালী এবং প্যালেষ্টাইনের কোন কোন স্থান হইতে যে সকল পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে জানা যায় যে, ঐ সকল দেশের প্রাচীন সভ্যতা বড় কম দিনের নয়। অন্ততঃ ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী দেশ-সমূহে সভ্যতার বহুল বিস্তার হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, এশিয়া মাইনরের মাইলেটাস্ (Miletus) নামক স্থানে পাশ্চাত্য শিক্ষার মূল যেন সর্ব্বপ্রথম শিকড় গাড়িয়া বসে। তৎপরে ক্রমান্বয়ে উহা পশ্চিমে গ্রীস এবং ইটালী, পূর্ব্বে সীরিয়া, আর্ম্মিনিয়া এবং পারস্য, দক্ষিণে আরব এবং মিশর, ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে স্পেন, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে প্রসারিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফ্রান্স হইতে এই শিক্ষার সন্ধান পায়। তখন ফ্রান্সে Chartre, Melun এবং Paris প্রভৃতি বিদ্যাকেন্দ্রে জ্ঞানের প্রভূত চর্চ্চা হইতেছিল।

স্বনামখ্যাত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এবং উহারই অনুকরণে উক্ত শতাব্দীর মধ্যভাগে ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে যথাক্রমে অক্স-ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্যারিসের অধ্যাপক ও কৃতী ছাত্রগণই অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজে শিক্ষাদান করিতেন এবং শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল, খ্রীষ্টতত্ত্ব। খ্রীষ্টতত্ত্ব যে কি বস্তু, উহা যাঁহারা ইউরোপীয় শিক্ষা ও স্বাধীনতার ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে এই তত্ত্বেরও আলোচনা একান্ত আবশ্যক। খ্রীষ্টের আদি উপাসকগণ, বিশেষতঃ তাঁহার পার্শ্বচরগণ তদীয় অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ ও সাধুজীবন দর্শন করিয়া তাঁহাকে কেবল আদর্শ চরিত্র বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তাঁহাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, অবতারের সহিত

সাধারণ মানবের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে এবং তাহা হইতে Trinity তত্ত্বের উদ্ভাবন করিতে হইল। God the father, God the son and God the Holy Ghost, তিনের পরস্পরের সম্বন্ধ এবং তাহার সহিত জগৎ ও মানবের সম্বন্ধ বিচার লইয়া ন্যূনাধিক আটশত বৎসর অতিবাহিত হয়। এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী আন্দোলনের ইতিহাসেরই অপর নাম স্বাধীন চিন্তার ইতিহাস বা History of the Freedom of Thought। কিন্তু সংক্ষেপে বলিতে গেলে trinity সংক্রান্ত তর্কযুদ্ধের মূলে গ্রীসীয় শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। গ্রীসীয় শিক্ষার অভাবে পাশ্চাত্য খণ্ডে এই তর্কমীমাংসার স্রোত প্রবাহিত হইত না। প্লেটো এবং অ্যারিষ্টটলের প্রেতাত্মা দেশকালপাত্র নির্ব্বিশেষে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, চিরদিনই আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। প্লেটোর মতের অনুকরণে প্লোটিনাস্ (Plotinus) নিও-প্লেটনিক্ মতের প্রচার করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত প্লেটনিক মতই রূপান্তরিত হইয়া trinity তত্ত্বে পরিণত হয় এবং উহাই আদি খ্রীষ্টতত্ত্বের মূল ভিত্তি। সেণ্ট আগষ্টাইন্ প্রমুখ সাধুগণ এই মতের পরিপোষক ছিলেন। পরবর্ত্তী খ্রীষ্টীয় সাধকগণ বরাবরই উহার অনুবর্ত্তন করিতেন। কিন্তু গোল বাধিল অ্যারিষ্টটল্‌কে লইয়া। অ্যারিষ্টলের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার, তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও মীমাংসা পদ্ধতি, তাঁহার বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক গবেষণা সমস্ত এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন একটা বিরাট দৈত্যের মত আদি খ্রীষ্টীয় দার্শনিক (Early Christian scholastics) গণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অ্যারিষ্টটলের প্রতিভা ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে পুনরুদ্দীপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই উহা আরবীয় এবং ইহুদী দিগের শিক্ষার অন্তর্ভূত হয় এবং তথা হইতে উহা মুসলমান বিজয়ীদিগের দ্বারা স্পেন দেশেও নীত হইয়াছিল। ফরাসী পণ্ডিতগণ টোলেডোর অনুবাদকদিগের নিকট হইতে গ্রীক প্রতিভা এবং অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাইয়াছিলেন। অ্যারিষ্ট্যালের গ্রন্থসমূহের অনুবাদের ফলে কতিপয় দার্শনিক তাঁহার দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু চার্চ্চ কিংবা খ্রীষ্ট সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাতে প্রমাদ গণিয়াছিলেন। Free thinking অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার প্রসার হইতে পাছে খ্রীষ্টের অবতারবাদে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা অ্যারিষ্টটলের গ্রন্থ সমূহ, বিশেষতঃ তাঁহার দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঐ সকল গ্রন্থ বর্জ্জিত হয়। পরে অন্যান্য বিদ্যাকেন্দ্র হইতেও হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিভার আগুন অধিক দিন চাপা থাকিল না। শিক্ষিতগণ সত্বরই তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ আরিষ্টটলের স্বর্গ সম্বন্ধীয় ধারণা খ্রীষ্টতত্ত্বেরই অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী অ্যারিষ্টটলের অভিশপ্ত গ্রন্থাবলীর পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ করেন; শুধু আদেশ করা নয়, কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই কার্য্যের ভারও দিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় পুনর্ব্বার ইউনিভার্সিটী সমূহে দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। তখন হইতে স্বাধীন চিন্তার পথ অনেকটা পরিষ্কার হইল বটে, কিন্তু তর্কযুদ্ধ একেবারে মিটিল না। মধ্যযুগের একজন প্রথিতনামা দার্শনিক সেণ্ট টমাস্ (St. Thomas) ও তাঁহার শিষ্যগণ অ্যারিষ্টটলের মতাবলীর সহিত খ্রীষ্টীয় ট্রিনিটি তত্ত্বের সমন্বয় করিয়া দর্শন শাস্ত্রের পুনর্গঠন সম্পন্ন করেন। তাহার পর হইতে Reformation বা ধর্ম্মসংস্কারের সূত্রপাত হয়। Reformationএর প্রধান কারণ স্বাধীন চিন্তার প্রসার। লোকে এখন আর চার্চ্চের বিধিনিষেধ (authority) এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের উপদেশে বড় একটা কর্ণপাত করিত না। সকলেই স্ব স্ব মতের প্রতিষ্ঠা ও পরিপোষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ঈশ্বরবাদে, অবতারবাদে, trinity তত্ত্বে সাধারণের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিল।

রোমান্ ক্যাথলিকগণ এই ব্যাপারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁহারা এই নূতন চিন্তা স্রোতের গতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রবিপ্লবও দেখা দিতে লাগিল। ইহার যে আপাত বিষময় ফল হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। এই বিপ্লবাগ্নিতে ক্যাথারিণ্ ডি মেডিচী (Catherine de Medici) ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট্‌দিগের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে রোমীয় ধর্ম্মমহামণ্ডলীর (Papacy) সংস্কার, ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক জেসুইট্ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা, রোমের ইন্‌কুইজিশন্, ট্রেণ্টের কাউন্সিল্ প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Giordino Bruno, ইটালীয় পণ্ডিত Lucilio Vanini, কবি মার্লো (Marlowe) প্রভৃতি বহু ব্যক্তি এই মহাযজ্ঞে জীবনাহুতি দিয়াছিলেন। বার্থোলোমিউ লিগেট নামক এক ব্যক্তিকে রাজা প্রথম জেম্‌স্ স্বয়ং অবমানিত করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়াছিলেন।* তাঁহার অপরাধ যে তিনি জীবনের শেষ সাতবৎসর খ্রীষ্টের উপাসনা করেন নাই। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কোপার্ণিকাস্ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রকাশ করার পর হইতে Reformationএর বহ্নি আরও সতেজ হইয়াছিল। কোপার্ণিকাসের মৃত্যু না হইলে তাঁহার শোচনীয় পরিণাম ঘটিত। অ্যারিষ্টটলের geo-centric গতির পরিবর্ত্তে কোপার্ণিকাস্ helio-centric গতির প্রচার করেন। পৃথিবী সূর্য্যকে আবর্ত্তন করে, সূর্য্য স্বতন্ত্র গ্রহ এবং উপগ্রহের কেন্দ্র স্বরূপ, এই মতের প্রচার হইতে সমগ্র ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়, বোধ হয় যেন ইহারই ফলে খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। সূর্য্যই যদি গ্রহাদির কেন্দ্র, পৃথিবীই যদি সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, তবে "মিরাকেল্" বা অলৌকিকের স্থান কোথায়? তাহা হইলে সমস্ত বাইবেল গ্রন্থই ত মিথ্যা, এবং চার্চ্চেরও কোন ভিত্তি নাই। পৃথিবী অপরাপর গ্রহের ন্যায় একটি গ্রহ হইলে ত স্বর্গেই তাহার গতিবিধি সম্ভব, পৃথিবী তাহা হইলে স্বর্গের বিপরীতার্থক কোন বস্তু নহে, পরন্তু স্বর্গ এবং মর্ত্তে কোন পার্থক্যই রহিল না। শুধু তাহাই নয়, অ্যারিষ্টটলের মতের বিরুদ্ধে, স্বর্গকে পৃথিবীর অতীত কোনও বস্তুরূপে স্বীকার না করিয়া জগৎকে যদি অসীম বলিয়াই গণ্য করা যায়, তবে জগতের বহির্ভাগে স্বর্গের বিদ্যমানতা অসম্ভব। তাহা হইলে অলৌকিক ব্যাপার সকলের সঙ্ঘটন হওয়াও অসম্ভব, এমন কি, "স্বর্গীয়" ঈশ্বরেরও কল্পনা অসম্ভব।

চার্চ্চের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সকল যুক্তির অবতারণা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি, সমস্ত তর্ক ও মীমাংসা, প্রাধান্য রক্ষার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, নব জ্ঞানালোকে মনে নূতন নূতন ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। জ্ঞান পিপাসায় লোকে যেন দিন দিন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়েই আবার মুদ্রাযন্ত্র এবং কম্পাসযন্ত্র ও টেলিস্কোপের আবিষ্কার জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল। আরও এক কথা, পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি সম্বন্ধে লোকের অতি সঙ্কীর্ণ ধারণা ছিল। ক্যাথলিকগণ মনে করিতেন যে, রোম সাম্রাজ্যের বাহিরে জগতের অস্তিত্বই নাই। কিন্তু কলম্বাসের

* The king summoned him (Bartholomew Legate) to his presence and asked him whether he did not pray daily to Jesus Christ. Legate replied he had prayed to Christ in the days of his ignorance, but not for the last seven years. "Away, base fellow" said James, spurning him with his foot. "It shall never be said that one stayeth in my palace that hath never prayed to our Saviour for seven years together."—History of Freedom of Thought (H.U.L.Ed.) p. 86. by J.B. Bury.

নূতন মহাদেশ আবিষ্কার, ভাস্কো ডি গামার কেপ্ (Cape of Good Hope) বেষ্টন করে ভারত আবিষ্কার এবং ম্যাগেলানের (Magellan) সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণের পর হইতে পৃথিবীর বিশালত্ব সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান জন্মে। অবশ্য জগতের বিশালতা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীক মনীষীরা যে না ভাবিয়াছিলেন, তাহা নয়, কিন্তু অজ্ঞান যুগের (Dark age) অব্যবহিত পরে ইউরোপ খণ্ডে চিন্তার উদারতা না থাকায় পূর্ব্বেকার ধারণা সমূহ ক্রমশঃ লোপ পাইয়া গিয়াছিল। বিজ্ঞানের দিক দিয়া আরও কত কত নূতন তথ্যের আবিষ্কার ও চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব— কয়েকটি মাত্রের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে Leonardo de Vinci এবং ফ্রাকাষ্টর (Fracastor) কর্ত্তৃক আর্কিমিডিসের তত্ত্বের পুনরাবিষ্কার এবং পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় আলোচিত জড়-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান এবং যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতির পুনরুদ্ধার এবং উন্নতি সাধিত হয়। ফরাসী পণ্ডিত ভাইয়েতি বীজগণিতের সংস্কারসাধন করেন। লর্ড নেপিয়র (Lord John Napier) "লগারিথম্" তত্ত্বের প্রচার করেন। Vesale নামক এক বেলজীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্থি-বিজ্ঞানের (Human anatony) সূত্রপাত হয়। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ডাঃ হার্ভি রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন। উপর্য্যুপরি এই সকল ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারে চতুর্দ্দিকে একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সকলের অপেক্ষা বেশী কায করিয়াছিল কোপার্নিকাসের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান। তৎপ্রণীত Celestial Revolutions নামক গ্রন্থই ইউরোপীয় চিন্তার ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ইহার প্রভাবে মানবের চিন্তা-একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

সম্মান রক্ষা

(গল্প)

ভ্রমর গুঞ্জন থামিয়া গেল, প্রভাতের স্নিগ্ধ মায়া অন্তর্হিত হইল, শান্ত পবন নিদাঘ সূর্য্যের প্রখর স্পর্শে উন্মত্তের মত দিকে দিকে ছুটিয়া চলিল, তৃণশস্যহীন নগর প্রান্তরে চঞ্চল মরীচিকা কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল।

সুগন্ধি তামাকের গন্ধে বালাখানা ভরপুর। প্রসাদ-প্রার্থীরা করুণ সতৃষ্ণনয়নে শ্যামসুন্দর বাবুর মুখবিবর নির্গত ধূমরাশির দিকে ঘন ঘন চাহিতেছিল। মাণিক সর্দ্দার সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই শ্যাম-সুন্দর বাবু গড়গড়ার নলটা মুখ হইতে একদিকে অপসৃত করিয়া ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মাণকে, এই চাঁদপুর থেকে ফিরে আসতে তোর এত বেলা হল কেন রে?"

মাণিক সর্দ্দারের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। থতমত খাইয়া ভীতস্বরে বলিল, "আজ্ঞে কি করবো কর্ত্তা, বাড়ী বাড়ী ঘুরতে বেলা হয়ে গেল। কোন গোয়ালাই দুধ দই দিতে স্বীকার হল না; আমাকে বেদখল করে' তাড়িয়ে দিলে।"

ক্রোধে শ্যামসুন্দর বাবুর প্রশস্ত মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার সজোর কম্পিত নিশ্বাস সমস্ত

ঘরটাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তার পর ?"

"আজ্ঞে—তার পর বল্লে, জমিদারের কালীপুজো হলো তাতে আমাদের কি ? আমরা কেন বছর বছর জিনিসপত্তর বেগার দিতে যাব ?—কুমোরদেরও ঐ এক কথা।"

বিকট গর্জ্জনে কক্ষ কাঁপাইয়া তুলিয়া শ্যামসুন্দর বাবু বলিলেন, "আমার কালীপুজোর জিনিসপত্তর দেবে না ব্যাটাদের এতদূর আস্পর্দ্ধা ? সব ব্যাটাকে দেখে নিচ্চি আমি এখন !"

তারণ চক্রবর্ত্তী মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কালীপুজোর জিনিস দেবে না—দিন দিন এ যে বড় অরাজক হয়ে উঠল ! মায়ের পুজোর জন্যে যা বাৎসরিক পার্ব্বণী আছে তা তো জমিদারকে দিতেই হবে। এ বেগার কি এবার নতুন ? পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে !"

বিপিন চৌধুরী উচ্চ গলায় বলিলেন, "পুড়ে মরবে, পপে ব্যাটারা একেবারে রসাতলে যাবে। মায়ের সঙ্গেও চালাকী !"

বৃদ্ধ নীলু রায় বলিলেন, "জমিদারের কথা থাকে না, তাতে আবার মায়ের কায—আমরা কোন ছার।"

তারণ চক্রবর্ত্তী দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী আন্দোলিত করিতে করিতে বলিলেন, "ঐ ইন্দির ছোঁড়াটাই যত গোলমালের গোড়া ! বাবু নাইট স্কুল করেছে, কৃষি শিক্ষা দেয়, খবরের কাগজ পড়ে শোনায় ! আরে ! তুই হলি ভদ্রলোকের ছেলে, তোর অত দরকার কি ? ছোট লোককে এই রকম আস্কারা দিলে ঘাড়ে চড়ে বসবে না ?"

শ্যামসুন্দর বাবু সোজা হইয়া বসিলেন। তাঁহার মাংসল মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল, প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত হইয়া গেল, রোষকষায়িত চক্ষু দুইটি জল জল করিতে লাগিল। তিনি কঠোর কণ্ঠে ডাকিলেন, "মাণিক সর্দ্দার !"

মাণিক সর্দ্দার সম্মুখে আসিয়া শ্যামসুন্দর বাবুর ক্রোধবহ্নিদীপ্ত মুখখানার দিকে ভীত কাতর নয়নে চাহিয়া বলিল, "বাবু !"

"কানাই সিংকে সঙ্গে নিয়ে এখনই ইন্দ্রকুমারকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আয়; যা, আর দেরী করিস নে।"

"যে আজ্ঞে"—বলিয়া মাণিক সর্দ্দার তাহার বংশ যষ্টিখানা বগলে করিয়া বাহির হইতেই, শ্যামসুন্দর বাবু স্বর কিঞ্চিৎ নরম করিয়া বলিলেন, "এই মাণকে !"

মাণিক সর্দ্দার ত্রস্তে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবু !"

"দ্যাখ, তুই একাই যা, গিয়ে বলিস বাবু আপনাকে একবার ডেকেছেন, বিশেষ দরকার, এক্ষুণি যেতে হবে।"

ইন্দ্রকুমার আসিলে শ্যামসুন্দর বাবু কুটিল কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি মনে করেছ কি বল ত ইন্দ্রকুমার ? আচ্ছা, আমাকে দেশে থাকতে দেবে কি দেবে না ?"

উত্তপ্ত বাতাস ধূলা বালি উড়াইয়া বৃক্ষরাজির হরিৎ পত্র কাঁপাইয়া হু হু করিয়া বহিয়া গেল। নাতিদূরে আম্রবীথি হইতে কোকিলের কুহুতান ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

ইন্দ্রকুমার বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে শ্যামসুন্দর বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি ত আপনার কোন অনিষ্ট করি নি মেসোমশাই !"

শ্যামসুন্দর বাবুর ঠোঁট দুইটি কঠিন হইয়া উঠিল। দন্তে দন্ত চাপিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি আমার কেবল মান সম্মানে হাত দিতে বসেছ, আর কিছু করনি ! কেন, তুমি আমার বাৎসরিক কৌলিক কালী পুজোর জিনিষ পত্তর বন্ধ করনি ? প্রজাকে নানা কথায় উত্তেজিত করনি ?"

ইন্দ্রকুমার দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "মাপ করবেন মেসো মশাই, সেজন্য আমি বিন্দুমাত্রও দায়ী নই। ওদের ন্যায্য দাবী ওরা বুঝে নেবে তাতে আমার কি ? আপনার ন্যায্য পাওনা আপনি দেখে নেন, ওরা হাসিমুখে দেবে ; কিন্তু এটা জানবেন, জোরজুলুমের কাল চলে

গেছে।" রৌদ্র ভরা আকাশের দিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল, "আর এ সত্যি যে আপনার কালীপুজোর ওরা বছরের পর বছর ধরে ওরকম বিনামূল্যে জিনিস দেবে কেন? এটা নিতান্ত অবৈধ ও অধর্ম্ম ভিন্ন—"

শ্যামসুন্দর বাবু ইন্দ্রকুমারের প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া তর্জ্জনী ঘুরাইয়া বলিলেন, "আমি তোমার কাছে সে উপদেশ শুনতে প্রস্তুত নই। কিন্তু জেনো ইন্দ্রকুমার, এটা তোমার পক্ষে মোটেই শুভকর নয়।"

২

বেলা চারিটার পর ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। আবার চারিদিক নিবিড় নীলিমায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যের মধুধারার মত কিরণ স্পর্শে প্রকৃতির অধরের হাসি উপছিয়া উঠিতে লাগিল। মৃদু মন্দ পবনে তাজা বনফুলের গন্ধ বিহগকুলের আনন্দকাকলী আবার কুটীরে কুটীরে শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল।

ইন্দ্রকুমার কর্দ্দম বৃষ্টিতে সিক্তপ্রায় হইয়া খিড়কী দরজা দিয়া শ্যামসুন্দর বাবুর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দেখিল সেখানে অন্য কেহই নাই; ঝি রামার মা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় একটা স্যাঁৎ সেঁতে ঘরের মেঝের মাদুরের উপর শুইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আর কতকগুলি পায়রা বক বকম শব্দ করিয়া মনের আনন্দে কার্ণিশের উপর খেলা করিতেছে। চিলাকোঠার পার্শ্বের কুঠরীটার খোলা জানালার ভিতর দিয়া সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি একটী বেলোয়ারী ঝাড়ের কাচে প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

ইন্দ্রকুমার দোতালার বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, "মাসীমা!"

ঘরের ভিতর হইতে মানকুমারী ডাকিলেন, "কে, ইন্দ্রকুমার? এস।"

ইন্দ্রকুমার ভিতরে গিয়া একখানা কৌচের উপবেশন করিয়া বলিয়া উঠিল, "উঃ! ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি! অনেকের ঘর দুয়োর যে কোথায় উড়ে গিয়েছে! ছেলেপুলে নিয়ে ওদের মাথা লুকোবারও একটুকও স্থান নেই!"

মানকুমারী ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "আহা! তাহলে তো ওরা বড় নিরুপায় হয়েছে!"

একটা দমকা বাতাস হু হু শব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া মানকুমারীর শিথিল কেশপাশ দুলাইয়া পরিধানের শাড়ী কাঁপাইয়া বহিয়া গেল। তিনি রেশমী ঝালর শোভিত একটা উপাধানের উপর হেলিয়া পড়িয়া ইন্দ্রকুমারের সিক্ত বসনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কাপড় চোপড় জল কাদায় যে একবারে মেখে গিয়েছে। ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই বুঝি কোথাও বেরিয়েছিলে? ও কাপড়টা ছেড়ে ফেল এখন। অমলা, একখানা শুক্‌নো কাপড় নিয়ে আয় তো।"

ইন্দ্রকুমার বলিল, "আর কাপড় দিতে হবে না মাসীমা! আমাকে এক্ষুণি বাড়ী যেতে হবে, কতকগুলি কাষ আছে।"

নবোদ্ভিন্ন যৌবনের সুষমায় কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া রূপমাধুরী মণ্ডিত দেহ তন্বীর দোলায় সুধা ছড়াইয়া অমলা একখানি ধৌত বস্ত্র হাতে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তাহার ওষ্ঠের কোণে হাস্যের অবলেপ, চোখের চাহনিতে আনন্দের দীপ্তি।

মানকুমারী ইন্দ্রকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেল, নইলে অসুখ করতে পারে। হাঁ একটা কথা—আচ্ছা ইন্দ্রকুমার, কাল তুমি আমার সাবিত্রী ব্রতে নেমন্তন্ন রক্ষা কর নি কেন?"

ইন্দ্রকুমার বলিল, "করিম সেখের ছেলেটার অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়িয়েছিল, নিউমনিয়ায় ধরেছে। সেই দুপুরেই সেখানে যেতে হল।"

"খাসা ছেলে তো তুমি! বেশ ওজর শিখেছ! কেন, সন্ধ্যের পর এলে হত না? অমলা, অচলার কাছ থেকে ইন্দ্রর জন্য একটু জলখাবার নিয়ে আয় তো। আচ্ছা থাক, তুই পারবি নে, আমিই যাচ্ছি।" বলিয়া মানকুমারী সিঁড়ি বাহিয়া নিম্নতলে নামিয়া গেলেন।

বন্য হংসের দল বাঁধন মুক্তির আনন্দে কলরব করিতে করিতে উড়িয়া গেল। উপরে ধীর সমীরণে পেঁজা তুলার মত খণ্ড মেঘ সকল ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়াছে। অমলা সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখিয়া একটু নৈরাশ্য-ব্যাকুলতা মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, "ইন্দ্র দা, আর তোমাকে আমাদের বাড়ী বেশী আসতে দেখি না কেন ?"

ইন্দ্রকুমার মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া অমলার গভীর দৃষ্টি নয়নে নয়ন মিলাইয়া বলিল, "কাষ নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয় বলে বেশী আস্‌তে পারিনে।"

"ওঃ ভারি তো কাষ! সারাদিন কেবল এ পাড়ায় ওপাড়ায় ঘুরে বেড়াও—এই তো? আচ্ছা বল তো ইন্দ্রদা, ইচ্ছা থাকলে কি উপায় হয় না ?"

"তা হয় বটে; কিন্তু দুদিন না এলেই যে মানুষের প্রতি মানুষের ভেতরকার প্রীতির আকর্ষণ কমে যায়, তা বলা যায় না। বরং আরও বেড়েই ওঠে।"

বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে অমলা ইন্দ্রকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার বেড়ে উঠতে পারে, কিন্তু আর কারুর যদি কমে যায় সেটা কি তোমার পক্ষে একটু ক্ষোভের কারণ হবে না ?"

ইন্দ্রকুমারের মুখখানা প্রীতি সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল। অমলার লাবণ্য-ঢলঢল মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "সে দুর্ভাগ্য আমার হবে না বলেই তো জানি।"

অমলা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। ইন্দ্রকুমার অনিমেষ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চোখ দুইটির সরল স্নিগ্ধ দ্যুতি, চিন্তালেশশূন্য সুডোল মুখখানির লাবণ্য রেখা, সুন্দর স্ফুটোন্মুখ দেহের আনন্দ-কম্পিত গতিভঙ্গী, ফিরোজা সাড়ীর রং ঘরখানির মধ্যে একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিল। মুগ্ধ বিভোর ইন্দ্রকুমারের চিত্তমন্দিরের নিদ্রিতা প্রেমময়ী আদরিণী জাগিয়া হাসিয়া উঠিয়া যেন তাহার প্রাণে পুলক মায়া বুলাইয়া দিল।

জলযোগান্তে ইন্দ্রকুমার যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার ধূসরতায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, আকাশের রক্তিমচ্ছটা মিলাইয়া যাইতেছিল, অসীমের গায়ে নক্ষত্রালোক ফুটিয়া ফুটিয়া ধরিত্রীর বুকে যেন শিহরণ হানিতেছিল।

৩

কক্ষে কক্ষে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। খোলা জানালা দিয়া আলোকরশ্মি পথের ধারে কুঞ্জবনের মাথায় পড়িয়া আবছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

দোতলার একটি কক্ষে আলোকের সম্মুখে বিধবা-বেশিনী অচলা কি একখানা বই পড়িতেছিল। তাহার উন্মুক্ত কেশরাশি দুই গণ্ডের পাশ দিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিসের একটা অনির্দ্দিষ্ট চিন্তায় যেন তাহার যৌবনশ্রীমণ্ডিত মুখখানাকে মাঝে মাঝে মলিন করিয়া তুলিতেছিল। পার্শ্বে উপবিষ্টা অমলা। তাহার শিথিল কবরী গ্রীবার উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, পরিধানের শাড়ীর আঁচল লুটাইয়া গিয়াছিল। তাহার যৌবনোন্মুখ দেহভঙ্গীর সৌন্দর্য্য নিটোল গণ্ডে রক্তরেখার খেলা আলোর উজ্জ্বলতা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিতে লাগিল।

অচলা তাহার ঝুলিয়া পড়া কেশগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অমলার দিকে চাহিয়া বলিল,—"কিরে অমলি, অমন ব'সে রইলি যে? একটু পড়াশুনা করবিনে আজ ?"

অমলা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি, পড়তে ভাল লাগছে না।

মানকুমারী আসিয়া কন্যাদ্বয়ের নিকটে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"অচলা, রামায়ণখানা কোথায় আছে, নিয়ে আয় তো মা!"

অচলা মাতার স্নেহমণ্ডিত মুখখানার উপর দুই চক্ষু তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"আচ্ছা মা, সীতা তো লক্ষ্মীর অংশ, তবু তাঁর এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার কারণ কি ?"

জুতার সজোর শব্দে বাহিরটা শব্দিত হইয়া উঠিল। মানকুমারী চকিতে চাহিয়া দেখিলেন, দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া স্বামী স্বয়ং, মুখখানা তাঁহার গম্ভীর, ক্রোধব্যঞ্জক। ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি চাপা ক্রোধের স্বরে বলিলেন,—"ঐ ইন্দ্র

ছোঁড়াটাকে আর তোমরা ওরকম প্রশ্রয় দিওনা,—এলে দরোয়ান ডেকে তাড়িয়ে দিও।"

মানকুমারী তাঁহার করুণ-নয়নের তীব্র দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন,—"কেন, সে এতই কি দোষ ক'রেছে যে দরোয়ান ডেকে তাড়িয়ে দিতে হবে?"

ক্রোধে শ্যামসুন্দর বাবুর মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"ও ছোটলোক—ছোটলোকের সঙ্গে মেশে। এই তো ওর প্ররোচনাতেই প্রজারা এবার আমার কালীপূজোর বার্ষিক পার্ব্বণী দেয় নি।"

মানকুমারী বলিলেন, "হায় হায়! তোমার কথায় আমি হাস্‌বো কি কাঁদবো কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পার্‌ছিনে! তুমি জমিদার, তোমার সিন্দুকে টাকা আছে, তোমার লোক জন আছে—তোমার অভাব কি? তুমি মায়ের পূজোর জন্তে অন্যায় অত্যাচার করতে যাবেই বা কেন? আর ভিক্ষুকের মত হাতই বা পাতবে কেন? দেবতার দোহাই দিয়ে গরীবের মুখের গ্রাস আর কেড়ে নিও না।"—বলিতে বলিতে মানকুমারীর চক্ষুর পাতে অশ্রু দেখা দিল, নতদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"বিধাতার অভিসম্পাৎ কিনা জানিনে, অচলার আমার বিয়ের গায়ে হলুদের গন্ধ না যেতেই কপাল পুড়্‌ল। সংসারের সব দরকারই যে তার মিটে গেছে! আর তো আমার এক অমল। তার বিয়ে দিলেই তো আমরা সংসারের সকল দায় থেকে মুক্তি পাই।"

বাবু বলিলেন, "শুধু কি এই পূজোর ব্যাপারই? ছোঁড়াটা কত রকমে লোককে উত্তেজিত ক'রে তাদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে! ভদ্রলোকের মান সম্মান রক্ষা ক'রে চলাই যে দায় হ'য়ে পড়েছে!"

মানকুমারী দৃপ্তস্বরে বলিলেন, "দেখ, মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। এই তোমরাই ত ঐসব মূর্খ নিরক্ষরদের পুনঃ পুনঃ আঘাত ক'রে আর ফাঁকি দিয়ে উত্তেজনার পথ তৈরী ক'রে রেখেছ। দোষ কার বল তো? আর এটা জেনো যে গায়ের জোরে ধনের জোরে মানুষ মানুষের কাছ থেকে প্রকৃত সম্মান লাভ করতে পারে না।"

শ্যামসুন্দর বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যাও, তোমার ওসব মেয়েলী নীতি কাহিনী আমি শুন্‌তে চাইনে। জমিদারী রাখতে হলে, ছোটলোকদের কাছ থেকে মান সম্মান পেতে হলে, লাঠির জোর চাই।" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে মুখে হিংসার আগুন জলিয়া উঠিল, পদশব্দে চারিদিক কম্পিত করিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

মানকুমারী তারা-ভরা আকাশের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। শিবাকুল প্রহর ঘোষণা করিয়া গেল। মানকুমারী অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে অচলা অমলা ঘুমাইয়া আছে। অচলার তরুণ করুণ মুখখানির দিকে চাহিয়া আবার তাঁহার চক্ষুর কোণে অশ্রু ঝকঝক করিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—এই আমার অচলা এই আমার অমলা। এদের জন্ত কি এত?

৪

আকাশ বাষ্পে ঢাকা—সূর্য্য দেখা যায় না। আসন্ন বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় প্রকৃতি যেন স্তিমিত লোচনে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণপ্রায়। ইন্দ্রকুমার এই মাত্র কেবলা মুচিদের জ্ঞাতি-বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া আসিয়া স্নানাহার করিয়া বাহির ঘরের বারান্দায় একটী কম্বল পাতিয়া একা বসিয়া আছে। আজ তাহার মনটা বড় ভাল নয়—উদ্বিগ্ন, নিরানন্দ। ঐ ঝাপসা আকাশের দিকে চাহিয়া কত কি যে ভাবনা তাহার মনের মধ্যে আসিতে লাগিল, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা সে নিজেই করিতে পারিল না। করিম সেখকে আসিতে দেখিয়া তাহার মনের কুয়াসা যেন কতকটা কাটিয়া গেল। একখানা মাদুর পাতিয়া বসিতে দিয়া পরম প্রীতি-ভরা কণ্ঠে ইন্দ্রকুমার বলিল, "করিম চাচাকে ক'দিন দেখ্‌তে পাইনি যে?—ভাল ত?"

করিম সেখ আনত মস্তকে সেলাম জানাইয়া হাসিবার চেষ্টায় মুখখানা বিকৃত করিয়া দীর্ঘ শ্মশ্রু-রাজিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে দাদাবাবু—ক'দিন বাড়ীছাড়া—মেয়ের বাড়ী গেছনু।"

"তারপর, ধান পেলে কতগুলি? বছরের খোরাক—কেও রাধু?—এস, বোস।"

রাধু মণ্ডল সভক্তি প্রণাম জানাইয়া ইন্দ্রকুমারের পার্শ্বে উপবেশন করিল। তার পর বিপিন প্রামাণিক, রাজু সরকার, রসিক ভট্টচায প্রভৃতি অনেকে আসিয়া সেখানে সমবেত হইল। গ্রাম্য রীতিনীতি এবং পারিবারিক সুখ দুঃখের কথায় ও হাসির কলরোলে স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রকুমারের স্নিগ্ধ সরল ও ঘৃণালেশ-শূন্য অমায়িক ব্যবহারে তাহাদের মধ্যে একতার বন্ধন দিন দিন দৃঢ় হইয়া আত্মীয়তায় পরিণত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও ইন্দ্রকুমার সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে, তবুও তাহার আসন অনেক শিক্ষাভিমানী, ধনগর্ব্বিতের চেয়ে উর্দ্ধে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশের বাষ্পঘন ধূসরতা কাটিয়া গেল—অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সোণালী কিরণ দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ধরিত্রীর বক্ষে গলিয়া পড়িতে লাগিল—দিগঙ্গনার নীলাঞ্চলে রক্তের ছোপের মত সিন্দুর-রঞ্জিত মেঘসকল ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

শ্যামসুন্দর বাবু উদ্যান পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার সময়ে ইন্দ্রকুমারের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা ধরিলেন—পশ্চাতে তারণ চক্রবর্ত্তী। কাহারও কোন কথা নাই, লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে উভয়ে চলিয়াছেন। ইন্দ্রকুমারের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া শ্যামসুন্দর বাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন—ক্রোধে তাঁহার কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল—চক্ষু দিয়া হিংসার আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।

সেজের আলোয় কক্ষ আলোকিত। বাহিরে আকাশ পূর্ণ করিয়া জ্যোতির্লোক সকল স্তব্ধ হইয়া আছে। শ্যামসুন্দর বাবু একা গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন—একটা বিরাট অশান্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা তাঁহার মুখভঙ্গীর রেখায় ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাকিয়ার উপর হেলিয়া পড়িয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই বিলাসপুর গ্রামের জমিদার—আমি, না ঐ ইন্দ্র ছোঁড়াটা?—ঐ ছোটলোক গুলো জমিদার ব'লে কি আমার একটুও সম্মান করলে? অথচ ঐ হতভাগা ছোঁড়াটারই হ'ল এত বেশী!—সেই-ই হল সব? যেমন করে হোক ওকে জব্দ কর্‌তেই হ'বে; আর ঐ ছোটলোক গুলোকে—আমি যদি ওদের ভিটে ছাড়া না করি তো, আমার নাম শ্যাম রায়-ই নয়।"

তিনি সোজা হইয়া বসিলেন—তাঁহার শিরায় শিরায় তড়িৎ খেলিয়া গেল—দেহ-যষ্টি আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

জমিদারের লোক লাঞ্ছিত ও ধিকৃত। পাইক প্রহরী আর তেমন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রামবাসীর ভীতি উৎপাদন করিতে পারে না—তাহাদিগকে বেশ সঙ্কুচিত হইয়া চলাফেরা করিতে হয়।

শ্যামসুন্দর বাবু শূন্য কক্ষে পায়চারী করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন—অধীর, অশান্ত, উত্তেজিত ললাটের স্বেদ-বিন্দু দুই গণ্ডের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। বাহিরের দিকে চাহিয়া হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন—বাহুদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইল—মুখখানা কঠিন হইয়া গেল—চক্ষুর কোণ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। তিনি আবার ঘুরিতে লাগিলেন—দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হইল—তাঁহার কণ্ঠ স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া উঠিল—চরম শাস্তি! খুন! খুন!

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেছে! মন্দ পবন ধীরে ধীরে বহিয়া গেল, বিহগকুল গাছের শাখায় শাখায় ডাকিয়া উঠিল।

শ্যামসুন্দর বাবু বারান্দায় আসিয়া অধীরকণ্ঠে ডাকিলেন, "মাণিক সর্দ্দার!"

মাণিক সর্দ্দার আভূমি প্রণত হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"এই ন্যাথ, নবীন পাইককে সঙ্গে নিয়ে আজই কায শেষ করে ফেল্‌বি।"

মাণিক সর্দ্দারের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল—চক্ষু দুইটা জ্যোতিঃহীন হইয়া গেল। সে শ্যামসুন্দর বাবুর হিংসা-দ্বেষ প্রদীপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্যামসুন্দর বাবু নিম্নস্বরে কহিলেন, "যা, আর দেরী করিসনে—নব্‌নেকে আমার কথা বলাই আছে। দু'শো টাকা বখশিশ্‌!"—বলিয়া তিনি পকেট হইতে দশটাকার পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া মাণিক সর্দ্দারের হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

ধরাবক্ষ নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—শান্ত স্তব্ধতায় বিলীন। পেচকের কর্কশ শব্দ, ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ রব সেই অন্ধকারের বীভৎসতা আরও বাড়াইয়া তুলিল—মাথার উপর নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

বাহির ঘরে একটা কোচের উপর ইন্দ্রকুমার উপবিষ্ট, সেজের আলোটা জ্বলিতেছিল। হঠাৎ শাড়ীর খসখস ও চুড়ীবালার টুং টাং শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমলা।—তাহার মসৃণ সুন্দর ললাটে কেমন একটা স্থির সঙ্কল্পের চিহ্ন—গণ্ডের আরক্তিম আভার মধ্যে কেমন যেন বিবর্ণ ভাব। একটা বিস্ময় ইন্দ্রকুমারের মুখ চক্ষে ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

সে ভাব তাহাদের বেশীক্ষণ রহিল না। অমলা অকস্মাৎ ইন্দ্রকুমারের ডান হাতটা তাহার কুসুমপেলব হাত দুইখানি দিয়া ধরিয়া ফেলিল—ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "পালাও ইন্দ্রদা, তোমায় খুন করতে লোক আসছে!"

চাঞ্চল্যে উত্তেজনায় ইন্দ্রকুমারের মাথাটার ভিতর যেন ঝন ঝন করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া সে অমলার তেজোদৃপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া বলিল, "খুন? খুন করতে আসছে?"

অমলা তেমনি কণ্ঠে বলিল, "জেনো ইন্দ্রদা, খুন শুধু তুমি একা নও। ঐ সঙ্গে আমাকেও—"

পদশব্দ ও অধীর নিশ্বাসে বাহিরটা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অমলা চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল—মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্বারের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "খুন কর তোমরা আগে আমাকে—যার জন্যে এত গোলমাল, এত অশান্তি।"

গুণ্ডাদের হস্তস্থিত তরবারী স্খলিত হইয়া গেল, তাহারা সভয়ে সসম্ভ্রমে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

৫

অশান্তি ও অসন্তোষে সারা গ্রামখানি যেন বিষাক্ত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, গণ্ডগোল। মানুষ যখন ধৈর্য্যের সীমারেখার বাহিরে গিয়া পড়ে, তখন তাহার শুভ অশুভ বিচার করিবার শক্তি হারাইয়া যায়।

রাত্রি দ্বিপ্রহর প্রায়—চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। বৃক্ষের শাখায় শাখায়, কুঞ্জবনের মাথায় মাথায় খদ্যোৎ বিকাশ হইয়া অন্ধকারের গাঢ়তা একটু হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল, কৃষ্ণা নবমীর চাঁদে তখনও পূর্ব্বাকাশ রাঙা হইয়া উঠে নাই।

জমিদার ভবন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন—চতুষ্পার্শ্বের বাড়ীগুলিরও সেই অবস্থা। অকস্মাৎ একটা হুড়মুড় শব্দে শ্যামসুন্দর বাবুর নিদ্রার ঘোর কাটিয়া গেল—তিনি চমকিয়া উঠিয়া শয্যার উপর বসিলেন। জানালা দরজার উপর দুড়ুম দুড়ুম শব্দে শিলাবৃষ্টির মত ইষ্টক রাশি পতিত হইতে লাগিল—বিদ্রোহীগণের বিকট চীৎকার অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করিয়া দিকে দিকে ছুটিয়া চলিল। মানকুমারী ব্যগ্র বাহুর স্নেহময় আবরণে তাঁহার অচলা অমলাকে ঘিরিয়া ধরিয়া, আলোর সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। ঝি রামার মা. বরদা, নিত্য উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। শ্যামসুন্দর বাবু উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া ভীত-কাতর নয়নে স্ত্রীর পানে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "সব বুঝি যায়! উপায় কি হবে এখন?"

মানকুমারী ইঙ্গিতে উর্দ্ধ দিকে দেখাইয়া দিয়া তেমনি ভাবে বসিয়া রহিলেন—তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

সদর দরজা ভাঙ্গিয়া গেল — বিকট শব্দ কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল।

শ্যামসুন্দর বাবু সভয়ে ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সব বুঝি যায়!" এই সময় একটা গভীর বেদনা কণ্ঠে লইয়া কে একজন ডাকিয়া উঠিল, "মেসো মশাই!"

শ্যামসুন্দর বাবু চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী প্রজাগণের সম্মুখে ইন্দ্রকুমার।

"যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত আছে—যতক্ষণ এই হাত দু'টো সম্পূর্ণ অক্ষম না হয়, ততক্ষণ কারও সাধ্য হ'বে না আপনাদের অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে;"—বলিতে বলিতে ইন্দ্রকুমার আলোর উজ্জ্বলতা বাড়াইয়া দিয়া বাহিরের দিক্‌কার জানালা খুলিয়া দিল। উন্মত্ত প্রজাগণ ইন্দ্রকুমারকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শ্যামসুন্দর বাবুর চক্ষু দিয়া হু হু করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আমার মান সম্মান, যা কিছু সবই আমার এই অমলা,—তাকে তোমায় সমর্পণ কর্‌লাম, তুমি রক্ষা কর।" বলিতে বলিতে অমলার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া ইন্দ্রকুমারের হস্তের মধ্যে পুরিয়া দিলেন।

সমস্ত গণ্ডগোল নিশীথিনীর নীরবতায় বিলীন হইল, শান্তির সুবাতাসে ভুবন ভরিয়া গেল।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক।

অজন্তা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অজন্তার শ্রেষ্ঠ সম্পৎ তাহার অপূর্ব্ব চারু চিত্র। সে চিত্র জগতে অতুলনীয়! একাধারে চিত্র, তক্ষণ শিল্প, ও স্থপতিসম্বন্ধীয় পরিকল্পনার অদ্ভুত মিলন, অদৃষ্টপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। এই চিত্রগুলির সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয়েরা ১৮১৯ খৃঃ প্রথম সংবাদ পান। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের খরচে মেজর গিল কতকগুলি প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা বিলাতে Crystal Palace এর দক্ষিণাংশ পুড়িয়া যাইবার সময় একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। গিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা নকল করিলেন, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাহা ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। পরে বোম্বে স্কুল অব আর্টের মিষ্টার গ্রিফিথস্‌ ও তাঁহার ছাত্রগণ ১৮৭২ হইতে ১৮৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিলিপি লন। সেগুলি লণ্ডন সাউথ কেন্‌সিংটনে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত ছিল। পরে মিসেস হেরিংহাম ও কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী চিত্রের নকল করেন। কয়েকজন প্রথিতযশা বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ কর—অজন্তা চিত্রাবলীর প্রতিলিপি লইয়াছেন। বম্বে স্কুল অব আর্টের দ্বারা চিত্রিত প্রতিলিপিতে প্রাণ নাই; তাহা হইতে অজন্তার শিল্পিগণের প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।—"The uninspired copies made by the Bombay School of Art, where the minds of the Indian students are still drugged with the dull academic formularies of Europe give no indication of the technical power and transcendent genius of the Ajanta painters."—Havell—Ancient & Medieval Architecture of India, p. 150.

। ও বিকটাকার চিত্রগুলি সেই উদ্দেশ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। অজন্তাতে ভাবচক্রের একটী ছবি ডাক্তার ওয়াডেল আবিষ্কার করেন। এই চক্র এক বিকটাকার কিম্ভূত-কিমাকার দৈত্যের কবলগত। এতৎসম্বন্ধে তিনি "Buddhism in Thibet" এবং "Lhasa and its Mysteries" নামক পুস্তকদ্বয়ে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিব্বতদেশে এই ভাবচক্র বিহার-গাত্রে চিত্রিত হয়। তাঁহার মত উদ্ধার করিয়া দিলাম—"...... The Wheel of ife when I first discovered it in a fresco in the ancient cave Temples of Ajanta and brought it to the notice of western readers. ...It looks like a large painted spoked plate held in the clutches of a monster and depicts in concrete symbolic form round the rim the chain of abstract conceptions upon which Buddha hung his doctrine of delivery from the cycle of rebirths and all their entailed misery. ..." —*Lhasa and it Mysteries*. pp, 222, 233; এবং আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত—জিজ্ঞাসা, পৃঃ ২১৩—২১৫; Rudyard Kipling প্রণীত Kim দ্রষ্টব্য।

ছোট ছোট ছেলেদের মন ভুলাইবার জন্য আজকালকার 'হাসি খুসি' ধরণের পুস্তকে দেখা যায়, হাতীর ধড়ে বকের গলা জুড়িয়া অথবা মুরগীর ধড়ে সাপের ফণা যোগ করিয়া কিংবা ঐরকমের উদ্ভট ছবি দিয়া ছেলেদের নাড়ী ছিঁড়িয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। এই ধরণের ছবি অজন্তায় বিরল নহে। মানবের অবয়বের সহিত পশুর অবয়ব সংযোজনে কিন্নর কিন্নরী ও অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। হুয়েনসাং যখন এদেশে আসেন, তখন তিনি উত্তরকুরুস্থিত অদ্ভুত জীব ও ভূত প্রেতের গল্প শোনেন। কোনও ভূতের পা দুইটা উল্টা, কাহারও ধড়ে মাথা নাই, সে মাথা আছে পেটটী দখল করিয়া, মানুষের মুখওয়ালা জীব মুরগীর ঠেঙ্গে ভর দিয়া বেড়াইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব গল্প লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতীচ্যের মনীষিগণের নিকট তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রায় প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের পিতামহীর গল্পে এইরূপ জীবের অপ্রাচুর্য্য নাই। এই বিকট বীভৎস কল্পনার ছবি এখানেও দেখা যায়। এই অদ্ভুত ছবিতেও শিল্পীর রচনা-কৌশল যথেষ্ট আছে। মানুষ চিরকাল গম্ভীর থাকে না, তাহার তরল দিকটাও আছে। কল্পনার এই খেয়ালের দিকটাও সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐহিক, পারমার্থিক; তরল, গম্ভীর; কোমল, কঠিন; করুণ, হাস্যোদ্দীপক; বিকট, বীভৎস—সর্ব্ববিধ রসের ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ অজন্তার শিল্প জগতের শিল্পরাজ্যে চক্রবর্ত্তীর আসন অধিকার করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে খ্যাতনামা ফরাসী পণ্ডিত ফুশে (A. Foucher) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে একসপ্তাহ, ১৯১৯ তে তিনসপ্তাহ ও ১৯২০ (জানুয়ারী—মার্চ্চ) আট সপ্তাহ অজন্তায় কাটাইয়া অতি যত্ন সহকারে চিত্রগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে সব চিত্রকে ঐতিহাসিক বলিয়া এ পর্য্যন্ত ধরা হইয়াছে, বাস্তবিক সেগুলি ঐতিহাসিক নয়, পরন্তু জাতকবর্ণিত আখ্যায়িকারই অঙ্কন। বিজয়সিংহের সিংহল আক্রমণ চিত্রিত হয় নাই; পরন্তু সিংহল জাতীয় একজন সদাগর রাক্ষস রাক্ষসী অধ্যুষিত লঙ্কাদ্বীপে আসিয়া কি বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে (সিংহলাবাদ,—বলাসক নামক জাতক কথা, * দিব্যাবদান ৩৬ ও মহাবস্তু দ্রষ্টব্য)। ফুশে বলিয়াছেন—

"Long ago it was realized that decoration of Ajanta is one of the most precious mines for the history of Indian civilization in its humblest as well as in its most sumptuous aspects. But having made myself clear on that point, I must declare that, to my regret, we must decidedly give up the hope cherished by many admirers of Ajanta, of

* Journal of the Hyderabad Archæological Society (919-20) pt 98.

finding there a sort of historical gallery telling us about the great events and showing us the great personages of the Indian past, the subject of all the depicted scenes is borrowed from one or other of the two great parts of the Buddhistic legend, the Jatakas and Buddha's career."—অতএব সব চিত্র গুলিই পরমার্থিক ; নিছক ঐহিক নহে। পারসীক দৌত্য সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, শুধু যদি এই ছবিটীতে মাত্র পারসীক-দিগের সাজসজ্জার নিদর্শন থাকিত, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত ; কিন্তু অন্যান্য বহু চিত্রে পারসীকগণকে দেখা যায়। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, অজন্তা ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে বেশী দূর নয়—ও তদানীন্তন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে পশ্চিম উপকূল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ফুশে বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধমূর্ত্তি-শিল্পতত্ত্ব ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিয়াছেন, বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং অনেকদিন ধরিয়া চিত্র-গুলিকে পরীক্ষা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার মত আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

বম্বে স্কুল অব্ আর্টের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সলোমন সাহেব Women of Ajanta নামক সুন্দর পুস্তকে অনেক বিষয় লিখিয়াছেন—পড়িবার উপযুক্ত। কি গভীর জ্ঞান, কি বিভিন্ন শিল্প-শিক্ষাই যে শিল্পীদের ছিল, তাহা চিত্রিত নর-নারীর নানা ভঙ্গী ও মুদ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। নন্দিকেশ্বর প্রণীত 'অভিনয়দর্পণে'র ইংরাজী অনুবাদ—Mirror of Gestures নামক পুস্তকের সূচনায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দ-কুমার স্বামী লিখিয়াছেন—"The Ajanta frescos seem to show unstudied gesture and spontaneous pose, but actually there is hardly a position of the hands or of the body which has not a recognised name and precise significance." পতাকা, শুকতুণ্ড, হংসাস্য প্রভৃতি মুদ্রায় চিত্রিত নারীকে দেখা যায়। (ভারতের নাট্যশাস্ত্র, শ্রীকুমার স্বামী প্রণীত শিল্পরত্ন ; চিত্রলক্ষণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্ দ্রষ্টব্য)।

Hyderabad Archæological Surveyর ১৯১৪—১৯১৫ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ডেনমার্কদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী Axel Jarlএর মন্তব্য ভারতীয়দের ভাল করিয়া পড়া উচিত। আমি স্থানে স্থানে তাহার উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

"The water-paintings in the rock-cut caves at Ajanta exhibit the classical art of of India. That is to say they represent the climax to which genuine Indian art has attained, and they show the way to be followed by Indian artists.…The painters were guided by a highly developed sense in their blending of colours with a view to the total impression to be produced.

"This technique which reaches its climax in a Bodhisatwa figure in Cave I bears a striking resemblance to that of Michael Angelo. If one placed a good photograph of this Buddhahead by the side of a photograph of a figure from the Capella Sixtina, one might be inclined to think, if no attention were paid to the different types of the figures, that they were painted by the same master.

"This perfect freedom in the painter's handling of the human body places Ajanta one thousand years ahead of all other paintings that we know.

"Great and thorough study of Nature and a patient and industrious training in tradition made it possible for the artist to transcend reality as he does so often to express what is the distinctive aim of all oriental art, the *soul*, the spiritual side of existence.

"India will get her Renaissance if she turns to Ajanta and goes to school there.

Whoever wants to serve the cause of pure Indian Art will find his masters here whose steps he must strive to go. He will do as they did, first of all to study Nature to master the secrets of form, volume and movement. But then he will go to Ajanta to cultivate his sense of deep and harmonious colours, of distinct and full composition, of expressive and pleasing lines, and last and not least, of genuiue Hindu figure and style. As he lives and studies among their works, he will catch something of their sacred fire, until in him he feels the heart vibrating while the hand draws a clear and bold outline. This is why those old Buddhist masterpieces so often leave upon the observer the impression of a prayer or a hymn of praise."

ভারতের সেই সমুন্নত শিল্প আর কি পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে না? ভারতীয় শিল্পীর নিকট বিদেশীয় শিল্পীর আহ্বান কি ব্যর্থ হইবে?

শ্রীকালীপদ মিত্র।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা

অর্দ্ধকুম্ভ উপলক্ষে এবার প্রয়াগে মাঘমেলার মহোৎসব দেখিবার জন্য অগ্রহায়ণ মাস হইতেই সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সময় যখন উপস্থিত হইল তখন পথের অসম্ভব জনতার কথা শুনিয়া সংকল্প ক্রমেই শিথিল হইয়া আ.সল। তারপর কলিকাতা হইতে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন লইয়া যখন গিরিডি ফিরিলাম, তখন প্রয়াগ যাইবার বাসনা মন হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইল। এদিকে কিন্তু এক উপসর্গ জুটিয়াছিল, ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা দিদিমাটি তাঁহার জীবনে পুণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য অর্দ্ধকুম্ভ যোগে প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিবার বাসনা লইয়া কলিকাতা হইতে আমার সঙ্গ লইয়াছিলেন। যেমন করিয়া হউক তাঁহাকে প্রয়াগে পৌঁছাইতেই হইবে। কিন্তু গিরিডি হইতে প্রয়াগ যাত্রী কাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না। একজন সহযাত্রিণী বরং জুটিয়া বাসলেন, তাঁহারও বয়স ষাটের নীচে নয়। অগত্যা ইহাঁদের লইয়া ও দুটি শিশু সন্তান লইয়া আমরা ২০শে মাঘ রবিবার সকালে প্রায় আটটার সময় গিরিডি হইতে রওনা হইয়া বেলা নয়টার সময় মধুপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এলাহাবাদ যাত্রী ট্রেণ অপেক্ষা করিতেছিল, গাড়ীতে স্থানও নাই। তবে ইণ্টার ক্লাশ মহিলাদিগের কামরায় যাত্রিণীর সংখ্যা বেশী ছিল না—সুতরাং সহজেই আমাদের সঙ্কুলান হইয়া গেল। যিনি আমাদের তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন তিনি অভয় দিলেন, মহিলাদিগের কম্পার্টমেণ্টে ইণ্টার ক্লাসে ভিড় কোথাও খুব বেশী হইবে না। আমরা আশ্বস্ত হইয়া বসিলাম।

সারাদিন এবং রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত একরকম মন্দ কাটিল না। যাত্রিণীদিগের সংখ্যা দুই পাঁচজন বাড়িতেও থাকে, আবার কমিয়াও যায়। থার্ডক্লাস যাত্রিণীর দল মধ্যে মধ্যে আসিয়া ট্রেণ ঘেরাও করিয়া ফেলিবামাত্র আমরা তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করি—দেড়া ভাড়া—উধার যাও। দিনের আলোর যতক্ষণ অস্তিত্ব ছিল ততক্ষণ এই বলিয়াই উহাদের ঠেকাইতেছিলাম,

কিন্তু রাত্রি হইবামাত্র আর ঠেকান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। কামরার স্থান বারো জনের জন্ত নির্দ্দিষ্ট—কিন্তু ক্রমে পনেরো জন যাত্রিণী সে স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তারপর হঠাৎ একটি ষ্টেশনে আট জন পুরুষ জোর করিয়া কামরার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আমরা সমকণ্ঠে তারস্বরে প্রতিবাদ করিতে লাগিলাম,—ইয়ে জেনানা কামরা—নিকাল যাও। তিনজন পর্দ্দা-নশীন দিল্লী-যাত্রিণী মুসলমান মহিলা ছিলেন, দুইজন কলিকাতা হইতে আসিতেছেন একজন বাঁকীপুর হইতে কামরায় ডুলি লাগাইয়া এবং তাহার উপর চারিদিক হইতে চাদর ঢাকা দিয়া বোরখায় মুখ ঢাকিয়া ট্রেণে উঠিয়াছেন। এমন কি সঙ্গী পুরুষগণ আমাদিগকে কিছুক্ষণের জন্ত কামরার সমস্ত জানালা গুলি একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন; সহ-যাত্রিণীগণ কিন্তু দমবন্ধ হইবার ভয়ে এ প্রস্তাব অনু-মোদন করেন নাই। একটি প্রৌঢ়া মহিলা বরং বলিয়া-ছিলেন, বহুজনের সঙ্গে চলিতে হইলে এ ভাবে আব্রু রক্ষা করা অসম্ভব, কেন না প্রতি ষ্টেশনেই তো ট্রেণ থামিবে; সঙ্গে সঙ্গে অমনি জানালাগুলি তুলিয়া দিয়া অসূর্য্যম্পশ্যার সম্মান রক্ষা মোটেই সম্ভব নয়। যাহা হউক, হঠাৎ কয়েকজন পুরুষ যাত্রীর আবির্ভাবে আমরা অত্যন্ত চকিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলাম। দিল্লী যাত্রিণী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অন্তঃপুরে একটি পাঁচবৎসরের বালকেরও প্রবেশ নিষেধ, এবং এমন কি একটি পুরুষ কুকুরও তাঁহাদের পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পায় না, আর কি না "বে-সমঝ" পুরুষগুলা ইহাঁদেরই সম্মুখে আসিয়া মান ইজ্জৎ এক কালে সব নষ্ট করিয়া দিতেছে! কিন্তু—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী—আমাদের প্রতিবাদের মধ্যেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

ট্রেণে নিতান্ত স্থানাভাব। আমরা সেই পুরুষগুলিকে বারবার তাহাদের এই বোধহীন কার্য্যের জন্ত যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলাম। বলিলাম, পরের ষ্টেশনে পুলিশ ডাকিয়া ধরাইয়া দিব। তাহারা কিন্তু নির্ব্বিকার—সহজ ভাবেই বলিল, "কাল কুম্ভযোগ—সুতরাং এই ট্রেণে আমাদিগকে প্রয়াগে পৌঁছাইতেই হইবে, কোনও কামরায় তিলার্দ্ধ স্থান না পাইয়া আমরা এই ট্রেণে উঠিতে বাধ্য হইয়াছি।" ব্যাপার সঙীন বুঝিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে মোগলসরাই ষ্টেশনে নামিয়া যাইবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলাম। শুনিয়াছিলাম, কলিকাতা হইতে স্পেশাল আসিতেছে, সেই ট্রেণে যাইবার পরামর্শ দিলাম, তাহারা তখন সম্মত হইল।

এদিকে রাত্রি একটার সময় মোগলসরাই ষ্টেশনে ট্রেণ থামিবামাত্র সে কি ব্যাপার—লাঠি সোঁটা লইয়া আবার একদল পুরুষ সেই কামরায় উঠিয়া পড়িল! দরজায় বিষম ধাকাধাক্কি চলিতে লাগিল। ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া সেদিকে চাহিয়া আছি, এ দিকে জানালা গলাইয়া ঝুপঝাপ ও "মাইয়া হো" শব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখি প্লাটফরম হইতে সঙ্গী পুরুষগণ বৃদ্ধা সঙ্গিনীগুলিকে পুঁটুলির মতো করিয়া জানালা দিয়া ভিতরে ফেলিয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে উপরে নীচে মানুষে ভর্ত্তি হইয়া গেল। মানুষের উপর মানুষ—এতটুকু দাঁড়াইবার স্থান নাই। তখন চীৎকার করিয়া বলিলাম, যাহারা ঢুকিয়াছ তাহারা এখন দ্বার রক্ষা কর, আর যেন কেহ না ঢুকিতে পায়। সৌভাগ্যের বিষয় সে লোকগুলি তৎপর হইয়া তখন লাঠি লইয়া দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। গণিয়া দেখিলাম, বারজন নির্দ্দিষ্ট আরোহীর স্থানে পঁয়তাল্লিশ জন আরোহী হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল হইলে সর্দ্দিগর্ম্মিতে মানুষ ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত। অন্ধকূপ হত্যার কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। এদিকে এক হস্ত পরিমিত স্থানে দুই বৃদ্ধা আমার শিশু কন্যাটিকে কোলে লইয়া ভয়ে কাঁপিতেছে।—পাঁচমিনিটের স্থানে কুড়ি মিনিট ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিল। এক ভীষণ কোলাহল কাণে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। বুঝিলাম, যাত্রীদের ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ির জন্ত এই ব্যাপার বাধিয়াছে। যাহাহউক, যখন ট্রেণ ছাড়িল তখন যাত্রীদের উন্মত্ত কণ্ঠস্বরে "জয় প্রয়াগ মহারাজ" শুনিয়া যেন কাঁপিয়া উঠিলাম!

এখনও গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সাত ঘণ্টা বাকী—

আইন কানুনের দোহাই এ ক্ষেত্রে কিছুই খাটিবে না, বৃত্যাগণ করিয়া এখনও অসংখ্য যাত্রী ষ্টেশনে ষ্টেশনে উঠিবার জন্ত ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিবে। যাহাহউক সভয়ে শুধু দেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্য ষ্টেশনে আবার থামিবামাত্র সেই একই ব্যাপার—জানালা গলিয়া লোক ঢুকিবার চেষ্টা করিবামাত্র এবারে যাত্রীরা খড়খড়ি তুলিয়া দিয়া সেই অতি শীতল শীতের রাত্রেও থামিয়া উঠিতে লাগিল। বসিবার এতটুকু স্থান নাই, লোকের পর লোক শুধু দাঁড়াইয়া আছে মাত্র, উন্মত্ত যাত্রীর দল তাহা দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান-শূন্ত ভাবে এই কামরায় উঠিতে চায়। যাহাহউক, এখন হইতে যখনই ষ্টেশনে ট্রেণ থামিতে লাগিল, খড়খড়ি তুলিয়া দিয়া আমরা আর নূতন যাত্রী দলের চড়াও হইতে অব্যাহতি পাইতে লাগিলাম।

এইভাবে কারারুদ্ধ অবস্থায় বেলা আটটার সময় ট্রেণ যখন এলাহাবাদ পৌঁছিল তখন খুকীর সে কি আনন্দ! প্রভাতের শান্ত শীতল নূতন বাতাস যেন সেই সর্ব্বদেহে নবীন স্পর্শ দিয়া নূতন জীবন সঞ্চার করিল। অগণ্য জন কোলাহলে ষ্টেশন ভরিয়া গেল। নামিবামাত্র শুনিলাম, প্রায় বিশ লক্ষেরও অধিক নর নারী আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় চারিদিকে তার করিয়া এলাহাবাদ যাত্রীর টিকিট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং স্পেশালও আর আসিবে না।

যাহাহউক আমাদের লইবার জন্ত ষ্টেশনে আত্মীয়গণ উপস্থিত ছিলেন এবং এই ভীড়ের মধ্যে অক্ষত দেহে পৌঁছিতে পারিব কি না ইহাও সন্দেহ করিতেছিলেন। আমাদিগকে নিরাপদ দেখিয়া তাঁহাদের সব সন্দেহ দূর হইল। আমরা বাড়ী আসিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া প্রয়াগ ক্ষেত্রে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। আজ এলাহাবাদের একাওয়ালাদের পোয়াবারো—সহর হইতে মোটর লরি, ঘোড়া গাড়ী, ট্রেণ, একা দলে দলে সদম্ভরে দৌড়িতেছে, তবু যাত্রীর আর শেষ নাই, সুতরাং চতুর্গুণ ভাড়া দিয়াও আজ নিস্তার নাই।

যাহা হউক আমরা মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার দেড় ক্রোশ ব্যাপী প্রশস্ত বক্ষে চড়া পড়িয়াছে, বর্ষায় দুইকূল প্লাবিনী জাহ্নবী আজ শীর্ণতোয়া—আজ তাঁর ধূ ধূ বক্ষে শুধু অসংখ্য নর নারীর মেলা—যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল অগণ্য নরমুণ্ড। দোকানী পসারী মেলার উপযুক্ত সাজসজ্জা লইয়া জমকাইয়া বসিয়াছে। কুটীরের পর কুটীর বাঁধা হইয়াছে, তাঁবুরও সীমা নাই। বাঁধের উপরে দুই দিকে পুলিশেরও ছাউনি পড়িয়াছে। মেলাস্থলে জলের কল, ডাকঘর, আলো সব কিছুরই উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় দশ হাজার নাগা ও সাধু সন্ন্যাসী এই যোগে স্নান করিতে আসিয়াছেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত দশনামীর দশ সম্প্রদায়ের কেহই অনুপস্থিত নাই। গিরি, পুরী, উদাসী, বৈরাগী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন আখড়া স্থাপিত হইয়াছে। উট, হাতী, ঘোড়া, প্রভৃতি বাহনও অসংখ্য। অনেক সাধু ট্রেণে মোটেই গতায়াত করেন না, তাঁহারা সুদূর দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে দল বল লইয়া বাহনে চড়িয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি ৭ই ফাল্গুন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, পূর্ণগ্রহণ উপলক্ষে কাশীধামে মহাস্নান হইবে, সুতরাং সাধুগণ সকলেই মেলা শেষে সেই স্থানেই যাত্রা করিবেন।

হরিদ্বার উজ্জয়িনী কুরুক্ষেত্র ও প্রয়াগ, এই চারিস্থানে কুম্ভযোগ হয়। প্রতি ছয় বৎসরে অর্দ্ধকুম্ভ, এবং বারবৎসরে পূর্ণযোগ অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগে স্নান সাধুগণ কামনা করিয়া থাকেন এবং সেই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ নর নারীও সাধুদর্শন কামনায় ও স্নানাদি করিবার জন্ত তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হইয়া থাকেন। এইটাই খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিজ্ঞাপন নাই, নিমন্ত্রণ নাই, প্রাকার্ড বিতরণ নাই, অথচ যেন উপযুক্ত সময়ে কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলির সঙ্কেতে নিয়মিত স্থানে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সম্মিলন হয়, দোকানী, পসারী কেহই আসিতে ত্রুটি করে না। শুনিলাম, চারিটি কুম্ভক্ষেত্রের মধ্যে প্রয়াগই প্রধান। এত বড়

বিস্তৃত মহাক্ষেত্র ভারতের আর কোনস্থানে নাই। সেজন্য বিশ লক্ষেরও অধিক যাত্রী সমাগম এই মহা-ক্ষেত্রকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। প্রায় এক সহস্র স্কুল বালক স্বেচ্ছাসেবক সাজিয়া সাধ্যমত স্নানার্থী যাত্রীদলকে সাহায্য করিতেছিল। আজ সকালে নয়টার পর হইতে অমাবস্যা যোগে কুম্ভস্নান আরম্ভ হইয়াছে, কাল ভোর হইতে সাধুদের স্নান আরম্ভ হইবে। সুতরাং ভিড়ের আর অন্ত নাই। আজ ভিড়ের মধ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক ও একটি শিশু পিষিয়া মরিয়া গেল। সকলেই সেই হতভাগ্যদের জন্ত হা হুতাশ করিতে লাগিল।

২২শে মাঘ মঙ্গলবার—কাল বেলা নয়টার পর হইতে আজ বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত অমাবস্যার স্থিতি কাল। আজ সর্ব্ব-প্রথমেই সাধু স্নান—সঙ্গমে প্রথমেই ইঁহাদের স্নান পর্ব্ব শেষ হইলে তবেই সাধারণের স্নানাধিকার বর্ত্তিবে। পদব্রজে, হস্তী আরোহণে, উষ্ট্র আরোহণে শত শত সাধু ভোর হইতেই স্নানে চলিয়াছেন। সর্ব্বত্রই পদাতিক বা অশ্বারোহী সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী শান্তি রক্ষার জন্ত ব্যস্ত। বড় বড় দলপতি মোহান্ত এবং আখড়াধারী সাধুদিগের সহচরগণ স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত সড়কী ও দণ্ড লইয়া আশ্চর্য্য ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে স্নানে চলিয়াছে। নাগা সন্ন্যাসী, বা সংসার বিরাগী সাধুদিগেরও এই প্রকার আশ্চর্য্য আড়ম্বর দেখিয়া আমার একজন সঙ্গিনী বলিয়া উঠিলেন, পুণ্য ক্ষেত্রে এ কি বিসদৃশ ব্যাপার!

একজন স্নানার্থী সাধু আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তিনি বলিলেন,ধর্ম্মের নামে এ আড়ম্বর অবহেলার বস্তু নয় মা, ভুল বুঝিও না। ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। সংসার বিরাগী,চির উদাসীন্ সন্ন্যাসী শঙ্করের সম্মুখে যুক্তপাণি নতজানু কুবেরের মূর্ত্তি দেখিয়াছ কি? ইহার যথার্থ অর্থ ইহাই যে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যই ঐ মহা ত্যাগীর চরণ ধূলায় সংলগ্ন। আমি বলিলাম, কিন্তু এই হাজার হাজার গৈরিক ধারীর মধ্যে যথার্থ সত্যকার ত্যাগী মহাপুরুষ কয়জন আছেন?

তিনি কহিলেন, "তা তো জানি না মা, তবে একথা খুব ঠিক যে, আসল আছে বলিয়াই মেকী চোখে পড়ে। এই পুণ্যভূমি মহাতীর্থ প্রয়াগ ক্ষেত্রে একদিন সর্ব্বত্যাগী প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু রূপসনাতনকে অপূর্ব্ব ভক্তি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। আরও অতীতের কথা, এই ক্ষেত্রে মহা মহর্ষিগণ অনেক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া, উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম সাধন করিয়া তাঁহাদের সাধনার বীজ এস্থানে বপন করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ যুগে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এই পুণ্যক্ষেত্রেই বসিয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য সমস্ত অকাতর চিত্তে দান করিয়া দীনতা অবলম্বন করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। আজ শুধু সেই কথাই স্মরণ করিয়া ধন্ত হও মা যে লক্ষ ভক্তের পদরেণু আজও এই পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রের প্রতি রেণুতে মিলিয়া আছে, এবং এই সমাগত বহু লক্ষ জনের একমুখী ভাব আজও এই পুণ্য ক্ষেত্রকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে।

এই সকল বিশ্বাসপূর্ণ কথাগুলি প্রাণে যেন অমৃতের স্পর্শ বুলাইল। ইচ্ছা স্বত্তেও ছোট শিশু লইয়া সেই জনতা ঠেলিয়া স্নান করা সাহসে কুলাইল না, বাড়ী ফিরিলাম। মাতামহীগণ তীরস্থ কুটীরেই রহিয়া গেলেন।

২৩শে মাঘ—আজ শরীর অসুস্থ বলিয়া আর বাড়ীর বাহির হইলাম না। এলাহাবাদে নূতন করিয়া দেখিবার কিছুই নাই, এবার শুধু কুম্ভমেলা দেখিবার জন্তই আগমন।

২৪শে মাঘ—আজ সকালে উঠিয়াই শুভ সংবাদ শুনিয়া আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল। মহাত্মাজীর আজ মুক্তি হইবে। কেহ বা বলিতেছে কাল হইবে। যাহা হউক শুনিবামাত্র মন প্রফুল্ল হইল। অবশ্য মহাত্মার ন্তায় সাধ-কের কাছে বাহিরের মুক্তির বিশেষ কিছু মূল্য নাই। অন্তর যাঁহার স্বাধীন, এজগতে তাহাকে বন্ধন করে কে? কিন্তু তাঁর মত শান্তির ও সত্যের উপাসককে শক্তির গর্ব্বে অন্ধ হইয়া যাহারা বন্দী করিয়াছে, তাহাদের হীনতা স্মরণ করিয়া সর্ব্ব মানবের অপমানে মনুষ্যত্ব যে শিহরিয়া উঠিতে চায়! এ গ্লানি তো শুধু জাতি বিশেষের নয়—এ যে সর্ব্ব মানবের গ্লানি—এ গ্লানি দূর হইলেই মঙ্গল।

আজ বেলা একটায় সময় মেলাস্থল একবার ভাল করিয়া দর্শন করিবার জন্ত গেলাম। আর ভিড় নাই, অনেক যাত্রী ইতিমধ্যে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। সাধুদিগের দুই তিনটি বড় বড় আখড়াও আজ প্রাতে বেনারস যাত্রা করিয়াছে। তবে দোকানী পসারীর আড়ম্বর তেমনিই আছে।

মেলাস্থলে ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সভা, আর্য্য সভা, ব্রহ্মবিদ্যা সভাও স্থান গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। খ্রীষ্টান মিশনরিও বাদ পড়েন নাই। একটি মিষ্টভাষিণী, হাস্তমুখী ইংরাজ মহিলা হিন্দি ও ইংরাজীতে সুসমাচার বিক্রয় করিতেছেন। এরূপ মেলা যে প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই

আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট খাড়া বাবাজীর নাম শুনিয়াছিলাম। তিনি দ্বারকায় বাস করেন। চৌদ্দ বৎসর যাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছে খাড়া বাবাজী। অন্তরের একাগ্র সাধনার পক্ষে এই কঠোর শারীরিক নির্য্যাতনের কোন বিশেষ মূল্য আছে আমার মত অজ্ঞ লোক তাহা না বুঝিলেও, কোন্ অদ্ভুত চিত্তবলে এতখানি সহিষ্ণুতা তাঁর আয়ত্ত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ত শ্রদ্ধা মিশ্রিত কৌতুহল আমার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণাম করিলাম। তাঁহার সম্মুখে একটি ঝোলা টাঙান ছিল, তিনি সেইটির উপর ভর দিয়াই শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করেন। বয়স পঞ্চাশের উপর হইলেও মুখশ্রী বেশ দীপ্তিপূর্ণ। তিনি সাদরে আমাদিগকে বসিতে বলিয়া আমার শিশুদেরও ঝুলি হইতে কিছু সন্দেশ বাহির করিয়া খাইতে দিলেন। এই সময় একজন ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের প্রচারক সেই স্থানে আসিয়া সাধুকে কহিলেন,—"বাবা-হঠ যোগকা ইৎনা ক্লেশ কাহে কো কর্‌তে হেঁ, শরীর কো ইৎনা ক্লেশ দেনা ধর্ম্ম নাহি হায়, সিধা রাস্তা ভী তো পড়া হায়।"

খাড়া বাবাজী যে উত্তর দিলেন তাহা লাগিল ভাল। তাঁহার উত্তর এই—গন্তব্য স্থান এক হইলেও অনন্ত যাত্রীর জন্ত অনন্ত পথ সম্মুখে পড়িয়া আছে। পর্ব্বত আরোহণ ব্যাপার সমতল ভূমিচারীর পক্ষে কষ্টকর বা দুঃসাধ্য হইলেও, পাহাড়ীয়ার পক্ষে বেশ সহজ ব্যাপার—সুতরাং কেমন করিয়া জানিলে যে, আমার কৃচ্ছ্রসাধন আমার পক্ষে সহজ হয় নাই? প্রভুর নামে আমার কোন কষ্ট নাই।

যাহা হউক—সভ্য মহাশয়ের হাতে কয়েক খানি পুস্তিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের পুস্তক? তিনি কহিলেন "সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু প্রচার করিতেছি। ভারতে বহু জাতি পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান হইয়া হিন্দু সমাজ হইতে অনাবশ্যক ভাবে বিচ্ছিন্ন রহিয়া রহিয়াছে। রাম নামে মহাপাপী শুদ্ধ হয় আর ইহারা শুদ্ধ হইবে না। আমরা শুদ্ধির মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ফিরিতেছি। ভারতবর্ষের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, এখন এই যে বিশাল সাধু সঙ্ঘের সমাজ—ইহারাই জাতির প্রাণ—ইহারা এখনও জাগেন নাই—ইহাঁদিগের নিকটই নিবেদন করিয়া ফিরিতেছি যে, সময় থাকিতে আপনারা দেশবাসীর কল্যাণে মনোযোগী হউন—সামাজিক কল্যাণ বিস্তৃত ভাবে না হইলে এ জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

অতঃপর আশাগিরি মাতাকে আমরা দেখিতে গেলাম। তাঁর বয়স আশীর কম হইবে না। এই সাধিকা নারী বহুবার বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। সমাগত সাধু সম্প্রদায় তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ভক্তি করেন দেখিলাম। তিনি আমাদিগকে সস্নেহে অভ্যর্থনা করিলেন এবং নিতান্ত শিশুসুলভ সরলতার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে লাগিলেন। ভক্তিমতী মীরাবাইয়ের পবিত্র কাহিনী তাঁহার মুখে নূতন করিয়া শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। ব্রাহ্ম ভক্ত স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ভক্তের ভগবদানুরক্তি, ও সর্ব্বজীবের প্রতি অগাধ প্রেমের কথা তিনি অত্যন্ত অনুরাগের সহিত আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেন।

২৯শে মাঘ—আজ আবার সঙ্গম ক্ষেত্রে স্নান করিতে

গেলাম—ভিড় অনেক কমিয়া গিয়াছে, অনেক আখড়ার আর চিহ্ন নাই, আমাদের সম্মুখেই প্রায় চারিশত সাধুর শোভা-যাত্রা দেখিলাম।

দোকানী পশারীরাও তাম্বু গুটাইতেছে।

আজ কল্পবাসের শেষ দিন—কল্পবাসিনী যাত্রীরা আজ পূজা, হোম প্রভৃতি যথাসাধ্য সমারোহে শেষ করিতেছেন। আমাদের কোনও আত্মীয়ও আজ সাধু ভোজনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, প্রসাদ দিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। স্নানের দক্ষিণা মিলিল তাল।

আজও ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে সেই খাকী বাবাজী ও আশাগিরি মাতারও সংবাদ জানিতে গেলাম। তাঁহারা আজ কাশী যাইতেছেন। আজ স্থানীয় সাধু নাগা বাবার দর্শন পাইলাম। বাঁধের উপরেই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বাস করিতেছেন। মাঘ মেলার এই একমাস সময় ভিন্ন অন্য সময়ে এস্থানে উলঙ্গ থাকা কোনও সাধু সন্ন্যাসীর পক্ষেও ইংরাজ সরকারের রাজবিধিতে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নাগাবাবার পক্ষে সরকার বাহাদুর সে নিয়ম রহিত করিয়াছেন। সাধুর প্রসন্ন সৌম্য মূর্ত্তি, নগ্নকায় শিশুর মত অনবদ্য সরল কান্তি—স্থানীয় সকলেই তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। অনেক উদ্ধত যুবক যাহারা সাধুমাত্রকেই "ভণ্ড" বলিয়া থাকে, তাহারাও দেখিলাম নাগাবাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমাদের এক সঙ্গী নাগাবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুবাদ অভ্রান্ত কি, না। ইহাতে তিনি কহিলেন—"মানবজীবনে প্রতি পদেই গুরুর আবশ্যক হয়, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যখন দীক্ষার আবশ্যক হয়, তখন গুরুকরণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান ও বিচারশীল হওয়া উচিত। যাহার প্রতি তোমার সম্যক্ শ্রদ্ধা আছে, যিনি গুণে, জ্ঞানে যথার্থই গরীয়ান্—এমন ব্যক্তিকে গুরুরূপে স্বীকার করিলে সর্ব্বাংশেই তোমার কল্যাণ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে যদি তোমার দ্বিধা বোধ হয়, তাহা হইলে ভগবানে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধ্যান ধারণায় অবহিত হইলেই কল্যাণ লাভ হইবে।"

নাগাবাবার এই সার কথাটি আমাদের মনে বড় লাগিল। অতঃপর আমরা বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া আর একবার সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গাবক্ষের অপূর্ব্ব দৃশ্যের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিপাত করিয়া বিদায় লইলাম। ঊর্ম্মিমালিনী যমুনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া কবির সেই গানটী বার বার মনে পড়িতে লাগিল—

"কতকাল ধরি বহিছ তুমি
নীল সলিলে যমুনে।"

শ্রীসরসীবালা বসু।

নীলকণ্ঠের ভাই ওলকণ্ঠ

(গল্প)

"কি বউ ঠাকরুণ!—এসেছ?"

মিত্রদের পূজার দালানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি শারদীয়া দেবী প্রতিমার পানে রহস্য-বিলোল নয়নে চাহিয়া এই কথা কয়টি বলিল। আগন্তুকের মুক্ত-কচ্ছ বেশ, গ্রীবালম্বী কেশ, কণ্ঠদেশে একগুচ্ছ তুলসী-মালা, হরিনামাঙ্কিত অনুন্নত ললাট।

আগন্তুক যখন দেবী-প্রতিমাকে সম্বোধন করিতেছিল তখন পুরোহিত বা কুলগুরু

সেখানে ছিলেন না, কেবল বাটীর কর্ত্তা বনমালী বাবু সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। আগন্তুকের এই ব্যবহারে তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ সম্বোধন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ণব প্রবর তখন গৌরব-প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, "উনি আমাদের ভাজ হন যে!"

কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি রকম?"

তখন বৈষ্ণববর ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন—"উনি শিব-পত্নী; আর হরি এবং হর এক আত্মা—সুতরাং ভ্রাতৃতুল্য—অতএব দুর্গা হরির ভ্রাতৃজায়া!"

কর্ত্তা বনমালীবাবুর বুদ্ধিবৃত্তি বোধ হয় তেমন ধারাল ছিল না; তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"উনি না হয় হরির ভ্রাতৃজায়া হলেন, কিন্তু আপনারও ভাজ হলেন কেমন করে?"

বৈষ্ণব একগাল বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভক্তে আর ভগবানে প্রভেদ আছে?"

কর্ত্তা বনমালীবাবু বৈষ্ণবের পদতলে প্রণত হইয়া বলিলেন, "আমার মূঢ়তা মাপ করবেন!" বৈষ্ণব প্রসন্নদৃষ্টিতে কর্ত্তার পানে চাহিয়া স্বীয় পদধূলি দান করিলেন।

তখন কর্ত্তা তাঁহাকে সযত্নে উপবেশন করাইয়া তাঁহার জন্য কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিতে উপরে গেলেন। গমনের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া শুধু বলিয়া গেলেন—"দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন—আমি এখনি আসছি একটু অপেক্ষা করুন।" বাবাজীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাঁহারি একটা বড় রকম সৎকারের আয়োজনে কর্ত্তা অন্দরে গেলেন। তখন তিনি তাঁহার কালিকাটি বাহির করিয়া বলিলেন—"ওহে—ছিলিমটা তৈরী করে দাও তো, ফুঁ-টুঁ দিও না যেন!"

সুযোগ মত বাবাজী কর্ত্তার নাম জানিয়া লইয়াছিলেন। তামাকু সেবনান্তে বাবাজী বলিলেন, "বনমালীর আমার সাধু সজ্জনের প্রতি খুব ভক্তি। প্রতিমাকে ভাজ বলাতে প্রথমটা একটু অসন্তোষ হয়েছিল, কিন্তু আমার ব্যাখ্যা শুনে একেবারে ভক্তিভরে পদধূলি নিয়ে কত বিনয় প্রকাশ কল্লে!—আহা, পুণ্যবান্ পিতামাতার সন্তান—ও! নামটিও কি সুন্দর—বনমালী! যাবার সময় কি ভক্তি বিনয় প্রকাশ কল্লে, দেখলে ত! আহা হবেনা কেন!—হরিহে!—গোবিন্দ বল মন!"

বাবাজীর প্রতি বনমালীবাবুর এরূপ ভক্তি দেখিয়া বাড়ীর লোকেরাও বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কারণ তাহারা তাঁহার এরূপ বৈষ্ণব ভক্তির পরিচয় ইতিপূর্ব্বে কখনও পায় নাই। তাহারা ভাবিল, বোধ হয় লোকটার কোন বিশেষ গুণের পরিচয় পাইয়াই কর্ত্তার মনে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। সুতরাং সকলের মনেই একটু ভক্তির সঞ্চার হইতেছিল।

সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবাজী আপনি কতবার বৃন্দাবন গেছেন?"

প্রশ্ন শুনিয়াই বৈষ্ণব প্রবরের চক্ষুর্দ্বয় ভক্তিবারি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ভাবগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"আহা বৃন্দাবন, বৃন্দাবন! আহা, মহাপ্রভুর লীলাস্থল …সেখানে যাওয়ার অহঙ্কার কি করতে আছে? হরি হে! গোবিন্দ বল মন!"—মহাপুরুষ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন!

এমন সময় বনমালীবাবু সেখানে উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাপ্রভু! একবার উপরে পদধূলি দিতে হবে!"

বাবাজীর মন সুখসেব্য খাদ্য সামগ্রীর কল্পনায় নৃত্য করিয়া উঠিল। সহাস্য বদনে বলিলেন "বনমালী, তুমি-যে এমনি একটা কি কর্ত্তে গিয়েছ তা বুঝতেই পেরেছিলুম! সাধু সজ্জনের প্রতি তোমার এ ভক্তি শ্রদ্ধা আশ্চর্য্য নয়! তা চল!" এই বলিয়া বৈষ্ণব, কর্ত্তার অনুগমন করিলেন।

ত্রিতলের এক সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে বৈষ্ণব প্রবর উপনীত হইলেন। কক্ষতলে কারুকার্য্য খচিত বিচিত্রবর্ণ সুকোমল আসন। সম্মুখে স্বর্ণপাত্রে রৌপ্যাবরণ মধ্যে খাদ্য সামগ্রী ভক্তপ্রবরের রসনা সংস্পর্শের আশায়

অবস্থিত! শ্বেতপ্রস্তর জলপাত্রে স্ফটিকস্বচ্ছ গঙ্গোদক বৈষ্ণবকুলতিলকের পূতকরস্পর্শাকাঙ্ক্ষায় তরলিত হৃদয়ে বিরাজমান! দ্বারদেশে ভৃত্য জলপূর্ণ ভৃঙ্গার হস্তে ভক্ত অতিথির চরণ প্রক্ষালন অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। ভক্তিরস সম্পৃক্ত ঐশ্বর্য্যের এরূপ অচিন্ত্য উৎসবময় সেবানুষ্ঠান দর্শনে বৈষ্ণবাবতংশ বিস্মিত চকিত হইয়া গেলেন। অতঃপর ভোজনের উদ্যোগ-পর্ব্ব শেষে, আসনগ্রহণ করিয়া হৃদয় মধ্যস্থ লীলায়িত অনন্ত রসের হেতুভূত পদার্থের উপভোগাশায় স্বর্ণ-পাত্রচুম্বী রৌপ্যাবরণ উন্মোচন করিলেন। হরি! হরি! সযত্ন পালিত কল্পনার কি শোচনীয় দুর্ব্বিষহ পরিণাম—ললিত আশার শিরে নিরাশার কি নির্ম্মম বজ্রাঘাত—বর্ষাবারি-বিধৌত শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রের কি চকিত সাহারা-সম্ভব উষর পরিণতি—প্রগাঢ় শান্ত ভক্তির ব্যঙ্গ বিকৃত কি অনলদাহী কুৎসিৎ মুখভঙ্গী!

বৈষ্ণবের মুখখানা মুহূর্ত্তে কালী হইয়া গেল। তথাপি সে ঈষৎ হাসিতে চেষ্টা করিয়া কর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "রহস্য করেছেন?"

কর্ত্তার মুখে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। তাঁহার মুখ আড়ষ্ট কঠিন—যেন ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি। তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "রহস্য করিনি!—খেতে হবে ওটা!"

কর্ত্তার মুখের সে ভীষণ কঠিন ভাবে, কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় বৈষ্ণবের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, "আজ্ঞে, কাঁচা ওল কি মানুষে খায়?"

কর্ত্তা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"মানুষে খায় না সত্য—কিন্তু তুমি না খাবে কেন?—তোমার ভাই শিব বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হতে পারেন, আর তুমি একটা কাঁচা ওল খেয়ে ওলকণ্ঠ হতে পার্ব্বে না?—খেতে হবে ওটা! খাও—বলচি।"—এই বলিয়া কর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইলেন!

ভক্তবর সে মূর্ত্তি দেখিয়া বধ্যভূমিনীত অজাশিশুর ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। কর্ত্তা সেই সদ্য-উত্তোলিত আরক্ত শূরণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে আবার বলিলেন "খাও—খাও বলচি—নয়ত এখনি তোমায় টুকরো টুকরো করে ফেলব—এখান থেকে চীৎকার করেও কেউ শুনতে পাবেনা—তোমার নিস্তার নেই—খাও বলচি!"

বৈষ্ণব বেচারা হতাশ ভাবে সেই ভীষণ পদার্থের পানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। কর্ত্তা তখন প্রহরীকে ডাকিলেন। পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে প্রহরী উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "তিন দফে উসকো খানে বোলো। নেহি খায় তো উসকো শির লেকর অন্দরকো কুয়েমে ফেক দেনা।"

সেই ভীমমূর্ত্তি প্রহরীহস্তে কোষমুক্ত শাণিত কৃপাণ দর্শনে মুক্তকচ্ছ বাবাজীর প্রাণবায়ু অর্দ্ধেক বহির্গত হইয়া গেল। তখন বেচারা শ্রীহরি স্মরিয়া সেই সদ্যোত্থিত ওলের একখণ্ড লইয়া বারদ্বয় চর্ব্বণমাত্র, তাহার হৃদয়ের ভূতপূর্ব্ব আনন্দরস ঘনীভূত হইয়া লালারূপে নির্গত হইতে লাগিল। বিষম কণ্ডূয়নে ভক্তপ্রবরের ওষ্ঠদ্বয় রক্তপুষ্ট জলৌকা সদৃশ হইয়া উঠিল।

তখন বেচারা "দোহাই ধর্ম্মবাপ রক্ষে কর।" বলিয়া কর্ত্তার চরণস্পর্শ করিতে আসিলে কর্ত্তা বাধা দিয়া তীব্র ব্যঙ্গভরে বলিলেন, "কেমন, ওলকণ্ঠ বাবাজী, আর মা দুর্গার দেওর হবে?"

বৈষ্ণব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "না বাবা, জন্মে আর ওকথা মুখে আনব না—তিনি আমার মা!"

কর্ত্তা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "চল্ ব্যাটা নীচে চল্—কাণমলা খেয়ে নাকেখৎ দিবি চল!"

বৈষ্ণব নীচে নামিতে পারিলে বাঁচে - বলিল, "চলুন বাবা এখনি চলুন!"

দৈবাৎ সেই সময় কক্ষের দ্বারদেশে কুলগুরু নকুলেশ্বর স্বর্ণপাত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "কি, কাঁচা ওল কেন?" তারপর বৈষ্ণবের স্ফীত-ওষ্ঠ শোভিত অপ্রসন্ন মুখমণ্ডল দেখিয়া বলিলেন "তোমার কি হয়েছে?"

মুহূর্ত্তের জন্য সংশে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তখন বৈষ্ণব নিজেই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া পরিশেষে বলিল—"আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েচে—এখন আমায় মুক্তি দিন।"

দেখিতে দেখিতে নকুলেশ্বরের সেই ঋষিতুল্য প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তিখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ব্যথিতকণ্ঠে শিষ্যের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ওকে ছেড়ে দাও!" তারপর তাঁর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "বনমালী, আজ বড় মর্ম্মাহত হলাম! পূজার তিনটে দিনও মনটাকে নির্ম্মল রাখতে পার না?"

বনমালীবাবু আনত মস্তকে বলিলেন, "দেবীর প্রতি এতটা বক্রণ সহ্য করতে পারলাম না প্রভু!"

নকুলেশ্বর বলিলেন, "বেশ তো! ভাল করে তাকে বুঝিয়ে বল্লেই ত হ'ত—তা না করে তুমি কিনা তার উপর এই ঘোর নিষ্ঠুরতা কল্লে—আহা কত কষ্ট হয়েচে ওর, তাব দেখি! যাও, ওকে সন্তুষ্ট করে, বেশ পরিতৃপ্ত করে আহার করিয়ে বিদায় দাও—আর তা না পার, বল আমি তোমার হয়ে ওর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি!"

কর্ত্তা বনমালীবাবু অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আর আমায় অপরাধী করবেন না,—আপনার আদেশ শিরোধার্য্য!"

নকুলেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ বাবা তাই কর! আর দেখ, দেবতার অপমান আর কেউই কর্ত্তে পারে না, অপমান যদি হয় তবে সে ভক্তের হাতেই! ভক্ত যদি খাঁটি থাকে, তবে এ বিশ্বের কেউ ই তাঁর অপমান কর্ত্তে পারে কি? -দেবতা মন্দিরে থাকেন না,—থাকেন ভক্তের মনে!"

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ।

কুহুস্বর

সম্মুখে প্রান্তর শ্যাম, দু'ধারে বনানী,
উজ্জ্বল তপন বিভা স্তব্ধ দ্বিপ্রহর দিবা
বায়ু বহে দিকে দিকে তপ্ত কর হানি।

স্নিগ্ধ ছায়ে বনপ্রান্তে শ্রান্তকায় ধেনু
নিমীলিয়া দু'নয়ন করে তৃণ রোমন্থন,
কভু দূরে বেজে উঠে রাখালের বেণু।

ধাবন কুর্দ্দন করি ফেরে বৎসগণ।
কভু চলে মৃদু পায়, চলিতে আছাড় খায়
স্নেহাতুরা জননী চিত্ত হরষে মগন।

অকস্মাৎ পূর্ণ করি নিখিল অম্বর
কোথা হতে সমীরণে ভেসে আসে এ বিজনে
হৃদয়-উন্মাদকর কুহু কুহু স্বর।

নয়ন ফিরাই—শূন্যে কারো দেখা নাই।
পঞ্চমে তুলিয়া তান পাগল করিয়া প্রাণ
কে কোথায় গাহে গান খুঁজিয়া না পাই।

কভু বা দক্ষিণে বামে, কভু বা পশ্চাতে,
কভু বা নিকটে দূরে, একই গান একই সুরে
কে গায়? ধরিতে তারে চাই হাতে হাতে।

আলোড়ি কাননভূমী দিগ্‌দিগন্তর
ভেদি নীল নভঃস্তর সেই কুহু কুহু স্বর
মথিয়া চলেছে কোথা ধরার অন্তর।

বসন্তের সহচর এল কি কোকিল
প্রাণ ভরা কুহু তানে বকাতে নিখিল প্রাণে
আনন্দ সঙ্গীত ধারা চির অনাবিল?

কোথায় লুকায়ে থাকে নয়নে না দেখি।
পত্র মাঝে অঙ্গ ঢাকি কুহরিছে থাকি থাকি,
সত্য কি বিহগ? কিংবা স্বর শুধু একি?

জীবনে নয়নে তারে কভু দেখি নাই।
স্বর মাত্র অনুসরি কত বন পথ ধরি
খুঁজিয়াছি, এখনও খুঁজিয়া বেড়াই।

পাই নাই, পাইব না এ জীবনে আর।
নাহি বর্ণ নাহি রূপ, কে অদৃশ্য, কে অরূপ
একটি অখণ্ড গীতি গাহে অনিবার।

বুঝিয়াছি এ বিরাট রহস্য ব্যাপার।
সৃজনের দিন হতে ভাসিয়া কালের স্রোতে
আসিছে এ গান কোন্ আত্মীয় আত্মার!

মাসে মাসে দিশে দিশে দেশে দেশান্তরে
অনুসরি কাল প্রথা ভাসিয়া চলিছে কোথা
যুগ হতে যুগান্তরে জন্ম জন্মান্তরে।

বৃথাই সন্ধান তার লইবারে যাই।
জ্ঞানের সীমায় বন্দী— সদাই খুঁজি অন্ধি সন্ধি
কার্য্যকারণের ফলে কিছুই না পাই।

চিন্তায় অধীর চিত্ত ক্লান্ত হয়ে আসে।
অবসাদ ধীরে ধীরে চারিদিক আসে ঘিরে
স্বপ্নসম এ জগৎ আঁখি 'পরে ভাসে।

এক কোণে নিরজনে স্নিগ্ধ ছায়ে ব'সে
হেরি মাঠ করে ধূ ধূ অলস নয়ন শুধু
তারে তারে তন্দ্রা আসি পড়িতেছে খসে।

আম্র মুকুলের গন্ধে দিক্ মাতোয়ারা,
দূরে দূরে চরে ধেনু পবন উড়ায়ে রেণু
পলে পলে করিতেছে চিত্ত দিশাহারা।

চৌদিকে অনলকণা বর্ষে দ্বিপ্রহর।
কেবলি পশিছে কাণে একটা সঙ্গীত তানে
অনাদি কালের সাক্ষী কুহু কুহু স্বর।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার দেবশর্ম্মা।

ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী

[৩]

একই বস্তু, বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কে আসিয়া 'অন্য'রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে বস্তুটী আপনার স্বরূপকে হারায় না। সত্তা হারাইয়া সে, অন্যরূপ ধারণ করে না। পুত্রের সম্পর্কে আমি পিতা; পত্নীর সম্পর্কে আমি স্বামী; আবার আমার পিতার সম্পর্কে আমিই পুত্র। একই আমি—বিবিধ ব্যক্তির সম্পর্কে পড়িয়া, নানা রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকি। আমার যেটী প্রকৃতই আমিত্ব, আমার যেটী প্রকৃত স্বরূপ—তাহার কি বাস্তবিক-পক্ষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে? এই যে আমি নানা ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছি, ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইতেছি; এই যে আমি কখনও পিতা, কাহারও স্বামী, কখনও বা পুত্র রূপে নানা অবস্থা, নানা রূপ, নানা সম্বন্ধে পরিচিত হইতেছি;—ইহাতে কি আমার স্বরূপটী, আমার আমিত্বটী, আমার সত্তাটী বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে? এই সকল বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপ

ও বিবিধ অবস্থান্তরের মধ্যে—আমি যে-আমি, সেই আমি-ই কি রহিয়া যাইতেছি না? আমার যদি কোন স্বরূপ না থাকে, আমার যদি কোন স্থির অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা না থাকে, তাহা হইলে কে, নানা বস্তুর সংসর্গে আসিয়া, এই সকল বিবিধ অবস্থান্তর ধারণ করিবে? কাহার তাহা হইলে নানা বস্তু বা নানা ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক হইবে? সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির স্বরূপটী যখন, অন্য একটা বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সম্পর্কে আইসে, তখনই সেই স্বরূপ হইতে নানাবিধ অবস্থার উদ্রেক বা অভিব্যক্তি হইয়া পড়ে। অতএব এই যে আমার অবস্থান্তর-গুলি, এই যে আমার পর-রূপ গ্রহণ,—ইহা বাহ্য বস্তুর সহিত সম্পর্কের ফল। সুতরাং, বহ্যবস্তুর উপরেই এই সকল অবস্থান্তর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু আমার স্বরূপটী—কাহারও উপরে নির্ভর করে না। সুতরাং আমার পর-রূপটা —আমার অবস্থান্তরটা, নিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল। কেন না, যে বস্তুর সঙ্গে যখন আমার যেরূপ সম্বন্ধ হইবে, আমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে; কিন্তু আমার যেটী স্বরূপ, সেটী অপরিবর্ত্তনীয়, স্থির। এই পর-রূপের মধ্য দিয়াই স্বরূপটী নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। আমার দোষ এই যে, আমি আমার পর-রূপটাকে স্বরূপের স্থলাভিষিক্ত করিয়া লই। পর-রূপ ছাড়া আমার যে একটা স্বরূপ আছে; একথা ভুলিয়া যাই।

বাহ্য বস্তুর সম্পর্কে পড়িয়া আমরা, কতপ্রকার শব্দ-স্পর্শাদির জ্ঞান, হর্ষ-শোকাদির অনুভূতি লাভ করিতেছি। যাহার সঙ্গে সম্পর্ক হইবে, সেটী যে প্রকারের,—আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়াদির অনুভূতিও তদনুরূপ হইবে। বৃক্ষের সম্পর্কে আসিলে আমাদিগের চিত্তে বৃক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হয়; কোন দুঃখজনক পদার্থের সম্পর্কে আসিলে, আমার দুঃখানুভূতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু এই সকল জ্ঞান-ক্রিয়া অনুভূতির অন্তরালে, আমার আপন স্বরূপটী অবিকৃত রহিয়া যায়। কেবল যে ইহা অবিকৃত থাকে তাহা নহে; ইহা ঐ সকলের মধ্য দিয়াই আপন স্বরূপের পরিচয় ফুটাইয়া তোলে। এইরূপে, আত্মা যে—জ্ঞান-স্বরূপ সামর্থ্য-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ—তাহার আমরা পরিচয় পাই। কেন না, বৃক্ষ-জ্ঞান, দুঃখজ্ঞান, শব্দ স্পর্শাদির সহস্র প্রকার জ্ঞানের মধ্য দিয়া, আত্মা যে জ্ঞান স্বরূপ—আত্মার সেই অবিকৃত জ্ঞানটী—পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সহস্র প্রকার সুখ-দুঃখ, হর্ষ বিষাদের মধ্য দিয়া, আত্মার অবিকৃত আনন্দ-স্বরূপটী ভাসিয়া উঠে। সহস্র প্রকারের ক্রিয়ার মধ্য দিয়া, আত্মার সামর্থ্য ফুটিয়া উঠে। বাহ্য-বস্তুর সহিত সম্পর্কের সময়েই, এই প্রকারে, আমরা আত্মার স্বরূপটীর পরিচয় পাইয়া থাকি। ব্রহ্মবস্তুও,—নাম-রূপের সহস্র প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, আপনার অপরিবর্ত্তনীয়, স্থির স্বরূপটীকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। সুতরাং নাম-রূপাদি তাবৎ বস্তুই, পরমাত্মার স্বরূপের অভিব্যক্তি বা পরিচায়ক ব্যতীত, উহারা 'অন্য' কোন বস্তু নহে।

অজ্ঞ লোকেরাই মনে করে যে, আমার অবস্থান্তর বা পর-রূপটাই আমার সর্ব্বস্ব। উহারা ভাবে যে, স্বরূপটী যেন আপনাকে হারাইয়াই, পর-রূপ গ্রহণ করিয়া, 'অন্য' একটা কিছু হইয়া উঠিয়াছে। এই-রূপে অজ্ঞ লোকেরা, জগৎকেই ধরিয়া থাকে এবং জগতের ধন-জন বিষয় বিভবে একান্ত মত্ত হইয়া অবস্থান করে। ইহাদের নিকটে ব্রহ্ম, আবৃত হইয়া পড়েন; 'অন্য' একটা বস্তু (জগৎ) যেন ব্রহ্মকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ বুঝেন যে, ব্রহ্মকে আবৃত করিবে কাহার সাধ্য? জগৎ—ব্রহ্মের আবরক ত নহেই; জগৎ—তাঁহার পরিচয়ের ক্ষেত্র; জগৎ তাঁহারি সংবাদ বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে; সুতরাং, অজ্ঞ লোকের দৃষ্টি ও তত্ত্বদর্শি-গণের দৃষ্টির মধ্যে, এই প্রকারে আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়া পড়ে।

ভাষ্যকার, অজ্ঞের দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখিবার

নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তিনি, পরমার্থ-দৃষ্টি হইতেই জগৎকে দেখিতে হইবে, ইহারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞ, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে, জগৎ একটা স্বতন্ত্র বস্তু, 'অন্য' বস্তু। সুতরাং ব্রহ্ম একেবারে আবৃত হইয়া পড়েন। সংসারের ধনজন, কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতিই নিয়ত চক্ষুর উপরে ভাসিতে থাকে। অন্তরালে যে ব্রহ্ম আছেন, সে তত্ত্বটী একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন, এই নাম-রূপ, শব্দস্পর্শাদিময় বস্তুরাশিই একমাত্র বস্তু হইয়া উঠে। ইহাই অজ্ঞ লোকের দৃষ্টি। বেদান্ত দর্শনে ইহারই নাম, জগতের 'ব্যবহারিক সত্তা'। কিন্তু ভাষ্যকার, তত্ত্বদর্শীর চক্ষু লইয়া জগৎকে দেখিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। এই দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখিতে শিখিলে তখন আর জগতের কোন বস্তুকেই স্বাধীন, স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুভব থাকে না। এক ব্রহ্ম-স্বরূপই সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতে থাকে। জগতের তাবৎ বস্তু ব্রহ্মেরই বিকাশ—এই প্রকার অনুভূতি তখন প্রবল হইয়া উঠে। কোন বস্তুকেই তখন আর বস্তু বলিয়া বোধ করিতে পারা যায় না। তখন সর্ব্বত্র কেবল ব্রহ্মেরই মহিমা, ব্রহ্মেরই অনন্ত ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মেরই বিভূতি চিত্তে ফুটিতে আরম্ভ করে। বেদান্তের ভাষায় ইহাকে "পারমার্থিক দৃষ্টি" বলে। এই দৃষ্টিতে জগৎ উড়িয়া যায় না; জগতের কোন বস্তুই অলীক অসত্য হইয়া * উঠে না। থাকে সমস্তই। কেবল দৃষ্টিটা অন্যরূপ হইয়া উঠে। সর্ব্বত্র সকল বস্তুই তখন, সেই পরম সুন্দর পরমেশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক হইয়া উঠে। কোন বস্তুরই স্বাতন্ত্র্য-বোধ থাকে না। সকলের মধ্যে, সেই অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্য-লহরী, একে একে, স্তরে স্তরে, ফুটাইয়া তোলে। জগৎ তখন ব্রহ্মের অভিব্যক্তির ক্ষেত্ররূপে দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

ব্রহ্ম এবং তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত এই জগৎ—এই উভয়ের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ? প্রিয় পাঠক, প্রিয় পাঠিকা, আপনারা অবশ্যই দেখিতেছেন যে, বেদ ও বেদান্ত, তত্ত্বদর্শীর চক্ষুদ্বারাই, সেই সম্বন্ধের নির্ণয় করিয়াছেন। সে সম্বন্ধ কিরূপ? শঙ্কর ইহার নাম দিয়াছেন—'অনন্য' সম্বন্ধ। আপনারা আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছেন যে, অজ্ঞ সাধারণ লোকে জগৎকে একটা অন্য 'বস্তু' বলিয়া, একটা স্বাধীন বস্তু বলিয়াই ধরিয়া লয়। ভাষ্যকার বলিয়া দিয়াছেন যে, এ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে 'অন্য' কিছু বলিয়া মনে করা নিতান্তই ভ্রম। ইহা অন্য কিছু নহে; ইহা ব্রহ্ম হইতে 'অনন্য';—অর্থাৎ এই জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করিও না; ইহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত 'অন্য' কোন বস্তু নহে। ইহা ব্রহ্ম বস্তুরই পরিচায়ক; কেন না, ইহা ব্রহ্ম স্বরূপেরই আংশিক অভিব্যক্তি। তবেই জগতের স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতেছে না; উহা কোন 'অন্য' বস্তু হইতেছে না। উহা ব্রহ্মেরই বিকাশ, তাঁহারই অভিব্যক্তি, তাঁহারই পরিচায়ক। যে বস্তু যাহার পরিচায়ক, সে বস্তু কি তাহার আবরক হইতে পারে? যে, স্বরূপের পরিচয় বহন করিয়া আসিতেছে, সে, সেই স্বরূপের আচ্ছাদনকারী হইবে কি প্রকারে?

ভাষ্যকার এই জন্যই বলিয়াছেন—

"তৎ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেন বিনিযুজ্যতে"।

ব্রহ্মই আমাদের জ্ঞেয় বস্তু; জগৎ আমাদের জ্ঞেয় বস্তু নহে। জগৎ, সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তুর দর্শনের 'উপায়' মাত্র। ঋগ্বেদ জগৎকে এই রূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদান্তের ভাষ্যকারও সেই রূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগৎ,—ব্রহ্ম দর্শনের, ব্রহ্ম জ্ঞানের উপায়; উহা 'অন্য' কোন বস্তু নহে। অতএব তত্ত্বদর্শীর নেত্র লইয়া, জগৎকে সর্ব্বদাই উপায়-রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠক-পাঠিকা দেখিবেন, এই প্রকারে গ্রহণ করিলে, অদ্বয়-তত্ত্বের কোনই ক্ষতি হইতে পারিল না। জগৎ—ব্রহ্মের আবরক হইল না; জগৎ

* ইহা না বুঝিয়া লোকে মনে করে, বেদান্তদর্শন জগৎকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

বলিয়া 'অন্য' একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইল না। সুতরাং উহা ব্রহ্মের একত্বের বিরোধী হইতে পারিল না।

জগৎকে যদি, তোমার বুদ্ধির দোষে, কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া বোধ কর, তবেই উহার সঙ্গে ব্রহ্মের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। কেন না, তখন ব্রহ্ম একটা বস্তু, আবার জগৎ আর একটা বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু জগৎকে তাঁহার বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিলে, জগৎ 'অনন্ত' * হইয়া উঠিল; জগৎ ব্রহ্মেরই নিতান্ত অনুগত হইল; তাঁহারই একান্ত অন্তর্ভুক্ত হইল। সুতরাং দ্বৈত (Dualism) রহিল না; বিরোধ থাকিল না। বেদান্তের ইহাই সিদ্ধান্ত; এবং এই সিদ্ধান্তটী শঙ্কর হইতেই গৃহীত।

একটী বৃক্ষ বীজের, পর-পর-উৎপন্ন অঙ্কুরাদি অবস্থাগুলি সেই এক বৃক্ষেরই পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং উহার কোন অবস্থাকেই বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না। কেন না, সকল অবস্থার মধ্য দিয়াই বৃক্ষটী, আপনাকে বিকাশিত করিতেছে। বীজাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে শেষ ফল-পুষ্পাদি অবস্থা পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে; তবে তুমি বৃক্ষটীর পূর্ণ বিকাশ বুঝিতে পারিবে। এই প্রকারে, ব্রহ্মই যখন আপনাকে অভিব্যক্ত জগতের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত, সকল অবস্থার মধ্য দিয়া, আত্ম-বিকাশ করিয়া চলিয়াছেন, তখন কোন অবস্থাকেই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারা যায় না। অথচ আমরা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ছাঁটিয়া লইয়াই,—অবস্থান্তর গুলি ধরিয়া নিয়ত ব্যাপৃত থাকি। নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া, 'ক্রমোর্দ্ধভাবে', জগতের তাবৎ বস্তুই, তাঁহারই পরিচয় দিতেছে; তাঁহারই রূপকে ফুটাইতেছে, তিনিই উহাদের মধ্য দিয়া আত্ম বিকাশ করিতেছেন। জগৎ এইরূপে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হইতেছে। মানবের মধ্যেও, ব্রহ্মের পূর্ণবিকাশ হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং জীবকেও, তাঁহা হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না। জীবের মধ্য দিয়া ব্রহ্মই আপন ঐশ্বর্য্যের বিকাশ করিতেছেন; জীব স্বতন্ত্র, স্বাধীন, 'অন্ত' বস্তু হইবে কিরূপে? জীব, সেই পূর্ণতা প্রাপ্তির নিমিত্তই ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে জীবকে পৃথক্ করিয়া লইবে কি প্রকারে? ইহাই বেদান্তের বিস্ময়-কর সিদ্ধান্ত। ইহাতে ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের বা জীবের কোন বিরোধ হইতেছে না; আবার উভয়ে এক বা অভিন্নও হইতেছে না। ব্রহ্মের অদ্বৈত-ভাবেরও কোনরূপ হানি হইতেছে না।

কিন্তু এই বিরোধ পরিহার সম্বন্ধে শঙ্কর নিজে কি বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আরো কিছু বলিবার বাকী আছে। আগামী বারে তাহা বলিব।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

* পাঠক-পাঠিকা লক্ষ্য করিবেন, 'অনন্ত' বলাতে, ব্রহ্ম এবং জগৎ উভয়ে একত্ব হইতেছে না। "ন তু ঐক্যাভিপ্রায়েণ"—আনন্দগিরি টীকা।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার ইতিহাস *

আজকাল যাঁহারা বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস আলোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁহাদের দীক্ষাগুরু। ১২৮৭ সালের "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমচন্দ্র যে লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।"—

এই প্রাণস্পর্শী কথা পড়িয়া অনেক কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী বাঙ্গালী যুবকের মন ইতিহাসের দিকে ঘুরিয়াছে। সুতরাং এই গুরুপাটে ইতিহাস আলোচনার নায়কতা করিতে আহূত হইয়া আমি জীবন ধন্য এবং এ পর্য্যন্ত যেটুকু পরিশ্রম করিয়াছি তাহা সফল জ্ঞান করিতেছি।

সাহিত্যসেবার সূত্রপাত হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনায় কিরূপ নিবিষ্ট ছিলেন, "দুর্গেশনন্দিনী"তে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। "মৃণালিনী" বাঙ্গালার ইতিহাস-মূলক উপন্যাস। তার পর "বঙ্গদর্শনে" ধারাবাহিক রূপে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে।

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯৩ সালে (মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে) প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড "বিবিধ প্রবন্ধে" পুনর্মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বেশী নহে। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুরে পথ খুলিয়া দিলে, দুর্গম কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসর বশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী হউক আর না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোণা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যাহাই লিখুক না কেন—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন বার্ত্তা ত শুনিলাম না।"

এই বিজ্ঞাপন লেখার পর আরও ৩০ বৎসর কাল চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র "মজুরদারী" করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের যে পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমন বার্ত্তা আমরাও এখনও শুনিতে পাই নাই। কিন্তু বিগত ১৫।২০ বৎসর যাবৎ সেনাসংগ্রহের রসদ সংগ্রহের, হাতিয়ার সংগ্রহের সোরগোল খুব শোনা যাইতেছে। এই কার্য্যে অনেক কর্মী লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন; উপকরণ সংগ্রহও বেশ হইতেছে। সংগৃহীত উপকরণের মধ্যে কুমার শরৎকুমার রায়ের অকাতর অর্থব্যয়ে এবং অসাধারণ পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত, রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা আজ

* কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে (২রা আষাঢ়, ১৩৩০) ইতিহাস-শাখায় বিবৃত।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই মহানন্দে মাতৃপদে কনকাঞ্জলি বলিয়া অভিনন্দিত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাসের যে পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পরিশ্রমের ফলে তাহা কোন্ দিকে আর কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে আজ তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিব।

(১) বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব।

ইতিহাসের গোড়ার কথা জাতিতত্ত্ব (Ethnology)। যে জনগণের ইতিহাস আলোচিত হইবে সেই জনগণ কোন্ কোন্ বিভিন্ন গণের মিশ্রণজাত, তাহারা বংশানুক্রমে কিরূপ আকৃতির এবং কিরূপ প্রকৃতির উত্তরাধিকারী, তাহার আলোচনা ইতিহাসের প্রথমভাগের বিষয়। ১২৮০ সাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার জাতিতত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করেন। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' নামক দু'টি প্রস্তাব যথাক্রমে ১২৮০ও ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তার পর আবার ১২৮৭ও ১২৮৮ সালের 'বঙ্গদর্শনে' 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' শীর্ষক আরও সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র জাতিতত্ত্ব-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পরে জাতিতত্ত্ব-আলোচনা রীতির নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং অনেক উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিতত্ত্ব বিষয়ক রচনার বিচার করিতে হইলে এখনকার হিসাবে না করিয়া সমসময়ের হিসাবে করিলেই সুবিচার হইতে পারে। জাতিতত্ত্বের একটা প্রধান কাজ মানব সমাজকে বিভিন্ন বর্ণে বা জাতিতে (race) বিভাগ করা। সমগ্র মানবজাতি সম্ভবতঃ একই পরিবারভুক্ত, অর্থাৎ একই কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত এবং বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্থানমাহাত্ম্যে এবং অন্যান্য কারণে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন শাখার মানুষের মধ্যে প্রকৃতিতে নানা প্রকার ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রকারে উৎপন্ন বিভিন্ন জাতির মানুষ আবার ঘটনা চক্রে পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় নূতন নূতন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এই মেশামিশির ফলে আদিম জাতির বা বর্ণের মানুষ অমিশ্র অবস্থায় কোথাও প্রায় দেখা যায় না। মানুষের এখনকার সকল বিভাগই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ণসঙ্কর। সুসভ্য জাতির সঙ্করত্ব বেশী অধিকতর। কেননা বিভিন্ন স্থানে মানবের হিতকর বিভিন্ন পদার্থের রীতি নীতির আবিষ্কারক বিভিন্ন জাতির মিলন ও মিশ্রণের ফলে সভ্যতার উৎকর্ষ। বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী মানবসঙ্ঘনিচয়ের পরস্পরের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের ঘনিষ্ঠতামূলক জাতি বিভাগ জাতি-বিজ্ঞানের (Ethnology) উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এরূপ জাতিবিভাগ করা হইত ভাষার বিভাগ অনুসারে। ভাষার হিসাবে তৎকালে পণ্ডিতেরা আর্য্য এবং অনার্য্য-ভেদ স্বীকার করিতেন। আবার তৎকালে যাঁহারা বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন তাঁহারা আদিশূর কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টিযাগ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; রাজেন্দ্রলাল মিত্রও বিশ্বাস করিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রও বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত কুলীন ব্রাহ্মণ বংশীয় ঐতিহাসিকেরাও আর সে কথা ঐ আকারে অবিচারে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন।* তাহার

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সম সময়ের (৬০৭—৬০৮ খৃষ্টাব্দ) কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মার এক প্রস্থ তাম্রশাসনের প্রথম তিনখানি ফলক শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত নিধনপুরে আবিষ্কৃত হয়, এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক তাহা এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা পত্রের দ্বাদশ ভাগে (৬৫-৭৬ পৃঃ) প্রকাশিত হয়। উক্ত তাম্রশাসনের এই অংশে ভাস্করবর্ম্মার বংশপ্রশস্তি ছিল এবং ভাস্করবর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটী) সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবারে (রাজধানীতে) এই শাসন সম্পাদন করিতেছেন এই পর্য্যন্ত ছিল। এই তাম্রশাসনের আরও দুইখানি ফলক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ফলকদ্বয়

কারণ, একপক্ষে ইদানীং কুল পঞ্জিকার আদিশূর সম্বন্ধীয় অংশে যেমন জাল ভেজাল ধরা পড়িয়াছে, তখন তেমন সন্দেহের কারণ ছিল না। অপর পক্ষে, এখন ইতিহাস লেখকেরা নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-মূলক জনশ্রুতি ছাড়া অন্য কোন কথা ঐতিহাসিক তথ্য অথবা প্রাচীন ঘটনার অবিকৃত বিবরণ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু দেশ কাল পাত্র হিসাবে বিচার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গলার জাতিতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধন উৎকৃষ্ট পুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষায় জাতিতত্ত্বের আলোচনারও গুরু; কেন না তাঁহার প্রথম প্রস্তাব লালমোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ নির্ণয়" গ্রন্থের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এ দেশে জাতিতত্ত্ব আলোচনার নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। রিজ্‌লি সাহেব ভাষা ছাড়িয়া মস্তকের, নাসিকার, এবং দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণের ভেদানুসারে জাতি বিভাগ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এবং ভাষাতন্ত্রী জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আর্য্যজাতীয় বা আর্য্যবংশীয় আক্রমণকারীরা উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিলেন। রিজ্‌লি সাহেব হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণাদি জাতির এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি জাতির মস্তক মাপিয়া দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুস্থানীদের মস্তক দু'দিকে চাপা এবং চওড়ার অনুপাতে দেখিতে লম্বা; পক্ষান্তরে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি জাতির মস্তক ওরূপ চাপা দেখায় না, লম্বার অনুপাতে খুব চওড়া মনে হয়। এই কথাটা কতটা ঠিক তাহা জানিবার জন্য এই লেখকও একবার মাপযোক করিয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সহায়তায় ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকেও মাপা হইয়াছিল। আমার পরিমাণ ফল মোটামুটি রিজ্‌লি সাহেবের ফলের অনুরূপই দেখা যায়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদির এবং হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণাদির মস্তকের আকারে যে অনেকটা প্রভেদ আছে তাহা অনেক সময়ে চোখেও ধরা পড়ে। এই প্রমাণ হইতে রিজ্‌লি সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি জাতি মূলতঃ এবং স্থূলতঃ হিন্দুস্থানীদিগের জাতি নহে, তাহারা মোঙ্গল-দ্রাবিড়-সঙ্কর। বাঙ্গালীর প্রতিবেশী জাতিনিচয়ের মধ্যে মোঙ্গলীয় হইল গারো, কাছারী, মিকির, কুকি প্রভৃতি; এবং রিজ্‌লি সাহেবের মতে দ্রাবিড় হইল সাঁওতাল, ওড়াও, কোল প্রভৃতি সুতরাং মোটা কথায় মোঙ্গল-দ্রাবিড় সঙ্করের অর্থ হইল গারো সাঁওতাল সঙ্কর। রিজ্‌লির পরিমাণ ফল প্রমাণ হইলেও তাঁহার এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা কঠিন।

হইতে জানা যায় মহারাজাধিরাজ ভাস্করবর্ম্মার বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজ ভূতিবর্ম্মা এই ভূমি তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়া আদৌ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। সেই তাম্রশাসন হারাইয়া যাওয়ায় ঐ ভূমির উপর কর বসান হইয়াছিল। ভাস্করবর্ম্মা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বর্ত্তমান তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়া ঐ ভূমির দখলকারিগণকে পুনরায় নিকর ভোগদখলের অধিকার দিতেছেন। এই নবাবিষ্কৃত তাম্রফলকদ্বয়ে ভূমির প্রতিগৃহীতাদিগের মধ্যে বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী বিভিন্ন গোত্রের ১১১ জন ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনের যে ফলকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই তাহাতে হয়ত আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ প্রতি-গৃহীতার নাম গোত্রাদি ছিল। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে বাৎস্য, ভারদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, গৌতম প্রভৃতি গোত্রেরও ব্রাহ্মণ আছেন। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দে ভাস্করবর্ম্মার সময়ে কামরূপের একটা গ্রামেই যদি এত ব্রাহ্মণের বসতি থাকিয়া থাকে, এবং তাহার চারি পুরুষ আগে ভূতিবর্ম্মার সময়ে এই সকল ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষগণ যদি এই ভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তাহার অনেক পরে বাঙ্গলায় মাত্র সপ্তশত ঘর ব্রাহ্মণের থাকার কথা, এবং যজ্ঞের জন্য আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে বর্ত্তমান সমস্ত রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণের বীজপুরুষ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আমদানীর কথা বিশ্বাসযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে কি? মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নবাবিষ্কৃত তাম্রফলকদ্বয় সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি হইতে তাঁহার অনুমতি অনুসারে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আমি প্রকাশিত করিলাম। এই অনুমতি দানের জন্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইহার প্রধান কারণ, যদি বাঙ্গালীর চওড়া মাথা মোঙ্গলজাতীয় পূর্ব্বপুরুষের দান হয়, তবে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর স্তরের জাতির মধ্যে মোঙ্গলজাতির নাক চোখ আদি আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না কেন? গারো প্রভৃতি মোঙ্গলীয়দিগের গোঁফ দাড়ি খুব কম গজায়, সাঁওতাল ওড়াও প্রভৃতি জাতির গোঁফ দাড়িও কম। বাঙ্গালী যদি প্রধানতঃ মোঙ্গল-দ্রবিড় সঙ্কর হয়, তবে বাঙ্গালীর প্রচুর গোঁফ দাড়ি আসিল কোথা হইতে? এই নিমিত্ত অনুমান হয়, বাঙ্গালীর চওড়া মাথা মোঙ্গলীয় শোণিতের মিশ্রণের ফল নহে, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বহির্ভাগ-বাসী চওড়া মাথা এবং দাড়িওয়ালা গালচা ও তাজিক প্রভৃতি জাতির সহিত দূর জ্ঞাতিত্ব সূচিত করে। বাঙ্গালীর শরীরে তথাকথিত দ্রবিড় বা কোলের শোণিত আছে; কিন্তু আদিম বৈদিক আর্য্যেরও মোঙ্গলীয় আগন্তুকের শোণিতের অংশ বেশী নয়। বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তবাসী কোচ পলিয়া ও মগজাতির মধ্যে মোঙ্গলীয় শোণিতের ভাগ বেশী।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে তিন প্রকার মত উল্লিখিত হইল তাহার কোনটিই এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না, এবং জাতির উৎপত্তি বিষয়ে hypothesis বা অনুমানের সীমা ছাড়াইয়া কখনও যে আর বেশী দূর—"ইদমেবতত্ত্বং" পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া যাইবে এরূপ ভরসা করা সুকঠিন। ভাষাভেদে জাতিবিভাগের অনুমানের দোষ এই, ভাষা সকল সময় বংশানুগত নহে; ভাষা অনেক সময়ে শোণিতমিশ্রণ ব্যতীতও বিভিন্ন জাতির মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। পক্ষান্তরে আকৃতিভেদে জাতিভেদ কল্পনার দোষ এই, আকৃতি অনেক সময় বংশানুগত নাও হইতে পারে; আবহাওয়ার প্রভাবে আকৃতি রূপান্তরিত হইতে পারে না এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। সুতরাং জাতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁহারা আকৃতিতন্ত্রী তাঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিতত্ত্ববিষয়ক নিবন্ধের অনাদর করিতে পারেন না। জাতিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ সমন্বয়ের সূত্র ভিন্ন বেশী কিছু মনে করা কর্ত্তব্য নয়। এইরূপ রচনাতে প্রমাণবিচারের ও প্রমাণবিন্যাসের পারিপাট্যই রচনার উৎকর্ষ সূচিত করে। প্রমাণবিচারে এবং প্রমাণবিন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রকে অতুলনীয় বলিলে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না।

ভাষার হিসাবে বা আকৃতির হিসাবে বাঙ্গালী প্রধানতঃ যে যে জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্ধারিত হউক না কেন, বাঙ্গালার সভ্যতার সঙ্গে হিন্দুস্থানের সভ্যতার যে কতকটা প্রভেদ আছে একথা অস্বীকার করা কঠিন। হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণেতর জাতিবিভাগ এক ছাঁচে গড়া, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণেতর জাতিবিভাগ আর এক ছাঁচে গড়া। হিন্দুস্থানের ধর্ম্মে কর্ম্মে বৈদিক শ্রুতির প্রাধান্য; বাঙ্গলার ধর্ম্মে কর্ম্মে তান্ত্রিক শ্রুতি প্রতিযোগিরূপে বিদ্যমান। বাঙ্গলায় কস্মিন্‌কালে বৈদিক শ্রুতির একাধিপত্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় হস্তলিখিত বেদ দুর্লভ। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বের" সূচনায় লিখিয়াছেন, রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বেদ পড়ে না, পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণেরা কিছু কিছু আলোচনা করে। সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল। জনশ্রুতিও সাক্ষ্য দেয়, প্রাচীনকালে পুত্রেষ্টিযাগের বা শকুনসত্রের জন্যও হিন্দুস্থান হইতে ঋত্বিক্‌ আমদানী করিতে হইত। সভ্যতার এই প্রভেদ যে কতক পরিমাণে বংশভেদ সূচিত করে এমন অনুমান অসঙ্গত নহে। একটী সংস্কৃত প্রবচন আছে—

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥

বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে এইরূপ বচন আছে এবং অঙ্গমগধাদি দেশের অধিবাসিগণকে সঙ্কীর্ণযোনি বলা হইয়াছে। মিতাক্ষরায় ধৃত দেবলের একটি বচনেও এইরূপ কথা পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় বর্ণিত মধ্যদেশবাসীরা যে এক সময় অঙ্গ মগধের অধিবাসিদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এমন প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যেও বিরল নহে। গৌতম বুদ্ধ যে দেশের এবং যে বংশের লোকই হউন না কেন, বেদবিরোধী সৌগত মত উৎপন্ন

হইয়াছিল মগধে। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্‌গে দেখা যায়, বোধিলাভের পরে ব্রহ্মা গৌতম বুদ্ধকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনুরোধ করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

পাতুরহোসি মগধেসু পুব্বে
ধম্মো অসুদ্ধো সমলেহি চিন্তিতো
অপাপুরেতং অমতস্‌সদ্বারং
সুনন্তু ধম্মং বিমলেনানুবিদ্ধং ॥

ললিতবিস্তরে (২৫ অঃ) অনুরূপ সংস্কৃত বাক্য পাওয়া যায়। যথা—

বাদো বভুব সমলৈ র্বিচিন্তিতো
ধর্ম্মোহ বিশুদ্ধো মগধেষু পূর্ব্বং।
অমৃতং মুনে তদ্বিবৃণীষ দ্বারং
শৃণ্বন্তি ধর্ম্মং বিমলেন বদ্ধং ॥

ইহার তাৎপর্য্য, মগধের জন্যই আদৌ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সূত্রপাত; সুতরাং প্রাচীন মগধকে প্রাচীন অবৈদিক আর্য্য সভ্যতার কেন্দ্র মনে করা যাইতে পারে। সকল শাস্ত্রানুসারেই বাঙ্গলা অর্থাৎ বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্রের সহিত মগধ, অঙ্গ ও কলিঙ্গের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বাঙ্গালা ভাষা মাগধী প্রাকৃত মূলক। সুতরাং সকল রকম প্রমাণ সমন্বয় করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সভ্য বাঙ্গালী মূলতঃ অবৈদিক মাগধগণের জ্ঞাতি এবং মগধ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। ১২৮০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"অতএব এই পর্য্যন্ত সিদ্ধি, যে যখন শতপথ ব্রাহ্মণ প্রণীত হয় তখন এদেশে আর্য্য জাতির অধিকার হয় নাই, যখন মনুসংহিতা সঙ্কলিত হয় তখনও হয় নাই, এবং যখন মহাভারত প্রণীত হয়, তখনও হয় নাই। ইহার কোন্ খানি কোন্‌কালে সঙ্কলিত বা প্রণীত হয়, তাহা পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা সিদ্ধ যে যখন ভারতে বেদ, স্মৃতি এবং ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছিল তখন এদেশ ব্রাহ্মণশূন্য অনার্য্য ভূমি। খ্রীষ্টের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বা তদ্বৎ কোন কালে এদেশে আর্য্যজাতির অধিকার হইয়াছিল, বলিলে কি অন্যায় হইবে? তাহা বলা যায় না।" (বঙ্গদর্শন, ১২৮০, ২৩৩ পৃঃ)

যদি আর্য্য শব্দটী মাগধ অর্থে গ্রহণ করা যায় তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত অবাধে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। পালি বিনয়পিটকের অন্তর্গত মহাবগ্‌গে (৫।১৩।১২) বৌদ্ধগণের পূজিত মজ্ঝিম দেশের পূর্ব্বসীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কজঙ্গলা নামক নিগম এবং মহাশালা। এই সীমাবচ্ছিন্ন দেশকে বলা হইয়াছে 'মজ্ঝে' বা 'মধ্যদেশ' এবং ইহার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দেশকে বলা হইয়াছে পচ্চন্তিমা বা প্রত্যন্তদেশ। মহাবগ্‌গে প্রত্যন্তদেশ বিভাগের এইরূপ কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—গৌতম বুদ্ধ প্রথমতঃ নিয়ম করেন যে দশজন ভিক্ষু মিলিত হইলে তবে কোন ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' বা বৌদ্ধ ভিক্ষুর পূর্ণ অধিকার দান করিতে পারিবেন। অনেক দেশে তখনও আবশ্যক মত দশজন ভিক্ষু একত্র করা কঠিন হইত। এই জন্য বুদ্ধদেব ব্যবস্থা করেন—

"সব্ব পচ্চন্তিমেসু জনপদেসু বিনয়ধর পঞ্চমেন গণেন উপসম্পদা।"

"সমস্ত প্রত্যন্ত দেশে বিনয়ধর এবং আর চারিজন ভিক্ষু একত্র হইলে উপসম্পদা দান করিতে পারিবেন।"

তারপর প্রত্যন্তদেশের সীমা নির্দ্দেশ উপলক্ষে বলা হইয়াছে, কজঙ্গলের এবং মহাশালার পূর্ব্বদিকে প্রত্যন্ত দেশ। কজঙ্গল রাজমহলের নিকটবর্ত্তী কাঁকজোল; মহাশালা এখনও অজ্ঞাত। বুদ্ধ স্বয়ং এই অংশের বক্তা হইলেও যে সময় এই অংশ রচিত হইয়াছিল তখন মনুর মধ্যদেশ অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত বৌদ্ধগণের মধ্যদেশের সকল অংশেই এত বৌদ্ধভিক্ষু ছিল যে, উপসম্পদার জন্য দশজন ভিক্ষু একত্র জুটান কঠিন হইত না; অথচ তখন বাঙ্গলা দেশ প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া গণ্য

হইত। ইহাতে অনুমিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তই মোটের উপর ঠিক্। হয়ত খ্রীষ্টাব্দের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে মগধ হইতে ঔপনিবেশিকগণ বাঙ্গালা দেশে আসিতে আরম্ভ করেন। বিনয়পিটকের মহাবগ্‌গ রচনার সময়ে, অনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্তও মগধবাসী বৌদ্ধেরা বাঙ্গলা দেশকে মধ্যদেশ বহির্ভূত প্রত্যন্ত দেশ বলিয়া গণ্য করিতেন। কিন্তু 'দিব্যাবদানে'র 'কোটী কর্ণাবদানে' দেখিতে পাওয়া যায় মধ্যদেশের পূর্ব্ব সীমা কজঙ্গল হইতে সরিয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত পহুঁছিয়াছে। যথা, "পূর্বেণোপালি পুণ্ডবর্দ্ধনং নাম নগরং তস্য পূর্বেণ পুণ্ডকক্ষো নাম পর্বতঃ, ততঃ পরেণ প্রত্যন্তঃ" (২১ পৃঃ)। পুণ্ডকক্ষ বোধ হয় গারো পাহাড়ের নামান্তর। 'মহাবগ্‌গ' স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের বিনয়পিটকের অন্তর্গত। 'কোটীকর্ণাবদান' সর্ব্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক হইতে 'দিব্যাবদানে' উদ্ধৃত হইয়াছে। 'কোটীকর্ণাবদান' যদি খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালের রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তবে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টাব্দের সূচনা কাল মধ্যে বাঙ্গলা দেশ মগধাদি দেশ হইতে আগত আগন্তুকগণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

(২) আর্য্যাবর্ত্তের কলঙ্ক।

জাতিতত্ত্ব ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলার, কলঙ্ক মোচন। ১২৭৯ সালে বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় 'ভারত কলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধের গোড়ায় তিনি লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সৌষ্ঠব লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করি। বাস্তবিক, স্পর্দ্ধা করিবার বিষয় অনেক আছে। এক্ষণে ইউরোপীয় জাতিগণেও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় দিগের পাণ্ডিত্য, শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনাদিতে ব্যুৎপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা কখন প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য লইয়া গৌরব করি না। এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের চিরকলঙ্ক; ভারতবর্ষীয়েরা রণনিপুণ বলিয়া কস্মিন্‌কালে সুখ্যাত নহেন। এই জন্য, তাঁহারা বাহুবলদর্পিত ভিন্ন-জাতীয়দিগের কাছে কতকদূর ঘৃণিত।"*

তৎকালে প্রচলিত ভারতবর্ষের এবং বাঙ্গলার ইতিহাসে মুসলমান বিজয়ের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে হিন্দুদিগকে একান্ত ভীরু বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিবরণ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, এবং বিশ বৎসরকাল, 'ভারত কলঙ্ক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বাঙ্গলার কলঙ্ক' পর্য্যন্ত, নানা সময়ে নানা প্রবন্ধে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, এই অপবাদ অমূলক। যে কলঙ্কজনক পরাজয়কাহিনী হিন্দুর ভীরুতা অপবাদের মূল, তাহার সহিত ভারতবর্ষের একাংশ, আর্য্যাবর্ত্ত মাত্র জড়িত। ইংরেজ অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের ধারা অনেকটা স্বতন্ত্র। দাক্ষিণাত্য যেমন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, তেমন কয়েকবার পুনর্জ্জিতও হইয়াছিল। আরাবল্লীর এবং বিন্ধ্যের শাখা প্রশাখা দ্বারা সুরক্ষিত রাজপুতানার এবং মালবের অংশ বিশেষের ইতিহাসও সেই প্রকার। মুসলমান আক্রমণ জনিত কলঙ্কের কালিমায় একমাত্র আর্য্যাবর্ত্তের অখণ্ড সমতলের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের ভূসংস্থানের হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে অপ্রকাশিত অথচ এখন আমাদের হস্তগত প্রমাণ সমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহাই সত্য। মুসলমানের আর্য্যাবর্ত্ত বিজয়কাহিনী অতিশয় দুর্ভাগ্যের কাহিনী হইলেও কলঙ্কের কাহিনী নহে। যদিও এই প্রস্তাবের বিষয় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার ইতিহাস,' বাঙ্গলা বিজয় ব্যাপারের সহিত আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাগের ইতিহাসের এমনই

* প্রথম খণ্ড "বিবিধ প্রবন্ধে" পুনর্মুদ্রিত 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে এই অংশ এই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—"ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল এই জন্য। Effeminate Hindoos ইউরোপীয় দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক।"

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের বিজয় বৃত্তান্ত একত্র আলোচনা না করিলে বাঙ্গলার ইতিহাস বুঝা কঠিন।

আর্য্যাবর্ত্তের অখণ্ড সমতল ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালার দ্বারা সুরক্ষিত। কিন্তু ইহার ভিতরে এমন কোন পর্ব্বত বা বিস্তীর্ণ জলাশয় নাই যাহা খণ্ডরাজ্যের সীমান্তের প্রাচীর পরিখার কাজ করিতে পারে। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তে স্বতন্ত্র খণ্ড খণ্ড রাজ্যের অভ্যুদয় হইলেই অশান্তি এবং বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতে হর্ষবর্দ্ধনের সময় পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে বরাবরই প্রায় এক একজন সার্ব্বভৌম সম্রাট্ দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই এইরূপ শক্তিসম্পন্ন সার্ব্বভৌম নরপতির অভাব হইয়াছে, তখনই বিদেশীয় আক্রমণকারী আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়াছে; তারপর আবার প্রাচ্যভারতে কোন সার্ব্বভৌম অভ্যুদিত হইয়া সমস্ত দেশ পুনরধিকৃত করিয়াছেন। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের পরে এইরূপ সার্ব্বভৌম আর দেখা যায় না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের আক্রমণের ফলে কান্যকুব্জের যশোবর্ম্মার দিগ্বিজয় বিফল হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের এবং পরে গুর্জ্জর প্রতীহার প্রথম ভোজের ও মহেন্দ্রপালের সার্ব্বভৌমত্ব অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দের আরম্ভ হইতে আর্য্যাবর্ত্তের খণ্ড রাজ্যের অধিপতিগণ পরস্পরের সহিত বিরোধে ব্যস্ত থাকিয়া অধঃপতনের জন্যই প্রস্তুত হইতেছিলেন। দশম শতাব্দের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের সিংহদ্বার খাইবর গিরিপথ উদ্ভাণ্ডপুরের (Ohind) সাহিরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। একদিকে পাঞ্জাব, আর একদিকে কাবুলসহ আফগানিস্থানের পূর্ব্বার্দ্ধ সাহিরাজগণের পদানত ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষভাগে গজনীর আমীর সবুক্তিগীন্ সাহিরাজ জয়পালকে পরাজিত করিয়া কাবুল এবং খাইবার পথ সহ উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পর্ব্বতমালা অধিকার করিয়াছিলেন। সবুক্তগীনের পুত্র সুলতান মামুদ সাহিরাজ জয়পাল, আনন্দপাল ও ত্রিলোচনপালকে যথাক্রমে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিলেন। তারপর হইতে দ্বাদশ শতাব্দের শেষ পাদে মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ পর্য্যন্ত এই সার্দ্ধ শতাব্দকাল পাঞ্জাব মামুদের উত্তরাধিকারিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। মুইজুদ্দীন ঘোরী ইহাদেরই উত্তরাধিকারী। এই সুদীর্ঘ সময় মধ্যে হিন্দুরা যদি আর্য্যাবর্ত্তের সিংহদ্বার পুনরায় হস্তগত করিতে পারিতেন তবে বোধ হয় ইতিহাসের ধারা অন্যখাতে প্রবাহিত হইত। হিন্দুরা সেই কার্য্য সাধন করিতে পারেন নাই ইহা স্থির। কিন্তু তাঁহারা যে পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত মামুদের উত্তরাধিকারিগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য কখনও কোন চেষ্টা করিয়াছেন এমন কথা প্রচলিত ইতিহাসে নাই। এবং যদি প্রকৃত ঘটনাও তাই হয় তবে ভীরুতা ভিন্ন এরূপ নিশ্চেষ্টতার আর কি কারণ হইতে পারে? মামুদের পূর্ব্ব মামুদের সমসময়ের পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি ইতিহাস আছে। কিন্তু মামুদের পরবর্ত্তী গজনবীবংশীয় সুলতানগণের কোন সমসময়ের ইতিহাস নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্যভাগে লিখিত মিনুহাজুদ্দীনের তবাকাৎ-ই-নাসিরিতে পাঞ্জাবের গজনবী সুলতানগণের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রচলিত ইতিহাস সেই বিবরণ মূলক। কিন্তু এখন হিন্দু পক্ষের যে সকল শিলালিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দের শেষ পাদে মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের অনেক পূর্ব্বাবধি হিন্দুরাজগণ তুরুষ্কের কবল হইতে আর্য্যাবর্ত্ত উদ্ধারের চেষ্টায় রত ছিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

সবই ছিল, সবই ছিল!
গুরু বলে মান্‌ছ যাদের,
নূতন তারা কি আর দিল?
রেল ইষ্টিমার টেলিগ্রাফী
ছিল ছিল ভারতব্যাপী,
ছিল মোদের ফটোগ্র্যাফী,
ছাপাখানা, পেপার মিলও।
ওদের যা, তা' সবই ছিল
বেশী ছিল মোদের বরং—
প্রমাণ করে, ভেঙে দিতে
পারি আমি ওদের ভড়ং।
সাব্‌মেরিন কি যুদ্ধ যাহাজ
ছিল মোদের, নেই বটে আজ।
জাহাজ ছাড়াও বীর হনুমান
লম্ফে সাগর ডিঙ্গাইল॥
এরোপ্লেন ত ছিলই মোদের
নরক শুধু হাওয়ায় ওড়া—
চল্‌ত লড়াই আসমানে তাই,
রথের সঙ্গে উড়ত ঘোড়া।
মাথার প'রে পাহাড় ধরা,
মুখের ফুঁয়ে ভস্ম করা,
নরক সোজা— স্বর্গে যাবার
সিঁড়িও তাই বিরচিল।
সবাই ছিল, বরং বেশী—
ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হলো
নেইক এখন, সুযোগ পেলে,
মিথ্যে সবাই বল্‌বে—বলো!
মহবেনাক সত্য তাতে,
করব প্রমাণ হাতে হাতে,
মোদের ওরা প্রশিষ্যাধম—
মোদের কাছেই শিখেনিলো।
কল্পতরু ছিল হাজার,
পরশমণি ঝুড়ি ঝুড়ি—
গণ্ডূষে পান কর্‌ত সাগর,
আসত যেত পাতাল ফুঁড়ি।
কি আর ওরা করলে বাহির,
করছে যে সব বিশ্বে জাহির?
মোদের যা' যা' ছিল তাহার
পায়নি ওরা একটি তিলও।

শ্রীকালিদাস রায়।

পরিচয়

(গল্প)

৫

সেদিন মোটরে করিয়া অনাথ প্রভৃতি গিরিডি সহরটী বেড়াইয়া আসিল। রসিক ও কণিকাও তাহার সঙ্গে ছিল। নরহরিবাবু বিশেষ কাযে তাহাদের সঙ্গী হইতে পারিলেন না। তিনি সেদিন একটী ইংরাজের সহিত খাদে গিয়াছিলেন। কণিকার অসঙ্কোচ ভাবটী অনাথের চক্ষে বড় সুন্দর লাগিতেছিল। গিরিডির বাঙ্গালী-পল্লী, রাজার কয়লার খনি এবং বরা-কর নদীর

ধার পর্য্যন্ত তাহারা ঘুরিয়া আসিল। কণিকা কতকগুলি কয়লার খনি দেখাইল। পরিত্যক্ত কয়লার খনি পরিত্যক্ত বৃদ্ধ ভৃত্যের মত নীরবে পড়িয়া রহিয়াছে। কণিকা বলিল, "এই যে বড় বাড়ী আর বাগান দেখ্‌ছেন এটা একটা ধনী মাড়োয়ারীর। এঁর কাছেই বাবা অভ্রের কায শেখেন। গিরিডির মধ্যে এঁর চেয়ে বড় অভ্রের কায কারও নেই।"

রসিক জিজ্ঞাসা করিল, "এঁদের কারখানায় তোমাদের মত ইলেক্‌ট্রিক লাইট, কলের জল, টেলিফোন সব আছে?"

কণিকা একগাল হাসিয়া উত্তর করিল, "মামার এক কথা! এসব বুঝি খুব বড় জিনিষ? এসব থাকা বুঝি খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার? এ সব নইলে কারবার চল্‌বে কেমন করে? ইংরাজদের প্রত্যেক কারখানাতে এসব আছে, তা বুঝি দেখেন নি?"

অনাথ আর কণিকার দিকে না ফিরিয়া বা কোনও প্রশ্ন করিবার ব্যর্থ সাহস না দেখাইয়া রাস্তার ধারে একটা মাঠের উপর কতকগুলি বাঙ্গালীর ছেলে ঝি চাকরদের সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়াছে, তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথাটা চিন্তা করিতে লাগিল।

রসিক জিজ্ঞাসা করিল, "টেলিফোনের কি প্রয়োজন?"

কণিকা উত্তর করিল, "কারখানার সঙ্গে সর্ব্বদা কথাবর্ত্তা না কইলে চলে না। সময় সময় সারা রাত্রি কাজ হয় কিনা।"

রসিক বলিল "এঁদের কারখানায় কত লোক কায করে?"

কণিকা বলিল, "আমাদের কারখানা চেয়ে ২০০০ হাজার বেশী। প্রায় ১২০০০ হাজার লোক।"

"বলেন কি" বলিয়া অনাথ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে কণিকার মুখের প্রতি চাহিল।

কণিকা কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া খুব সহজ ভাবেই বলিল, "আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। কায করলেই লোকের প্রয়োজন। কায যত বড় করবেন, তত বেশী লোকের আবশ্যক হবে। নেই। চলুন, দেখবেন আমাদের কারখানা। আজ কাল কায কিছু কম, তবু প্রতিদিন দশ হাজার লোক কায করছে।"

একটী বাঙ্গালী-পরিচালিত কারখানায় এতগুলি দেশবাসী দরিদ্রের অন্ন-সংস্থান হয় শুনিয়া অনাথের অন্তরের ভিতর বিপুল আনন্দ হইল। এক একটী ইংরাজের কারখানায় অনেক লোক কায করে, তাহা সে দেখিয়াছে। কিন্তু যাহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহার কল্পনায়ও কোন দিন আসে নাই, আজ তাহা স্বচক্ষে দেখিতে যাইতেছে মনে করিয়া যে কতখানি উৎসাহ, শক্তি ও হর্ষ এক সঙ্গে তাহার হৃদয়ে ভরিয়া উঠিতেছিল তাহা বলা যায় না। যথাসময়ে তাহারা কারখানা বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অনাথ যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই ঘটিল। গুজরাটী ম্যানেজার আসিয়া তাহাদের যথাযোগ্য অভিনন্দন করিয়া লইয়া গেলেন। কণিকা তাহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া চলিতেছিল। সে-ই সমস্ত বিষয়গুলি বুঝাইতে লাগিল। ম্যানেজার তাহার সহায়তা করিতেছিলেন। কারখানাটীর চারিদিকে বড় বড় হল ঘর এবং সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বারান্দা। এই বারান্দার উপর এক একটী বিভাগ, সহস্র সহস্র বালক-বালিকা যুবা-বৃদ্ধ হিন্দু-মুসলমান কাজ করিতেছে। ইহার একধারে একটী বড় হল-ঘর ম্যানেজারের অফিস। সেখানে অনেকগুলি কর্ম্মচারী লেখাপড়ার কায করিতেছে। ম্যানেজার লোকটী বড়ই অমায়িক ও শান্তভাবাপন্ন। তাঁহার কথা-বার্ত্তা অত্যন্ত ভদ্র। সমস্ত ব্যাপারটী যেন তিনি দর্শকগণকে মুহূর্ত্তের ভিতর বুঝাইয়া দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।

সব চেয়ে উল্লেখ করিবার মত ব্যাপার, এত লোক এক সঙ্গে কায করিতেছে কিন্তু এতটুকু বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ নাই। সকলেই যে যার কায লইয়া ব্যস্ত।

কণিকা এক জায়গায় বসিয়া বলিল, "এরা অভ্র sort করছে। এরাই একরকম অভ্রের ভাল-মন্দ বেছে এক একটা standard ঠিক করে' দেয়।"

রসিক জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি রকম ?"

কণিকা বলিল, "এরা হচ্ছে অভ্রের 'যাচনদার'— অভ্রের কায করে' করে' এমন একটা অভিজ্ঞতা জন্মে গিয়েছে যে, কোন্ অভ্র কোন্ শ্রেণীর আর কি মূল্যে বিক্রী হবে তা এরাই নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। তারপর ম্যানেজার পরীক্ষা করে মনোনীত করে নেন। প্রায় দেখা গেছে এদের সঙ্গে ম্যানেজারের মতের খুব কমই অমিল হয়ে থাকে। কি বলেন ম্যানেজার বাবু ?" বলিয়া কণিকা ম্যানেজারের সমর্থন প্রার্থনা করিল।

ম্যানেজার যথেষ্ট বিনয় দেখাইয়া উত্তর করিলেন, "এ সবই অভিজ্ঞতার ফল। এদের নির্ব্বাচন শক্তি প্রশংসাযোগ্য। যদিও এসব লোকের লেখা-পড়া জ্ঞান নেই বল্লেই হয় তবু অভ্রসম্বন্ধে এদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সে বিষয় স্পর্দ্ধা করে' বলা যেতে পারে।"

অনাথ ম্যানেজারের প্রতি একবার বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। সে দৃষ্টির অর্থ—লেখাপড়া জ্ঞান নাই ত, কি হইয়াছে ? ইহা কিছু গুরুতর অপরাধ নয়! আর লেখাপড়া জ্ঞান থাকিয়া ত সব বুঝিতেছি! রসিক জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদের কিরূপ বেতন দিতে হয় ?" ম্যানেজার উত্তর করিলেন, "৮০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।"

অনাথ শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহাদের গ্রামের বি-এ পাস হেড্‌মাষ্টারের মাহিনা আজ দশ বৎসরে ৮০ টাকা মাত্র দাঁড়াইয়াছে!

কারখানার মাঝে একটী বৃহৎ "প্রস্তুত-মালের" গুদাম। সেটী অভ্রে পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর নাকি ৮০ লক্ষ টাকার মাল জমা রহিয়াছে। বিলাতে এখন অভ্রের খুব জোর প্রয়োজন নাই, সে জন্ত মাল পাঠান বন্ধ আছে। দর মন্দা বলিয়া বিক্রয় করা হয় নাই। বিলাতের অফিসে নাকি এক কোটী টাকার মাল জমা রহিয়াছে। সমস্ত কারবারটী ঘুরিয়া দেখিতে প্রায় দুই ঘণ্টার অধিক সময় লাগিল।

৬

নরহরি বাবু হাসিয়া বলিলেন, "অনাথ বাবু খাদ দেখে এসে যেন খুব গভীর ভাবে, কি একটা বিষয় চিন্তা করছেন ?"

রসিক বলিল, "কিনকার মানুষ কিনা, চিন্তাই হচ্ছে ওদের কায।"

এমন সময় কণিকা জল খাবারের আয়োজন হইয়াছে সে সংবাদ লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

সকলে এক সঙ্গে জল খাইতে বসিলে কণিকা পরিবেষণ করিতে লাগিল। বাগানের পেঁপে, কলা, ডালিম হইতে সুরু করিয়া ঘরের দুধের ছানার প্রস্তুত রসগোল্লা, সন্দেশ, ছানার জিলিপি প্রভৃতি যখন একে একে আসিতে লাগিল, তখন রসিক হাসিয়া বলিল, "এখানে এ সবেরও খনি আছে নাকি ? তাহলে আমি ওকালতী পড়া আজই ছেড়ে এই ব্যবসায় লেগে যাই।"

কণিকা বোধহয় কিছু উত্তর দিবে এমন ভাব তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা সামলাইয়া অনাথের মুখের প্রতি মৃদু হাসিয়া চাহিতেই অনাথ বলিল, "এ সবই সেই এক অভ্রের খনিতে পাওয়া যায়। যা খাচ্ছ, সবই হচ্ছে অভ্রের রূপান্তর মাত্র। দেখ্‌চ না, যত খাচ্ছ, ততই ঠোঁটের কিনারায় অভ্রের মত হাসি চিক্ চিক্ করছে।"

নরহরি বলিল, "সবই অভ্রের রূপান্তর সে বিষয় কোন ভুল নেই।"

কণিকা হাসিয়া ফেলিল। তাহার হাসিতে সে বুঝাইল, সে অনাথের উত্তরে খুব খুসী হইয়াছে।

অনাথ নরহরির দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

নরহরি বাবু বলিলেন, "কি প্রস্তাব, বলুন ; আমার সাধ্য হলে আমি তা পূরণ করবো।"

কণিকা মনে মনে বলিল, "বাবার অবজ্ঞ করবো বলা কি সঙ্গত হল ?" তাহার মাথার মধ্যে বায়স্কোপের চিত্রের মত সহস্র সহস্র চিন্তা তড়িদ্ গতিতে প্রবাহিত হইয়া গেল।

অনাথ বলিল, "আমি মনে করছি, বৃথা টাকা নষ্ট করে আর এম-এ পড়ব না, আজই এখান থেকে চিঠি লিখে দিই।"

নরহরি। উপস্থিত কি জন্তে লেখাপড়া ত্যাগ করতে চান ?

অনাথ অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বিনা উত্তেজনায় উত্তর করিল, "লেখাপড়া শিখে কোনও লাভ নেই বুঝতে পেরেছি।"

নরহরি। একথা যদি বলেন, তবে এতদিন কেন ত্যাগ করেন নি ?

অনাথ তেমনি স্থির কণ্ঠে উত্তর করিল, "এতদিন অন্ত পথ দেখ্তে পাই নি, আর দেখবার কোন চেষ্টাও করি নি।"

নরহরি। এখন কি পথ দেখ্তে পেয়েছেন ? আর যে পথ দেখ্তে পেয়েছেন সেটা মরীচিকা নয় ত ?

অনাথ। এতদিন পাই নি, আজ পেয়েছি। এত-দিন কেবল মরীচিকার পিছনে ছুটেছি। কোনদিকে চাই নি, চাইবার অবসর পাই নি।

নরহরি। যদি সত্য সত্যই পথের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তবে সে পথে চলাই আপনার কর্ত্তব্য। কিন্তু আপনার পিতামাতা কি আপনার সে পথ গ্রহণ অনু-মোদন করবেন ?

অনাথ পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া নরহরি বাবুর হাতে দিল এবং বলিল, "তাঁদের অনুমতি পেয়েছি। এখন আপনার অনুমতি পেলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হই। আপনি আমার এ পথে কি সহায় হবেন না ?"—বলিয়া অনাথ নরহরি বাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া উত্তরের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নরহরি বলিলেন, "আমার কি করতে হবে বলুন ?"

অনাথ বলিল, "আপনার কাছে আমাকে ব্যবসা শিখ্তে অনুমতি দিন এই আমার প্রার্থনা।"

নরহরি বলিলেন, "দেখুন অনাথ বাবু, আপনার ব্যবসা শেখবার উৎসাহ, আগ্রহ আমাকে যে কি পর্য্যন্ত মুগ্ধ করেছে তা বলতে পারি নে। আপনাদের মত ছেলেরা যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবসার দিকে না চাইবে, ততদিন সহস্র চেষ্টাতেও দেশের আত্মশক্তি বোধ জেগে উঠ্বে না। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে দেশের জীবনী শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নতুবা এক মুষ্টি অন্ন আর একখানি বস্ত্রের জন্তে দেশ হাহাকার করে মরবে, সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।"

অনাথ বলিল, "এ বিষয়ে আর কোনই তর্ক নেই।"

নরহরি বলিলেন, "উত্তেজনার মুখে আমরা না ভেবে অনেক সময় এগিয়ে পড়ি; তারপর একটু ধাক্কা খেলেই পেছিয়ে পড়ি। এতে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। আজ আপনি উত্তেজনার মুখে হয়ত যতখানি অধ্যবসায় আপনার আছে বলে' মনে করছেন, দুদিন পরে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখে হয় ত আপনি অনুতপ্ত হবেন। বেশ করে চিন্তা করে তারপর যদি আস্তে রাজি হন, আমি আপনাকে নিজের ছেলের মত কায শেখাতে প্রস্তুত আছি।"

অনাথ বলিল, "আপনার আশ্বাসবাণী আমাকে যে কি পর্য্যন্ত উৎসাহিত করেছে, যদি কোন দিন কৃত-কার্য্য হই, তবেই তার পরিচয় দেবো।"

রসিক এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। সে বলিল, "দেখছি শেষটা তুমি পাশ করার মায়া কাটালে ? বেড়াতে এসে ব্যবসাদার হতে চললে। মন্দ নয়, কিন্তু এত সব কষ্ট কি তোমার শরীর সহ্য করতে পারবে ?"

নরহরি অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিলেন, "দেখ রসিক, দূর থেকে ভয় পেয়ে পালালে কোন দিন কোন কাযে সফলকাম হওয়া অসম্ভব। সওয়া না সওয়া সবই আমাদের মনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। আজ অল্পক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়ালে তোমার মাথা ধরবে, অসুখ করবে, একথা খুব সত্য। কিন্তু কিছুদিন অভ্যাস হ'লে,

সেই রৌদ্রে না দাঁড়ালে আবার অসুখ করবে। সাহস নেই বলে' রোজ নেই নেই করলে সাহস কোনদিন আর আসবার পথ পাবে না। এ সব হচ্ছে কেবল অভ্যাস। আমাদের জাতটা ক্রমাগত নিজেদের কোন শক্তি নেই ভেবে ভেবে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কণিকা বালিকা, ছেলেবেলা থেকে ও আমার সঙ্গে সঙ্গে এই কাযের মধ্যে থেকে যেমন কায শিখেছে,তেমনি সাহস ও আত্ম-নির্ভর শক্তিও লাভ করেছে। এখন আমি বলতে পারি, আমার অবর্ত্তমানে কণিকা আমার কায বেশ চালাতে পারবে, কেউ তাকে ঠকিয়ে এক পয়সাও নিতে পারবে না।

পিতার মুখে কণিকা নিজের প্রশংসা শুনিয়া লজ্জায় সংকুচিত হইয়া গেল। নরহরি পুনরায় বলিলেন, "আমার ছেলে নেই, কিন্তু সেজন্ত সত্য বলছি, আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ আমি জানি, কণিকা আমার ছেলের কায খুব করতে পারবে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা অনাথ, তুমি এই কায শেখ এবং আমাদের ফ্যাক্টরীর ভিতর একটা স্কুল খোল; এবং দেশের ছেলেদের বিনা বেতনে এই কায শেখাও। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা, এই রকম একটা স্কুল খুললে দেশের লোকের অনেক উপকার হবে। তুমি যদি আমার এ কার্য্যে সহায় হও তবে তোমার সঙ্গে কণিকাও সে কার্য্যে যোগ দিতে পারে।"

ইহাতে কণিকা যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করিল। অনাথ সেদিন দ্বিপ্রহরে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। কণিকা দেখিল, একখানি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের নামে লেখা।

৭

তারপর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কণিকার বিদ্যালয় হইতে এখন দেশের অনেক ছেলে অস্ত্রের কায শিখিয়া স্বাধীন ভাবে নানা স্থানে কারখানা খুলিয়াছে। অনাথ গত বৎসর বিলাতে গিয়া নিজেদের একটা অফিস খুলিয়া আসিয়াছে। এখন পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারকম নূতন কারবার আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন অনেক অস্ত্র ব্যাবসায়ী এই দেশীয় লোকের প্রতিষ্ঠিত বিলাতের অফিসে অস্ত্র বিক্রয়ার্থে পাঠাইয়া যথেষ্ট লাভবান হইতেছেন। অনাথকে নরহরি বাবু অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাহার প্রতি তাঁহার অসীম বিশ্বাস। অনাথকে নিজের কারবারের অর্দ্ধেক অংশীদার করিয়া লইয়াছেন। গিরিডিতে অনাথের বাড়ী এখন একটি দেখিবার মত জিনিষ। অনাথের পিতামাতা এখন বৎসরের প্রায় অনেক সময় এখানেই থাকেন। নরহরি ইদানীং বড় একটা কাযকর্ম্ম দেখেন না। তাঁহার বাগান বাটীতে আজ এক বৎসর যাবৎ একটি সাধু আসিয়া আছেন, তাঁহার সহিতই সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা হইয়া থাকে। সাধুকে নরহরি বাবু গুরুর ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। নরহরি বাবুর স্ত্রী স্নেহময়ীও সেখানে সন্ধ্যার পর গিয়া বসেন।

একদিন সন্ন্যাসী বলিলেন, "মেয়েটির বিবাহ দিয়ে তারপর তোমাদের সংসার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মেয়েটি হাজার বুদ্ধিমতী ও কাযের লোক হলেও, যখন কায কর্ম্ম ও গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করতে হবে, তখন তার বিবাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।"

স্নেহময়ী বলিলেন, "দেখুন, মেয়েকে আমরা একটু অন্যভাবে মানুষ করেছি। তা ছাড়া, আমাদের সমাজে যে বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া রীতি, সে বয়সও অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। এখন মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি সহজ হবে?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "পাগলী মা আমার কি বলছ? কণিকা তোমার একটি রত্ন। এমন মেয়ে যাদের ঘরে থাকে তাঁদের অত্যন্ত ভাগ্য, এ বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তারপর এ জগৎটা যে মা অন্ধ হ'য়ে কেবল টাকার উপাসনা করছে। সুতরাং কণিকার বিবাহের জন্যে কিছুমাত্র চিন্তার কারণ নেই। অনেকেই ছুটে আসবে, কিন্তু তা বলে যার তার হাতে কণিকাকে দিতে আমি বলি না। আমার মনে হয় অনাথ ছেলেটি বেশ সচ্চরিত্র

এবং সাধু প্রকৃতি। কেবল তাই নয়। গরীব দুঃখীর প্রতি ওর বিশেষ যত্ন আছে। তাঁর হৃদয়ের পরিচয়ও অনেকবার আমি পেয়েছি।"

স্নেহময়ী বলিলেন, "এ প্রস্তাবে কি অনাথ রাজী হবে? অনাথের পিতামাতা এতবড় বৌ ঘরে নিতে যদি অসম্মত হন, তা হলে বড়ই একটা কষ্টের কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে।"

৮

অনাথের পিতামাতা আপত্তি করেন নাই। আজ শুভ বিবাহ।

অনাথের বাড়ী হইতে নরহরির বাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তাটি কুলি মজুর গণ অভ্রে একরূপ মুড়িয়া দিয়াছে। সূর্য্য অভ্রের উপর পড়িয়া সহস্র সহস্র হীরক খণ্ডের ঔজ্জ্বল্যে পথিকের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইতেছিল।

শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। ফুলশয্যার দিন প্রভাতে, অনাথ ও কণিকা নিভৃত কক্ষে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

অনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কণিকা, অভ্রের কাব তোমার কাছেই ত আমার শেখা! আমাকে কি গুরুদক্ষিণা দিতে হবে, এবার তার হুকুম হোক্।"

কণিকা হাসিয়া বলিল, "হুকুম কি একবার বল্লেই সহজে হয়? এখনও বিলম্ব আছে।"

অনাথ বলিল, "এখনও বিলম্ব কেন কণিকা?"

কণিকা বলিল, "গুরুদক্ষিণা দেওয়া সহজ হতে পারে, কিন্তু নেওয়া যে অত্যন্ত কঠিন।"

অনাথ বলিল, "কঠিন কেন?"

কণিকা বলিল, "সর্ব্বস্ব না দিতে পারলে ত আর দক্ষিণা নেবার অধিকার হয় না।"

অনাথ বলিল, "তবে কি দেওয়ার মধ্যে এখনও কিছু বাকী আছে?

কণিকা বলিল, "আছে।"

অনাথ সম্মুখের চেয়ার খানির উপর হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িল।

কণিকা একখানি অত্যন্ত সুন্দর ট্রের উপর একরাশ ফুল আনিয়া অনাথের সম্মুখে রাখিল এবং বলিল, "সর্ব্বস্ব দেওয়া কিছু বেশী কথা নয়—সে ত দিয়েছি; তবে একটা জিনিস দিতে পারব না। সে জন্য ক্ষমা করতে হবে।"

অনাথ বলিল, "সেটা কি?"

কণিকা বলিল, "তোমার কাছে আমি ঘোমটা দিয়ে কনেবৌ সেজে থাকতে পারব না। এই অনুমতিটি তুমি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আমায় দান কর।"

"দোহাই তোমার—কনেবৌ তুমি সেজ না।"—বলিয়া অনাথ তাহার নবপরিণীতা পত্নীকে চুম্বন করিল।

এমন সময় বাহির হইতে রসিক চিৎকার করিতে করিতে আসিতেছিল, "কোথায় হে অনাথ, আমি ওকালতী একেবারে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

অনাথ অভূত পূর্ব্ব আনন্দে দৌড়িয়া গিয়া রসিককে দুই বাহু দিয়া প্রগাঢ় প্রেমে বক্ষ মধ্যে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল।

সমাপ্ত

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দারার দুরদৃষ্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দারার এই দুঃসময়ে ঔরঙ্গজীবের রোষরক্ত নয়ন এবং বাদশাহী অগ্নিবর্ষী কামানকে সমভাবে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় এবং সাহায্যদান করিবে এমন লোক কে আছে, দারা সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভারতের উপান্তভাগে, বেলুচিস্থানের প্রান্ত সীমায়, মালেক জিউয়ান নামক একজন সামন্ত সর্দ্দারের কথা দারার স্মৃতিপথে উদিত হইল। এক সময়ে বিশেষ অপরাধের জন্য মালেক জিউয়ানের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা বাদশাহ শাজাহান দিয়াছিলেন; যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ অপরাধী সম্রাটের নিকট আনীত হয়, রাজকুমার দারা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া পিতার নিকট জিউয়ানের প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন এবং তাহাকে পুনরায় তাহার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সম্রাটের নিকট বিনীত নিবেদন জানান; স্নেহশীল পিতার নয়নানন্দ নন্দনকে অদেয় কিছুই ছিল না; সুতরাং দারার দয়াতেই জিউয়ান যমমন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াও জীবলোকে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিল। দারার মনে হইল এই মালেক জিউয়ান, প্রাণদানের বিনিময়ে তাঁহাকে আশ্রয় এবং সাহায্য দিয়া সাধ্যানুসারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। মালেকের বাসস্থান নিকটেই ছিল, দারা তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার আগমন সংবাদ দিবার নিমিত্ত একজন অনুচরকে জিউয়ানের নিকট প্রেরণ করিলেন।

মুমূর্ষু নাদিরার প্রাণ লোকান্তরে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়াই বসিয়া ছিল, রোগশীর্ণ দেহের অবশেষ আর কিছু ছিল না; সামান্য সামন্ত সর্দ্দারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণের অসম্মান রাজরাজেন্দ্রাণী বুঝি সহ্য করিবেন না বলিয়াই, মালেক জিউয়ানের আবাসে পহুঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণ-বিহঙ্গ পরীলোকে উড়িয়া চলিয়া গেল। নাদিরা সকল দুঃখ বেদনা, ক্ষোভ ক্ষতি, ক্লেশ অপমানের অতীত লোকে চলিয়া গিয়া শান্তির শীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয়-দয়িত দারার মস্তকে যে বজ্র হানিয়া গেলেন তাহার বেদনা যে ভীষণ! যে দিন কুসুমমাল্যের দ্বারায় উভয়ের প্রকোষ্ঠ বন্ধন করতঃ মোল্লা মন্ত্রপাঠ করিয়া দিয়াছে, সেই দিন হইতে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে স্বাস্থ্যে, কর্ম্মে নর্ম্মে, উৎসবে ব্যসনে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটে নাই। আজ মরণ আসিয়া যে বিরহের সৃজন করিল, হায়, তাহার অবসান কবে, কেমন করিয়া হইবে? দারার সকল দুঃখের সান্ত্বনা, সকল ব্যাধির সেবা, সকল কর্ম্মের মন্ত্রণা, সকল নর্ম্মের সঙ্গিনী এক মুহূর্ত্তে কোন্ সুদূর লোকান্তরে চলিয়া গেল, রহিল কেবল হৃদয়ের চিরন্তন হাহাকার, আর অফুরন্ত অশ্রুর অবিশ্রাম বর্ষণ! দারার চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া গেল, সমগ্র ধরণী অন্ধকার মরুভূমিতে পরিণত হইল, জীবিত প্রয়োজনও শেষ হইয়া গেল। ইহলোকে অনেকের ললাটেই বিধাতা বিয়োগ-দুঃখ লিখিয়া থাকেন, কিন্তু জীবন থাকিলে বিরহাতুর জনের অন্তরের অন্তরতম নিভৃত প্রদেশে কোথাও না কোথাও আশার ক্ষীণ দীপ শিখা মৃদু মৃদু জ্বলিতে থাকে, মনে হয় কখনও এমন দিন আসিতেও পারে যখন বিরহ বেদনার অশ্রুজল শুষ্ক হইয়া যাইবে, প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যে চির-আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়জন আসিয়া ধরা দিবে। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া যখন প্রিয়তম জনকে লোকান্তরে লইয়া যায় তখন এক নিমেষে সকল আশা চূর্ণ বিচূর্ণিত হয়, দেহমন-অন্তরাত্মা সমস্তই ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে—দারার তাহাই হইয়াছিল। নাদিরা কেবল মাত্র দারার পত্নী ছিলেন না, তিনি গৃহিণী, সচিব,

শিক্ষা, সখী সমস্তই ছিলেন, নতুবা স্বীয় শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া মৃত্যুব্যাধিগ্রস্তা নাদিরা স্বামীর দুর্ভাগ্যের দিনে তাঁহার সহিত ভয়াবহ মরু-পথে যাত্রা করিয়া নির্ব্বান্ধব স্থানে পথপ্রান্তে নিতান্ত দীনজনের ন্যায় এই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেন না; দারার সমস্তই গিয়াছিল, ধনজন, রাজ্যসিংহাসন, আশা ভরসা কিছুই তাঁহার ছিল না, কেবল তাঁহার কণ্ঠভূষা এই নাদিরা কোহিনূর মাত্র ছিল, যাহার দিকে চাহিয়া দারা অসীম ক্লেশ সহাস্যবদনে সহ্য করতঃ বিমুখ ভাগ্যকে পুনরায় প্রসন্ন করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু অপ্রসন্ন অদৃষ্ট-দেবতার প্রসন্ন হওয়া দূরের কথা, দারার শিরে এই নির্দ্দয় অশনি নিক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার নির্ম্মমতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

দারার আগমন সংবাদ পাইয়া মালিক জিউয়ান প্রত্যুদ্গমন করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত আসিল; কিন্তু কি জানি কেন বালক সিপার পিতাকে বারম্বার জিউয়ানের বাস ভবনে যাইতে নিষেধ করিলেন। বালকের হৃদি-স্থিত দেবতা ভাবী অমঙ্গলের কি ছায়াপাত তাঁহার অন্তরে করিয়া ছিলেন, তাহা সেই দেবতাই জানিতেন; কিন্তু সিপার বুঝিয়াছিলেন যে, অতিথ্য গ্রহণের ফল বিষময় হইবে। হইলও তাহাই। কিন্তু শোকে দুঃখে দারা তখন বাহ্যজ্ঞান শূন্য, সতীর শবদেহবাহী ভোলানাথের ন্যায় নাদিরার শব বহন করিয়া দারা চলিয়াছেন, কোথায়, কিজন্য, সে জ্ঞান তাঁহার নাই।

মুসলমান ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে চতুর্থাহে মৃতের এক প্রকার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করিতে হয়, হয়ত দারার মনে সেই কথা উদয় হওয়ায় মালিক জিউয়ানের গৃহে তিন দিবস অবস্থান করিয়া, চতুর্থীর শ্রাদ্ধ শেষ করতঃ পুনরায় যাত্রা করিবেন ভাবিয়াছিলেন। মালিক জিউয়ান অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবে হয়ত একথাও তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই; ফলতঃ যে কারণেই হউক পুত্র সিপারের নিষেধ সত্ত্বেও দারা নাদিরার শবদেহ লইয়া, জিউয়ানের গৃহেই প্রবেশ করিলেন। শোকে, দুঃখে, বেদনায় হতজ্ঞান, মৃতকল্প দারা, জিউয়ানের বাসভবনে কোন প্রকারে দুই দিবস অতিবাহিত করিলেন। পূজ্য অতিথির যথাসাধ্য সৎকার মালিক জিউয়ান করিতেছিল, কিন্তু অন্তর্গূঢ় বেদনায় অভিভূত দারার সেদিকে মন দিবার মত অবস্থা তখন নহে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় পান-ভোজনটুকু তিনি মৌন ভাবে নিষ্পন্ন করিয়া যাইতেছিলেন। চক্ষুর নিমেষপাত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দেখিয়া বুঝা যাইত যে, রাজকুমার দারা তখনও জীবিত; মাতৃহীন বালক পুত্র সিপারের মুখ চাহিয়াই হয়ত দারা আত্মহত্যা করেন নাই, নতুবা রাজ্যনাশ, সদা ত্রাস, পরাজয়, পলায়ন, অনশন, চীর-বসন প্রভৃতি রাজকুলজাত জনের দুঃসহ পুঞ্জীভূত দুঃখের উপরে চির-প্রিয়ের চির-বিরহের বজ্র বেদনায় আত্ম-হত্যার সম্ভাবনাই সমধিক ছিল।

নাদিরা মৃত্যুকালে শেষ সাধ প্রকাশ করিয়া গিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার শবদেহ যেন নদী নির্ঝরবহুল, চির-শ্যামল ভারতবর্ষেই সমাহিত করা হয়, ভারত সীমান্তের বহির্ভাগে, কান্দাহারের গিরি-সঙ্কট বা মরু-প্রান্তরে তাঁহার শেষ শয়নের ব্যবস্থা না হয়। দারা ভাবিয়া-ছিলেন তাঁহার তাৎকালিক দুঃখ চির-দিনের নহে, এমন দিন আসিবে যখন ভুবন বিশ্রুত মণিময় ময়ূর সিংহাসনে নাদিরার সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া ভারতের রাজদণ্ড পরিচালন করিবেন এবং সে দিনে, বর্ত্তমানের যত দুঃখ ক্লেশের অবসান হইবে; দারার অদৃষ্টে সে শুভদিন আসিল না, মৃত্যু আসিয়া নাদিরার দুঃখের অবসান করিল। এত দুঃখের মধ্যে যাহার জীব-লীলার শেষ হইয়াছে, সেই প্রাণ-প্রিয় দয়িতার শেষ ইচ্ছা পরিপূরণ, দারা প্রাণপণ করিয়াও করিবেন, ইহা নিশ্চিত কথা।

নাদিরার শব দেহ, প্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ ফকির মিঞা মীরের সমাধির সন্নিকটে লাহোরে সমাহিত করিবার ইচ্ছা দারার মনে উদয় হইল। তখন দারার সহিত সপ্ততি সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল; তাঁহার এবং পুত্র সিপারের শরীর রক্ষী স্বরূপ এই কয়টি মাত্র সৈনিক

পুত্রই দারার শেষ সম্বল। যদি কোন আপদ উপস্থিত হয় এই কয়জন পুরাতন প্রভুভক্ত বীরপুরুষ তখন প্রাণ দিয়াও প্রভুর রক্ষায় চেষ্টা করিবে, ইহা দারা জানিতেন। কিন্তু জানিয়াও শোক-সন্তপ্ত দারা নিজের সহায়হীন নিঃসঙ্গ অবস্থার প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া, নাদিরার শব-দেহের প্রহরায় সেই সপ্ততি সংখ্যক অশ্বারোহীকে লাহোরে পাঠাইলেন এবং খাজা মাকুল ও গুল মহাম্মদ নামক যে দুইজন সেনানায়ক তাঁহাকে তখনও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই তাহাদিগকেও সেই অশ্বারোহী দলের সহিত রাজ্ঞীর সমাধির ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত লাহোরে যাইতে বলিলেন। নিম্নতম সৈনিক হইতে সিপার পর্য্যন্ত সকলেই এই ব্যবস্থায় বাধা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিয়োগ বেদনায় উন্মত্তপ্রায় দারা কাহারও কোন কথাই শুনিলেন না। পথে প্রাণাধিক প্রিয় দয়িতার শব দেহের কোনরূপ অবমাননা কেহ করে, সেই ভয়ে নিজের বিঘ্ন বিপদের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া সঙ্গের সকলগুলি লোককেই শবের সহিত পাঠাইয়া দিয়া বহুবিপদপূর্ণ বোলানের গিরিসঙ্কট পথে পুত্রসহ পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। নাদিরাবানুর মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বারম্বার রণ-নির্জ্জিত দারা পুনরপি সিংহাসন উদ্ধারকল্পে কি উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে সেই চিন্তাতেই নিবিষ্ট ছিলেন, বৎসরাধিককালের নিরত পথশ্রম, অনশন, নিশা জাগরণ, ধনক্ষয়, পরাজয় প্রভৃতি কোনরূপ ক্লেশেই দারার রাজোচিত দৃঢ়-চিত্তকে মুহূর্ত্তের জন্যও দুর্ব্বল করিতে পারে নাই; কিন্তু আজ এক আঘাতে বিপুলবল-সমন্বিত সেই বীর হৃদয়, ধূলিতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে, সাম্রাজ্যের জন্য সমর-সজ্জা দূরের কথা, একটি মাত্র সহচরও আজ সঙ্গে রাখিবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। ঔরঙ্গজীব প্রেরিত দস্যুস্বভাব সম্পন্ন সৈনিকদল আসিয়া আজ তাঁহাকে বন্দী বা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেও বাধা দিবার মানসে দারা তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলী পর্য্যন্ত উত্তোলিত করিবেন কি না সন্দেহ। বহু দুঃখ কষ্টেও যাঁহাকে অবনমিত করিতে পারে নাই, নাদিরার মৃত্যু তাঁহাকে মৃতকল্প করিয়া দিয়াছে—প্রিয়-বিচ্ছেদ-বেদনা, মানুষকে এমনই করিয়া মারিয়া রাখিয়া যায়। বিয়োগাতুর হতভাগ্য জনে অবশিষ্ট জীবনকাল কেমন করিয়া কাটায় তাহা সেই জানে, সে কথা অপরকে বলিয়া বুঝাইবার নহে; দারা কি দুঃখে নিজের জীবন মরণের দিকে পর্য্যন্ত চক্ষু দেন নাই, সকলগুলি অনুচরকে বিদায় দিয়া আপদকে কি দুঃখে এমন করিয়া স্বেচ্ছায় আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন সে কথা তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিবে? জনস্থানে সীতার স্মৃতি চিত্তে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বারম্বার হতচেতন করিয়া ফেলিতেছিল, আবার ছায়া-সীতার স্নেহের অমৃতস্পর্শে সেই রামচন্দ্রের বিনষ্ট চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল,—প্রিয়জনের কর-স্পর্শের এমনই অপূর্ব্ব মহিমা! যে প্রাণ প্রিয়জনের স্পর্শ, নিপীড়িত হরিচন্দন-পল্লবরস বা বসন্ত চন্দ্রমায় ক্ষরিত সুধা বিন্দুর ন্যায় দেহে অমৃত সিঞ্চন করে, দারা আজ সেই প্রিয়তমার একান্ত বিচ্ছেদের মর্ম্মন্তুদ বেদনায় অভিভূত, নিজের ইষ্টানিষ্ট, জীবন মরণের কথা চিন্তা করিয়া কার্য্য করিবার শক্তি তাঁহার নাই। যে কোন প্রকারে বিরহাতুর জীবনের অবশিষ্ট কালকে সংক্ষিপ্ততর করিয়া, লোকান্তরে বাঞ্ছিতার সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। ঔরঙ্গজীবের অনুচর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াই যদি ব্যথিত জীবনের শেষ হইয়া যায়, তাহাতেও দারা আজ ভীত নহেন। তাই তিনি আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই; একজন মাত্র অনুচরও সঙ্গে রাখেন নাই। এই ঔদাসীন্য হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রিয়বিচ্ছেদ বেদনায় দারার দেহ-মন অন্তর আজ কিরূপ ভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

জয়সিংহ ঔরঙ্গজীবকে জানাইয়াছিলেন যে, দারাকে হয় বন্দী বা যুদ্ধে বিনষ্ট কিংবা ভারত সীমার বাহিরে বিতাড়িত না করিয়া তিনি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিবেন না। দারাকে বন্দী বা বিনষ্ট করিতে জয়সিংহ কৃতকার্য্য হন নাই; কিন্তু যখন দেখিলেন সিন্ধুনদ পার হইয়া দারা কান্দাহারের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তখন জয়-

সিংহ ঔরঙ্গজীবের নিকট জানাইলেন যে, নিয়ত পথশ্রমে বহু বাদশাহী ফৌজ বিনষ্ট হইয়াছে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বহু সমরোপযোগী পশু ধ্বংস হইয়াছে, দারাও প্রাণভয়ে ভারতসীমান্ত পার হইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার আর পশ্চাদ্ধাবন করিবার প্রয়োজন নাই, আদেশ পাইলে তিনি রাজ-সমীপে উপস্থিত হইতে পারেন।

বাদশাহের আদেশের আশায় যখন তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নাদিরার মৃত্যুর পরে চতুর্থ দিনের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া কোন মতে সম্পন্ন করিয়া, পুত্র সিপার ও দুই কন্যাসহ সঙ্গী-হীন দারা মালিক জিউয়ানের নিকট বিদায় লইয়া বোলান গিরি-সঙ্কটের দিকে যাত্রা করিলেন।

একদিন দারার নিকট মালিক জিউয়ান প্রাণ ভিক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু আফগান হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না; দারাকে বন্দী করিয়া ঔরঙ্গজীবের নিকট লইয়া গেলে, বাদশাহ তাহাকে বহুরূপে পুরস্কৃত করিবেন সেই আশায়, দুর্ব্বৃত্ত কৃতঘ্ন নরপিশাচ জিউয়ান, তাহার রাজ-অতিথি এবং তাঁহার অসহায় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যাগণকে অনুচরবর্গ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করাইয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। যখন দারার নিকট সপ্ততি সংখ্যকও অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, তখন এই নর-রাক্ষস দারার রাজ-অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু দারা এখন নিঃসঙ্গ একক, নাদিরার মৃত্যুর শোকে মৃতকল্প, সুতরাং পাষণ্ড দুরাচার এখন নির্ভয়ে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে দ্বিধা করিল না। যাহার একদিন প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি সামান্য অর্থলোভে বা পদমর্য্যাদার আশায় এতদূর কৃতঘ্নতা করিতে পারে এ কথা দারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই; অন্যে যাহাই করুক, জিউয়ান তাঁহাকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করিবার জন্য বন্দী করিবে না ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের মূলে জিউয়ান নির্ম্মম কুঠারাঘাত করিল। খোজা, অনুচর, সঙ্গী, সৈন্য, রক্ষী, ভৃত্য কেহই নাই—একজন মাত্র লোকও নাই যে এই দুরাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সামান্য চেষ্টাও করিতে পারে। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক সিপার পিতার এই দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া, দুর্ব্বৃত্তগণের কয়জনকে আঘাত করিয়া পিতাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বালক একাকী বহু লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিবে? তাহারা সকলে মিলিয়া বালকের হাত বাঁধিয়া ফেলিল, দারাও নিষ্ফল চেষ্টা হইতে সিপারকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন।

সামুগড়ের সমরে পরাজিত হইবার পর হইতে যে বন্ধনভয়ে দারা পথ বিপথ জ্ঞান না করিয়া মরু, পর্ব্বত, সরিৎ সাগর, উল্লঙ্ঘন করতঃ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়াছেন, ভারত সীমার প্রান্তে আসিয়া সেই বন্ধনই তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল! আর অতি অল্প পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই বোলান গিরিসঙ্কটে পঁহুছিতে পারিতেন। খোজা বসন্ত তখনও তাঁহার আশায় কান্দাহার দুর্গ প্রাণপণে রক্ষা করিতেছে। গিরিপথ উত্তীর্ণ হইয়া কান্দাহারে পঁহুছিলে নিরাপদ হইবার সম্ভাবনাই সমধিক ছিল, কিন্তু কৃতঘ্ন আফগানের পাপাচরণে তাহা ঘটিল না—"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি" ইহাই বুঝি বিধাতার নিয়ম! নতুবা প্রত্যূষে যে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইবে, সেই রাম সেই প্রত্যূষে জটিল তপস্বী বেশে বনযাত্রা করিবেন কেন? পাষণ্ড নরাধমের গৃহে অতিথ্য গ্রহণের পূর্ব্বে, নর পিশাচের কলুষিত করে অঙ্গস্পর্শের পূর্ব্বে, রাজ রাজেশ্বরী নাদিরাবানুর যে মৃত্যু হইয়াছিল ইহা দারা এবং নাদিরার প্রতি বিধাতার অসীম কৃপা। নতুবা কৃতঘ্ন পশুকৃত নারীর অবমাননা কতদূরে গিয়া পঁহুছিত কে বলিতে পারে; এবং তাহার প্রতীকার করে উপায় বিহীন দারা ও সিপার কি করিতে পারিতেন? শাজাহান বাদশাহের কারাগারে জিউয়ানের ন্যায় কত শত সহস্র বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সমস্ত জীবন যাপন করিয়াছে, কতশত জিউয়ানের জীবিতাবস্থায় দেহ হইতে চর্ম্ম উৎপাটিত করিয়া তাহাদের মাংস শীকারী শ্যেন

পক্ষী এবং কুকুরের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, আজ সেই শাজাহানের নয়ন তারা, বক্ষের মাণিক, আনন্দ দুলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র, জিউয়ান কর্তৃক শৃঙ্খলিত হইয়া তাহার গৃহে নীত হইতেছে। প্রতীকারের কোন উপায় করিবার কেহই নাই, নিকরুণ বিধাতার একি নির্ম্মম অভিশাপ!

মালিক জিউয়ান দারা ও সিপারকে বন্দী করিয়া তাহার গৃহে আনিল। অবশিষ্ট যৎসামান্য ধনরত্ন যাহা কিছু ছিল তাহা বল পূর্ব্বক অপহরণ করিল, অশ্বাবরণ কাড়িয়া লইল, এবং দ্রুতগামী দূতদ্বারা জয়সিংহ এবং বাহাদুর খাঁকে সংবাদ দিল এবং বলিল যে তাহারা যেন শীঘ্র আসিয়া বহু আয়াসে ধৃত, এই মহামূল্য বন্দীগণের যথোচিত ব্যবস্থা করে। জয়সিংহ এবং বাহাদুর খাঁকে সংবাদ দিয়াই নিরস্ত হয় নাই, জিউয়ান বাদশাহ ঔরঙ্গজীবকে স্বয়ং দূতদ্বারা সংবাদ দিয়াছে যে, যে কার্য্য তাঁহার বিচক্ষণ সেনানায়কগণ কর্তৃক সাধিত হইতে পারে নাই, সে উহা সম্পন্ন করিয়াছে এবং বন্দীগণ সহ রাজ-প্রসাদ লাভার্থ বাদশাহের চরণ চুম্বনের জন্য শীঘ্রই দিল্লী রাজধানীতে পঁহুছিতেছে।

জিউয়ানের প্রেরিত চরমুখে দারার বন্দী হইবার সংবাদ পাওয়া মাত্র, বাহাদুর ও জয়সিংহ সসৈন্যে দ্রুতবেগে জিউয়ানের গৃহাভিমুখে কুচ করিয়া চলিল। দুরন্ত গ্রীষ্মের আতপতাপ, ঝঞ্ঝাবাত, উত্তপ্ত মরু বালুকা, কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করিল না। দিবা রাত্রি সমভাবে পথ চলিয়া তাহারা যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত মালেকের গৃহে পঁহুছিল এবং বাহাদুর খাঁ স্বয়ং বন্দীগণের তত্ত্বাবধানের এবং নিরাপদে দিল্লী পঁহুছিবার ভার গ্রহণ করিল। দিল্লী রাজধানীতে ঔরঙ্গজীব বাদশাহের সম্মুখে সমানীত হইবার পূর্ব্বেই দারা ও তাঁহার পুত্র কন্যাগণের কারাবাস আরম্ভ হইল। এই মহার্ঘ বন্দীগণ পাছে পলায়ন করে সেইজন্য বাহাদুর, বাদশাহী ফৌজের প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া সেই চলিষ্ণু প্রাকারের মধ্যস্থলে বন্দীগণের শিবিকা প্রভৃতি স্থাপিত করতঃ দ্রুতবেগে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিল। উন্মুক্ত তরবারি এবং আগ্নেয়াস্ত্র হস্তে সশস্ত্র প্রহরীগণ শিবিকা বেষ্টন করতঃ সাবধানে চলিতে লাগিল; পলায়নের সামান্য চেষ্টা মাত্রে বন্দীদিগকে বধ করিবে ইহাই বোধ করি উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু হায়, পলায়নের উদ্যম করিবে কে? নাদিরার মৃত্যুর পরে দারার তাদৃশ কোন ইচ্ছা থাকিলে তাঁহার সমভিব্যাহারী স্বল্প সংখ্যক অশ্বারোহী দল ও তাঁহাদের নায়ক গুল্ মহাম্মদকে তিনি বিদায় দিয়া একান্ত নিঃসঙ্গ হইবেন কেন? সিপারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ শুনিয়া তাঁহার সেই সপ্ততি সংখ্যক অশ্বারোহী সঙ্গে রাখিলে মালিক জিউয়ানের সাধ্য ছিল না যে দারাকে বন্দী করে, তিনি হয়ত নিরাপদে বোলানের গিরিপথ পার হইয়া কান্দাহারে পঁহুছিতে পারিতেন এবং তথায় পঁহুছিয়া পারস্যের শাহের সহায়তায়, পুনরায় হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ঔরঙ্গজীবের সম্মুখীন হইলে, সেই বল পরীক্ষার ফলে ভারতের মোগল ইতিহাস পরিবর্ত্তিত ভাবে লিখিত হইত কিনা কে বলিবে? সহোদর মুরাদকে হত্যা করা এবং পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার জন্য পারস্যের শাহ ঔরঙ্গজীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন সুতরাং দারার পক্ষে পারস্যাধিপতির সাহায্য লাভও কঠিন হইত বলিয়া মনে হয় না। শেরের কবল হইতে হুমায়ুন দিল্লী-সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন পারস্যের সহায়তায়, সুতরাং ইতিহাসচক্রের সেইভাবে পুনরাবর্ত্তন একেবারেই অসম্ভব ছিল না। পারস্যের ভয়ে ঔরঙ্গজীব বহুদিন পর্য্যন্ত কম্পান্বিত কলেবর ছিলেন; যখন তাঁহারই দৃষ্টান্তে তদীয় পুত্র আকবর বিদ্রোহ করিয়া অবশেষে পারস্যের পথে যাত্রা করিয়াছিল, তখনও ঔরঙ্গজীব ভীত ত্রস্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জিউয়ান প্রেরিত দূত যখন দারার বন্দী হইবার সংবাদ বহন করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইল, বাদশাহ আম দরবারে সে সংবাদ শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কপটীর শিরোমণি ঔরঙ্গজীবের মুখ দেখিয়া হর্ষ বিষাদ

কোনরূপ ভাবের ইঙ্গিতই কেহ পাইল না, আনন্দোৎসবের কোনরূপ আয়োজনের আদেশই তিনি দিলেন না, এমন কি বাদশাহী নহবতে বিজয়-সঙ্গীতও ধ্বনিত হইয়া উঠিল না। অনেকে হয়ত মনে করিয়াছিল, অগ্রজের পরাজয়, অপমান, বন্ধন প্রভৃতির দুর্গতিতে কনিষ্ঠের হৃদয়ে ব্যথা বাজিয়াছে, স্বার্থের জন্ত যাহা করিতে হয় তাহাই করিয়াছেন, তাঁহার বন্ধন সংবাদে উল্লসিত হইয়া, উৎসবের আয়োজন নিতান্তই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক, সেইজন্ত ঔরঙ্গজীব সে সকল ব্যবস্থা করেন নাই। পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা পাষণ্ডের মনে দয়া, স্নেহ, প্রেম কোন দিনই স্থান পায় নাই। দারার ধৃত হইবার সংবাদে তিনি প্রথমে যে উৎসব-আয়োজন করেন নাই তাহার কারণ, জিউয়ানের সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। যখন বাহাদুর খাঁর নিকট হইতে দূত আসিয়া জানাইল যে সত্যই দারা ধৃত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দিল্লীতে আনা হইতেছে, তখন পুনরায় আম দরবার করিয়া সে সংবাদ ঘোষিত করা হইল এবং দিল্লী নগরীতে ও সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র উৎসবের বিপুল আয়োজন করিবার আদেশ প্রচারিত হইল। বাদশাহী নহবত ও রশন্ চৌকীতে বিজয়ের আনন্দ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল, নিশীথে দিল্লী নগরী দীপমালায় সজ্জিত হইল. আতশ বাজির দীপ্ত আলোকে নৈশ আকাশের অন্ধকার বিদূরিত হইয়া গেল; দরবারের আমীর ওমরাহ মন্ত্রী সেনাপতি সকলেই এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তির আনন্দ উপভোগের জন্ত অবাধ ও পর্য্যাপ্ত পান ভোজন নৃত্য গীতে মনোনিবেশ করিলেন। খাজোয়ার যুদ্ধে সুজা পরাভূত হইবার পরে, মীরজুম্‌লা কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, আরাকানের দিকে চলিয়া গিয়াছে; মুরাদ দুর্ভেদ্য গোয়ালিয়র দুর্গের অন্ধকারাগারে আবদ্ধ—কেবল দারাই ছিল ঔরঙ্গজীবের দুশ্চিন্তার হেতু। সেই দারা ধৃত হইয়া দিল্লীতে বন্দীরূপে আনীত হইতেছে,—এ হেন শুভ সংবাদ পাইয়া ঔরঙ্গজীব উৎসবের আয়োজন করিবেন না ইহা নিতান্ত উন্মাদ কল্পনারও অতীত; কেবল মাত্র সত্য সংবাদ পাইবার অপেক্ষায় বাদশাহ প্রথমে হর্ষের লক্ষণ কিছু দেখান নাই। বিশ্বাসী সেনাপতি বাহাদুর ও জয়সিংহের নিকট হইতে নিশ্চিত সংবাদ পাইয়া, নিশ্চিন্তমনে আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রজাপুঞ্জের চক্ষে দারাকে নিতান্ত হেয় করিবার নিমিত্ত, কি ভাবে তাঁহাকে দিল্লী রাজধানীতে আনা হইবে তাহার বিস্তৃত উপদেশ সহ, নজরবেগ নামক সর্ব্ববিধ পাপে কুণ্ঠাহীন, জল্লাদের চিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে বাহাদুর খাঁর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং রাত্রিদিন পথ চলিয়া যত শীঘ্র সম্ভব পহুঁছিবার জন্ত তাহাকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। ঔরঙ্গজীবের ভয় ছিল, কি জানি যদি পথিমধ্য হইতে বন্দী পলায়ন করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমানে নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিবেন না, এবং ভবিষ্যতে কোনদিন দারা যদি সমর সজ্জা করিয়া সিংহাসনের দিকে হস্ত প্রসারণ করে, তাহা হইলে সে সমরের ফলও অনিশ্চিত। দারা শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী, তাঁহার দেহ এবং মনের সৌন্দর্য্যে প্রজাপুঞ্জ তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল, তিনি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন, বিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার নিকট আদর লাভ করিত, মুসলমান সাহিত্যকে সংপুষ্ট করিবার জন্ত তিনি উপনিষদের অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ফলতঃ রাজোচিত বহুগুণে গুণবান দারা সেকো জনসাধারণের প্রিয় রাজকুমার ছিলেন, এবং প্রজাপুঞ্জ যথাকালে এই দারাকে সিংহাসনে সমারূঢ় দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সিংহাসনের এ হেন প্রতিদ্বন্দ্বী, করলগত হইয়াও যদি পলায়ন করে সেই ভয়ে বাহাদুরকে শীঘ্র দিল্লী পহুঁছিবার আদেশ দেওয়া হইল।

সামুগড়ের যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন "দেওয়ানে আমের" প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সম্রাট শাজাহানের আজ্ঞানুসারে দারা রথারোহণে রণযাত্রা করেন, তখন তিনি স্বগত

ভাবেন নাই যে রণনির্জ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ-কর-চরণ হইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বাদশাহী বিপুল বাহিনী এবং সেই বাহিনীর অধিনায়ক রণদক্ষ বহু সেনাপতি সহায় করিয়া তিনি যুদ্ধযাত্রা করিয়েছেন, ঔরঙ্গজীবের মুষ্টিমেয় সেনা ঝটিকাগ্রে তৃণের ন্যায় কোথায় উড়িয়া যাইবে, তিনি বিদ্রোহী ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া আনিয়া পিতৃপদে সমর্পণ করিবেন; সম্রাট বিদ্রোহী পুত্রকে যথোচিত তিরস্কার করতঃ ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিয়া দাক্ষিণাত্যের সুবায় বা অন্য কোন স্থানে পাঠাইয়া দিবেন, উত্তর কালে এরূপ ঘটনা আর ঘটিতে পারিবে না, ময়ূর সিংহাসনে জ্যেষ্ঠের আসন অটুট রহিয়া যাইবে। কিন্তু কি কুক্ষণে জাহাঙ্গীর শাহ পিতা আকবরের জীবমানে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিলেন, সেই হইতে মোগল বংশের রাজকুমারগণ সকলেই প্রায় সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। জাহাঙ্গীর এবং শাজাহানের বিদ্রোহ নিষ্ফল হইয়াছিল সত্য; কিন্তু তাঁহাদের রোপিত সেই বিষতরু, ফল প্রসব করিল শাজাহানেরই শেষ জীবনে। আবার বিদ্রোহে সফলকাম ঔরঙ্গজীবের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাঁহার পুত্র আকবরও পিতার পন্থায় চলিয়াছিলেন; পিতার সৌভাগ্য যে পুত্র সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই, হইলে বৃদ্ধ পিতা শাজাহানের প্রেতাত্মা লোকান্তরে বসিয়া ঔরঙ্গজীবের অবস্থান্তর দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিত।

সামুগড় ক্ষেত্রের পরাজয়ের সঙ্গেই দারার আশালতা উন্মূলিত হইয়াছিল, তথাপি "যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ" এই প্রসিদ্ধ বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি আশাও ত্যাগ করেন নাই এবং চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই। দৈব তাঁহার প্রতিকূল, পুরুষকারকে আশ্রয় করিয়া তিনি প্রাণপণে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, এমন সময়ে নাদিরার মৃত্যু দারার নয়নে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিল, আর সেই অশ্রু সাগরের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে কর্ম্মচেষ্টা কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল, অসিমুষ্টি হস্তস্খলিত হইয়া পড়িল, প্রকোষ্ঠ বেষ্টন করিল অকৃতজ্ঞ জিউয়ানের লৌহ শৃঙ্খল। বাহাদুরের বন্দী হইয়া নিগড়বদ্ধ পদে আজ তিনি দিল্লী চলিয়াছেন। ঔরঙ্গজীব বিচার করিয়া তাঁহার কিরূপ দণ্ডের বিধান করিবেন তাহার নিশ্চয়তা নাই সত্য, কিন্তু বোধ করি ঘাতকের খড়্গাঘাতে বধের ব্যবস্থা হইবে এ কথা মুহূর্ত্তের জন্যও দারা মনে করিতে পারেন নাই। আমরা অনেক সময়ে নিজের মন দিয়া অপরের মন বুঝিবার চেষ্টা করি; দারা সহোদরের মৃত্যুদণ্ডের বিধান কোন অবস্থাতেই করিতে পারিতেন না, সেইজন্য ঔরঙ্গজীব যে ওরূপ কার্য্য করিবে এ কথা দারার মনে একবারও বোধ করি উদিত হয় নাই। তিনি হয়ত মনে করিতেছিলেন, প্রিয়বিচ্ছেদ-বেদনা ভোগ করিতে করিতে যে কয়টা দিন কাটাইতে হইবে, তাহা অপূর্ব্ব কারুসমন্বিত দেওয়ানে খাসের সভাকুট্টিমস্থ ময়ূর সিংহাসনে বসিয়াই কাটুক, বা কারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে কদর্য্য কুটীরেই কাটিয়া যাউক, তাঁহার পক্ষে উভয়ই তুল্য। নৈরাশ্যপীড়িত হইয়া, সর্ব্ব চেষ্টায় বিরত হইবার বয়স কিশোর সিপারের নহে, সেইজন্য পিতা যখন সকলগুলি অশ্বারোহী সেনাকে বিদায় দিয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় আফগান গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতেছিলেন তখন সিপার বারম্বার নিষেধ করিয়াছিল; আবার যখন দারার অঙ্গস্পর্শ করিতে জিউয়ানের অনুচরগণ উদ্যত হইয়াছে, তখন পিতাকে রক্ষা করিবার জন্য বালকের অসি পলকে কোষমুক্ত হইয়াছিল। তাই মনে হয়, বাহাদুরের বন্দীরূপে একান্তই যখন দিল্লীর পথে যাইতে হইয়াছে, তখন দারার ন্যায় সুখে দুঃখে সমান উদাসীন ভাবে, সিপার ঈশ্বরেচ্ছাকে মাথায় তুলিয়া লইতে পারেন নাই, মুক্তির উপায় কিছু করিবার সুযোগ থাকিলে সমাসন্ন-যৌবন সিপার যেকো সে উপায় করিতেন, স্বেচ্ছায় পুরতাতের কবলগত হইতেন না।

নজর বেগের নিকট আগে, ঔরঙ্গজীবের উপদেশ মত, বাহাদুর দারাকে যে ভাবে নগর প্রবেশ করাইয়াছিল তাহা মোগল রাজবংশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। হস্তিপৃষ্ঠে দারাকে নগর প্রবেশ করাইতে হইবে, যাহাতে নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা দেখিতে পায় যে সত্য সত্যই

দারা ধৃত হইয়াছে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অপর কেহ দারা নামে নিজেকে অভিহিত করিয়া সিংহাসনের দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে পারিবে না। সম্রাট বা সম্রাটের পুত্রগণ কেহই হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন না, উহা নিতান্তই অপমান সূচক বলিয়া মুসলমান সমাজে পরিগণিত হইত। দারা একটি ক্ষুদ্রাকারা, চক্ষুহীনা, ধূলি-মলিনা হস্তিনীর পৃষ্ঠে অতি কদর্য্য মলিন বসন পরিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাঁহার চরণদ্বয় নিগড়বদ্ধ, শিরোপরি কৃষ্ণবর্ণের জীর্ণ উষ্ণীষ, পশ্চাতে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ভীষণদর্শন জল্লাদ নজর বেগ উপবিষ্ট, হস্তিনীর উভয় পার্শ্বে, পুরোভাগে ও পশ্চাতে ঔরঙ্গজীবের অসংখ্য অশ্বারোহী সেনা, তাহাদের করধৃত সুতীক্ষ্ণ বর্শাফলক নিদাঘ মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্যকিরণে ঝলসিয়া উঠিতেছে। দিল্লীর সম্রাট্ বা রাজকুমারগণের সদৈন্যে দূরগমন এবং শোভা যাত্রা করিয়া নগর পরিভ্রমণের যে বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাহা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে। সর্ব্বাগ্রে উষ্ট্রোপরি ডঙ্কাধ্বনি, তৎপর হস্তিপৃষ্ঠে রণবাদ্য; পশ্চাতে বাদশাহী নহবত; হস্ত্যশ্বরথপদাতি সংগঠিত চতুরঙ্গ বাহিনীর পদাঘাতোত্থিত ধূলি পটলে গগন সমাচ্ছন্ন, কিন্তু সেই ধূলি নিবারণ জন্য গন্ধবারি সেচনে পথ কর্দ্দমাক্ত, যাত্রা পথে সর্ব্বপ্রকার দুর্গন্ধ নিবারণকল্পে দগ্ধ সর্জ্জরস-ধূম, উচ্চৈঃশ্রবার গর্ব্ব খর্ব্বকারী ইরাণ তুরাণ আরবের নর্ত্তনশীল সুদর্শন অশ্বের সারি—সারি—সারি; তাহাদের পদে স্বর্ণ-নূপুর; কণ্ঠে সুবর্ণঘণ্টিকা; মধ্যস্থলে ঐরাবত-নিন্দী বিশালকায় গজরাজ-পৃষ্ঠে সম্রাট সমাসীন, স্বর্ণ-সূত্রের অপূর্ব্ব কারুখচিত বিস্তৃত আস্তরণে গজপৃষ্ঠ সমাচ্ছন্ন, করীকরে চারুচিত্র, শিরোপরি স্বর্ণময় বিশাল মুকুট, কর্ণ-বিলম্বী স্থূল মুক্তাদাম। সম্রাটের মস্তকোপরি সুবর্ণ চন্দ্রাতপ, দেব শিশুর ন্যায় প্রিয়দর্শন ব্যজনকারী বালভৃত্য চামর হস্তে পশ্চাতে দণ্ডায়মান, বাদশাহের বৃহৎ বারণকে বেষ্টন করিয়া শরীর রক্ষী অশ্বারোহী আহদী সেনা। দিল্লীশ্বরের শোভাযাত্রার সমারোহের যথাযথ বর্ণন করিবার সাধ্য কাহারই নাই, যাহারা সে দিনে সে সমারোহ চক্ষে দেখিয়াছে তাহাদের চক্ষু সার্থক। রাজকুমার দারা ঐরূপ আড়ম্বরের সহিতই সর্ব্বদা নগরপথে ভ্রমণার্থ বাহির হইতেন। আজ তাঁহাকে ঔরঙ্গজীব যে ভাবে নগরের মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই দারার পক্ষে শতগুণে প্রার্থনীয় ছিল এবং তিনি সে মুহূর্ত্তে বোধ করি কায়মনে ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনাই করিতেছিলেন; সম্ভাবিতের অপমান মরণের অধিক, ইহা শাস্ত্রের বাণী।

দারার ধৃত হইবার সংবাদ ঔরঙ্গজীব আম দরবারে বসিয়া পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন, সুতরাং সাম্রাজ্যের কাহারই সে সংবাদ জানিতে বাকি ছিল না। দারার নগরে পঁহুছিবার দিন যখন নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, দিল্লীর চতুর্দ্দিগস্থ বহু দূরদেশ হইতে অসংখ্য নরনারী তখন রাজধানীতে সমাগত হইতে লাগিল। ঔরঙ্গজীব জানিতেন, দারা জনপ্রিয় রাজকুমার. এই বিশাল জনসঙ্ঘ যদি পথিমধ্য হইতে দারাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে বিপদ গুরুতর হইবে। একটি যুদ্ধমান বাহিনীকে সংগ্রামে পরাস্ত করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার না হইতে পারে; কিন্তু একটি সমগ্র জনপদের আবালবৃদ্ধবনিতার একান্ত ঈপ্সিত যাহা, তাহার প্রতিরোধ করা অতি বড় ক্ষমতাশালী সম্রাটের পক্ষেও সহজসাধ্য নহে। গোপনে রজনীর অন্ধকারে দারাকে রাজধানীতে আনিলে প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, সত্য সত্যই যে দারা ধৃত হইয়াছেন, একথা বহুলোকে হয়ত বিশ্বাসই করিবে না, সেইজন্য দিবালোকে দারার নগর প্রবেশ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার বিপদও কম নহে। সেই বিপদ না ঘটিতে পারে, দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দ তাহাদের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দারাকে পথিমধ্যে বল পূর্ব্বক মুক্ত করিতে না পারে, সেই হেতু অগণিত অশ্বারোহী সৈন্য অন্ধ হস্তিনীর পৃষ্ঠে দারাকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে। ইহাতেও ঔরঙ্গজীব নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, মুক্ত-তরবারি হস্তে জল্লাদের প্রকৃতি

বিশিষ্ট পিশাচতুল্য নজরবেগ দারার পশ্চাতে বসিয়া আছে, যদি দিল্লীবাসী বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে পাষণ্ড জল্লাদ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তক দেহ-বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে, ইহাই ঔরঙ্গজীবের আজ্ঞা। বিধাতার বিধানে যাঁহারা ভ্রূণরূপে এক মাতৃগর্ভে স্থান পাইয়াছিল, ভূমিষ্ঠ হইবার পরে যাহারা একই জননীর বক্ষ-নিঃসৃত পীযূষ ধারায় পুষ্ট হইয়াছে, শৈশবাবধি যাহারা একই গৃহে সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দের মধ্যে একইভাবে পালিত হইয়াছে, সেই সহোদর সহোদরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া যখন শাণিত তরবারি উত্তোলন করে, তখন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না যে, এই বিশ্বরচনার অন্তরালে এক দয়াময় পরম পুরুষের মঙ্গলেচ্ছা নিরত কার্য্য করিতেছে। স্বার্থের জন্য সংসারে নির্ম্মম নৃশংস ব্যাপার অনেক ঘটিয়াছে, কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে দিল্লীর রাজতক্ত লইয়া যে সকল পৈশাচিক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবী অন্বেষণ করিলেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। আবার ধর্ম্মধ্বজী ঔরঙ্গজীব যাহা করিয়াছেন সেরূপ কুক্রিয়া জগৎ সংসারে আর কেহ করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই; সিংহাসনের পাদপীঠ তলে সকল গুলি ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলি দিয়া তাহাদের রুধির-রঞ্জিত হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন ঔরঙ্গজীব, পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের কয় দিন গুলিকে সংক্ষিপ্ততর করিয়াছিলেন ঔরঙ্গজীব, পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনান্ত করিয়াছেন ঔরঙ্গজীব, অপর পুত্রকে ভারত বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন উদ্বেগ শূন্য করিয়াছেন ঔরঙ্গজীব, নিজ দুহিতাকে চিরজীবনের জন্য বন্দিনী করিয়াছিলেন ঔরঙ্গজীব,। ফলতঃ পিতা পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যাহাকেই তিনি তাঁহার স্বার্থের অন্তরায় বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহারই বধ, বন্ধন, নির্ব্বাসন কিছুতেই তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। সাম্রাজ্যের যাবতীয় প্রজাপুঞ্জকে প্রতারিত করিবার জন্য পশ্চিমাস্য হইয়া স্ফটিকের জপমালা হস্তে, পবিত্র আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সর্ব্ববিধ পাপাচরণের পন্থা উদ্ভাবনের চিন্তা করাই ছিল দুরাত্মা ঔরঙ্গজীবের বিশেষত্ব। পাপিষ্ঠ যে মুহূর্ত্তে নতজানু হইয়া নমাজে প্রবৃত্ত হইত, সেই পবিত্র মুহূর্ত্তে কেমন করিয়া পিতার বন্ধন, ভ্রাতার বধ, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর দেবমন্দির চূর্ণের উৎকট পাপ চিন্তা অন্তরে স্থান পাইত ইহাই পরম বিস্ময়ের বিষয়।

দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত চাঁদনি চকের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া, প্রহরী বেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ দারা চলিয়াছেন। দিল্লীবাসী অসংখ্য নরনারী পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়াছে; অন্তঃপুরচারিণী মুসলমান রমণীগণ বাতায়নে, গবাক্ষে, সৌধশিরে দাঁড়াইয়া সর্ব্বজন-প্রিয় রাজকুমার দারা ও তাঁহার কিশোর-বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র সিপারের পরম দুর্গতি ও চরম অপমানের করুণ দৃশ্য দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। কিন্তু এই রাজপথস্থ বিশাল জনসঙ্ঘ, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল, একটি মনুষ্যের একখানি হস্তও দারাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উত্তোলিত হইল না; একটি কণ্ঠও প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করিল না! ভারতবাসী জনের হৃদয় মন স্নেহপ্রবণ, উৎপীড়িতের দুঃখে সহজেই দ্রবীভূত হইয়া যায়, কাতর প্রাণে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে, কিন্তু ন্যায়ের জন্য প্রপীড়িতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অত্যাচারীর দমন করে কর্ম্মের উদ্যম তাহাদের প্রকৃতিতে নাই। আমরা বিধাতার উপরে সকল দায়িত্ব নিক্ষেপ করিয়া হা হুতোস্মি করিতেই শিখিয়াছি—"ষষ্ঠী জাগর বাসরে" লিখিত ললাট লিপির স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই, সে লিপির খণ্ডনার্থ পুরুষকারের সহায়তা গ্রহণে আমরা নিতান্তই অনিচ্ছুক। লক্ষ লক্ষ নাগরিকের চক্ষুর উপরে প্রজারঞ্জক সম্রাট শাজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া, দারা, সুজা, মুরাদের বধ সাধন করিয়া, ভারতবর্ষ বলিয়াই ঔরঙ্গজীব নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিল। অন্য কোন দেশ হইলে ঐসকল

অমানুষিক অত্যাচার করিয়া পার পাইয়া যায়, এমন ক্ষমতাশালী সম্রাটের জন্ম আজও কোথাও হয় নাই। যে মুহূর্তে দুর্গত দারার দুঃখ দেখিয়া দিল্লীবাসী দর-বিগলিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল, হয়ত তখন হর্ষিত অন্তরে, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ঔরঙ্গজীব কপট নমাজে নিবিষ্ট হইয়া, কত শীঘ্র দারার হত্যাকার্য্য শেষ করিতে পারিবেন সেই চিন্তা করিতেছিলেন। রাজাদেশ পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, তদনুসারে দারাকে সমগ্র নগরী পরিভ্রমণ করাইয়া বাহাদুর খাঁ "খাওয়াস্ পুরা" প্রাসাদে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করতঃ বাদশাহের নিকট সে সংবাদ জ্ঞাপন করিল। বৎসরাধিক কালের নিদারুণ দুশ্চিন্তা দূর হওয়ায় ঔরঙ্গজীব স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

মানসী

তুমি,
পুষ্প হয়ে লুকিয়ে ছিলে আমার মনের মাঝখানে,
মানস বনের মানসী গো, আনন্দে প্রলয় আজ প্রাণে!
নীহার কণা—হীরার দানা—মাল্য, সুঠাম ঐ গলে,
অলকপুরীর পুলকভরা নলিন নয়ন মন ছলে!
অন্তরীক্ষে তোমায় দেখে দেব-বালারা লাজ মানে,
বেরিয়ে এলে, লুকিয়ে ছিলে আমার মনের মাঝখানে!

অলকগুলি নৃত্য-চপল কোমল কপোল তুলতুলে,
নধর দুটি অধর মাঝে বাঁধল কুলায় বুলবুলে!
শীতল বায়ু শিথিল খেলায় দোলায় তোমার অঞ্চলে,
রক্ত রাঙা ললাট ঘেরি হৈম মুকুট জলজলে!
চতুর নিঠুর চপল কালো চক্ষু দুটি ঢুলঢুলে!
নইলে সারা অঙ্গখানি টুকটুকে লাল তুলতুলে!

আঙুল হেলাও যেদিক পানে সেথায় সবুজ রঙ্ ধরে!
নিশ্বাসে ঐ কুসুম ফোটে, স্পর্শে সুধার ধার ঝরে!
হাওয়ার পরে পড়ছে চরণ, ছোঁয়না যেন মৃত্তিকা—
মানস বনের গোপন জনের প্রকাশ তুমি রূপশিখা!
শুষ্ক ধরা সরস হল তোমার হরষ মন্তরে,
জরার বুকে যৌবনেরি মোহন সবুজ রঙ ধরে॥

শ্রীরামেন্দু দত্ত।

নগবালা

(উপন্যাস)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামপ্রাণ বাবুর দুর্ভাবনা।

সেই দিন রামপ্রাণবাবু সন্ধ্যার প্রাকালে বাটী ফিরিয়া তাঁহার বক্ষের মণি, বক্ষের ধন, আশার প্রদীপ পুত্রকে, কিছু বিচলিত ভাবে আহ্বান করিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না।—সে তখন তার পরম বন্ধু কৃষ্ণকমলের মহলের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিতেছিল।

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৃহিণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হস্তপদ ধৌত করিবার জন্ত জল রাখিলেন, তাঁহার ক্লান্ত হস্ত হইতে ছিন্ন ও মলিন ছত্রটী গ্রহণ করিলেন, এবং

সংবাদ দিলেন যে, পুত্র বেড়াইতে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগত হয় নাই।

সেই সংবাদে রামপ্রাণবাবুর দরিদ্র প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল, তাঁহার অবসাদক্লিষ্ট, শুষ্ক মুখে উদ্বিগ্নতার কৃষ্ণছায়া পতিত হইল। সেইদিন, আফিস হইতে বাটী ফিরিবার পথে তিনি এক যুবককে, এক দ্রুতগামী মোটর গাড়ীর তলায় পড়িয়া প্রাণ হারাইতে দেখিয়াছিলেন। যদিও তিনি আপন নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়াছিলেন যে, মৃত যুবক, তাঁহার নয়নমণি জ্যোতিঃপ্রকাশ নহে, তথাপি তাঁহার পিতৃ-হৃদয় মধ্যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল যে, সেইরূপ বিপদ তাঁহার পথচারী পুত্রেরও ঘটিতে পারে। তাই তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বাটী আসিয়াছেন, এবং তাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

এক্ষণে গৃহিণীর মুখে পুত্রের বেড়াইতে যাইবার সংবাদ পাইয়া, তাঁহার স্নেহময় অন্তর মধ্যে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। তাঁহার ভয়ের কারণের কথা তিনি গৃহিণীর নিকট বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া গৃহিণী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "বাট! জ্যোতিঃপ্রকাশের আমার তেমন বিপদ হবে কেন? আমরা ত ভগবানের কাছে কোন অপরাধ করিনি, তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি কাপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে, জলখাবার খেতে বস। তুমি জলখাবার খেতে খেতেই সে বাড়ী এসে পড়বে।"

কতকটা আশ্বস্ত হইয়া রামপ্রাণবাবু হাত মুখ ধুইয়া জলখাবার খাইতে বসিলেন, কিন্তু সেই সামান্য সামগ্রীও উদরস্থ করিতে পারিলেন না। খাদ্যদ্রব্য মুখে তুলিতে যাইয়া কেবল তাঁহার সেই লোমহর্ষণ বীভৎস দৃশ্যের কথা মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল। আহার ত্যাগ করিয়া তিনি সেই প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন করিলেন। নিকটোপবিষ্টা গৃহিণীকে সজল নয়নে কহিলেন, "যাদের ছেলে,—উঃ—তাদের আজ কি সর্ব্বনাশই হয়ে গেল। যখন শুনবে, তাদের বুক ফেটে যাবে। জলজ্যান্ত ছেলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, যখন ফিরে দেখবে, তাদের সেই ছেলের কি দশা হ'য়েছে, তখন...উঃ! সে কথা ভাবতেও দম আটকে যায়! কি ভয়ানক! কলকাতার রাস্তায় চলা প্রাণ হাতে করে যাওয়া।"

গৃহিণীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়াছিল; তিনি বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার হেঁটে আসবে না। যাবার সময়, ট্রাম ভাড়ার জন্যে, আমার কাছ থেকে আট আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে গেছে।"

শুনিয়া, রামপ্রাণবাবু হৃদয়ে কতকটা শান্তি লাভ করিয়া, গৃহিণী প্রদত্ত কলিকা থেলো হুকার মাথায় বসাইয়া ধূমপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইত্যবসরে তরকারির পেতে এবং বঁটী লইয়া গৃহিণী কর্ত্তার সম্মুখে বসিয়া রাত্রের আহারের ব্যঞ্জন কুটিতে লাগিলেন; এবং এক একবার পুত্র প্রত্যাগমন আশায় বহির্দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তরকারী কোটা সমাপ্ত হইলে, তিনি উঠিয়া সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিলেন এবং দেবতা সকলকে বার বার প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে ঠাকুর! জ্যোতিঃপ্রকাশকে কুশলে রেখ; আর আজ, দোহাই তোমার, তাকে শীগ্‌গির করে বাড়ী এনে দাও।"

কিন্তু কলির দেবতাগণ নির্ব্বোধ; সহজে তাঁহার কথা শুনিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতে দেখিয়া, রামপ্রাণবাবুর শঙ্কিত হৃদয় অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুল স্বরে গৃহিণীকে কহিলেন, "কৈ, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, এখনও ত সে এল না। সে একদিনও ত এত রাত করে আসে না, সে ত আমার তেমন ছেলে নয়।"

গৃহিণীর মনোমধ্যেও অত্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বিহ্বল স্বামীকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "এখনও রাত হয়নি; এক এক বার বাড়ী ফিরতে এর চেয়ে একটু দেরী হ'য়ে যায়। আর দেরী হ'বে না; এই এল বলে।"

রামপ্রাণবাবু কাতরস্বরে বলিলেন, "যাই, দরজায় দাঁড়িয়ে একটু দেখি, রাস্তায় আসছে কি না।"

গৃহিণী কহিলেন, "তুমি বস। আমি গিয়ে দেখে

আসি।" এই বলিয়া গৃহিণী বাহিরের দ্বারে গিয়া, পুত্রানুসন্ধানরতা মাতার তীক্ষ্ণ নয়ন দিয়া গ্যাসালোকিত রাস্তার সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু লোক-সমারোহ মধ্যে জ্যোতিঃপ্রকাশের চিহ্নমাত্র দেখিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে ভগ্ন মনোরথ হইয়া জিজ্ঞাসু স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহিণীকে প্রত্যাগতা দেখিয়া রামপ্রাণবাবু উৎসুকনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতে পেলে?"

গৃহিণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "না, সে ত কখনও এত দেরী করে না।"

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রাত্রের অন্ধকারে পরিণত হইল. দেখিয়া রামপ্রাণবাবুর ভাবনা অসহ্য হইল। তিনি অস্থির হইয়া কাতর কণ্ঠে গৃহিণীকে বলিলেন, "দাঁড়াও, আমি রাস্তাটায় একটু বেরিয়ে দেখে আসি, আসছে কি না!" এই বলিয়া দারিদ্র্যক্লিষ্ট রামপ্রাণবাবু পরিশ্রমজীর্ণ অবসন্ন দেহ লইয়া রাজপথে বাহির হইলেন। সেখানে গ্যাসের আলোকে প্রত্যেক পথিকের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল; শ্রীমানের মুখচন্দ্র কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না।

কোথায় সন্ধান পাইবেন? শ্রীমান তখন বন্ধুবর কৃষ্ণ-কমলের সহিত একত্র বসিয়া, কলেজ স্কোয়ারের নূতন হোটেলে, চপ্ নামক এক অজানিত দ্রব্য, এবং সম্ভবতঃ গলিত মাংস এবং অন্য অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত কট্‌লেট্ মহানন্দে আহার করিতেছিল; আর মনে মনে ভাবিতেছিল, কি উপাদেয় সামগ্রীই উদরস্থ করিতেছে! বাস্তবিক সে, সেই আনন্দের মাঝে ভাবেই নাই যে, তাহার অদর্শনে, তাহার পিতা এতটুকু চিন্তিত হইতে পারেন। জ্যোতিঃপ্রকাশ বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত বটে; কিন্তু পিতা মাতার সুবিধা বা অসুবিধার কথা কখনই সে ভাবে নাই; তাহা শিক্ষা করিবার কখনই তাহার সুযোগ ঘটে নাই। ইহা কেবলমাত্র তাহার দোষ নহে; আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর দোষ।

রামপ্রাণ বাবু আরও কিছুক্ষণ চিন্তিত মনে ও ক্লান্ত দেহে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। পরে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া মনে করিলেন, বুঝি এতক্ষণ অন্য পথ দিয়া শ্রীমান্ বাটী ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি আশান্বিত হৃদয়ে, কুলপ্রদীপকে দেখিবার জন্য ত্বরিত পদে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু তাহাকে বাটীতে না দেখিয়া, আবার চারিদিকে নিরাশার অন্ধকার দেখিলেন; এবং গৃহিণীর উদ্বেলিত চিত্তকে আরও উদ্বেলিত করিয়া তুলিলেন।

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল; গাঢ় অন্ধকারে বাটী আচ্ছন্ন হইল। তথাপি জ্যোতিঃপ্রকাশ ফিরিল না। রাম-প্রাণ বাবু ও তাঁহার গৃহিণীর মনে উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। পুত্রের—বিশেষতঃ একমাত্র কৃতবিদ্য পুত্রের—বিপদ আশঙ্কায় তাঁহাদের বিশুষ্ক মুখ, রজনীর মতই, অন্ধকার হইয়া গেল। তাঁহাদের লোচনদ্বয় কেবল অশ্রুজলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। সজল নয়নে, বিহ্বল চিত্তে, সেই অন্ধকারে বসিয়া তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন। জ্যোতিঃ-প্রকাশ যদি আগে কখন কখনও বিলম্বে বাটী আসিত, তাহা হইলে, সে বিলম্বেই আসিবে ইহা মনে করিয়া, তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু পূর্ব্বে সে ত কখনও বাটী ফিরিতে এমন অযথা বিলম্ব করে নাই। এ বিলম্বের অবশ্যই কোন কারণ আছে। তাঁহারা সেই মৃত যুবকের কথা মনে করিয়া ভাবিলেন যে, সেই কারণটা অবশ্যই তাহার কোনও বিপদ। প্রাণাধিক পুত্রের বিপদে তাঁহারা কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেন? তাঁহারা চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, প্রথমেই নিকটবর্ত্তী থানায় খবর লওয়া তাঁহা-দের কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবামাত্র রামতনু বাবুর জীর্ণ ও অবসন্ন দেহে যেন তড়িৎ সঞ্চারিত হইল। তিনি মহা অস্থিরতা দেখাইয়া, অতি সত্বর একটি লণ্ঠন জ্বালিয়া লইলেন; এবং লাঠিটি হস্তে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং গৃহিণীকে বলিলেন, "তাহ'লে আমি থানা থেকে খবরটা নিয়ে আসি।"

গৃহিণীর তখন আর স্বামীর অবসন্ন দেহের কথা মনে

ছিল না। তিনি সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "তাই যাও, থানায় একবার খোঁজ নিয়ে এস।"

কিন্তু রামপ্রাণ বাবুর থানায় যাইবার দরকার হইল না। তাঁহাদের ঠিকা ঝি আপন কার্য্য সারিয়া বাটী যাইতেছিল; সে দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ দিল, "ঐ যে গো, দাদাবাবু বাড়ী আসছে। তোমরা কেমন একটুতেই বাড়াবাড়ী কর।"

ঝির বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই, অনুসন্ধানের ধন, দ্বারের বাহিরে, মুখ হইতে সিগারেটের ধূম ত্যাগ করিয়া, এবং সিগারেটের ভুক্তাবশিষ্ট টুকরাটুকু ফেলিয়া দিয়া, বাটীতে প্রবেশ করিল। তাহার চন্দ্রমুখের উদয়ে মাতা-পিতার হৃদয়ে আবার শান্তির জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরিচয়।

ইহার পর, কয়েকদিন, জ্যোতিঃপ্রকাশ, জ্যোতির্ম্ময়ীর কিংবা কৃষ্ণকমলের শুভ সন্দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই সকালে সকালে বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলাটা তাহাদের ধ্যানেই অতিবাহিত করিয়াছিল। পিতামাতাও ঘরের ছেলেকে ঘরে দেখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আজ আবার সে সেই ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে আসিয়াছিল। আজ তাহার সহিত রমেশ কিংবা অন্য কোন বন্ধু আগমন করে নাই।—নবীন প্রেমিকগণ বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গ পছন্দ করে না; নিঃসঙ্গ থাকিয়া, একাকী প্রেম বিষয়ে বা প্রেমময়ীর ধ্যানে সময় কাটাইতে ভালবাসে। জ্যোতিঃপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিয়া অবধি বন্ধুদের সঙ্গ সাধ্যমত ত্যাগ করিত।

উদ্যান মধ্যে ইতস্ততঃ সতৃষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সে কৃষ্ণকমল বা জ্যোতির্ম্ময়ীকে কোনও স্থানে দেখিতে পাইল না; তাহারা কি উদ্যান ভ্রমণ ত্যাগ করিল? নিরাশায় হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আজও কি বাড়ী ফিরিবে? ভগবান, দয়াময়! সেই ভুবনমোহিনীকে আবার দেখাও; তাহার রূপালোকে নবীন প্রেমিকের নিরাশাচ্ছন্ন অন্ধকার বক্ষঃ আবার আলোকিত কর; এই মৃতকল্পকে আবার স্বর্গের সুধা খাওয়াইয়া সঞ্জীবিত কর।

দয়াময় ভগবান তাহার হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা শুনিলেন, এবং তাহা আশু পূর্ণ করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে দেখিল যে, গেটের ভিতর দিয়া এক প্রৌঢ়া, অতি শুভ্র বসনে তাঁহার সুঠাম দেহ আবৃত করিয়া, অতি মন্থর গমনে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন; তাঁহারই পশ্চাতে সালঙ্কারা জ্যোতির্ম্ময়ী, একখানি ফিরোজা রংএর রেশমী শাড়ী পরিয়া এবং জুতা মোজা প্রভৃতি আঁটিয়া, সাদা মেঘের অন্তরালে পূর্ণিমার চন্দ্রের মত, বাগানের প্রেমময় পথে ধীরে—অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

দেখিয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ আপন টেরীতে হাত বুলাইয়া চুলগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া লইল; পাঞ্জাবীর গলায় হাত দিয়া, তাহার সোণার বোতামগুলি ঠিক লাগান আছে কি না পরীক্ষা করিল; চক্ষু হইতে সোণার চশমা খুলিয়া রুমালে তাহা মুছিল; কাপড়ের কোঁচান্‌তে হাত বুলাইয়া তাহা ঠিক করিয়া লইল; লপেটা রুমালে ঝাড়িল; এইরূপে আপনাকে সুসংস্কৃত করিয়া, তাহাদের অপেক্ষায়, তাহাদের আগমন পথের পার্শ্বে একটা বেঞ্চে বসিয়া রহিল।

ক্রমে তাহারা নিকটবর্ত্তিনী হইল; ক্রমে তাহাদের পরিধেয়ের সৌরভ জ্যোতিঃপ্রকাশের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; ক্রমে তাহাদের কথোপকথনের মধুর ধ্বনি তাহার উৎকর্ণ কর্ণে মধু বর্ষণ করিল। কথোপকথন কালে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রৌঢ়াকে একবার 'মা' বলিয়া সম্বোধন করায়, জ্যোতিঃপ্রকাশ বুঝিল যে এই শুভ্রবেশধারিণী প্রৌঢ়াই জ্যোতির্ম্ময়ীর ধনবতী জননী। তাঁহারা বেঞ্চের নিকট সমাগতা হইলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ সসম্ভ্রমে বেঞ্চ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী এবং তাহার মাতা গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাস্যরস মাখিয়া এবং ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন করিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া আরও অগ্রসর হইলেন। জ্যোতিঃপ্রকাশের শ্রবণ সীমা অতিক্রম করিয়া জননী কন্যাকে

মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোকরাও বেশ সভ্য; আর দেখতেও মন্দ নয়। তুই ওকে চিনিস?"

অপরা যুবতীরা কি করে আমরা তাহা অবগত নহি। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী কোন যুবকের সুন্দর মুখ দেখিলে আপন মনে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইত; এবং সেই চিত্রের উজ্জ্বল বর্ণ সহজে মলিন হইত না। তাই জ্যোতিঃপ্রকাশকে একবার মাত্র অবলোকন করিয়া সে তাহাকে ভুলে নাই। মাতার প্রশ্নে সে বলিল, "সাত আট দিন আগে ওকে এই বাগানে বসে থাকতে দেখেছিলাম।"

মাতা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "সাত আট দিন আগে তুই এই বাগানে এসেছিলি; কৈ, সে কথা ত আমাকে বলিস্‌নি; কার সঙ্গে এসেছিলি?"

সে কৃষ্ণকমলের সঙ্গে প্রেমলীলা করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু সে কথা ত মাতার কাছে প্রকাশ করিতে পারে না; তাহার সহিত ভ্রমণে যে মাতার বিশেষ আপত্তি ছিল। সে মনে করিল, বাগানে আসার কথা মাতার নিকট প্রকাশ করা ভাল হয় নাই। এখন কথাটা সংশোধন করিয়া লইতে হইলে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে সে কখন পরাঙ্মুখ হয় নাই; আজও হইল না। মিথ্যা-বাদিনী কহিল, "আমি বাড়ী থেকে যায়নি ত, তুমি জানবে কেমন করে? আমি একবারে কলেজ থেকে ক'জন মেয়ের সঙ্গে ট্রামে গিয়েছিলাম। বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ঐ ছোকরাটাকে একটা বেঞ্চে একলাটি বসে থাকতে দেখেছিলাম। এর বিষয় আর কিছু আমি জানিনে।"

যদি পরিচয়ই নাই তবে নমস্কার করিল কেন, সে সম্বন্ধে জননী কন্যাকে কোনও প্রশ্ন করিলেন না। অপর গম্ভীর চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি ভাবিতে-ছিলেন ঐ শিষ্ট যুবকটিকে জামাতা করিতে পারা যায় কি না। ছোকরা সুন্দর বটে, কন্যার পছন্দ মত সুন্দর কি না জানিয়া লইতে হইবে; উহার পরিচয় লইয়া, উহার কুল শীল ও গুণপনার খবর লইতে হইবে। তাঁহার অর্থ আছে, তিনি কন্যার জন্য কেন পছন্দমত জামাতা পাইবেন না? টাকায় যে কুলশীল সৌন্দর্য্য গুণপনা সকলই কিনিতে পারা যায়! কৃষ্ণকমলটা জ্যোতির্ম্ময়ীকে বিবাহ করিতে চায়; কি স্পর্দ্ধা! রাস্তার কুকুর দেবতার মাথার মণি চায়! চিন্তিত মনে তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই ওর নাম কি বলতে পারিস?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল, "না। আমি ত বলেছি আমি ওর বিষয় কিছুই জানিনে। সেদিন কেবল বসে থাকতে দেখেছিলাম।"

মাতা কন্যার মন বুঝিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন, "ছোক-রাটি বেশ দেখতে; নয়?"

ছলনা শাস্ত্রে মাতা অপেক্ষা কন্যা কম পারদর্শিনী নহে; সে মাতাকে নিজের মনোভাব কোনরূপে জানিতে দিল না। কেবল দ্ব্যর্থবোধক একটি ছোট শব্দে মাতার প্রশ্নের উত্তর দিল, "হবে!"

মাতা কন্যার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া, কহিলেন, "ওর পরিচয় নিতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সন্দেহব্যঞ্জক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করে নেবে?"

মাতা ঈষৎ গর্ব্বে মুখমণ্ডল গম্ভীর করিয়া কহিলেন, "তা পরে বুঝতে পারবি। এখন চল্‌, এই পথে আবার তার সমুখ দিয়ে ফিরে যাই।"

কন্যাসহ মাতা ফিরিলেন। ধীর পাদবিক্ষেপে আবার পূর্ব্বপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। ক্রমে জ্যোতিঃপ্রকা-শের বেঞ্চের পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন মনে করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল; তাঁহারা আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রতিনমস্কার করিলেন। কি জানি কেন, মাতা আপন পরিস্কৃত মুখ ও নির্ম্মল ঘর্ম্মহীন ললাট, কটিদেশে হইতে রেশম রচিত অতি শুভ্র রুমাল লইয়া মার্জ্জন করি-লেন। পুনরায় কটিদেশে রুমালখানি রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় চেষ্টা সফল হইল না। যেন অসাবধানে তাহা রাস্তায় পড়িয়া গেল। যেন রুমাল পতনের বিষয় কিছুমাত্র জানিতে না পারিয়াই মাতা কন্যাসহ অগ্রসর হইলেন।

বলা বাহুল্য, ইহা একটা ছলনামাত্র। সুদূর সাগরপার

হইতে আমরা এই ছলনা আমদানি করিয়া, আমাদের মাতৃভূমির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেছি।

ছলনাময়ীর রুমালের টোপ ফেলা সার্থক হইল। আমাদের জ্যোতিঃপ্রকাশ বাবাজীবন সে টোপ সহজেই গলাধঃকরণ করিল। অসাবধানে পড়িয়া গিয়াছে মনে করিয়া, শ্রীমান মাতার হস্তচ্যুত রুমালখানি রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইল, এবং উহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

জ্যোতিঃপ্রকাশের পদশব্দে ছলনাময়ী মাতা ও কন্যা উভয়েই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। উভয়েই ছল বিস্ময় ও ভীতি বিস্ফারিত লোচনে প্রকটিত করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশের দিকে তাকাইলেন। জ্যোতিঃপ্রকাশের হস্তে আপন পরিচিত রুমালখানি দেখিয়া মাতা প্রশ্নপূর্ণ কটাক্ষ করিলেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ একবার মাত্র প্রেমপূর্ণ নয়নে জ্যোতির্ম্ময়ীর উজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সসম্ভ্রমে মাতাঠাকুরাণীকে কহিল, "আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার এই রুমালখানি রাস্তায় কি রকম ভাবে পড়ে গিয়েছিল। দেখতে পেয়ে আমি আপনাদের দেবার জন্যে কুড়িয়ে এনেছি।"

মাতা প্রথমে একটা ছোট "ওঃ" বলিয়া রুমালখানি আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন। পরে উহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এখানি আমার রুমালই ত! অতি সামান্য জিনিষ; হারিয়ে গেলে কিছুই ক্ষতি হত না। কিন্তু এরই জন্যে আপনি—তুমি যে কষ্ট স্বীকার করেছ, এবং ভদ্রতা দেখিয়েছ তা অতি মহৎ! এর জন্যে আমরা তোমার নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকব। তোমার নামটি কি, বাবা?"

জ্যোতিঃপ্রকাশ বলিল, "আমার নাম শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়।"

মাতা ঈষৎ হাস্যরসে আপনার গাম্ভীর্য্য কিছু নরম করিয়া বলিলেন, "বেশ! বেশ নামটী ত তোমার! এ নাম আমার চিরকাল মনে থাকবে।—আমার যে মেয়ের নামও জ্যোতি—জ্যোতির্ম্ময়ী।"

নিজের নামের উল্লেখ হওয়ায়, এবং জ্যোতিঃপ্রকাশের সহিত তাহার নামের মিল হওয়ায়, জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার দিকে লজ্জাবিজড়িত কটাক্ষপাত করিয়া আপন লজ্জারক্ত আনন অবনত করিল; তাহার কৃষ্ণপক্ষ্ম-বিশিষ্ট লোচনদ্বয় ভূমিতে আবদ্ধ রহিল।

সেই লজ্জাবনত মুখের অরুণিমা দেখিয়া, সেই কৃষ্ণচক্ষু পল্লবের মধুরিমা দেখিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশের মনে হইল, এ মুখের তুলনা নাই; ইহা নিশ্চয় স্বর্গসুধা গাঢ় করিয়া, দেবহস্তে দেব আদর্শে গঠিত হইয়াছে।—এ মুখের সুষমায় বিরাট আকাশ পূর্ণ হইয়া যায়!

মাতা দেখিলেন মুগ্ধ জ্যোতিঃপ্রকাশ কন্যার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে; তাহার রূপ সুষমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মাতা এই সুযোগ অবহেলা করিলেন না। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহার বাড়ী কোথায়, সে কি কায করে, কতদূর পড়িয়াছে, বিবাহ হইয়াছে কি না, তাহার মা বাপ বর্ত্তমান আছেন কি না, ইত্যাকার তাহার সমস্ত পরিচয়ই গ্রহণ করিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে কথাটা বন্ধুবান্ধবদের নিকট যেমন গোপন রাখিয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহা সেইরূপ গোপন রাখিল। তাহার পরিচয় পাইয়া, মাতৃদেবী মনে মনে তাহাকে জামাতৃপদে বরণ করিলেন। এবং তাহাকে আপন বাটীর ঠিকানা দিয়া, মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

নিমন্ত্রণ-রক্ষা।

মাতা ঠাকুরাণীর মধুর আহ্বানের কথা, শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশ, রক্ষাকবচের ন্যায়, হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিল।

পর দিন প্রভাত হইতেই নিমন্ত্রণ রক্ষার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। নিজের যে সকল পরিচ্ছদ ছিল, তাহার উৎকৃষ্টগুলি, জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রভাতে গাত্রোত্থান

করিয়াই বাহির৷ গুছাইয়া রাখিয়াছিল। শ্বশুরবাড়ী হইতে আগত, পুজার জরিপাড় কাপড় ও উত্তরীয় কুঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল; শ্বশুরবাড়ীরই সিল্কের পাঞ্জাবীতে তৎস্থান হইতে প্রাপ্ত, স্বর্ণের বোতাম গুলি মার্জ্জিত করিয়া লাগাইয়া রাখিয়াছিল; শ্বশুরবাড়ীর আমদানি ময়ূরকণ্ঠি রঙের লপেটাটি পালিশ করিয়া, দর্পণের মত করিয়াছিল, বিবাহ উপলক্ষে প্রাপ্ত হীরকাঙ্গুরীয়, রিষ্ট ঘড়ী এবং তাহা ধারণের সুবর্ণ গঠিত কঙ্কণটী, সাবান, খড়িমাটী ও শাবর চর্ম্মের দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল; এবং তদুপলক্ষে ক্রীত কনক ফ্রেমবিশিষ্ট চশমার ফ্রেমটি সাধ্যমত পরিষ্কৃত করিয়াছিল। দীর্ঘ প্রভাত সময় কেবল এই কার্য্যেই অতিবাহিত হইল।

বিধাতার দারুণ বিড়ম্বনা এই যে, জ্যোতিঃপ্রকাশ নবপ্রণয়িনীর সাক্ষাৎকারে যাইবার জন্ত যে সকল সজ্জা সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল, এমন কি যে গন্ধদ্রব্যও মাখিবার জন্ত বাহির করিয়াছিল, তৎ সমুদায়ই পূর্ব্ব শ্বশুরবাড়ীর অর্থে ক্রীত, কিংবা তৎস্থান হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু সে কথা সে ভাবে নাই। ভাবিলে, তাহার হৃদয় মধ্যে কোনও অনুশোচনা আসিত কি? না; আমরা জানি, তাহার হৃদয় সেরূপ উপাদানেই গঠিত হয় নাই।

দ্বিপ্রহরের সময়টা, জ্যোতিঃপ্রকাশ দেহখানি সাবান দ্বারা মার্জ্জন ও পুনর্মার্জ্জন করিবার জন্ত অতিবাহিত করিয়াছিল। তৎপরে আহারাদি করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়াছিল; এবং আরও পরে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রায় পূর্ব্বাহ্নের শ্রমক্লান্তি বিদূরিত করিয়া দেহসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

অপরাহ্ণে রৌদ্রতেজ ঈষৎ মন্দীভূত হইলে, সময়ের ধীর মন্থর গতিতে জ্যোতিঃপ্রকাশ একান্ত অধীর হইয়', সে তাহার কেশবিন্যাস করিল; সম্মুখের অতিদীর্ঘ কেশগুলি পশ্চাৎ ভাগের অতি ক্ষুদ্র কেশের উপর বিন্তস্ত করিয়া, গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে, কদলী বৎসের শিরাকণ্টকের ন্তায়, কিংবা নীরদ মধ্যে সরল দামিনীছটার ন্তায়, সূক্ষ্ম এবং উজ্জ্বল সিঁথি কাটিল; বলাবাহুল্য, একটী কেশও তাহার সুপটু হস্তের কৌশলে স্থানভ্রষ্ট রহিল না। তৎপরে কিঞ্চিৎ গন্ধজল মুখমণ্ডলে সিঞ্চিত করিয়া, শ্রীমুখ তোয়ালের দ্বারা মুছিয়া সে আপন বরদেহ সজ্জিত করিল।

উপরিউক্ত দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়া সে নিম্নে মাতার নিকট নামিয়া আসিল; এবং ট্রামভাড়া (প্রকৃতপক্ষে সিগারেট কিনিবার) পয়সা চাহিল।

মাতা পুত্রের বেশবিন্যাস দেখিয়া, হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবি, জ্যোতি?"

মাতার সরল প্রশ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশ রুষ্ট হইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, "সে কথায় তোমার দরকার কি? ট্রাম ভাড়ায় পয়সা দেবে কিনা বল?"

মাতার প্রতি বুদ্ধিমান সুশিক্ষিত পুত্রের এই কি ভাষা? উচ্চশিক্ষার অভিমান লইয়া, বাহিরে সুসভ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া, এবং পয়সার জন্ত প্রার্থী হইয়া পুত্র কিরূপে আপন জননীর প্রতি এই ভাষা প্রয়োগ করিল? হায় বিধাতা! তোমার গঠিত মানব হৃদয়ে কি এতটুকু মাতৃভক্তি দাও নাই, এই সুন্দর মুখে কি এতটুকু বিনয় বচন দাও নাই? কিন্তু এইরূপ মানব কি বিধতার সৃষ্টি? তাহা হইলে, কি তাঁহার বিশ্বরাজ্য এখনও চলিত?

জননী নির্ব্বাক বদনে পুত্রের প্রার্থিত অর্থ আনিয়া দিলেন, এবং কলিকাতার বিপদ-সঙ্কুল রাস্তার কথা ভাবিয়া শঙ্কান্বিত হৃদয়ে স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন আবার ফিরে আসবে?"

সুসজ্জিত ও সুসভ্য পুত্র, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, আপন গর্ভধারিণীর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। গমনোন্মুখ হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া, চলিতে চলিতে কর্কশ কণ্ঠে কহিল, "আগে তা' বলে যেতে পারি নে।"

মাতা আর কিছু বলিলেন না। কেবল দেবতা-দিগের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিলেন যে, পুত্রের গমন ও প্রত্যাগমন পথ যেন তাঁহাদিগের কৃপায় নিরঙ্কুশ হয়; যেন প্রতিপাদক্ষেপে পুত্রের পদ কোমল কুসুমের উপর পতিত হয়।

মাতার প্রার্থনা অনুযায়ী দেবতারা মিলিয়া, শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশের প্রেমপথ নিরঙ্কুশ ও কুসুমাকীর্ণ করিয়া ছিলেন। সেই পথে, সে কোনও স্থানে অপেক্ষা না করিয়া একবারে উল্কাগতিতে প্রণয়িনীর আবাস বাটীতে পৌঁছিয়াছিল।

বহির্দ্বারের সম্মুখের রাস্তার দিকে জ্যোতির্ম্ময়ীর একটি চক্ষুর দৃষ্টি সর্ব্বদাই নিবদ্ধ থাকিত। সেই পথে কেহ আগমন করিলে সে সর্ব্বাগ্রে তাহার নয়নপথের পথিক হইত। সে জ্যোতিঃপ্রকাশকে সেই পথে আসিতে, এবং তাহাদের গৃহদ্বারে প্রবেশ করিতে দেখিল। দেখিয়াই সে ত্বরিত বেগে মাতার নিকট সংবাদ দিল, "কালকার সেই লোকটি, সেই বাগানে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এর মধ্যেই হাজির হয়েছে।"

মাতা কহিলেন, "আজই যে আসবে, তা' আমিও মনে করিনি। কিন্তু যখন এসেছে, তখন একটু পরে, আমি বস্‌বার ঘরে ওর সঙ্গে দেখা করব। আর আমাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হ'লে, তুই একটু সেজে গুজে, কোনও একটা অছিলা করে, সেই ঘরে আসিস্। মনে রাখিস্, ঐ ছোক্‌রার সঙ্গেই তোর আমি বিয়ে দেব। যেন কোন রকমে হাতছাড়া না হয়।'

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া বলিল, "আর ওকে যদি আমার পছন্দ না হয়?"

মাতা কহিলেন, "তবে কাকে পছন্দ হবে, শুনি? কেষ্টাকে?"

জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "মা, তুমি মনের ভিতর এই একটা ভুল করে রেখেছ। কৃষ্ণকমল দাদাকে আমি বড় ভাইয়ের মত দেখি; তাকে কখনই আমি বিয়ে করব না।"

মাতা বলিলেন, "আর বিয়ে করব বল্লেও, আমি সে বিয়েতে কখনও মত দেব না; একথাটা ঠিক জেনে রাখিস। আর ওই ছোকরা নিজের যা পরিচয় দিয়েছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওর সঙ্গেই আমি তোর বিয়ে দেব;—ওকে তোর পছন্দ হোক আর নাই হোক।"

জ্যোতির্ম্ময়ী মাতার কথার কোনও উত্তর দিল না। মুখখানা গম্ভীর করিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, একজন পরিচারিকা আসিয়া গৃহিনীকে আগন্তুকের আগমন সংবাদ দিল।

গৃহিনী আদেশ করিলেন, "আগে দেখ্, বস্‌বার ঘরটা কোনও রকম অগোছান আছে কিনা। যদি একটুও অগোছান থাকে, তবে সে ঘরটা বেশ করে গুছিয়ে নে। তার পরে, ছোক্‌রাকে ডেকে এনে সেই ঘরে বসাবি। আমি কাপড় চোপড় একটু গুছিয়ে প'রে, একটু পরে তার সঙ্গে দেখা করব।"

দাসী কর্ত্রীর আদেশ পালন জন্ম চলিয়া গেল। কর্ত্রী গাত্রোত্থান করিয়া, আপন দেহের ও পরিচ্ছদের পরিপাট্য সাধন জন্ম প্রসাধন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রকাশ দ্বারবানের নিকট একখানা চেয়ারে বসিয়া, দুরু দুরু বক্ষে পরিচারিকার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় পনের মিনিট কাল পরে দাসী প্রত্যাগতা হইয়া কহিল, "আসুন।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ দাসীর অনুগামী হইয়া, মর্ম্মরসোপনাবলী অতিক্রম করিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশ উপরে উঠিল;—তাহার মনে হইল, সে ধাপে ধাপে স্বর্গে উঠিতেছে। তথায় সে সুসজ্জিত অনতিবৃহৎ বসিবার ঘরে গিয়া বসিল;—তাহার মনে হইল, সে যেন পারিজাত শোভিত, স্বর্গীয় গন্ধামোদিত নিকুঞ্জে বসিয়াছে। কিন্তু সে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে তথায় স্বর্গের রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী নাই।

পরিচারিকা তাহাকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে দেখিয়া বলিল, "আপনি একটু বসে থাকুন। মা এখনই আসবেন।"

জ্যোতিঃপ্রকাশ দাসীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজা রবিবর্ম্মা মাদ্রাজ অঞ্চলের লোক। মাদ্রাজ বলিয়া মাদ্রাজ? একেবারে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মানুষ, তাঁহার দ্বারবানটিও সেই দেশের। এই দ্বারবান প্রবর তাঁহার দেশের ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষাই জানেন না। আমি বাঙ্গালা, হিন্দী, ইংরাজি এই তিন ভাষা দ্বারা আমার আগমন প্রয়োজন জানাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই ফল হইল না; সঙ্গে 'কার্ড' ছিল না, থাকিলে উহা তাহার হাতে দিয়া ইঙ্গিতের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে আমি রাজা রবিবর্ম্মার দর্শন-প্রয়াসী। অবশেষে ইঙ্গিতের সাহায্যই লইলাম। হস্তদ্বারা কাগজ কলম বা শ্লেট পেনসিল বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে রঙ্গীন উষ্ণীষধারী, কামিজ কোট এবং তদুপরি উত্তরচ্ছদে আবৃত শুম্ফবিশিষ্ট একটি ভদ্রলোক বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, এবং আমার মূকবৎ অভিনয়ের চেষ্টা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন আমি কি বিপদে পড়িয়াছি। আগন্তুক ভদ্রলোকটির এ বাড়ীতে যাওয়া আসা আছে, তিনি দ্বারবানটিকে জানেন, ইহা তাঁহার নিকট পরে শুনিয়াছিলাম। ভদ্রলোকটির মূর্ত্তি দেখিলেই অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং সদা প্রফুল্ল বলিয়া মনে হয়। তিনি সুন্দর ইংরাজিতে আমাকে আমার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমার আগমনের কারণ শুনিবামাত্র আমাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। কহিলেন আমি রাজা রবিবর্ম্মার পুরাতন বন্ধু, আমি সঙ্গে করিয়া আপনাকে লইয়া গেলে রাজা কিছুই মনে করিবেন না, এবং রবিবর্ম্মা অতিশয় ভদ্র, তাঁহার শিষ্টাচারের অবধি নাই, তবে আপনি সেখানেও বিপদে পড়িবেন, কারণ তিনিও হিন্দী বা ইংরাজি ভাল বলিতে পারেন না, তবে কাজ চলিয়া যায়। যাহা হউক আমি দোভাষীর কার্য্য করিব।—এই কয়টি কথা বলিবার সময়ে তাঁহার হাস্যোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে প্রতিভা এবং বুদ্ধির অসামান্য জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলাম, বিশেষতঃ তাঁহার চক্ষুর দীপ্তি অনন্যসাধারণ বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই ধারণা জন্মিয়া গেল, পরে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সে ধারণা আমার আভমূল হইয়া গিয়াছিল।

আগন্তুক ভদ্রলোকের নাম ছিল পুরুষোত্তম রাও তেলাঙ্গ। ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের পরলোকগত জজ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। যাঁহার কথা বলিতেছি সেই পুরুষোত্তম আজ লোকান্তরে, তাঁহার মৃত্যুতে একজন যথার্থ অন্তরঙ্গ বন্ধু আমি হারাইয়াছি।

পুরুষোত্তম আমাকে সঙ্গে করিয়া দোতালায় যেখানে রাজা রবিবর্ম্মার চিত্রগৃহ (Studio) সেই কামরায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম রবিবর্ম্মা ইজেলের (Easel) নিকট দাঁড়াইয়া একমনে চিত্রকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা রামবর্ম্মা (?) নিকটে দাঁড়াইয়া আমার অবোধ্য ভাষায় চিত্রসম্বন্ধেই কি আলোচনা করিতেছেন। পুরুষোত্তম মহীশূরী ভাষায় কি বলিল বুঝিলাম না, রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে কুশলপ্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। কষ্ট হইতেছে দেখিয়া পুরুষোত্তম স্বেচ্ছায় দোভাষীর কার্য্য করিতে চাহিলে দেখিলাম ভ্রাতৃদ্বয় আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। পুরুষোত্তমের কৃপায় আলাপ অবাধে চলিতে লাগিল।

সমুদ্রের তটপ্রান্তে রাজার বাড়ীটি সুন্দর, গৃহসজ্জার পারিপাট্য ধনিজনসুলভ, এবং চিত্রগৃহে সম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ নানাবিধ ছবি, নানাস্থানে, নানাভাবে রক্ষিত আছে।

কাগজে প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখিয়া জীবিকার্জ্জন সম্ভব নহে। কিন্তু আমার পাঠক পাঠিকাগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, পুরুষোত্তম তেলাঙ্গ মাত্র এণ্ট্রান্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী অবধি পড়িয়াছিলেন। তাঁহার যাহা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা সে সমস্তই স্কুলের বাহিরে এবং তৎসমুদয়ই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার বিস্ময়কর ফল। তাঁহাকে যে দেখিয়াছে সেই তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যে কোন বিষয়েই কথা উত্থাপন হউক না কেন, পুরুষোত্তম সে সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিবেনই এবং যাহা বলিবেন তাহা সারগর্ভ। পরলোকগত বিচারপতি রাণাডের মত অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষের মুখে শুনিয়াছি, "পুরুষোত্তম যদি ইচ্ছা করিত তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষতম উপাধি তাহার অনায়াসলব্ধ হইত এবং সংসার-ক্ষেত্রে অর্থে ও পদগৌরবে শীর্ষস্থান অধিকার করা তাহার নিকট বালকের ক্রীড়া।" আমার সহিত তাঁহার প্রথম দর্শনাবধি বান্ধবতার সূত্রপাত হয় এবং সেই প্রীতির বলে তাঁহাকে আমি সুদূর বোম্বাই নগরী হইতে কলিকাতায় আমার আবাসে আনিতে পারিয়াছিলাম। যতকাল জীবিত ছিলেন; বৎসরে অন্ততঃ তিন মাস কাল তিনি কলিকাতায় আমার বাটীতে কাটাইতেন। এখানে অবস্থান কালে স্যর আশুতোষ চৌধুরী, তাঁহার ভ্রাতা মিঃ পি, চৌধুরী প্রভৃতি প্রতিভা-সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সহিত পুরুষোত্তমের পরিচয় হয়, ইঁহারাও তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমার প্রথমবারের বোম্বাই বাসের পরম লাভ এই মিত্র লাভ এবং রবিবর্ম্মার চিত্র দর্শন। আর এক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম—তাহা নৌ-সেনা ও স্থল-সৈন্যের যুদ্ধাভিনয় (Army & Navy tournament) তৎপূর্ব্বে সৈনিকগণের ক্রীড়াসমর আমি দেখি নাই। বোম্বাইয়ের ওভাল নামক ময়দানে এই কৃত্রিম যুদ্ধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। টিকিট করিয়া দেখিবার বন্দোবস্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে যুদ্ধাভিনয় হইবে, আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আহারাদি শেষ করিয়া টিকিট হস্তে নির্দ্দিষ্ট আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। অভিনয় চলিতেছে, এমন সময়ে দেখি একজন ইউরোপীয় বেশধারী লোক আমার আসনের নিকট ধীরপদে অগ্রসর হইতেছে। দূর হইতে চিনিতে পারিলাম না লোকটি কে। সে নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিয়া উঠিল, "Hallo Roy, you are here!" আমি তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলাম, আগন্তুক আমার একজন পূর্ব্বপরিচিত আমেরিকাবাসী বন্ধু। অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধুকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। একত্রে বসিয়া যুদ্ধাভিনয় দেখিলাম, অভিনয়ান্তে বন্ধু আমার সহিত আমাদের বাসায় আসিলেন। সে রাত্রি তথায় আমার "পায়জামা স্যুট" পরিয়া আমার শয্যাতেই শয়ন করিলেন। পরদিবস তাঁহার জিনিষ-পত্র হোটেল হইতে আনাইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার জাহাজ ছাড়িবার দিন পর্য্যন্ত আমাদের বাসাতেই রহিলেন। বন্ধুর সহিত একত্রবাসে আমার আনন্দের সীমা ছিল না; কিন্তু আমার সঙ্গে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা ইংরাজের সমক্ষে অনাবৃত শরীরে থাকিতে না পারায় মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন, কিন্তু মুখে কেহই কিছু বলেন নাই। বন্ধুর অমায়িক ব্যবহারে তাঁহাদের পূর্ব্ব অসন্তুষ্টি কাটিয়া গিয়াছিল এবং যে দিন তিনি সকলের নিকট একে একে বিদায় লইয়া জাহাজে চড়িলেন, তখন মুখ দেখিয়া মনে হইল যে সকলেই যেন আসন্ন বিরহের আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়াছেন—আমি যে বন্ধুবিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হইয়াছিলাম একথা বলাই বাহুল্য।

গোপালবাবুর পীড়ায় এবং দর্শনীয় সকলগুলি পদার্থ দেখিতে অনেক সময় লাগিল। পুণা, হায়দ্রাবাদ, গোলকুণ্ডা, বরোদা প্রভৃতি দেখিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে, সেই জন্য রবিবর্ম্মার চিত্রাঙ্কন শেষ হইয়া গেলে দুই এক দিনের মধ্যেই আমরা বোম্বাই ছাড়িয়া "ডেকান-রাণী" পুণার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পুণার রেল-পথ অতি সুন্দর। বোম্বাই হইতে বাহির হইয়া লোহবর্ত্ম কিছুদূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমির

উপর দিয়া বিসর্পিতভাবে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর দেশে উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে কঠিন শৈল-গাত্র ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গপথে (টানেলের মধ্য দিয়া) রেলগাড়ী চলিয়া গিয়াছে, সে দৃশ্য জীবনে প্রথম যখন দেখা যায় তখন এক প্রকার ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত না হয় এমন ব্যক্তি বোধ করি জগতে কমই আছে। আমি রেল টানেলের কথা পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম এবং লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু রেল সুড়ঙ্গ প্রত্যক্ষ দেখিবার এবং সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ীতে বসিয়া যাইবার সুযোগ আমার তৎপূর্ব্বে ঘটে নাই—সেই প্রথম।

বোম্বাই হইতে প্রাতঃকালের গাড়ীতে রওনা হইয়াছিলাম, উদ্দেশ্য দিনমানে পুণায় পঁহুছিলে থাকিবার স্থান প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিবার সুবিধা হইবে। বেলা প্রায় সাত ঘটিকার সময়ে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িয়া প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে কল্যাণ নামক ষ্টেশনে পঁহুছিল। এ পথটুকু সমতল। কল্যাণে গাড়ী কিছু দীর্ঘ সময় দাঁড়াইল এবং দেখিলাম সেই বেলা নয়টার সময়েই গাড়ীতে বাতি জ্বালিয়া দিতেছে, কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, অবাক হইয়া রহিলাম।

আমার সহিত বাল্যের সহাধ্যায়ী শশিশেখর চক্রবর্ত্তী নামক এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি কিছু রঙ্গপ্রিয় এবং কথাবার্ত্তা কহিবার তাঁহার এমনিই ধরণ ছিল যে, সামান্য কথাতেও লোকে না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহাদের গ্রামে কালী চৌধুরী নামধারী এক ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁহার মদ্যাসক্তি সর্ব্বজন বিদিত ছিল; চৌধুরী মহাশয় মদ্যপানান্তে প্রাতঃকালে দুইটি মোমবাতির লণ্ঠন জ্বালাইয়া দুই একবার পথে বাহির হইয়াছেন; সেই কথার উল্লেখ করিয়া শশিশেখর আমাকে কহিল, "ওহে, এখানেও দেখি কালী চৌধুরী আছে, নতুবা এরা এই মেঘলেশ-হীন সূর্য্যালোকিত প্রাতঃকালে গাড়ীর মধ্যে বাতি জ্বালায় কেন?" বাস্তবিক বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া আমাদের সকলেরই মনে হইয়াছিল।

কালী চৌধুরীর কথা লইয়া হাসি তামাসা হইতেছে এমন সময় বাতি জ্বালা হইয়া গেলে, নিশান দেখাইয়া বাঁশি বাজাইয়া গার্ড সাহেব গাড়ী ছাড়িবার সংকেত করিলেন; গাড়ী চলিল। কালী চৌধুরীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেখি অকস্মাৎ গাড়ীর মধ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকার, নিজের শরীর পর্য্যন্ত দেখা যায় না, হস্তদ্বারা অনুভব করিতে হয় যে, আমি গাড়ীতে আছি। এঞ্জিনের অপর্য্যাপ্ত ধূমে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম, রেল গাড়ীর মধ্যস্থ লণ্ঠনের আলো ছাড়া আর কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই। তখন সকলে বুঝিলাম যে গাড়ী সুড়ঙ্গ পথে চলিয়াছে, এবং দিবাভাগে প্রদীপ জ্বালিবার



পুণা—পার্ব্বতী দেবীর মন্দির

যথেষ্ট এবং সঙ্গত কারণ আছে, গার্ড বা ড্রাইভার কালী চৌধুরী মহাশয়ের আচরণের অনুকরণ করে নাই। সুড়ঙ্গ ছাড়াইয়া গাড়ী যখন অনাবৃত আকাশের নীচে বিশুদ্ধ বায়ু সেবিত সূর্য্যালোক পরিপূর্ণ স্থানে আসিল তখন যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম এবং

বিস্মিত চিত্তে ও মুগ্ধনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখি, সমতলভূমি ছাড়িয়া পাহাড়ের উপরে অনেকখানি ঊর্দ্ধে গাড়ী উঠিয়াছে। পথ প্রস্তুতকারী ইঞ্জিনিয়ারের তারিফ করিতেছি, এমন সময় পুনরায় নিবিড় অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল—কি বিপদ! একবার অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে আসিবার ক্লেশই বিদূরিত হয় নাই আবার সুড়ঙ্গ—"একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং" এ যে দেখি তাহাই হইল। এক দুই তিন করিয়া সেবারে গণিয়াছিলাম, বোম্বাই হইতে পুণা পর্য্যন্ত পথটুকুর মধ্যে প্রায় শতাধিক সুড়ঙ্গ আছে। এক একটি এত দীর্ঘ যে সত্য সত্যই শ্বাসরোধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। ক্রমে সুড়ঙ্গপথে গাড়ী যাইতেছে ক্রমে আমরা ঊর্দ্ধে উঠিতেছি এবং ঊর্দ্ধদেশে হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে সমতল ভূমির শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষলতা, নদী তড়াগ প্রভৃতির দৃশ্য বড়ই সুন্দর মনে হয়, ঠিক যেন দার্জ্জিলিংএর পার্ব্বত্য রেলপথের ক্ষুদ্র সংস্করণ। ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতেছি, ক্রমে শীত বাড়িতে লাগিল, এবং খানাতলী নামক স্থানে যখন পঁহুছিলাম তখন বিলক্ষণরূপে শীতানুভব করিতেছিলাম, ওভার কোট দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত না করিয়া পারা গেল না। শুনিলাম পুণা বোম্বাইয়ের মধ্যে ঐ স্থানটিই সর্ব্বোচ্চ এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। বোম্বাই সহরের অনেক ধনী লোকের গ্রীষ্মাবাস খানাতলীতে রহিয়াছে, তাহারা অনেকে সপ্তাহান্তে কাযকর্ম্মের অবসরে একবার করিয়া খানাতলীতে গিয়া থাকেন। তথা হইতে রেল-পথ কিছুদূর পর্য্যন্ত নীচে নামিয়াছে, তাহার পরেই পুণা পর্য্যন্ত সমতল ভূমির উপর দিয়া লৌহবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। পুণায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে কারকী ষ্টেশন পাওয়া-যায়, অধুনা এই কারকীতে ইংরাজ সৈন্যের সুবৃহৎ ছাউনি হইয়াছে—এই কারকীর যুদ্ধেই দ্বিতীয় বাজিরাও-এর সময়ে পেশওয়েগণের গৌরব সূর্য্য চির অস্তমিত হইয়া অতল অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। পুণা হইতে আটক পর্য্যন্ত যে পেশওয়েগণের অপ্রতিহত প্রভাব একদিন ছিল, যে মহারাষ্ট্রীয়গণের ভুজ বীর্য্যে একদিন রাজপুত ও মুসলমান সমভাবে কম্পান্বিত কলেবর হইয়াছে, যে বারগীরের (বর্গীর) অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া সমগ্র বাঙ্গালা একদিন ভীতত্রস্ত হইয়া উঠিত, আজ তাহারা কোথায়?



পুণা—এম্প্রেস গার্ডেন

ঘাট পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া রেল গাড়ী চলিতে লাগিল। কারকী ষ্টেশনে অল্পক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইবার পরে পুনরায় গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে ট্রেণ চলিলে, বুঝিলাম আর অন্ধকার রন্ধ্রপথে গাড়ী যাইবে না, কারণ সে সম্ভাবনা থাকিলে দ্রুতবেগে চলিত না এবং গাড়ীর অভ্যন্তরের বাতিগুলিও নিবাইয়া দিত না। কারকী হইতে গাড়ী একেবারে পুণা ষ্টেশনে গিয়া দাঁড়াইল, তখন বেলা প্রায় তিনটা হইবে। সেদিনে গাড়ী আজকার দিনের মত দ্রুত যাইত না, সেই জন্য



মহাবালেশ্বর—গভর্ণমেণ্ট হাউস

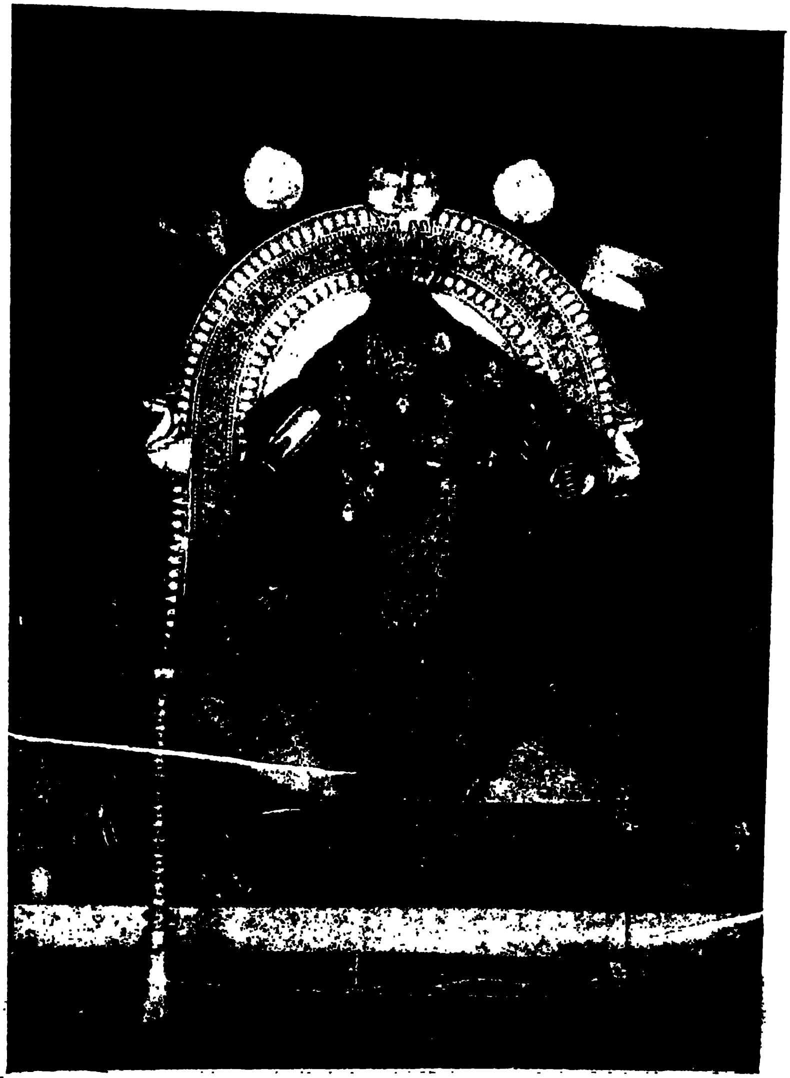
প্রাতে রওনা হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে পঁহুছিতে হইল। আজ কাল Race special নামক একখানি ট্রেণ হইয়াছে, ইহা প্রতি শনিবারে ঘোড় দৌড়ের দিনে বেলা সাড়ে দশটার বোম্বাই হইতে রওনা হইয়া দেড়টার সময়ে পুণায় পঁহুছে—Restaurant Car ট্রেণের সহিত সংযুক্ত, ঘোড়দৌড় বিলাসী ইংরাজ ও ভারতীয়গণের পানাহার সেই কারেই নির্ব্বাহ হয়, সে জন্ত পথ-মধ্যে আর বিলম্ব হইবার কারণ ঘটে না। দৈনিক ডাক গাড়ী এবং যাত্রীর গাড়ীও (প্যাসেঞ্জার ট্রেণ) সেদিনের তুলনায় আজ দ্রুততর বেগেই যাইয়া থাকে।

ছত্রপতি শিবাজীর স্বাধীনতা লাভ-প্রচেষ্টার পুণ্য-পূত এই পুণাকে, সহ্যাদ্রি শৈলমালা পরিবেষ্টিতা নগর-রাণী এই পুণাকে দেখিবার অভিলাস বহুকাল হইতেই আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রের ইতিহাস যতই পড়িয়াছি, সে বাসনা আমার ততই বলবতী হইয়াছে, কিন্তু অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার সুযোগ এতকাল হয় নাই, সে সুযোগ যে দিনে আসিল সে দিনটি আমার পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। পুণার গাড়ী পঁহুছিলে দেখিলাম ষ্টেশনে লোকারণ্য। কেহ আত্মীয় বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, কেহ বা সেই ট্রেণে আনীত দ্রব্য সামগ্রী লইতে আসিয়াছে, কেহ বা অনাগত বন্ধুর অদর্শনে ম্রিয়মান হইয়া চারিদিকে সেই অনাগতেরই সন্ধানে ফিরিতেছে, যদি আসিয়াই থাকে, এই দুরপরাহত আশার মোহে। আর এক দল লোক আসিয়াছে হোটেলের—ইংরাজী হোটেল এবং দেশীয় "আহার গৃহ" এবং "উপাহার গৃহে"র লোক। মহারাষ্ট্রে দেশীয় হোটেলগুলির বিদেশী নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে—উপাহার-গৃহ বলিলে বুঝিতে হইবে সেখানে জলযোগের (Light Refreshments) ব্যবস্থা আছে, ভূরী ভোজনের ব্যবস্থা নাই। আমাদের আগমনে বা অনাগমনে হর্ষামর্ষ বোধ করিবার মত মানুষ সেখানে কেহই ছিল না, আমরা সেই দূর দাক্ষিণাত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাঙ্গালী বলিয়া আমাদিগকে চিনিতে পারিলেও হয়ত বা কৌতূহল পরবশ হইয়া কেহ

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও পারিত, কারণ সে দেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা কম, কেবল পুণার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দুই একজন বাঙ্গালী ছাত্র তখন এবং তাহার কিছুদিন পর পর্য্যন্ত ছিল, এখন আছে কিনা জানিনা। আমাদের পরিচ্ছদ ইংরাজী ধরণের, সুতরাং নিতান্ত কৃষ্ণকায় ফিরিঙ্গী কিংবা দাক্ষিণাত্যে যাহাকে "সুধার লেলা" অর্থাৎ reformed বলে, সেইরূপ কিছু ভাবিয়া লওয়াই সম্ভব, সেই জন্য কেহই আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল না, কেবল ইংরাজী হোটেলের মানুষ ধরার দল আসিয়া টানাটানি করিতে আরম্ভ করিল। যে পাটাধারী চাপরাশীর পরিচ্ছদ অধিক জাঁকাল, আমরা তাহার সঙ্গে যাওয়াই স্থির করিলাম। জিনিষ পত্র গাড়ীতে উঠাইয়া আমরা সেই চাপরাশীর সঙ্গে চলিলাম। যে হোটেলে গেলাম তাহার নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। দেখিলাম হোটেলের ঘর দ্বার এবং ব্যবস্থা ভাল, কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হইল না। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইংরাজী আহারে বাধা ছিল, সেই জন্য স্থির হইল, হোটেলে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করিয়া "হিন্দু আহার গৃহে" ব্যবস্থার জন্য একজন যাইবে। যিনি গেলেন তিনি পাঠক পাঠিকা গণের পূর্ব্ব পরিচিত শশীবাবু; এই শশিশেখরই রেল-পথের পর্ব্বতরন্ধ্রে প্রবেশ কালে আলোর ব্যবস্থা দেখিয়া পূর্ণাভিষেকী বামাচারী কাশী চৌধুরীর দিবাভাগে লণ্ঠন জালিবার প্রসঙ্গ লইয়া রঙ্গরস করিয়াছিলেন। "হিন্দু আহার গৃহে" ব্যবস্থা করিতে গিয়া যে রঙ্গরস করিয়াছিলেন তাহাতে সে রাত্রে ভোজ্যরস প্রায় কাহারই অদৃষ্টে ঘটে নাই, সে কথা বলিতেছি।

শশিবাবু ধুতি পিরান চাদর পরিয়া খাঁটি বাঙ্গালী বাবু সাজিয়া গাড়ী করিয়া গাড়োয়ানের সাহায্যে এক মারাঠী হোটেলে গেলেন এবং প্রশ্নের উত্তরে জানিলেন যে, আহার পাওয়া যাইবে। আহার প্রাপ্তির আশার আনন্দে, ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ, ভোজ্য সামগ্রীর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছিলেন। সকল কথাই হিন্দীতে চলিতেছে, কারণ শশীবাবু মারাঠী ভাষা জানেন না, এবং হোটেলের মালিক ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। কথা প্রসঙ্গে শশীবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "দেখো জি, মচ্ছি উচ্ছি হ্যায় তো?" এরূপ হিন্দীকে বিশুদ্ধ হিন্দী না বলা গেলেও "মচ্ছি উচ্ছি" শব্দের অর্থ বোধ হইতে ব্রাহ্মণের মুহূর্ত্ত সময়ও লাগে নাই। ব্রাহ্মণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া "মচ্ছি! মচ্ছি! তুম্ মচ্ছি খাতে হো, তুম্ ব্রাহ্মণ হো? কভি নাই, তুম ইঁহাসে যাও, যাও, অভি যাও, চলা যাও।" ইত্যাদি বলিতে বলিতে শশীবাবুকে এক প্রকার অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বাহির করিয়া দিল। ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ ম্লানমুখে আসিয়া আমাদের হোটেলে যথাযথ বর্ণনা করিলে অপর সকলের মন যে আনন্দরসে পরিপ্লুত হয় নাই, একথা বলাই বাহুল্য। আমাদের সেক্রেটারী বাবু যথার্থই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কে তোমাকে মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিল হে? তোমার মত নির্ব্বোধ ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার।" শশী কহিল, "মহাশয়, ঈশানের রাঁধা মাছ ত অনেক খাইয়াছি, ভাবিলাম মারাঠী ব্রাহ্মণের ঝাল দেওয়া মাছটা কেমন একবার দেখিতে হইবে, যদি মাছ না রাঁধিয়া থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা ছিল রাঁধিতে বলিব, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম এজি মচ্ছি উচ্ছি হ্যায়?" সেক্রেটারীবাবু কহিলেন, "এখন খাও তোমার মচ্ছি উচ্ছি।" যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, উপায় নাই, সে রাত্রিতে পুনরায় এক "উপাহার গৃহে" গিয়া কথঞ্চিৎ জলযোগ করতঃ সকলে কোন মতে রাত কাটাইলেন, পরদিবস ব্যবস্থা করিবার জন্য শশীকে বিশ্বাস করিয়া পাঠান হয় নাই।

পুণার পূর্ব্ব গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে। যেদিন বাজিরাও পেশওয়ে তাঁহার লক্ষ "ঘোড় চড়ের" কাওয়াজ দেখিবার সময়ে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন "এখন যদি আকাশও ভাঙ্গিয়া পড়ে তবু কিছুকাল আমার অশ্বারোহী সৈন্যের বর্শাফলকে তাহাকে ধরিয়া রাখা যাইতে পারে।" সে ক্ষাত্রবীর্য্যগর্ব্বিত সৌভাগ্যশালিনী পুণা নগরী আজ স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত, মহারাষ্ট্রমুকুটমণি পুণা আজ



মহাবালেশ্বর—শিবাজীর ইষ্টদেবী ভবানীমূর্ত্তি

নামমাত্রাবশিষ্ট। পুণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী "পার্ব্বতী" কেবল অতীতের সাক্ষী স্বরূপিণী হইয়া শৈল শিখরস্থিত মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজমানা, আর কিছুই নাই; নন্দন-নিন্দী হীরাবাগ, ইন্দ্রভবনতুল্য পেশওয়ের প্রাসাদ, সমস্তই আজ স্বপ্ন-কাহিনী! সুবিশাল নগরীর প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় এবং সুদীর্ঘ রাজ-পথ টঙ্গাযোগে অতিবাহন করিয়া পার্ব্বতী শৈলের পাদমূলে দর্শককে নামিতে হয়। তাহার পরেই পর্ব্বতারোহণ জন্ত প্রস্তর বিনির্ম্মিত বিশাল সোপান-শ্রেণী; সেই সোপান বাহিয়া পর্ব্বত-চূড়াস্থ মন্দিরের নিকটে পঁহুছিতে মানুষের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। শুনিয়াছি পেশওয়েগণ পার্ব্বতী দর্শনার্থ প্রতিদিন হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া সেই সোপান আরোহণ করিতেন,—প্রত্যেকটি সোপানের পরিসর এবং গঠন প্রণালী দেখিলে মনে হয় সত্যই হস্তী উঠিবার

জন্য এই সোপানাবলী প্রস্তুত হইয়াছিল। পেশওয়েগণ সকলেই আজ স্বর্গগত, বংশ লুপ্ত হইয়াছে, মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সূর্য্য বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে, "মাউলী" সৈন্যের ক্ষাত্রবাহু পুনরায় হলকর্ষণে নিযুক্ত। কিন্তু অভ্যুদয় দিনের এই শৈলসোপানাবলী আজও মানুষকে পার্ব্বতীর পাদমূলে প্রণামার্থ লইয়া যাইতেছে —মানুষ যায় কিন্তু তাহার করচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে বহু সময়ের প্রয়োজন।

পার্ব্বতী মন্দিরের চতুষ্পার্শে অনুচ্চ প্রাকার-পরিবেষ্টিত প্রস্তর নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ অলিন্দ। এই অলিন্দে দাঁড়াইলে সমগ্র পুণানগরী দেখিতে পাওয়া যায় এবং চতুর্দ্দিকস্থ নভোন্নত প্রশস্ত প্রান্তরের উপর দিয়া চক্ষু দিক্‌চক্রবালে প্রতিহত হয়। শুনিয়াছি পুণার অধিষ্ঠাত্রী পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরের বহির্ভাগে সপারিষদ দণ্ডায়মান হইয়া দ্বিতীয় বাজিরাও পেশওয়ে কাড়্‌কীর যুদ্ধ দর্শন করিয়াছিলেন!

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ, মহারাষ্ট্রকেশরী তানাজি মালসুরে প্রভৃতি বীরেন্দ্রবর্গ জীবন তুচ্ছ করিয়া অসি হস্তে রণক্ষেত্রে সৈন্যচালনা করিয়াছেন; বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য্য শাস্ত্রত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে একদিন শস্ত্রহস্তে সৈন্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ বাজিরাও লক্ষসৈন্যের অধিনায়ক হইয়া বিজয় গর্ব্বে বিপুল বাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছেন; ভাস্কর পণ্ডিতের অশ্বপদধ্বনি মুরশেদাবাদের মসনদশায়ী আলীবর্দ্দীর সুখতন্দ্রাতুর চক্ষুকে বারম্বার উচ্চকিত করিয়াছে; আর সেই বাজিরাওয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে সমুপবিষ্ট, তাঁহারই নামধারী দ্বিতীয় বাজিরাও অসিহস্তে সম্মুখযুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা না করিয়া নিরাপদ পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া নায়কহীন স্বীয় সৈন্যের পরাজয় নীরবে দর্শন করিয়াছেন, কালের কি অদ্ভুত মহিমা!

নির্ব্বাপিতপ্রায় হিন্দুর বীর্য্যবহ্নি মহারাষ্ট্রে আহুতি লাভ করিয়া একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কোঙ্কণ গিরিমালার শৃঙ্গে শৃঙ্গে সমুত্থিত "হর হর, বম্ বম্" রব হিমশৈলের সন্নিহিত সুদূর পুরুষপুরের গিরিগাত্রে একবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের হৃদয়-শোণিতের তর্পণে পাণিপথ ক্ষেত্রের বালুকারাশি একদিন লোহিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সেই মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর শেষ পেশওয়ের কাপুরুষতায় সব শেষ হইয়া গিয়াছে, ছত্রপতির প্রাণাহুতিপুষ্ট হিন্দুবীর্য্যের পবিত্র হোমাগ্নি আজ নিঃশেষ নির্ব্বাপিত হইয়াছে! এই পুণায় বিবাহের শোভাযাত্রার ছলে স্বল্প সংখ্যক মাউলী সৈন্য সহ শিবাজি মহারাজ একদিন মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ শায়েস্তা খাঁর শিবির আক্রমণ জন্য প্রবেশ করিয়া দুর্নিবার পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন; নৈশ আক্রমণে, নির্ব্বিঘ্ন নিদ্রার ব্যাঘাতে পলায়নপর সুপ্তোত্থিত শায়েস্তার করাঙ্গুলী ছিন্ন হইয়াছিল এই পুণায়। হিন্দু বীরত্বের, ক্ষাত্রবীর্য্যের লীলাভূমি এই পুণানগরী হিন্দুর পক্ষে যথার্থই পুণ্যভূমি। কিন্তু সে ভূমির গৌরব-চিহ্নগুলি আজ নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে; দেখিবার, দেখাইবার আজ আর কিছুই নাই। সেই পুণ্যক্ষেত্রের রজরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া, কীর্ত্তি গৌরবের কাহিনী স্মরণ করতঃ অশ্রুমোচন করিবার ক্ষমতা হিন্দুর আছে —তাহাই বা আজ কয়জনে করে?

পুণার অনতিদূরে মহারাষ্ট্রসিংহ শিবাজির সিংহগড় দুর্গ—মেঘমুক্ত দিনে দিগন্তের দিকে সচেষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শুনিয়াছি সিংহগড় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি পারি নাই কারণ আমার দৃষ্টি ক্ষীণ। শুনিলাম সিংহগড়ে যাওয়া যায়, কিন্তু পথ দুর্গম, যান বাহনের সুবিধা সেদিনে ছিল না। সুতরাং চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। বোম্বাই প্রদেশে আমি বহুবার গিয়াছি কিন্তু সিংহগড় দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। শুনিলাম পথের দুর্গমতা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে এবং সরকারি "আর্কিয়লজিক্যাল" বিভাগের সহায়তা না পাইলে সে বিজন বনে গমনাগমন এবং তথায় অবস্থান কালের ভোজ্য পানীয় সংগ্রহ সহজ সাধ্য নহে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বোম্বাই প্রদেশে আর্কিয়লজি বিভাগের কর্ম্ম-কর্ত্তা হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আফিস এবং

আবাসস্থান ছিল পুণায়, বন্ধুবর সিংহগড় দেখিয়াছেন এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া দেখাইবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রদেশে অবস্থান কালে আমার পুণায় যাওয়া ঘটে নাই, গেলে নিশ্চয়ই বন্ধুর কৃপায় আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইত। পুণায় "বাঁধবাগ" (Bund garden), এম্প্রেস গার্ডেন প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিবার সামগ্রী সমস্তই আধুনিক। পুরাতনের মধ্যে কেবল সর্ব্বকালে বিশ্রুতনামা, মহাকাল মহিষী, পর্ব্বত-দুহিতা পর্ব্বতী, পার্ব্বতোপরি আজও সমভাবে সমাসীনা।

মহাবালেশ্বর পুণা হইতে অধিক দূর নহে, এবং এই কোঙ্কণ গিরিমালার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উপরে বোম্বাই গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাসের প্রাসাদ সংস্থিত। গিরিশৃঙ্গ বলিলে যাহা বুঝায় মহাবালেশ্বর ঠিক তাহা নহে—পথ ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিয়া সর্ব্বোচ্চ শিখরে পঁহুছিয়াছে। কিন্তু উহার শীর্ষপ্রদেশ প্রায় সমতল, গাড়ী ঘোড়া চলে এবং আজকাল মোটর গাড়ীও অনায়াসে সেখানে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। ঘোড়ার গাড়ী ও মোটর চলিবার মত পাহাড় ভারতবর্ষে কয়টি মাত্র আছে, বোম্বাই প্রদেশে মহাবালেশ্বর, মান্দ্রাজে উটকামণ্ড এবং আসামে শিলং। আজ পুণা হইতে মহাবালেশ্বরে মোটর যোগেই যাওয়া যায়, অনেকে গিয়াও থাকেন এবং আমরাও গিয়াছি। কিন্তু যে দিনের কথা এখানে বলিতেছি সে সময়ে ভারতে মোটর আকাশ-কুসুমবৎ ছিল। পুণা হইতে রেলযোগে ওয়াটার নামক ষ্টেসনে গিয়া তথা হইতে চল্লিশ মাইল পথ টাঙ্গায় যাইতে হইত। মহাবালেশ্বরের সন্নিহিত অপর একটি শৃঙ্গের উপরে শিবাজির "প্রতাপগড়" দুর্গ, এবং সেই দুর্গে আজও শিবাজির ইষ্টদেবী, তাঁহার সর্ব্বাভিষ্টদাত্রী, মহামহেশ্বরী ভবানীর মূর্ত্তি বিরাজমানা। শিবাজি এবং বিজাপুরের ইতিহাস-বিজড়িত এই প্রতাপগড় দেখিবার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও সেবারে যাইতে পারি নাই, পরে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেবারে পুণা হইতে হায়দ্রাবাদে গিয়াছিলাম, সেই কথাই পূর্ব্বে বলি।

পুণা শেষ করিলাম। কিন্তু বহুদিনের সঞ্চিত আশা লইয়া গিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতির রাজধানী পুণা নগরী দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ পাইব। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে মন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দর্শনীয় পদার্থ বিশেষ কিছু নাই বলিয়া এই বিষাদ তাহা মনে হয় না, কারণ হিন্দুর বহুতীর্থে আজ প্রাচীন মন্দির দেবায়তন প্রভৃতি কিছুই নাই, মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর মধ্যে অযোধ্যা, কাঞ্চী, অবন্তী, মায়া প্রভৃতি পবিত্রতম তীর্থভূমিতে দেখিবার মত উন্নতশীর্ষ প্রকাণ্ডকায় দেবায়তন নাই বলিলেও হয়; কিন্তু সে সকল স্থানে মন বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয় না, অন্ততঃ আমার হয় নাই। পুণা নগরী দেখিবার পরে মনে হইতে লাগিল, অল্পদিন পূর্ব্বেই কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে! বোধ করি বিষাদে অবসন্ন-মন হইবার ইহাই কারণ। সিংহগড়, মহাবালেশ্বর, প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থানে যাইবার সুবিধা যখন আপাততঃ হইল না, তখন আজ পর্য্যন্ত জীবন্ত মুসলমান রাজ্যের রাজধানী দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ দেখিবার জন্য পুণা হইতে যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

শিকার ও শিকারী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হাওদা শিকার

সব শিকারেই—বিশেষতঃ মহিষ, বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু শিকারে আর একটী বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। এইসব শিকারে সর্ব্বদাই নূতন টোটা (cartridge) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পুরানো হইলে তাহার ক্যাপের রং খারাপ হইয়া যায় ও ভিতরের বারুদ জমিয়া থাকে। সে অবস্থায় অনেক টোটা আওয়াজই হয় না। কোন কোন সময় এইরূপ পুরানো কার্ত্তুসের ক্যাপ ফুটিয়া এক আধ সেকেণ্ড পরে হঠাৎ আওয়াজ হয়; ইহাকে hang fire বলে। ইহাতে নিশানা ঠিক থাকে না। Miss fire ও hang fire উভয়েই তুল্য বিপদের আশঙ্কা আছে। চার্জ্জের সময় এরূপ হইলে বিপদের গুরুত্ব যে কত হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। হাঁটিয়া শিকারে এরূপ হইলে সময় সময় শিকারীকে নিজের জীবন দিয়াও ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এরূপ ঘটনা বিরল নহে। সামান্য কৃপণতা করিয়া ধনের লোভে প্রাণ দিয়া লাভ নাই। যদিও অনেক সময় প্রাণ যায় না বটে, তবু আশঙ্কার স্থলে অন্যের জন্য কৃপণতা না করাই ভাল। যে শিকারের উদ্দেশ্যে এত আয়াস ও অর্থব্যয়, সঙ্গে সঙ্গে বিপদ সম্ভাবনাও আছে, সেই শিকারও এই কার্পণ্যের ফলে 'মিস' করিতে হয়।

'মিস্ ফায়ার' হইয়া আমি নিজে দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইলেও, বহুস্থানে ভাল ভাল শিকার 'মিস্' করিয়াছি। হয়ত ভবিষ্যতে সেরূপ সুযোগ পাইবার সম্ভাবনা আর নাই।

আর এক রকমে আমি ২।৪ বার খুব জখম হইয়াছি। একবার রীতিমত বিপদেই পড়িয়াছিলাম,



মধুবাবুর পশ্চাদ্ধাবনকারী মহিষ আহত হইয়া পলায়মান

অনেক ঘোড়াওয়ালা বন্দুকের অথবা রাইফেলের দুইদিকে চাপের lock-এর উপর ২টা করিয়া special safe দেওয়া থাকে। উহা বন্ধ থাকিলে কিছুতেই বন্দুকের 'ঘোড়া' পড়ে না ও double cock (দুইমা'র) উঠান যায় না। আওয়াজ করিবার সময় ঐ safe টানিয়া খুলিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই duplicate safeই প্রকারান্তরে অনেক সময় ভয়ানক unsafe হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় ভুলে ইহা খোলাই হয় না। অথবা খুলিয়া রাখিলেও, কোন কোন সময় হাওদার ঝাঁকি লাগিতে লাগিতে বন্ধ হইয়া যায়।

আমার একটী রাইফেলের এই রকম safe ছিল। একবার আসামে এইরূপ safe লাগানো অবস্থায় আমি একটী বাঘের উপর 'লব্‌লবি' (trigger) টিপিতে টিপিতে উহা ভাঙ্গিয়াই ফেলিলাম; তবু আওয়াজ হইল না। প্রকাণ্ড বাঘ মিনিট খানেক হাতীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। তখন অপর বন্দুক তুলিয়া মারিবার বুদ্ধিও যোগাইল না। কাজেই বাঘটীকে হারাইতে হইল। Safe যে বন্ধ ছিল তাহা আমার খেয়ালই ছিল না। এ সময় বাঘটী চার্জ্জ করিলে কি যে বিপদ হইত তাহা কল্পনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সে বুদ্ধি ঘটে আসিলে অপর বন্দুক উঠাইয়া ফায়ার করিলাম; কিন্তু বাঘ তখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছিল।

আর একবার—তখন আমি নূতন শিকারী, সেই আমার প্রথম শিকার,—আমাদের পার্টিতে অনেক শিকারী ছিলেন। তখনও নূতন ধরণের নানা শ্রেণীর বন্দুক বাহির হয় নাই, আমারও ছিল না। আমার পৈতৃক সম্পত্তি যে কয়েকটী ছিল তাহা দিয়াই শিকার করিতাম। ঐ সব বন্দুকের মধ্যে safe দেওয়া ১৬নং একটী hammer rifle ছিল; উহা দিয়াই তখন শিকার করিতাম।

একদিন আমরা হরিণ শিকারে বাহির হইয়াছি; খানিকদূর জঙ্গল বীট করিয়া যাওয়ার পর আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড এক বয়ার (পুং মহিষ) হড়্‌মড়্‌ করিয়া বাহির হইল। তখন হরিণ মারার জন্য প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া আমার হাতে একটী snider rifle ছিল, তাহাও আবার একনলা। মহিষ দেখিবামাত্রই গুলি করিলাম। গুলির সঙ্গে সঙ্গেই জখম হইয়া শিং নিচু করিয়া সে এত বেগে আমাকে চার্জ্জ করিল যে, আমি আর তাড়াতাড়ি অন্য বন্দুক লইবার অবকাশ পাইলাম না। হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া হাওদা হইতে ১৬নং রাইফেল উঠাইয়া লইলাম; কিন্তু তখন মহিষ আমার হাতীর পেটে শিং বিঁধাইয়া দিয়াছে। আমার প্রিয় হস্তিনী 'মনমতী' শৃঙ্গাঘাতে কাতর হইয়াও, পাছে তাহার প্রভুর বিপদ হয় এই আশঙ্কায় এত ধীর ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল যে, আমার হাতের বন্দুক দিয়া পুনরায় গুলি করিবার কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। কিন্তু হায়, সমস্তই বৃথা হইল। সেই safe দেওয়া বন্দুকের 'লব্‌লবি' টিপিতে টিপিতে এবারও বাঁকাইয়া ফেলিলাম। সেই সময় আমার অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, হয়ত আর একটু হইলেই হাতী শুদ্ধ উল্টাইয়া পড়িতাম। অন্য হাতী হইলে নিঃসন্দেহ ইহার বহু পূর্ব্বেই পড়িয়া যাইতাম।

সৌভাগ্য ক্রমে আমার হাওদার পাশে আর এক শিকারী ৺উমেশচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন। ইনি আমাদের camp ডাক্তার, তিনি উপর্য্যুপরি দুই গুলি করিয়া 'মহিষাসুর' বধ করিলেন।

পরে সেই বন্দুকের safe একেবারে বন্ধ করাইয়া আনাইয়াছিলাম এবং তদবধি উহা আর বড় ব্যবহার করিতাম না। তাহার পর আমি নানা শ্রেণীর ভাল ভাল বন্দুক কিনিয়াছি; ঐ সব ছোট বন্দুক আর আমার পছন্দ হইত না।

সত্য কথা বলিতে হইলে—লোকে বলে "নাচতে না জান্‌লে উঠান বাঁকা"—আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব এই সকল বন্দুক দিয়াই কত যে হরিণ, মহিষ ও বাঘ ভালুক মারিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। আর আমি 'নারেক' হইয়াই ঐ সকল ছোট বন্দুক অপছন্দ করিয়া ফেলিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেবল ভাল

rifle হইলেই শিকার হয় না—শিকারীরও ক্ষমতা থাকা চাই।

আরও ২।১ বার মহিষের মুখে পড়িয়াছি; কিন্তু তাহা এত সাংঘাতিক হয় নাই। ইহারা হাওদা শিকারে প্রায়ই চার্জ্জ করে না। কদাচিৎ কোন কোনটা ভয়ানক হইয়া উঠে।

স্বর্গীয় মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় একবার ঠিক এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মহিষ তাঁহার হাতীর vagina চিরিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর হইতে ঐ হাতী মহিষ শিকারে অত্যন্ত ভয় পাইত; কিন্তু অন্য শিকারে পূর্ব্ববৎ দৃঢ় ছিল।

আর একবার আমি বর্ষাকালে নৌকা করিয়া মহিষথলা শিকার করিতে যাই। ইহা ৭।৮ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। সেবার পার্টিতে কেবল আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীহট্টের জমিদার পরলোকগত মহীউদ্দিন চৌধুরী ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না।

একদিন 'কালাগড়' নামক এক জঙ্গলে একপাল মহিষের সংবাদ পাইয়া আমরা শিকার করিতে যাই। অল্প কালেই মহিষের সন্ধান হইল। প্রকাণ্ড বয়ারকে আমি গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই সে চার্জ্জ করিয়া এত বেগে আসিয়া আমাদের সঙ্গীয় 'খুঁজি' আম্‌জদালী মুন্সী যে হাতীতে ছিল তাহার পেছনের দুই পায়ের ভিতর দিয়া শিং চালাইয়া এত জোরে গুঁতাইতে লাগিল যে হাতী প্রায় উল্টাইয়াই পড়ে। যন্ত্রণাকাতর হস্তিনীর বিকট চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মুন্সীর "এ আল্লা মইলাম! এ আল্লা মইলাম!" (মরিলাম) ও জঙ্গলের 'হড়্ মড়্' শব্দে আমি যত সত্বর সম্ভব তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, মুন্সী গদির দড়ি ধরিয়া এক দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া ঐরূপ চেঁচাইতেছে। ও দিকে হাতীর ত এই অবস্থা! আমার হাওদা মতিলাল নামক এক মাকনার উপর ছিল। আমার গুলি করিবার পূর্ব্বেই মাহুতের ইঙ্গিতে সে এত বেগে শুঁড় দিয়া মহিষকে ধাক্কা দিল যে, মহিষটা ছিট্‌কাইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। এদিকে আক্রান্ত হাতীও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে মুন্সী ঝুলিতে লাগিল। মুহূর্ত্তবিলম্ব না করিয়া উপর্য্যুপরি আমি দুই ফায়ার করিলাম। ইহার পরই আমার বন্ধু চৌধুরী সাহেব আসিয়া উহাকে নিঃশেষ করিলেন।

অনেক সময় মহিষ বিনা কারণেও চার্জ্জ করে। বাঘের হাতে রক্ষা পাইলেও, মহিষের চার্জ্জে খুব পূর্ব্ব পুণ্যফল না থাকিলে রক্ষা পাওয়া কঠিন। বাঘ অনেক সময় থাবা দিয়া বা আঁচড় কামড় দিয়াও ছাড়িয়া যায়; কিন্তু মহিষ, একবার ধরিতে পারিলে শেষ না করিয়া ছাড়ে না।

একবার আসামে, 'চুনারির ঘাট' নামক স্থানে আমরা camp করি। সেখানে একদিন শিকারে বাহির হইয়া যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহাই লিখিতেছি।

একদিন শিকার করিয়া আমরা তাঁবুতে ফিরিতেছি, কতক শিকারী ও হাতী আগে চলিয়া গিয়াছে, কতক পাছে আসিতেছে এইরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে আমরা যাইতেছিলাম। মনুবাবু, রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও আমি পাশাপাশি তিন হাওদায় নানা রূপ গল্পগুজব করিতে করিতে যাইতেছিলাম। ব্রহ্মপুত্রের 'চরের' মধ্যে কাশবনে একটা Florican (চরশ) পাখী উড়িতে দেখিয়া, মনুবাবু আর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, একটা ছর্‌রার বন্দুক হাতে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। পাখাটা এক একবার উড়িয়া খানিক দূরে গিয়া বসিতেছে, আর তিনি উহাকে পাছু লইতেছেন। এইরূপে তিনি আমাদের হাতী হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছিলেন। আমরাও ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। তখন কেহ বলিতেছিল "আমরা চলিয়া যাই", কেহ বা আর একটু অপেক্ষা করিতেও বলিতেছিল। যদি আমরা সত্যই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতাম, তবে হয়ত উহাই চিরজীবনের জন্য ছাড়াছাড়ি হইত। এই ভাবে

কতকদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম যে কাশবন হইতে এক প্রকাণ্ড মহিষ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা প্রথমে উহাকে পালিত মহিষ মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু এরূপ নির্জ্জন স্থানে পালিত মহিষ আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহাও আলোচনা করিতে লাগিলাম। মিনিটখানেকের মধ্যে দেখা গেল, মহিষটা শিং নীচু করিয়া, মনুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া চার্জ্জ করিয়াছে।

সৌভাগ্য যে, তিনি মহিষ হইতে অনেক দূরে ছিলেন; নচেৎ সেদিন আর তাঁহার রক্ষা পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। আমরা তখনই সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাঁহার পিছনে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাতী ছুটাইলাম। আমরা হাওয়ার প্রতিকূলে ছিলাম বলিয়াই এত চীৎকারও তাঁহার কাণে পৌঁছিতেছিল না। আমার হাওদা সেদিন 'জুলিয়া' নাম্নী এক অতি দ্রুতগামিনী হস্তিনীর উপর ছিল। এই হাতী এত বেগবতী ছিল যে, অনেক সময় সে ভাড়াটিয়া গাড়ীর সহিতও ২।৪ মাইল রাস্তা দৌড়াইয়া যাইতে পারিত।

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমরা মহিষের কাছে যাইতে পারিলাম না। তবে অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম। ইহার পর এমন সঙ্গীন সময় উপস্থিত হইল যে, আর একটু পরেই মনুবাবুকে ধরিয়া ফেলে আর কি! তখন নিরুপায় হইয়া রাজা জগৎকিশোর ও আমি উভয়েই হাতী দাঁড় করাইয়া, খুব নিশানা করিয়া দূর হইতেই দুই গুলি করিলাম। ভগবানের অশেষ করুণা যে আমাদের গুলি ব্যর্থ হয় নাই; পক্ষান্তরে খুব ভাল কলই হইয়াছিল। আহত হইয়াই দুষমন্ মনুবাবুর দিকে আর না গিয়া অন্য দিকে দৌড়াইল। আমরাও তখন উহার পাছে পাছে দৌড়াইয়া, গুলি বর্ষণ করিতে করিতে উহাকে নিপাত করিলাম। বলা বাহুল্য মনুবাবুও পরে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন।

মনুবাবু যে এইরূপ সাংঘাতিক অবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহা তিনি বন্দুক আওয়াজের পূর্ব্বে টেরই পান নাই। তিনি কিন্তু এক মনে পাখীটাকেই অনুসরণ করিতেছিলেন।

মেছের উল্লা নামক আমাদের সঙ্গের স্থানীয় প্রসিদ্ধ শিকারী ও "খুঁজি"র নিকট পরে জানিতে পারিলাম যে, এই মহিষটা ঐ অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে ২।৩টি মানুষ মারিয়াছিল। নিরীহ লোকেরা খড় কাটিতে গিয়া অকালে প্রাণ দিয়াছিল। ইহার পর হইতে মনু বাবু আর কখনও এ ভাবে হাঁটিয়া যাইতেন না; সর্ব্বদাই সঙ্গে একটী প্যাড হাতী রাখিতেন।

এই জাতীয় খুনী মহিষকে মার্কা মহিষ বলে। বাথানের পালিত কাহুয় মহিষের মধ্যেও এইরূপ মার্কা মহিষ আছে, তাহাদের সম্মুখের এক পায়ে কাঠের কুঁদা বাঁধা থাকে, উহা নিয়া তাহারা বেশী দৌড়াইতে পারে না।

এখনও আমার trophyর মধ্যে ঐ মহিষের মাথাটী রক্ষিত আছে। যখনই উহাকে দেখি, তখনই যেন উহার জীবিত কালের সেই ভীষণ দৃশ্য বায়োস্কোপের ছবির মত আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটী গল্প বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

সেবার আমরা আসামের 'খল্‌সিয়ার ভিটা', 'চুপানীর ঘাট' প্রভৃতি অনেক স্থানে শিকার করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময়, আমাদের হাতী, গরুর গাড়ী ও অধিকাংশ লোকজন, হাঁটা পথে ভুড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়া ফিরিবার উপদেশ দিয়া, কতক কতক লোকজন সঙ্গে গোয়ালপাড়া হইতে ষ্টীমারে উঠিলাম। আমাদের সঙ্গে সেইবারের শিকারলব্ধ বাঘের চামড়ার মাথা ও হরিণের ভাল ভাল শিং প্রভৃতি অনেক ছিল।

শিকারপার্টি কোন স্থানে যাতায়াত করিবার সময় সর্ব্বদাই পাশ্চাত্য জাতি কর্ত্তৃক বেশ সমাদৃত হইয়া থাকেন। অনেক সময়, বাঘ ও হরিণের কাঁচা চামড়া ও মাথা অত্যন্ত দুর্গন্ধ সত্ত্বেও তাঁহারা বিরক্ত না হইয়া বরং যথেষ্ট প্রীতির চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইহার কারণ কেবল পাশ্চাত্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ

শিকারপ্রিয়তা। কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার কেহ কেহ "নেটিভ" বিদ্বেষ-বিষে এতই জর্জ্জরিত যে, এই সব বিলাস ব্যসনে বা অন্য কিছুতেও তাঁহারা ক্ষণিক বিষ উদ্গিরণ না করিয়া কিছুতেই শান্তি পান না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ জাহাজে ৩।৪টী সাহেব ও ২।৩টী মেম্ ছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই জাহাজের 'ক্যাবিন' গুলি দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। আমাদের দলবলও কম ছিল না। ৬।৭টী প্রথম শ্রেণীর আরোহী ৪।৫টী দ্বিতীয় শ্রেণীর। ইহা ছাড়া চাকর বাকরও ২০।২৫ জন ছিল। ক্যাবিন গুলি অন্যায়ভাবে আবদ্ধ দেখিয়াও, সাহেবদিগকে বিরক্ত না করিয়া আমরা ষ্টীমারের সামনের ডেকে ফরাস বিছাইয়া লইলাম।

তখন চৈত্র মাস, ক্যাবিনের গরম ভোগ করা অপেক্ষা বরং এখানে আমরা আরামই বোধ করিতেছিলাম। আমরা কতকগুলি নেটিভ, জাহাজের ডেক দখল করিয়া সাহেব মেমদের আমোদ উপভোগ ও বৈঠকের সুবিধা নষ্ট করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় মনে মনে আমাদের উপর তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এই সমস্ত শ্বেতকায় বীরপুরুষদের মধ্যে একজন কিছুতেই মনের ঝাল না ঝাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না।

সকাল বেলা আমরা ডেকের ফরাসে বসিয়া চা পান অন্তে নানারূপ গল্পগুজব করিতেছি। আমাদের মধ্যে একজন তাঁহার গড়্গড়াতে পরম আরামে ধূমপান করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষ পশ্চাৎ দিক হইতে চোরের মত আসিয়া গড়্গড়া হইতে 'সরপোষ' (চাক্'ন) সমেত কল্কেটী টপ্ করিয়া তুলিয়া লইয়া ব্রহ্মপুত্র গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। এই কাযটী করিয়াই সে যেন বড় একটা কিছু বাহাদুরী করিয়াছে এই ভাব দেখাইয়া, অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে তাহার সঙ্গীদিগের সহিত হাসি তামাসা করিতে করিতে সেলুনের ভিতর দিয়া গিয়া যে যাহার কেবিনে ঢুকিয়া পড়িল। এত তৎপরতার সহিত কাযটী সম্পন্ন হইল যে আমরা সকলেই একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। কোন প্রতিকার করা দূরে থাকুক কিছু বলিবার অবসরও পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য আমরা সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রতিশোধের সুযোগ-প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সত্য সত্যই তখন আমার মনের ভাব যে কি হইয়াছিল তাহা বলিতে পারিনা। পরাধীন জাতি হইলেই কি এতখানি নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে?

ভগবান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিশোধের সুযোগ করিয়া দিলেন। ঘণ্টা দুই বাদে প্রাতরাশের অব্যবহিত পরেই ইহারা পুনরায় ডেকে আসিয়া গল্প গুজব আরম্ভ করিল। কাহারও মুখে সিগার কাহারও বা সিগারেট ছিল; এবং আমাদের পূর্ব্ব বন্ধুটী পাইপে তামাক ভরিয়া বেশ আরাম করিয়া টানিতেছিল। ষ্টীমারের চিম্নি অপেক্ষা ইহার মুখ-গহ্বর হইতে টানে টানে বড় কম ধূম উদ্গিরিত হইতেছিল না। আমার যেন আর সহ্য হইল না। হঠাৎ উঠিয়া নিমেষের মধ্যে তাহার সম্মুখে গিয়া, প্রজ্জ্বলিত পাইপ্টী তাহার মুখ হইতে টানিয়া লইয়া তাহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলাম। বলা বাহুল্য, ইহার ফল ভালই হইয়াছিল। আর মন্দ হইলেও তাহার জন্য আমি প্রস্তুতই ছিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাহেবগণ যে যার ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়াই যে দরজা বন্ধ করিল, আর বড় একটা বাহিরে আসিল না। যদিও বা কদাচিৎ কেহ আসিত, সিগার বা সিগারেট কাহারও মুখে দেখা যাইত না। কিন্তু আমাদের বন্ধুবর সেই যে ক্যাবিনে ঢুকিলেন, গোয়ালন্দ যাওয়ার পূর্ব্বে আর তাঁহাকে বাহির হইতে দেখা যায় নাই।

এইরূপ আরও ২।১ বার ইহাদিগকে নেটিভ বিদ্বেষ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া নিষ্ফল ক্রোধে আস্ফালন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বের মত প্লীহা ফাটার দিন এখন ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে—

"তেহি নো দিবসা গতাঃ"

হাতী শিকারী না হইলে, হাওদায় অনেক সময়ই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যদি কোন দিন নিরাপদে ফিরিয়া আসা যায় তবে সেদিন যেন দৈবেই রক্ষা করিল বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বদা সকল শিকারীর পক্ষে খুব শিক্ষিত হাতী পাওয়া কঠিন। মাঝামাঝি শ্রেণীর হাতীও মন্দ নহে। সচরাচর ইহারা পলায় না, তবে বাঘ শিকারে বড় স্থির হইয়াও থাকে না। স্থির থাকুক আর নাই থাকুক, জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বাঘের গন্ধ পাইলেই মাথা ঝাঁকিয়া 'দে ছুট' না হইলেই রক্ষা। কতকগুলি হাতী অত্যন্ত ভীরু। বাঘ দূরের কথা, জঙ্গলে একটা পাখী বা গো-সাপ নড়িয়া উঠিলেই ইহারা আতঙ্কে নৃত্য করিতে থাকে। বাঘের গন্ধ পাইলেই ইহাদের মাথা ঝাঁকানি ও চিৎকারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে; লাইনও নষ্ট হইয়া যায়। অনেক সময় আমরা এই জাতীয় 'ভাগড়া' বাধ্য হইয়া লাইন হইতে সরাইয়া দিয়াও শিকার করিয়াছি।

এই শ্রেণীর খারাপ হাতীতে শিকার করিতে গিয়া একবার যে কিরূপ বিপদ হইয়াছিল তাহা ভাবিলে এখনও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিপদ-মুক্ত হইয়া গেলে তাহা লইয়া অনেক সময় আমরা রহস্যালাপ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু যাহাই করিনা কেন, ইহাতেও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

সে আজ ১৪।১৫ বৎসরের কথা, একবার শিলেট অঞ্চলে শিকার করিবার সময় আমাদের পার্টিতে গোবরডাঙ্গার জমিদার ৺রায় গিরিজাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জগৎপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিল। সে তখন নূতন শিকারী; সবে মাত্র pig game shootingএ হাতে খড়ি দিবার জন্য সেই বারই আমাদের পার্টিতে যোগ দিয়াছিল। তখন তাহার বয়স ১৮।২০ বৎসর হইবে। ভবিষ্যৎ জীবনের অসীম আকাঙ্ক্ষা ও উত্তম লইয়া, প্রথম বাঘ শিকার দেখিতে গিয়াছিল। সেবার সে নূতন শিকারী বলিয়া বাঘ শিকারের সময় সর্ব্বদাই কোন প্রবীণ শিকারীর হাওদার পশ্চাতে স্থান পাইত। কিন্তু হরিণ শিকারে পৃথক হাওদায় স্বাধীন ভাবে তাহার শিকারের ব্যবস্থা ছিল।

আমরা নেত্রকোণা হইয়া প্রথমে 'গারো হিল' এর নিম্ন দিয়া শিকার করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হই। 'টঙ্গুয়ার' প্রকাণ্ড হাওরের পারে কতকগুলি হরিণ ও মহিষ শিকার করিয়া সিলেট শ্রীপুরের জমিদার শরৎবাবুর বাড়ীর নিকটে ক্যাম্প করি। শরৎ বাবুর সঙ্গে এই শিকার উপলক্ষেই প্রথমে পরিচয় হইয়া পরে তাহা বান্ধবতায় পরিণত হইয়াছিল।

এই ক্যাম্পের নিকট 'জোড়কান্দা' নামক স্থানে হরিণ শিকারের একটা ভাল স্থান আছে। যখনই আমরা শ্রীপুরে ক্যাম্প্ করিতাম ২।১ দিন জোড়-কান্দায়ও হরিণ শিকার করিয়া যাইতাম।

সেদিনও আমরা হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিলাম। উপর্য্যুপরি কয়েকদিনের শিকারে শ্রান্ত ক্লান্ত আমাদের ভাল ভাল শিকারী হাতীগুলিকেও সেদিন বিশ্রাম দেওয়া হইয়াছিল। কাযেই সকলের হাওদাই বাজে হাতীর উপর ছিল। জগৎপ্রসন্নও সেদিন হরিণ শিকার বলিয়া রাজা জগৎকিশোরের 'কমল কলি' নামক হাতীর উপর পৃথক হাওদায় স্থান পাইয়াছিল। অদৃষ্টগুণে তাহার হাতীটীও তত ভাল ছিল না।

আমরা জোড়কান্দায় গিয়া গোটা দুই হরিণ মারিয়াছি, এর মধ্যে মাহুতদের "বাঘ বাঘ, ঐ যায়, ঐ যায়" চিৎকারে সেইদিকে আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। মাহুতদের অনেক সময় অযথা বাঘ বাঘ করিয়া চেঁচাইয়া উঠা একটা স্বভাব, বিশেষতঃ আমার হাতীর দারোগা আপ্রবালীর ভ্রাতার, জঙ্গলে ঢুকিয়াই টাইগার টাইগার বলিয়া চিৎকার করা একটা মুদ্রাদোষ বিশেষ ছিল। নানারূপ জেরা করিয়া আমরা বাঘ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলে, অতঃপর কি কি করা যায় সেই পরামর্শ চলিতে লাগিল। কাহারও ভাল হাতীতে হাওদা ছিল না। ভাল হাতীতে হাওদা বদল করিতে হইলে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় নষ্ট হইবে, ততক্ষণ বাঘ চলিয়াই যাইবে। কাযেই 'যা থাকে

কপালে' মনে করিয়া যেখানে বাঘ গিয়াছে বলিয়া দেখাইয়া দিল তাহার নিকটে যাইয়াই আমরা লাইন কর্ম্ম করিয়া ফেলিলাম। খানিক যাইতে না যাইতেই বাঘ দেখা গেল; কিন্তু তখনও উহা দূরে ছিল। নূতন শিকারী হইলেও জগৎপ্রসন্ন দূর হইতেই এক গুলি করিল। গুলিটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া, বাঘের পিছনের পায়ে গিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সপ্তরথীতে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম। বাঘ ও একটা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় লইয়া ক্রমাগত গর্জ্জন করিতে লাগিল। আমরা ঘিরিলাম বটে, কিন্তু বাঘের ভয়ানক ডাক শুনিয়া হাতীগুলি আর এক পা-ও অগ্রসর হইতেছিল না, দূরে চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু জোর করিয়া 'বাড়াইবার' চেষ্টা করিলেই মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত চিৎকার ও মাথা ঝাঁকানি দিয়া হট্ করিতে লাগিল।

যদি বাঘও 'ঝোপ' হইতে বাহির না হয়, আমরাও কাছে যাইতে না পারি, তবে আর শিকার হইবে কি করিয়া? কেহ ঢিল ছুড়িতে, কেহ কেহ বা কতকগুলি শুক্না বন কাটিয়া আগুন ধরাইয়াও বাঘের দিকে ছুড়িতে লাগিল। ইহাতে কিছু ফল হইল। হঠাৎ একবার বাঘটা ঝোপ হইতে বিদ্যুতের মত বাহির হইয়া একটা হাতীর কাণ কামড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। আমরাও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা করিলে বাঘ সেই গোলমালেই সময় অনায়াসেই চম্পট দিতে পারিত; কিন্তু আমাদের দুর্দ্দশার সবে মাত্র সুরু, সে এখনই যাইবে কেন? যাহা হউক, হাতীর ঝাড়ায় বাঘ পড়িয়া গিয়া আবার সেই ঝোপেই আশ্রয় লইল। আমরাও উহাকে পুনঃ ঘিরিয়া ফেলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলাম—তাঁবু হইতে হাওদার হাতী আনিয়া হাওদা বদলাইয়া লওয়া হউক; নচেৎ বাঘ মারা শক্ত হইবে। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববৎ ঢিল ছোঁড়াও চলিতেছিল। ২।৪ মিনিট পর বাঘও আবার সেই রূপ হঠাৎ চার্জ্জ করিয়া একেবারে মহেশ বাবুর হাতীর মাথার উপর লাফাইয়া পড়িল। মাহুত বেচারা গত্যন্তর না দেখিয়া ক্রমাগত বাঘের মাথায় 'গজ্‌বাক্' দিয়া খোঁচাইতে লাগিল আর 'এ আল্লা—এ আল্লা—খাইল!' বলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। ইহা যে সে ইচ্ছা করিয়া বা বুদ্ধি খাটাইয়া করিয়াছিল তাহা নহে, সঙ্গীন মুহূর্ত্তে 'খাব্‌ড়াইয়া' গিয়া তাহার যাহা মনে হইতেছিল তাহাই করিতেছিল। এবার আর মহেশ বাবুর লক্ষ্যও ব্যর্থ হয় নাই বা তাঁহার গুলিতে হাতীর কাণও ছেঁদা হয় নাই। পেটে গুলি খাইয়া বাঘ হাতী হইতে পড়িয়া গিয়া, এবার আর ঐ ঝোপে না ঢুকিয়া অন্যদিকে যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এবারও আমাদের হাতীগুলি পূর্ব্ববৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিন্তু আহত হওয়ায় বাঘ খুব জোরে চলিতে পারিতেছিল না। আমরা আবার লাইন করিয়া পূর্ব্ববৎ উহাকে ঘিরিয়া ফেলিলাম। একটু পরেই আবার চার্জ্জ করিয়া জগৎপ্রসন্নের হাতী কমলকলির কাণ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। এবার বাঘ সম্মুখের এক পা হাতীর কাণে ও অপর পা কাণের পেছনে দিক দিয়া মাহুতের উরুতে বিঁধাইয়া হাতীর কাণ কামড়াইয়া ধরিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটাও হাওদা সমেত কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। যাঁহারা হাতীর 'ভেড়ে নেওয়া' দেখিয়াছেন,—তাঁহারা এইরূপ শোয়াটা বেশ ধারণা করিতে পারিবেন। হাওদা সমেত এই ভাবে হাতীর শুইয়া পড়া জীবনে সেই একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। এ ভয়ানক দৃশ্য আর ভুলিবার নয়। বাঘের শরীরটা হাতীর মাথা ও তাহার বিরাট দেহের ফাঁকে পড়ায় বোধহয় বাঘটার কিছু হয় নাই; নচেৎ হাতীর চাপনে পিষ্ট হইয়া যাইত। হাতী ক্রমাগত ঝটাপটি করিয়া খানিক উঠিতেই বাঘটা উহার কাণ ধরিয়া টানিয়া আবার শোয়াইয়া ফেলে। হাতী খানিকটা উঠিলে বাঘের শরীর দেখা যায়, আবার শুইলে হাতীর তলায় ঢাকা পড়িয়া গেলে মাথাটা দেখা যায়।

এই সময় উপরের শিকারীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। হাতীর এই ভাবে ক্রমাগত ঝটাপটির সময় শিকারীর মাথা হাওদার শিকের সহিত ঠোকাঠুকি হইতেছিল। বন্দুক ও অন্যান্য যাহা কিছু হাওদায় ছিল, প্রায় সমস্তই মাটীতে পড়িয়া গেল। মাত্র একটী বন্দুক কেমন করিয়া যেন হাওদায় আটকাইয়া ছিল। সৌভাগ্য যে বন্দুকগুলি মাটিতে ছিটকাইয়া পড়িয়াও আওয়াজ হয় নাই। শিকারী কাৎ হইয়া প্রাণপণ শক্তিতে হাওদার শিক ধরিয়া আছে। হাতী যখন এক একবার উঠিবার চেষ্টা করে, তখন শিকারীর মাথা বাঘের মুখের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। আবার যখনই হাতী শুইয়া পড়ে তখন বাঘের মুখ ও শিকারীর মাথা অর্দ্ধহস্তের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

এই অবস্থায় আমরা সকলে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিক তখন দৈবের উপর নির্ভর করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। বাঘ মারিতে হাতী মারি কি মানুষ মারি এই আশঙ্কায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভগবানের অশেষ করুণা, মহেশ বাবু হঠাৎ অগ্রসর হইয়া বাঘের কোমর লক্ষ্য করিয়া এক গুলি করিলেন। যদিও এই কায তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অবৈধ ও দায়িত্বপূর্ণ, তথাপি অনেক সময় অনেক মন্দ কাযের মধ্য দিয়াও সৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। কোমরে গুলি লাগিয়াই বাঘ হাতী ছাড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনু বাবুর গুলিতে এই ভীষণ দৃশ্যের অবসান হইল।

ইহার পর হাওদা স্থিত শিকারীকে প্রকৃতিস্থ করিতে কিছু সময় লাগিয়াছিল। মাহুতের উরুর কয়েক স্থানে ছুরির কাটার মত (incision) খুব জখম হইয়াছিল। অনেক চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের পর সে আরোগ্যলাভ করে।

হাওদার হাতী ভাল না হইলে অনেক সময়ই এইরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে। সর্ব্বদা ভাল হাতী পাওয়া কঠিন। কিন্তু যতদূর সম্ভব অন্ততঃ মাঝারি রকমের হাতীও নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া উচিত। যে সে হাতীতে হাওদা দিলেই শিকার ভাল হইবে এই ধারণা ঠিক নহে। বরং মাটিতে দাঁড়াইয়া শিকার করাও ভাল, কিন্তু নিকৃষ্ট হাতীতে হাওদা দিয়া বিপদগ্রস্ত হওয়া মুর্খতা। বাঘ যদি মহেশবাবুর গুলিতে হাতী ছাড়িয়া না দিত, তবে হাওদার মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া অথবা বাঘের মুখেই শিকারীর পরিণাম আরও শোচনীয় হইত।

একদিকে যেমন হাওদা শিকার অন্যান্য প্রকারের শিকার অপেক্ষা নিরাপদ ও সুবিধাজনক, অন্য দিকেও তেমনি এইরূপ 'ভাগড়া' হাতীতে শিকার করা সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। কারণ ইহাতে শিকারীর স্বাধীনতা মাত্রও নাই, সমস্তই হাতীর উপর নির্ভর করে। হাঁটা শিকারে বরং যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী।

সার্থকতা

নারী কহে করযোড়ে দেবতারে তার,
কেন প্রভু, নারী প্রতি এত অবিচার!
জীবনের আয়ুরশ্মি মিলে যায় ওই—
তার মাঝে জীবনের সার্থকতা কই?

সুধা মাখা স্বরে, দেব হাসি কন তায়,
—হে নারী, জীবন তব বৃথায় না যায়।
নারীজন্মে মাতৃত্বের পূর্ণতা বিকাশ,
তারই মাঝে সার্থকতা করিছে প্রকাশ।

শ্রীশিলাবতী বসু

সত্যবালা

(উপন্যাস)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ।

রাত্রে শয়ন করিয়া, ফুরচিং-র সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কিশোরী জানিতে পারিল, সানচং হইতে ফিরিবার পথে ফুরচিং ঐ সাহবদের ছাউনি দেখিয়া আসিয়াছে—এমন কি দার্জ্জিলিঙবাসী দুই একজন পূর্ব্বপরিচিত স্বদেশীয় লোকের সঙ্গেও সেখানে তাহার দেখা হয়, তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে গিয়াই ফিরিতে অত রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। কিশোরী ফুরচিংকে সাহেবগণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নানা প্রশ্ন করিয়া বুঝিল, তাহারা পুলিশ অভিযান ত নহেই, ইংরাজ জাতিও নহে; যথার্থই ভৌগোলিক আবিষ্কারকের দল এবং আমেরিকা হইতে আগত। এ কথা শুনিয়া, কিশোরীর মন হইতে পূর্ব্বশঙ্কা দূর হইল, এবং সংবাদপত্র-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে, নিমন্ত্রণ অনুসারে প্রাতে তথায় যাইবে বলিয়া সে স্থির করিল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া, ফুরচিংকে বাংলার জল আনিতে পাঠাইয়া নিনা বলিল, "নাজালামাঁ, তুমি ঐ কাইলিংদের তাঁবুতে চা পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলে?"—কাইলিং অর্থে বিদেশী।

কিশোরী বলিল, "যাইব মনে করিতেছি।"

নিনা বলিল, "তবে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। শাদা মানুষ কখনও আমি নিকট হইতে দেখি নাই, দেখিয়া আসিব। তাহাদের চালচলন কথাবার্ত্তা কিরূপ সে সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল আছে। কিন্তু তাহারা যখন আমার সঙ্গে কথা কহিবে, সে সকল কথা আমি বুঝিব কিরূপে?"

কিশোরী বলিল, "আমি না হয় দোভাষী হইয়া তোমায় বুঝাইয়া দিব। ফুরচিং ফিরিয়া আসিলেই আমরা যাই চল। তোমার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা আছে—পরামর্শ করিবার আছে—পথে যাইতে যাইতে নিরিবিলিতে সে সকল আমাদের শেষ করিতে হইবে।"

নিনা হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা; তোমায় যদি তারা জিজ্ঞাসা করে আমি তোমার কে, তুমি কি বলিবে?"

"তুমি আমার যা, তাই বলিব। বলিব; শীঘ্রই তুমি আমায় তোমার পাণিদান করিয়া, আমাকে চিরসুখী করিবে।"

নিনা বলিল, "দেখ, তোমার কথা বলিবার প্রণালী বড় সুন্দর। এদেশের কোনও যুবক হইলে, একথাগুলি, কখনই এ ভাবে গুছাইয়া বলিতে পারিত না।"

কিশোরী মনে মনে বলিল, "তারা কি নভেল পড়েছে ছাই!"

অতঃপর নিনা, নিজ কক্ষে গিয়া, পোষাক পরিবর্ত্তন করিল। নূতন ক্রীত আর্সি চিরুণীর সাহায্যে, চুলগুলির পরিপাট্যবিধান করিল। একখানি পাটল বর্ণের রেশমী রুমাল গলায় বাঁধিয়া, হাসিতে হাসিতে কিশোরীর কাছে আসিয়া বলিল, "আমায় কেমন দেখাইতেছে বল দেখি?"

কিশোরী তাহার উভয় স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, মুখখানির দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, "তোমায় সুন্দর—অতি সুন্দর দেখাইতেছে। যেন পাহাড়ের বুকে একটি গোলাপফুল ফুটিয়াছে। কিন্তু কৈ, তোমার এ পোষাকটি ত আর কোনও দিন আমি দেখি নাই।"

নিনা বলিল, "তুমি বুঝি মনে কর আমার একটি মাত্র পোষাক? আমার আরও আছে। একটি আছে, সেটি আমি বিবাহের দিন পরিব; আমার বিবাহের জন্যই বাবা সেটি তৈয়ারী করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমার বিবাহ হইবে, কিন্তু বাবা আমার দেখিতে পাইলেন না।"—বলিতে বলিতে নিনার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

কিশোরী নিনার দুখানি হাত ধরিয়া বলিল, "তোমার বাবা স্বর্গ হইতে দেখিবেন এবং আমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

সুরচিং ঝরণা হইতে ফিরিয়া আসিলে, তাহার উপর রন্ধনাদির ভারার্পণ করিয়া, নিনা নিজ শয়ন গুহায় প্রবেশ করিল। তাহার অস্ত্রভাণ্ডার হইতে খাপযুক্ত দুই খানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাছিয়া লইয়া, একখানি নিজ কটিবন্ধে ধারণ করিল, এবং অপরখানি কিশোরীর কোমরে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "চল এইবেলা আমরা বাহির হইয়া পড়ি—নচেৎ ফিরিতে বিলম্ব হইয়া যাইবে।"

উভয়ে তখন সেই অধিত্যকা লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে পর্ব্বত অবরোহণ আরম্ভ করিল।

সূর্য্যোদয়ে তখন প্রভাতবায়ুর শৈত্যকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। যদিও 'চড়াই' নহে 'উৎরাই', তথাপি ইহা কিয়ৎপরিমাণে শ্রমসাধ্য ব্যাপার। পথশ্রমে, প্রথমটা কিশোরী বেশী কাতর হইল না। অধিত্যকা প্রদেশে নামিবার অনেকগুলি পথ ছিল—সেগুলি সমস্তই নিনার পরিচিত—সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথটিই সে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধপথ যখন তাহারা নামিয়া আসিয়াছে, তখন নিনা বলিল, "তুমি একটু হাঁফাইয়া পড়িয়াছ, নয়? একটু বিশ্রাম করিবে?"

"করিলে মন্দ হয় না"—বলিয়া কিশোরী উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিল। বামে কিয়দ্দূরে কয়েকটি ঝোপ দেখা গেল, তাহাদের গায়ে গায়ে কিশোরীর অপরিচিত কি একটা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কিশোরী বলিল, "চল, ঐ ফুলের ঝোপগুলির মধ্যে গিয়া একটু বিশ্রাম করা যাউক।"

উভয়ে, পথ ত্যাগ করিয়া, সেই ফুলের ঝোপগুলির দিকে যাইতে লাগিল। নিকটে পৌঁছিয়া, কিশোরী সে ফুলের মৃদু মধুর সৌরভ অনুভব করিল। বলিল, "বাঃ, গন্ধটি ত বেশ; এগুলি কি ফুল, নিনা?"

"এর নাম রিংচেন। বর্ষাকালেই উহাদের ফুটিবার কাল।" বলিয়া নিনা ঝোপের নিকট গিয়া একটি ফুল তুলিয়া, কিশোরীর হাতে দিল। কিশোরী সেটির সুবাস গ্রহণ করিয়া, সযত্নে নিনার চুলে পরাইয়া দিল।

ফুলের ঝোপগুলির মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা ছিল; তাহারা উভয়ে সেখানে গিয়া বসিল। কিশোরী নিনার হাতটী নিজ হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "আমাদের বিবাহ কোথায় হইবে এবং কবে হইবে, তাহা তুমি কিছু ভাবিয়াছ নিনা?"

নিনা বলিল, "ভাবিয়াছি বৈকি। কাল রাত্রে তোমার নিকট বিদায় লইয়া, নিজ গুহায় আসিয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিলাম না। ঐ সকল কথাই কেবল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার ইচ্ছা যাহা, তাহা তোমার নিকট বলি শুন—তার পর, তোমার যাহা মত হইবে, সেইরূপই আমরা করিব। এ দেশে আমরা বাস করিতেছি বটে, কিন্তু ইহাদের বিবাহ প্রথা হইতে আমাদের তিব্বতীয় প্রথা বিভিন্ন; সুতরাং আমাদের বিবাহের পুরোহিত কাংপাচেন গ্রামে মিলিবে না। কোনও বৌদ্ধমঠে গিয়া আমাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হইবে। এখান হইতে উত্তরে, দুই দিনের পথে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে, তাহার নাম ওয়ালং।—সেখানে অনেকগুলি লামা বাস করেন। আমার ইচ্ছা দুজনে সেইখানে গিয়াই বিবাহ করিয়া আসিব। এখন তোমার কি ইচ্ছা তাই বল। আমরা দার্জ্জিলিঙ অথবা কলিকাতায় গিয়া বিবাহ করিব কি?"

কিশোরী বলিল, "না নিনা—সে অনেক দূরের পথ—সে দরকার নাই। ঐ ওয়ালং মঠে গিয়া বিবাহ

করাই ভাল। কিন্তু একটা কথা আছে। অন্যান্য লামাগণ যেমন চেলা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মঠের উত্তরাধিকারী করিয়া যান, তোমার পিতা তাহা করেন নাই—তোমাকেই নিজ উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বহু ধনরত্ন ঐ মঠে লুকানো আছে তাহা যদি অন্যান্য লামারা জানিতে পারিয়া থাকে, তবে তাহারা, আমার সহিত তোমার বিবাহে কোনও আপত্তি করিবে না ত?"

নিনা বলিল, "তা বোধ হয় করিবে না। তা ছাড়া বহু ধনরত্নের কথা অন্যে কিরূপেই বা জানিবে? পূর্ব্বগত লামারা মৃত্যু আসন্ন হইলে, উত্তরাধিকারী চেলাকে অতি গোপনে বলিয়া যাইতেন। এই লামাগণের ধনশালিতার কোনও জড়ং বা গর্ব্ব ছিল না, তদনুরূপ ব্যয়বাহুল্য বা ধুমধাম কিছুই ছিল না—ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহারা জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন—বাহিরের লোকে জানিবে কিরূপে? জানিলে আমি একা স্ত্রীলোক এতদিন কি ও সমস্ত রক্ষা করিতে পারিতাম?"

কিশোরী বলিল, "তবে ওয়ালং মঠেই যাওয়া যাক চল। কবে আমরা যাইব বল দেখি? আমাদের মিলনে বেশী আর দেরী করিয়া কায নাই—কি বল?"—বলিয়া কিশোরী নিনার হাতটি ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিল।

নিনা, বিনা আপত্তিতে, কিশোরীর দেহলগ্ন হইয়া তাহার স্কন্ধে নিজ মস্তক রক্ষা করিয়া বলিল, "বেশ, চল কালই আমরা যাত্রা করি। কাইলিংদের তাঁবু হইতে ফিরিয়া, আহারাদির পর, আমি একবার কাংপাচেন গ্রামে যাইব—দুটি টাটু ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া আনিব। ভাল ঘোড়া হবে না—কায চলা মত হইবে। কিনিব না, ভাড়া করিয়া আনিব।"

কিশোরী বলিল, "আজ যদি আবার তোমায় কাংপাচেন গ্রামে যাইতে হয়, তবে এখানে বসিয়া আর দেরী করা উচিত নয়, আমরা উঠি চল,—সাহেবদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসি।"

দুইজনে উঠিল। নিনার চুলের ফুলটী পড়িয়া গিয়াছিল, কিশোরী আর একটি তুলিয়া তার কবরীতে পরাইয়া দিয়া, পূর্ব্বেরটি নিজ আলখাল্লার বুকে গুঁজিয়া লইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সংবাদপত্র সংগ্রহ।

নামিতে নামিতে নিম্নে অধিত্যকা ছাউনির দৃশ্যটি ক্রমে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ছাউনির সন্নিকটে ইহারা পৌঁছিলে, দেখা গেল, কিশোরীর পূর্ব্ব পরিচিত সেই রটেনহ্যাম সাহেব, পাইপ মুখে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহাদিগকে দেখিয়া সাহেব অগ্রসর হইয়া আসিল; এবং ইংরাজী ভাষায় "হেল্লো লামা, আসিয়াছ? বড় খুসী হইলাম।"—বলিয়া নিজ কর প্রসারণ করিয়া দিল। করমর্দন করিতে করিতে বলিল, "এই মহিলাটি কে?"

কিশোরী বলিল, "ইনি পরলোকগত জোংপা লামার কন্যা এবং এখন আমার বাগ্‌দত্তা বধূ।"

সাহেব নিনার দিকে চাহিয়া শিরোনমন পূর্ব্বক তাহাকে অভিবাদন করিয়া কিশোরীর পানে চাহিয়া বলিল, "বেশ বেশ। তোমাদের দুটিকে মানাইয়াছে ভাল। তা, ইনিও কি ইংরাজী কহেন?"

কিশোরী বলিল, "না, ইনি তিব্বতীয় ভাষা কহিয়া থাকেন।"

"তবে আপনি ইঁহাকে বলুন, ইনি আসাতে আমরা বড়ই খুসী হইয়াছি; কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কোনও আত্মীয়া মহিলা আমাদের সঙ্গে নাই।"

কিশোরী নিনাকে সাহেবের কথাগুলি বুঝাইয়া দিল। অতঃপর সাহেবের আহ্বানে, দুইজনে প্রধান তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইল। তাম্বুর সম্মুখে বৃক্ষতলে ক্যাম্প টেবিলের উপর চা প্রভৃতি সরঞ্জাম বিস্তৃত ছিল। অপর দুইজন সাহেব আসিলে, রটেনহ্যাম সকলের পরিচয় সম্পাদন করিয়া দিল। অতিথিদ্বয়কে চা রুটি

মাখন প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া দিয়া রটেনহাম তিব্বৎ দেশ সম্বন্ধে কিশোরীকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিশোরী কতক বা নিনার নিকট জানিয়া লইয়া, কতক বা পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে, কতক বা নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া, সে সকলের উত্তর দিতে লাগিল।

চা পান শেষ হইলে কিশোরী সাহেবদিগকে বলিল, "আপনাদের সঙ্গে পুরাতন সংবাদ পত্রাদি আছে কি? বহুদিন আমি দার্জ্জিলিঙ যাইতে পারি নাই—বাহিরের পৃথিবীর কোনও খবরই পাই না।"

রটেনহাম বলিল, "বেশী নাই, কিছু কিছু আছে। দার্জ্জিলিঙে আমাদের অবস্থানকালে যে কাগজগুলি পাইয়াছিলাম, তাহার কতক আমাদের সঙ্গে আছে বটে, তবে প্রায় সেগুলি জিনিষপত্রের গায়ে জড়ানো আছে। আচ্ছা, আমি খানকতক খুঁজিয়া তোমাকে দিব এখন।"

সাহেবেরা একে একে উঠিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে রটেনহাম ফিরিয়া আসিয়া খানকতক খবরের কাগজ কিশোরীর হাতে দিলেন। কিশোরী বলিল, "এগুলি আমি কি লইয়া যাইতে পারি? পড়িয়া আজ বিকালেই আমার লোক দিয়া ফেরৎ পাঠাইব।"

সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, খবরের কাগজগুলি লইয়া নিনা সহ কিশোরী বিদায় গ্রহণ করিল।

অবরোহণ যত সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল, আরোহণ অবশ্যই তদ্রূপ হইল না; তবে নিনার সুমধুর সাহচর্য্য ও তাহার অনায়াস ক্ষিপ্রগতির দৃষ্টান্ত, কিশোরীকে উৎসাহিত করিয়া, তাহার পথক্লেশ বহু পরিমাণে বিদূরিত করিতে লাগিল। মাঝে একবার থামিয়া নিনা বলিল, "একে তোমার অনভ্যাস, তাহাতে আবার রোগে দেহ দুর্ব্বল; তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। একটু বসিবে?"

"কিশোরী বলিলল, "বসিব। চল সেই রিংচেন কুঞ্জে আবার বসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিব।"

কিশোরী থামিল না—তবে তাহার গতি ক্রমে মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অতি কষ্টে সে পূর্ব্বোক্ত ফুলের ঝোপগুলির নিকটবর্ত্তী হইল। পাকদণ্ডি (গিরিপথ) ছাড়িয়া, সেই ঝোপের মধ্যে আবার দুই জনে গিয়া বসিল। বাক্য বিনিময়ের ক্ষমতা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের কাহারও রহিল না—পরস্পরের মুখ পানে চাহিয়া, সুখের হাসি হাসিয়া, কথা কহিবার সাধ তাহারা মিটাইল।

নিনা অবশেষে বলিল, "ঐ যে কাগজগুলি তুমি আনিলে, ওগুলি কি?"

খবরের কাগজ যে ব্যাপারটা কি, কি প্রকারে তাহা তৈয়ারী হইয়া দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হয়, তাহা কিশোরী সংক্ষেপে নিনাকে বুঝাইয়া দিল। নিনা কাগজ গুলি হাতে লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিল; শেষে বলিল, "তুমি যে যে ভাষা জান, সে সকল তুমি ক্রমে আমায় শিখাইয়া দিও। তুমি যেখানে যাইতে পার, আমার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, ইহা মনে হইলে, দাম্পত্য-সম্বন্ধে আমার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।"

কিশোরী বলিল, "শিখাইব বৈকি নিনা—আমি যাহা জানি সমস্তই তোমায় শিখাইয়া দিব। প্রথমে আমার মাতৃভাষা বাঙ্গলা তোমায় শিখাইব—তার পর ইংরাজি শিখাইব। তোমার তিব্বতীয় ভাষা আমি অল্প শিখিয়াছি বটে—আরও অনেক শিখিতে এখন বাকী—তুমি আমায় তাহা শিখাইয়া দিবে,—কেমন?"

মুক্ত আকাশের নীল-চন্দ্রাতপ তলে, সেই রিংচেন-সৌরভে আমোদিত নির্জ্জন কুঞ্জবিতান মধ্যে বসিয়া এই তরুণ তরুণী প্রায় একঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিল; এবং সমস্ত ক্ষণই যে "খালি লেখাপড়ার কথা" কহিয়াই কাটাইল, এমত বলা যায় না। তবে সে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই।

সম্পূর্ণভাবে সুস্থ ও বিগতক্লম হইয়া, নিনার বাহু কিশোরী নিজ বাহুতে শৃঙ্খলিত করিয়া কুঞ্জবিতান হইতে বাহির হইল, এবং পাকদণ্ডির পথে পৌঁছিয়া, আবার পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিল।

মঠে পৌঁছিয়া, উভয়ে দেখিল, ইতোমধ্যে কুরচিং

পাকাদি সম্পন্ন করিয়া বসিয়া আছে। উভয়েই অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ছিল; কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর, দুইজনে খাইতে বসিল।

আহারান্তে নিনা ঘোড়া সংগ্রহের জন্য গ্রামে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যাইবার সময় কিশোরীকে আড়ালে বলিল, "ঐ ফুরচিংকে তুমি কি আমাদের বিবাহের কথা বলিয়াছ?"

"না, বলি নাই।"

"এইবার তবে বল। কারণ, ইহাকে মঠ রক্ষণে নিযুক্ত রাখিয়া, আমরা দুইজনে কল্য প্রাতে ওয়ালং যাত্রা করিব।"

"আচ্ছা, তা বলিব।"

নিনা চলিয়া গেলে, শয়ন গুহায় কম্বল বিছাইয়া শয়ন করিয়া কিশোরী সংবাদপত্র গুলি খুলিল। দেখিল, সেগুলির তারিখ, তাহার দার্জ্জিলিং পরিত্যাগের সপ্তাহ কাল পরে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুইখানি "দার্জ্জিলিঙ ভিজিটর" নামক ইংরাজি সাপ্তাহিক, বাকীগুলি কলিকাতার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ইংলিসম্যান প্রভৃতি। কিশোরী প্রথম "দার্জ্জিলিঙ ভিজিটর" খানির পৃষ্ঠায় মনোনিবেশ করিল। ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে করিতে দেখিল, সপ্তাহ মধ্যে দার্জ্জিলিঙে যাঁহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং যাঁহারা ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, একস্থানে তাঁহাদের নামের তালিকা মুদ্রিত রহিয়াছে। পড়িতে পড়িতে, কিশোরী দেখিল, পরিত্যাগকারীদের মধ্যে, "মিসেস্ ঘোষ, মিস্ ঘোষ এবং মিস্ বীণা ঘোষ" নাম-গুলি রহিয়াছে। সুতরাং বুঝিল, ইঁহারা কলিকাতা ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কৈ, মল্লিক সাহেবের নাম ত এই তালিকা মধ্যে নাই।

বহুদিন পরে এইভাবে সত্যবালার নামোল্লেখে, কিশোরীর বুকটার ভিতর কি যেন আঁটিয়া ধরিল—উহা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। অবশেষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া, দ্বিতীয় ভিজিটর খানির পৃষ্ঠা উন্মোচিত করিল। স্থানীয় সংবাদ স্তম্ভে দেখিল,—

"রঙ্গপুরের ছুটিপ্রাপ্ত জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মল্লিকের পাহাড়িয়া ভৃত্য মংলুকে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যাল্‌কাটা রোডের নিম্নে খদমধ্যে আহত ও অচেতন অবস্থায় কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল এবং স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল ইহা বোধ হয় পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। সম্প্রতি সে আরোগ্যলাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া, তাহার প্রভু মল্লিকের কর্ম্মে পুনরায় বাহাল হইয়াছে, এবং যে বাঙ্গালী বাবু তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহার নামে ডেপুটি কমিশনরের আদালতে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছে। আসামীর এ পর্য্যন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই।"

ইহা ছাড়া, এ বিষয়ে আর কোনও সংবাদ কোনও কাগজে নাই। পড়িয়া, কিশোরী হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল—যাক্ মানুষ খুনের মহাপাপ হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে! ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার নালিশ্ করিয়াছে?—তা সে করুক!

কিশোরী চক্ষু বুজিয়া, পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল—"আর হয় না! আর হয় না! কয়েকদিন পূর্ব্বে এ সংবাদটি পাইলে, আমি দার্জিলিঙে ফিরিয়া যাইতাম; টাকা কড়ি দিয়া, মংলুর সঙ্গে মিটমাট করিয়া, মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে তাহাকে সম্মত করিতাম, এবং—

"এবং" ভাবিয়া আর ফল কি! যে কর্ম্মজালে নিজেকে জড়াইয়াছি, তাহা আর ছিন্ন করিবার উপায় নাই। উপায় থাকিলেও, তাহা করা ধর্ম্মসঙ্গত হইত কি না সন্দেহ!—যাহা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নই থাকিয়া যাক্!—আর কেন?"

অতঃপর কিশোরী কিছুক্ষণ দিবানিদ্রায় চেষ্টা করিয়া, অকৃতকার্য্য হইয়া, উঠিয়া বসিল। ফুরচিংকে ডাকিয়া খবরের কাগজ গুলি সাহেবদের ছাউনিতে দিয়া আসিতে বলিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিনা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, দুইটি টাটু ঘোড়া সংগ্রহ হইয়াছে, কল্য পূর্ব্বাহ্নকালে সে দুটি এখানে আনীত হইবে।

ফুরচিং ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সাহেবেরা তাহাকে মাসে ৫০৲ টাকা বেতন ও খোরাকে চাকরি দিতে চায়, নাদালামার এখন ত আর তাহাকে বিশেষ প্রয়োজন নাই—অতএব অনুমতি পাইলে ইত্যাদি।

নাদালামা তৎক্ষণাৎ অনুমতি ও পরদিন প্রাতে তাহার প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিলেন। ফুরচিং সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে টাটু দুইটি আসিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া লইয়া, গুহাদ্বারগুলিতে তালবন্ধ করিয়া, অশ্বারোহণে দুইজনে ওয়ালং মঠের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ঝঞ্ঝা-বরণ

বৃত্রের মত আসিতেছে ছুটে
কালবৈশাখী ঝড়।
এক হাতে তার রুদ্র-বিষাণ
আর হাতে খর্পর!
হুঙ্কারে তার গর্জ্জে অশনি
নিশ্বাসে ছুটে অগ্নি,
সৃষ্টি নাশিতে বুঝিবা আসিছে
আকাশের জমদগ্নি!
ঊর্দ্ধে বিমানে উল্লম্বিত
পিঙ্গল তার জটা,
চক্ষে খেলিছে চমকি চপলা,
বক্ষে জলদ ঘটা।
জুড়ি দুই পাণি কাঁপিছে ধরণী
গণিতেছে পরমাদ;
ক্ষুব্ধ তটিনী তট তরঙ্গে
উত্তাল উন্মাদ।
তা'থৈ তাথৈ থিয়া থিয়া থিয়া
ভৈরব তাণ্ডব!
নেত্র মুদিয়া লুকাতেছে ডরে
গ্রহ তারকারা সব।
হে বীর, আজিকে সত্রাসে তুমি
রুদ্ধ করো না দ্বার,
রুদ্রেরে আজি বরিবারে, আনো
অর্ঘ্যের উপচার।
ঝঞ্ঝার বুকে ঝাঁপায়ে পড়ুক
তোমার ক্ষিপ্ত প্রাণ
রুদ্রের সাথে ধর মল্লার
নট নারায়ণ তান।

শ্রীসন্তোষকুমার সরকার।

টিকটিকি

(গল্প)

আমার নাম রামরূপ সিংহ, পিতা মৃত রামটহল সিংহ; আমি এই গোপালপুর সহরের ডাক্তার যদু বাবুর বাসায় চাকরি করি। অদ্য প্রাতে ৬টা ৪২ মিনিটের সময় আমার সঙ্গীর হরি মণ্ডল চৌকিদারের একতার থানায় হাজির হইয়া আপনার (দারোগা বাবুর) সমক্ষে এজাহার করিতেছি যে, গত রাত্রে অজ্ঞাত সময়ে কে বা কাহারা আমার মনিবের পূর্ব্বদ্বারী কোঠা ঘরে সিঁদ দিয়া নগদ ও গহনায় আন্দাজী ২৫০৲ টাকা চুরী করিয়াছে। বাবুর নিজ লিখা ও সহি করা তালিকা দাখিল করিলাম। কাহারও উপর সন্দেহ আছে কিনা তাহা আমি জানি না। আর সমস্ত খবর বাবু নিজে বলিতে পারিবেন। আমার এই এজাহার আপনি লিখিয়া লইয়া আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, ঠিক লেখা হইয়াছে জানিয়া নিজে স্বেচ্ছায় টিপ সহি দিলাম। ইতি।

২

উপরি বর্ণিত প্রথম এতলা কার্ব্বণ পেপার সহযোগে দোকর (duplicate) লিপিবদ্ধ করিয়া দারোগা বাবু অকুস্থানে গমন পূর্ব্বক যথারীতি তদন্ত আরম্ভ করিলেন। গোপালপুর সহরে যদু ডাক্তারের নাম কে না জানে? তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে, ক্রীড়া কৌতুকে, টেনিস ও ব্রীজে, সঙ্গীত চর্চ্চায় ক্ষুদ্র গোপালপুর সহরে বাবু যদুনাথ ঘোষ মহাত্মনের ন্যায় প্রতীয়মান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার বাড়ীর এই চুরী ঘটনায় অনেকেই দুঃখিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। স্থানীয় সাপ্তাহিক "গোপালদর্পণ" লিখিলেন, "সহরে উপর্য্যুপরি এত গুলি চুরী হইয়া গেল, একটিরও কিনারা হইল না! পুলিস কর্ম্মণ্য কি অকর্ম্মণ্য এইবার তাহার মীমাংসা হইবে।"

কিন্তু একা পুলিসের উপর দোষ চাপাইলে হইবে কেন? জনসাধারণের স্বতঃ প্রণোদিত সাহায্য না পাইলে বিলাতী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকদেরও সূত্র আবিষ্কার ও প্রমাণ সংগ্রহ করা দুষ্কর। সুতরাং দারোগা ললিত বাবু রেল ষ্টেশনে প্রহরী প্রেরণ, পোদ্দারদের সতর্কীকরণ, অনেক খানা-তল্লাসীতে বহু বালিস বিদারণ, ও ধান চাউল উলোট পালোট ইত্যাদি করিলেন বটে, কিন্তু চুরীর আস্কারা হইল না। সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোকদের থানায় ডাকাইয়া লইয়া দারোগা বাবু ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক বিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু এই চুরীর কথা কিছু জান?" একে একে সকলেই বলিল না, সে কিছুই জানে না; সে চুরী করে নাই। ইচ্ছা থাকিলেও তার চুরী করিবার আবশ্যকই বা কি?

আবশ্যকই বা কি! এ কথার এক উত্তর—প্রহার। বিনা প্রহারে বদ্মাসদের পেটের কথা বাহির হয়? কিন্তু সে সুখের সাবেকি আমল আর নাই। যে দিনকাল, কাহাকেও তুমি ছাড়া তুই বলিবার সাধ্য নাই। অধুনা প্রহারে দারোগা বাবুর লাভ কি? বরং সমূহ বিপদ। এই তো সেদিন রতনগঞ্জের দারোগা সাহেব একটা সন্দিগ্ধকে একটুখানি কটু কাটব্য করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। আর অমনি সে জেলায় যাইয়া জনৈক নবীন উকিলের সৎ পরামর্শে কিংবা তাঁর মুহুরী বাবুর পিঠ-চাপড়ানিতে দুইটা ইকিমোসিস্, তিনটা ক্রস্ এইরূপ ডাক্তারী সার্টিফিকেট সংগ্রহ পূর্ব্বক নালিস রুজু করিয়া দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার অমৃতবাজারে যে তার প্রেরিত হইল তাহার হেডিং A Sub Inspector in trouble এবং শেষ দিকটার প্রধান কথাটা এই যে বাদীপক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অমুক।

এই সব দেখিয়া শুনিয়াই প্রবীণ দারোগা ললিত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার ক্রোধ হৃদয় কন্দরে লুকায়িত রাখিয়াছিলেন। ক্রোধ সম রিপু আর নাহি ধরাতলে।

৩

দারুণ সমস্যা। সাক্ষ্য দিবার ভয়ে কাহারও সাহায্য লাভের প্রত্যাশা নাই, প্রহার করিবার উপায় নাই; অথচ চোর ধরিতেই হইবে। নতুবা "গোপাল দর্পণ" সম্পাদক কি বলিবেন? আচ্ছা, এক কাষ করিলে হয় না? শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও ভক্তিভরে পূজার অনুষ্ঠান করিলে, দেবতার কৃপায় চোরা মাল পাওয়া অসম্ভব নয়। ন চ দৈবাৎ পরং বলং। দারোগা বাবু ও ডাক্তার বাবুর মধ্যে গোপন পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরদিন রাত্রে ডাক্তার বাবুর এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে এক পূজার আয়োজন হইয়াছে। তিনি তাঁহার বসিবার ঘরে পুলিশের সাহায্যে সহরের সন্দিগ্ধ লোকদের ডাকাইয়া আনিয়াছেন।

বদ্রবাবু গাত্রোত্থান করিয়া গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই।

"হে ভাই সব, আমার এই দারুণ সঙ্কটে তোমাদেরই সাহায্য ভরসা। তোমরা সকলে পরম হিন্দু, আমিও তোমাদের একজন। আমার গৃহে এক দৈবজ্ঞ সন্ন্যাসী পদধূলি দিয়াছেন এবং এক পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি পূজান্তে চুরীর গুপ্ত কথা পুলিশের কাছে বলিয়া দিতে পারিবেন। আমি তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া নিরস্ত করিয়াছি এবং তাঁহার হৃদ্‌বোধ মতে বলিয়াছি, পুলিসের হাঙ্গামা গুপ্ত কথাটি শুধু আমাকে বলিলেই হইবে। এই দেখ সন্ন্যাসী ঠাকুর পূজা শেষ করিয়া আসিলেন। (জটাজূটধারী মৌন সন্ন্যাসীর প্রবেশ) তোমরা সকলে পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম করিয়া এস। ঠাকুর তেল কালী বিলিপ্ত এক প্রস্তর খণ্ড; অতি জাগ্রত দেবতা। ইঁহার নিকট জাতি বিচার নাই; মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, সকলেরই ইঁহাকে স্পর্শ করিবার অধিকার আছে। যাও, স্পর্শ করিয়া ধন্য হও। ঠাকুরকে দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক হেটমুণ্ডে ভূমিতে প্রণাম করিবে এবং তৎক্ষণাৎ এই ঘরে আসিবে। আমি তোমাদের হস্ত কোশা-কুশির পবিত্র বারি দ্বারা ধৌত করিয়া দিই। (তথাকরণ) যে নিষ্কলঙ্ক তাহার হাতে তেল কালীর দাগ লাগিবে না। আমার কথাটি তোমরা সকলে বুঝেছ? তুমি? তুমি? আর তুমি? (ক্রমান্বয়ে সকলেই বুঝেছি স্বীকার করিল) যাও, দর্শন স্পর্শন করিয়া একে একে ফিরিয়া এস, পূজার ঘরে দেরী করিও না।"

বক্তৃতা শেষ হইল। একে একে উহারা ফিরিয়া আসিল। সকলেরই হস্ত তেল কালীতে কলঙ্কিত, কেবল একমাত্র ভিকুদাস ব্যতীত। ভিকুদাসের হস্ত নিষ্কলঙ্ক, সাদা ধব ধবে। দন্তে কৃত্রিম হাসির বিকাশ থাকিলেও, মুখ শুষ্ক ও চরণ কম্পমান।

"তবে রে বেটা!" এই বলিয়া রক্তবর্ণ চক্ষু বদ্রু ডাক্তার ৮২ সিক্ক ওজনের মুষ্টি উত্তোলন করিতেই [আহা কর কি! প্রহার যে নিষেধ!] ভিকুদাস সাষ্টাঙ্গে জটাধারী সন্ন্যাসীর শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়া উত্তোলিত আঘাত ব্যর্থ করিয়া দিল। আর অমনি পুলিশের হাঙ্গামা হইবে না আশ্বাস পাইয়া সে সমস্ত ব্যক্ত করিল। রাত্রি বেশী হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে যখন ভিকুদাস তাঁহার বাড়ীর প্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষতল হইতে সমস্ত অপহৃত মাল বাহির করিয়া দিল তখন সহরের বহুলোক জড় হইয়াছে এবং পুলিসেরও জানাজানি হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ভিকুদাসকে রক্ষা করিবার উপায় রহিল না।

দারোগা ললিত গাঙ্গুলী যথা সময়ে চার্জ্জ শীট পাঠাইয়া মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেন। পুলিশের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। "গোপাল দর্পণ" সম্পাদক অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, হাঁ পুলিশ কর্ম্মণ্যই বটে। আমরা গোপন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি মৌন সন্ন্যাসীর সাজসজ্জা ও শ্মশ্রু কৃত্রিম; কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি কথা কহেন নাই।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মহাপ্রয়াণে

থামাও বৃথা বিলাপ-কলরব, ভারতবাসী নোয়াও সবে শির,
শ্রান্ত দেহে ভবনে ফিরে ওই সমরজয়ী গরবী মহাবীর।
মুকুটমালা নামায়ে রাখি ভূমে
তৃপ্ত হিয়া নিবিড় স্নেহ-চুমে
মায়ের কোলে এলায়ে পড়ে ঘুমে, নয়নমণি স্বদেশ-জননীর!

নয়ন-কোণে মোছ রে আঁখিজল নিরোধি বুকে বিফল হাহাকার,
অস্তাচলে উজল হের তায় ভুবনপ্লাবী আলোক গরিমার!
দিগঙ্গনা দাঁড়ায় নতশিরে,
চরণতলে কমল-রেখা ঘিরে
মরণ-নদীর নীরব তীরে তীরে মহাকালের শুভ্র ফুলহার!

গগন-পথে অনেক ছিল বেলা, দিনের খেয়া সাঙ্গ তবু তার!
কে লুকালো মধ্য দিনের রবি ঘনিয়ে-আসা সাঁঝের তমসায়!
কাণ্ডারী গো অকূল পারাবারে
যাত্রী সবে লুটায় হাহাকারে,
খেয়ার তরী সুদূর পরপারে কে ভিড়াবে দিনের কিনারায়?

মন্দিরে ঐ ভক্ত সারি সারি, দুয়ার-পাশে যাত্রী করে ভিড়,
ফুলের সাজি শুকায়ে আসে হায়, পূজার আসন শূন্য পূজারীর!
সাধন-ধামে কোন্ অমিয় পিয়া
সাধক আজি রইলে বিসরিয়া
গড়লে দেউল বুকের পাঁজর দিয়া, তীর্থভূমি বিশ্ব ভারতীর!

বজ্রসম কঠোর ছিলে, কভু শিশুর মত সবুজ কচি প্রাণ,
জড়ার দেশে মড়ার দেশে একা মানুষ ছিলে সজীব বলীয়ান।
নয়ন-তটে আলোক-লেখা আঁকি
জ্ঞানের গুরু অন্ধে দিলে আঁখি,
বিদেশ দেশে বাঁধলে মিলন-রাখী, ভুবন জুড়ি জাগল জয়গান!

—মরণ! এ তো মরণ নহে ভাই, অনন্তকাল এমনি আসে যায়!
অমৃতের পুত্র ফিরে আজি আঁধার-পারে দীপ্ত অমরায়!
যুগের ঋষি মন্ত্র দিল পড়ি,
ঘুম-বিলাসীর তন্দ্রা নিল হরি',
আলোর কুঁড়ি চরণ-রেখা ধরি' ফুটল নবীন প্রভাত-গরিমায়!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

কলিকাতা
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



পূজারিণী ।

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

১৬শ বর্ষ } ১ম খণ্ড } শ্রাবণ, ১৩৩১ { ১ম খণ্ড { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

একাম্র কানন

অজীর্ণ রোগগ্রস্ত বাঙ্গালীর নিকট ভুবনেশ্বর খুব একটি প্রিয় স্থান হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা হইতে এখানে আসা খুব সহজ। রাত্রে হাওড়ার মেল বা এক্স-প্রেস ট্রেণে চড়িলে ভোর বেলা ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে পৌছানো যায়। সেখান হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দির ২॥ মাইল। রাস্তা ভাল, গোশকট প্রচলিত যান। তীর্থস্থানের চির-পরিচিত পাণ্ডার সহিত ষ্টেশনেই সাক্ষাৎকার ঘটে। মন্দিরের অনতিদূরে জনৈক ধনাঢ্য মাড়োয়ারীর স্থাপিত ধর্ম্মশালা - বৃহৎ ত্রিতলগৃহ। অন্য কোথাও থাকিবার বন্দোবস্ত না থাকিলে তিনদিন পর্য্যন্ত এখানে আশ্রয় পাওয়া যায়। একটি বাঙ্গালীর স্যানিটেরিয়ম বা স্বাস্থ্যনিবাসও আছে।

বলা বাহুল্য ভুবনেশ্বর দেব ও তাঁহার মন্দিরই তীর্থযাত্রীর প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়, আর স্বাস্থ্যান্বেষীর পীঠ-স্থান গৌরীকুণ্ড ও কেদারকুণ্ড। ভুবনেশ্বরের মন্দির ভারতবিখ্যাত, এখানে তাহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির ও ইহা অনেকটা এক ধরণে নির্ম্মিত। জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গনের ন্যায় ভুবনেশ্বরের প্রাঙ্গনও নানা দেবদেবীর মন্দিরে পূর্ণ; ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায়ের এই পন্থাটী সকল তীর্থক্ষেত্রেই সুপরিচিত।

পুরীর ন্যায় এখানকার মন্দিরগুলিরও অধিকাংশ বহির্দ্দেশে নানা কারুকার্য্য খচিত মূর্ত্তিতে শোভিত। ভুবনেশ্বরের ভোগও জগন্নাথদেবের ভোগের অনুরূপ। জগন্নাথদেব খুব সম্ভবতঃ এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তীর তলে আপনার পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি হিন্দুর দেবতা। বিষ্ণুতে পরিণত হইয়া ভ্রাতা বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রার সহিত ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্য, বৌদ্ধধর্ম্মের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আহার্য্য গ্রহণ স্বীয় "ক্ষেত্র" হইতে অপসারিত হইতে দেন নাই। তাই সেখানে চণ্ডালোচ্ছিষ্ট পক্বান্ন প্রসাদ এখনও ব্রাহ্মণের

ভোজ্য। হিন্দু জগতে আর কোথাও এমনটি পাইবে না। ভুবনেশ্বরের মহাদেব কোন কালে অন্ন কিছু ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের দেবতার এত নিকটে থাকায় তাঁহার প্রসাদও বিক্রেয়। প্রসাদ অনেকটা একরূপ, তবে জাতিভেদের গণ্ডী এখানে পুরীর ন্যায় শিথিল নহে এবং প্রসাদও ততটা প্রকাশ্যভাবে বিক্রীত হয় না।

পাণ্ডারা ভুবনেশ্বরের প্রস্তরময় দেহে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ধারা ইত্যাদি কত কি দেখাইতে সর্ব্বদাই দিব্যচক্ষু। কালাপাহাড়ের শুভাগমন সত্বেও ভুবনেশ্বর এখনও মন্দির ও দেবতায় পূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবল মন্দির। কোনটী যত্নে রক্ষিত, কোনটী পরিত্যক্ত, কোনটী ভগ্ন। পাণ্ডারা কেহ বলে যে এখানে উনকোটী দেবমন্দির, কেহ বলে সওয়া লক্ষ হইতে একটী কম। অঙ্কশাস্ত্রের অতটা চর্চ্চা করিবার অবসর পাই নাই, তবে মোটা বুদ্ধিতে বুঝিয়াছি পাণ্ডাদিগের লক্ষ বা কোটীর জ্ঞান খুব গভীর না হইলেও শিবমন্দিরের আধিক্যে ভুবনেশ্বর বারাণসীর প্রতিদ্বন্দ্বী।

ধর্ম্মশালার খুব নিকটেই বিন্দুসরোবর, পাণ্ডাদিগের মতে ইহা মহাদেবের ত্রিশূলাঘাতের ফল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন ইহা ও ইহার তীরস্থ অনন্ত বাসুদেবের মন্দির বাঙ্গালী পণ্ডিত ভবদেব ভট্টের কীর্ত্তি। সরোবরটি যে বহু প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। হইতে পারে আরও প্রাচীন বিন্দুসরঃ ভবদেব ভট্টের চেষ্টায় বর্ত্তমান বিন্দুসরোবরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভবদেব ভট্টও আধুনিক লোক নহেন; তাঁহার আবির্ভাব খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে অনুমিত হইয়াছে। সরোবরের বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে দ্বীপাকৃতি অংশে দেবমন্দির। স্নানযাত্রার সময় নৌকাযোগে দেবকার্য্য সাধিত হয়, অন্য সময়ে নৌকা নিমজ্জিত থাকে—সুতরাং মন্দিরে যাইতে সন্তরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সন্তরণও ঠিক নিরাপদ বলিতে পারি না, কারণ সরোবরে কুম্ভীরাদির অভাব নাই। দেবতার মাহাত্ম্য সত্বেও সাধারণ লোকের পক্ষে এই বিপদের আশঙ্কা উপেক্ষণীয় নহে।

বিন্দুসরোবরে স্নান তর্পণাদির পর অনন্তবাসুদেবের ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যাওয়াই তীর্থযাত্রীর পক্ষে সনাতন প্রথা। বিন্দু সরোবরের তীরেই ভবানী শঙ্করের মন্দির। ভবানী শয়ানাবস্থায়; চরণদ্বয়ের নিকট শিবলিঙ্গ। আদর্শটী যেন বাঙ্গালী ক্রমে নিজস্ব করিয়া তুলিতেছে তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। কপিলেশ্বরের মন্দির কিছু দূরে—খুব প্রাচীন। কপিলেশ্বরও মহাদেব, তাঁহার প্রস্তরময় দেহে একটী রন্ধ্র আছে, পাণ্ডারা তদ্দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস চলে বলিয়া ভক্ত যাত্রীর বিস্ময়োৎপাদনের চেষ্টা করে। রন্ধ্রদ্বারে লেখকের ন্যায় অবিশ্বাসী হস্ত-চালন করতঃ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও পাণ্ডারা নিরস্ত হইবার নহে, বলিবে ভোগের সময় চলে অথবা কখন কখন চলে। যাহা হউক ঠাকুরকে যে সময় সময় নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে হয় অন্য সময় তাহার প্রয়োজন হয় না, ইহাও তাঁহার মাহাত্ম্যেরই পরিচায়ক। আমরা (ওড়িয়ামতে) অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন কপিলেশ্বর দর্শনে গিয়াছিলাম। দিনটি পবিত্র, অনেক ভক্ত "ধন্না" দিয়া মন্দিরে শুইয়া পড়িয়া আছে দেখা গেল; ইহারা অবশ্যই কোন না কোন অভীষ্ট লাভ না করিয়া উঠিবার পাত্র নহে। মন্দির প্রাঙ্গনে এখানেও অনেক দেবতা ছোট খাট মন্দির লইয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহার প্রত্যেক মন্দিরে দর্শনপ্রার্থীর প্রণামী সাধারণতঃ এক পয়সা।

বিন্দুসরোবরের তীরস্থ অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা প্রধান দেবতা। ধারে ধারে অন্য দেবতারও সেবায়েতের অভাব নাই। মন্দিরের প্রাচীর গাত্রেই বঙ্গেশ্বর হরিবর্ম্মদেবের সচিব বাঙ্গালী পণ্ডিত "বালবলভী ভুজঙ্গ" ভবদেবভট্টের প্রশস্তি। এই প্রশস্তি যে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা তাহা প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন। প্রস্তরে উৎকীর্ণ প্রশস্তি প্রাচীর গাত্রে বসাইয়া রাখা হইয়াছে।

নাগেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, মেঘেশ্বর ইত্যাদি নামধারী আরও বহু শিবমূর্ত্তি এখন ভুবনেশ্বরে অনাদৃত অবস্থায় আছেন।

কেদার কুণ্ডের কৃপায়ই ভুবনেশ্বর বাঙ্গালীর উপনিবেশে পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে। এই কুণ্ডস্থ প্রস্রবণের খেতাভ জল ব্যাধিগ্রস্তের পক্ষে কল্যাণ-জনক বলিয়া অনেক চিকিৎসক মত প্রকাশ করেন। জলধারণের জন্ত কয়েকটী কুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে—এক কুণ্ড হইতে অন্ত কুণ্ডে জল নির্গমনের ব্যবস্থা আছে। কেদার কুণ্ড ক্ষুদ্র, পানীয় জলের জন্ত বেশ যত্ন সহকারে রক্ষিত। গৌরী কুণ্ড প্রভৃতি অপর কুণ্ড গুলি বৃহৎ—তাহাতে অবগাহনাদি ক্রিয়া চলিতে পারে। কুণ্ডের পার্শ্বে কেদারনাথ মহাদেব ও কৃষ্ণ প্রস্তর খোদিত গৌরী দেবীর মন্দির। এই প্রস্রবণের জল যতই খ্যাতিলাভ করিতেছে, ম্যালেরিয়া ও অজীর্ণ-গ্রস্ত বাঙ্গালী ততই দলে বলে ভুবনেশ্বর আক্রমণ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

জলের উপকারিতা সম্বন্ধে কিন্তু মতভেদ আছে। অনেকেরই ধারণা এই জল কোষ্ঠশুদ্ধির অমোঘ ঔষধ, কিন্তু কেহ কেহ বলেন উহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধ না হইয়া আরও বদ্ধ হইয়া যায়। আমার অল্প কয়েক দিনের ব্যবহারে মনে হয় ইহা পরিপাকের সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি বিষয়ে কোন উপকার পাওয়া গিয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার যে কোন-একটি বিশেষত্ব আছে তাহা নিশ্চিত তবে সেই বিশেষত্ব কোন ব্যাধিতে উপকারী তাহা বিশেষজ্ঞেরাই বলিতে পারেন।

ভুবনেশ্বরে বাঙ্গালীর অনেক নূতন নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। রক্তাভ মৃত্তিকা, মুক্ত বায়ু, প্রস্রবণের জল, চিকিৎসকের উপদেশ—কলিকাতাবাসী যে সহজেই আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে স্থানটী যদি কেহ নিরাময় মনে করেন তিনি নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। বাঙ্গালীর চিরপরিচিত ম্যালেরিয়া এখানে বেশ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে। ওড়িষ্যায় কোন জায়গায়ই বা করে নাই?

যদি কেহ জল বা বায়ু ব্যতীত অন্ত কিছু পান বা ভোজনের জন্ত বিশেষ উৎসুক থাকেন তবে তাঁহার অন্ত স্থান হইতে জিনিষ-পত্রের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। স্থানটী বাঙ্গালার ন্তায় "সুজলা সুফলা" নহে, এখানকার চাউল ও ডাল খাইতে হইলে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ স্থানীয় কঙ্করও গলাধঃকরণ করিতে হইবে। মৎস্য এখানে একটী দুষ্প্রাপ্য বস্তু, ফল তরকারীও সুপ্রাপ্য নহে। সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়। যে ডাব পুরীতে এত সুলভ তাহা ভুবনেশ্বরের হাটের দিন সংগ্রহ না করিলে পাওয়া যাবে না। তরকারীও খুব কম প্রকারই দৃষ্টিপথে আসিবে। দুগ্ধ ও ঘৃত অবশ্য কলিকাতা অপেক্ষা সুলভে মিলিবে। গরু ও মহিষের মাখন বিনা বিচারে মিশ্রিত হইলেও স্থানীয় লোক তাহা গালাইয়া যে জিনিষটী বিক্রয়ার্থ আনে সেটী ঘৃত,—চর্ব্বি মিশ্রিত একটী দুর্গন্ধ দ্রব্য বিশেষ নহে।

ভুবনেশ্বরে এত দেব দেবীর স্থান কেন? দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন বোধ হয় আমরা প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের নিকট শিখিয়াছি। ভুবনেশ্বরের অদূরে—৩।৪ মাইল দূরে—অস্তগিরি ও উদয়গিরি। এই দুইটী অনুচ্চ শৈল সরকারী রাস্তার উভয় দিকে পাশাপাশি ভাবে অতীতের যে কি এক মোহিনী স্মৃতি বক্ষে ধারণ করতঃ দণ্ডায়মান আছে তাহা কল্পনার নেত্রে ভিন্ন বোধগম্য নহে। কত বৌদ্ধ ও জৈন সাধুপুরুষের পদরেণু এই শৈলযুগল পবিত্র করিয়াছে তাহা কে বলিবে? আর পর্ব্বতগাত্রে প্রাচীন ওড়িয়ার শিল্পকলা এইখানে আসিলেই বুঝিতে পারা যায়। ওড়িয়া যে "মেড়া" বা মেষ নহে, ২০০০ বৎসর পূর্ব্বেও সে সুনিপুণ কলাবিদ্যায় জগৎকে স্তম্ভিত করিতে পারিত, তাহা এইখানে আসিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পর্ব্বত কাটিয়া কত যে গুহানামধারী স্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে- তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকেও বিস্ময়প্রদ। কত জীবজন্তু, দেবতা ও মানবের মূর্ত্তিতে যে এইসকল গুহা এবং তাহার প্রাঙ্গন ও প্রাচীর অলঙ্কৃত তাহা দেখিবার বিষয়। যাঁহারা এক সময় এই সকল গুহা অলঙ্কৃত করিতেন তাঁহাদের আহার বিহারের চিন্তা ছিল না, চাকুরীর চিন্তা ছিল না, কন্যা বিবাহের চিন্তা ছিল না, ছিল ধর্ম্ম-চিন্তা। যথেচ্ছ

আনীত ফলমূল বা অন্য কোন আহারেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন, সংসারকে তাঁহারা "চির বাসস্থান" বলিয়া মনে করিতেন না। জয়া বিজয়া গুহা, গণেশ-গুহা, সর্পগুহা, ব্যাঘ্র গুহা, 'স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল' নামক ত্রিতল গুহা, ইত্যাদি কত গুহাই এখন পর্য্যন্ত কতনামে পরিচিত হইয়া দর্শকের চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। কোন কোন গুহার অবস্থান দেখিলে পূর্ব্বে তাহা বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া মনে হয়, কোন গুহার এখনও শিলালিপি পরিস্ফুট। বিখ্যাত হস্তিগুম্ফা এখনও জৈন নৃপতি খারবেলের কীর্ত্তিকাহিনী দেহে বহন করিতেছে। গুহার আধিক্য উদয়গিরিতে। ইহার উপরিভাগে একটী কুণ্ড এখনও ইন্দ্রদেবের কৃপায় জলপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু সে যতি সন্ন্যাসী এখন নাই, সে জলের সদ্ব্যবহারও নাই। গুহাগুলি এখন পরিত্যক্ত, সাধুগণের অপরাহ্ণ সদালাপ এখন অতীতের বস্তু। সান্ধ্য আরতির পরিবর্ত্তে বন্য শ্বাপদের চীৎকারেই এখন গুহাগুলি মুখরিত। খণ্ডগিরিতেও কারুকার্য্য খচিত গুহার অভাব নাই; তন্মধ্যে অনন্ত-গুহা ও নবমুনির গুহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পাহাড়ের উপর এখন একটী জৈন মন্দির বিরাজমান। সেখানে নিয়মিতভাবে অর্চ্চনাদি হইয়া থাকে—আদিনাথ, সম্ভনাথ, পরেশনাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি।

আর একটী অতীত কীর্ত্তির স্থান ধৌলীপাহাড়। ইহা ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী; এখানে রাজাধিরাজ অশোকের অনুশাসন এখনও উৎকীর্ণ। কলিঙ্গজয়ের পর সীমান্তবর্ত্তী রাজপুরুষদিগের উপর ব্যবহার ইহাতে নিয়মিত হইয়াছে।

অবশ্য ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচারক শাস্ত্রের অভাব নাই। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ মনে করেন ভুবনেশ্বরই মহাভারতোক্ত স্বয়ম্ভু বন। কিন্তু ভুবনেশ্বরই যে ঠিক ঋষি নির্ব্বাচিত প্রাচীন স্বয়ম্ভু বন তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাকে একাম্রকানন ও দ্বিতীয় কাশী বলা হইয়াছে, এমন কি মহাদেব বারাণসীধাম পরিত্যাগ করতঃ এই স্থানেই বাস করিতেছেন এরূপ শাস্ত্রীয় বচনেরও অভাব নাই। ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শিব-পুরাণ, একাম্রপুরাণ, একাম্রচন্দ্রিকা, উৎকলখণ্ড প্রভৃতি বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ভুবনেশ্বরের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আর "ভুবনেশ্বর মাহাত্ম্য" ত আছেই। কোন তীর্থ যাত্রী উপস্থিত হইলে মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী পণ্ডিত তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু স্থানটী যতই প্রাচীন হউক, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির নিকট অর্ব্বাচীন বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান ভুবনেশ্বরের মন্দির খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। শিলালিপির বর্ণনায় পাওয়া যায় মন্দিরটী উৎকলরাজ অনিয়ঙ্ক ভীমদেবের কীর্ত্তি। তাহা হইলে ইহা খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মন্দির হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ মূল মন্দির ইহার পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। অভ্যন্তরস্থ লিঙ্গরাজ কতদিনের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। খণ্ড-গিরি ও উদয়গিরিতে গুহার আধিক্য ও ধর্ম্মসাধনার বিরাট আয়োজন দেখিয়া মনে হয় পুরাকালে এই অঞ্চল আর্য্য সভ্যতা একটী কেন্দ্র ছিল এবং ভুবনেশ্বর সম্ভবতঃ সেই কেন্দ্রেরই ভগ্নাবশেষ। বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক ইউয়ান্‌চাং খণ্ডগিরি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে নীরব। ইহাতে মনে হয় ভুবনেশ্বর তখনও পরিব্রাজকের মনোযোগ আকর্ষণের উপযুক্ত প্রাধান্য লাভ করে নাই। রেলওয়ে লাইন খুলিবার পূর্ব্বে এখানে তীর্থযাত্রীর সমাগম খুব বেশী ছিল বলিয়া বোধ হয় না—জগন্নাথ ক্ষেত্রই বহু লোককে আকৃষ্ট করিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহার স্বেতাভ প্রস্রবণই বাঙ্গালী যাত্রীর প্রধান আকর্ষক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মাহাত্ম্য এত প্রচারিত হইয়াছে যে ব্যাধিগ্রস্ত বাঙ্গালীর নিকট লিঙ্গরাজ অপেক্ষা প্রস্রবণই এখন অধিক প্রিয়। মন্দির যত বড়ই হউক, দেবতা প্রায় সকল তীর্থস্থানেই বায়ু ও আলোক হইতে দূরে এক প্রকার গহ্বরের মধ্যে থাকেন। তাঁহার এইরূপ অবস্থান মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য কি পাণ্ডাদিগের সহায়তা আবশ্যক করিবার জন্য বলা কঠিন।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আশাহত

(গল্প)

৪

অপরাহ্ণে বাড়ী ফিরিয়া চাউলের পুটুলিটা রোয়াকের উপর নামাইয়া রাখিয়া পরম ডাকিল—"গরব।"

কোন উত্তর না পাইয়া, পরম ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সদ্য নিদ্রোত্থিত গোবরা অলস নয়নে শয্যার উপর পড়িয়া আছে। পরম জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথা রে, গোবরা?"

গোবরা জড়িত স্বরে কি একটা উত্তর দিল ভাল বুঝিতে পারা গেল না। পরম তাহাকে সাগ্রহে কোলে তুলিয়া লইতে গিয়া দেখিল, তাহার গায়ে আগুনের মত উত্তাপ; জ্বরে সমস্ত শরীর পুড়িয়া যাইতেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও, গরবী ফিরিল না দেখিয়া, পরমের রাগ হইল। এই জ্বরে ছেলেটাকে ফেলিয়া সে পাড়া বেড়াইতে গিয়াছে? পরম জোর করিয়া ভাবনার বেগটাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেও তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, হাজার হউক সৎমা ত! গোবরার প্রতি গরবীর যে স্নেহ দেখিয়া পরম একদিন আকুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহাই তাহার মনে বিরুদ্ধ ভাবের সঞ্চার করিতে লাগিল। কেন সে গোবরাকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিল? নিজের নির্ব্বুদ্ধিতাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া, সে গোবরাকে কোলে লইয়া শুইয়া পড়িল।

দুপুর হইতেই গোবরার অরুবোধ হইতেছিল। অনেক দিনের চাপা জ্বর আবার ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া গরবী একটু চিন্তিত হইল। সে শুনিয়াছিল রামু বেদেনী এইরূপ রোগের ঔষধ জানে। রবিবারের দিন তামার মাদুলীতে পুরিয়া, গঙ্গাজলে ধুইয়া, তাহা ছেলের গলায় ঝুলাইয়া দিলে, যে কোন প্রকারের দূষিত জ্বর একদিনের মধ্যেই পলাইয়া যায়।

সেদিন রবিবার। সুতরাং গোবরা ঘুমাইয়া পড়িলেই গরবী কালবিলম্ব না করিয়া, পাঁচ পয়সা দক্ষিণা দিয়া, বেদেনীর নিকট একটা মাদুলি সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া রোয়াকের উপর চাউলের পুঁটুলিটা দেখিয়া গরবী বুঝিতে পারিল, পরম ফিরিয়া আসিয়াছে। সে ঘরের মধ্যেই আছে মনে করিয়া ডাকিল—"গোবরার বাপ!"

পরম সাড়া দিল না।

গরবীর সন্দেহ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "গোবরা ভাল আছে ত?"

ঘর হইতে পরমের বিরক্ত স্বর শোনা গেল, "এত মায়ায় আর কায কি!"

গরবীর মাথায় অকস্মাৎ একটা উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, স্বামীর মনের সন্দেহ ত এতটুকু কাটে নাই। সে এতদিন শুধু ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পরের জিনিসকে আপনার করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছে। তাহার সুপ্ত অভিমান আবার জাগিয়া উঠিল।

মাদুলিটি কপালে ঠেকাইয়া, গরবী প্রতিদিনের ন্যায় রাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর এক পাথর ভাত সশব্দে ঘরের ভিতর রাখিয়া দিয়া পরমকে জানাইয়া দিল যে, তাহার আহার্য্য প্রস্তুত।

পরম বলিল, "আমি কিছু খাব না।"

গরবী সে কথায় কাণ না দিয়া নিজে কতকগুলা ভাত লইয়া তাহার দিকে পিছু ফিরিয়া খাইতে বসিল। দুই এক গ্রাস মুখে দিয়াই, পাথরখানা হাতে করিয়া, গরবী উঠিয়া পড়িল।

অন্ধকার হইলে কেরোসিনের ডিবেটা ঘরের কোণে জালিয়া দিয়া, এক বাটী দুধ ও জলের গেলাসটা গোবরার মাথার কাছে রাখিয়া, গরবী নিঃশব্দে পৃথক গৃহে গিয়া শয়ন করিল।

গভীর রাত্রিতে আরও জলের আবশ্যক হওয়ায়, পরম উঠিয়া সমস্ত ঘর খানা অনুসন্ধান করিল। কিন্তু জলের কলসীটা না পাওয়ায় বাহিরে আসিয়া গরবীর দুয়ারে ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিল, "গরবি, ও গরবি!"

পরমের স্বর কাণে যাইবামাত্র গরবী পাশ ফিরিয়া শুইয়া জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

কোনরূপেই তাহার উত্তর না পাইয়া বিকৃত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়া পড়িল "আচ্ছা!"

অগত্যা ঘটীটা লইয়া পুকুর ঘাট হইতে জল আনিয়া পরম গোবরার মুখে দিল।

৫

সকাল না হইতেই গরবী ঘর হইতে বাহির হইয়া রোগীর ঘরের দুয়ারের নিকট দাঁড়াইল।

ঘরের ভিতর হইতে একটা অস্ফুট যন্ত্রণা-মূলক কাতর শব্দ এবং দুই চারিটি অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বাক্য ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না।

আতঙ্কে গরবীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। ছুটিয়া তুলসী তলায় গিয়া, গলায় আঁচল দিয়া বার বার প্রণাম করিয়া যোড়হাতে বলিতে লাগিল, "হে মা কালী, হে মা জগদ্ধাত্রি, এবার গরবীর মুখ রক্ষা ক'র।"

পরম বাহিরে আসিলে গরবী তাহার প্রতি চাহিতে পারিল না। অনাহারে, অনিদ্রায়, উৎকণ্ঠায় তাহাকে শ্মশানোত্থিত প্রেতের ন্যায় দেখাইতেছিল।

যে সকল প্রতিবেশী গোবরার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজনকে গ্রামের একমাত্র চিকিৎসক বিশু কবিরাজের নিকট পাঠাইয়া দিয়া, পরম মুখে চোখে একটু জল দিতে লাগিল। লোকটা অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, তাহার মাতার চিকিৎসার দরুণ, ছয় বৎসরের বাকী পাঁচটাকা সাড়ে তিন আনা পরিশোধ করিয়া না দিলে, বিশু কবিরাজ কোন মতেই পরমের বাড়ীতে পদার্পণ করিবে না।

গরবী কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরমের অবস্থা দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার শারীরিক যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল। জোর করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে লাগিল। নিরুপায় পরম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

যখন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, দেখিল, মহকুমার সরকারি ডাক্তার তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া।

ডাক্তারের পা দু'খানা জড়াইয়া ধরিয়া পরম চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমার গোবরাকে বাঁচিয়ে দাও, ডাক্তারবাবু!"

পরমকে আশ্বাস দিয়া ডাক্তার বলিল "রোগীর ঘরে আরও আলো বাতাস দরকার।"

সবে মাত্র পরমের এই একখানি ঘর সম্বল। গরবী যে ঘরে শুইয়াছিল, তাহা মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। পরম অকূল পাথারে পড়িয়া গরবীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

ঘরে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। নিষ্প্রয়োজন বোধে নানারূপ তৈজস পত্র তাহা অনেক দিন হইতে রুদ্ধ ছিল। গরবী একে একে সে গুলাকে টানিয়া নামাইয়া ফেলিল। গবাক্ষের উইজীর্ণ কপাট দুইখানা টানিয়া খুলিতেই, রুদ্ধ বায়ু কতকটা বাহির হইয়া যাওয়ায়, ঘরের গুমট অনেক কমিয়া গেল।

কতকগুলা উৎকট পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রেস্‌ক্রিপসান্ খানি পরমের হাতে দিয়া, ডাক্তার বিদায় হইল।

ইতিমধ্যে পরমের মনটা অনেক লঘু হইয়া

আসিয়াছিল। ডাক্তারকে যে গরবীই ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ ছিল না।

গরবীর উপর অন্যায় বিরক্তির জন্ত তাহার মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। মনের তিক্ত ভাবটাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়া পরম বলিল, "গরব, রাগ করিস্‌নে। দুঃখ তাপের শরীর, সব সময় মনটা ঠিক থাকে না।"

গরবী অভিমান ভরে প্রেস্‌ক্রিপসান্‌ খানা হাতে লইয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণপরে বিবিধবর্ণের ঔষধপূর্ণ দুই তিনটি শিশি লইয়া গরবী যখন পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল, পরম দেখিল একমাত্র লোহার কড়া ছাড়া গরবীর উভয় হস্ত শূন্য। পরম বিবাহের সময় গরবীকে রূপার বালা, খাড়ু ও চার গাছি মল কিনিয়া দিয়াছিল। গরবী খাড়ু ও মল তুলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু বালা যোড়াটা একদিনের জন্তও হাতছাড়া করে নাই।

পরম জিজ্ঞাসুনয়নে গরবীর মুখের দিকে চাহিল। গরবী মুখখানা নিচু করিয়া চলিয়া গেল।

একটা ছোট কাঠের বাক্সে গরবীর খাড়ু, মল ও পিতৃদত্ত একটি সোনার নথ সযত্নে রক্ষিত হইত। গরবী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে, পরম সন্তর্পণে বাক্সটি খুলিয়া ফেলিয়া দেখিল, তাহার ভিতর কিছুই নাই। সে এক মুহূর্ত্তে বুঝিয়া ফেলিল, সরকারি ডাক্তারের মোটা দর্শনীর সংস্থান কোথা হইতে হইয়াছে।

এতটা যে হইতে পারে, পরম তাহা ভাবিতে পারে নাই। গরবীর গহনা কয়খানির কথা অনেক বার তাহার মনে উঠিয়াছে। কিন্তু গোবরার প্রাণ রক্ষার জন্ত, গরবী যে তাহার যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীধন হইতে কোন প্রকারেই বঞ্চিত হইতে পারে না, তাহা সে একরূপ স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল। গরবীর মুখে নূতন করিয়া অস্বীকৃতির বাক্য শুনিয়া নিজের গ্লানিটাকে আর বাড়াইয়া তুলিতে তাহার ইচ্ছা হয় নাই।

পরমের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিয়া রাখিল, উঠুক আগে গোবরা বিছানা ছেড়ে, তারপর দেখা যাবে কে কাকে জব্দ করে। রতন চাটুয্যের কাছে তমসুক দিয়ে দশ গণ্ডা টাকা ধার ক'রে এনে, মহাজনের হাত থেকে গরবীর গহনা গুলো উদ্ধার ক'রে দেওয়া চাই-ই।

রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া গরবী অর্দ্ধ কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, পরমের মুখখানা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি কাষ শেষ করিয়া কতকগুলা পান্তা আনিয়া পরমের সম্মুখে রাখিয়া দিল।

পরম হাসিয়া বলিল, "একটু নুন লঙ্কা নিয়ে আয়।"

নুন লঙ্কা আসিলে পরম দুইদিনের আহার একেবারেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিল।

হাত মুখ ধুইয়া পুকুরের ধারে উঠিবামাত্র রতন চাটুয্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গোবরা কেমন আছে রে, পরম?"

পরম গড় হইয়া চাটুয্যেকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এখনো কিছু বিশেষ বুঝতে পারা যায়নি দা ঠাকুর।"

চাটুয্যে মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "কেন, বড় ডাক্তার এনেছিস, বিশেষ বুঝতে পারছিস্‌ নে?"

"এই ত মোটে ওষুধ পড়েছে, এর মধ্যে আর কি এমন বুঝতে পারব?"

"ডাক্তার কত টাকা নিয়ে গেল?"

"আমি তা বলতে পারিনে দা ঠাকুর, গরবী জানে।"

"সতীন পোর জন্তে গরবীর খুব মাথা ব্যথা দেখছি যে?"

"দা ঠাকুর, বললে বিশেস করবে না, গরবের মত মেয়ে একালে দেখা যায় না।"

চাটুয্যে একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "দ্বিতীয় পক্ষ আবার কার কোন কালে মন্দ হয় রে?"

চাটুয্যের তীক্ষ্ণবাণটা পরম অকাতরে সহ্য করিয়া গেল। কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চাটুয্যে পুনরায় বলিতে লাগিল, "ছেলেটার পুরোণো জরটা কি শুধু শুধুই জেগে উঠল? বাব্—এখন থেকে ওষুধপত্র গুলো দেখে শুনে খাওয়াস্। সৎ মায়ের ওপর অতটা বিশ্বেস ভাল নয়।"

এই বলিয়া ত্রেতাযুগের রাজপরিবারের উদাহরণ তুলিয়া রতন চাটুয্যে পরমকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিল যে, স্বয়ং নরনারায়ণ পর্য্যন্ত যখন বিমাতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই, তখন এক ফোঁটা বাগ্দীর ছেলের ত কথাই থাকিতে পারে না।

পরমের মস্তিকের মধ্যে কি একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়া গেল। সে এক নিশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া রোগীর মাথার নিকট হইতে ঔষধের শিশি কয়টা তুলিয়া লইয়া, বাহিরে আনিয়া ঢালিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

গরবী ছুটিয়া আসিয়া পরমের হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "দিন্‌যে ক্ষেপেছিস্ নাকি?"

উন্মাদের ন্যায় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া, পরম হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "সত্যি বল, তুই—

পরমের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। শিশি কয়টা গরবীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া, ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

গরবীর রমণী হৃদয় অভিমানের প্রবল উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল। প্রবল পরাক্রমে অন্তরের ভাবটাকে চাপিয়া রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কথাটা খুলে বল্‌লেই হ'ত। আমি তোর ছেলেকে বিষ দিয়েছি, না? আর যদি তোর ছেলের নাম মুখে আনি, আমার নাম গরব বাগ্দিনী নয়—নয়—নয়।" এই বলিয়া নিজের কর্ণদ্বয় সজোরে মর্দ্দন করিয়া সদস্তে মাটি কাঁপাইয়া প্রস্থান করিল।

৬

পরদিন গরবী অনেক বেলা পর্য্যন্ত উঠিল না। তাহার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল। এতবড় নিন্দাগ্লানির বোঝা মাথায় করিয়া পরমের সংসারে একতিল বাস করিতে আর তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। সংসারের কাযে যোগ দিতে যাওয়া তাহার পক্ষে মরণের অধিক বলিয়া মনে হইতেছিল। কিসের জন্য সে খাটিয়া মরিবে? পরমের সংসার ডুবিয়া গেলেই বা তাহার ক্ষতি কি?

কিন্তু যখন তাহার মনে পড়িল যে, কণ্যকার ভিজা জালখানা সমস্তরাত্রি মেলিয়া দেওয়া হয় নাই এবং মনীর মায়ের কাছে এখনই দুধ আনিতে না গেলে, তাহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তখন সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে আশা করিতেছিল, রুগ্ন পুত্র লইয়া বিব্রত পরম তাহাকে আগে ডাকিবে। সে যে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা জানাইবার জন্য ঘরের মধ্যে এটা সেটা নাড়িয়া সাড়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতের রৌদ্রে ঘরখানা সমুজ্জল হইয়া উঠিলেও কেহ তাহাকে ডাকিল না। পরম যে বাহিরে আসিয়াছে গরবী তাহারও কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিল না। অগত্যা মুখ খানা ভারি করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোবরার ঘর খোলা ছিল। গরবী গোপনে মুখ বাড়াইয়া দেখিল ঘরে কেহই নাই।

পরমকে না দেখিয়া গরবী তত বিস্মিত হইল না, কিন্তু রোগা ছেলেটাকেও বিছানায় না দেখিয়া—তাহার বুক খানা কাঁপিয়া উঠিল। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে গোবরা ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যায় নাই ত? পরম কি এতই বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছে যে, গোবরার সঙ্গে শেষ দেখা করিবার জন্যও সে গরবীকে ডাকে নাই?

গরবী কাঁদিল না। অসম্ভব শক্তিতে হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা গুলাকে চাপিয়া রাখিয়া, সে পুত্রহীন পিতার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

পরম কিন্তু ফিরিল না।

যতই বেলা হইতে লাগিল, গরবীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রতিবেশীদের কাছে নিজের স্বামী পুত্রের সংবাদ কি রূপে জানিতে যাইবে? বাস্তবিক

ছেলেটা যদি মরিয়াই গিয়া থাকে এবং পরম তাহার সৎকারের জন্ত শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়া থাকে, এক ঘরে বাস করিয়া গরবী তাহার সংবাদ জানে না, এ লজ্জা যে রাখিবার স্থান নাই। গরবী স্তব্ধ ভাবে পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ননীর মা গোবর কুড়াইয়া ফিরিতেছিল। গরবীকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, "তুই কি ম'রে ছিলি, গরবী? এতবড় রোগা ছেলেটা নিয়ে দু'কোশের পথ চলে যেতে দিলি?"

গরবীর দেহে প্রাণ আসিল। গোবরা তাহা হইলে বাঁচিয়া আছে। তাহার বাপ, তাহাকে কোন্ দূরদেশে লইয়া গিয়াছে। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমাকে কি ব'লে গেছে?"

"বলিস্ কি?"

"কেন বল্‌বে? আমি তার কে?"

"ছেলেটাকে নিয়ে বেড়াদহের মনসা ঠাকুরের কাছে হত্যা দিতে গেল, আর তোকে ব'লে গেল না?"

গরবী কপালে হাত ঠেকাইয়া মনে মনে বলিল, "ঠাকুর, গোবরার পানে মুখ তুলে চেও।"

ননীর মা থাকিতে না পারিয়া পুনরায় বলিল, "ঘরের মানুষকে কোন কথা না জানিয়ে, চুপি চুপি বাড়ী থেকে চলে গেল? ও মা, কোথা যাব গো!"

"তার ইচ্ছে হ'ল, চ'লে গেল, আমি তার কি করব?"

ননীর মা এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে একটি একটি করিয়া সমস্ত জানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

গরবী কোন কথাই প্রকাশ করিল না। ননীর মা ভিতরের ব্যাপারটা সমস্ত জানিতে না পারিলেও ইহা স্পষ্ট অনুমান করিয়া লইল যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা কিছু ঘটিয়াছে।

গরবী বলিল, "ননীর মা, আমার একটা কথা রাখ্‌বি?"

ননীর মা জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা গো?"

"আমাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দিবি?"

বদলীর মেয়ে গরবী যে রাণীর মত বসিয়া থাকে, আর সে নিজে গোবর কুড়াইয়া, মাছ ধরিয়া, খাটিয়া মরে, ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। আজ সুযোগ পাইয়া হাসিয়া বলিল, "এ সখ আবার কেন হ'ল? মিন্‌সে কি আর ভাত দিতে চায় না?"

"হাত পা থাকতে,—আমিই বা পরের ভাত খেতে যাব কেন?"

"ভাত খাওয়াবার জন্তেই ত মিন্‌ষে তোকে ঘরে এনেছে। মিছে কেন কাদা মাখতে যাবি?"

"তুই পারবি কিনা, বল।"

"পারবো না আবার কেন? তবে পরমা ফিরে এসে আবার কিছু না বলে!"

"আমি কারো কথা কহার তোয়াক্কা রাখিনে।"

ননীর মা আশ্বাস দিয়া গেল, যে দিন সে মাছ ধরিতে যাইবে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।

ননীর মা চলিয়া গেলে, গরবী একটু ভাবিয়া লইল। ডাক্তারের চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া গোবরাকে লইয়া দৈব অনুগ্রহের জন্ত পরম কেন যে এতদূর চলিয়া গেল, সে কোন মতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। মনসা ঠাকুরের উপর যে পরমের অখণ্ড বিশ্বাস আছে, তাহারও কোন পরিচয় সে ইতিপূর্ব্বে পায় নাই। তবে কি তাহার নিকট হইতে গোবরাকে দূরে রাখাই পরমের একমাত্র উদ্দেশ্ত?

পরমের চরিত্র গরবী ভাল রূপেই জানিত। শিশুর প্রতিপালনের ভারটা সময় সময় গরবীর উপর ছাড়িয়া দিলেও, সে যে কখনই সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর নির্ভর করিতে সাহস করে নাই সেটা তাহার ভালরূপেই জানা ছিল। তবুও আজ মুমূর্ষু ছেলেটা'কে উন্মুক্ত রৌদ্র বাতাসে সমস্ত দিনের পথ মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া যাওয়ার জন্ত তাহার মনটা এরূপ জলিয়া জলিয়া উঠিতেছিল যে, সে এই নির্ব্বোধ কুটিল পুরুষটিকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিল না।

৭

পাঁচ সাতদিন চলিয়া গেলেও, যখন গোবরা বা পরমের কোন সংবাদই গরবী পাইল না, তখন সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ঘরের সঞ্চিত চাউল গুলিও শেষ হইয়া আসিল। বাপের একটি মেয়ে বলিয়া গরবীকে কখনও বাপের উপার্জ্জনে সাহায্য করিতে হয় নাই। পরমের ঘরে আসিয়াও, তাহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। আজ নিজের উদরের জন্য মাছ ধরিতে যাইতে বা পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করিতে তাহার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। ঘরে যে দুই একখানি পিতল কাঁসা ছিল, তাহাই বাঁধা দিয়া দুই চারিদিন চলিল। ক্রমে তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিল।

পাড়ার লোকের অভাবে সময় অসময় মোক্ষদা ঠাকুরাণী দুই চারি সের চাউল ধার দিত। সুদের মাত্রাটা একটু বেশী হইলেও, বাধ্য হইয়া অনেককে তাহাই গ্রহণ করিতে হইত। গরবীর অবস্থা দেখিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী নিতান্ত দয়া পরবশ হইয়া দুই সের চাউল ও চারি আনা পয়সা ধার না দিলে, তাহাকে অনাহারেই মরিতে হইত।

দুই সের চাউলে একটা মানুষের কতদিন চলিতে পারে? গরবী আবার অভাবে পড়িল। অনেক ভাবিয়া কূল কিনারা না পাইয়া, অগত্যা পরমের অনুসন্ধানে যাইতে মনস্থ করিল।

কিন্তু মেড়াদহের পথ ত সে চেনে না। কে তাহাকে এই দীর্ঘপথ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে? যাইতে হইলেও দুইচারি আনা পয়সা পথ খরচের জন্য আবশ্যক! গরবীর চোখ অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল।

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার বিবাহের সময় তাহার বাবা যে একখানা পুরাতন থালা দিয়াছিল, সে থালা সযত্নে ঘরের কুলুঙ্গীতে সাজান আছে। থালা খানি নামাইয়া লইয়া গরবী হাটে চলিল।

সেদিন হাটবার। দেশ বিদেশের অনেক লোক হাটে জমিয়াছে। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়া গরবীর পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল। এত লোকের মধ্যে সে আপনার বিক্রেয় বস্তু লইয়া কাহার নিকট উপস্থিত হইবে, ভাবিয়া পাইল না। একবার মনে করিল, ফিরিয়া যাই। তখনই গৃহের অবস্থা স্মরণ হওয়ায়, তাহার মনের গতি ফিরিয়া গেল।

গরবী দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, তাহাদের গ্রামের কেহ আসিয়াছে কিনা। তাহার নিকট জানিতে হইবে, সে থালা বিক্রয়ের জন্য কাহার নিকট উপস্থিত হইবে। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না।

একটা লোক ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। সে সহসা গরবীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গা, তোমার কি চাই?"

গরবী আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আমি এই থালা খানা বেচতে এসেছি।"

লোকটা থালা খানা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া গরবীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাম নেবে?"

গরবী বলিল, "যা উচিত দাম।"

লোকটা বলিল, "এ ত সেকেলে থালা। এখন আর এর কদর নেই। যদি আট গণ্ডা পয়সা নিয়ে দিয়ে যাও, তা হ'লে আমি নিতে পারি।"

গরবী জানিত তাহার বাবা তিনটাকা দিয়া থালা খানা কিনিয়াছিল। তিন টাকার মাল আট আনায় দিতে গরবীর কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু কি করে? বেশী দাম বলিলে যদি সে না লইয়া চলিয়া যায় তখন উপায় কি হইবে? গরবী তাহাতেই সম্মত হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে কয়েক সের চাউল এবং অবশিষ্ট পয়সা কয়টি হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিল। মোক্ষদা ঠাকুরাণী গরবীর অপেক্ষায় তাহার উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। গরবী আসিতেই তাহাকে চাল ও পয়সার তাগাদা করিয়া বসিল।

মিনতির স্বরে গরবী বলিল, "আর দু'টো দিন

থাক, মাসী, মিনুষে ফিরে এলেই তোমার পাই পয়সা শোধ করে দেব।"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মোক্ষদা বলিল, "চার চার কাঠা চাল ফেলে রাখতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নেই।"

গরবী বলিল, "কালই তাকে আনতে যাচ্ছি, মাসী, পরশুদিন নিশ্চয় ফিরে আস্ব।"

গরবী বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া মোক্ষদার চিন্তা হইল। বাগ্দী জাতি ত! যদি আর না-ই ফিরে?

মোক্ষদা চাপিয়া ধরিল, আজ তাহার চা'ল পয়সা শোধ না করিলে কোন মতেই চলিবে না। আবার ত দিন আছে।

গরবীর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। সে কোথায় কি পাইবে? মোক্ষদার ঋণ সে কেমন করিয়া পরিশোধ করিবে? গরবী পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

তাহার হাতের চাউলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মোক্ষদা বলিল, "হাতে চা'ল তবু ধার শোধ ক'রতে চায় না! লোকের একি মতি গতি হ'ল মা!"

গরবী তাড়াতাড়ি চাউল গুলি মোক্ষদার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আজকের মত এই নিয়ে যাও মাসী, তোমার পয়সা ক'টা যেমন করে পারি, দু'চার দিনের মধ্যেই দরে দিচ্ছি।"

মোক্ষদা চাউল গুলি সংগ্রহ করিতে করিতে বলিল, "মনে থাকে যেন।"

মোক্ষদা চলিয়া গেলে, গরবী হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। রাগের মাথায় সমস্ত চা'লগু'ল মোক্ষদাকে ঢালিয়া দিয়া সে যে কত বড় ভুল করিয়াছে, এখন তাহাই মনে হইতে লাগিল। কা'ল অর্দ্ধাহারে কোন প্রকারে চলিয়াছে। আজ সমস্ত দিন উপবাস। কাল সকালে সে কিরূপেই বা পথে বাহির হইবে?

চতুর্থীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে ভাসিয়া উঠিল। নীল আকাশের গায়ে তারাগুলি হীরার মত ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। উঠানের আমড়া গাছের শুষ্ক পত্রগুলা দমকা বাতাসে ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

চাল ও তরকারির একটা বৃহৎ ধামা হাতে করিয়া ভজহরি আসিয়া ডাকিল, "গরব,—গরব আছিস্?"

ভজহরির ডাকে গরবী কোন উত্তর দিল না। কাপড় খানা টানিয়া মাথায় দিল। ভজহরি দেখিল, চালের নীচে যেখানে খানিকটা অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, সেই খানে সাদামত কি একটা নড়িতেছে। নিকটে আসিতেই গরবীকে চিনিতে পারিয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "এই যে গরব, শুনতে পাচ্ছিস্ নে নাকি?"

গরবী একটু নড়িয়া উঠিয়া বলিল, "শুনে কি হবে?"

ধামা হইতে তরকারিগুলি নামাইতে নামাইতে ভজহরি বলিল, "আজ তোর কি হয়েছে?"

"আমার মাথা!" বলিয়া গরবী উঠিবার চেষ্টা করিল।

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "যাচ্ছিস কোথায়?"

গরবী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "মরতে।"

"পরে মরবি, এখন আমার একটা কথা শোন দেখি।"

গরবী স্থির হইয়া দাঁড়াইল। চা'ল তরকারিগুলি গরবীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া, ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল "তোর রান্না হয়ে গিয়েছে?"

"আমি আজ আর রাঁধব না।"

"কি খাবি?"

"তোর তাতে কাষ কি?"

"একটু আছে বই কি।"

গরবী ভজহরির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভজহরি বলিল, "হাড়ভাঙা খাটুনী খেটে আজ আর হাত নড়্ছেনা। পেট ত মানতে চায় না।"

গরবী বলিল, "তার আমি কি করব?"

"ইচ্ছে করলে সবই করতে পারিস।"

"সোজা কথা বল্বি ত বল্। আমি অত ন্যাকামি বুঝিনে।"

ভজহরি বলিল, "রাগ না করিস্ ত বলি।"

গরবী বলিল, "আমার রাগে কার কি আসে যায় ?"

ভজহরি বলিল, "আজ যদি দয়া ক'রে দু'টো রেঁধে দিস্ তবেই। নইলে বুঝিস্ ত ?"

গরবী বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে আবার কি ?"

ভজহরি নরম সুরে বলিল, "তোকেও ত রাঁধতে হবে, সেই সঙ্গে না হয় আমার জন্যেও দু'টো চা'ল নিলি।"

গরবী বুঝিল ইহার মধ্যে ভজহরির একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। মোকদ্দমার ব্যাপারটা জানিতে পারিয়া, সে বোধ হয় এমনি করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছে।

ভজহরির উপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী পরিত্যক্তা, নিরাশ্রয়া নারীর প্রতি সম্পর্কশূন্য প্রতিবেশীর অযাচিত করুণা, গরবীর অশান্ত অন্তঃকরণকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

স্নিগ্ধ কটাক্ষে ভজহরির দিকে চাহিয়া গরবী বলিল, "আলোটা আল্।"

উৎফুল্ল হৃদয়ে ভজহরি আলো জ্বালিয়া ফেলিল।

রান্না শেষ হইলে, ভজহরি খাইতে খাইতে বলিল, "পরমা শালার আক্কেলটা দেখ্ দেখি, গরব !"

গরবী হাঁড়ি হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

ভজহরি পুনরায় বলিল, "পরমা যতদিন না ফেরে, আমি নিজে আর হাত পোড়াচ্ছিনে, গরব।"

কথাটা গরবীর পক্ষে আশ্বাসজনক হইলেও, বিনা কারণে একজনের অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকিতে, তাহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অভিমানিনী গরবীর অভিমানের প্রায়শ্চিত্ত যে এইরূপে হইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। ভজহরির কথায় কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া মৌন হইয়া রহিল।

আহার শেষ হইলে ভজহরি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এখন তুই খা, গরব, আমি আসি।"

অবশিষ্ট চাউলগুলি দেখাইয়া দিয়া গরবী বলিল, "চালগুলো নিয়ে যা।"

ভজহরি, "থাক না কেন।"

ক্রমশঃ

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইউরোপীয় শিক্ষার নবযুগের আরম্ভ। এই যুগে বহু বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রতিভাবলে জগতে স্মরণীয় হইয়াছেন। ইটালীতে ব্রুণো, ইংলণ্ডে বেকন্, ফ্রান্সে ডেকার্ট ইঁহারা সকলেই নবযুগের প্রবর্ত্তক। এই যুগে Materialism বা জড়বাদের অভ্যুদয় হইতে একদিকে যেমন Science বা বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহের উন্নতি হয়, অপরদিকে Idealism বা মায়াবাদের চর্চ্চা হইতে অধ্যাত্মশাস্ত্রেরও তদ্রূপ উন্নতি হইয়াছিল। চিন্তার এই দুইটি প্রবাহের একটি বহির্ম্মুখীন, অপরটি অন্তর্ম্মুখীন। মানব জ্ঞানের সম্যক্ পুষ্টিসাধন কল্পে এই দুই শাখারই চর্চ্চা অপরিহার্য্য। Materialismএর আলোচনা ইংলণ্ডে যত অধিক হইয়াছে, অন্যত্র দেশে তত হয় নাই। জন্ লক্, ডেভিড্ হিউম্, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ প্রভৃতি সকলেই ইংরাজ এবং ইঁহাদের দ্বারা Materialismএর ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। Charles

Darwin এবং Agustus Comteএর নামও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। Darwin বিবর্ত্তবাদের প্রচারক, ফরাসী দার্শনিক Comte, positivism বা নাস্তিকতার আবিষ্কর্ত্তা। ইঁহারা উভয়েই জনসমাজে বিশেষরূপ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। Idealismএর বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, এই তত্ত্ব পাশ্চাত্য খণ্ডের জর্ম্মাণিতে যত অধিক আলোচিত হইয়াছে, অন্যত্র তত হয় নাই। Idealism যেন পূর্ব্ব দেশেরই নিজস্ব, তাই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স্ অপেক্ষা জার্ম্মাণিতে ইহার আদর অধিক হইয়াছিল। Benedict Spinoza (১৬৩২—১৬৭৭ খ্রীঃ) এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও, তিনি বেল্‌জিয়ামে এক পর্ত্তুগীজ ইহুদীবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার Substance theory বা সত্ত্বা সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বিচার প্রণালী হইতে আধ্যাত্মিক মীমাংসার পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ, জর্ম্মাণ পণ্ডিত লাইবনিজ (Leibnitz) স্পিনোজার মতেরই পরিপোষক ছিলেন, এবং তাঁহার অসমাপ্ত মতাবলীর সংস্কার ও পুষ্টিসাধন করেন। গণিত শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ইঁহার প্রচারিত Monad বা শক্তিকোষ তত্ত্ব দর্শন শাস্ত্রে ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer ইঁহারা সকলেই স্বনামধন্য। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ন্যূনাধিক দুই শত বৎসরের মধ্যে ইঁহাদের দ্বারা পাশ্চাত্য চিন্তা জগতে আধ্যাত্ম তত্ত্বের যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ সাধিত হয়। সূক্ষ্মবিচার এবং আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে ক্যাণ্ট অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী পণ্ডিত আধুনিক যুগে আর জন্মিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। পরবর্ত্তীকালের সমগ্র চিন্তা প্রণালী তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। উপরিউক্ত দুই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও অনেক খণ্ড সম্প্রদায়ের এবং মতের আবির্ভাব, এবং তাঁহাদের দ্বারা জড়বিজ্ঞান (Physics), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনোবিজ্ঞান (Psychology), নীতি বিজ্ঞান (Ethics), সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান (Aesthetics), প্রাণীবিদ্যা (Natural history), উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany), ভূবিদ্যা (Geology), বায়ুবিদ্যা (Meteorology) প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সূত্রে Jeremy Bentham, Sir William Hamilton, Herbert Spencer, James Martineau প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল মহাত্মার চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের ফলে স্বাধীন চিন্তার প্রভূত শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। সাহিত্য এবং রাজ-নীতিক্ষেত্রে আরও কত মহাপুরুষ স্মরণীয় হইয়াছেন, তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব। স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে ইহাই toleration-এর যুগ। মধ্যযুগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় দমন নীতির (religious persecution) তিরোভাব হইতে মানব মাত্রেই স্ব স্ব অভিপ্রেতানুরূপ মতের প্রচার ও পোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্বন্ধে উপরে যে সামান্য বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ড ও জনসাধারণের ভিতর অজ্ঞান তিমির ও কুসংস্কার বড় কম ছিল না। শিক্ষার অভাব ত ছিলই, তাহার উপর church authority পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকায় এবং ধর্ম্মের সহিত রাজ-নীতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকায়, ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতাও লোপ পাইয়াছিল। ইহার সহিত যদি ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তারের বহু পূর্ব্বে ভারতের অবস্থাও তাহা হইতে কোন অংশে হীন ছিল না। বৈদিক সভ্যতার দিনে, ঋষিদিগের সময়ে স্বাধীন চিন্তার প্রভূত বিস্তার হইয়াছিল। চিন্তা প্রভাবে ঋষিরা জগতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব সকল তত্ত্বেরই সন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহাদিগের মধ্যে দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। "এক বিভাগের ঋষিগণ সর্ব্বদা ধন পুত্র, সংগ্রামজয়, স্বর্গসুখ, প্রভৃতি বাঞ্ছিত বস্তুর জন্য অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগের অনুষ্ঠান করিতেন; আর এক সম্প্রদায় অরণ্যে থাকিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়, বাসনাক্ষয়ের উপায়

ও মোক্ষপথের অনুসন্ধানে রত থাকিতেন। শেষোক্ত জ্ঞানিগণ অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচিন্তা করিতেন বলিয়া তাঁহাদের ও তাঁহাদের চিন্তা প্রসূত গ্রন্থের আরণ্যক নাম হয়। আরণ্যক উপনিষদেরই নামান্তর। প্রথম শ্রেণী যেরূপ ঋক্, সাম্, যজুঃ, অথর্ব্ব এই চারি বেদ ও শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরাবিদ্যার আবিষ্কার ও অনুশীলন দ্বারা মানব সমাজের পার্থিব জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর জ্ঞানিগণও তদ্রূপ উপনিষদ্ এবং দার্শনিক মতের সৃষ্টি দ্বারা পরা বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে নিরত রহিলেন। উভয় সম্প্রদায় দ্বারাই দিন দিন পৃথিবীতে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল।" *

এই নূতন জ্ঞানালোকের ফলস্বরূপ বহু দর্শনশাস্ত্র এবং উপনিষদাবলী আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞানালোকের প্রভা যাজ্ঞিক ঋষিদিগের প্রভাবে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতে লাগিল; স্বাধীন চিন্তার দ্বার ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ইঁহারা ক্রমশঃ ধন ও প্রভুত্বের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। "রাজা দেশের শাসনকর্ত্তা হইলেও ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়নের ভার ঋষিদিগের উপরই ন্যস্ত রহিল। শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করা রাজারও ক্ষমতায়ত্ত নহে, সুতরাং প্রকারান্তরে ঋষিগণই দেশের শাসন-যন্ত্রের পরিচালক হইলেন। তাঁহাদের আদেশ ও কার্য্যই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। ইহার ফলে ঋষিগণের অনেকের তপস্যা, সত্যপরায়ণতা নিস্পৃহতাব অনেকটা অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা ধনলোভে ঐশ্বর্য্যশালী ক্ষত্রগণের দ্বারা প্রায়ই অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন।" *

পরা বিদ্যা কিছু দিবসের মত আত্মগোপন করিলে অপরাবিদ্যা তৎস্থলে দেখিতে দেখিতে সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি ধারণ করিল। বেদ অপৌরুষেয় ঈশ্বরমুখ বিনিঃসৃত সুতরাং নিত্য, এই বিশ্বাস সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ভারতীয় আর্য্যসমাজের যখন এই অবস্থা, তখন বোধ হয় প্রাকৃতিক নিয়মে, একাদিক্রমে কয়েকজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের এক জন বৃহস্পতি, দ্বিতীয় কপিল, তৃতীয় পতঞ্জলি, চতুর্থ কণাদ, পঞ্চম গৌতম, ষষ্ঠ জৈমিনি এবং সপ্তম বাদরায়ণ। ইঁহাদের চিন্তাপ্রসূত মতাবলীই যথাক্রমে লোকায়ত মত, সাংখ্যমত, যোগমত, বৈশেষিক মত, ন্যায় মত, পূর্ব্ব মীমাংসা এবং বেদান্ত মত বলিয়া উক্ত হইল। লোকায়ত মত নাস্তিক মতের নামান্তর; ইহা নৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া ইহাদ্বারা বৈদিক ধর্ম্মের কোন অনিষ্টও হয় নাই। অপর ছয় মত শীঘ্রই প্রতিষ্ঠালাভ করে। ইঁহাদের হ আপাততঃ বৈদিক ধর্ম্মের অন্তরায় হইলেও পরে তাহার প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল স্বাধীন। চিন্তার প্রসার বশতঃ লোকের মনে পুনরায় ঐশ্বর্য্যতৃষ্ণা বলবতী হইয়া উঠে। তখন হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। বিদেশীয় পণ্যসম্ভারের আমদানি এবং ভারতীয় দ্রব্যজাতের রপ্তানি উপলক্ষে সমুদ্রপথে গমনাগমন হেতু এবং বৈদেশিকদিগের সংস্পর্শে কিছুদিনের নিমিত্ত প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে একটা উদার ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সময়ে আর্য্য এবং অনার্য্যগণ পাশাপাশি বাস করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন। আর্য্য এবং অনার্য্যের অবাধ মেলামেশা হইতে অনেক আর্য্যেতর জাতিও আর্য্যদলভুক্ত এবং আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, আর্য্যদিগেরও অনেকে অনার্য্যমত পোষণ করিতেন। এই উপলক্ষে উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনুলোম ও বিলোম বিবাহ প্রচলিত হয়। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সামাজিক উদারতা চিরস্থায়ী হইল না। ব্রাহ্মণগণ ইহাকে সামাজিক ব্যভিচার বলিয়া গণ্য করিলেন। এই সূত্রে মহর্ষি মনু কৃত মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বা অনুশাসন উল্লেখযোগ্য। সমাজ বন্ধনের নিমিত্ত মনুর পর অত্রি, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত রামানুজ চরিতের অবতরণিকা হইতে উদ্ধৃত।

প্রভৃতি ঊনিশ জন ঋষি কর্ত্তৃক স্মৃতি সংহিতা রচিত হয়। "প্রচলিত (ভৃগুকৃত) মনুসংহিতার বিধি অত্যন্ত কঠোর। উহাদ্বারা উপকার অপকার দুই ই হইয়াছে। বোধ হয় উপকার অপেক্ষা অপকারও নিতান্ত অল্প হয় নাই। তিনি, সন্ধ্যা উপাসনা, বেদপাঠ, যথা সময়ে উপনয়ন সংস্কারের অভাব, বেদের নিন্দা এবং কোন কোন নিষিদ্ধ ভক্ষ্যের গ্রহণ ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ হইবে, এইরূপ কঠোর বিধির প্রবর্ত্তন করিয়া যেমন সমাজে পবিত্রতা আনয়ন করিয়াছিলেন, তেমনি জ্যোতিষ, পুরাণ, চিকিৎসা শস্ত্র প্রভৃতি পাঠ ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়া ঐসকল শাস্ত্রের উন্নতির পথে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। শূদ্রদের প্রতি মনুর বিধির কোন কোন অংশ অত্যন্ত অকরুণ, ঐরূপ প্রত্যেক বিধি পালন করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।" *

মনুর অনুশাসনের ফলে সমাজের প্রকৃত উপকার যাহাই হইয়া থাকুক, ইহার অপকারিতা আজিও এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বেশ উপলব্ধ হইতেছে। এই অনুশাসনের দ্বারা সুবৃহৎ আর্য্য এবং অনার্য্য সমাজ খণ্ডীকৃত এবং শতধা বিভক্ত হইয়াছিল। ধনী ও বর্দ্ধিষ্ণু জাতির পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলজাতির নিষ্পেষণ করে এরূপ অমোঘ অস্ত্র ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ। পদে পদে পাপের দোহাই দিয়া গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের বিধি এমন আর কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে নাই। কিন্তু মনুর ব্যবস্থা সত্বেও ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে, তাহাতে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির অন্তরায় যথেষ্ট রহিয়াছে। লোকে তখনও প্রাচীন আর্য্যদিগের পূর্ব্বকথিত উদার শিক্ষা একেবারে বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা তখনও ঋষিদিগকে ঋষি বলিয়াই জানিত, দেবতা বলিতে তেত্রিশ দেবতার স্থলে তেত্রিশকোটী দেবতা বুঝিত না। পাছে সত্যের আলোকে পুনরায় তাহারা মস্তক উত্তোলন করে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিলেন। পুরাণ সৃষ্টির পর হইতে বহুসংখ্যক ঋষি দেবত্ব প্রাপ্তি হইলেন এবং তাঁহাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেওয়া হইল। ঋষিদিগের সহিত দেবতাদিগের কথোপকথন, ঋষি কিংবা দেবতার কোপানলে ব্রাহ্মণেতর জাতির পরাভব এবং ধ্বংস, ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে অপরাপর জাতির অমোঘ পাপ সঞ্চয় এবং ব্রাহ্মণের প্রসাদে পাপ মোচন, দেবতার বরে অসুর বা অনার্য্য জাতির লোকের অমিত তেজ সঞ্চয় এবং তন্নিবারণ জন্য দেবতাদিগের মন্ত্রণা, মানবের গৃহবিবাদে দেবতাদিগের পক্ষাবলম্বন ও সাহচর্য্য ইত্যাদি কতশত কাহিনী যে মধুর দেবভাষায় সুললিত ছন্দে রচিত হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বেদ, উপনিষদ্ এবং দর্শন শাস্ত্রাদির শিক্ষার পরিবর্ত্তে পৌরাণিক উপাখ্যান এবং স্মৃতিকারদিগের ব্যবস্থা স্থান পাইল। দেখিতে দেখিতে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তির কল্পনা, পূজার ব্যবস্থা এবং উপাসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। ভারতের চিন্তাগগনে মধ্যে মধ্যে যে দুই একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব না হইয়াছিল তাহা নয়। ইঁহাদের মধ্যে শাক্যসিংহ বা গৌতমবুদ্ধ অন্যতম। গৌতম অসাধারণ প্রতিভাশালী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং তৎকাল প্রচলিত সর্ব্ববিধ ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রায় দেড় সহস্র বর্ষ যাবৎ তৎপ্রচারিত ধর্ম্মমত এবং লোকশিক্ষা ভারতে প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই সময়ে সমগ্র ভারতে, এমন কি ভারতের বাহিরে, সুদূর ইউরোপ খণ্ডেও বৌদ্ধ প্রচারকগণ কর্ত্তৃক ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুদারতাই যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বহুপূর্ব্বে ভারতে আর একটি প্রাচীন ধর্ম্মমতের উৎপত্তি হইয়াছিল; ইহা

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত রামানুজাচার্য্য চরিত্রের অবতরণিকা হইতে উদ্ধৃত।

ঋষভদের প্রবর্ত্তিত জৈন মত। বুদ্ধের সমসাময়িক চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর কর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া পুনঃ প্রচারিত হয়। জৈনমত অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ হইলেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া উক্ত মত ভারতে স্থায়ী হইয়া গেল, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পারিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির দিনে উহাতে অনেক ব্যভিচার প্রবেশ করে এবং তাহার ফলে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উত্থান হয়। এই সূত্রেই আমরা শঙ্করাচার্য্যের পরিচয় পাই। শঙ্করের অদ্বৈত মত এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ তত্ত্বে মূলের ভেদ না থাকিলেও সামাজিক অবস্থানুসারে তৎকালে তাহা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। অদ্বৈত মতের পরেই দক্ষিণ ভারতের রামানুজাচার্য্য প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈত মত উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্টাদ্বৈত মত বৈষ্ণব মতেরই নামান্তর। শঙ্কর ও রামানুজাচার্য্য হইতে হিন্দু ধর্ম্ম পুনরায় জাগিল বটে, কিন্তু জাগিয়া স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাপ্রাবল্যে স্বাধীন চিন্তার পথ পূর্ব্বেই কণ্টকিত হইয়াছিল, এইক্ষণ পৌরাণিক কাহিনীর চমৎকারিত্বে সমস্ত কল্পনা-শক্তি ডুবিয়া গেল। স্মৃতি ও পুরাণ হিন্দুর সর্ব্বস্ব বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রকৃত, অপ্রকৃত এবং অতিপ্রাকৃত সর্ব্ববিধ বৃত্তান্ত মিলিয়া মিশিয়া সজীবতা লাভ করিয়া হিন্দুর হৃদয় ক্ষেত্রে এমন নিবিড় ভাবে বসিয়া গেল যে,—তাহার ভিতর কতটুকু প্রকৃত কতটুকু অপ্রকৃত এবং কতটুকু বা অতিপ্রাকৃত, তাহা বিচার করিবার শক্তি রহিল না। স্মৃতি ও পুরাণ হইতে যে হিন্দুজীবনের কোন উপকারই হয় নাই, তাহা বলা উদ্দেশ্য নয়। উপকার যথেষ্টই হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে প্রেমভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ ভালবাসা, শৌর্য্যবীর্য্য প্রভৃতি সমাজ বন্ধনের এবং সমাজ রক্ষণের উপযোগী নানা উপকরণ বিদ্যমান। তাহা সত্ত্বেও ইহাদের দ্বারা ভারতের বহু অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কিঞ্চিদধিক তিনশত বৎসরের অধ্যবসায়ের ফলে অজ্ঞান জাল ছিন্ন করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আপনাপন-কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর, ভারতে সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনার পরও মানবের শিক্ষা দীক্ষা ও চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইল না। হিন্দুগণ সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া অক্লেশে ধর্ম্মনামে পরিচিত শাস্ত্রের বিধি বলিয়া পরিগণিত দেশাচার ও লোকাচারের গন্ধমাদন বহিয়া জীবনকে অকারণ ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের শিশু জন্মিয়া ভূত প্রেত ও জুজুর ভয় শিক্ষা করে, অধিক বয়সে পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়া মোহিত হয়, যৌবনে নানা সংস্কারের বশীভূত হয়। অজ্ঞ পিতামাতার ও পরিজনবর্গের সংস্কার বেষ্টনীর মধ্যে লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত হওয়ায় তাহাদের কল্পনার বিশুদ্ধতা লোপ পায়। তাহারা স্মৃতি ও পুরাণের অতিরিক্ত কোন বিষয়ের ধারণাই করিতে পারে না। পদে পদে জাতিপাতের ভয়, তেত্রিশকোটী দেবতার ভয়,—শুধু দেবতা নয়, অপদেবতার ভয়েও দিন দিন তাহারা ম্লান ও কাতর হইয়া পড়ে। মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুক্, তুকতাক্ লইয়াই হিন্দু পরিবার ব্যস্ত। এই সকল বিধিব্যবস্থার চাপে হিন্দুর নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই। "শাস্ত্রবাক্য"—তা সে যে বাক্যই হউক এবং যাহারই হউক,—অলঙ্ঘ্য, তাহা মানিতেই হইবে। যদি কেহ মনে করেন, এই সকল সংস্কার বা আচার বিচারের পরিমাণ পাশ্চাত্য সংস্পর্শে এবং শিক্ষার বিস্তারের সহিত ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান করিতেছে, তাহা হইলে তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে, বর্ত্তমানে সমগ্র বৃটিশভারতে জনসংখ্যার শতকরা ৯৪ জন লোকেরও কম লোক শিক্ষাহীন। ইহার মধ্যে পুরুষশিক্ষার্থী শতকরা ৫, ৫৫ এবং স্ত্রী শিক্ষার্থী শতকরা ১, ১৮ জন মাত্র। যে দেশে শিক্ষাবিস্তারের হার এই, সেদেশে যুগ যুগান্ত গ্রথিত সংস্কার-তরুর মূল উৎপাটিত করিয়া, স্মৃতি পুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র এবং ব্যবস্থার নিগড় ছিন্ন করিয়া জনসাধারণকে পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত ও পরিচালিত করিয়া তোলার আশা দুরাশা নয় কি?

প্রাচীন গ্রীসে একমাত্র সক্রেটীশ ও প্রোটাগোরাসের চিন্তাপ্রভাবে লোকের মন বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য, বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, ভারতে কতশত মুনিঋষির জন্ম ও তিরোভাব হইল, তথাপি সমগ্র হিন্দুভারত আজ সংস্কারের দাস, হিন্দুর মস্তিষ্কে উদ্ভাবনা শক্তির অভাব, হিন্দুর প্রাণে বিশ্বমানবতার সাড়া নাই।

পাশ্চাত্যখণ্ডে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব কিরূপ চলিয়াছিল এবং তাহার ফল কি হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এই দ্বন্দ্বের পরিণামে জ্ঞানের জয় এবং অজ্ঞানের ক্ষয় হয়। পাশ্চাত্যগণ বিচারবুদ্ধি (Reason)কে কারারুদ্ধ জানিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য, অর্থাৎ অজ্ঞানতিমির দূর করিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে religious toleration এবং freedom of thought আসিয়াছিল। তখন তাঁহারা আর সংস্কার বা authorityর দোহাই মানিতেন না। সংস্কারকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সত্যানুসন্ধান মনীষিগণের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইল, চতুর্দ্দিকে অনুধাবন ও পরীক্ষণ (observation and experiment)এর সাড়া পড়িয়া গেল, বিজ্ঞান সাহায্যে তখন তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিলেন। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও, religious intolerance পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাবল্যে জনসাধারণের ভিতর freedom of thought কখনও স্থায়ী হওয়ার অবকাশ পায় নাই। Reason বা বিচারবুদ্ধি চিরদিনই কারারুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া ভারতের এই শোচনীয় অবস্থা আসিল, তাহাও এক প্রকার মোটামুটি দেখা গিয়াছে। সমগ্র ভারত আজ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্‌ভ্রান্ত, অথচ ভারতের সামাজিক দুরবস্থা এবং মানসিক জ্ঞানদৈন্যের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। ভারতের দুর্দ্দশামোচন না করিয়াই সকলে আজ পাশ্চাত্যবিতাড়নে বদ্ধপরিকর, সত্যের আলোক রুদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে East বা প্রাচ্যের সহিত West বা প্রতীচ্যের সদ্ভাব দেখান বিড়ম্বনামাত্র। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত প্রতীচ্যের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, কর্ম্মের সামঞ্জস্য-সাধন অস্বাভাবিক। মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী হিন্দু বা ব্রাহ্ম, মহারাষ্ট্রীয় অথবা কাশ্মীরী পণ্ডিত কিংবা মান্দ্রাজী বিলাতফেরত শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা ভারতের ভাগ্যাকাশ কখনই প্রসন্ন হইবে না। ইঁহাদের কর্ম্মজীবনের গতির সহিত সাধারণ হিন্দুপরিবারের কর্ম্মজীবনের সম্পর্ক নাই, থাকিতেও পারেনা; কারণ, এখানেও সেই শাস্ত্রের বাধা, জাতিপাতের ভয়। লোকশিক্ষা এবং ধর্ম্মসমন্বয় ব্যতীত কোন জাতির কোনকালে উন্নতি হয় নাই। পৃথিবীতে যে সকল জাতি জাতীয়তার দাবী করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের সকলের মূলে এই দুইটি কারণ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। ভারতে যতদিন লোক-শিক্ষার বিস্তার না হইবে, যতদিন বিভিন্ন ধর্ম্মের লোক ধর্ম্মবিদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে না পারিবে, ততদিন East এবং Westএর শিক্ষাগত মিলন (Cultural unity) অসম্ভব।

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

নগবালা

(উপন্যাস)

দশম পরিচ্ছেদ

সুখের খবর।

ভারতীর বড়লাটের দপ্তরে, উচ্চশ্রেণীর হিসাব-পরিদর্শনের কার্য্যে প্রবেশলাভ করিতে হইলে, প্রথমে দরখাস্তের মুদ্রিত ফরম, কিছু নগদ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়; দরখাস্ত ও দরখাস্তের ছাপার প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখিতে হয়; দরখাস্তের সহিত দেহের সুস্থতা, পটুতা ও বয়ঃক্রম সম্বন্ধে, চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বপ্রধান জেলা কর্ম্মচারীর পরীক্ষা পত্র, ও এম্.এ, বা এম্.এস্.সি, পরীক্ষার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদর্শন পত্র দাখিল করিতে হয়। তৎপরে দরখাস্তকারিগণের মধ্যে কতক সংখ্যক প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার জন্য মনোনীত হইলে, তাহাদিগকে আবার ঐ পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট দর্শনী দিয়া, পরীক্ষা দিতে হয়। যাহারা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়, সেই যুবকগণের মধ্য হইতে, খালি পদের সংখ্যা অনুযায়ী, কয়েকটি মাত্র যুবক বাছিয়া লওয়া হয়।

এতগুলি বাধা অতিক্রম করিতে, প্রথমতঃ বিদ্যা, পরে স্বাস্থ্য, পরে ক্ষমতাপন্ন লোকের সহায়তা আবশ্যক। ইহার উপর ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইতে, দরখাস্ত করিতে, পরীক্ষার ফি দিতে কিছু খরচেরও আবশ্যক আছে।

দরিদ্র রামপ্রাণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার আশার প্রদীপ শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রকাশের জন্য সহজেই অর্থ সাহায্য এবং ক্ষমতাপন্ন লোকের সহায়তা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, উহা না পাইলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ তাহার সমস্ত বিদ্যা-গৌরব ও বুদ্ধিমত্তা লইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

তিনি তাঁহার অফিসের বড় সাহেবকে ধরিয়া বলিলেন যে, অফিসের তহবিল হইতে, ঋণ স্বরূপ তাঁহাকে কিছু অর্থ দেওয়া হউক; পরে তাঁহার বেতনের টাকা হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু আদায় লইয়া, ঐ ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হউক।

বড় সাহেব অতি সদাশয় ব্যক্তি। তিনি তাঁহার দরিদ্র কিন্তু কর্ম্মঠ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অভাবের কথা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। তিনি রামপ্রাণ বাবুকে কহিলেন যে, তাঁহার প্রার্থিত অর্থ, আপন পকেট হইতে দিবেন, এবং উহা পরিশোধ করিবার আবশ্যক হইবে না। এইরূপে, পরীক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু বড় সাহেবের সদাশয়তা এই অর্থ সাহায্য করিয়াই বিমুখ হয় নাই। ইংরাজ জাতির একটা স্বভাব এই যে, যখন তাঁহারা কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা যেরূপেই হউক, সেই কার্য্য সুসম্পন্ন না করিয়া নিবৃত্ত হ'ন না। ইহাকে তাঁহারা bull dog tenacity (ডাল কুত্তার গোঁ) বলিয়া থাকেন। বড় সাহেবের, উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারী মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সেই প্রতিপত্তি লইয়া তিনি জ্যোতিঃপ্রকাশের মনোনয়ন সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে, জ্যোতিঃপ্রকাশ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য মনোনীত হইল। তৎসংবাদ গেজেটে প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বেই অবগত হইয়া তিনি রামপ্রাণ বাবুকে জানাইলেন।

সেই শুভ সংবাদ শুনিয়া কৃতজ্ঞতা ভারে রামপ্রাণবাবু সাহেবের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। সাহেব তাঁহার আনন্দে সহানুভূতি জ্ঞাপন জন্য,

ইংরাজি প্রথা অনুযায়ী, তাঁহার করমর্দন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি সাহেবের উদ্যত হস্ত, দুই করতল মধ্যে গ্রহণ করিয়া, ভক্তি পূর্ব্বক উহাতে আপন ললাট স্পর্শ করিলেন; এবং চিত্তাবেগে সেই হস্তের উপর প্রচুর অশ্রু বর্ষণ করিলেন।

আপন পুরাতন কর্মচারীর কৃতজ্ঞতার এই নিদর্শন পাইয়া সাহেবের মনোমধ্যে কি হইতেছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারও লোচনদ্বয় আর্দ্র হইয়াছিল। অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে তিনি কহিলেন, "রামপ্রাণবাবু, তুমি হৃদয়োচ্ছ্বাসে, আর নিজেকে কাযের অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছ।"

রামপ্রাণবাবু চক্ষু মুছিয়া, আপন হৃদয়োচ্ছ্বাস কতকটা প্রশমিত করিয়া কহিলেন, "না; এখন আমি আরও উৎসাহের সহিত কায করিতে পারিব। তবে এই সুখের খবরটা শীঘ্র শীঘ্র বাটীতে দিবার জন্য, আমি ঘণ্টা খানেক আগে যাইতে চাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টা খানেক ছুটী দেন।"

সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে, সেদিন আর রামপ্রাণ বাবুর দ্বারা অফিসের কার্য্য হইবে না। অতএব তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে বেলা তিনটা হইতে ছুটী দিলাম।"

রামপ্রাণবাবু সাহেবকে সেলাম করিয়া সাহেবের কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন; এবং আপন কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোন মতেই তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। কেবলই পুত্রের ও তাহার জননীর হর্ষোৎফুল্ল মুখ তাঁহার নয়নাগ্রে উদিত হইতে লাগিল; কেবলই নব নব আশা তাঁহার হৃদয়রঙ্গমঞ্চে, নব নব বেশে নৃত্য করিতে লাগিল; কেবলই নূতন নূতন সুখের উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানস আকাশে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তিনি কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, পুত্র তাঁহাকে মাসে মাসে পাঁচশত টাকা আনিয়া দিলে, ঐ অর্থে তিনি কি কি সামগ্রী ক্রয় করিবেন। প্রথম মাসের টাকা হইতে তাহার গর্ভধারিণীকে নগদ কুড়ি টাকা দিতে হইবে; ঠাকুর দেবতার কাছে তাহার কি মানত আছে, ঐ টাকায় সেই সকল ব্যয় সে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। বাকী চারিশত আশী টাকা, বোধ হয়, শ্রীমান্ বাবাজীর পোষাক পরিচ্ছদ ও আবশ্যক আসবাব পত্রে খরচ হইবে; একটু গুছাইয়া ব্যয় করিতে পারিলেই ঐ টাকার ভিতর হইতে শ্রীমতী বধূমাতার জন্য এক-খানা হাফ্ গোছের গহনাও হইতে পারিবে। তাহার পর, পরের মাসের পাঁচশত টাকা হইতে, মুদীর চল্লিশ টাকা, গোয়ালার কুড়ি টাকা, ধোবার বার টাকা, আর ঝির দুই মাসের মাহিনা পরিশোধ করিতে হইবে। ক্রমে রামপ্রাণবাবুর জমাখরচ আর মনে মনে কুলাইল না। তিনি অফিসের কার্য্য না করিয়া, অফিসের কাগজ ও কালী ব্যয় করিয়া, আয় ব্যয়ের দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কিন্তু আয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি বড় অস্থির হইয়া পড়িলেন; গৃহিণীর সৎপরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। রামপ্রাণবাবু বাটী ফিরিবার জন্য ছটফট্ করিতে লাগিলেন। ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল, বুঝি তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে হইল, গগনপথে সূর্য্যের রথ অচল হইয়াছে। এইরূপে কোন রকমে তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, আয়ব্যয়ের তালিকা বস্ত্র পূর্ব্বক পকেটে লইয়া এবং জীর্ণ ছাতিটি বাহুমূলে গ্রহণ করিয়া, তিনি গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। আজ তাঁহার বুকে জোর ছিল, তাই অকাতরে ব্যয় করিয়া ট্রাম গাড়ীতে চড়িয়া, সত্বর বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

গৃহিণী তাঁহাকে সকালে বাটী প্রত্যাগত দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত আগে এলে যে? কোনও অসুখ করেনিত?"

রামপ্রাণ বাবু ছত্রটি গৃহিণীর উদ্যত হস্তে সমর্পণ

করিয়া কহিলেন, "অসুখ? আর কখনও আমার অসুখ হবে না। আজ বড় সুখের খবর নিয়ে আমি বাড়ী এসেছি।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুড়ি টাকা মাইনে বাড়বার কথা ছিল; তাই বুঝি বেড়েছে?"

রামপ্রাণবাবু কহিলেন, "সে বাড়ুক আর নাই বাড়ুক। তার চেয়ে সুখের খবর আজ তোমাকে দেবো। জ্যোতিঃপ্রকাশ কোথায়?"

গৃহিণী বলিলেন, "কেন? এই কতক্ষণ আমার কাছ থেকে ট্রাম গাড়ীর পয়সা চেয়ে নিয়ে বেড়াতে গেছে।"

রামপ্রাণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত আগে বেড়াতে গেল কেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "কি জানি। বোধ হয় কোন জায়গায় নেমন্তন্ন আছে। ভাল কাপড় চোপড় পরে গেছে। কিন্তু তাকে খুঁজছ কেন?"

রামপ্রাণ বাবু কহিলেন, "সুখের খবরটা তারই সব আগে শোনা দরকার।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু এই সুখের খবরটা কি?"

রামপ্রাণ বাবু হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, "বড় লাটের অফিসে তার পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী হয়েছে। আমাদের বড় সাহেব আমাকে চুপি চুপি খবর দিলেন। বুঝেছ, বড় সাহেবের চেষ্টাতেই এ চাকরী হ'য়েছে।"

স্বামীর হৃষ্ট মুখ দেখিয়া এবং সেই মুখে পুত্রের কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া গৃহিণীর বুকটা যেন সাত হাত লাফাইয়া উঠিল; তিনি মহানন্দ-উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন, "এখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে যেন দীর্ঘজীবী হয়।"

রামপ্রাণ বাবু কহিলেন, "এখন মাইনের টাকা গুলো মাসে মাসে কি করে খরচ করবো, তাই দুজনে পরামর্শ করিগে, চল।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

বধূর আদর।

সেই দিন অফিস হইতে রমেশও মাতার স্নেহাকুল কর্ণে সুখসংবাদ আনিয়াছিল। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় সে হাসিমুখে বাটী ফিরিয়া, সম্মুখোপবিষ্ট মাতার পায়ের কাছে, পঞ্চবিংশতিটি চক্‌চকে রজত মুদ্রা রাখিয়া প্রণত হইল।

মাতা পুত্রের মস্তকে হাত বুলাইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের টাকা?"

রমেশ বলিল, "একটা হিসাবের গোলমাল, আমি ক'দিন পরিশ্রম করে মেটাতে পেরেছি। তাতে আমার মুনিবের কিছু লাভ হয়েছে। তাই তিনি সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে এই পঁচিশ টাকা বকসিস্ করেছেন। আর এই মাস থেকে দশটাকা হিসাবে মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন।"

মাতা, পুত্রের নমিত মস্তকের উপর পুনরায় তাঁহার স্নেহসিক্ত হস্ত স্থাপিত করিলেন। সেই স্নেহময় স্পর্শে রমেশ মনে করিল, কে যেন তাহার মস্তকে দেবতার মাথার মণিময় মুকুট পরাইয়া দিল। মাতা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "তুই ঐ আফিসেই লেগে থাকিস; তোর ঐখানেই ভাল হ'বে। তুই সৎপথে থেকে, মুনিবের যাতে ভাল হয় খুব পরিশ্রম করবি, ভগবান তোর ভাল করবেন। আর মনে রাখিস্ ভগবান যখন ভাল করেন, তখন কোন মানুষ তাতে বাধা দিতে পারে না।"

মাতার উপদেশ বাক্য শুনিয়া রমেশ গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কি কথা বলিল, মাতা তাহা কর্ণে শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয়মধ্যস্থিত স্নেহ-সাগর আলোড়িত হইয়া উঠিল। রমেশ তাঁহার পদপ্রান্ত ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলে, তিনি কিয়ৎকাল ভাবাবেগে কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "ঠিক সময়, ভগবান তোর আয় বাড়িয়ে দিয়েছেন। তোর ছেলে হ'বে কিনা, তাই ভগবানের

কৃপায়, সে আপনার সুখের যোগাড় ক'রে নিয়ে আস্‌ছে।"

রমেশ এ সংবাদটি জানিত না। এক্ষণে মাতার নিকট শুনিয়া, সে প্রশ্নপূর্ণ নয়নে অদূরোপবিষ্টা, লজ্জাবনতমুখী, অবগুণ্ঠনবতী মালতীর দিকে তাকাইল।

ক্ষীণ অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া সেই দৃষ্টি মালতীর প্রেমাকুল নয়নের সহিত মিলিত হইল; মালতীর শিরায় শিরায় প্রেমপ্রবাহ প্রবাহিত হইল; সে প্রিয়তমের প্রশ্নপূর্ণ প্রেমদৃষ্টি শিরায় শিরায় অনুভব করিল। করিয়া, তাহার ব্রীড়ারাগরঞ্জিত নমিত মুখখানি আরও অবনত হইল।

ক্ষণকাল মধ্যে প্রেমিক প্রেমিকার নয়নে নয়নে এই প্রেমলীলা হইয়া গেল। মাতা কি চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন; তিনি ইহার কোন সন্ধানই পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "বৌমা, এ দিকে এস ত, মা?" লজ্জা-সঙ্কুচিতা মালতী আদেশ মত তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, "এই টাকা ক'টা ছেলে আমাকে দিয়েছে। এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই। এ টাকা আমি ইচ্ছামত খরচ করবো; তোমরা কোনও আপত্তি করতে পারবে না।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিজ ইচ্ছামত ব্যয় করিবার অর্থ, বুদ্ধিমতী মালতী বুঝিল; বুঝিল যে, তাহাদিগকে কোনও ভাল খাদ্য খাওয়াইবার জন্যই উহা ইচ্ছামত ব্যয় করিতে চাহেন। কিন্তু সে মনের কথা প্রকাশ করিল না; কেবল ঘাড় নাড়িয়া শ্বশ্রূর কথায় সম্মতি জানাইল।

মাতা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এই টাকার মধ্যে দশ টাকা বাক্সে তুলে রাখ। আর পাঁচ টাকায় রমেশ নিজের জন্যে দুটো জামা কিনে আনুক। আর বাকী দশ টাকা খরচ করে, রমেশ কিছু ঘি ময়দা নিয়ে আসুক। আমি আমার পোয়াতি বৌকে মাঝে মাঝে লুচি ভেজে খাওয়াতে চাই। ও ত এক গরাসও ভাত খেতে পারে না।"

মালতীকে লুচি খাওয়াইতে রমেশের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। সে মাতার প্রস্তাব শুনিয়া, হাসি মুখে জামা কাপড় ছাড়িতে উপরে চলিয়া গেল।

মালতী শাশুড়ীর বাক্যের কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহার পায়ের নিকট হইতে টাকাগুলি উঠাইয়া লইল।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী আবার কহিলেন, "দেখ, যেন ঘি ময়দা আনতে ভুল হয় না।"

মালতী বলিল, "কিন্তু, মা, আমি ত লুচি খেতে ভাল বাসিনে। কলা, লিচু, আম এই সব খেতে ভালবাসি।"

শ্বশ্রূঠাকুরাণী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে জুয়াচুরি কোরনা, বৌমা। আমার টাকা দিয়ে, তুমি লিচু আম কিনে, আমাকেই রাত্রে খেতে দেবে, মনে করেছ? কেন রমেশ কি আমাকে ফলমূল এনে দেয় না? আমার টাকার একটি পয়সাও আমি তোমাদের সংসারের জিনিষ কেনবার জন্যে খরচ করবো না। টাকা আমার ইচ্ছামত খরচ করবো। রমেশকে বল, আজই ঘি ময়দা কিনে আনা চাই।"

মালতী আর কোন কথা কহিল না, আপন অঞ্চলে অর্থ গ্রহণ করিয়া, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে গেল।

রমেশ উপরে উঠিয়া, প্রিয়তমা পত্নীর প্রতীক্ষায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিল; এক্ষণে তাহাকে নিকটে পাইয়া, দৃঢ় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। দুইটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় মিলিত হইল, প্রেমপূজার রক্তপুষ্পের মত দুই যোড়া ঠোঁট আপন আপন পূজা গ্রহণ করিল; রমেশ প্রণয়িনীর কর্ণমূলে মুখ রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি মা হবে?"

মালতী স্বামীর আদরে আত্মহারা হইয়াছিল; তাই কিছুক্ষণ তাহার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিল না। পরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "মা,—ঐই ত মেয়েমানুষের সব চেয়ে বড় খেতাব।"

রমেশ প্রিয়তমাকে আদর করিয়া কহিল, "কিন্তু

খেতাব টেতাব বড় লোকেরই পোষায়। আমাদের মত গরীব লোকের পক্ষে খেতাবের ছুধ যোগান' বড় শক্ত কায।"

মালতী স্বামীর ব্যঙ্গ বাক্যে হাসিয়া বলিল, "কেন, মা ত বলেছেন, আমার ছেলে আপনার ছুধের যোগাড় করে নিয়ে আস্‌ছে।"

রমেশ আর দুই এক কথার পর বলিল, "হাঁ, মা যে তোমাকে লুচি খাওয়াবার জন্তে, ঘি ময়দা কিন্‌তে বলেছেন, তার টাকাটা আমার দাও।"

মালতী বলিল, "ছি! তুমি ক্ষেপেছ? আমি দশ টাকার ঘি ময়দা খাব? দশ টাকাতে ঘি ময়দা কিনলে, এদিকে অন্ত দরকারী খরচ কিছুই করতে পারব না। মার চার খানি কাপড়ই পুরান হ'য়ে গেছে; তাঁর জন্তে একযোড়া নূতন কাপড় কেনা চাই। আর তোমারও এক যোড়া কাপড় চাই।"

রমেশ বলিল, "না, না, আমার কাপড় এখন চাইনে, এই কাপড়েই এখন তিন চার মাস চালিয়ে দিতে পারব। মার কথা না শুনলে, মা রাগ করবেন; মনে মনে দুঃখ করবেন। তুমি আমাকে ঐ দশ টাকাই দাও। ঐ থেকেই আমি মার কাপড়, আর ঘি ময়দা, দুই কিনে আনব এখন।"

মালতী কি ভাবিয়া স্বামীর বাক্যের আর প্রতিবাদ করিল না। অঞ্চল হইতে জামার জন্ত পাঁচটাকা, এবং শাশুড়ীর কাপড় ও ঘি ময়দার জন্ত দশ টাকা বাহির করিয়া দিল। বাকী দশটাকা আপন বাক্সে তুলিয়া রাখিল।

রমেশ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই জামা কাপড় ঘি ময়দা কিনিতে বাহির হইল। কিন্তু পথে এমন ঘটনা সংঘটিত হইল যে, মাতার কাপড় ব্যতীত সে আর কিছুই কিনিতে পারিল না। এই ঘটনাটা আমরা পরবর্ত্তী এক পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব। এখন আমাদের একবার কলিকাতা ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা

দিগন্তের হিরণ্ময় প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে
কে তুমি অঙ্গনে,
ক্রীড়াময়ী, চঞ্চল-চরণা?
পবনে লুটিছে রাঙা বসন অঞ্চল
ফুল্ল তব আনন কমল,
নীরব গগন-তলে অমিয়-বরণা।

হাসিয় কুমুদদল উঠিছে বিকশি',
হে চারু রূপসী,
উজলিয়া আকাশ ভুবন।
লাজ ভরা মনোরম আঁখি দুটি তব
ঢলে পড়ে অনুরাগে নব;
আবেশে শিথিল কালো কবরী-বন্ধন।

এক্ষি তব অপরূপ ক্রীড়া মনোহারী,
তরুণ কুমারী।
স্বপ্ন-সম আকুল উজল।
প্রেম উন্মাদনা সম স্নিগ্ধ শ্রান্তিহীন,
তপস্বিনী সম অমলিন
মরণ-ছায়ায় মাঝে মিলন-চঞ্চল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গলার ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

একাদশ শতাব্দের শেষভাগে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার জন্মভূমি আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যদেশে দুইটি রাজবংশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই দুইয়ের একতম শাকম্ভরীর চাহমান বা চৌহান বংশ; অপর কান্যকুব্জের গাহড়বাল বংশ। যিনি তারাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে একবার (১১৯১) মুইজুদ্দীন ঘোরীকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়বার (১১৯২ খৃঃ অঃ) স্বয়ং পরাজিত ও নিহত হয়েন সেই চৌহান-রাজ দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের প্রপিতামহ অজয়রাজ সম্বন্ধে "পৃথ্বীরাজ বিজয়" নামক মহাকাব্যে (পঞ্চম সর্গে) কথিত হইয়াছে যে তিনি—"মাতঙ্গান্ অজয়ৎ রণে"। টীকাকার জোনরাজ লিখিয়াছেন, "মাতঙ্গান্ ম্লেচ্ছাংশ্চ যুদ্ধেঽজয়ৎ", ম্লেচ্ছগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। অজয়রাজ সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। 'পৃথ্বীরাজ বিজয়ের' ষষ্ঠ সর্গের প্রথমাংশে দেখা যায় অজয়রাজের পুত্র অর্ণোরাজের সময়ে তুরুষ্কেরা চৌহানরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। (১) অর্ণোরাজ এই আক্রমণ রোধ করিতে যাইয়া বহু তুরুষ্ক নিহত করিয়াছিলেন। অর্ণোরাজ তুরুষ্কহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বিগ্রহরাজ বীসলদেব বোধ হয় তুরুষ্কদিগকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিদূরিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজমীরে "আড়াই-দিন কা ঝোঁপরা" নামক মসজিদে চারিখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহার দুইখানিতে বিগ্রহরাজ বিরচিত "হরকেলি" নাটকের কিয়দংশ খোদিত আছে। "হরকেলি" নাটকের উপসংহারে ১২১০ সংবৎ ৫ই মাঘ (২২শে নভেম্বর, ১১৫৩ খৃঃ অঃ) এই তারিখ দেওয়া আছে। অপর দুইখানি লিপিতে সোমদেব নামক কবি বিরচিত "ললিত বিগ্রহরাজ" নাটকের প্রথম অঙ্কের এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের কিয়দংশ পাওয়া যায়। "ললিত বিগ্রহরাজ" নাটকের তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের যতটা পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার কিলহর্ণ তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এই 'ললিত বিগ্রহরাজ' নাটক, সমসময়ে রচিত ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের নায়ক স্বয়ং চৌহান-রাজ বিগ্রহরাজ বীসলদেব এবং নায়িকা বসন্তপাল নামক রাজার কন্যা দেশলদেবী। তৃতীয় অঙ্কের শেষ ভাগে নায়ক নায়িকাকে বলিয়া পাঠাইতেছেন,—"রাজপুত্রীকে জানাইবে, তুরুষ্ক রাজের সহিত যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই আমি আসিয়া দেবীর সন্তুষ্টি বিধান করিব; শুনিতে পাইতেছি তুরুষ্করাজও আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।" চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য বিগ্রহরাজের শিবির। শিবিরের নিকটে দুইজন তুরুষ্ক বন্দীর প্রবেশ। এইখানে বন্দীদের সহিত একজন তুরুষ্ক গুপ্তচরের সাক্ষাৎ হইল। গুপ্তচর বলিল, "বিগ্রহরাজের সেনাবলের মধ্যে সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্ব এবং দশ লক্ষ লোক আছে।" "তশ্শ্শি কড় অশ্শ পাশা-ত্তিদে শাজলে বি শুকে তোদি", "এই কটকের পার্শ্বে সাগরও শুষ্ক মনে হয়।" তারপর গুপ্তচর চলিয়া গেলে বন্দীদ্বয় রাজ-শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহরাজ তাঁহাদিগকে সুবর্ণ মুদ্রা ও বস্ত্র পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। এমন সময় বিগ্রহরাজ হাম্মীরের বা আমীরের অর্থাৎ লাহোরের গজনবী

১। "পৃথ্বীরাজবিজয়" চৌহানরাজ দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের সময়ে রচিত একখানি সংস্কৃত ঐতিহাসিক কাব্য। এই কাব্যের একখানি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বুহলার সাহেব কাশ্মীরে পাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক তাহা খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

বংশীয় সুলতানের কটকবলের স্বরূপ জানিবার জন্য যে চর পাঠাইয়াছিলেন সে আসিয়া জানাইল যে হাম্বীরের গজ, রথ, অশ্ব এবং লোক বল অসংখ্য; হাম্বীর সসৈন্যে বিগ্রহরাজের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন এবং শীঘ্রই একজন দূত প্রেরণ করিবেন। এই সংবাদ শুনিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য কিনা স্থির করিবার জন্য বিগ্রহরাজ স্বীয় মাতুল সিংহবলের এবং মন্ত্রী শ্রীধরের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী শ্রীধর যুদ্ধ না করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন; সিংহবল যুদ্ধের অনুকূলে মত দিলেন। বিগ্রহরাজ সিংহবলের সমর্থন করিলেন। এমন সময় তুরুষ্করাজের দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। দূত বিগ্রহরাজের ঐশ্বর্য্যাদির পরিচয় পাইয়া একেবারে চমৎকৃত হইল। "ললিতবিগ্রহরাজ" নাটকের যতখানি পাওয়া গিয়াছে দুর্ভাগ্যক্রমে এই খানেই তাহার শেষ। (২) নাটকের নায়ক বিগ্রহরাজ সম্ভবতঃ তুরুষ্করাজ হাম্বীরের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং নায়িকার সহিতও তাঁহার মিলন হইয়াছিল। পুরাতন দিল্লীর অন্তর্গত ফিরোজসাহ কোট্‌লার ভিতরে যে অশোকস্তম্ভ আছে তাহার গাত্রে প্রাচীন নাগরাক্ষরে খোদিত বিগ্রহরাজ বীসলদেবের একটি প্রশস্তি পাওয়া যায়। এই প্রশস্তির তারিখ ১২২০ বিক্রম সম্বৎ, ১লা বৈশাখ, অর্থাৎ ১১৬৪ খৃঃ অঃ, ৯ই এপ্রিল। এই প্রশস্তিতে এই শ্লোকটি আছে—

আবিন্ধ্যাদাহিমাদ্রের্ব্বিরচিতবিজয়স্তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গাদ্
উদ্গ্রীবেষু প্রহর্ত্তা নৃপতিষু বিনমৎকন্ধরেষু প্রসন্নঃ।
আর্য্যাবর্ত্তং যথার্থং পুনরপি কৃতবান্ ম্লেচ্ছবিচ্ছেদনাভি-
র্দেবঃ শাকম্ভরীন্দ্রো জগতি বিজয়তে বীসলক্ষৌণীপালঃ॥ (৩)

"তীর্থযাত্রা উপলক্ষে যিনি বিন্ধ্য হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন; যিনি উদ্ধত রাজাদিগের শাসক এবং নতশির নৃপতিগণের উপর প্রসন্ন; পুনঃ পুনঃ ম্লেচ্ছ নাশ করিয়া যিনি আর্য্যাবর্ত্ত নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন; সেই শাকম্ভরীপতি পৃথ্বীপতি বীসলদেব জগতে বিজয়ী।"

মনু-ভাষ্যকার মেধাতিথি (২।২২) আর্য্যাবর্ত্ত শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন, "আর্য্যা বর্ত্তন্তে যত্র পুনঃ পুনরুদ্ভবন্ত্যাক্রম্যাক্রম্যাপি ন চিরং যত্র ম্লেচ্ছা স্থাতারো ভবন্তি"; "আর্য্যগণ যেখানে বাস করেন এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যুদিত হন এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও ম্লেচ্ছগণ যেখানে স্থায়ী হইতে পারে না।" এই 'আর্য্য', জাতিতত্ত্বের 'আর্য্য' বা Aryan race নহে। এই আর্য্য শব্দের অর্থ হিন্দু। বিগ্রহরাজ "আর্য্যাবর্ত্তকে যথার্থনামা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন" একথা প্রশস্তিকারের অতিশয়োক্তি মাত্র। কেন না পাঞ্জাব তখন তুরুষ্কগণের করতলগত ছিল। বিগ্রহরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম পৃথ্বীরাজ আজমীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। হান্‌সীর একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায়, নিখিল বসুমতীর শল্যস্বরূপ হাম্বীরের অর্থাৎ তুরুষ্ক সুলতানের গতিরোধ করিবার জন্য প্রথম পৃথ্বীরাজ স্বীয় মাতুল কিল্হনের হস্তে হান্‌সী দুর্গ রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ এই প্রথম পৃথ্বীরাজের অপর খুল্লতাত সোমেশ্বরের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী।

তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের আর এক প্রবল শক্তি ছিল কান্যকুব্জের গাহড়বালরাজ। গাহড়বাল বংশের রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে ইনি কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। চন্দ্রদেবাদি গাহড়বালরাজগণের তাম্রশাসনে 'তুরুষ্কদণ্ড' নামক একটি কর উল্লিখিত হইয়াছে। 'তুরুষ্কদণ্ড' হয়ত তুরুষ্ক ঔপনিবেশিকগণের দেয় জিজিয়ার পাল্টা কোন বিশেষ কর; আর না হয়ত তুরুষ্ক আক্রমণকারিগণকে দমন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহার্থ স্থাপিত বিশেষ কর। চন্দ্রদেবের পৌত্র গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে মহারাণী কুমারদেবীর সারনাথে প্রাপ্ত প্রশস্তিতে লিখিত আছে—

২। Indian Antiquary, Vol. XX, pp. 205-210.

৩। Indian Antiquary, Vol. XIX, p. 218.

বারাণসীং ভুবনরক্ষণদক্ষ একো
দুষ্টাত্তুরুষ্কসুভটাদবিতুং হরেণ।
উক্তো হরিস্স পুনরত্র বভূব তস্মাদ্
গোবিন্দচন্দ্র ইতি প্রথিতাভিধানঃ॥ (৪)

"হর কর্তৃক দুষ্ট তুরুষ্কসেনার হস্ত হইতে বারাণসী রক্ষার অনুরুদ্ধ ভুবন রক্ষণে একমাত্র দক্ষ হরি গোবিন্দচন্দ্র এই নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং তাঁহার (মদনচন্দ্রের) পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" "তাবাকাৎ-ই নাসিরি" গ্রন্থে দেখা যায় যে, গোবিন্দচন্দ্রের সমসময়ের গজনবী বংশীয় পাঞ্জাবপতি বাহরাম সাহ বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের তাম্রশাসনে কথিত হইয়াছে—

"ভুবন-দলন-হেলাহর্ম্ম্য হম্মীর নারী
নয়ন-জলদ-ধারা-ধৌত-ভূলোক তাপঃ"

"তিনি ভুবন দলনক্ষম হম্মীরের নারীগণের নয়ন জলের ধারার দ্বারা পৃথিবীর তাপ দূর করিয়াছিলেন।" এই বিজয়চন্দ্রের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জয়চন্দ্র মুইজুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়াছিলেন।

সমসময়ের লিপি হইতে এই যে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম ইহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তুরুষ্কগণ কর্তৃক আর্য্যাবর্ত্তবিজয়ের কাহিনী রণনৈপুণ্যের অভাবের পরিচায়ক নহে। এই সকল লিপিতে মধ্যদেশের দুই প্রহরী চৌহান এবং গাহড়বাল রাজগণের শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া যায় না একটি কথা,—আর্য্যাবর্ত্তকে পুনরায় সার্থকনামা করিবার জন্য উভয় শক্তির মিলনের কথা। চৌহানসেনা এবং গাহড়বালসেনা একত্র মিলিয়া একটিবার তুরুষ্ক সেনার সম্মুখীন হইয়াছে এমন কথা কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লিখিত হয় নাই। যেন কোনও অপদেবতার অভিসম্পাতের ফলে আর্য্যরাজগণ প্রয়োজনমত সম্মিলিত হইয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের অবসানে হিন্দুজাতির অধঃপতনের আরম্ভ। তদবধি অসহযোগ অধঃপতনোন্মুখ এবং অধঃপতিত ভারতবাসীর স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল।

(৩) বাঙ্গলার কলঙ্ক।

বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের" মঙ্গলাচরণে 'ভারত কলঙ্ক' প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালীর ভীরুতার কলঙ্ক অপনোদিত করিবার জন্য ধারাবাহিক রূপে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল প্রবন্ধের উপসংহার ১২৯১ সালের ১৫ই শ্রাবণ প্রকাশিত "প্রচার" পত্রের প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালার কলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের আরম্ভে তিনি লিখিয়াছিলেন, "যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তান মাত্রেই আমাদের সহায় হউন।"

"যাহা ভারতের কলঙ্ক বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যত্র ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখাইলেই পলাইয়া যায়।"

'বাঙ্গলার কলঙ্ক' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রচারিত হওয়ার পর ৪০ বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। এই অবকাশে ঐতিহাসিক প্রমাণ আহরণ এবং ব্যাখ্যান ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র জীবিত থাকিলে এই ব্যাপারে জগদীশ্বরের হাত দেখিতে পাইতেন সন্দেহ নাই। এই সকল অভিনব প্রমাণ অবলম্বনে বাঙ্গালার কলঙ্কের কথার পুনরালোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

৪। Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 234.

যে সকল স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্যের অভ্যুদয় আর্য্যাবর্ত্তের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল তন্মধ্যে বাঙ্গালা বিহার লইয়া গঠিত গৌড়রাজ্য অন্যতম প্রধান রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দে কান্যকুব্জেশ্বর যশোবর্ম্মার অধঃপতনের পর আর্য্যাবর্ত্তে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায়, ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই অরাজকতার সময় বাঙ্গালার জননায়কগণ অসাধারণ আত্মসংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন। গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের (আনুমানিক রাজ্যকাল খৃঃ অঃ ৮০০—৮৪০) খালিমপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বাঙ্গালার এই অরাজকতা মাৎস্যন্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মপালের পিতা গোপালদেবের রাজ্য লাভ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে :—

"মাৎস্যন্যায়মপোহিতুম্ প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণি স্তৎসুতঃ।"

"অরাজকতা দূর করিবার জন্য জনসাধারণ রাজকুলচূড়া (বপ্যটতনয়) গোপালকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন।" প্রাচীনকালে বাঙ্গালা দেশ ভৌমিকগণের এবং মাণ্ডলিকগণের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং এখানে "প্রকৃতিভিঃ" পদে ভৌমিক এবং মাণ্ডলিকগণ বুঝিতে হইবে। গোপাল এবং ধর্ম্মপালের বংশধরগণ বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত বরেন্দ্র ভূমিকে "জনকভূ" বা জন্মভূমি বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই নির্ব্বাচন বাঙ্গলা দেশেই হইয়াছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। তিব্বতীয় লেখক তারানাথের মতেও গোপাল বাঙ্গালায় নির্ব্বাচিত হইয়া পরে মগধ জয় করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দের প্রারম্ভে ইন্দ্রায়ুধ প্রভৃতি নরপতিগণকে পরাজিত এবং অনুগত চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে গৌড়াধিনাথের প্রাধান্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কেননা ইহার পরেই আর্য্যাবর্ত্তের প্রাধান্য লইয়া গৌড়ের পাল নরপতি, রাজপুতনার এবং পরে কান্যকুব্জের গুর্জ্জর-প্রতীহার নরপতি, এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট নরপতি এই তিন পক্ষের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধ দেখা যায়, এবং যতদিন না তিন পক্ষই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন ততদিন এই বিরোধের নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু এই বিরোধ সত্ত্বেও পাল নরপালগণ নবম এবং দশম শতাব্দের প্রথম ভাগে খুব প্রতাপশালী ছিলেন। কিছুদিন হয় নালন্দার ভগ্নস্তূপের ভিতরে ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনের উপসংহারে সুবর্ণদ্বীপের অধীশ্বর শ্রীবলপুত্রদেবের দূত বলবর্ম্মার প্রশস্তি আছে। এই বলপুত্রদেবকে যবভূমির অধিপতির পৌত্র বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। সুতরাং সুবর্ণদ্বীপ যবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী কোন দ্বীপ এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে এবং এই সকল দ্বীপের সহিত গৌড়পতির এবং গৌড়জনের সম্বন্ধ ছিল ইহাও প্রমাণীকৃত হয়। (৫)

গৌড়রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয় দশম শতাব্দের শেষার্দ্ধে যখন কাম্বোজগণ পাল নরপালের হাত হইতে বরেন্দ্রের খানিকটা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বরেন্দ্রে কাম্বোজ আধিপত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার অবকাশ পায় নাই। বোধ হয় এই দশম শতাব্দেরই শেষভাগে প্রথম মহীপাল অনধিকারীর অধিকৃত বরেন্দ্র উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক সময়ে মহীপালের প্রভাব বঙ্গ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু মহীপালকে দুইটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন চেদির (বর্ত্তমান জব্বলপুর প্রদেশের) রাজা গাঙ্গেয়দেব এবং আর একজন দ্রাবিড়দেশের রাজা রাজেন্দ্রচোল।

একাদশ শতাব্দের শেষভাগে গৌড়রাজ্যের কেন্দ্র ভাগে (বরেন্দ্রে) এক নূতন বিপদ উপস্থিত হয়। প্রথম মহীপালের প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল প্রজাপীড়ন করায় কৈবর্ত্ত নায়কগণের অধীনে বরেন্দ্র দেশে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে। কিয়ৎকাল পরে দ্বিতীয় মহীপাল বিদ্রোহিগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার ভ্রাতা রামপাল কৈবর্ত্ত নায়ককে পরাজিত করিয়া

৫। Archæological Survey of India, Annual Report, 1920-21, p. 27

বরেন্দ্র দেশের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দী কর্ত্তৃক সমসময়ে রচিত "রামচরিত"নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যে এই বিদ্রোহের এবং তাহার দমনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রামপাল, কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ দমন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; তিনি কামরূপে, বঙ্গে এবং কলিঙ্গে গৌড়াধিপের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রামপালের পুত্র কুমার পাল দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে এই প্রাধান্য কতক পরিমাণে বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কুমার পালের মৃত্যুর পর আবার "মাৎস্যন্যায়" উপস্থিত হয়। মিথিলায় কর্ণাটবংশীয় নান্যদেব স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ব্ব বঙ্গে বর্ম্মণরাজ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কর্ণাট হইতে আগত সেন বংশীয় বিজয়সেন রাঢ়দেশকে কেন্দ্র করিয়া গৌড়মণ্ডলে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সচেষ্ট হয়েন। বিজয়সেনের দেবপাড়া প্রশস্তিতে কথিত হইয়াছে, তিনি "গৌড়েন্দ্রমদ্রবৎ" গৌড়াধিপতিকে সবলে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বারাকপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন বিক্রমপুরে সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পশ্চিম দিক হইতে গাহড়বাল রাজা আসিয়া ক্রমশঃ মগধে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। কান্যকুব্জের দক্ষিণ দিক হইতে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ আসিয়া দক্ষিণ রাঢ় গ্রাস করিয়াছিলেন। ফলে দ্বাদশ শতাব্দ ভরিয়া গৌড়রাজ্য লইয়া পাল, বর্ম্মা, সেন, কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় এবং গাহড়বাল রাজগণের মধ্যে অবিরত বিরোধ চলিতেছিল। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ গৌড়রাজ্যের কেন্দ্র বরেন্দ্রের যে ক্ষতি করিয়াছিল এই গোলযোগের মধ্যে তাহা পূরণের অবকাশ বোধ কাহারও ঘটে নাই। তাই দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদ খিলিজি যখন বাঙ্গলা আক্রমণ করিলেন তখন পরিত্যক্ত রাজপুরী নোদিয়া এবং প্রহরীশূন্য বরেন্দ্র ভূমি অবাধে তাঁহার পদানত হইল। সুতরাং মহম্মদ বক্তিয়ারের বরেন্দ্র বিজয় কাহিনীকে কলঙ্কের কাহিনী মনে না করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বরেন্দ্র অধিকারের পরের অর্দ্ধ শতাব্দের ইতিহাস শুধু বাঙ্গালীর নয়, বাঙ্গালীর প্রতিবেশী কামরূপী এবং উড়িয়াগণের বিশেষ কলঙ্কজনক। ভীরুতা এ কলঙ্কের কারণ নহে; চৌহান ও গাহড়বালের কলঙ্কের মত এ কলঙ্কেরও কারণ সহযোগিতায় অসামর্থ্য। বরেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণসেনের উত্তরাধিকারীরা প্রশস্ত নদনদীসুরক্ষিত পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লইয়া এক প্রকার নিরাপদেই ছিলেন। নোদিয়া অধিকারের কয়েক বৎসর পরে মহম্মদ বক্তিয়ার তিব্বত জয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিব্বতের পথে তাঁহাকে সসৈন্যে করতোয়ার পাষাণ নির্ম্মিত সেতু পার হইয়া যাইতে হইয়াছিল। এই সেতুর অপর পারে কামরূপ রাজ্য। মহম্মদ যখন সেতুর পরপারে উপস্থিত হইলেন, তখন কামরূপ রাজ্যের দূত তাঁহার কাছে নিবেদন করিল যে, কামরূপ রাজের অভিমত এই, মহম্মদ বক্তিয়ার এ যাত্রা ফিরিয়া যাউন, এবং আগামী বৎসর অধিকতর সেনা লইয়া তিব্বত আক্রমণ করুন; তখন কামরূপরাজ সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন। কামরূপ রাজের পরামর্শ তুচ্ছ করিয়া মহম্মদ তিব্বত আক্রমণ করিলেন এবং বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। ফিরিয়া সেতুর কাছে আসিয়া দেখেন সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। তখন তিনি একটি মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। এই অবসরে কামরূপ রাজের সেনা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। নিরুপায় হইয়া মহম্মদ সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া সানুচর নদীতে নামিলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তুরুকসেনা অথই জলে উপস্থিত হইল। তখন কামরূপীর আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের ফলে অধিকাংশ তুরুক হয় অস্ত্রাঘাতে নিহত হইল না হয় জলমগ্ন হইল। শতেক অনুচর লইয়া কেবলমাত্র মহম্মদ পরপারে পঁহুছিতে সমর্থ হইলেন এবং ক্রমে দেবকোটে উপস্থিত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। (৬)

৬। রেভার্টি কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত "তাবাকৎ ই-নাসিরি" ৫৬১—৫৭২ পৃষ্ঠা।

মহম্মদ বক্তিয়ারের মৃত্যুর অর্দ্ধ শতাব্দ পরে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা মালিক ইক্তিয়ারুদ্দীন য়ুজবক কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। য়ুজবক করতোয়া (বেগমতী) পার হইয়া কামরূপে উপস্থিত হইলে, কামরূপরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া গেলেন। কামরূপের রাজধানী য়ুজবকের হস্তগত হইল। তারপর রাজধানীর আশে-পাশের প্রদেশে যত ধান্যাদি ছিল কামরূপরাজ তাহা উচ্চমূল্যে খরিদ করিয়া লইয়া গেলেন। দেশে ভাল ফসল জন্মিয়াছে দেখিয়া য়ুজবক ধান্যাদি সংগ্রহ করিয়া গোলাজাত করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। তারপর যখন চৈতালি ফসল কাটিবার সময় উপস্থিত হইল তখন কামরূপ রাজ নদীর (করতোয়ার বা তিস্তার বা উত্তর নদীর) বাঁধ কাটিয়া দিলেন। দেশ জলে ভাসিয়া গেল; চৈতালি ফসল ডুবিয়া গেল, নিরুপায় য়ুজবক লক্ষ্মণাবতীর দিকে যাত্রা করিলেন। জলমগ্ন দেশের অজানা অপ্রশস্ত পথে তুরুক সেনাগণকে একত্র পাইয়া কামরূপীয়া তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। য়ুজবক হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি তীর তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। তিনি আহত হইয়া ভূপতিত এবং ধৃত হইলেন। য়ুজবকের পুত্রকন্যা এবং অন্যান্য পরিবারবর্গও ধৃত হইলেন। যখন বন্দীবেশে য়ুজবককে কামরূপ রাজের নিকট উপস্থিত করা হইল তখন তিনি তাঁহার পুত্রকে কাছে লইয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। যখন পুত্রটিকে কাছে আনা হইল তখন য়ুজবক পুত্রের মুখের উপর মুখখানি রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এইরূপে কামরূপ রাজ্য তুরুকের কবলমুক্ত হইল (৭)

কামরূপ রাজের তুরুক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার শক্তি ছিল, করতোয়া পার হইয়া তুরুক রাজ্য আক্রমণ করিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু প্রাচীন গৌড় রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট উৎকল রাজের সে সামর্থ্য ছিল। গঙ্গাবংশীয় প্রথম নৃসিংহদেবের সেনাপতি তুরুকাধিকৃত লক্ষ্মণাবতী প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী লক্ষ্মণাবতী নগরী পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিলেন।

উৎকল রাজের সহিত লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তাগণের যে দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল মিন্‌হাজ তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনেও তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু একটি খবর কোথাও পাওয়া যায় না; তুরুকগণের বরেন্দ্র ও রাঢ় অধিকারের পর কামরূপ, বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) এবং উৎকলের হিন্দু নৃপতিবর্গ একত্র মিলিত হইয়া তুরুক আগন্তুকগণকে পাল্টা আক্রমণ করিবার কল্পনা কখনও মনে স্থান দিয়াছেন একথার আভাস কোথাও পাওয়া যায় না। বস্তুত নবম শতাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দু নৃপতিগণকে অনেক সময় আবশ্যক মত একযোগে কাজ করিতে দেখা যায়; কিন্তু তারপরে আর দেখা যায় না। তারপর যেন হিন্দুদিগের একত্র মিলিয়া কাজ করিবার সামর্থ্য সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই প্রকার সামর্থ্য বিলোপের কারণ চরিত্র-বিপর্য্যয়, নৈতিক অবনতি। সমষ্টির হিতের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ এবং ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ সংযত করিতে হইলে যে বিচারশীলতা এবং যে চরিত্রবলের প্রয়োজন, সে চরিত্রবল প্রধান প্রধান হিন্দুদের তখন ছিল না। পক্ষান্তরে তুরুকদিগের সেই বল অধিকতর পরিমাণে ছিল বলিয়াই প্রায় একই সময়ে তাঁহারা একদিকে হিন্দুদিগকে আর একদিকে আদিম ইস্‌লামীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আরবদিগকে পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। (৮)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

৭। রেভার্টির "তাবাকাৎ-ই-নাসিরি ১৬৪—১৬৬ পৃষ্ঠা। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে য়ুজবকের মৃত্যু হয়।

৮। এই প্রস্তাবে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলিত হইল তাহার অধিকাংশের প্রমাণ লেখকের "গৌড়রাজমালা" নামক পুস্তকে এবং সপ্তম বর্ষের "মানসী" পত্রে প্রকাশিত "বাঙ্গালার ইতিহাস (সমালোচনা)" শীর্ষক প্রবন্ধে (৫৭৭—৫৯৯ ও ৬৫৭—৬৭৩ সূচিত হইয়াছে।

নারীর মন

(গল্প)

সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল জামাতার প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় থাকিয়া প্রৌঢ় যদুনাথ যখন হতাশ হইলে, তখন তাঁহার মন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। অদৃষ্টের পরিহাস! একদা যাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া কন্যার সুখ সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজ তাহারই নির্ম্মম শঠকারিতায় জীবনের এই শেষ ক'টা দিন অনুশোচনায়পূর্ণ হইয়া উঠিল। মানসিক অশান্তিতে অকালেই স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল; সময়ও আর নাই। পরপারের ডাক বুঝি বা কাণে আসিয়া বাজে। তাই অণিমার ভবিষ্যৎ ভাবনা তাঁহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিল। অবশেষে যেদিন সকল ভাবনা চিন্তা হইতে ছুটী মিলিল, পুত্র কুমুদনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"আজ হতে অণির ভার তোমার, দুজনের শরীরে একই রক্ত! ওর অসম্মানে তোমারও অসম্মান জেনো।"

তারপর আরও দুটী বছর কাটিয়াছে। কুমুদনাথ ব্যবসায়ে বেশ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরে তাহারা বালিগঞ্জের বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে অণিমা নিজে পছন্দ করিয়া দাদার বিবাহ দিয়াছিল। তাহাদের ছোট সংসারটীতে আবার সুখের হিল্লোল বহিয়াছে। অরুণের জন্য চিন্তা করিতে এখন আর কেহ নাই; তাহার নাম এ বাড়ী হইতে লোপ পাইয়াছে। কেবল অণিমা একেবারে ভুলিতে পারে নাই; তাহার মনের এক কোণে আশার ক্ষীণ আলো এখনো বুঝি বা মিট মিট করিয়া জ্বলে।

সন্ধ্যা সমাগত, অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু হরণ করিয়া পৃথিবী তখন রক্তরাগে রাঙিয়া উঠিয়াছে! এমনি সময়ে মিনি ও অণিমা বাহিরের বারান্দাটিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বারান্দা হইতে সিঁড়ির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নানাবিধ দেশী বিদেশী ফুলের টবে সজ্জিত। রঙ বেরঙের অজস্র ফুল ফুটিয়াছে; বধূ মিনি একটা বড় রক্তবর্ণ গোলাপ ছিঁড়িয়া অণিমার হাতে দিয়া বলিল,—"দেখ ভাই, দুদিন এদিকে আসিনি, কত ফুলই ফুটে রয়েছে! বেয়ারাটা কি করে! তোড়া বেঁধে বাইরের ঘরটায় সাজিয়ে রাখলেও ত পারে।"

অণিমা একটী ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"ফুলগুলি ঠিক আমারি মত, নয় ভাই? ফোটাই সার, কেউ আর তুলে দেখছে না।"

মিনি বলিল,—"কেন, যখন ফোটে তখনি ত দেখে মানুষের মন ভোলে।"

"তা বটে"—বলিয়া অণিমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া তারপর বলিল,—"কাল ভাগবত শুনতে যাবি ত?"

মিনি মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না ভাই,—ও আমার ভাল লাগে না। কি যে ছাই বুঝতেই পারি না। সত্যি তোর কি করে ওতে মন যায়?"

"কি আর করি! মনটা যার জন্যে সেই যখন দূরে রইল, তখন এটাকে একদিকে দেওয়া চাই ত," বলিয়া অণিমা নীরব হইল।

বারবার এই কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া মিনি সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিল। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকা তার স্বভাব নয়। গম্ভীর হওয়া সে ভালবাসে না। তাই আবার হাসিয়া বলিল, "তুই কি করে এতগম্ভীর হোস ভাই? দেখদেখি এমন সুন্দর সন্ধ্যা, এমন ফুলের মেলা, আর তার মাঝ-মাঝে তুই ঠিক যেন মেঘে ঢাকা পূর্ণিমার চাঁদ!"

অণিমা এবার হাসিল। "ঈস্, কবিত্ব যে আর ধরছে না!" বলিয়া মিনির গাল দুটী টিপিয়া দিল। ভাবিল সরলা মিনি, সংসার এখনো তার কাছে নূতনত্বে ও আনন্দে পরিপূর্ণ, দুঃখের বার্ত্তা সে কি জানে?

সেদিন দ্বিপ্রহরে মিনি অণিমার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ঠাকুর্ঝি, একটা সুখবর আছে ভাই!" অণিমা একটা বই পড়িতেছিল; সে মুখ না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

মিনি বলিল—"অম্নি বলছি না ত! আগে একটু পায়ে ধরে সেধে নে। তার পর।"

অণিমা এবার বইখানা বন্ধ করিয়া হাসিয়া বলিল, "একজন ত দাসখৎ লিখে দিয়েছেন, তাতেও কি সাধ মেটে না?"

পরাজিত হইয়া মিনি বলিল, "তোর সঙ্গে কথায় পারা যায় না ভাই। শোন্—তোর দাদা আজ বলছিলেন, তাঁর বিলাতের কোন বন্ধু লিখেছেন, অরুণ-বাবু এবার দেশে ফিরছেন; পড়া ত তাঁর কবেই শেষ হয়েছে, এতদিন নাকি চাকরী করছিলেন।"

হঠাৎ প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে অণিমার সুন্দর মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিল। পাছে মিনি তাহা ধরিয়া ফেলে এই ভয়ে সে মুখ নীচু করিয়া রহিল।

মিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল,—"আমি তাই বলছিলাম ওঁর কাছে, এবার ঠাকুর্ঝি পালাবে।"

অণিমা উৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কি বল্লেন?"

মিনি কহিল,—"তিনি বল্লেন, অণি কক্ষণো এত হ্যাংলা নয়! সে তার নিজের মূল্য বোঝে। যে তাকে এতদিন অবহেলা করেছে, তার কাছে সে যাবে? কক্ষণো নয়!"

অণিমা কিছু বলিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া মিনি বলিল,—"আমায় যদি একথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি বল্‌ব ভাই?"

"তোর যা খুসী! বলিস্, স্বামী কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর পরিত্যাজ্য নয়।"

মিনি এবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুই কেন ভাই একালে জন্মালি? মনে হয় তুই যেন সেই সত্যিকালের মানুষ; একালে তোকে মানায় না মোটে।"

অণিমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মিনি বলিল,—"দেখ্‌না সে দিন তোর দাদা আমার সঙ্গে মিছামিছি ঝগড়া করেছিলেন বলে আমি তিন দিন তাঁর কাছে ঘেঁসিনি। আর তোর কিনা এক-বিন্দুও অভিমান নেই! আমার কি ইচ্ছে করে জানিস? তিনি যেমন তোকে কাঁদিয়েছিলেন, আমরাও তাঁকে কাঁদিয়ে ছাড়ব।"

অণিমা একটু ম্লান হাসিয়া নীরবে রহিল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। অণিমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "যা ভাই, দাদা এলেন বুঝি! চা'টা তুই করে দিস্। যদি আমাকে খোঁজেন, তাহলে বলিস্ যে আমার মাথা ধরেছে।"

মিনি চলিয়া গেল। অণিমা ভাবিতে লাগিল, এতকাল পরে দেশের কথা মনে পড়িয়াছে তবে। ফিরিয়া আসিতেছেন, যদি অণিমাকে মনে পড়ে! কাছে আসিয়া যদি অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আগে-কার মত মধুর কণ্ঠে বলেন, "ক্ষমা কর অণি, আমার অপরাধযোগ্য শাস্তি নেই, তবু তোমার কাছে ক্ষমার প্রার্থী আমি আজ।" তখন কি অণিমা, কাঙ্গালের মত এত দিনের দুঃখ এক নিমেষে না ভুলিয়া মনের তেজটুকু বজায় রাখিয়া বলিতে পারিবে, "যাও, এখন কিসের দরকার?" কিন্তু অন্তর যাহাকে দেখার জন্য অহর্নিশ কামনা করিতেছে, তাহাকে অপ্রিয় কথা বলা কি সম্ভব হইবে?

অণিমার সারা মনে যেন আনন্দের তড়িৎ-প্রবাহ এক নিমেষে বহিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে পিতার শেষ জীবনের দুঃখ, ভ্রাতার বিদ্রূপবাণী সবই ভুলিয়া গেল! আশার মোহন সুরে বহুদিন পূর্ব্বেকার শোনা একটি গান কেবলি তাহার কাণে বাজিতে লাগিল:—

বাজিবে সখি বাঁশি বাজিবে !
হৃদয় রাজ হৃদে রাজিবে !
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে !

কিন্তু তারপর ? দশবৎসর পূর্ব্বে হৃদয়ের মাঝখানে অমল শতদল প্রেমে যে সিংহাসন রচিয়া দিয়াছিল এখনো তাহা অটুট আছে কি ? না, তাহা যে তিনি স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন ! আর বুঝি সেরূপ দেওয়া হইবে না। মাঝখানে এই দশবৎসরকার ব্যবধান ! সহজ শ্রদ্ধার ঠাঁই:বুঝি এর মধ্যে নাই।

* * *

মানুষে গড়ে আর বিধাতা ভাঙেন ! অণিমা আশায় আশায় দিন গণিতে লাগিল। কিন্তু অরুণ-কুমার ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিতে আসিল না ! খালি চিঠি লিখিয়া কুমুদনাথকে আপনার আগমন বার্ত্তা জানাইল। কুমুদ রাগ করিয়া চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিল। মিনি শঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখেছে ?" কুমুদ ক্রোধভরে কহিল, "কিছু না, রাস্কেল-টার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, আমিও ওকে সাধছি না ! অণি আমাদের জলে পড়েনি।" অণিমা সমস্ত শুনিয়া নীরবে রহিল।

কয়েক দিন কাটিল। সেদিন অণিমার বড় ননদের বাড়ীতে তাহার নিমন্ত্রণ ছিল। শ্বশুরালয়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই অণিমার খোঁজ খবর নিয়া সম্পর্ক বজায় রাখিতেন। অণিমাও মধ্যে মধ্যে গিয়া সেখানে থাকিত।

অনেকটা দূর বলিয়া সকাল বেলাই স্নান সারিয়া সজ্জাতা, সজ্জিতা অণিমা যখন গাড়ীতে উঠিতে গেল তখন মিনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। এবং এক মুহূর্ত্ত তাহাকে দেখিয়া বলিল, "তোকে দেখ্‌তে ঠিক ইন্দ্রাণী বলে ভ্রম হয় ভাই। তোকে যে তুচ্ছ করে সে কি রকম, আমার বড় দেখতে সাধ হয়।"

অণিমা কিছু বলিল না, খালি একটু হাসিয়া গাড়ীতে উঠিল। মনে বলিল, "দেখিসনি, ভাই "

সে বাড়ী পৌঁছিয়া বড় ননদকে প্রণাম করিতেই তিনি স্নেহে মুখচুম্বন করিলেন। তার পর, মুখখানি অণিমার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অন্যান্য নিমন্ত্রিতাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ দেখি কেমন বউ ! আমার ভাইয়ের যোগ্য কি না। তাইত আজ ওকে আনা। দুইজনকে এক জায়গায় দেখব—এ ত আমার ভাগ্যে কখনো হয়নি।"

অণিমা এবার প্রমাদ গণিল। সে তো ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। অথচ এরূপ সম্ভাবনা তাহার মনে আসা উচিত ছিল। এখন এ সমস্যা হইতে মুক্তি পাইবে কিরূপে ? এত লোকের ভিতর নিজের অবস্থা প্রকাশ করিয়া সকলের কৌতূহল জাগানো, তাহা ত লোভনীয় নয়। কিন্তু অযাচিত ভাবে তাঁহার নিকট যাওয়া, এ যেন তার কল্পনারও অতীত। কি করিবে অণিমা ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় তার বড় ভাগী 'বেবী' আর ভাবিতে অবকাশ না দিয়া, "চল ছোট মামী, মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করবে চল" বলিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। অণিমা বাধ দিল না, কম্পিত পদে তাহার সঙ্গে চলিল। এ যেন তাহার অগ্নিপরীক্ষা। ভিতরে বাহিরে আগুনে বেড়িয়া উঠিয়াছে। মুক্তি পাইবে কিনা কে জানে !

মনের এমনি সঙ্কট অবস্থায় অণিমা যখন অরুণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তখন অরুণ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। বেবীর আহ্বানে ফিরিয়া হঠাৎ সে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই অণিমা, দশবৎসর পূর্ব্বেকার কিশোরী, আজ যৌবনের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যের ষোল কলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে অরুণ সব ভুলিয়া নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। আর লজ্জিত অণিমা এই অপলক দৃষ্টির তলে আপনাকে নিয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। বেবীও চলিয়া গিয়াছে। দশ বছর পরে আবার এই একান্ত আপনার দুটী মানুষ এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; অথচ তাহাদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান ! কথা বলিবার শক্তিও বুঝি নাই ! অণিমার বুকের ভিতর যেন

চিপ চপ করিতে লাগিল। অবশেষে সে আপনাকে সামলাইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল ছিলে ?"

অরুণ বিস্মিত হইল। তাহার সুরে সংকোচ নাই, দ্বিধা নাই, এ যেন নিতান্ত পরিচিতের মত প্রশ্ন "ভালো ছিলে ?"

এর পরে চুপ করিয়া থাকা তাহার পক্ষে অশোভন, তাই সে মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, "হ্যাঁ—তুমি ?"

অণিমা বলিল—"ভাল। তারপর, এদেশেই থাকবে ত এখন ? না, আবার সেখানে যাচ্ছ ?"

অরুণ একথা কোন জবাব দিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া অণিমা আবার বলিল, "তাহলে আমি যাই—"

অরুণ এবার যেন সংকোচ কাটাইয়া চকিতে বলিয়া ফেলিল, "দাঁড়াও, আবার কবে দেখা পাব ? তোমার কাছে একটা কথা বলবার আছে।"

হঠাৎ অরুণের এই প্রশ্নের এবং কথার সুরে অণিমা যেন কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ধরা দিল না। হাসিমুখে বলিল, "এই ত দেখা হ'ল, আবার কেন ?"

অরুণ ভাবিল যে সে বলে 'তোমাতে আমাতে কি খালি এইটুকু দেখা হওয়ার কথা অণিমা ?' কিন্তু আবার সংকোচ আসিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে, তাই আর বলা হইল না। একথা বলিবার অধিকার বুঝি তাহার আর নাই!

কোন উত্তর না পাইয়া অণিমা একবার জিজ্ঞাসুনেত্রে অরুণের দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "আর, অপরিচিতের সঙ্গে কিই বা কথা থাকতে পারে ? আচ্ছা, চল্লাম আজ।"—বলিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অপরূপ লীলাভরে ঘুরিয়া চলিয়া গেল।

অণিমা যখন তাহার ননদের নিকট গিয়া, বৌদিদির অসুস্থতার দোহাই দিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় চাহিল, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তাহার রক্তোচ্ছ্বাসহীন ফ্যাকাশে মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আর জোর করিতে পারিলেন না। হঠাৎ একি পরিবর্ত্তন ? কিছুক্ষণ আগের দেখা সুন্দর প্রভাত-পদ্মটী যেন এক নিমেষে ম্লান হইয়া উঠিয়াছে।

অণিমাকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া মিনিও আশ্চর্য্য হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে ?"

কৃত্রিম ভয়ের অভিনয় দেখাইয়া অণিমা কহিল, "বড্ড ভয় পেয়েছি, তাই পালিয়ে এলাম।"

মিনি তাহার রকম দেখিয়া হাসিল। বলিল, "কিসের ভয় ? বাঘ দেখেছিস্ নাকি ?"

অণিমা বলিল, "বাঘ নয়; সাপ।"

মিনি বলিল, "বাঃ—বাঘের চেয়ে বুঝি সাপের ভয় বেশী ?"

"নয় ? বাঘকে তবু চোখে দেখে কিছুক্ষণ লড়াই করা চলে। আর ও যে গুপ্ত শত্রু, কখন ফোঁস করে প্রাণটী নেবে জানবার যো নেই।" বলিয়া অণিমা মিনিকে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়া কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সে খালি মিনির সঙ্গ এড়াইয়া চলিতে লাগিল। রাত্রেও শরীর ভাল নয় বলিয়া তাড়াতাড়ি আপনার কক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। কিন্তু ঘুমাইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অশান্ত মনে সে কেবল সারাদিনের ব্যাপারটা ভাবিতে লাগিল।

আজ সে জয়ী হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কৈ মনটা ত জয়ের আনন্দে পূর্ণ হয় নাই। এ কি হইল ? তাহার গর্ব্ব তো পরিপূর্ণ রাখিয়া ফিরিয়াছে, তবে কেন এ আপশোষ ? যাহা হয় নাই তাহা।—অস্থির চিত্তে সে বার কয়েক গৃহমধ্যে ঘুরিয়া অবশেষে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকার রাত্রি। তারায় ভরা আকাশ। জনকোলাহল নিস্তব্ধ। যেন তাহারই মনের মত একটা বিরাট শূন্যতা পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘুমন্ত পুরীর মত খালি সারি সারি অট্টালিকা, মাঝে মাঝে দু একটী বৃক্ষ উন্নত শিরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তারি মাঝে যেন মূর্চ্ছিতা প্রকৃতি। অণিমা ভাবিতে লাগিল, 'মানুষের জীবনও এইরূপ রহস্যময়! সবই আছে, তবু যেন ফাঁকা। এত অতৃপ্তি কোথা হইতে আসে ? এই যে জীবন, কিসের ক্ষোভ তার ? স্নেহময় ভ্রাতা, সরল হৃদয়া



সিন্ধুপ্রদেশের আমীর-রাজভবনে নৃত্যসভা

১৮০৮ খৃঃ ক্যাপ্টেন মেলভিল গ্রন্থে অঙ্কিত চিত্র হইতে—মেসার্স কার কোম্পানীর সৌজন্যে প্রাপ্ত

বৌদিদি, তবু মনে হয় সে বুঝি ভাসিয়া বেড়াইতেছে! চারিধারে কূল নাই, সীমা নাই।

সে রাত্রে অরুণও এইরূপ বিনিদ্রনয়নে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া কাটাইতেছিল। এই অণিমা ত তাহারই। কিন্তু, কতদূরে! তাহার উপর বুঝি তার কোন অধিকার নাই।—কেনই বা থাকিবে! সত্যই অণিমাকে এতদিন ভুলিয়া থাকার কারণ শুধু বিদ্যার্জ্জনের প্রলোভন নয়, আরও কিছুর মোহ সেখানে ছিল। দশবছরের কৃত কার্য্য তাহাকে যেন আজ কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। কেন সে অণিমাকে ভুলিয়া মরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছিল? ফলে তৃপ্তি তো পায়ই নাই, সুশীতল পানীয়ের অধিকারও সেই সঙ্গে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মনে পড়িল, কুমুদকে চিঠি লিখিয়া সে উত্তর পায় নাই। তাহারা তার অপরাধ ভুলিতে পারে নাই—সে ত অণিমার ব্যবহারেই বোঝা গেল। তাই স্বামী হইয়াও আজ সে অপরিচিত।

কিন্তু সে কেন চিঠিতে অণিমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা জানায় নাই? এখন যে আর কোন পথ নাই। যদি সে প্রথমেই দেখা করিতে চাহিত, তাহা হইলে আজ এত উপায় খুঁজিতে হইত না। অরুণ ভুলিয়া গেল তখনও সে অণিমাকে দেখে নাই। আজ তাহাকে দেখিয়াছে, তাই এত ব্যাকুলতা। এক মুহূর্ত্তের দেখা অণিমা যেন মনের মধ্যে আসন মেলিয়া বসিয়াছে, কোথাও আর ফাঁক নাই। অরুণের মনে হইল, অণিমা ঠিক যেন মূর্ত্তিমতী অগ্নিশিখা। মন আকৃষ্ট করে, কিন্তু ছুঁইবার যো নাই। তার মনে একটা অনুতাপ জাগিতে লাগিল—আজিকার এই মুহূর্ত্তটাকে যদি আর একটু বেশী বাড়াইতে পারিত! তখন কেন সে অণিমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া লইল না? মূর্খ অরুণ, আজিকার এত বড় সুযোগটাকেও সে হেলায় হারাইয়া ফেলিয়াছে!!

অণিমারও দিন কাটিতেছিল, কিন্তু সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া যে ক্ষোভের হাহাকার বহিতেছে তাহাকে চাপিয়া রাখা বুঝি তার সাধ্য নাই। তাহার হাসি—সে যেন কান্নারই রূপান্তর। কুমুদ তাহা লক্ষ্য করিয়া স্ত্রীকে বলিল, "অরুণের চিঠির জবাব না দিয়ে ভাল করিনি, নয়?"

মিনি বলিল, "নিশ্চয়। তোমরা না বললে সে কি সেধে আসবে?"

কুমুদ বলিল, "তাই ভাবছি, তাকে আসতে লিখব। কিন্তু অভ্যর্থনার ভার তোমার উপর। তার ব্যবহার মনে করলে আর তার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না। আমি যদি না থাকি, তুমি একলা পারবে ত?"

মিনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, পারিবে।

পরদিন বিকালে অরুণ যখন আসিল, কুমুদ তার আগেই বাহির হইয়া গিয়াছে। মিনি সাদরে তাহাকে বসাইয়া বলিল, "উনি এইমাত্র একটা কাযে বেরিয়ে গেলেন।"

কুমুদ নাই শুনিয়া অরুণ চক্ষুলজ্জার হাত এড়াইয়া মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। ফিরিয়া যাইবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল, মিনি বুঝিতে পারিয়া বলিল, "উনি নেই, তাতে কি? আমরা ত আছি। বসুন, ঠাকুরঝিকে খবর দিয়ে আসি।"

অণিমা একাকী আপনার কক্ষে বসিয়া ছিল। মিনি আসিয়া বলিল, "ভাই, অরুণ বাবু এসেছেন। তোর কাছে নিয়ে আসব?"

অণিমা সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল বলিল, "সে কি? দাদা জানেন?"

মিনি বলিল, "জানেন বৈ কি! তিনিই ত আসতে লিখেছেন।"

অণিমা কহিল, "দাদা কেন লিখলেন? যদি অনুরোধে পড়ে এসে থাকেন? তাঁর নিজের ইচ্ছায় এসেছেন কি?"

মিনি এত সব প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই একটু মুস্কিলে পড়িয়া কহিল, "বারে, আমি কি জানি? সে ত তোমার জানবার কথা। ইচ্ছে না থাকলে কি

কেউ অনুরোধে পড়ে কায করে?" বলিয়া মিনি বাহির হইয়া গেল।

ঠিক কথা। কিন্তু দাদা কেন লিখিলেন? অণিমার মনের ভাব কি তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে? ছিছি, কি লজ্জা! আর তিনি, এত দিন পরে কি বলিয়া দয়া হইল? অণিমা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, এ বুঝি সেদিনকার সাক্ষাতের ফল! আসিয়া যাহাকে খবর দেওয়াও দরকার মনে করেন নাই, আজ তাহার জন্ত বিনা কারণে আসিবেন এ যেন বড়ই অবিশ্বাস্য। কিন্তু সত্যই যদি সেদিনের দেখায় মন টলিয়া থাকে?—অণিমা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার অধর কাঁপিয়া উঠিল। যে পূজা তাহাকে নয় সে পূজা অণিমা চায় না। তাহার সৌন্দর্য্য তাহার রূপ আজ যেন তাহাকে ধিক্কার দিয়া কেবলি বলিতে লাগিল, "আমরা ছাড়া তোমার কোন মূল্য নাই—কোন মূল্য নাই।"

বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। ধীরে ধীরে অরুণকে নিয়া মিনি প্রবেশ করিল। বলিল, "ঠাকুঝি, অপরাধী হাজির, হুকুম কর কাণ দুটো মলে দি। নইলে থাক্, তুমিই মনের মত শাস্তি দিও। আমি যাই, খাওয়ার আয়োজন করিগে।"

অণিমা তখন ভাবিতেছিল, সেদিন তাহার পরীক্ষা হয় নাই, অগ্নি পরীক্ষা তাহার আজ। সেদিন বুঝি আজিকার মত অপমানের সুর এমন স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। অধীর চিত্তে সে মনে মনে বলিল, ভগবান তোমার সৃষ্ট নারীর মনের জন্ত কেবল কি কোমলতাই নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছ? একবিন্দু শক্তি দিতে পার নাই? এক মুহূর্ত্তের জন্ত আজ এতটুকু শক্তি দাও, যার জোরে এই অনাহুত অশ্রুরাশিতে ফিরাইয়া দিয়া সতেজে বলিতে পারি, "তোমার খেয়ালমত ভালবাসা, সে আমি চাইনা!"

মিনি চলিয়া গিয়াছিল। আবার দুজনে কাছাকাছি। নিস্তব্ধ কক্ষ—অরুণ ধীরে ধীরে আরো নিকটে গিয়া অণিমার একখানি হাত ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল—"অণিমা!"

হায়, কৈ শক্তি?—শক্তি ত মিলিল না! অণিমা নত হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল।

শ্রীপ্রমীলা সেন।

কৈলাসপর্ব্বত ও মানসরোবর দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২। দিওরি

১৯শে জ্যৈষ্ঠ ইং ২রা জুন সকালে উঠিয়াই নিকটবর্ত্তী ঝরণায় যাইয়া স্নানাদি করিয়া কিছু খাওয়ার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ডাক বাঙ্গলার নীচেই সরকারী হুকুমে একটি সরকারী দোকান আছে, দোকানদার ব্রাহ্মণ। পাহাড়ের বেশীর ভাগ লোকই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অন্তান্ত জাতি সামান্ত পরিমাণে আছে, কিন্তু সব কাযেই প্রায় ব্রাহ্মণই বেশী পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণটিকে আহার সম্বন্ধে বলায় সে আমাকে গরম গরম রুটি ও আলুর তরকারী খাওয়াইতে পারে বলিল। আমি "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে তৈয়ারী করিতে বলিলাম। আমার নেপালী বন্ধুরা রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলেও হইতে পারিত, কিন্তু বিশেষ দরকার না পড়িলে তাঁহাদিগকে কষ্ট দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলাম না। ৮টার মধ্যেই খাইয়া সকলেই আবার চলিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম।

এই বার পথটি অনেকটা সমতল, তাই বলিয়া কলিকাতার ময়দানের মত নহে—অনেক উঁচু নিচু আছে। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পথ এই রকমই ছিল, আবার চড়াই আরম্ভ হইল। দ্বিপ্রহর বলিয়া চড়াইয়ে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলাম। সকলেই ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। যদিও আজকের চড়াই বিগত কল্যের মত, কিন্তু পূর্ব্বদিনে বড় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ছিলাম বলিয়া আজ যেন সকলেই হাঁটিতে কষ্ট পাইতে লাগিলাম। আজ আর ঘোড়াটি আগে যাইতে দেওয়া হয় নাই, কেহ কেহ উহা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বেলা ৩টার সময় এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, বেশ ঠাণ্ডা হইল। ঠাণ্ডা হইবার জন্য আরও কিছুক্ষণ চলিতে পারিলাম। কিন্তু এইবার আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আর চলিবার ক্ষমতা রহিল না, আমি বসিয়া পড়িলাম, ও আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম, "আপনারা অগ্রসর হউন, আমি যদি পারি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনাদের সঙ্গে চম্পাওতে আসিয়া মিলিত হইব, না পারিলে রাত্রে পাহাড়ে থাকিয়া সকালে নগরে পৌছিব।"

আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের চম্পাওতে পৌছিবার কথা। এখান হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূর। বন্ধুরা বলিলেন, "সে কথা কোন মতে হইতে পারে না। এক সঙ্গে আসিয়াছি, আমরা আপনাকে একলা ছাড়িয়া যাইতে পারি না।" তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ নেপালী হিন্দু, তাঁহারা কোন মতেই সঙ্গীকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। বিষম সমস্যায় পড়িলাম। এ দিকে শারীরিক অবস্থা, ওদিকে সঙ্গীদের অবস্থা—কি হইবে, অগত্যা সাহসে ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর সকলের সঙ্গে আবার চলিতে লাগিলাম। আর বেশী দূর যাইতে হইল না, চড়াই শেষ হইয়া আসিল, পরেই উৎরাই ও প্রায় সমতল রাস্তায় চম্পাওতে পৌছিতে হইবে। চড়াইয়ের পর একটু উৎরাই নামিয়াই একটি নদী আছে, সেইখানে সকলে যাইয়া মুখ হাত ধুইয়া ও জল পান করিয়া পিপাসা নিবারণ করিলাম এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। এবার আমাদের নেপালী জামাই বাবু বলিলেন, তাঁর ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে ও পেট ব্যথা করিতেছে। তিনি বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছু সুস্থ হইলে আমি সকলকে বলিলাম, "আর চম্পাওত ৩ মাইল, আপনারা অগ্রসর হউন, জামাই বাবু ও আমি আস্তে আস্তে আসিতেছি আপনারা যাইয়া বাসা ঠিক করিয়া রাখিবেন।" চাকরটি যে এখনও পিছনে কোথায় পড়িয়া আছে তার কিছুই খবর নাই। অপর সকলে অগ্রসর হইলে আমরা দুই জনে চাকরটির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু যখন তাহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল আমরাও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

এইবার আমরা নদীর ধারে ধারে জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। সন্ধ্যা আগত প্রায়, রৌদ্রের উত্তাপ একেবারেই নাই, জল হইয়া বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য আর কোন বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে না। পাহাড়ের রাস্তায় দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের উত্তাপ মানুষকে শীঘ্রই ক্লান্ত করিয়া ফেলে। জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা, আশে পাশে অনেক জংলি গোলাপ গাছ ও জায়গায় জায়গায় নদীর ধারে চাষবাস। কোথাও রাখালেরা গরু চরাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। অদূরে চম্পাওত নগর দেখা যাইতেছে, একটী ময়দানের উপর ছোট গ্রাম। গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক চাষ বাস, ও অদূরে আবার পর্ব্বতশ্রেণী। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গ্রামের বাহিরে (যেখানে আমাদের বাকি সঙ্গীরা বাসা স্থির করিয়াছিলেন) পৌছিলাম। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন। গ্রামটি এখনও অর্দ্ধ মাইল দূরে, কিন্তু থাকিবার স্থান আছে বলিয়া এবং কাছেই একটি নদীতে জল পাওয়া যাইবে ভাবিয়া এবং চাকরটি এখনও আসিয়া পৌছে নাই সেই কারণেও বটে, এই স্থানে থাকাই স্থির হইল। বন্ধুরা রাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন,

কিন্তু আমাকে রাত্রিতে কিছুই খাইতে হইবে না বলিয়া বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। আজ বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে, কারণ বৈকাল বেলায় একটু বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন, এখনও বৃষ্টি হইবার খুব সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ পরে সকলের খাওয়া হইল। চাকরটিও ইতিমধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আমরা সকলেই আজ এক স্থানে থাকিলাম, কারণ জায়গাটি জঙ্গলের ধারে ও শোনা গেল সময় সময় এখানে বাঘ ভালুকের উপদ্রব হইয়া থাকে।

৩। চম্পাওত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ ইং ৩রা জুন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা চম্পাওত নগরের ভিতর দিয়া লোহা ঘাটের দিকে রওয়ানা হইলাম। চম্পাওত বেশ একটি নগরী। এখানে একটি স্কুল, হাঁসপাতাল, পোষ্ট অফিস আছে। একজন সব্ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন, তাঁহার আদালত আছে। পুরাকালে কুমায়ুন বা কূর্ম্মাঞ্চলের হিন্দু রাজাদিগের ইহা রাজধানী ছিল। পরে গুর্খা দিগের হাতে পড়িলে তখনও একটি সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। গুর্খা যুদ্ধে তাহাদের পরাজয়ের পর যখন ইহা ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, তখনও অনেক দিন ইহা একটি সৈন্য নিবাস ছাউনি ও সব্ডিভিজনাল্ টাউন ছিল। এখন এখানে সৈন্য সামন্ত রাখা হয় না; এবং লোহা ঘাটে সব্ডিভিজনাল্ আফিসের হেড্কোয়ার্টার উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার আর পূর্ব্বশ্রী নাই। তাহা হইলেও ইহা প্রসিদ্ধ জনপদ ও হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান। সহরের সন্নিকটে একটি পাথরের পুরাতন মন্দির আছে। ইহা যে সুনিপুণ শিল্পী তৈয়ারি করিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাই ঘট্কু দেবের মন্দির, ভগবান এখানে কূর্ম্ম অবতারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই কারণে এই স্থানটি এবং বিশেষ রূপে ও সমস্ত প্রদেশটি কূর্ম্মাঞ্চল নামে খ্যাত হইয়াছে। চম্পাওত সমুদ্রগর্ভ হইতে ৫৬৪২ ফুট উচ্চে অবস্থিত ও টনকপুর হইতে ৩০ মাইল দূর।

আমরা নগরের বাহির হইয়া ময়দানে পড়িয়া বেশ সমতল ভূমি দিয়া যাইতে লাগিলাম। কাছে কোনও জঙ্গল নাই সমস্তই শস্যক্ষেত্র। অদূরে যে পাহাড় দেখা যাইতেছে উহার উপর দিয়া লোহা ঘাটের পথ। রাস্তার দুইধারে ছোট ছোট দেবদারু গাছের জঙ্গল আছে, দেখিলেই বোধ হয় যেন বাঙ্গলার সন্নিকটস্থ কোন বাগান, জঙ্গল নয়। গাছগুলি দেবদারু, কিন্তু ইহা অন্য রকমের দেবদারু। এক রকম দেবদারু আছে যাহা নিম্নস্থানীয় জঙ্গলে পাওয়া যায়, তাহাকে ইংরাজিতে পাইনাস্ লঙ্গিফলিও (Pinus Longifolio) এবং সচরাচর চিড় গাছ বলা হয়। কিন্তু এই দেবদারু গাছগুলি পাইনাস্ এক্সেলসিয়র (Pinus Excelsior);—কলিকাতার বড় লোকদের বাগানে Cypress গাছের মত দেখিতে, গোড়া হইতে ডগা পর্য্যন্ত যেন কাঁচি দিয়া কাটিয়া দাঁড় করান হইয়াছে, গোড়াটি খুবই মোটা, আর ডগাটি খুবই সরু।

শীঘ্রই পথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখের পাহাড়টি পার হওয়া গেল। পাহাড়টির উপরে গাছপালা একটিও নাই। রাস্তার ধারে মাত্র একটি গাছ, গাছের ছায়ায় বসিয়া দৃশ্যগুলি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, পেছন ফিরিয়া আবার একবার দেখিতে লাগিলাম। সম্মুখে উত্তর দিকেই লোহাঘাট দূরে জঙ্গলের মধ্যে আভাস মাত্র বোঝা যাইতেছে। আবার লোহা ঘাটের দিকে দেবদারু গাছের ঘন জঙ্গল আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া চলিতে লাগিলাম।

এবার লোহাঘাট পর্য্যন্ত প্রায় বেশীর ভাগ উৎরাই। রাস্তার দুইধারেই বড় বড় দেবদারু গাছ, ও অনেক জংলি গোলাপ গাছ আছে। আরও নানারকম গাছ লতা পাতা আছে। আমার নেপালী বন্ধুরা একরকম মরিচের মত ছোট ছোট ফল আনিয়া কহিলেন, "ইহার নাম টিমুর, খাইলে জল পিপাসা নিবারণ হইবে।" মুখে দুই একটি দিয়াই বুঝিতে পারিলাম ইহা কাঁচা

কাবাব চিনির ফল (cubeb)। জঙ্গলে খুব কাবাব চিনি ফলিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় এ দেশের লোক ইহার ব্যবসা বাণিজ্য করে না। যাইতে যাইতে পথে একটি বড় গ্রাম পাইলাম। এইস্থানে অনেক মুসলমানের বাস। এখান হইতে লোহাঘাট দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে লৌহবর্ণি নদীর তীরে পৌছিয়া নদীর ধারে ধারে রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলাম। আমরা দুইজন পিছনে পড়িয়াছি, বাকি সকলে অগ্রসর হইয়াছেন। নদীর ধারে ধারে যাইয়া লোহাঘাটে ঢুকিতেই নদীর উপর একটি সেতু আছে। সেতুর পারেই নদীর ধারে ঋষীশ্বর মহাদেবের মন্দির। আমাদের সঙ্গীয়া যাঁহারা অগ্রে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই স্থানটি থাকিবার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। আমরাও যাইয়া তাঁহাদের কাছে পৌছিলাম। দেখিলাম তাঁহাদের নির্ব্বাচনটি অতি সুন্দরই হইয়াছে।

ঋষীশ্বর মহাদেবের মন্দিরটির দুই দিকেই নদী। এক দিকে লৌহবর্ণি, অপর দিকে অন্য একটি ছোট নদী, লৌহবর্ণিতে আসিয়া মিশিয়াছে। দুইটি নদীর ধারেই বেশ উচ্চ পাহাড়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ, বড়ই মনোমুগ্ধকর ও শান্তিদায়ক দৃশ্য। মন্দিরের অদূরে অন্য দুই দিকে লোহাঘাটের সহর বাজার। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লৌহবর্ণিতে স্নান করিলাম। ইহা আমাদের শাস্ত্র কথিত স্কন্দ পুরাণের তীর্থস্থান, পুরাতন নাম এখনও চলিয়া আসিতেছে। স্নান করিয়া নিজেই পাক করিয়া আহার করিলাম। ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করিয়া লোহাঘাটের বাজার দেখিতে বাহির হইলাম।

৪। লোহাঘাট।

লোহা ঘাটে একটি সব্‌ডিভিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী আছে। তিনটি উকিলও থাকেন। উকিল গঙ্গারাম পুনেঠা একজন উৎসাহী যুবক, বাজারের মধ্যে তাঁহাদের একটি কাপড়ের দোকান আছে, হরিনন্দন পুনেঠা তাঁহার জেষ্ঠভ্রাত এই দোকানের কার্য্যাধ্যক্ষ। আমি সোজাসুজি তাঁহাদের দোকানেই উঠিলাম। প্রথমেই হরিনন্দন পুনেঠার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, পরে উকিল মহাশয় আসিলে তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিবার পর তিনি বলিলেন, আপনার সমস্ত ব্যবস্থা এইখান হইতেই হইয়া যাইবে। তাঁহার নিকট শুনিলাম মিষ্টার টমাস্ এখানকার সব্‌ডিভিজনল্ ম্যাজিষ্ট্রেট। টমাস্ সাহেব পূর্ব্বে গোরখ্‌পুরে ছিলেন, তথায় তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। মিসেস্ টমাস বাঙ্গালী ঘরের কন্যা। বাজার পরিভ্রমণ করিয়া আমরা মিষ্টার টমাসের বাঙ্গলায় গেলাম। টমাস সাহেব আমাকে দেখিয়া বড় খুসী হইলেন ও গোরখ্‌পুরের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মিসেস্ টমাসও আসিয়া আমাকে চিনিতে পারিলেন। চা পানের পর অনেক রকম গল্প আরম্ভ হইল। কত রংয়ের কত বিষয়ের কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা অনেকটা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মিসেস টমাস বড়ই ধার্ম্মিক খৃষ্টান রমণী। তিনি আমায় কোন মতে বাসায় ফিরিতে দিলেন না। বলিলেন, লোহাঘাটে যত দিন আছেন আমাদের আতিথ্য স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ইহাতে সম্মত হইলাম। যে দুই দিন লোহাঘাটে ছিলাম, বড়ই আনন্দে ও সুখে কাটাইলাম।

বিবি টমাস বলিলেন—"সকল ধর্ম্মই এক, প্রত্যেক মাত্র পন্থা অবলম্বনে। কেহ কোনটি ভাল পথ বলিয়াছেন, অপর কেহ আবার নূতন পথ দেখাইয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ বুঝাইয়াছেন।" সাধারণত আমরা যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-যাজক বা পাদরীদিগকে হিন্দু ধর্ম্মের বিদ্বেষী দেখিতে পাই ও কথায় কথায় অন্য ধর্ম্মের প্রতি কটূক্তি করিতে শুনিতে পাই, তাঁহার কাছে তাহার কোন রূপ গন্ধ পর্য্যন্ত ছিলনা। অনেকক্ষণ কথা কহিবার পর, ভোজনের ডাক পড়িল। সাধারণ নিয়ম অনুসারে আমিও তাঁহাদের সহিত টেবিলে যাইয়া বসিলাম। আমি রাত্রে কিছু খাই না, বসিয়া বসিয়া মিসেস টমাসের মিষ্ট কথার আস্বাদ পাইতে লাগিলাম। "ভগবানের পুত্র

যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদিগের জন্ত জন্ম লইয়া কত কষ্টই সহ্য করিয়াছেন, ও পরের দুঃখে কাতর হইয়া মনুষ্যগণকে তাহাদের কষ্ট হইতে নিবৃত্ত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। চৈতন্যদেবও ইহাই করিয়াছিলেন। যীশুই ভক্ত, আর চৈতন্যই ভক্ত, ভক্তনামে অবশ্যই আনন্দ পাইবে এবং তাহাই ভগবৎপ্রাপ্তির প্রথম পথ।"

আহারের পর অনেক ক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কথা বার্ত্তা চলিল। রাত্রি অধিক হইলে আমরা সকলেই মিলিত হইয়া ভগবৎ প্রার্থনা করিলাম। খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এখনও শয়নের পূর্ব্বে ভগবৎ আরাধনা প্রচলিত আছে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া একবার লোহবর্ণিতে স্নান করিয়া আসিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দর জল। সকালে যদিও একটু ঠাণ্ডা বোধ হইল, কিন্তু স্নান করিবার পর যেন শরীরে বেশ স্ফূর্ত্তি হইল। বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিয়া টমাস সাহেবদিগের সহিত ৮টার সময় চা খাওয়া হইল, ও ১০টার সময় প্রাতরাশ শেষ হইল।

একবার বাজারের দিকে বাহির হইলাম। বাজারে আসিয়া পণ্ডিত হরিনন্দন পুনেঠার দোকানে যাইয়া বসিলাম। সেখানে অনেকক্ষণ থাকিয়া নানা রকম রাস্তার বিষয়ে খবরাখবর পাইলাম। তাঁহার এক ব্যাপারী বন্ধু নন্দরাম কল্যাণ সিং, গারবিয়াংয়ে থাকেন, তিব্বতে তাকলা কোটের বাজারে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যান। পুনেঠা মহাশয় তাঁহার নামে এক পত্র লিখিয়া আমাকে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার নেপালী বন্ধুদের কাছে গেলাম।

কল্য প্রত্যুষেই আমরা রওয়ানা হইব স্থির হইল। আমরা মাত্র লোহাঘাট পর্য্যন্ত ঘোড়া ভাড়া করিয়াছিলাম, অতএব এখান হইতে আবার দুইটি ঘোড়া ৮৲ হিসাবে পিথোরাগড় পর্য্যন্ত ভাড়া করা হইল। প্রত্যুষে আহারাদি করিয়া এখান হইতে যাওয়াই সুবিধা বিবেচনা করা গেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শিবস্থানে থাকিয়া সদাশিব ঋণেশ্বরের সন্ধ্যা আরতি দেখিয়া, আবার টমাস সাহেবের বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলাম। আজ রাত্রেও তাঁহাদের অতিথি থাকিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। তাঁহারা আরও দিন কয়েক থাকিয়া যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি আমার নেপালী বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়িতে ইচ্ছা করিলাম না, সকালে উঠিয়াই যাওয়া স্থির রহিল।

২২শে জ্যৈষ্ঠ ইং ৫ই জুন প্রত্যুষে লোহবর্ণিতে স্নান করিয়া আমার নেপালী বন্ধুদিগকে বলিলাম, "আপনারা যত শীঘ্র পারেন বাঙ্গলার দিকে আসুন, আমাকে প্রস্তুত পাইবেন।" পিথোরাগড়ের রাস্তা বাঙ্গলার ধার দিয়াই গিয়াছে। মিসেস্ টমাস আমার নেপালী বন্ধু ও তাঁহাদের মহিলাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমার নেপালী বন্ধুগণ, ইহা শুনিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

পূর্ব্ব রাত্রেই বিবি টমাস তাঁহার ভৃত্যদিগকে আমাকে ৮টার সময় খাওয়াইয়া দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। পার্ব্বতীয় দেশে বেশীর ভাগ চাকরই ব্রাহ্মণ। ৮টার মধ্যেই আমার আহার হইয়া গেল। ভাত ও আলু মটরশুটি দিয়া ডালনা। আজ তরকারী খাইলাম, কিন্তু জানিতাম না ইহার পর দুইমাস আর কোন তরকারির মুখ দেখিতে পাইব না।

আমার নেপালী বন্ধুরা আসিলে তাঁহাদের মহিলাদিগকে দেখিয়া মিসেস্ টমাস বড়ই খুসি হইলেন। সকলেই মিষ্টার ও মিসেস্ টমাসের অভ্যর্থনা পাইলেন। আমার নেপালী বন্ধুরা জাতিতে নেওয়ার (Newar) পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সমস্ত নেপালের ব্যবসা বাণিজ্য নেওয়ারদের হাতে। নেওয়ার স্ত্রীলোকদিগের পরিধান, অন্য নেপালী মহিলাদের পরিধান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। ইঁহারা সৌখীন রকমের কাপড় পরেন ও কেশ-বিন্যাসও অন্য রকমে করিয়া থাকেন। মাথায় ফুল বসাইতে বড় ভালবাসেন। মিসেস্ টমাস যদিও পূর্ব্বেই নেওয়ার মহিলাদের ছবি দেখিয়াছিলেন, কিন্তু

ইহাদিগকে দেখিয়া যেন জীবিত ছবি পাইলেন। সকলকেই ফুল ও ফল উপহার দিলেন। আজ দুই দিন বেশ আনন্দে কাটাইয়া, সর্ব্বানন্দ শ্রীকৈলাসের দিকে আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

বাঙ্গলার কাছ হইতেই বেশ সমতল রাস্তা চলিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমতল বলিলে কলিকাতার মত বুঝিলে চলিবে না, মধুপুর কিংবা গিরিডিতে যাহাকে "পাহাড়ের উচুনিচু' বলা হয় সেই রকম উচু নিচুকেই, কিংবা তাহার চাইতে আরও বেশী উচু নিচুকেই হিমালয় পর্ব্বতের সমতল বুঝিতে হইবে। রাস্তার দুইধারেই অনেক চাষবাস হইয়াছে। একটু দূরেই রায়কোট (Raikot) গ্রাম, তার পরেই একটি উচ্চ পর্ব্বত আরম্ভ হইয়াছে। উহার উপরে খৃষ্টান দিগের মাউন্ট এবট (Mount Abbot) গ্রাম খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সুদূর পাহাড়ে তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নিজেদের বসতি কায়েম করিয়াছেন, এই হিমালয় পর্ব্বতের অনেক দুর্গম স্থানে তাঁহারা যাইয়া নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রযত্ন পাইয়াছেন। সুদূর ভোট দেশে গটি চৌদাসে সিরখা বলিয়া একটি স্থানে দুইটি খৃষ্টান মহিলা কিছুদিন নিজেদের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন এবং একটি স্কুল ও খুলিয়াছিলেন।

মাউন্ট এবট পর্ব্বতের উত্তরে পশ্চিমে মা-ধুরী দেবীর মন্দির। তাহার আরও পশ্চিমে অন্যান্য হিন্দু তীর্থ স্থান আছে। কিন্তু হিন্দুদিগের স্থান গুলি আজ নির্জীব, কারণ হিন্দু ধর্ম্মের প্রচার নাই। যদি ধর্ম্মের প্রচার না থাকে ও জলের প্রবাহ না থাকে, তাহা হইলে কালে উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়। হিন্দু! তোমাদের কি নিদ্রা আর ভাঙ্গে না? তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া জাভাদ্বীপ পর্য্যন্ত হিন্দু ধর্ম্মের জয় পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তোমরা আজ এমন দুর্ব্বল যে, তোমার হিমালয় দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই, সমুদ্র পার হইবারও সাহস নাই। কারণ, কোনও অন্ধকূপের পণ্ডিত বলিয়া দিয়াছেন, সমুদ্র পার হইলে জাত হারাইবে।

কথা কহিতে কহিতে বেশ আনন্দে চলিয়াছি। দুই দিনের বিশ্রামের পর আজ পথ হাঁটিতে ততটা কষ্ট হইতেছে না। ডান ধারে খুব উচু পাহাড়, বামে খুব দূর পর্য্যন্ত পার্ব্বতীয় গহ্বর ও পরেই নদী আছে। এই স্থানে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম ও পাহাড়ের ধারে বেশ চাষবাস হইতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া "ছিয়া" স্থানে পৌছিলাম। এখানে একটি ছোট ডাকবাঙ্গলা আছে। মনে করিলাম, এখানে একটু জল খাওয়া যাইবে ও বিশ্রাম করা যাইবে। সকলেরই জল পিপাসা লাগিয়াছিল, কিন্তু জল পাওয়া গেল না বলিয়া আর মাইল খানেক যাইয়া "যমুনা পানি"তে আমরা বিশ্রাম করিলাম। যমুনা পানিতে পানিই পানি (জলই জল) কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় হইতে ঝরণা বাহির হইয়াছে। এই স্থানে একটি ছোট কলা বাগান আছে, কিছু কলা কিনিয়া আবার মাস দুয়েকের জন্ম ফল খাইয়া লইলাম। লোহাঘাট হইতে সমস্ত হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বৎ হইয়া আবার যতদিন বদরি-নারায়ণের কাছে যোশি মঠে না পৌছিব ততদিন আর তরকারি বা ফলের মুখ দেখিব না। হিমালয়ের অন্যান্য স্থানে সময়ে অনেক তরকারি ও নানারূপ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু আমি যে সময়ে গিয়াছিলাম সে সময়ে কিছুই ছিল না।

৫। রামেশ্বর ঘাট

দূরে রামেশ্বরের পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। যদিও মন্দির এখান হইতে দেখা যায় না, কিন্তু কোন্ খানে মন্দিরটি অবস্থিত তাহার ধারণা করা যাইতে পারে। অদূরে রামেশ্বরের পুল ও রামেশ্বরঘাট পর্ব্বত পার হইতে হইবে। এক পাহাড়ের উচ্চ স্থান হইতে অপর অন্য একটি পাহাড়ে

যাইবার জন্য যে সংকীর্ণ পথ তাহাকেই ঘাট বা ঘাটি বলা হয়। খেয়াঘাট গুলিতে যেমন নদীর উচ্চতীর হইতে নীচে নামিয়া নৌকাযোগে জল পার হইয়া আবার পরবর্ত্তী উচ্চতীরে উঠিতে হয়, পাহাড়ের ঘাট অবতীর্ণ হওয়াও প্রায় সেই রকম। এক উচ্চ শৃঙ্গ হইতে আরও উচ্চতর শৃঙ্গে যাইতে হইলে অনেক উঠা-নামা করিতে হয়। এবার আমাদিগকে রামেশ্বর ঘাটে তাহাই করিতে হইবে। প্রায় ৩ মাইল পথ নীচে নামিয়া, রামগঙ্গা পার হইয়া আবার তিন মাইল পর্ব্বতে উঠিয়া শুরণা পর্য্যন্ত যাইয়া রামেশ্বর ঘাট পার হইয়া তবে পিথোরা গড়ের সমতল ভূমি পাওয়া যাইবে।

যমুনা পানি হইতে উৎরাই আরম্ভ হইল। আজ আমরা বেশি ওঠা-নামা করি নাই, তাহা ছাড়া দুইদিন বিশ্রামের পর একটু সুস্থই ছিলাম, রাস্তায় বিশেষ কষ্ট হয় নাই। এবার আবার উৎরাই আরম্ভ হইল দেখিয়া আমরা একটু খুসী হইলাম, কিন্তু পরক্ষণেই নৈরাশ্যের সঞ্চার হইল। রামেশ্বর ঘাটের উৎরাই ভয়ানক কঠিন, কারণ মাত্র একটি পর্ব্বত খাড়া একবারে নদী বক্ষ পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। নদীবক্ষ যদিও দেখিতে খুব কাছে বোধ হয়—যেন সজোরে ঢেলা ফেলিলে নদীর জলে ঢেলাটি পড়িবে—কিন্তু পাহাড় দিয়া যাইতে অনেকখানি রাস্তা। রাস্তাটি পাহাড়ের পার্শ্বে আঁকা বাঁকা করিয়া কাটিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। রাস্তাটিও ভাল নয়, পথ সংকীর্ণ, ও পাথরে পরিপূর্ণ। যাই হউক, আমরা কোন মতে আস্তে আস্তে নামিলাম। ঘোড়াটির কোনও রকম ব্যবহার করা যাইতে পারা গেল না, কারণ উৎরাইয়ে ঘোড়ার উপর চড়া একেবারেই চলে না। ঘোড়ার গর্দ্দানের উপর জিনটি না বসিলে বোধ হয় কিছুই হইতে পারে না। হাসিবার কথা নয়, যাঁহারা পার্ব্বতীয় ঘোড়ায় তিব্বৎ দেশে পাহাড় অতিক্রম করিবার ছবি দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন, ঘোড়ার জিনটি পিঠের মাঝখানে নয়, একেবারে গর্দ্দানের দিকে।

গোমতী, সরযূ ও রামগঙ্গা। এই স্থানের কিছু উপরে তিনটি মিলিত হইয়াছেন, সেই জন্য এই স্থানটি ও শ্রীশ্রীরামেশ্বর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। রামগঙ্গা এই-স্থানে দুইটি উচ্চ পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর, এখন পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বরাবর নদীর ধারে ধারে যাইয়া পুল পার হইতে হইবে। কিন্তু কাছেই একটি ছোট পুল ছিল, সেটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কারণে একবার খুব উঁচু নিচু করিতে হইল। বড় বড় পাথর, রাস্তা নাই, সেই কারণে ঘোড়াগুলি পার করা দুরূহ হইয়া উঠিল; অতএব ঘোড়ার মাল-পত্র নামাইয়া খালি ঘোড়া পার করা গেল। সন্ধ্যা হইতে না হইতে আমরা রামগঙ্গার পুল পার হইলাম। পুলটি বেশ বড় ও সুন্দর। এটা ঝোলা পুল বা ইংরাজিতে যাহাকে সাসপেনসেন ব্রিজ (suspension bridge) বলা হয়। পার্ব্বতীয় দেশে পুরাকালে নদীর উপরে পার্ব্বতীয়েরা দড়ির ঝোলা পুল তৈয়ার করিত। তাহারই উপর দিয়া পারাপার হইবার উপায় ছিল। পার হইবার সময় পুলটি বড়ই দুলিত, সেই কারণে অনেকেই সাহস করিয়া পুল পার হইতে পারিত না। হরিদ্বারের কাছে লছমন ঝোলা বেশ প্রসিদ্ধ স্থান। লছমন ঝোলায় পূর্ব্বে দড়ির ঝোলা পুল ছিল, যাত্রীরা বড় কষ্ট পাইত। এখন কোন ধার্ম্মিক বড় লোকের দানে লছমনঝোলায় একটা সুন্দর সাসপেনসেন ব্রিজ নির্ম্মিত হইয়া যাত্রীদিগের কষ্ট নিবারিত হইয়াছে।

সাসপেনসন ব্রিজগুলিও পুরাকালের দড়ির ঝুলির অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। নদীর দুই পাশে পাড়ের উপর দুইটি পায়ার মতন উচ্চ দেওয়াল তৈয়ার করিয়া, তাহার উপর দিয়া দুইগাছি লোহার তারের দড়ি টানিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই লোহার দড়িতেই লোহার গরাদে দিয়া লৌহ বীম ঝুলাইয়া তাহারই উপর পাটা বিছাইয়া পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। পুলটি সম্পূর্ণই লৌহ-নির্ম্মিত, তাই বেশী দোলে না, তবে পাঁচ সাতজন এক সঙ্গে চলিলে যেন একটু ঝোলার মতন সামান্য দোল

বোধ হয়। পার্ব্বতীয় নদীর মধ্যে পায়া করিয়া পুল বসান যাইতে পারে না, কারণ বর্ষাকালের খরস্রোতে নদীবক্ষে পায়া যত মজবুতই হক না কেন ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় আছে।

পুল পার হইয়া নদীর উত্তর তীরে পৌঁছিলাম। এই স্থলে দুটি ছোট ছোট ঘর ধর্ম্মশালা নামে অভিহিত। কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন ঘর গুলির বড়ই বে-মেরামত হইয়া পড়িয়াছে আর থাকিবার উপযুক্ত নহে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, অতএব আজ আমাদিগকে এইখানেই বাসা করিতে হইল। জিনিসপত্রগুলি রাখিবার পর আমার নেপালী বন্ধুরা রন্ধনের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। খাওয়ার পর সকলে শুইবার পূর্ব্বে একটা খুব বড় রকম আগুনের ধুনি জ্বালিয়া রাখা হইল। এই স্থলে ব্যাঘ্র ও বিশেষ করিয়া ভল্লুকের বড়ই ভয় আছে, কারণ সমস্ত স্থানটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সেইজন্য রাত্রিকালে আগুন জ্বালাইয়া রাখা উচিত। কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। ধুনি জ্বালাইলে সুবিধাই হয়, রাত্রে একটু শীতও হইয়াছিল।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ইং ৬ই জুন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা শীঘ্র বাহির হইয়া পড়িলাম। সম্মুখেই কঠিন চড়াই, রৌদ্র হইবার পূর্ব্বে চড়াইটি শেষ করিতে পারিলে বিশেষ কষ্ট হইতে বাঁচা যাইবে। কি ভয়ানক চড়াই! পূর্ব্বে দিউরি চড়াই মনে করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম রামেশ্বর ঘাটের চড়াই আরও কঠিন। এখন কঠিন বলিতেছি, কিন্তু পরে পরে যখন আরও কঠিন আসিবে তখন বলিব রামেশ্বরের চড়াই কিছুই নয়। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিয়া ৯টা বাজিতে বাজিতে রামেশ্বরের চড়াইয়ে চড়িয়া শুরণা পৌঁছিলাম।

শুরণা হইতে পিথোরা গড় পর্য্যন্ত ভূমিকে একটা খুব বড় পার্ব্বতীয় মাঠ বলা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে খুব উঁচু নিচু আছে, ছোট বড় পাহাড়ও আছে, কিন্তু সমস্তই প্রায় সমতল ভূমি। দূরে দূরে পর্ব্বতের উপর অনেক পার্ব্বতীয় গ্রাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বেশ চাষবাসও হইতেছে। শুরণায় একটি বেনের দোকান ও সরকারি ডাক বাঙ্গলা আছে। কিন্তু জল অনেক দূরে, তাই শুরণা হইতে এক মাইলে একটী গ্রাম আছে সেইখানে যাওয়াই স্থির হইল। শুরণা হইতে কিছু চাউল খরিদ করিয়া লইলাম। বেশ ভাল চাল, টাকায় ২ সের করিয়া পাওয়া গেল। তরকারি কিছুই পাওয়া গেল না অতএব কিছু ডাল কিনিয়া লইলাম।

প্রায় এক মাইল যাইয়া একটী গ্রাম অতিক্রম করিয়া তাল্লি সেউনি গ্রামের নিকট পৌঁছিলাম। এই স্থানে একটী ছোট নদী আছে, রন্ধনাদি করিয়া খাওয়া হইবে ইহাই স্থির হইল। জিনিস পত্র রাখিয়া রন্ধনাদির উদ্যোগ করা গেল। কিন্তু আজ একটী বিশেষ অভাব হইল। যাহা আমরা কখনও ভাবি নাই, আজ জ্বালাইবার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিল। রামেশ্বরের ঘাট উঠিয়া শুরণা হইতে যে পার্ব্বতীয় মাঠ আরম্ভ হইয়াছে ইহার কোথাও আর জঙ্গল নাই। ছোট ছোট যে পাহাড় গুলি আছে তাহাতেও গাছ পালা নাই। কোন পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে কিংবা নিম্নদেশে যেখান হইতে কোন পার্ব্বতীয় নদী বাহির হইয়াছে সেই স্থানেই যৎসামান্য গাছপালা আছে। গ্রামবাসীদিগকেও দূর হইতে কাষ্ঠ আনিয়া ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা কোনও রকমে ছোট বন জঙ্গল গাছের কাটী সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিলাম। আজ আবার স্বহস্তেই পাক করিয়া ভোজন করিলাম। বিশ্রাম করিবার পর আবার রওয়ানা হইবার জন্য সকলে উঠিলাম।

আমরা নদীতটে রাস্তা হইতে যেখান দিয়া নামিয়াছিলাম, সচরাচর সেখান দিয়া কেহ নামে না। সেই কারণ কোন নামিবার বা উঠিবার পথ নাই। সদর রাস্তা হইতে নদীগর্ভে প্রায় ১০০ ফুট নীচে। আমি বাসনগুলি ধুইয়া দুই হাতে লইয়া উপরে উঠিতেছি, এমন সময় ভুল ক্রমে আমার পা একটী অপলকা যায়গায় পড়িয়া পিছলাইয়া পড়িয়া গেলাম। পড়িয়াই নদীর দিকে গড়াইয়া

যাইতে লাগিলাম। প্রায় পাঁচসাত হাত নীচে যাইয়া কতক গুলি কাঁটা গাছ ছিল তাহাতেই কাপড়গুলি লাগিল। এইরূপে আটকাইয়া গেলাম ও কাঁটাগাছগুলি হাত দিয়া ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম। নীচেই ২৫।২৬ ফুট খাড়া গভীর নদীর গর্ত্ত। আমার নেপালী বন্ধুরা দৌড়াইয়া আসিয়া দুই জন নীচে হইতে আমার পায়ের তলায় হাত দিয়া আমার ঝোলা অবস্থা হইতে উপরে তুলিলেন। বৃদ্ধ অজবর আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে তুলিয়া লইলেন। কাঁটায় দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, বিশেষ হাতের তালুগুলি একবারে রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছিল। উপরে রাস্তায় আসিয়া খানিকটা হাসা গেল, কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার আমরা চলিতে লাগিলাম। এবার আমি ঘোড়ায় সওয়ারি করিলাম। প্রায় সমতল ভূমি দিয়াই চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। আজিকার দৃশ্য তত সুন্দর নয়, পাহাড় পর্ব্বতে গাছ পালা না থাকায় কারণ সকলই যেন একটা রুক্ষ ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আসেপাশে শস্যক্ষেত্রের জন্য যেন এক একবার একটু সান্ত্বনা হইতে লাগিল। পটিসৌর বা পিথোরা গড় এ অঞ্চলের শস্যক্ষেত্র এবং এইখান হইতেই লোহাঘাট পর্য্যন্ত শস্য সরবরাহ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন রায়।

আষাঢ়ে

ও কার পাগলা হাসি ঠিক্‌রে পড়ে
ঘন মেঘের কিনারায়,
ও কে মল্লারেতে উদাস করে'
ডাক্‌ছে শত ইসারায়?
থাম্‌ল চাঁদের তরী বাওয়া,
মেঘের ছায়ায় আকাশ ছাওয়া,
আজ বিষাদ ভরে সজল হাওয়া
সুর ধরেছে উদারায়!
কান্না-হাসির গণ্ডী ছিঁড়ে,
অসীমে প্রাণ মিশতে ফিরে,
এই কোলাহলের সাগর তীরে
থাক্‌তে চাহে নিরালায়!
ইন্দ্রধনুর সেতুর পারে,
দৃষ্টি তাহার খুঁজছে কা'রে,
আর পাগল তা'রে করতে নারে
আলো-ছায়ার মদিরায়।
বাঁধন-হারার মন্দিরেতে,
চল্‌বে অচিন্‌ বন্দরেতে,
ও সে স্বচ্ছ তরল অম্বরেতে
চল্‌বে ভাসি' দরিয়ায়।
সুধার বানে কানায় কানায়,
ভরলো তাহার শুষ্ক হিয়ায়,
তার উছলে-ওঠা হাজার ধারায়
ফেল্‌ছে ছেয়ে বসুধায়!
যা' কিছু তা'র আপন আছে,
বিলিয়ে দেবে জগৎ মাঝে,
সে যে গৈরিকেতে বাউল সাজে
ছাড়্‌বে এবার মথুরায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

ঋগ্বেদের মর্ম্মবাণী

[৪]

আমরা পূর্ব্ব-সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে, বেদান্তের ভাষ্যকার দুই প্রকার দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন; এক, অজ্ঞ সাধারণ লোক যে ভাবে জগতের বস্তুগুলিকে দেখিয়া থাকে; অপর তত্ত্বদর্শিগণ যে ভাবে জগৎকে অনুভব করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের স্বাভাবিক দৃষ্টি, জগতে অভিব্যক্ত নাম-রূপাদিতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আমরা জগতে নানাশ্রেণী বস্তু দেখিতে পাই,—বৃক্ষজাতীয় বস্তু, পশুজাতীয় বস্তু, মনুষ্যজাতীয় বস্তু—কত জাতীয় বস্তু আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রত্যেক জাতিতে আবার অসংখ্য নাম-রূপধারী 'ব্যক্তি' (individuals) দেখিতে পাই। ইহাদের প্রত্যেকটী প্রত্যেকটী হইতে স্বতন্ত্র, ভিন্ন। আবার সকল বস্তুই অহরহঃ পরিণত হইতেছে, ইহাও সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়। এমন বস্তু কদাপি পাওয়া যাইবে না, যাহা এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থা না পাইতেছে। ইহাই বস্তুগুলির প্রকৃতি। দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। একটা বৃক্ষের কথা ভাবিয়া দেখুন। উহার বীজাবস্থা বিনষ্ট হইবার পর, উহা অঙ্কুরাবস্থায় পরিণত হয়। আবার, অঙ্কুরাবস্থার পর, উহা ফলপুষ্পাদিসমন্বিত বৃক্ষাবস্থায় পরিণত হয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন্। আমার বাল্যাবস্থার পরে যৌবনাবস্থা; যৌবনাবস্থা চলিয়া গিয়া, এখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এইরূপ মৃচ্চূর্ণাবস্থা চলিয়া যাইবার পর, পিণ্ডাবস্থা; পিণ্ডাবস্থার পর, ঘটাবস্থা দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাবস্থাটী, বর্ত্তমানাবস্থার 'কারণ'। এবং বর্ত্তমানাবস্থাটী, উহার পূর্ব্বাবস্থার 'কার্য্য'। এই প্রকারে, কার্য্য-কারণ-সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, প্রত্যেক বস্তু এক অবস্থা নাশের পর, অপর অবস্থায় পরিণত হইতেছে,—ইহাও আমরা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বস্তুর এই সমস্ত অবস্থা ছাড়া যে আবার কোন 'স্বতন্ত্র' পরমাত্মা বা অপর কোন বস্তু আছে, তাহা আর আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না। ইহারই নাম—"স্বাভাবিক দৃষ্টি।"

কিন্তু যাঁহারা "তত্ত্বদর্শী" লোক, তাঁহারা বলেন যে—'আচ্ছা, তোমার কথা মানিলাম। আমরা নানা শ্রেণীর, নানা জাতীয়, বস্তু দেখিতেছি। ঐ সকল বস্তু এক অবস্থা হইতে অপর এক ভিন্ন অবস্থায় নিয়ত পরিণত হইতেছে;—এ কথাটাও মানিয়া লইতেছি। উন্মাদ ভিন্ন এ কথাটা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যাহা, তাহা অস্বীকার করিলে, আমার ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইতে পারে, আমার গায়ের জোর প্রকাশ পাইতে পারে;—কিন্তু আমার বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইবে না। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন যে—'প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এই জগৎ প্রপঞ্চ 'বিদ্যমান' রহিয়াছে, ইহার অপলাপ বা অস্বীকার করা ত কখনই সম্ভব হইতে পারে না।' *

"প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—মৃচ্চূর্ণাবস্থা চলিয়া গিয়া ঘটাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে;—ইহা অস্বীকার করা ত আর চলে না। মাটীর পরিণতি ঘট;—ইহা নদী হইতে জল লইয়া আসিয়া আমার ক্ষুন্নিবৃত্তির আমার পিপাসার উপশমের সাহায্য করিতেছে; উহাদ্বারা সর্ব্বদা আমার সাংসারিক প্রয়োজন ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে। সুতরাং বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির কথাটাও কখন অস্বীকার করা চলে না।

---

* যদি তাবৎ বিদ্যমানোহয়ং বাহ্যঃ পৃথিব্যাদি লক্ষণঃ, আধ্যাত্মিকশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিলক্ষণঃ—প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়িতুং উচ্যেত...স পুরুষ মাত্রেণ অশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুং। ইত্যাদি (শঙ্করভাষ্য, বেদান্ত দর্শন)

"কিন্তু তুমি যে বলিলে যে, ইহা ছাড়া 'স্বতন্ত্র' কোন পরমাত্মা নাই,—তোমার এ কথাটা আমরা মানিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বলি, নাম-রূপাদি সকল অবস্থান্তরের মধ্যে একটা জিনিষ অনুস্যূত হইয়া আসিতেছে। উহা আপন স্বরূপে ঠিক্ থাকিয়াই আপন 'স্বাতন্ত্র্য' বজায় রাখিয়াই, অবস্থান্তরগুলির মধ্যে অনুগত হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থান্তরগুলি, সেই স্বাতন্ত্র্যের কোন হানি করিতে পারিতেছে না। দৃষ্টান্তের অভাব নাই! রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত, মরু-মরীচিকা—প্রভৃতির দৃষ্টান্ত লও। সর্পাবস্থার প্রতীতি হইতেছে; কিন্তু রজ্জু ত প্রকৃতই অবস্থান্তরিত হইয়া পড়ে নাই। উহা স্বতন্ত্র রহিয়াই, সর্পাবস্থা পাইয়াছে; রজ্জুটি ত প্রকৃতই সর্প হইয়া উঠে নাই। তুমি যে আবার অবস্থান্তর গুলির মধ্যেই কার্য্য কারণের কল্পনা করিতেছিলে, সেটাও ঠিক কথা নহে। যে জিনিষটা সকল অবস্থার মধ্য দিয়াই অনুস্যূত হইয়া আসিতেছে, সেই জিনিষটাই প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল অবস্থান্তরের 'কারণ'। উহা হইতেই অবস্থান্তর গুলি উৎপন্ন হইয়াছিল এবং উহাই সকল অবস্থান্তরের মধ্যে আপনার স্বাতন্ত্র্য হারায় নাই, আপন স্বরূপকে হারায় নাই।"

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! তত্ত্বদর্শী লোকেরা এই প্রকার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদিগকে একটা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় যে—"মহাশয়! আপনারা ত অবস্থান্তর গুলিকে স্বীকার করিতেছেন। এবং আপনারা ঐ অবস্থান্তর গুলির মধ্যে অনুস্যূত একটা জিনিষ স্বীকার করিতেছেন; এবং আপনারা বলিতেছেন যে, ঐ জিনিষটা স্বতন্ত্র থাকিয়াই—আপন স্বরূপে ঠিক্ থাকিয়াই—বিকৃত না হইয়াই—প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে অনুগত হইয়া রহিয়াছে। আচ্ছা মহাশয়! যদি তাহাই হয়, তবে আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে,—ঐ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ তবে কি প্রকার হইবে? এই অবস্থান্তর গুলির সঙ্গে, সেই অনুস্যূত জিনিষটার সম্বন্ধ কি প্রকার?"

এই প্রশ্নের উত্তর, ভাষ্যকার নিজে এইরূপে দিয়াছেন—

"পরমাত্মাই এই নাম-রূপাদি বিকার গুলির মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন। এই বিকারগুলি, এই অবস্থান্তর গুলি,—প্রকৃতপক্ষে তাঁহা হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। ইহারা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, মধুতে রসের ন্যায়, কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়, ঘৃতে মাধুর্য্যের ন্যায়, তাঁহারই মধ্যে অবিভক্ত ভাবে ছিল। বর্ত্তমানেও তাঁহাতেই অবিভক্ত রহিয়া—ইহারা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। আবার, ইহারা তাঁহারই মধ্যে পুনরায় বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং ইহাদের স্বতন্ত্রতা কৈ? তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া,—ইহারা থাকিতে পারে কৈ? প্রকৃত কারণের সহিত, উহার কার্য্য বা অবস্থান্তর গুলির এই প্রকারই সম্বন্ধ। যাহা হইতে যাহার অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না; তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া—পৃথক্ হইয়া সে থাকিতে পারে না।* মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি যে কোন অবস্থাই ধারণ করুক না কেন;—মৃত্তিকা হইতে বিভক্ত হইয়া, মৃত্তিকার স্বরূপকে ত্যাগ করিয়া, মৃত্তিকার স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন 'স্বতন্ত্র' স্বরূপ লইয়া, ঘট কখনই উৎপন্ন হইতে পারিবে না, থাকিতেও পারিবে না। অতএব, নাম-রূপাদি বিবিধ বিকারময় জগৎটাও—ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে কোন স্বতন্ত্র বা ভিন্ন বস্তু হইতে পারে না। অবস্থান্তরগুলি, সেই অনুস্যূত কারণটীর আপন স্বরূপেরই পরিচায়ক; কোন 'অন্য' বস্তু নহে।

তাহা হইলেই, পাঠক পাঠিকা দেখিতেছেন যে, অবস্থান্তর গুলিকে, নাম-রূপাদি বিকারগুলিকে উড়াইয়া দিবার কোনই প্রয়োজন হইতেছে না। জগৎকে অপলাপ বা অস্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে না। ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে কোন

* যচ্চ যদাত্মনা যতো জায়তে, স তেন অপ্রবিভক্তো দৃষ্টঃ, যথা ঘটাদীনাং মৃদা।'

বিরোধও থাকিতেছে না। যাহা প্রকৃতপক্ষে 'অন্য' একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে; যাহা ব্রহ্মেরই স্বরূপের বিকাশ বা অভিব্যক্তি;—তাহার সঙ্গে ব্রহ্মের বিরোধ হইবে কি করিয়া? এই প্রকারে ভাষ্যকার, জগৎকে রাখিয়াই বিরোধ ভঞ্জন করিতে পারিয়াছেন। জগৎকে উড়াইয়া দিয়া, অপলাপ করিয়া, তাঁহাকে বিরোধ ভঞ্জন করিতে হয় নাই।* ভাষ্যকার ভারতের ব্রাহ্মণ। কাহাকেও হিংসা করা, কাহারও প্রাণনাশ করা, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে। শঙ্কর, অস্ত্রোদ্যতহস্ত যোদ্ধৃ-পুরুষের ন্যায়, এ জগতের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হন নাই। তিনি যে অর্থে জগৎকে 'অসত্য' বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার।

সাংখ্যাচার্য্যগণ, 'প্রকৃতি' নামক একটা বস্তুকে এই জগতের উপাদান (material cause) বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রকৃতিকে, একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র স্বয়ংসিদ্ধ শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, এই প্রকৃতি, কাহারও বিনা প্রেরণায়, আপনা আপনি, অন্তর্নিহিত শক্তি-বলে এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। ন্যায়াচার্য্যগণও, পরমাণুপুঞ্জকে জগতের মূলে স্থাপন করিয়াছেন। এই পরমাণুপুঞ্জ, তাঁহাদের মতে, স্বাধীন, স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যবস্তু। পরমেশ্বর, এই সকল নিত্য পরমাণুকে গড়িয়া পিটিয়া জগতের আকারে পরিণত করিয়াছেন। তবেই, সাংখ্য এবং ন্যায়—উভয় মতেই, জগৎটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র, 'অন্য' একটা বস্তু হইয়া পড়িয়েছে।

কিন্তু বেদান্ত দর্শন এ প্রকার সিদ্ধান্ত করেন নাই। বেদান্তের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। বেদান্তের ভাষ্যকার, প্রকৃতির স্বাধীনতা স্বীকার করিতে পারেন নাই। এই জন্যই তিনি আপন দর্শনে, সাংখ্যের 'প্রকৃতি' শব্দটাকে গ্রহণ করিতেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তের "মায়াশক্তি" কোন স্বাধীন, স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ইহা ব্রহ্মের নিতান্ত অধীন, নিতান্ত অনুগত। ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত ইহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। উহা ব্রহ্মস্বরূপেরই বিকাশোন্মুখ অবস্থা মাত্র।* উহা ব্রহ্ম হইতে 'অন্য' কিছু নহে। এই জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হইবার জন্য, যখন ব্রহ্মের "ঈষৎপ্রবৃত্তি" বা চেষ্টা উপস্থিত হইল, উহা তাহাই।—

"ঈষদুপজাত প্রবৃত্তি তৎসৎ সমস্তবৎ।"

আনন্দগিরি এই মায়াশক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,—"ইহা যখন পরমাত্মারই শক্তি, তখন ইহা পরমাত্মারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পরমাত্মার স্বরূপ ব্যতীত ইহার স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। অতএব ইহা সত্ত্বেও, ব্রহ্মের একত্বের কোন হানি হইতেছে না।"

"ইহা পরমাত্মা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ক্রিয়া করিয়া থাকে; নিজে স্বতন্ত্রভাবে কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ নহে।"

ভাষ্যকার অনেক স্থলে, এই মায়াশক্তিকে, ব্রহ্মের "কর্ম্মস্থানীয়" বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে ইহার 'কর্ত্তা' বলিতে হয়। কর্ত্তা, আপন ক্রিয়ার ব্যাপক। ব্যাপককে, তাহার ব্যাপ্য হইতে স্বতন্ত্র হইতেই হয়। ব্যাপ্য এবং ব্যাপক—এক বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু, কর্ম্ম কখনই কর্ত্তাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। অতএব, মায়াশক্তি আর কিছুই নহে; উহা ব্রহ্মেরই ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা। সুতরাং, ব্রহ্ম হইতে উহা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইতে পারিতেছে না। সুতরাং, এই জগৎ, এই নাম-রূপাদি বিকারবর্গ,—ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি, ব্রহ্মেরই বিকাশ, ব্রহ্মেরই ক্রিয়া বা কর্ম্মমাত্র। 'অন্য' কোন বস্তু নহে।

উহা যে ব্রহ্ম হইতে বাস্তবিক স্বতন্ত্র কোন বস্তু

* "পরমার্থাভিপ্রায়েণ তদনন্যত্বমিত্যাহ। ... পরিণাম-প্রক্রিয়াঞ্চ আশ্রয়তি অপ্রত্যাখ্যায় কার্য্যপ্রপঞ্চং।"—সূত্রকারঃ (বেদান্ত-ভাষ্য)।

* বেদান্তের নানাস্থানে ইহাকে 'জায়মানাবস্থা, 'চিকির্ষিতাবস্থা', 'উন্মুখীভূতাবস্থা' বলা হইয়াছে।

নহে, উহা ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি মাত্র—ইহা বুঝাইবার জন্ত ভাষ্যকার, সাংখ্য বা স্তায়ের মত, অন্ত কোন বস্তুকে জগতের উপাদান না বলিয়া, ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঠক-পাঠিকা! আপনারা অবশুই শুনিয়া থাকিবেন যে, বেদান্ত এক ব্রহ্মকেই, একাধারে, নিমিত্ত কারণ (Efficient Cause) এবং উপাদান কারণ (Material Cause) বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম, এই জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াই, আপনাকেই জগৎ-রূপে পরিণত—বিকাশিত—করিতেছেন।—

"পূর্ব্বসিদ্ধোপি হি সন্, জগদাকারেণ
পরিণময়ামাস আত্মানং।" (বেদান্ত ভাষ্য)

তিনি অন্ত কোন স্বাধীন উপাদানকে গড়িয়া পিটিয়া জগৎরূপে পরিণত করেন নাই। তিনি নিজেই নিজকে, বিবিধরূপে ও বিবিধ নামে অভিব্যক্ত করিতেছেন। সুতরাং জগৎকে ব্রহ্মেরই বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা 'অন্ত' কোন বস্তু নহে।

কিন্তু এই মহান্ সিদ্ধান্তটা বেদান্ত কোথায় পাইলেন? প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারা শুনিলে হয়ত বিস্মিত হইবেন যে, বেদান্ত এই তত্ত্বটী অবিকল ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা মূলে ঋগ্বেদেরই সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম বস্তু যে জগতের নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই—একথা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া, ঋগ্বেদই সর্ব্ব প্রথমে বলিয়া দিয়াছিলেন। বেদান্ত তাহাই আপন দর্শনে, সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কিন্তু আমরা ঋগ্বেদের সে কথা আর একদিন বলিব।

ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

কবির কল্পনা

ছুটে যাই, আমি ছুটে যাই ওগো
চাঁদের হৃদয় লুটিতে,
ছুটে যাই আমি অসীম গগনে
তারকার সাথে ফুটিতে।
স্বপ্নপুরীর জ্যোৎস্না-মাধুরী নিঃশেষে আনি বহিয়া,
দুর্লভ সুধা স্বর্গের আনি ক্ষীর-সমুদ্র মথিয়া।

ছুটে যাই আমি উল্কার মত
উগ্র অশনী ধরিতে,
ছুটে যাই আমি মেঘের কোলেতে
বাদল ধারায় ঝরিতে।
ছুটি দেশে দেশে উদাসীর বেশে পাগল পবনে ভাসিয়া,
সবি চেনা ঠাঁই,এধরা যে তাই ডাকে মোরে ভালবাসিয়া।

নন্দন বনে ছুটি উল্লাসে—
সৌরভ রাখে আবরি,
গোলোকবিহারী আনি শ্রীহরির
চরণামৃত আহরি।
বহি আনন্দ সহি আনন্দ ছুটি আনন্দ ঢালিয়া,
কংসের কারাগৃহ আলো করি মণির প্রদীপ জালিয়া।

ছুটে যাই আমি সলাজ মেদুর
পৃথিকার বুকে ঘুমাতে,
ছুটে যাই আমি বিলাতে আপনা
যৌবন-সুখ-চুমাতে।
বন-মর্ম্মরে নদী-নির্ঝরে মর্ম্মের গান ঢালি গো,
বিশ্বে সুখের মৌচাক রচি মনমধু করি খালি গো।

ছুটে যাই আমি চঞ্চল শিশু—
গোপালের সাথে নাচিতে,
ছুটে যাই আমি জনকোলাহলে
সকলের সাথে বাঁচিতে।
রূপরস যেথা পড়িছে গলিয়া গোপনেতে সেথা বিহারি,
দরদী যেথায় জলে বেদনায় সেথা স্নেহছায়া বিথারি।

ছুটি অনন্ত বন্ধন টুটি
উদ্দাম স্রোতে মাতিয়া,
কোথা সুন্দর চির-মনোহর
অন্তর আছি পাতিয়া।
আপন ছন্দে ছুটি আনন্দে সত্যের করি আরতি,
দুর্জ্জয় আমি, উন্মাদ আমি—মুক্তির আমি সারথি!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

কাশ্মীর-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭ই নভেম্বর—প্রত্যহ সকল বেলা উঠিয়া অনেকটা না হাঁটিলে কিছুতেই ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, তাই আজও গুপকরের দিকে গেলাম। এই কয়দিনে দৃশ্যাবলীর আরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রায় ১৫।২০ দিন প্রখর রৌদ্রে গুপকর পাহাড়ের বরফ অন্তর্হিত হইয়াছে—মহাদেবের তুঙ্গ শৃঙ্গও প্রায় বরফশূন্য! শীত ক্রমেই বাড়িতেছে। প্রত্যহ বেলা ৯টা পর্য্যন্ত frost থাকে। সফেদাশ্রেণীর সে হরিৎ সৌন্দর্য্য নাই, প্রায় সকলগুলিই পত্রশূন্য হইয়া যেন আগুনে পুড়িয়া কালো হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! চেনারও তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে। বাড়ি ফিরিতে একটু হাওয়ার তেজ হইতেই অজস্র ধারায় সফেদা ও চেনারের পাতা পুষ্প বৃষ্টির মত আমাকে ঢাকিয়া ফেলিল। কাশ্মীরে এই পাতা পড়ার দৃশ্যটি বড়ই মধুর। সুন্দর সরল রাস্তাগুলির দুই পাশে অগণিত বৃক্ষশ্রেণী, তাহার নীচে কুমারবিন্দমুখী বালিকারা ছুটাছুটি করিয়া পাতা কুড়াইতেছে, আর উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টির মত পাতার রাশি তাহাদের চোখে মুখে বর্ষিত হইতেছে। কবি না হইয়াও এ দৃশ্য বেশ উপভোগ করা যায়।

৮ই নভেম্বর—আজ চা পানান্তে সন্ধ্যার পর Mr J ও H এর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। শ্রীনগরে রাত্রিতে ভ্রমণ বড়ই আনন্দদায়ক। রাস্তায় জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। দারুণ শীতে হাটিতে কোন কষ্ট হয় না।

এখানে "শালী" অর্থাৎ ধান্যের কি একটা control লইয়া বড় গোলযোগ চলিতেছে। চাউল যে শুধু দুর্ম্মূল্য তাহা নহে। একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। গরীবেরা কেহ কেহ ২।৩ মাস শুধু রুটী খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। দেশের সংবে সন্তুষ্ট দরিদ্র অধিবাসীরাও ভাত খাইতে না পাইয়া একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

৯ই নভেম্বর—আজ একটু হাওয়া হওয়ায় শীত আরও বেশী হইয়াছে। এইবারে এ স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। একবার মার্ত্তণ্ড (মাটন) মন্দির দেখিবার উদ্যোগ করিতে হইতেছে। তার পর যদি পারি "পীর প'ঞ্জাল" পর্ব্বতরাজির মস্তকে বানিহাল পাস্ (Banihal pass) দিয়া জম্মু যাইব এবং তথা হইতে দেশে ফিরিব।

১০ই নভেম্বর—সকাল বেলা উঠিয়া দেখি যে বেজায় frost হইয়া সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে

ছোট ছোট নধরকান্তি গাছগুলি শুকাইয়া যাইতেছে। রৌদ্রের তাপেই গাছ শুকাইয়া যায় জানা ছিল, শীতে ও হিমে যে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যাইতে পারে তাহা এই খানেই দেখিলাম। দ্বিপ্রহরে আহারান্তে বসিয়া আছি এমন সময় খবর আসিল Mr Q সেলাম দিয়াছেন। তাঁহাদের কারখানার প্রস্তুত একখানা "কিলান" (কার্পেট) আমাকে দেখাইলেন। বাস্তবিক এই আসনগুলি অতীব সুন্দর।

১১ই নভেম্বর—রাত্রে একটু দেরীতে শুইয়াছিলাম, সুতরাং শেষরাত্রে বেশ একটু নিদ্রার ঘোর হইয়াছিল। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে দেখি ঘর বেজায় কাঁপিতেছে। ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে। ঘরে ২নং 'প' বাবু ছিলেন, তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। মনে হইল ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ভাবিলাম নীচে যাই, কিন্তু ঘর যেরূপ কাঁপিতেছিল তাহাতে সে সাহসও হইল না। অগত্যা নিশ্চেষ্ট হইয়া শুইয়াই রহিলাম। প্রায় দেড় মিনিট পরে কম্পন থামিয়া গেল। কাশ্মীরে নাকি ভূকম্পন প্রায়ই হইয়া থাকে। ঘরগুলি প্রায়ই কাঠের, তাই এ ধাক্কা সহজেই সামলাইয়া লয়।

১২ই নভেম্বর—শীতের প্রকোপে বাধ্য হইয়া পট্টুর সুটের অর্ডার দিতে হইল। এখানে কারিকরগণ সূক্ষ্ম শাল তাকতা বয়ন কমাইয়া দিয়া এখন 'পট্টু' (Kashmir tweed) প্রস্তুত করিতেছে। এই কাপড় ক্রমেই সকলের, বিশেষতঃ সাহেবদের নিকট আদৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত লুই এখনকার এক প্রধান পণ্য।

আহারাদির পর Mr. Rএর সহিত এখানকার প্রসিদ্ধ রেশম কারখানা দেখিতে গেলাম। আমরা তাঁহারই বাসায় থাকি। তিনি এই কারখানার একজন পদস্থ কর্ম্মচারী—জাপান হইতে কাষ শিখিয়া আসিয়াছেন—অতি অমায়িক ভদ্রলোক। বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিয়া বন্ধু আমাকে প্রথম হইতে দেখাইতে লাগিলেন। এখানে চারিদিকের কৃষকদিগকে বীজ দেওয়া হয়, তাহারা সেগুলি হইতে কীট প্রস্তুত করে এবং কারখানা হইতে প্রস্তুত "মালবেরী" (তুঁত) পাতা খাওয়াইয়া সেগুলিকে পুষ্ট করে। পরে তাহারা যখন cocoon (গুটী) প্রস্তুত করে তখন সেগুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া ভিতরের কীটকে মারিয়া ফেলা হয় এবং সেইগুলি এই কারখানা কিনিয়া লয়। আর নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের কৃষকগণ কাঁচা গুটী আনিয়া দেয়। সেগুলি প্রথম একটা উত্তপ্ত গ্যাস দিয়া গরম ঘরের মধ্যে রাখিয়া ভিতরকার পোকাগুলি মারিয়া ফেলা হয়। তাহার পর সমস্ত গুটি এক বিস্তৃত ঘরে লইয়া গিয়া অসংখ্য কুলী প্রথমে তাহার উপরকার পর্দ্দা তুলিয়া ফেলে। পরে গুণানুসারে সেগুলিকে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়। অপর একটা ঘরে বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন রংএর গুটি পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। এগুলি নমুনাস্বরূপ বিদেশে পাঠান হয়। এখানকার একটী কর্ম্মচারী আমাকে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের গুটি উপহার দিলেন।

তথা হইতে আমরা যে গৃহে সূতা বাহির হয় তথায় গেলাম। সারি সারি বহুসংখ্যক পাত্রে ষ্টীম দিয়া জল গরম রাখিয়া গুটিগুলি সিদ্ধ হইতেছে। সেখান হইতে পৃথক পাত্রে সেগুলি ফেলিয়া দিয়া এক একটী লোক নিপুণ ভাবে নয়টী হইতে নয়টী সূতা বাহির করিয়া এক সঙ্গে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্যে দিতেছে। সেখান হইতে বিদ্যুতের বলে সেই সূতা লাটাইএ জড়ান হইতেছে। সে লাটাইটির সূতা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত সূতা অত্যন্ত শক্ত। যাহারা এই নয়টী তার একত্র করিতেছে তাহাদের কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। লাটাই হইতে সূতার গোছা খুলিয়া ওজন করিয়া পৃথক ভাবে রাখা হয়, তাহাই আবার প্যাক করিয়া বাঁধিয়া বিদেশে রপ্তানী হয়।

এখানে সূতাই প্রস্তুত হয়, তাহা হইতে কোন কাপড় প্রস্তুত হয় না। তবে সম্প্রতি বয়ন শিল্পের ব্যবস্থারও চেষ্টা হইতেছে।

এই কারখানার আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা অতি



কাশ্মীরী সাধারণ মুসলমান রমণী

সুন্দর। সমস্ত বৈদ্যুতিক শক্তিতে সম্পন্ন হয়। প্রথমত একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই কারখানা পরিকল্পিত করেন এবং মুরশিদাবাদের আদর্শেই কার্য্যারম্ভ হয়। এখন অনেক উন্নতি সাধিত হইয়া ইহা পৃথিবীর মধ্যে রেশম প্রস্তুতের একটী প্রধান কারখানায় পরিণত হইয়াছে।

অপরাহ্নে খানিক টঙ্গায় ও খানিকটা হাঁটিয়া বেড়াইয়া Mr J'র ঘরে গিয়া বসিলাম। বাতায়ন মুক্ত। একটী কাংড়ী লইয়া আমি বসিয়া অন্যমনে কি ভাবিতেছি, হঠাৎ বন্ধু আমায় একটী ক্ষুদ্র ঠেলা দিয়া বলিলেন, "বিবাদ মীমাংসা করুন।" তাঁহার নির্দ্দেশমত চাহিয়া দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। এখানকার মুসলমানীরা বলে, তাহারাই বেশী সুন্দরী; পণ্ডিতানীরা বলে তাহারাই বেশী—এই বিবাদ। পার্শ্ববর্ত্তী বাতায়নে একটি মুসলমানী তরুণী দাঁড়াইয়া আছেন—একটী সুগঠিত মর্ম্মরমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। কোথাও এতটুকু খুঁৎ নাই। তাহার উপর সেই চম্পক বর্ণ, আর কি যেন এক কমনীয়তা মুখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কবির ভাষায় বলিতে হয় "চাহিলে করুণ ধরা চরণে বিকাতে চায়!" হাঁ, আজ কাশ্মীর-সুন্দরীর প্রকৃত রূপ দেখিলাম। তন্ময় হইয়া আছি, এমন সময় বন্ধু বলিলেন, "উতি দেখিয়ে।" তাকাইয়া দেখি—আর এক তরুণী পণ্ডিতানী নিম্নে রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে। আমার আর "রায়" দেওয়া হইল না। এ বিবাদ মীমাংসা করিবার শক্তি আমার



কাশ্মীরী পণ্ডিত পরিবার
(মহিলাদের ছবি সহজে পাওয়া যায় না)

নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, মুসলমানীরা স্বভাবতঃ যেন একটু তীক্ষ্ণ এবং পণ্ডিতানীগণ যেন অপেক্ষাকৃত কোমল। তবে তাহার ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দেখা যায়।

১২ হইতে ২০শে নভেম্বর। 'মাটন' যাওয়া আর হইয়া উঠিতেছে না। Q পরিবারের সহিত অত্যন্ত খাতির হইয়া গিয়াছে, প্রত্যহই তাঁহাদের হাউস বোটে হয় চায়ের পার্টি না হয় গল্প-গুজব আর তাঁহাদের মোটরে নগর ভ্রমণ চলিতেছে। একদিন বৃষ্টি হইয়াছিল, বেজায় শীত আর সঙ্গে সঙ্গে স্তূপাকারে পাহাড়ে বরফপাত। পরদিন সৌভাগ্যক্রমে রৌদ্র হওয়ায় বরফ অদৃশ্য হইয়া গেল। আর একদিন চন্দ্রালোকে জাফরাণের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য Q পরিবারের সহিত তাঁহাদের মোটরে পামপুরের দিকে গিয়াছিলাম। রাত্রির বাতাস তীক্ষ্ণ সূচিবেধের মত পশমী বালাক্লাভা টুপী ভেদ করিয়াও মাথায় ও কাণে বিঁধিতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে স্বপ্ন রাজ্যের সৌন্দর্য্য দেখা গেল, তাহাতে বোধ হয় বাস্তব সূচিবেধও গ্রাহ্য করিতাম না। পূর্ণিমার রাত্রে "তাজ-মহলের" সৌন্দর্য্যও ইহার নিকট পরাভূত।

শীত ক্রমেই বাড়িতেছে। এখন দিনের বেলাতেও যদি রৌদ্রের তেজ কমিয়া যায় তাহা হইলে ফ্লানেল ইত্যাদির ভিতর দিয়াও শীত বোধ হয়। রাস্তায় লাদাকীরা নামদা ও অন্যান্য শীত বস্ত্র বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে এবং ছেলে মেয়েগুলি যেন আরও অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে একদিন জনৈক বন্ধুর নিমন্ত্রণে এক নর্ত্তকী ও গায়িকা "আ—" বিবির বাটীতে বন্ধুর সহিত উপস্থিত হইলাম। কাশ্মীরি সঙ্গীত ও নৃত্যের বিষয় জানিবার কৌতূহল এতই অধিক হইয়াছিল যে, নর্ত্তকীর বাড়ী যাইবার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাকেও দমন করিয়া ফেলিলাম। আমরা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর গায়িকা মহাশয়ার শুভাগমন হইল। তিনি মাথায় সোণা ও জড়োয়া মুকুট পরিয়াছেন। মাথার সহিত বাঁধা অথচ কাণের পাশ দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া এক থোপা মাকড়ি, গলায় বেজায় মোটা জড়োয়া চিক, আরও নানারূপ অলঙ্কার ও অঙ্গুরীয় আছে। তাঁহার পরিধান সূচের কায করা 'ফেরন'। বয়স বোধ হয় ২০ বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি সোণার



শ্রীনগর বাজার। উইলো নির্ম্মিত দাঁড়িপাল্লা

করিয়া উপবেশন করিলেন এবং তখনও ওস্তাদ উপস্থিত হন নাই বলিয়া রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। উর্দ্দূতে অনেকটা আমারই মত পণ্ডিতা, তবে কথা চালাইতে পারেন। বন্ধু তাঁহার নিকটে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন, আমি একটু দূরে একখানা চেয়ারে বসিয়া গান শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

২৪টা কথাতেই বুঝিলাম বিবি বেশ বুদ্ধিমতী। অবশ্য তিনি যে রূপবতী এ কথা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ বন্ধু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি ইঁহার হাতখানা একটু দেখিয়া ভবিষ্যত বলিয়া দিন।" তাঁহার কথা শেষ হইতেই বিবি উঠিয়া আসিয়া আমার সম্মুখে হাতখানা প্রসারিত করিয়া দিলেন। আমি এরূপ

ব্যাপারের জন্ত একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। বিশেষতঃ এই করকোষ্ঠীর ব্যাপারটা আমার নিকট বন্ধু বান্ধব অথবা অন্তের দুর্ব্বলতার উপর একটা রহস্ত করিবার অস্ত্র মাত্র ছিল এবং সেই ভাবেই তাহার ব্যবহার করিতাম। যাহাহউক যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্যের সহিত আমি বিবির কররেখাধ বিচার করিয়া প্রথমে একটা অতীত ঘটনার উল্লেখ করিলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে যুবতীর হাস্তোজ্জ্বল মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রফুল্লতা দেখাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না। কি যেন এক ঐন্দ্রজালিকের যাদু মন্ত্রে সমস্ত ছবিটা বদলিয়া গেল। সেই হাস্তাননা, প্রগল্‌ভা যুবতী এখন ভয়োরুদ্ধ-মানা বালিকা। ওস্তাদজী আসিয়া সেলাম করিয়া বাজনা সুরু করিলেন, কিন্তু গান গাহিবার বা শুনিবার মত প্রবৃত্তি কাহারও আর রহিল না। আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া বিষয়টা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল না। বিবি বলিলেন, "আপনাকে সহস্র সেলাম, আমি পথ দেখিতে পাইয়াছি।"

আমরা সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া আসিতে এই কথাই মনে হইতেছিল যে, যদিও কালই এ রমণী হয়তো এ কথা ভুলিয়া যাইবে, তথাপি সে রমণী হৃদয় একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই।

২১শে নভেম্বর সকাল বেলা উঠিয়াই দেখি বেজায় শীত। এত সকালে অর্থৎ ৭ ১০ মিনিটে কখনও উঠি নাই। এখানে ৯টার পূর্ব্বে অল্প লোকেই বাহির হয়। Mr. Q এর সহিত কিছু কায ছিল তাই চা পান করিয়া ৮টার সময় শুপকরের দিকে রওনা হইলাম। সমস্ত মঠ তুষার পাতে (frost) সাদা হইয়া গিয়াছে! শুপ-করের নিকটে ৮—৪৫ মিনিটেও রাত্রি বলিয়া বোধ লাগিল। কুজ্ঝটিকাবৃত "ডাল" হ্রদে কিছুই দেখা যাইতেছে না। Mr Q এর হাউস্ বোট উঠিতে দেখি প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু frost জমিয়া গুঁড়া চিনির মত হইয়া রহিয়াছে! পুনরায় চা পানান্তে Mr. Q এর সহিত বাহিরে আসিয়া শুপকরে রাজা

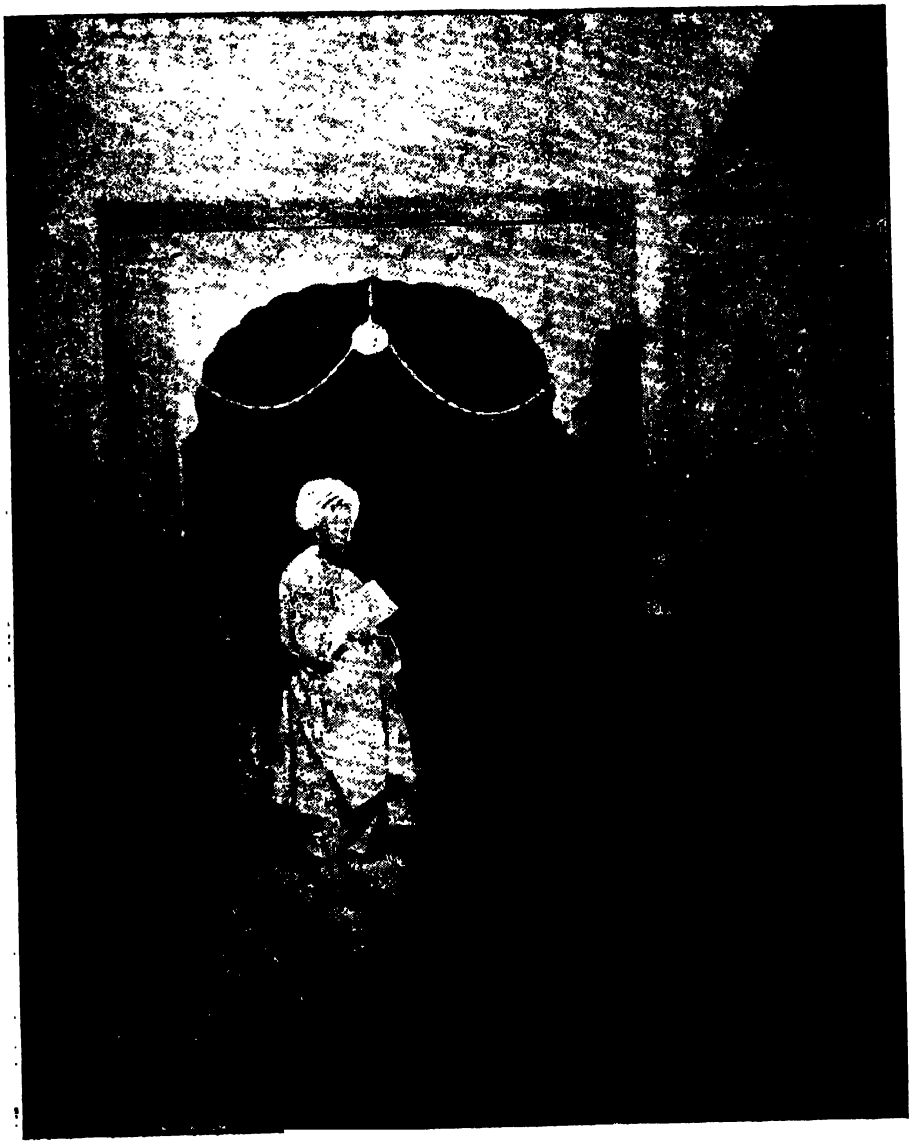


শ্রীনগর বাজার। মুসলমান ফুল ফল বিক্রেতা



বিবাহ সজ্জায় কাশ্মীরী বর

সাহেবের বাংলোর দিকে চলিলাম। পাশে একটা ক্ষুদ্র নালার জলের উপর কেমন যেন একটা পর্দার মত দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ হাতের ছড়ি তাহার উপর রাখিতেই দেখি তাহা কাঁচের মত কঠিন। বুঝিলাম যেখানে নালায় জলে স্রোত নাই সেখানে তাহার উপরের স্তর জমিয়া প্রায় সিকি ইঞ্চি পুরু বরফের চাকনী হইয়া গিয়াছে। একটু জোরে খোঁচা দিতেই তাহা ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন একখানা মোটর গাড়ীর wind screen সরিয়া গেল। Mr J বলিলেন আর ১৫।১৬ দিন মধ্যেই বরফ পতন আরম্ভ হইবে।



জুম্মার দ্বারে কাশ্মীরী মুসলমান উপাসক

আজ রাজা সাহেব যাইবার পর "বানিহাল পাশ" বন্ধ হইবে। সুতরাং সে পথে যখন জম্মু যাওয়ার উপায় নাই—তখন পলায়নই প্রশস্ত।

২২শে—৩০শে নভেম্বর—আজ ১লা ডিসেম্বর। এ ক'দিনের ডায়েরী আজ বসিয়া লিখিতেছি। গতকল্য বন্ধুবর Mr J জাম্বু চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া শতবার যাইতে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন।

ঋতু পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হইয়াছে। আর কোন গাছে পাতা নাই। শ্রীনগর জনশূন্য। চারিদিকে যেন এক গভীর নিস্তব্ধতা। এক এক দিন বেলায় frost, আর প্রায়ই কুয়াসায় সমস্ত আবৃত। সহর

জামা পরিয়াও রাত্রিতে পথ চলা কষ্টকর। সাধারণ লোক মধ্যেই 'কাংরী' লইয়া পথ চলিতেছে। 'মাটনে' যাওয়া হইয়া উঠিতেছে না।

ইতিমধ্যে একদিন পূর্ব্বোক্ত Mr R এর সহিত বৈকাল বেলা তাঁহার আফিসে বেড়াইতে গেলাম। তিনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে রেশমের কারখানা দেখাইয়াছিলেন, এইবার তাঁহার department অর্থাৎ যেখানে বীজ হইতে পোকার উৎপত্তি হইয়া সেগুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় বীজ উৎপন্ন হয় তাহাই দেখিতে লইয়া গেলেন।

একটা জীর্ণ বাটীতে প্রবেশ করিয়া আমরা উপরে উঠিয়া গেলাম। বন্ধু কি করিয়া বীজ হইতে পোকা বাহির হয় এবং তাহারা প্রজাপতিতে পরিণত হইয়া পুনরায় ডিম পাড়ে, এবং কি করিয়া সেই ডিমগুলি পরীক্ষা করিয়া কৃষকদিগকে বিতরণ করা হয় ইত্যাদি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

ঘরে আগুন ছিল না। শীতে হাত পা জমিয়া যাইতেছিল। তখন তিনি তাঁহার এক পণ্ডিত কর্ম্মচারীকে চায়ের হুকুম দিলেন। পণ্ডিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে আমি "নামকি" অথবা "মিঠি" কি প্রকার চা পান করিব। কাশ্মীরীরা Green tea হইতে লবণ সংযোগে যে চা প্রস্তুত করে তাহা "নামকী" ও চিনি দিয়া যাহা প্রস্তুত করে তাহাই "মিঠি"। আমি বলিলাম "নমকী"—কাশ্মীরীরা "নামকীই" পছন্দ করে। প্রায় আধঘণ্টা পরে পরিষ্কার ধাতু পাত্রে চা আসিল। একখানা পরিষ্কার রুমাল দিয়া তাহা ধরিয়া আমরা পান করিতে লাগিলাম। গ্লাস এত গরম যে শুধু হাতে তাহা ধরা যায় না।

সঙ্গে কাশ্মীরী "কুলচা" সেও কতক 'নামকী' কতক 'মিঠি'। এরূপ সুস্বাদু 'চা' আর জীবনে পান করি নাই। মাখন, চিনি ও লবণ সংযোগে এই চা প্রস্তুত, তাহার মধ্যে এলাচি প্রভৃতি মশলা। 'কুলচা' গুলিও উৎকৃষ্ট। ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম। গতকল্য (৩০শে নভেম্বর) বন্ধু Mr H আমাকে গান শুনিবার



শ্রীনগর মিশন হাঁসপাতাল

নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। সে দিন গান শুনিতে পাই নাই—সুতরাং উঁহাদের সহিত স্বীকৃত হইলাম। এবার গান তাঁহার বাটীতে।

রাত্রি ৮টায় সময় আমি গানের আসরে উপস্থিত হইতেই বন্ধু উঠিয়া আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া বসাইলেন। আসর বেশ সরগরম। আমি বসিতেই গান বন্ধ হইয়া গেল। তাকাইয়া দেখি গায়িকা বিবর্ণমুখে মাটীর দিকে চাহিয়া আছেন—ইনি সেই পূর্ব্বোক্ত বিবি! হঠাৎ এইরূপ রসভঙ্গ হওয়ায় একটু লজ্জিত হইলাম। বন্ধু বলিলেন আমি ফরমাইস করিলে সেইরূপ গান হইবে। তখন আমি বিবিকে গান করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি কি গান গাহিবেন জানিতে চাহিলেন। উর্দ্দু গান চলিতেছিল কারণ শ্রোতা অধিকাংশই পাঞ্জাবী। আমার পক্ষে সবই সমান। আমি কাশ্মীরী গান শুনিতে চাহিলাম। গায়িকা তখন সুললিত করুণকণ্ঠে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক সেই অশ্রুতপূর্ব্ব কাশ্মীরী সঙ্গীত সেই যুবতীর করুণ কণ্ঠে বড়ই মধুর শুনাইতেছিল। তাহারপর অনেক উর্দ্দু গান হইল কিন্তু অমন মিষ্ট আর একটীও লাগিল না। সকলে চলিয়া গেলে আমি ও বন্ধু বসিয়া রহিলাম। গায়িকা আসিয়া আমাকে সেলাম করিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার কাশ্মীরী গানটি নোট করিয়া লইলাম এবং তাহার একটি সংক্ষিপ্ত টীকাও লিখিয়া লইলাম। কতক তিনি বুঝাইতে পারিলেন না, কতক নিজে বুঝিলাম না তবুও লিখিয়া লইলাম। একটু নমুনা দিতেছি:—

বেদর্দী দাদি চাইনি
শিরুকো সকে দান
শৈলাই মঠিয়ো মাইনে
ইয়ারো লো—লো—লো—

এই "ইয়ারো—লো—লো—লো" সমস্ত কাশ্মীরী সঙ্গীতের একটা বিশেষত্ব। টীকাটী হারাইয়া ফেলিয়াছি। এইরূপ ৪টী পদে সঙ্গীত সমাপ্ত—এটী 'লয়লা' ও মজনু'র প্রেম ঘটিত।

ইতোমধ্যে বন্ধুর এক ভৃত্য কয়েক পেয়ালা চা লইয়া আসিলেন। বিবি বলিলেন যে তিনি ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া কেবল খোদার নাম করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। আমরা অবাক হইয়া শুনিতেছি, এমন সময় সেই মুসলমানী এক পাত্র চা আমার হাতে উঠাইয়া দিলেন এবং পরক্ষণেই আর এক পাত্র বন্ধুর হাতে দিলেন। আমরা উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু চাএর পাত্র নামাইয়া রাখিতে পারিলাম না। কাশ্মীরে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী যে এদেশের মত এতটা জাতিভেদের ভাব সেখানে নাই। চা পানের পর সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

১লা হইতে ৩ই ডিসেম্বর—সূর্য্যদেবকে আর বড় একটা দেখা যায় না। শীতও বেজায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ করিয়া বৃষ্টি হয়। রাস্তায় লোক চলাচল খুবই কমিয়া গিয়াছে। ঝেলমের বক্ষ প্রশান্ত। একটা কুয়াশা চারিদিকের পাহাড় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সাধারণের হাতে কাংরী আর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের ঘরে দিন রাত বুখারি অথবা electric heater জ্বলিতেছে। জলে হাত দেওয়া একরূপ অসম্ভব। এই ভাবেই নাকি এখন চলিবে এবং এরূপ চলিলে শীঘ্রই বরফ পড়া আরম্ভ হইবে।

৫ঠা ডিসেম্বর ৫টার সময় আমি Mr. H এর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদিগকে সেলাম করিল। সে পূর্ব্বোক্ত নর্ত্তকীর ভৃত্য, সে বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হুজুর আপনার বাসা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবি সাহেবের কি এক বেমার হইয়াছে যে তিনি আর মজুরা করিতে যান না, সর্ব্বদাই ঘরের ভিতর বসিয়া থাকেন।" বন্ধু আমাকে বলিলেন "চলুন দেখিয়া আসা যাক ত—তাজ্জব কি বাত বোধ হইতেছে।" আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম না। বন্ধু তখন ভৃত্যের সহিত চলিয়া গেলেন এবং পরদিন

আসিয়াই বলিলেন—লোকটা যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য!

৬ই ডিসেম্বর—সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু উঠিতে ইচ্ছা হইল না। কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলাম। ২নং 'প' বাবু উঠিয়া ঘরের বাহির হইলেন এবং পরক্ষণেই 'দেখ দেখ' বলিয়া চীৎকার করিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখি সমস্ত সাদা। বিকাল বেলা বর্ষাতি চাপাইয়া যখন বাসায় ফিরি তখনই কথা হইতেছিল যে হয়তো আজ রাত্রে বরফ পড়িবে। কালও তাহাই হইয়াছে। শেষ রাত্রে বরফ পড়িয়া সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বরফ কোথাও অর্দ্ধ ইঞ্চি কোথায়ও বা এক ইঞ্চি মাত্র। চারিদিক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন; কদাচিৎ পাহাড় দেখা যাইতেছে তাহাও সাদা। আমরা নামিয়া আসিয়া সেই বরফের উপর দিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, পায়ের নীচে "মচ্ মচ্" শব্দ হইতে লাগিল, আর পায়ের দাগ বসিয়া গর্ত্ত হইয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই কদাচিৎ ২।১টা কাক বা শালিক বরফের উপর দিয়া বেড়াইয়া ঠোক্‌রাইয়া খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। একটা কুকুর বিষণ্ণ ভাবে বরফের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে যেখানে একটু বেশী বরফ পাত হইয়াছে সেইখানে শুইয়া পড়িল। এটা বিষাদ কি আনন্দের চিহ্ন বুঝা কঠিন। হঠাৎ সে উঠিয়া গা ঝাঁকি দিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। বোধ হয় তাহার বরফ পাতের সহিত পূর্ব্বে পরিচয় ছিলনা—এবং এই প্রথম পরিচয়টা বড় সুবিধাজনক মনে হয় নাই।

শীত অবশ্য খুবই হইয়াছে, তবে অসহ্য নয়। বরফ পড়িবার পূর্ব্বে গতকল্য শীত ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল। তবে এখনও লিখিতেছি আর হাত যেন অবশ হইয়া উঠিতেছে। বেলা ১১টায় সূর্য্য দেখা গেল। বারান্দায় আসিয়া দেখি হুহু করিয়া জল পড়িতেছে, অথচ বৃষ্টির লেশ মাত্র নাই। যতক্ষণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ততক্ষণ এক ফোঁটাও জল ছিল না। রৌদ্রে বরফ গলিয়া এ ব্যাপার হইতেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বরফ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং রাস্তা ভিজিয়া জল চলিতে লাগিল। শ্রীনগরের রাস্তায় একবার কাদা হইলে আর সহজে শুকায় না। একে তো রৌদ্রের তেজ নাই, তার উপর সংকীর্ণ রাস্তায় উভয় পাশে উঁচু বাড়ী। রাতে বাসায় ফিরিবার সময় আবার টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল।

৭ই—১০ই ডিসেম্বর—এ কয়দিন বেশ রৌদ্র হইয়াছে। কাশ্মীরের শাল, তাক্‌তা, তোষা, পট্টু প্রভৃতির বয়ন সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিয়াছি। তিব্বত অঞ্চলে 'তোষ' নামক এক ক্ষুদ্র জানোয়ার আছে তাহাদের পশমে প্রস্তুত সূতায় যে সূক্ষ্ম আলোয়ান প্রস্তুত হয় তাহারই নাম 'তোষা' বা 'সাতোষা'।

ইয়ারকন্দ লাদাক প্রভৃতি স্থান হইতে যে সমস্ত পশম আসে তাহার মধ্য হইতে বাছাই করিয়া পশম লইয়া মেয়েরা অতি প্রত্যূষে নির্জ্জনে চরকা দিয়া যে সূতা প্রস্তুত করে তাহা হইতে 'তাক্‌তা' প্রস্তুত হয়। এই তাকতার উপর সূচী কার্য্য করিয়া 'শাল' ও জামিয়ার প্রস্তুত হয়। শাল ও জামিয়ারের উপর কাশ্মীরীরা যে অদ্ভুত সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য করে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়।

শাল ব্যতীত রুমাল, বিছানার চাদর, নামদার শাড়ী প্রভৃতি বহু জিনিষের উপরই ইহারা রেশম বা পশম দিয়া অদ্ভুত সূচীকার্য্য করিয়া থাকে। ফলতঃ সূক্ষ্ম শিল্পে কাশ্মীরীদের তুলনা হয় না। অথচ এই হতভাগ্য জাতির নৈতিক ও শারীরিক শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। ইহারা পরাধীন থাকতে থাকিতে আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্যই এই যে মানুষের লজ্জা আছে পশুদের তাহা নাই। এই বিচারে দিয়া দেখিতে হইলে কাশ্মীরী বিশেষতঃ কাশ্মীরী মুসলমানদের শতকরা ৯০।৯৫ জন মনুষ্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। এমন নির্লজ্জ জাতি আমি আর সমস্ত ভারত-বর্ষে কোথাও দেখি নাই। গালি দেও, মার, অপমান কর কিছুতেই

প্রায় নাই। অবশ্য আমার এই মন্তব্য শ্রীনগরের পক্ষেই প্রযোজ্য—যেহেতু আমি এ পর্য্যন্ত দূরের গ্রামাদিতে ভাল করিয়া লোক চরিত্র দেখিবার সুবিধা পাই নাই। সহরের লোক দেখিয়া বিশেষতঃ যে সহরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে লোক আমোদের জন্যই আসিয়া থাকে, তাহা দেখিয়া একটা পুরাতন জাতি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা সঙ্গত নয় জানি; কিন্তু যতটা দেখিয়াছি তাহাতে আমার এ ধারণা যাইবার নহে।

যাহা হউক কাশ্মীরের পশমীনার শিল্প বহু পুরাতন কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রধান ব্যবসা লুই এবং পট্টু। শাল, তাকতা প্রভৃতি করিয়া যে পশম অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে আলোয়ান; এইরূপে ক্রমে লুই এবং সর্ব্বশেষে পট্টু প্রস্তুত হয়। তাই পট্টু এত সস্তা। এই পট্টুর প্রচলন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

লাদাক (ক্ষুদ্র তিব্বত) ও ইয়ারকন্দ হইতে এখানে নাম্‌দা আমদানী হয়। কাশ্মীরীরা তাহার উপর পশম দিয়া নানারূপ কারুকার্য্য করে। এতদ্ব্যতীত আজ-কাল এখানে অতি উৎকৃষ্ট কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। আর অনন্ত লালের "গাব্‌বা" নামক একরূপ নানারঙের পশমের কারুকার্য্য-খচিত চাদর অতিশয় প্রসিদ্ধ।

পশমীনার শিল্প ব্যতীত কাঠের উপর খোদাই (wood carving) এখানকার প্রসিদ্ধ। Papier machie অর্থাৎ কাগজের Pulp দিয়া প্রস্তুত দ্রব্যের উপরের কারুকার্য্য ও সোণা রূপার জিনিষের উপর অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এখানে অতি চমৎকার। এই সমস্ত দ্রব্য প্রতি বৎসর রাশি রাশি বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি দূর দেশে গিয়া থাকে।

১১ই—১৩ই ডিসেম্বর—আজ ১৩ই তারিখে সমস্ত দিন সূর্য্য দেখা যায় নাই। দারুণ কুজ্ঝটিকাতে চারিদিক আচ্ছন্ন। গতকল্য হইতে শরীরটা ভাল যাইতেছে না সুতরাং আজ আর বাহির হইলাম না। শীত ক্রমেই অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এক খানা চেয়ারের উপর বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলাম। পায়ে পশমীনার মোজা ও পট্টি বাঁধা ছিল। খানিক লিখিয়া পা'টা জ্বালা করিতে লাগিল। উঠিবার সময় দেখি পা অসাড় হইয়া গিয়াছে। কাংরীতে সেঁকিয়া তবে রক্ষা। বেলা যতই যাইতে লাগিল শীতও ততই বাড়িতে লাগিল। অপরাহ্ণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পতন আরম্ভ হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন শেষ রাত্রে তুষার-পাত হইবে। কাল রাত্রে বাসায় আহারাদির একটু বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কাশ্মীরী পোলাও ও ২।৩ রকমের কাশ্মীরী মাংস রান্না হইয়াছিল। এক প্রকারের নাম—নকেল্‌স—এক প্রকার রোষ্ট, খাইতে বেশ। আজ আর আহারের আকাঙ্ক্ষা ছিল না তাই "কাশ্মীরকা করম শাক আর নসীর্‌কা ভাত্তা" বাদ দিলাম। কয়েক খানা গরম লুচিতে কর্ম্ম শেষ করা গেল।

সন্ধ্যার পর শীতের প্রকোপে বাধ্য হইয়া বুখারী জ্বালিতে হইল। এখানে সমস্ত ঘরেই চিম্‌নী আছে। বিলাতের fire placeএর সুখ কি তাহা আজ বেশ বুঝিতে পারিলাম। আগুনের নিকট সকলে বসিয়া গল্প করার আরামটা অনুভব না করিলে বুঝান যায় না। কাঠগুলিও মশালের মত—ধোঁয়া হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

বঙ্গনারী

বিশ্বব্যথা তোর বুকে যে বাজছে মাগো দিবস যামী,
কেমন করে বুঝ্‌বে সে তার, কেমন করে বলব আমি ?
জীর্ণ বুকের তপ্তশ্বাস, আর পিষ্টনী-ঝরা অশ্রুরাশি,
তলিয়ে তলে উঠছে ভেসে, তোদের মুখের মরণ-হাসি !
কি ব্যথা ওই হাসির আড়ে শুকিয়ে-ওঠা কুসুম সম,
আঁধার রাতে বাজের আলো বিঁধিয়ে তোলে পরাণ মম।
আপন শিখা জ্বালিয়ে তুলি' গোপন মরম নিঃস্ব করি
নিবিড় কালো আঁধার নাশি আলোয় রাখ বিশ্ব-ভরি—
মৃত প্রাণের সঞ্জীবনী, তপ্ত হিয়ায় শান্তিবারি ;
সংজ্ঞা, সুধাদাত্রী ওগো, জাগ্‌ মা আজি বঙ্গনারী !

আকুল করা স্নেহের পরশ ছড়িয়ে গেছে সকল দেহে,
অমর, সজীব প্রেমের বিতান উঠছে বেড়ে মৃতের গেহে,
পরের ছেলে নিজের বলে আপন কর আপনহারা,
বিকিয়ে দিতে, বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখ মাতৃধারা ;
মা, মা বলে ডাকলে পরে কোন স্বরগের চেতন-বায়ে
জাগিয়ে তোলে, সাধ্য কি তোর বসে থাকিস্ স্বপন-ছায়ে ?
সাগর সম অতল হিয়া উথ্‌লে ওঠে উত্তাল হয়ে,
রাখ্‌তে তুমি বিশ্ব-ভুবন বাড়িয়ে দু'টী হস্ত দিয়ে !
বিশ্বমাতা শক্তিময়ী তুই যে মা গো মূর্ত্তি তারি,
সংজ্ঞা, সুধাসঞ্জীবনী জাগ্‌ মা আজি বঙ্গনারী।

মরম-মরুর পান্থপাদপ তৃষ্ণাতুরের হরতে জ্বালা,
আপনা শুধু বিকিয়ে দিয়ে অন্ধ জগৎ করছ আলা।
তৃপ্তি তোমার মিশিয়ে দিছ স্নিগ্ধ শ্যামল শস্য'পরে
ফুল্ল হাসি ছড়িয়ে গেছে রবির বিমল কান্তি ভরে ;
কণ্ঠে তোমার বিশ্ববাণী, নিখিল ভুবন-সম্মিলনে
শান্তি হয়ে সাম্য নীতি, ভ্রাতৃধারা উদ্বোধনে,
ভক্তি ডোরে আছেন বাঁধা মর্ম্মকারায় বিশ্বপতি
ছড়িয়ে গেছে কর্ম্ম মাঝে শক্তি তোমার আত্মব্রতী !
আশীষ তোমার শিরায় শিরায়, চরণ-রেণু বিঘ্নহারী,
সংজ্ঞা, সুধা সঞ্জীবনী জাগ্‌ মা আজি বঙ্গনারী !

মত্ত উত্তাল মরণ-সাগর স্তব্ধ তোমার চরণ-তলে,
শিথির সিঁদুর উঠ্‌ছে ভাতি' বিশ্ব-জোড়া কুহুমালে !
ধূপের সম নিঃস্ব হয়ে বিলালে যে গন্ধ তুমি,
তাতেই আজো মরণ-ধাম এ অমর-কথার-পুণ্যভূমি !
দুঃখে সুখে পতির লাগি' অমন করে আপন-ভোলা,
প্রভঞ্জনে বয়্‌তে পারে—দুল্‌তে দোদুল মরণ-দোলা !
রোগে, শোকে সান্ত্বনা দান, তাপে প্রাণে অভয় বাণী,
আপন ভোলা, জীবন ভরি' পরের লাগি-ফুলের রাণী !
সিঁদুর মাথে, নোয়া হাতে তোমায় যেন দেখতে পারি
সংজ্ঞা সুধা সঞ্জীবনী—দাঁড়াও আজি বঙ্গনারী !

দাঁড়াও আজি বঙ্গনারী, দাঁড়াও আজি মুখটী তুলে,
বিশ্বভুবন ডাক্‌ছে তোমায় মিলন—মহা সাগর কূলে !
মাতৃরূপে মুক্তি জাগো লাগুক্ পরশ বক্ষে, রক্তে
ভগ্নীরূপে শক্তিময়ী—পত্নী প্রেমের উদ্বোধনে।
কণ্ঠে ধরি জয়ের গীতি, শঙ্খ বাজাও জীবন-স্রোতে,
লজ্জা, ভয়ের কোথায় সময় অমর মরণ-চপল দোলে।
হুলুধ্বনি দাওগো আজি, আঁধার ঘরে আলোক জ্বালো,
নীল আকাশের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দিতে তোমার আলো !
প্রণম তোমায়, মাগো আমার ! সর্ব্বজয়ী শান্তিবারি,
মত্ত উত্তাল সিন্ধু সম জাগ্‌ মা আজি বঙ্গনারী।

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় *

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন যে রঘুবংশীয়দের গুণের কথা শ্রবণান্তর চপলতা প্রণোদিত হইয়া তিনি রঘুবংশ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠিক সেইরূপ আমিও বলিতে পারি যে দেশ-বিদেশবিশ্রুত যে মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ও যাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানার্থ আমরা সকলে অদ্য এই স্থানে সমবেত,—বাতুলতা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। বাস্তবিক, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তুলনাতে আমরা এতই ক্ষুদ্র যে তাঁহার চরিত্রের ও কার্য্যের যথার্থ সমালোচনা আমাদিগের মধ্যে কেহ করিতে পারেন কি না, তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কুশাগ্রবুদ্ধি আশুতোষ যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে যে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহা সম্যক্-রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, আমাদিগেরও সেইরূপ বা অন্ততঃ প্রায় তুল্যানুরূপ ধীশক্তি থাকা প্রয়োজন; কিন্তু এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহার মনীষার সহিত তুলনাতে আমাদের মস্তিষ্ক এতই দুর্ব্বল যে আমাদের পক্ষে সেই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাবের সহিত সুপরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা বামনের চন্দ্র-স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষার মত দুরাকাঙ্ক্ষামাত্র।

আশুতোষের শবদেহ যে দিন পাটনা হইতে হাওড়া ষ্টেশনে আনীত ও কালীঘাটের শ্মশানে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, সে দিন প্রত্যেক বাঙ্গালীর নেত্রে ও বদনে যে এক বিষাদ-কালিমার ছায়া পড়িয়াছিল, সেরূপ বিষাদ-কালিমার ছায়া বহুদিন বাঙ্গালীর নেত্রে ও বদনে দেখা যায় নাই। দেশ হইতে মাঝে মাঝে খ্যাতনামা ব্যক্তির তিরোভাব ঘটিতেছে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর আর কাঁহারও মৃত্যুতে বোধ হয় প্রত্যেক বাঙ্গালী এমন করিয়া বুঝিতে পারে নাই যে আজ তাহারই একজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু পৃথিবী হইতে চির-দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অবস্থার কারণ কি তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আশুতোষ খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী জাতির দেহে কোন্ কোন্ স্থান ব্যাধিদুষ্ট তাহা তিনি যেমন করিয়া বুঝিয়াছিলেন, তেমন করিয়া বোধ হয় আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। রোগের স্থান নির্ণয় করিয়াই তিনি নিবৃত্ত হন নাই, রোগের স্বরূপ ও নিদানের অনুসন্ধানও তিনি করিয়াছিলেন এবং কি ভাবে সেই রোগের প্রতিকার হইবে তাহাও তিনি যেমন করিয়া বুঝিয়াছিলেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর কেহই তেমন করিয়া বুঝিতে পারেন নাই বা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। কি ঔষধে রোগের উপশম হইবে কেবল তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই; তিনি নিজে নানাস্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এমন সময়ে কালের কঠোর হস্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিল, আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য সমগ্র দেশ ও জাতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

আশুতোষের মৃত্যুর পর সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি একত্রী-ভূত হইয়া পুস্তকাকারে তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে বিতরিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালা প্রদেশে ও বাঙ্গালা প্রদেশের বাহিরে য়ুরোপীয় ও ভারত-বাসী-সম্পাদিত পত্রে একবাক্যে স্বীকার করা হইয়াছে যে আশুতোষের মত কর্ম্মী পুরুষ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই এবং পৃথিবীতেও যে বেশী আছে তাহাও মনে হয় না। নায়ক পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছেন যে "বাঙ্গালীর মনীষার ইতিহাসে, বাঙ্গালীর প্রতিভার ইতিহাসে, বাঙ্গালীর

* ১লা আষাঢ় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

কর্ম্মশক্তির ইতিহাসে, বাঙ্গালীর গৌরবের ও স্পর্দ্ধার ইতিহাসে তিনি অবিনশ্বর অমর হইয়া রহিবেন।" বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে যে "আশুতোষের সবটাই বিরাট ছিল, তাঁহার বপু বিরাট, তাঁহার হৃদয় বিরাট, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি বিরাট, তাঁহার পরিকল্পনা বিরাট, তাঁহার কর্ম্মশক্তি বিরাট, তাঁহার অধ্যবসায় বিরাট।" যদি বলা যায় যে, ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থাতে রাজা রামমোহন রায় জাতীয়তার সম্যক্ উপলব্ধিকল্পে যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন বর্ত্তমান সময়ে আশুতোষ সেই যজ্ঞের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক ছিলেন, তাহাতে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবেন না। বসুমতীর সম্পাদক মহাশয়ের ভাষাতে বলিতে গেলে "মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডসম প্রদীপ্ত প্রতিভার অধিকারী" আশুতোষ তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত যত কাজ করিয়া গিয়াছেন, সমস্ত কার্য্যেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তার উদ্বোধন, এবং সেই হেতু নায়ক-সম্পাদক লিখিয়াছেন যে "আশুতোষের তুলনা আশুতোষ। বাঙ্গালায় তাঁহার তুলনা নাই—প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—ভারতেও নাই। তিনি বাঙ্গালীর, ভারতের গৌরবস্তম্ভ ছিলেন। সমগ্র ভারতে এই একটী মানুষ ছিলেন যাঁহাকে দেখাইয়া ভারতবাসী শ্লাঘা ও স্পর্দ্ধার সহিত বলিত, দেখ দেখ এই আমাদের ভারতীয় মানবতার শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ—ইহার ভিতর বাহির নব ভারতের নব আদর্শে অনুপ্রাণিত—স্বজাতিপ্রেমের পূর্ণতায় টলমল, ধুতি-কোর্ত্তা-চাদরে-পরিবৃত—জাতীয়তার গৌরবে নিত্য উন্নতশির—এই বিরাট পুরুষকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখ।"

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন মালাঙ্গা লেনে আশুতোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন তাৎকালীন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। পিতা ও মাতার তত্ত্বাবধানে তাঁহার শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাতে বিশেষ সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হইয়া তিনি নিজের কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে যোগদান করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। কলিকাতা হাইকোর্ট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই দুই স্থানই বিশেষরূপে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এই হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে দেশস্থ আরও অনেক অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু জাতীয়তার যে উচ্চ আদর্শ লইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেছিলেন, অন্যান্য অনুষ্ঠানেও তিনি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই এক উদ্দেশ্য সাধনেই নিযুক্ত ছিলেন। তপস্বী যেরূপ আহারনিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতগ্রীষ্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সমস্ত সময়েই এবং সমস্ত অবস্থাতেই তাঁহার নিজের আরাধ্য দেবতার দর্শন লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, সেইরূপ আশুতোষও সেই দিন দর্শনের চেষ্টাতে দিবানিশি ব্যাপৃত ছিলেন, যেদিন জগতের বিদ্বন্মণ্ডলীর সভাতে ভারতবাসী গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবাসী আবার স্বীয় লুপ্ত মর্য্যাদার স্থান ফিরিয়া পাইবে, শিক্ষিত জগতের সম্মুখে ভারতবাসী আবার উচ্চশিরে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে যে সমস্ত গুণ থাকিলে মানুষ হইতে পারা যায়, ভারতীয় যুবকের মধ্যে সে সমস্ত গুণের অভাব নাই, কিন্তু যথোপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার অভাবে সেই সমস্ত গুণ পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না। সেই হেতু যখন জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব যুবরাজকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি দেওয়া হয় সেই উপাধিপত্র বিতরণ প্রসঙ্গে আশুতোষ বলিয়াছিলেন যে :—

"It is their (the Indian people's) ambition not only to advance on material prosperity, but also to qualify themselves to take an important part, not all unworthy of their ancient traditions, in that great intellectual and spiritual competition through which mankind may hope gradually to accomplish its high ideal purposes, a competition in which all people of earth may peacefully join, rivals and brothers at the same time."

হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র

হইলেও, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে হাইকোর্টে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্য অনেক বেশী। যতদিন ভারতবর্ষে শিক্ষার আদর থাকিবে, দেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তারকল্পে আশুতোষের কার্য্যের ইতিহাস ততদিন স্বর্ণাক্ষরে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। কিন্তু বিচারপতি হিসাবেও তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার মূল্যও অসামান্য ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পাটনা হাইকোর্টে বিচারপতিগণ ও অন্যান্য সকলে একত্রিত হইয়া যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যর ডসন্ মিলারের মতে "the name of Sir Ashutosh Mookerjee is a household word throughout the High Courts of India." দেশের আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ আশুতোষকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতেন তাহা এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আশুতোষের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তিকাতে তিনি আশুতোষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে

"He has been a brilliant student, a successful lawyer and judge and an eminent educationist, but in all these walks of life he has been only one among many. In all these he has had many equals and even some superiors. It is only as Vice-Chancellor of the Calcutta University that Sir Ashutosh has attained his unique position in our public life."

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শ্রীযুক্ত পাল মহাশয়ের এই উক্তির সহিত একমত হইতে পারিলাম না। ছাত্র, আইনজ্ঞ, এবং বিচারপতি হিসাবে আশুতোষের সমকক্ষ অথবা তদপেক্ষা প্রতিভাশালী কেহ থাকিতে পারেন কিন্তু বর্ত্তমান যুগে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে তদপেক্ষা অভিজ্ঞতর আর কেহ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভাইস্-চ্যান্সলার হিসাবে স্যর আশুতোষ যাহা করিয়াছেন তাহা যে খুব বড় সে কথা ঠিক এবং তাহাতেই যে তাঁহার নাম দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাও ঠিক; কিন্তু ইহাও ঠিক যে যদি দেশে কি ভাবে শিক্ষা প্রচলিত হইলে এই জাতি অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ হইতে পারিবে সে সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা না থাকিত, কি নীতি অবলম্বন করিলে দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রচার অপ্রতিহত ও সহজসাধ্য হইবে তাহা তিনি সুস্পষ্ট ভাবে না বুঝিতেন, কি প্রণালীতে শিক্ষার সংস্কার সাধন করিলে ভারতের বিভিন্ন খণ্ডজাতি এক পূর্ণ জাতিতে পরিণত হইবে, তাহা যদি তিনি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে কেবল মাত্র ভাইস্-চ্যান্সলাররূপে সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সভাপতিত্ব করিয়া তিনি দেশের ও জাতির নিকট এত শ্রদ্ধার ও আদরের পাত্র হইতেন না। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করেন, তখন দেশে সেই কমিশনের গঠন বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তি হইলেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে আইন ভারতের রাজসরকার কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছিল সেই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পূর্ব্ব অবস্থা সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে ভাবে পরিচালিত হইতেছিল তাহাতে দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা মোটেই হইতেছিল না এবং তাহা শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে মৌলিক অনুসন্ধিৎসার দীপ জ্বালাইতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যপদ্ধতি প্রভৃতির অনুসন্ধানের জন্য কমিশন গঠন করেন। এই কিঞ্চিদূন অর্দ্ধশতাব্দীতে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, আইন, বৈদ্যবিদ্যা ও স্থপতিবিদ্যাতে উচ্চউপাধিধারী অনেক যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

বাহির হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কয়জন স্বীয় অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? প্রায় ৫০ বৎসর পরে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আবশ্যক নহে এই মত যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যে অত্যন্ত সীমাবিশিষ্ট ছিল তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, এবং দূরদর্শী আশুতোষই কেবল মাত্র ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তৎকালে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার আবশ্যক, এবং ইহা সংস্কৃত হইলে আমরা আমাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইব। এই হেতু ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বলিয়াছিলেন যে:—

"India, we cannot conceal the fact from ourselves, contributes hardly anything at the present moment towards the progress and extension of knowledge: in this respect, it does not rank even with the smallest of the civilized countries of the West. Our Colleges and Universities doubtless help to preserve and impart knowledge and learning, but they do exceedingly little to augment and extend it ... I prefer to take my stand on the conviction, deep-rooted in my mind, that India with her great intellectual traditions, India which in old times was one of the chosen seats of wisdom and learning, is expected, nay, is bound to come to the front rank again and take her due place among those nations which are justly regarded as the leaders in the evolution of humanity in modern times."

Sadler Commission'ও এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন:—

"According to the accepted view of almost all progressive societies, a university ought to be a place of learning, where a corporation of scholars labour in a comradeship for the training of men and the advancement and diffusion of knowledge. On this definition the Indian universites, in their first form, were no true universities."

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আশুতোষ যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য:—

(১) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রত্যক্ষ ভাবে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করণ।

(২) বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিষয়ান্তর্গত করণ।

(৩) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্য সমূহের ব্যুৎপত্তিতে উৎসাহ প্রদানার্থ Indian vernaculars নামক একটী বিষয় এম, এ পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করণ।

(৪) ভারতীয় ইতিহাসের চর্চ্চার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করণ।

(৫) বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত করণ।

(৬) জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির পাঠ্যের ব্যবস্থা করণ।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহার সম্যক্ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে আমাদের মধ্যে জাতীয়তার ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং যাহাতে শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয়ই আমরা দেশে বসিয়া শিখিতে পারি সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বিপুল কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যাহাতে অধ্যাপকগণ নিজের নিয়মিত কার্য্য সম্পাদনান্তর নিজ নিজ প্রিয় বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য সুযোগ ও অবকাশ পাইতে পারেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এবং যাহাতে এই সমস্ত অধ্যাপকের গবেষণার ফল বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইতে পারে তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে University Journal of Letters এবং University Journal of Science নামক দুইখানি পত্রিকা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত বন্দোবস্তের ফলে দেশে ও বিদেশে একাধিক বিদ্বৎসভা প্রচারিত পত্রিকাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের লিখিত অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত পত্রিকা গুলিরও অনেক সংখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত আছে, সেই সমস্ত স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সাময়িক পত্রিকা বা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং সেই সমস্ত গ্রন্থে তৎ তৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কার্য্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আশুতোষ বুঝিয়াছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের কার্য্য দুই প্রকার। কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিমত সাধারণে প্রচারিত হইয়াছে সেই সমস্ত অভিমত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছাত্রদিগকে জানান অধ্যাপকদিগের প্রথম কার্য্য। কিন্তু তাঁহারা যে কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা সম্যক্ ভাবে পালন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে মৌলিক গবেষণা দ্বারা নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে হইবে, নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বাধীনভাবে জ্ঞানের অনুশীলন করিবার জন্য শিষ্যদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং নিজেদের ও শিষ্যদের আবিষ্কারের ফল সুধী-সমাজে প্রচার করিতে হইবে। ভারতবর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও আজকাল অধ্যাপকগণ গবেষণাতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান যে অধ্যাপকদের দৈনন্দিন কার্য্যান্তর্গত হওয়া বিধেয় সে ধারণা বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ মধ্যে বাঙ্গালা দেশেই সর্ব্বপ্রথমে আশুতোষ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, এবং এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ নিজ অধ্যাপক লিখিত সন্দর্ভাবলী প্রকাশিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নাই। দৈনন্দিন কার্য্য পরিসমাপ্তির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগকে নিজ নিজ কার্য্য করিবার জন্য যে যথেষ্ট সুবিধা ও অবকাশ দেওয়া হইত, তাহার বিরুদ্ধে এক সময়ে দেশে কিছু কিছু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিছুদিন হইল অধ্যাপক রামণ যে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিজ্ঞান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহার মূলে আশুতোষ। স্বাধীনভাবে জ্ঞানানুশীলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অগ্রগামী তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, এবং ইহা যে আশুতোষের অতুলনীয় কল্পনা ও কর্ম্মশক্তির ফল তাহাও সর্ব্ববাদীসম্মত। দৃষ্টান্তস্বরূপ Englishman ও Times of India পত্রের সম্পাদকীয় উক্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

Englishman পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে :—

"...It is chiefly due to him and his passion for pure learning, not as a means to an end, but as an end in itself, that the Calcutta University has a world wide reputation in certain branches of knowledge."

Times of India নামক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে—

"The result has been that Calcutta now leads in the university world. Much of the research done at Calcutta has been of real value and added to the inter-national reputation of India for culture, and the staff of the Calcutta University is the envy of universities in other parts of India."

আশুতোষের জীবদ্দশাতে যে শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি অনেক বার তাঁহার কার্য্যের ও কার্য্যপদ্ধতির অতি তীব্র সমালোচনা করিতেন, তিনিও বর্ত্তমান জুন মাসের Modern Reviewতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

"For the facts that the Calcutta University is the first and foremost teaching university in India, that it teaches more students in more subjects than any other Indian university, that in many sciences and arts it has turned out a laudable amount of genuine research, the chief credit is due to the man who has served it longer and with greater devotion as a senator a syndic and a vice-chanceller than any other person."

যাঁহারা এই পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকের ও জগতের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা প্রথম হইতেই নিজ সম্মুখে একটী আদর্শ স্থাপন করেন, এবং সমস্ত জীবন সেই আদর্শকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

আশুতোষের জীবনী আলোচনা করিলে এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে তিনি সর্ব্ব প্রথমে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কি নীতি অবলম্বন করিবেন সে বিষয়ে তাঁহার আদর্শ সুস্পষ্ট ছিল, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সেই আদর্শই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। বেশবিন্যাস প্রভৃতি বাহ্যচাকচিক্যে মুগ্ধ না হইয়া প্রাচীন কালের হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই কর্ত্তব্য,এই আদর্শও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার-রূপে উপাধি বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা কালে আমাদের দেশের ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। মাতৃভাষার যথেষ্ট অনুশীলন যে আমাদের দেশে হইতেছে না, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারকরণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও তিনি এই সময়ে স্বীয় জলদগম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"There is only one other point in connection with the new Regulations to which it is my duty to invite your attention. I mean the Regulations which deal with the appointment of University Professors, Readers and Lecturers...These Regulations indicate that the University is no longer to be a merely examining body with power to grant degrees ; it is not even to be merely a federation of Colleges ; it is to be there and a great deal more. It is ultimately to be a centre for the cultivation and advancement of knowledge. This is unquestionably a true ideal of a university, and the realisation of this stimulating ideal, though it may be attended with difficulties, is imperative and is by no means impracticable. Among the brightest signs of a vigorous university, is zeal for the advancement of learning and the true function of a university is not merely the distribution of knowledge but also its acquisition and conservation. Every Professor must be a student, and every advanced student must be animated by a higher ideal than mere absorption of knowledge.

"Graduates of today...Do not hesitate to own at all times that you are genuine Indians, and do not fail to rise above the petty vanities of dress and taste. Above all sedulously cultivate your vernaculars, for it is through the medium of the vernaculars alone that you can hope to reach the masses of your countrymen and communicate to them the treasures that you gather from the field of European learning...you ought to be the trusted interpretors of the West to the East and of the East to the West."

সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান, ও ইতিহাসের প্রথম উপাধি পরীক্ষার পরবর্ত্তী অন্য সমস্ত উপাধিপ্রার্থী ছাত্রগণের অধ্যাপনার ভার বিশ্ববিদ্যালয় নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজসরকার যে বিধিদ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এই সমস্ত বিষয়ের উচ্চতর শিক্ষার ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়াছেন, যে বিধির ফলে কলিকাতাতে কোন কলেজ পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছেন সেই বিষয়ের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে থাকেন, এবং আশুতোষের বক্তৃতা পাঠে মনে হয় যে ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষা যে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রদত্ত হইবে, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সেইরূপ অভিপ্রায় ছিলনা, এবং সেই হেতু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উপাধি বিতরণ সভাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে :—

"We do not dream of establishing for ourselves a monopoly of M. A. or research teaching. We shall welcome all sound competition : we feel ourselves free from the spirit of jealousy."

কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার প্রণালীর পরিবর্ত্তন যে বিশেষ আবশ্যক তাহা তিনি উক্ত সভাতেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রথম উপাধি পরীক্ষার পাঠ্য-পুস্তকাদি নির্দ্ধারণের ভার সেনেটের উপর থাকিলেই চলিতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি পরীক্ষা গুলিতে অর্থাৎ যে সমস্ত পরীক্ষাতে পাঠ্য-বিষয়াদি নির্দ্ধারণ ও ছাত্রদের কৃতকার্য্যতার পরীক্ষা প্রভৃতি কেবল মাত্র বিশেষজ্ঞগণ

যাহারা সম্ভবপর সেই সমস্ত পরীক্ষার যাবতীয় ভার শিক্ষক মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে—

"We may admit, I think, that the senate...may remain entrusted as hitherto with the function of determining the general courses of study to be followed in our colleges up to a certain standard, possibly the B. A. standard....On the other hand it is evident ...that all the arrangements as to the higher specialised courses of studies....should be left entirely and solely to those special experts, whom the University entrusts with the task of instruction in those subjects. The University Professor of Mathematics, to take one illustration only, and his helpers i. e. all the M. A. Lecturers in Mathematics will, under this system, ex-officio determine the higher courses, text books, and methods of examination in Mathematics."

এই সময়ে প্রধানতঃ বিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে এই উচ্চতর শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। এই উচ্চতর শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং Sadler Comissionএর মতে—

"The position grew acute when both the University and the Presidency College repeatedly made insistent demands, the one upon the Government of India, the other upon the Government of Bengal, for funds for the promotion of higher training."

ইহার ফলে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভারত রাজসরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য নয়জন সদস্যক লইয়া এক সমিতি গঠন করেন, এবং সভাপতি আশুতোষ ব্যতিরেকে, মিষ্টর হর্নেল, মৃত স্যার হেনরি হেভেন, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার Howells, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক Hamilton মিঃ Wordsworth এবং মিঃ Anderson এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যাহাতে কলিকাতায় শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষকদের সাহায্যে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে কলিকাতাতে Post-Graduate শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেই সম্বন্ধে রাজসরকারকে উপদেশ দিবার জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর এই সমিতি গঠিত হইয়াছিল, এবং সেই বৎসরের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে এই সমিতি স্বীয় মন্তব্য দাখিল করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভাতে এই সমিতির মন্তব্য সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল, এবং পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট কর্ত্তৃক এই সমিতির মন্তব্য গুলি আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে রাজসরকার সেনেট কর্ত্তৃক গৃহীত মন্তব্য গুলি বিধিবদ্ধ করেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহার সূত্রপাত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিতেছে কিনা তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে যথেষ্ট মতভেদ ছিল, কিন্তু আশুতোষের মৃত্যুর পর তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকাদিতে ও সভা সমিতিতে যে সমস্ত উক্তি করা হইতেছে তাহাতে মনে হয় যেন দেশবাসী তাঁহার কার্য্যের যথার্থ মূল্য ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে। যে সমস্ত কলেজ উচ্চতর শিক্ষাপ্রদানের অধিকার হইইতে বঞ্চিত হইয়াছে সাধারণের চক্ষে সে সমস্ত বিদ্যালয়ের সম্মানের কিঞ্চিৎ হানি হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষার প্রচার কিরূপ হইয়াছে তাহার মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে এই নব প্রথাতে যে দেশ ও সমাজ সমধিক লাভবান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। এমন কি ভারতবর্ষের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আশুতোষের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী B.A.ও B. Sc. Honours পরীক্ষাতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নব প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালীর দুইটী বিশেষত্ব। এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীগণ নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের নিকট হইতে শিক্ষা পাইতে পারেন এবং কোন বিশেষ বিষয়ে অনেক শিক্ষক থাকাতে শিক্ষকগণের প্রত্যেকেই সেই বিষয়ের কোন এক বিভাগে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিতে, নিজের সেই বিভাগ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে এবং শিষ্যদিগকে সত্যানুসন্ধানে উৎসাহিত করিতে পারেন। ইহা ছাড়া এই শিক্ষা প্রণালীর আর একটী বিশেষত্ব আছে। যাহারা শিক্ষক, এই প্রথার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে শিক্ষার পদ্ধতি বিধানের উপর তাহদের কোনও হাত ছিল না, এবং Sadler Commissionএর মতে—

"The Post-Graduate system, for the first time in the history of the University, recognised and gave

effect to the principle that these teachers were entitled, as of right, to be associated in the management of the teaching arrangements."

এই প্রসঙ্গে কমিশন আরও বলিয়াছেন যে—

"It is clear that the Post-Graduate scheme gives us valuable recognition to what...must be deemed, the fundamental principle namely, that each student no matter to what College he is attached, is entitled to have the advantage, of the most helpful teaching given in the best educational institutions of this city."

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

দারার দুরদৃষ্ট

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে মুহূর্ত্তে দারা ধৃত হইয়াছেন তখনই তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার জীবনলীলা কিরূপে শেষ হইবে। তথাপি তাঁহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে নির্ব্বাপিতপ্রায় আশা-প্রদীপের ক্ষীণালোক মৃদুমন্দ ভাবে জ্বলিতেছিল,—বুঝি ঔরঙ্গজীব জ্যেষ্ঠের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেও, শাজাহান বাদশাহের অনুগৃহীত প্রাচীন ওমরাহগণ সে নৃশংস হত্যার আদেশের প্রতিবাদ করিবেন, অন্ততঃ অন্তঃপুরের রমণীবৃন্দ তাঁহাদের স্বভাব-সুলভ করুণার বশবর্ত্তিনী হইয়া অমানুষিক ভ্রাতৃহত্যা সংঘটিত হইতে দিবেন না। যাহা হইবার নহে তাহাই হইবে, দীন দরিদ্র রাজরাজেশ্বর হইবে, যে চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে তাহাকে পুনরায় পাইব, এইরূপ প্রলোভনে আশা যদি আমাদিগকে প্রলুব্ধ না করিত তাহা হইলে ক্ষয় ক্ষতি, ব্যথা বেদনাময় সংসারে মানুষ কয়দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত? দারা জানিতেন, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই ঔরঙ্গজীবের সহিত তাঁহার শত্রুতা চলিয়া আসিতেছে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে, সেই ঔরঙ্গজীব আজ তাঁহাকে একান্ত কবলগত করিয়াছে; সুযোগ পাইলে রণক্ষেত্রেই তাঁহাকে বধ করিত, তাহা হয় নাই, আজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াও হয়ত বা হত্যা করিবে না। দারার এ আশা নিতান্তই দুরাশা। তথাপি আশা না করিয়া মানুষ কি পারে?

যে দিবস দারাকে কারারুদ্ধ করা হইল, সেই দিন সন্ধ্যাকালে দেওয়ান খাসে ঔরঙ্গজীব বাদশাহের দরবার বসিল। আমীর ওমরাহ, মন্ত্রী সেনাপতি, কাজি হাকিমে বৃহৎ দরবার গৃহ পরিপূর্ণ। দিল্লীশ্বর, জগদীশ্বরের ন্যায়, দারার অদৃষ্ট নিয়মিত করিবার জন্য ময়ূর সিংহাসনে সমুপবিষ্ট। দেওয়ান খাসের জাফরীর অন্তরালে অবরোধ-বাসিনী নারীবৃন্দ বিচারের ব্যাপার দেখিবার জন্য সমাগত। সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন তাহার বিচার নহে, বক-ধার্ম্মিক ঔরঙ্গজীবের মতে, দারা মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী, সেরূপ লোক জীবিত থাকিলে ভারতে মুসলমান ধর্ম্ম লুপ্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং ধর্ম্ম-প্রবক্তা কাজীগণের দারার সম্বন্ধে অভিপ্রায় জানিবার জন্য এই বিচার-সভা বসিয়াছে। দারা সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সমদৃষ্টিতে দেখিতেন, হিন্দুর প্রতি অত্যাচার না করিয়া হিন্দুর অমূল্য উপনিষদের অনুবাদ করাইয়া, মুসলমান শাস্ত্র পুষ্ট করাইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অপরাধ এবং সেইজন্য তিনি ধর্ম্মধ্বজী ঔরঙ্গজীব এবং তাঁহার অন্নপুষ্ট কাজী ও অপরাপর অনুগত জনের চক্ষে মুসলমান ধর্ম্মের শত্রু। এতাদৃশ গর্হিত অপরাধের বিচার

না করিয়া ধর্ম্মরক্ষক ঔরঙ্গজীব কি স্থির থাকিতে পারেন ?

বস্তুতঃ রণপ্রত্যাগত বিজয়ী দারা, সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়া রাজদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদের হত্যাকারী ঔরঙ্গজীবের যদি বিচার করিতে পারিতেন তাহা হইলেই ন্যায় ও ধর্ম্ম বজায় থাকিত। কিন্তু অখিল ধরিত্রী, বামনরূপী ভগবানকে দান করিয়া বলিরাজার রসাতল বাস ব্যবস্থা হইয়াছিল, আর অঞ্জলি পরিমিত শক্তুদান করিয়া ব্রাহ্মণ অব্যয় স্বর্গ লাভ করিয়াছিল; আবাল্য অসতী কুন্তী অমরপুর-বাসিনী; অথচ পতিদেবতা জানকীর শেষ ব্যবস্থা পাতাল প্রবেশ। সেইজন্যই কবি বলিয়াছেন "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।" সত্য সত্যই ধর্ম্মের গতি যদি বিচিত্র না হইত তাহা হইলে পুঞ্জ পুঞ্জ পাপাচরণ করিয়া পাষণ্ড ঔরঙ্গজীব নিরুদ্বেগে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর-রূপে ময়ূর সিংহাসনে বিরাজ করিতে পারিত কি ? হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী এবং সোমনাথ হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বিশাল ভারতের হিন্দু মুসলমান প্রজা-পুঞ্জ এবং সর্ব্ববিধ সামন্ত নরপালবর্গ, নারকী নরপতি আলমগীরের পাপাচরণ অবিচলিত চিত্তে অবলোকন করিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সকলেই যেন প্রাণহীন কাষ্ঠপুত্তলিকা, রাক্ষসের রাক্ষসী লীলার প্রতিরোধ করে কেহই কিছু কহিতে বা করিতে পারিল না, ইহাও এক বিচিত্র ব্যাপার !

বিচার সভার কেবল মাত্র বৃদ্ধ দানেশমন্দ খাঁ দারার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন এবং যাহাতে সেই চরম দণ্ডের ব্যবস্থা না হয়, সেজন্য ঔরঙ্গজীবের সিংহাসনের পাদপীঠতলে নতজানু হইয়া বারবার আবেদন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর সেনাপতি ও মন্ত্রিগণ, বিচার বিভাগের ন্যায়াধীশ কাজীবর্গ সকলেই দারার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থার পক্ষপাতী, তন্মধ্যে মাতুল শায়েস্তা খাঁ, যিনি "আমীর-উল্ ওমরাহ" উপাধিতে ভূষিত, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উদ্যোগী। দারা জীবিত থাকিলে সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইবে না, ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, এবং যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ঔরঙ্গজীব ফকিরি গ্রহণ এবং পুণ্যধাম মক্কায় যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন সেই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনেও ব্যাঘাত হইবে, ইহাই ছিল শায়েস্তার প্রবল যুক্তি !

গীয়াস বেগের পৌত্র, আসফের পুত্র, মমতাজমহলের ভ্রাতা শায়েস্তা—দারা, ঔরঙ্গজীব প্রভৃতি সকলেরই মাতুল; সময়ক্ষেত্রে মাতুল এবং ভাগিনেয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে হইয়াছেও, এমন কি সময় সময়ের উত্তপ্ত শোণিত বেগে একজন অপরকে বধ করাও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু রণ-কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, সমরোন্মত্ততা বিদূরিত হইয়া গেলে, সভাতলে বসিয়া যুক্তি পূর্ব্বক ভাগিনেয়ের মৃত্যু ব্যবস্থার জন্য ব্যগ্র হওয়া নিতান্তই নৃশংস ব্যাপার এবং পৈশাচিক প্রবৃত্তির পরিচায়ক। "নরানাং মাতুলক্রমঃ" কথাটা মিথ্যা নহে, বুঝি এই শায়েস্তা খাঁর প্রকৃতি বহু পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়ায় ঔরঙ্গজীব এত বড় নিষ্ঠুর এবং পাপাচারী হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষাও বিচিত্র ব্যাপার দারার বধ ব্যবস্থার জন্য ভগিনী রোসেনারার বিপুল ব্যগ্রতা! চিরাচরিত মুসলমান অবরোধ প্রথার অবমাননা করিয়া রোসেনারা অন্তঃ-পুর হইতে দেওয়ান খাসের দরবার উপস্থিত হইল এবং দারার বধ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের জন্য ঔরঙ্গজীবকে বারম্বার উত্তেজিত করিতে লাগিল। দানেশমন্দ এবং শায়েস্তাখাঁর বাদ প্রতিবাদে যখন অনেকের চিত্তই দোলায়মান, সেই পরম মুহূর্ত্তে রোসেনারার নির্ব্বন্ধাতি-শয্যে, যাহারা বধ দণ্ডের বিরোধী ছিল তাহাদেরও মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—হইবারই কথা, কেননা ভারতেশ্বর সম্রাটের প্রীতির জন্য তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা মত প্রকাশ না করে এমন আমীর ওমরাহ, মন্ত্রী মনসবদার, কাজী মোল্লা কেহই ছিল না। সাম্রাজ্যের সকলেই জানিত ঔরঙ্গজীবের অভিপ্রায় কি—দারার কিরূপ দণ্ড তাঁহার অভিলষিত; কপটী

ঔরঙ্গজীব যে স্বয়ং নীরব থাকিয়া অপর সকলের দ্বারা দারার বধের ব্যবস্থা করাইবার জন্য উৎকন্ঠিত ছিলেন ইহা কাহারই অবিদিত ছিল না। সুতরাং সেরূপ ক্ষেত্রে ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাপত্র, তাঁহার অন্নদাস মোল্লাগণের নিকট হইতে পাওয়া, আলমগীর বাদশাহের পক্ষে অতি সহজসাধ্য ব্যাপার।

রোসেনারা নারী হইয়া, ভগিনী হইয়া, ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার জন্য যেরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখাইয়াছিলেন এবং যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন সে সমুদয়ও হয়ত ঔরঙ্গজীবেরই শিক্ষা; কিংবা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া ঔরঙ্গজীবের অভিলাষানুযায়ী মত দেওয়াও রোসেনারার পক্ষে অসম্ভব নহে। দিল্লীর বাদশাহের অন্তঃপুরে নারীগণের মধ্যে একজন "বাদশাবেগম" উপাধি পাইয়া রঙ্গমহলের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া থাকিতেন। শাজাহানের সময়ে মমতাজের মৃত্যুর পরে জাহানারা সেই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুগামিনী হইলে সেই গৌরবময় পদবী লাভ করা যাইতে পারিবে, সেই জন্য রোসেনারা ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক আগ্রা দুর্গ অবরোধের সময় হইতেই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, এমন কি পিতা শাজাহানের বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে দ্বিধা করেন নাই। আজিও সেই স্বার্থের প্রলোভনে ঔরঙ্গজীবের প্রীতির জন্য দারার মৃত্যু কামনা করা এই দুষ্টা নারীর পক্ষে অসম্ভব নহে।

ফলতঃ ঔরঙ্গজীবের যাহা অভিপ্রেত তাহাই হইল। দরবারের আমীর ওম্‌রাহ, কাজী মোল্লা সকলে একবাক্যে দারার বধদণ্ডের ব্যবস্থাই সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। রোসেনারার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, ক্রুরকর্ম্মা ঔরঙ্গজীব কৃতকৃতার্থ হইলেন; দারার জীবন রক্ষার্থ বৃদ্ধ দানেশমন্দের সকাতর প্রার্থনা পাপাত্মার অন্তরকে স্পর্শও করিতে পারিল না। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ যিনি অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের যথার্থ অধিকারী, দুই দণ্ডের দরবারে তাঁহার বধের ব্যবস্থা স্থির হইয়া গেল। অপরাধ এই যে তিনি পাষণ্ড ভণ্ড ঔরঙ্গজীব এবং তাঁহার অন্নপুষ্ট শায়েস্তা খাঁ ও কাজীগণের বিবেচনায় গোঁড়া মুসলমান নহেন,—কেন না তিনি সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন, অপরের সাহিত্যে, দর্শনে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা উপাদেয় পাইয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিয়া মুসলমান শাস্ত্র পুষ্ট করিয়াছেন, অপর ধর্ম্মাবলম্বীর উপর কোন প্রকার অত্যাচার কখনও করেন নাই।

এই দারার জন্মের পরে স্ফুটকুসুমকান্তি শিশুসহ সস্ত্রীক শাজাহান সাধু মুসলমান ফকিরের আশীর্ব্বাদ লাভার্থ বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন; সাধু ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা শিশুর সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহার সর্ব্ব অমঙ্গল বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবৎ পদারবিন্দে সমাহিত চিত্ত সন্ন্যাসীর শুভাশীর্ব্বাদ লাভ যাহার জন্মের অনতিকাল পরেই ঘটিয়াছিল, যাহার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ পিতৃস্নেহের নিবিড় বেষ্টনের মধ্যে পরমানন্দে কাটিয়া গিয়াছে, সিংহাসনাধিরোহণের সময় যাহার সমাগতপ্রায়, তক্তে তাউস্ যাহার স্পর্শ লাভার্থ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছে, জীবনের সেই পরম মুহূর্ত্তে স্বার্থপর শোণিত পিপাসু ভ্রাতার আজ্ঞায় ঘাতকের খড়্গাঘাতে দারার জীবনান্তের ব্যবস্থা বিধিকৃত কি নির্ম্মম ললাটলিপি! রাজ্যলোভে এবং ধর্ম্ম ও প্রেমের নামে সংসারে বহু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে কিন্তু দারা এবং তদীয় পুত্রদ্বয়ের শোচনীয় মৃত্যুর ন্যায় হৃদয়-বিদারী ব্যাপার ইতিহাস খুঁজিলে দোসর মিলিবে কি না আমি জানি না।

বিচারের অব্যবহিত পরেই ঔরঙ্গজীব দারার বধের আজ্ঞা প্রচার করেন নাই; বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল কাজী ও মোল্লাগণের অভিমত দিল্লীতে প্রচারিত হইলে দিল্লীবাসী প্রজাপুঞ্জ তাহা কি ভাবে গ্রহণ করে এবং তাহারা সেই নিদারুণ বার্ত্তা শুনিয়া কিরূপ আচরণ করে তাহাই দেখিয়া তিনি ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করিবেন। ইহার মধ্যে একটী ঘটনা ঘটিয়া গেল এবং সেই ঘটনার জন্য, যদি বা দারার বধ-ব্যাপার দুই চারি দিবস পরে

ঘটিত, তাহা হইল না, সেই ঘটনা হতভাগ্য রাজকুমারের মৃত্যুকে অগ্রসর করিয়া আনিল। সে ঘটনাটি এই—কৃতঘ্ন আফগান মালিক জিউয়ান, দারাকে বাহাদুর খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং বাদশাহের প্রসাদ লাভের জন্য শাহী সৈন্যের সঙ্গেই রাজধানী দিল্লী নগরীতে আসিয়াছিল। কৃতঘ্ন নরপিশাচের সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ বাদশাহ তাঁহাকে নানা ধনরত্ন উপহার দিয়া মনসবদারের গৌরবময় পদবীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। অকৃতজ্ঞ নরাধম জিউয়ান এই সদ্যপ্রাপ্ত সম্মানের আনন্দে উল্লাসিত হইয়া, তাহার আফগান অনুচরবর্গ সহ যখন দরবার হইতে স্বীয় বাসভবনে ফিরিতেছিল, তখন দিল্লীর ক্রুদ্ধ জনসাধারণ পাষণ্ডের মূর্ত্তি দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারে নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রথমে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং নগরীর গৃহশীর্ষ হইতে নারীগণ আবর্জ্জনাপূর্ণ মৃদ্‌ভাণ্ড পাপিষ্ঠের মস্তকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। গন্তব্যপথে জিউয়ান যতই অগ্রসর হইতেছিল, ক্রুদ্ধ নাগরিকের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; প্রথমে প্রস্তর খণ্ড তৎপর বংশদণ্ড, অবশেষে তেগা, তলোয়ার, বর্শা, পাটা ছোরা ছুরি যাহার যাহা ছিল, তাহাই লইয়া সকলে জিউয়ান ও তাহার অনুচরবর্গকে আক্রমণ করিল; জিউয়ানের সমভিব্যাহারী আফগান সৈন্যগণ যথাশক্তি প্রভুর রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই হাঙ্গামায় অসি ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতে আহত হইয়া বহু আফগান মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং জিউয়ানের প্রস্তর ও অস্ত্রাঘাতে প্রায় প্রাণান্ত হইবার উপক্রম। সহর কোতোয়াল সংবাদ পাইয়া, নগর রক্ষার্থ যে সকল সৈন্য অষ্টপ্রহর প্রস্তুত থাকে, তাহা লইয়া জিউয়ানের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং বহু চেষ্টায় বহুক্ষণ পরে ক্রুদ্ধ নাগরিকগণের হস্ত হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। নারীহস্ত নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনার মৃন্ময় ভাজনের আঘাত হইতে জিউয়ানের মস্তক দেহ বাঁচাইবার জন্য কোতোয়াল সাহেবকে অনেকগুলি ঢাল একত্র করতঃ একটি আচ্ছাদন প্রস্তুত করাইয়া তাহার নিম্নে তাহাকে লুকাইয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। উপযুক্ত সময়ে ফৌজসহ কোতোয়াল সাহেব উপস্থিত না হইলে সেই দিনই দিল্লীবাসীর হস্তে লগুড়াঘাতে মালিক জিউয়ানকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পাপের সমুচিত প্রতিফল গ্রহণ করিতে হইত এবং সেইদিনই যমদূত তাহার দেহ-বিযুক্ত পাপমলিন আত্মাকে অনন্ত কালের জন্য নরকের জ্বালাময় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিত।

ক্রুদ্ধ নগরবাসী-জনের এই আচরণের কথা যথাসময়ে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের নিকট বিজ্ঞাপিত হইলে তিনি জিউয়ানকে অবিলম্বে দিল্লী ত্যাগ করিয়া তাহার ভারত সীমান্ত সন্নিহিত পার্ব্বত্য ভবনে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদেশ দিলেন। জিউয়ানও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাত্রির অন্ধকারের আবরণে বাদশাহের সৈন্য পরিবৃত হইয়া দিল্লী নগরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। জনপ্রিয় দারার প্রতি স্নেহশীল নগরবাসী কখন্ কোন বিপদ ঘটাইয়া ফেলে, কোন মুহূর্ত্তে কারাগার ভগ্ন করিয়া দারাকে মুক্ত করিয়া দেয় এই আশঙ্কায় ঔরঙ্গজীব দারার হত্যাকার্য্য আর স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া স্থির করিলেন।

খাওয়াসপুরার প্রহরী পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত প্রাসাদে দারা এবং সিপারকে ঔরঙ্গজীব অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দারা মুরাদের ন্যায় পলায়নের উদ্যম পর্য্যন্ত না করিতে পারেন এই জন্য যত প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা যাইতে পারে, পূর্ব্ব হইতেই ঔরঙ্গজীব তাহা করিয়াছিলেন। বৎসরাধিক কালের নানাবিধ ক্লেশে ক্লিষ্টকায়, সমরে অক্লান্ত এবং প্রিয়বিয়োগবিহ্বল দারার অন্তরে পলায়নের ইচ্ছা কোন দিনই উদয় হয় নাই; ধরমতের ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ রণ পরাভব, জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমানের নিরুদ্দেশ, প্রিয়তমা পত্নীর পথপ্রান্তে শোচনীয় মৃত্যু এবং জীবিত-দান-প্রাপ্ত জিউয়ানের কৃতঘ্নতা, এই সকল গুলি একত্র হইয়া দারার অন্তরে একান্ত ঔদাসীন্যের

সঞ্চার করিয়াছিল। সেরূপ অবস্থায় নিষাদ-শর-সন্ত্রাসিত কুরঙ্গের ন্যায় ঔরঙ্গজীবের অনুচরগণ কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়নের ক্লেশ ও লাঞ্ছনা পুনরায় স্বীকার করিবার ইচ্ছা কি তাঁহার হইতে পারে? ইহজীবনের সুখ দুঃখ সমস্তই তিনি দেখিলেন, জীবন ভরা সুখ এবং এই এক বৎসরের দুঃখ রাশি তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিলে দুঃখের দিকটাই গুরু হইয়া ভূমিস্পর্শ করিবে সন্দেহ নাই। সেরূপ ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজীবের হস্ত হইতে পলায়ন দ্বারা পরিত্রাণ লাভের কামনা তাঁহার হইতেই পারে না। তবে লোকলজ্জা এবং সাম্রাজ্যের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিরাগের ভয়ে অগ্রজের হত্যাব্যাপার হইতে ঔরঙ্গজীব বিরত হইতেও পারে, এই ক্ষীণ আশাটুকু হয়ত তাঁহার অন্তরে কখন কখন উদিত হইয়া থাকিবে। তাঁহার নিজের জন্ম নহে, চতুর্দ্দশবর্ষীয় মাতৃহীন কিশোর সিপারের চিন্তা তাঁহাকে নিয়ত কাতর করিয়াছে সন্দেহ নাই; এবং সেই সিপারের মুখ চাহিয়াই তাঁহার বাঁচিবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং হওয়াও নিতান্তই স্বাভাবিক।

প্রাসাদ কারার পিতা পুত্রকে ঔরঙ্গজীব একত্রে রাখিয়াছিলেন। দারা এবং সিপারের সংক্ষিপ্ত বন্দী জীবনের সেইটুকুই একমাত্র সুখ আনন্দ আরাম যাহা কিছু সমস্তই। বাদশাহ ইচ্ছা করিলে, দুইজনকে পৃথক স্থানে রাখিতে পারিতেন, তাহা করিলে পিতাপুত্র, কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিল না জানিতে পারিয়া, জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাইতেন। ঔরঙ্গজীবের ন্যায় পর-পীড়ক, নৃশংস, নররাক্ষস এই অনুগ্রহটুকু কেন করিয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন! যে ব্যক্তি মৃদু বিষ প্রয়োগে বালক ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ধীরে ধীরে জীবন নাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, প্রদেশাধিপতি নরপতির জীবিতাবস্থায় জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া উল্লাসিত হইয়া উঠে, সে যাহাকে চির শত্রু মনে করিয়াছে, সেই দারাকে পুত্রের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পৈশাচিক আনন্দ ভোগ হইতে নিজকে বঞ্চিত কেন করিল বুঝিতে পারা কঠিন; সম্ভবতঃ কোন নিষ্ঠুরতর অভিপ্রায় ছিল, যাহা খাফিখাঁ প্রমুখ স্তাবক রাজ-ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিতে শঙ্কিত হইয়াছে, সেই জন্য আমরা আজ তাহা জানিতে পারিতেছি না।

দিল্লীর পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক যে দিন মালেক জিউয়ানের নির্য্যাতন শেষ হইল, সেইদিনই রাক্ষস প্রকৃতি নররক্ত-লোলুপ নজরবেগের উপর অবিলম্বে দারাকে হত্যা করিবার আদেশ ঔরঙ্গজীব প্রচার করিলেন। আদেশ পাইবামাত্র পৈশাচিক হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নৃশংস ঘাতক নজরবেগ, তাহার হত্যাকার্য্যের সহকারী, সমপ্রকৃতির অপরাপর জল্লাদগণ সহ যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত প্রস্তুত হইতে লাগিল, যেন রাজকুমার দারার সহিত পাষণ্ডের কতকালের জাতক্রোধ শত্রুতা, আজ সেই শত্রুতা নির্য্যাতনের মাহেন্দ্রমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত! "যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণবাহনম্!" ঔরঙ্গজীবের অনুচর সহচর তাহারই অনুরূপ না হইবে কেন? রোসেনারা, শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি সকলে স্বার্থের জন্য দারার প্রাণদণ্ডের পক্ষপাতী ছিল একথা বুঝা যায়, কিন্তু দারার রক্তদর্শনের জন্য নজরবেগের এই অমা-নুষিক ঔৎসুক্য যথার্থই অবোধ্য।

পাষণ্ডের প্রস্তুত হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। আদেশ প্রাপ্তির ক্ষণপরেই সানুচর নজর সশস্ত্র হইয়া দারার কারাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহাদের মূর্ত্তি দেখিয়াই দারার বুঝিতে বাকী রহিল না যে তাহারা কি উদ্দেশ্যে তথায় গিয়াছে। নরশোণিত-তৃষ্ণা ইহাদের নয়নে বদনে অঙ্কিত, হস্তে তীক্ষ্ণধার উলঙ্গ কৃপাণ; সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় ইহারা হতভাগ্য পিতাপুত্রের সম্মুখে সমুপস্থিত। সুপ্তোত্থিত সিপার জল্লাদগণের ভীম মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে চীৎকার করিতে করিতে, বালকের চিরনির্ভর পিতার স্নেহবক্ষের উপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। হতভাগ্য পিতা প্রাণপণে পুত্রকে নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, হস্ত দ্বারা তাহার নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত করিলেন এবং কম্পমান সন্ত্রস্ত

শিশুকে আশ্বস্ত করিবার জন্ত ভগ্ন কণ্ঠে "ভয় নাই ভয় নাই" বলিতে লাগিলেন।

মুখের আশ্বাস বাণী শুনিয়া সিপার আশ্বস্ত হইবে কেন? কারাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া কোষমুক্ত কৃপাণ হস্তে ঘাতকগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই নরঘাতী, পশুপ্রকৃতি জল্লাদগণের হস্ত হইতে তাহাকে এবং তাহার পিতাকে রক্ষা করিবার সামান্য চেষ্টাটুকু পর্য্যন্ত করিতে পারে, এমন একটি প্রাণীও বিশাল বিশ্বে আজ নাই। পিতা পুত্র উভয়েই নিরস্ত্র। এমন নিঃসহায় অবস্থায় পিতা যে "ভয় নাই" "ভয় নাই" বলিতেছেন, সে বরঞ্চ যে ভয়বিহ্বল বিপন্ন ব্যক্তির কণ্ঠনিঃসৃত চেষ্টাবিহীন ব্যাকুল শব্দ মাত্র, উহার যে সার্থকতা কিছুই নাই তাহা বুঝিতে সিপারের বাকী ছিল না, তাই সে আশ্বস্ত হইতে পারিল না। বাত-সঞ্চালিত বংশপত্রের ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল; পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সহায়হীন নিরুপায় দারাও থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন এবং অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠের বিকৃত স্বরে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—"তোমরা কি চাও, কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ?"

ভারতের একাতপত্র প্রভুত্ব যাঁহার উত্তরাধিকার, অতি অল্পকাল পূর্ব্বেও যাঁহার আদেশ, দেবাদেশের ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইত, যাঁহার ইচ্ছা পরিপূরণের জন্ত দুইদিবস পূর্ব্বেও ভারতের কোটি কোটি নরনারী প্রাণপাত করিত, আজ সেই দারার, শাহানশাহ বাদশাহ শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার কি দুর্গতি!—নীচ ঘাতকের ভয়ে তিনি কম্পিত কলেবর!

নজরবেগের ন্যায় পাষাণহৃদয় পাপিষ্ঠও দারাকে বলিতে পারিল না যে, কি উদ্দেশ্যে সে কারাগারে আসিয়াছে। বাদশাহের আদেশে সিপারকে পৃথক প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতে হইবে, ঔরঙ্গজীব বাদশাহ দুইজনকে একস্থানে রাখিবেন না, এই মিথ্যা কথা তাহাকেও রচনা করিতে হইল। ঘাতকের জিহ্বা যে বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, সেই কার্য্য করিবার আদেশ-বাণী ঔরঙ্গজীবের কণ্ঠ হইতে কেমন করিয়া বাহির হইয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! পাপ-চিন্তা এবং নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে করিতে দুরাত্মা ঔরঙ্গজীবের হৃদয় হইতে কোমলতা একেবারে তিরো-হইয়া গিয়াছিল, এবং তুলনায় দেখা যাইতেছে, রাজাদেশে হত্যায় নিয়োজিত ঘাতক অপেক্ষাও সে অধম, অরণ্যচারী ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডার অপেক্ষাও হিংস্র, বিবর-বাসী সর্প অপেক্ষাও ক্রূর।

পিতা এবং পুত্রকে চিরবিচ্ছিন্ন করা হইবে, ইহার অর্থ কি তাহা দারার বুঝিতে বাকি রহিল না। নজরের পাদমূলে দারা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় নিপতিত হইয়া গলদশ্রু নেত্রে, তাহাদিগকে একত্র রাখিবার জন্ত কাতর-প্রার্থনা, বারম্বার জানাইতে লাগিলেন এবং আসন্ন পিতৃবিচ্ছেদ ভয়ে কাতর বালক সিপার ভূলুণ্ঠিত মস্তকে, নজরের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কেবল অশ্রু-জলে বুক ভাসাইতে লাগিল, বালকের রুদ্ধকণ্ঠে প্রার্থনার একটি বাণীও বাহির হইতে পারিল না। কুলিশ-কঠোর নজর বেগ, ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় দারার নিকট রাজাদেশ স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারে নাই, কিন্তু স্বভাব-নিষ্ঠুর পাপাত্মার সে মোহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বজ্র গম্ভীর স্বরে সিপারকে উঠিতে আদেশ দিয়া সজোরে তাহার প্রকোষ্ঠ ধারণ করিল এবং তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া যাইবার জন্ত আসুরিক বল প্রয়োগ করিতে লাগিল। কি হৃদয় বিদারী এই দৃশ্য! দারার ধন জন, সম্পদ সম্ভ্রম, সমস্তই গিয়াছে, বল্লভতমা পত্নী পরলোকে, তাহার বিরহবেদনায় বৃশ্চিক দংশনে অহর্নিশ মরণের অধিক যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহার অভাবে অপ্রাপ্তবয়ঃ পুত্রের কি অবস্থা ঘটিবে সে চিন্তা মনে আসিতেও হৃৎকম্প হয়। তাহার উপরে মূর্ত্তিমান যমদূতরূপী ঘাতক আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। বক্ষলগ্ন, ভয়বিহ্বল, বালক পুত্রকে বল পূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিবার পর মুহূর্ত্তেই খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক স্কন্ধবিচ্যুত হইবে, এবং পরে সে পুত্রের দশাই বা কি হইবে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন।

রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দারার ন্যায় দুর্গতি আর কাহারও হইয়াছে কি না বলা কঠিন। অনুনয় বিনয়, অশ্রু, কাকুতি, পদপ্রান্তে পড়িয়া ধূলি-অবলুণ্ঠিত মস্তকে সকাতর প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা, কিছুতেই কিছু হইল না। পাষণ্ড নজর বেগ পাশব বল প্রয়োগ করিয়া দারার আলিঙ্গনবদ্ধ পুত্র সিপারকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল। তথা হইতে বালকের আর্ত্তরোদন-ধ্বনি মৃত্যু-পথ-যাত্রী পিতার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। হায়! মানুষ মানুষের প্রতি এতদূর নিষ্করুণ হইতে পারে ইহা দেখিলেও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। শুনিয়াছি মানবের হৃদ্‌মন্দিরে নারায়ণ বাস করেন। যে হৃদয়ে দেবতা অধিষ্ঠিত, তাহা এরূপ নিদারুণ ভাবে অকরুণ কেমন করিয়া হইতে পারে তাহা মানবের সসীম বুদ্ধির অতীত।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।



শিশু দারা সহ সাধুসমীপে সস্ত্রীক শাজাহান

গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ত্তীকালের মথুরা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)



মথুরায় প্রাপ্ত হরগৌরী মূর্ত্তি

গুপ্ত সম্রাটগণের শিল'-লেখা ও তাম্রশাসনাদি হইতে, ইঁহাদিগকে 'পরম ভাগবত' অর্থাৎ বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে সোডাস ও রঞ্জুবুলের পুত্র বৃষ সেন প্রভৃতি দুই একজন শক সত্রপও এইরূপ "পরম ভাগবত" ছিলেন। ইঁহাদের কথা পরে বলিব।

ভাগবতগণের মধ্যে অনেকের মুদ্রায়, "পদ্মস্থা পদ্মহস্তা চ গজোৎক্ষিপ্ত ঘটপ্লুতা"—দুই দিকে দুইটি হস্তী শুণ্ডে কলসী ধরিয়া, কমলোপরি উপবিষ্টা কমলহস্তা শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীকে অভিষেক করিতেছে, এইরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে। গুপ্ত সম্রাটেরা অনেকেই উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এবার আমরা মথুরায় গুপ্ত সম্রাটগণের কি কি নিদর্শন (Relic) পাওয়া গিয়াছে তাহাই বলিব। আওরঙ্গজেব (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) মথুরায় একটি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত তথাকার প্রধান দেবতা কেশবদেবের সুশোভন মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া, তাহারই ভিত্তির উপর একটী মস্‌জিদ নির্ম্ম ণ করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই টিলার উপর দ্বাপর যুগে কংসের কারাগার ছিল। তথায় দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ এই টিলার উপর জন্মকালীন আকারের অনুরূ প কেশব নামে একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেনারেল কানিংহাম সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সেই মসজিদের প্রাঙ্গনে ফটকের নিকট বসান গুপ্ত লিপি খোদিত একখানা পাষাণ ফলক আবিষ্কার করেন। * সেই পাষাণ ফলকখানা মাপে ১১"×১১" ইঞ্চি। ইহার গাত্রে শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচ গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত

* অশোক, কুশান, গুপ্ত ও পালরাজগণের খোদিত শিলালেখ এবং কতকগুলি প্রাচীন পুথি অনুশীলন ও আলোচনা করিয়া লিপিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অবধারণ করিয়াছেন যে, প্রায় ৩৪ শত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় লিপি বা অক্ষরের ছাঁদ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেবনাগর ও বাঙ্গালার বর্ণমালা বর্ত্তমান আকারে উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা অক্ষরের ছাঁদ দেখিলেই বুঝিতে পারেন যে, সে লিপিগুলি কোন্ রাজগণের সময়ের লিখিত, বা খোদিত। এখন মুদ্রাযন্ত্রের ফাঁদে পড়িয়া বোধহয় তাহাদের আর রূপান্তর ঘটিবে না।



মথুরার দক্ষিণে নিধুবনে প্রাপ্ত গান্ধার শিল্পের তিনটি মূর্ত্তি। মধ্যে তপঃক্লিষ্ট বুদ্ধদেব,
দক্ষিণে বিতর্কমুদ্রায় বুদ্ধদেব, বামে ধ্যানী বুদ্ধদেব

(১ম) ও সমুদ্রগুপ্ত পর্য্যন্ত চারিজন গুপ্ত সম্রাটের নাম লেখা আছে। যথা—"মহারাজ শ্রীগুপ্ত প্রপৌত্রস্ত মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ পৌত্রস্ত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র-গুপ্তপুত্রস্ত মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তস্ত পুত্রেণ দত্তদেব্যাসমুৎপন্নেন পরমভাগবতেন মহারাজাধিরাজেন" (সেই পুত্র চন্দ্রগুপ্ত ২য়)। পাথরখানা আরও বড় ছিল, তাহাতে অপর যে সকল কথা লিখিত ছিল, তাহা মস্‌জিদ নির্ম্মাণকালে ভাস্করেরা মানানসই করিবার নিমিত্ত, সেই পাথরখানকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। মস্‌জিদের প্রাঙ্গনে বসান এই গুপ্ত নামাঙ্কিত পাষাণখানি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের অনুমান হয় যে, এখানা হয়ত কেশব মন্দিরের গাত্রে বা দ্বারপার্শ্বে সংলগ্ন ছিল। সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে কেহ কেশবদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের নামাঙ্কিত করিয়া থাকিবেন। আবার ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফুহার সাহেব মস্‌জিদের অনতিদূরে উত্তর পশ্চিমদিকে ভূগর্ত্ত খনন করিয়া বৌদ্ধ মঠের কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ ও একটা বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের পরিক্রমাপথ আবিষ্কার করিয়া-ছেন। সে পথটা মস্‌জিদের নিম্ন দিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়া খনন কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, একটা বৌদ্ধ স্তূপের উপর গুপ্ত রাজাদিগের কেহ না কেহ কেশবদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। পরে আওরঙ্গজেব মন্দিরটাকে মস্‌জিদে পরিণত করেন। সেই গুপ্ত নামাঙ্কিত পাষাণখানি আজিও মথুরার যাদুঘরে রহিয়াছে। যাদুঘরে ইহার নম্বর কিউ ৫ (Q 5) প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভোগেল সাহেব বলেন, এই পাষাণখানি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আদেশে খোদিত, তিনি "পরম ভাগবত" অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত। খনিত স্থানটা আর বন্ধ করা হয় নাই। যে কেহ ইচ্ছা করেন দেখিতে পারেন। এই খনিত স্থান হইতে অল্পদূরে একটি বহু পুরাতন কূপের মধ্য হইতে কানিংহাম সাহেব অপর কতকগুলি ধ্বংসাবশেষের সহিত একটি ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি ও অপর একটা ছোট উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি উত্তোলন করেন। দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটির পাদপীঠে গুপ্তাক্ষরে লিখিত আছে যে জয়ভট্টা

নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সেই মূর্ত্তিটিকে ২৩০ গুপ্তাব্দে (৫৫০ খৃঃ) যশোবিহারে দান করিয়াছিলেন। * উপবিষ্ট মূর্ত্তিটীর তলে গুপ্ত লিপি আছে, কিন্তু লেখাটা অস্পষ্ট ও সমাপ্ত হয় নাই। [মথুরার ১॥ মাইল



মথুরায় প্রাপ্ত গণেশমূর্ত্তি

দক্ষিণ দিকে কালেক্টরের কাছারীর নিকট জামালপুর নামক স্থানে হুবিষ্কের নির্ম্মিত একটী ভগ্নবিহারে মৃত্তিকা মধ্য হইতে ৭ ফুট ৩ ইঃ উচ্চ সুন্দর অপর একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বামহস্তে বসনপ্রান্ত ধরিয়াছেন। তাঁহার পাদপীঠে সংস্কৃত ভাষায় গুপ্তাক্ষরে ছইছত্রে লিখিত আছে—যশোদিন্ন নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্ত্তৃক সেইটী পিতামাতা, আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। অপর একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে সংস্কৃত ভাষায় গুপ্তাক্ষরে লিখিত আছে, দেবতা নাম্নী একজন বিহার স্বামিনী ১৩৫ গুপ্তাব্দে (৪৫৫ খৃঃ) "যদত্র পুণ্যং তদ্ভবতু মাতাপিত্রোঃ সর্ব্ব সত্ত্বানাং হিতায়" দান করিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটগণের সময়েও যে মথুরায় বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইত, এগুলি তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ।]



গুপ্তযুগের দশভুজা মূর্ত্তি চক্রহস্তা বৈষ্ণবী শক্তি, উভয় পার্শ্বে সহচরী, পদতলে গরুড়, মথুরা কংস টিলায় প্রাপ্ত।

* এই যশোবিহার শব্দ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই কেশব দেবের স্তূপটীতে হউক, অথবা ইহার সন্নিহিত কোন স্থানে বৌদ্ধ মহাস্থবির যশের নামে একটী বিহার ছিল। সম্রাট অশোকের গুরুর নাম উপগুপ্ত, তাঁহার গুরুর নাম যশঃ। ইঁহার নাম আমরা পূর্ব্বে দুই একবার উল্লেখ করিয়াছি। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মথুরায় বাস করিতেন।



মথুরায় প্রাপ্ত গুপ্তযুগের বিষ্ণুমূর্ত্তি উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতী



মথুরায় প্রাপ্ত গুপ্তযুগের প্রত্যালীঢ় মুদ্রায় উপবিষ্ট দুর্গামূর্ত্তি উভয় পার্শ্বে কার্ত্তিক ও গণেশ, শীর্ষে জৈন তীর্থঙ্কর

গুপ্তদিগের নামাঙ্কিত আরও দুই একটা সামান্য শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে।

তৃতীয় গুপ্ত-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত-দ্বিতীয়ের কথা বলব। ইনি (৩৭৫—৪১৩) খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার উপাধি বিক্রমাদিত্য। ইনি মালব ও সৌরাষ্ট্র হইতে শক-সত্রপদিগকে বিতাড়িত করিয়া পিতৃসাম্রাজ্যের পরিধি পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। সেই জন্য ইঁহার সময় হইতে আরব সাগর দিয়া জলপথে মিশর ও ইউরোপের সহিত বাণিজ্য করিবার সুবিধা হয়। বঙ্গদেশও বোধ হয় ইঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইঁহার সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অবধারণ করিয়াছেন যে, কালিদাস প্রমুখ নবরত্নের পণ্ডিতেরা ইঁহারই সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে সমুদ্রগুপ্ত ও এই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ধ্বংসপ্রাপ্ত অযোধ্যা নগরীর সংস্কার করিয়া রাজধানী তথায় লইয়া যান। কালিদাস রঘুবংশের ষোড়শ সর্গে নিশীথকালে "বিদেশস্থ কলত্র বেশা" অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মুখে নিজ পুরীর পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশার কথা বলিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক অযোধ্যা সংস্কারকালে তাহা মহাকবি স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। ঐ কাব্যেই ইন্দুমতী স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে তিনি মথুরার নীপবংশীয় সুষেণ নামক একজন রাজার নাম করিয়াছেন। তাহা কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক কোন লোকের নাম কিনা বলিতে পারিলাম না। কবি, ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরকালে সুনন্দা মুখে মথুরা ও যমুনার তৎকালীন শোভা সম্পদের একখানি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন, এবং বৃন্দাবনকে কুবেরের চিত্ররথ উদ্যানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন গুহায় বর্ষাকালে ময়ূরেরা অবাধে নৃত্য

করিত যাহা বলিয়াছেন তাহা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কালিদাসকে মালব-পতি যশোধর্ম্মদেবের সভাসদ বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে মতভেদ আছে। চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়ের) রাজত্ব কালেই ফাহিয়ান ভারতবর্ষে ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্র নগরে তিন বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। রাজধানী তখন পাটলিপুত্র হইতে অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল, কাজেই পাটলিপুত্রের পূর্ব্ব গৌরব ও শোভা সম্পদ বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। ফাহিয়ান প্রায় ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুরম্য পাষাণ রচিত প্রাসাদখানি দেখিয়া বলিতেছেন যে, সে সুচারু শিল্পকলা-বিভূষিত প্রাসাদটী যেন মানুষের হাতের কায নহে, কোন দেব-শিল্পীর রচনা। তখন এই পাটলিপুত্রে একটী মাত্র বৃহৎ স্তূপের সন্নিকটে, মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ে মোটে ছয় সাত শত বৌদ্ধ যতির বাস ছিল। তাঁহারা বৎসরের দ্বিতীয় মাসে আপনাদের বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তিগুলিকে কুড়িখানি রথে বসাইয়া গীত বাদ্য নৃত্যাদি সহকারে মহানন্দে নগর ভ্রমণ করাইতেন। ফাহিয়ান বলিতেছেন যে তিনি যখন কপিলাবস্তু, কুশীনগর, গয়া, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বুদ্ধদেবের লীলা স্থানগুলি দেখিতে যান, তখন সর্ব্বত্রই শ্রীহীন, জনবিরল ও কোথাও বা বন জঙ্গল সমাকীর্ণ; অথচ আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, সেই সময়ে মথুরায় কুড়িটী সঙ্ঘারাম, তিন সহস্র বৌদ্ধ যতির বাস ছিল। এবং তাঁহারা পূর্ণ প্রতাপে বৌদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, গুপ্ত সম্রাটেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে অযোধ্যা, পাটলিপুত্র, বিহার প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া



মথুরায় প্রাপ্ত প্রাকযুগের সরস্বতী (Minerva) মূর্ত্তি

গিয়াছিল। কিন্তু মথুরায় তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল।

এখানে আরও একটী কথা বলিতেছি। পুরাতন দিল্লীতে কুতব মিনারের সন্নিকটে যে প্রসিদ্ধ লৌহ স্তম্ভটী স্থাপিত আছে, এতদিন সেইটীকে অনভিজ্ঞ লোকেরা কেহ দিলুরাজা কর্ত্তৃক বাসুকীর মস্তকে স্থাপিত যজ্ঞীয় যূপ, কেহ ভীমের গদা, কেহ হনুমানজীকা লাঠা প্রভৃতি কত কি বলিত। এখন উহার গাত্রস্থ লিপি পাঠে নিঃসংশয়ে জানা গিয়াছে যে, সেই লৌহ স্তম্ভটি চন্দ্র নামক কোন রাজার প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুধ্বজ।

এই চন্দ্র নামক রাজাকে চন্দ্র গুপ্ত, কেহ বা চন্দ্র বর্ম্মণ বলিয়া অনুমান করেন। আমরা এই লৌহ স্তম্ভটীকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত বলিয়া মনে করি। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব তাঁহার ইতিহাসে ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন যে, একাদশ শতাব্দীতে তোমর বংশীয় রাজারা এই বিষ্ণুধ্বজটীকে বৈষ্ণব-প্রধান মথুরা হইতে লইয়া আসিয়া দিল্লীতে স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা সাহেবের এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে করি। পাঠান সম্রাটেরাও এইরূপে দুইটী অশোকস্তম্ভ অন্যস্থান হইতে আনিয়া রাজধানী দিল্লীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। লৌহস্তম্ভটী প্রায় দেড়হাজার বৎসর যাবৎ উন্মুক্ত স্থানে অবাধে রৌদ্র বৃষ্টির উপদ্রব সহ্য করিয়া আসিতেছে, তথাপি কোথাও বিন্দুমাত্র মরিচা ধরে নাই, পালিশটা যেন টাটকা রহিয়াছে। মুসলমানেরা কামানের গোলা মারিয়াছিলেন তাহার দাগ রহিয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া যায় নাই। ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এইটীকে গুপ্ত রাজগণের সময়ে লৌহ শিল্পের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করেন। গুপ্ত রাজারা যে বিষ্ণুধ্বজ বা বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিতেন তাহার প্রমাণ স্কন্দগুপ্তের

প্রবন্ধে আরও বলিব। পূর্ব্বোক্ত কিউ পঁচ চিহ্নিত পাষাণখানি ও সেই লৌহস্তম্ভটী মথুরায় ছিল ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়, যেমন অযোধ্যা সংস্কার করিয়া তথাকার বৌদ্ধ স্তূপ গুলিকে রামকোট, সুগ্রীব পর্ব্বত, মণি পর্ব্বত প্রভৃতি হিন্দুনামে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, মথুরাতেও তিনি একটী বৌদ্ধস্তূপকে কেশব দেবের মন্দিরে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন। লৌহময় বিষ্ণুধ্বজটী ঐ কেশব মন্দির প্রাঙ্গনের সম্মুখভাগে প্রোথিত ছিল এবং গুপ্ত নামাঙ্কিত পাষাণখানিও মন্দির প্রান্তে সংলগ্ন ছিল, আমরা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ইহাই যে ধ্রুব সত্য তাহা বলিতেছি না, এ বিষয় ইংরাজ আমলের মথুরা প্রবন্ধে আরও বিশদ করিয়া আলোচনা করিব।

চতুর্থ সম্রাট কুমার গুপ্ত (১ম) (৪১৩—৪৫৫ খৃঃ)। ইনি পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় মহাসমারোহে বিষ্ণুপ্রধান অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধান করেন। ইঁহার রাজত্বের শেষ দিনে ভারতের উত্তর পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে শ্বেতহূণ নামে খাঁদানাক, কোটরগত চক্ষু দাড়িগোঁফ বিহীন, কাঁধ বাহির করা এক কদাকার বর্ব্বর দস্যুদল ভারতের উত্তর প্রদেশে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে প্রজাগণের ধন লুণ্ঠন ও নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে তাহারা এতই প্রবল হইয়া পড়ে যে ভারতের নানাস্থান তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়া যায়। কুমার গুপ্তের পর পঞ্চম সম্রাট স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫ – ৪৮০ খৃঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্বেতহূণদিগকে পরাভব করিয়া চিরংকালের জন্ত দেশমধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ইঁহারও বিক্রমাদিত্য উপাধি ছিল। এই হূণদিগের পরাজয় ঘটনা তিনি একটী বিষ্ণুধ্বজে খোদিত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, "শ্রীকৃষ্ণ যেমন শত্রু কংসকে বিনষ্ট করিয়া আপন মাতা দৈবকীর নিকট গিয়াছিলেন, স্কন্দগুপ্তও তেমনি হূণদিগকে পরাজিত করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে নিজমাতার নিকট উপস্থিত হইলেন।" এই বিষ্ণুধ্বজটী গাজিপুরের অন্তর্গত ভিতারি গ্রামে আজিও দণ্ডায়মান আছে।



গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি

ইহার উপর শার্ঙ্গী নামে যে বিষ্ণু মূর্ত্তিটী স্থাপিত ছিল, মুসলমানগণের উপদ্রবে তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। এই বিষ্ণুধ্বজের লেখা হইতে দুইটী বিষয় জানিতে পারা যায়। (১) গুপ্ত সম্রাটেরা যে বিষ্ণুপূজা করিতেন ব বিষ্ণুভক্ত ছিলেন তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এবং (২) সে সময়ে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের আখ্যানও সে দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাও জানা গেল। এই বিষ্ণুধ্বজটী অপর কোন স্থান হইতে ভিতারি গ্রামে আনীত হইয়াছে কিনা জানিতে পারি নাই। স্কন্দ গুপ্তের পুত্র পুরগুপ্ত প্রতাপাদিত্য গির্ণার পর্ব্বতের নিকট বৃহৎ হ্রদপার্শ্বে একটী মনোহর বিষ্ণু মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেটিতে আজিও তাঁহারই নামাঙ্কিত শিলালেখ রহিয়াছে। ইহার পর আদিত্য সেন অপ্সর গ্রামে ও ললিতাদিত্য পরিহাসপুরে (বর্ত্তমান নাম পরম পোর) এক একটী করিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল হইতে অনুমান করা যায় যে, গুপ্ত রাজারাই বিশেষরূপে বিষ্ণুমূর্ত্তি গুলি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যখন অজস্র এতগুলি

বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরাতেও বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপন অনুমান করিলে অসঙ্গত হয় না। ইহার পর তোড়ামন নামে অপর একজন শ্বেতহূণের দলপতি ভারতে আসিয়া পুনরায় উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। তাহার পুত্র মিহির গুল বা মিহির কুল এতই বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিল যে, হিয়েহসাঙ্ বলিয়াছেন মিহির কুল বৌদ্ধদিগের ষোল হাজার সঙ্ঘারাম, বিহার, চৈত্য প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধ প্রধান মথুরা ইহার হস্তে কেনরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিল কিনা তাহ ইতিহাসে পাই নাই, তবে ভোগল সাহেব প্রভৃতি দুই এক জন ঐতিহাসিকের মত এই যে, মথুরা ধ্বংসের জন্য কেবল মুসলমানেরা দায়ী নহে, এই নগরীকে হূণদিগেরও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইহার



দর্পণ হস্তে কোনও বৌদ্ধ দেবী। কেহ কেহ এটিকে নিয়তী বা ভাগ্যদেবী মনে করেন। কুশান যুগ।

পর সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত (উপাধি বালাদিত্য) ও মালবাধিপতি যশোধর্ম্মদেব উভয়ে মিলিয়া ৫২৮ খৃঃ করুর নগরের যুদ্ধে মিহির কুল ও হূণ দিগকে দেশ হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিয়া দর্পচূর্ণ করিয়া দেন। কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় কালে হূণ দিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মল্লিনাথ টীকায় হূণদিগকে "উত্তর জনপদ বাসী ক্ষত্রিয়" বলিয়াছেন। রাজপুতদিগের মধ্যে আজিও হূণ নামে একটি শাখা আছে। মালবাধিপতি যশোধর্ম্মদেব এই সময়ে হূণ দিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের অপর একটা গুণের কথা এখানে বলিব। হিয়েহসাং বলেন বালাদিত্য নালান্দায় * বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সুবর্ণ ও মণিরত্ন মণ্ডিত একটী ৩ শত ফুট উচ্চ ইষ্টক নির্ম্মিত সুবিশাল মঠ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি বৌদ্ধদিগেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিয়েহসাং কয়েক বৎসর নালন্দায় থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন।

ইতিহাসে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেবের যেরূপ প্রবল প্রতাপের পরিচয় পাই, তাহাতে মনে হয় যেন বালাদিত্যের সময়ে মথুরা নগরী যশোধর্ম্মদেবেরই অধিকারভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই।

সে যাহা হউক, ৯ম সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল দ্বাদশাদিত্য। বৃন্দাবনে এখন যে উচ্চ টিলার উপর সনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন জীর মন্দিরটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেইটিকে লোকে আজিও দ্বাদশাদিত্যের টিলা বলিয়া থাকে। বরাহ পুরাণে দেখিতে পাই প্রাচীন সেই দ্বাদশাদিত্যের টিলার উপর একটা সূর্য্য দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল. দ্বাদশাদিত্য শব্দের অর্থ— বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা বরুণ, মিত্র, শক্র, উপক্রম এই দ্বাদশ নামধারী দ্বাদশ মাসের

* প্রাচীন কালে ভারতের তিন স্থানে তিনটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যাপীঠের নাম পাওয়া যায়। পেশোয়ারের নিকট তক্ষশিলা, বিহার ও রাজগৃহের নিকট নালন্দা (বর্ত্তমান নাম বড়গাঁও) শেষটী পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমশিলা, শতাব্দীতে কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা আজিও সমাক হয় নাই।

১২টি সূর্য্য। সুতরাং ৯ম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দ্বাদশাদিত্য উপাধি হইতে কিংবা দ্বাদশ সূর্য্যের নাম হইতে—এই টিলাটীর নাম কি জন্ত দ্বাদশাদিত্য হইয়াছে,সে সন্ধান কেহ দিতে পারিলেন না। কিন্তু বেশ নাম-সাদৃশ্য রহিয়াছে। আর একটী কথা এখানে বলিতে হইতেছে; গুপ্ত সম্রাটগণের মধ্যে ১ম, ৩য়, ও ৯ম সম্রাটের নাম চন্দ্রগুপ্ত ছিল। দিল্লীর সেই যে লৌহ স্তম্ভের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেইটী কোন্ চন্দ্রগুপ্তের স্থাপিত? অনেকেরই মত, রাজচক্রবর্ত্তী ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যেরই কীর্ত্তি। আমরাও তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে করি। ইঁহাদের পর হইতে গুপ্ত সম্রাটেরা ক্রমে রাজসম্পদ শূন্ত ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জি, আই, পি রেল পথে অনেক দূর গিয়া নিজাম সরকারের রেলে হায়দ্রাবাদ যাইতে হয়। যতদূর স্মরণ হয় পুণা হইতে শেষ রাত্রে রেল যাত্রা করিয়াছিলাম, এবং হোটগি ষ্টেশনে মধ্যাহ্নের আহার শেষ করি। সেক্রেটারী বাবু, ডাক্তার বাবু, আমার পাঠক পাঠিকাগণের পূর্ব্ব পরিচিত রহস্যপ্রিয় শশিশেখর এবং আমি এই চারিজনে, "চতুর্ভিঃ শোভনা যাত্রা" করিলাম। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে (সে দিনে সমস্ত রেল গাড়ীই মন্থরগতি ছিল) হোটগিতে পঁহুছিয়া ষ্টেশনে প্রাপ্তব্য ভোজ্যের সন্ধানে বাহির হইলাম; সকলের এক প্রকার ভোজ্যে তৃপ্তি হয় না, কারণ "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" সেই জন্ত নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া জঠরজ্বালা নিবারণ করতঃ যখন রেলগাড়ীর দিকে আসিলাম, তখন দেখি আমাদের কামরায় একটি গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, সুন্দর ও সুবেশধারী মুসলমান যুবক বসিয়া আছেন। মনটা অপ্রসন্ন হইল, কারণ আমরা চারিজনে কামরাটি অধিকার করিয়া সুখে ছিলাম, অপরিচিত লোকের সমক্ষে সমস্ত কার্য্যেই বাধ বাধ লাগিবে বলিয়া লোকটির উপরে কিছু বিরক্তই হইলাম। মনে মনে কহিলাম, কেন বাপু,—আর কি কামরা ছিল না? তবে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই, কারণ দিবাভাগে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ছয় জন করিয়া বসিবার নিয়ম, আমরা চারিজন মাত্র ছিলাম, আরও দুই জনকে স্থান দিতে আমরা রেলের আইন মত বাধ্য, কেন না সে কামরাটি আমরা রিজার্ভ করি নাই। বিরক্ত হইবার আরও একটি কারণ ছিল —সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে তাঁহার বিছানা, ট্রাঙ্ক ব্যতীত একটি প্রকাণ্ড বাঁশের ঝুড়ি ছিল যাহা আমাদের কামরার মেঝের প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের চারি জনের অষ্টসংখ্যক শ্রীচরণ রাখিবার স্থান পাওয়াই দুষ্কর হইয়াছে। ভদ্রলোকটি দেখিলাম অতিশয় বিনয়ী। আমরা কামরায় প্রবেশ করিবা মাত্র সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া সেলাম করিলেন এবং পরিষ্কার উর্দ্দু ভাষায়, আমাদের অনুপস্থিতিতে কক্ষে প্রবেশ করা এবং প্রকাণ্ড ঝুড়ি দ্বারা কক্ষতল জুড়িয়া দেওয়ায় অপরাধের জন্ত বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গী তিনজন উর্দ্দু উপস্থিত হইলেই মূক হইয়া যান। আমি যে উর্দ্দুতে মৌলবী তাহা বলিতেছি না, তবে কায়ক্লেশে কাষ চালাইয়া দিতে পারি বটে। সকলের হইয়া আমিই আলাপ আরম্ভ করিলাম। আলাপে জানিলাম তিনি হায়দ্রাবাদ নিবাসী এবং "মওলানা," হায়দ্রাবাদেই যাইতেছেন, হোটগিতে

কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ উর্দ্দু জবানে আমাদের চিত্তের অপ্রসন্নতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইল; কিছুক্ষণ আলাপেই বুঝিলাম লোকটি নিরতিশয় হাস্যরসিক, প্রতি কথায় লোককে হাসাইতে পারেন; এই হাস্য পরিহাসের মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব বিরক্তির ভাব কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার সন্ধানে পাওয়াই দুষ্কর।

আমরা সেদিনে আজিকার মত পলিতকেশ, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ ছিলাম না। অল্প বয়সে কৌতূহল পূর্ণ মাত্রাতেই থাকে; প্রকাণ্ড বাঁশের ঝুড়িতে কি আছে জানিবার কৌতূহল যখন দুর্দ্দমনীয় হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলিলাম। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম তিনি আমার কৌতূহলে বিরক্ত মোটেই হন নাই, বরং একটু খুসীই হইয়াছেন। প্রশ্ন করিবামাত্র সহাস্য বদনে তিনি ঝুড়ির নিকটে গিয়া তাহার বন্ধনরজ্জু খুলিয়া ফেলিলেন এবং উপরের ঢাকনা খুলিবামাত্র দেখিলাম এক প্রকাণ্ডকায় মোরগ তাহার মধ্যে কোন প্রকারে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। মওলানা সাহেব দুইহস্তে তাহাকে কাঁই তুলিয়া যখন রেলগাড়ীর মধ্যে দাঁড় করাইলেন, দেখিলাম সেই অতিকায় কুক্কুটটির তাম্রচূড়া আমরা দাঁড়াইয়া থাকিলে আমাদের বক্ষ স্পর্শ করিতে পারে! ভাবিলাম এই শকুন্ত বুঝি গরুড়ের প্রপৌত্র কিংবা তদ্বংশীয় সম্পাতি বা জটায়ুর দশ রাত্রির জ্ঞাতি! তত বড় মোরগ আমি তৎপূর্ব্বে ত দেখিই নাই, আজও পর্য্যন্ত তাদৃশ "কৃকপাখী" আমার চক্ষু গোচর হয় নাই।

মওলানা সাহেব আমাদের প্রশংসমান চক্ষু দেখিয়াই বুঝিলেন, আমরা তাঁহার সযত্ন রক্ষিত এই শকুন্ত শাবকটি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি এবং এই ধারণা তাঁহার মনে হইবামাত্র তিনি সগর্ব্বে মোরগের বংশাবলী এবং গুণাবলীর কথা বলিতে লাগিলেন। জলস্রোতের ন্যায় তাঁহার উর্দ্দু জবান চলিতে লাগিল, সে ভাষা যথাযথরূপ লিখিয়া পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণ করা আমার সাধ্যাতীত, কারণ কোন মতে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার থাকিলেও, তাদৃশ উচ্চ অঙ্গের উর্দ্দু ভাষায় আমার দখল নাই। যেটুকু উর্দ্দু আমি বলিতে পারি তাহা কাণ দিয়া শিখিয়াছি, অর্থাৎ শুনিয়া;— উর্দ্দু বা ফার্সীর এক বর্ণও আমি পড়িতে বা লিখিতে জানি না। একবার নাটোরের "সহর ওস্তাদ" মৌলবী সাহেবের নিকট "ছবক" পাঠ লইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার মেধা, স্মৃতি, বুদ্ধি ও মনোযোগ দেখিয়া মৌলভী সাহেব আমার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। মওলানা সাহেব বলিলেন, তাঁহার মোরগ, লড়াইয়ের মোরগ অর্থাৎ উহার সমকক্ষ একই জাতীয় অন্য মোরগের সহিত লড়াই করিবার জন্য এই সকল মোরগের বংশ বৃদ্ধি ও সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহারা শকুন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতীয়।

লড়াই করিবার মোরগের কথা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম; মুরশিদাবাদের নবাবী আমলে মোরগের লড়াই সেখানে প্রচলিত ছিল তাহাও শুনিয়াছি; নাটোরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহারাজগণের সময়ে নাকি বহু পরিশ্রমে দেশ দেশান্তর হইতে এই জাতীয় মোরগ সংগ্রহ করা হইত। কিন্তু আমার শৈশবাবধি সেদিন পর্য্যন্ত স্বচক্ষে আমি ক্ষাত্রধর্ম্মী মোরগের মূর্ত্তি দেখি নাই। মওলানা সাহেব বলিলেন উহাদের মূল্য নাকি অত্যন্ত অধিক, এমন কি শুনিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সময়ে সময়ে সহস্র মুদ্রাও অধিক দিয়া কিনিতে হয়, কারণ উহাদের সংখ্যা নাকি বড়ই কম। তাঁহার কথা শুনিয়া ভাবিলাম 'ম্যামথ' প্রভৃতি অতিকায় জন্তু যেমন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বুঝি বা এই অতিকায় বিহঙ্গবংশও এককালে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তাঁহার নিকট শুনিলাম নিজাম সরকারে এইজাতীয় কয়েকটি "সমর শকুন্ত" রহিয়াছে, বিশেষ বিশেষ দিনে নিজাম বাহাদুরের ইচ্ছা হইলে ইহাদের লড়াই হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে উহাদের পায়ে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং সেই

ছুরিকার আঘাতে প্রতিপক্ষ বিদ্ধবক্ষ হইয়া রক্তস্রাবে মরিয়াও যায়। আমাদের বাল্যাবস্থায় আমাদের বাড়ীতে মেষ এবং বুলবুলের লড়াই হইতে দেখিয়াছি, তাহাতে যুধ্যমান প্রাণীদিগের মৃত্যু ঘটিতে দেখি নাই। যে ক্রীড়ায় ছুরিকাঘাতে বিদীর্ণবক্ষ হইয়া বিহঙ্গের প্রাণান্ত হয় উহা বড়ই নৃশংস বলিয়া মনে হইল, কিন্তু মওলানা সাহেবের উৎসাহের মুখে সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে আমার সাহস হইল না।

কথা বার্ত্তায় কতদূর আসিয়াছি, কয়টা ষ্টেশন পার হওয়া গিয়াছে সে সকল দিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ দেখিলাম মাঠের মাঝখানে ট্রেণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং ঘন ঘন এঞ্জিনের বাঁশী বাজিতেছে। মওলানা সাহেব বলিলেন "এখন আমরা নিজাম সরকারের রেলপথে চলিয়াছি, সেইজন্য গাড়ী চলিতেছে না।" আমি কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি দেখিয়া তিনি কহিলেন "Ruling chief দের রেলের বন্দোবস্ত এইরূপই হইয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। আপনি বিদেশী লোক এ সকল খবর কেমন করিয়া জানিবেন? আমরা এই দেশবাসী, সুতরাং সমস্তই আমরা অবগত হইবার সুযোগ পাই।" বহুক্ষণ ট্রেণখানি সেই তেপান্তর মাঠে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন বাঁশী বাজাইতে লাগিল, কিন্তু সে স্থান হইতে একপদও অগ্রসর হইল না। কিছুকাল পরে দেখি মাঠের মধ্যদিয়া বহুলোক একত্রে আসিতেছে এবং সেই জনতার মধ্যে দেখা গেল, আশাসোটা, ছাতা, পাখাধারী অনেক লোক আগে আগে চলিয়াছে, মধ্যে মূল্যবান পরিচ্ছদধারী একব্যক্তি অশ্বারোহণে আসিতেছেন। মওলানা সাহেব আমার "সমাচার দর্পণ", সুতরাং তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, এই ব্যক্তি নিজাম সরকারের এক বৃহৎ তহসীলের প্রধান কর্ম্মচারী, কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছিলেন, স্বীয় কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এবং তাঁহারই জন্য গাড়ী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছিল। অশ্বারোহণে যে ব্যক্তি চলিয়াছে —সে অশ্বও আবার আরব দেশীয়—তাহার মস্তকোপরি স্বর্ণছত্র—এ দৃশ্য আমি নূতন দেখিলাম। পাল্‌কি, নাল্‌কি, তাম্‌জাম্, মহাপায়া প্রভৃতি যানে বিবাহ করিতে যাইবার সময়ে শোভাযাত্রা হয় এবং আশাসোটা আড়ানী ছাতা সঙ্গে থাকে; রাজকীয় সওয়ারীর সঙ্গে নকীব উচ্চৈঃস্বরে অবোধ্য ভাষায় শ্লোকাবলী অশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সঙ্গে সঙ্গে যায় ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ঘোড় সওয়ারের মাথায় ছাতা এই প্রথম দেখিলাম এবং দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রেলের সময়ানুসারে নিজাম সরকারের কর্ম্মচারী নিজের গতিবিধির সময় নিয়মিত করিবেন না, তাঁহার সময়ানুসারে রেলকে চলিতে হইবে, সেই জন্যই পথের মধ্যে এতগুলি যাত্রী গাড়ীতে বসিয়া ছট্‌ফট্ করিল। ইহা সময়ের মূল্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিবার ফল, এবং ইহা কেবল ধরিত্রীর প্রাচীদিগ্‌বিভাগেই সম্ভব হইতে পারে। যখন কর্ম্মচারীপ্রবর সদলবলে গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী চলিবার সময় হইল, তখন আবার বাঁশী বাজিতে লাগিল। কিন্তু গাড়ী চলে না। এক একবার চাকা অর্দ্ধেক ঘুরিয়াই থামিয়া যায় এবং সমগ্র ট্রেণখানি বিষম ঝাঁকানি খায়। আমার দিকে চাহিয়া মওলানা সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "ইহাকেই বাদশাহী চাল বলে। শাহী লাইনের গাড়ী শাহী চালে চলিবে না ত কি সাধারণ চালে যাইবে?" মওলানা সাহেবের কথাবার্ত্তায় প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলাম তিনি শিক্ষিত এবং পরিহাসরসিক লোক; তিনি ইংরাজী ভাষা যেমন ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শিক্ষা কিছুমাত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় নাই।

হায়দ্রাবাদের এক ষ্টেশন আগে দুইজন ভদ্রলোক আমাদের গাড়ীতেই উঠিলেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ বিশেষ জাঁকাল না হইলেও দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে পরিচ্ছদের মূল্য অধিক, এবং তাঁহাদের মাথায় হায়দ্রাবাদী টুপী দেখিয়া অনুমান করিলাম সরকারের সহিত

সংসৃষ্ট বিশিষ্ট লোক হইবেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মওলনা সাহেব সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেলাম করিয়া কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কথায় বুঝিতে পারিলাম ভদ্রলোকদ্বয় তদানীন্তন পেশকার (পরে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন) রাজা কিশন্ প্রসাদের সঙ্গী—রাজা সাহেব ভিন্ন গাড়ীতে আছেন। মওলানা সাহেব "কল্‌কত্তা কা রহিস্" বলিয়া আমাকে ভদ্রলোক দিগের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। কল্‌কত্তা কা রহিস্ শুনিয়া আমার কি পরিচয় তাঁহারা পাইলেন তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন—অন্ততঃ বিদেশীলোক হায়দ্রাবাদে বেড়াইতে আসিয়াছে এটুকু বুঝিয়া থাকিবেন।

হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে পহুঁছিবার পূর্ব্বে গাড়ী "হোসেন সাগর" নামক প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদের নিকট দিয়া অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে চলে; এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য প্রায় তিন ক্রোশেরও অধিক এবং ইহার পরিসর বোধ করি দুই মাইল হইবে; বস্তুতঃ সেকেন্দ্রাবাদ হইতে হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই সুবৃহৎ জলাশয় হায়দ্রাবাদের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য সামগ্রী। সন্ধ্যাসমাগমে ইহার সুদীর্ঘ তটভূমিস্থ অসংখ্য আলোক স্তম্ভের উপরে যখন প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়, রেলগাড়ী হইতে সে দৃশ্য দর্শকের নয়ন মন মুগ্ধ করিয়া দেয়। আবার সেকেন্দ্রাবাদ হইতে হায়দ্রাবাদ পর্য্যন্ত দীর্ঘ রাজবর্ত্ম হোসেন সাগরের কূল ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই দীপালোকিত প্রশস্ত রাজপথ নগরবাসিগণের সান্ধ্যবায়ু সেবনের বড় মনোরম স্থান। শুনিয়াছি হোসেন সাহ নামক নিজামের সময়ে, রাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অপ্রচুর আহার্য্যের মহার্ঘতায় বহু প্রজা যখন মৃত্যুমুখে পড়িতে লাগিল, তখন এই পরদুঃখকাতর ধর্ম্মশীল রাজ্যেশ্বর যোজন বিস্তৃত এই কৃত্রিম জলাশয় খনন করিবার ব্যবস্থা করাইয়া শ্রমলব্ধ দৈনিক উপার্জ্জনে প্রজার অন্নকষ্ট দূর করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য হায়দ্রাবাদের পুরবাসীজনের জলকষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে। যেমন ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাও তদনুরূপ। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে কৃত্রিম দ্বীপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, ফলতঃ সার্থক ইহার নাম রাখা হইয়াছে "হোসেন সাগর;" ইহার তটভূমিতে দাঁড়াইয়া যে দিকে চক্ষু ফিরান যায়, বিস্তীর্ণ জলরাশি এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটি কৃত্রিম দ্বীপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। সামান্য বায়ুবেগেই এই দিগন্তরেখাচুম্বী দীর্ঘিকাবক্ষে তরঙ্গমালা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সাগরেরই অনুকরণ করে। আজমীর, ভোপাল, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে অনেক স্বভাবজাত এবং কৃত্রিম বাপী, সরোবর, হ্রদ, দীর্ঘিকা আমি দেখিয়াছি, আমার মনে হয় হায়দ্রাবাদের "হোসেন সাগর" কাহারও অপেক্ষা হীন হইবে না, বিশেষতঃ ইহার দীপালোকিত তটবর্ত্ম ইহাকে অতুল শোভা-সম্পদে সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এই হোসেন সাগরের প্রশস্ত বক্ষে নৌকা বিহারের জন্য নিজাম সরকার হইতে অনেকগুলি ষ্টীম লঞ্চ রক্ষিত আছে। রাজ্যেশ্বর এবং তৎপরিবারস্থ সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ ত হইয়াই থাকে, কোন বিদেশী ভ্রমণকারী হায়দ্রাবাদ দেখিতে গিয়া যদি এই বাপীবক্ষ বিহারের জন্য ধূমকলের নৌকা চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার সে প্রার্থনা পূরণ হইতে কোন বাধা হয় না।

আমরা পথেই স্থির করিয়াছিলাম যে সম্ভবতঃ হায়দ্রাবাদে ভাল হোটেল আদি পাওয়া যাইবে না, সেকেন্দ্রাবাদ ইংরাজের অধিকারে সেখানে হোটেলের বন্দোবস্ত ভাল হইবার সম্ভাবনা, আমরা সেইখানেই নামিব এবং সেখান হইতেই হায়দ্রাবাদ দেখিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। তদনুসারে হায়দ্রাবাদে না নামিয়া আমরা সেকেন্দ্রাবাদে নামিলাম। সচরাচর রেল ষ্টেশনে যেমন কুলি, মজুর মুটের হুড় হাঙ্গামা থাকে, এখানেও তাহাই দেখিলাম। গাড়ী দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই কুলি কামরায় প্রবেশ করিয়া মাল পত্র ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল; জিনিষপত্র নামাইয়া আমার ভৃত্যকে সেইখানে রাখিয়া আমি ষ্টেশনের বাহিরে গাড়ীর খোঁজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি কুলিগণ আমার ভৃত্যের সহিত কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

অনুসন্ধানে জানিলাম, কুলি জিনিষ মাথায় তুলিয়া জনতার মধ্যে লুকাইত হইবার চেষ্টায় ছিল, সেই জন্যই চাকরের সহিত গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে অসম্বন্ধ প্রলাপের মত কি বলিতে লাগিল, তাহার অর্থ আবিষ্কার করা আমার সাধ্যাতীত দেখিলাম। আরও দেখিলাম তাহার বদন-নিঃসৃত সুরার সদ্‌গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত, বারুণী বিঘূর্ণিত লোচনদ্বয়ের বর্ণ, বসন্ত-বৈতালিকের নেত্রবর্ণকেও পরাস্ত করিয়াছে।

যাহা হউক সেখানে আর বিশেষ গোলযোগ না করিয়া ক্যোচম্যানের সাহায্যে মালপত্র গাড়ীতে তুলিয়া হোটেলের দিকে চলিলাম। যতদূর মনে হয় ভিটক হোটেলে গেলাম, কারণ শুনিয়াছিলাম ঐ হোটেলটি নাকি সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে সেকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল ছিল? গিয়া দেখিলাম হোটেলের সান্ধ্যভোজন হইয়া গিয়াছে কারণ আমরা যখন হোটেলে পঁহুছিয়াছিলাম তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, এগারটা বাজিবার অল্প বিলম্ব। হোটেলে লোক অধিক হওয়ায়, হোটেল ওয়ালা তেতালার ছাদে চাটাই এবং সামিয়ানার সাহায্যে কতকগুলি ক্ষণভঙ্গুর কামরা প্রস্তুত করাইয়াছে, যাহার মধ্যে চন্দ্র সূর্য্যের রশ্মি এবং তস্কর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। উপায় নাই, সে রাত্রে আর যাই কোথায়, ঐ চাটাই ঢাকা কামরাতেই আশ্রয় লইলাম। আহার্য্যের মধ্যে পাওয়া গেল, তৃতীয় শ্রেণীর স্নেহসংস্পর্শ শূন্য পাউরুটি এবং মূষিকপুরীষগন্ধী 'চা'—বলা বাহুল্য উহা গলাধঃকরণ করা গেল না। এখানেও দেখিলাম হোটেলের ভৃত্যবর্গ সকলেই স্খলিত-বাক্ এবং বারুণী-বিঘূর্ণিত লোচন। পরদিন শুনিয়াছিলাম কি এক পর্ব্ব উপলক্ষে সে রাত্রে সেকেন্দ্রাবাদের মুসলমানগণ (ইতর শ্রেণীর অবশ্য) মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

হোটেলের ভিস্তি, মেথর, খিদ্‌মদ্‌গার গুলির চেহারা দেখিয়া আমার কিরূপ সন্দেহ হইতে লাগিল, বুঝি হইল ইহারা সুবিধা পাইলে চুরি করিবে। আরও দেখিলাম, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চাটাইয়ের ছিদ্রপথে আমাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং দুই তিন জনে নিম্নস্বরে কথা কহিতেছে। সে কামরায় আমি এবং আমার ভৃত্য ছিলাম; ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার ভৃত্যকে ডাকিয়া আমার রিভলভার বাহির করিয়া দিতে বলিলাম এবং প্রদীপ জ্বালিয়া কতকগুলি টোটা রিভলভারের মধ্যে বারম্বার ভরিতে ও বাহির করিতে আরম্ভ করিলাম, ইচ্ছা উহারা দেখে যে আমার নিকট আগ্নেয়াস্ত্র রহিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে উহা ব্যবহৃত হইতেও পারিবে। আগ্নেয়াস্ত্রের মহিমা অপার। সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ঘনান্ধকারে নিঃশব্দ-পাদচারী কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মানব মূর্ত্তিগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহার সন্ধান পাইলাম না; দুই একবার বাহিরে আসিয়াও দেখিলাম, কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তথাপি মনের সন্দেহ দূর হইল না—যে ছোট বাক্সটির মধ্যে নোট এবং টাকা ছিল, সেটি আমার উপাধান দিয়ে রাখিলাম, কিন্তু ঘুমাইলাম না। রিভলভার হাতে লইয়া বসিয়াই রহিলাম। ভৃত্যকে ঘুমাইতে বলিলাম, ইচ্ছা রহিল শেষ রাত্রিতে তাহাকে জাগাইয়া দিয়া আমি নিদ্রা যাইব। ভৃত্য অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিল। রাত্রি শেষে তাহাকে জাগাইবার কথা, কিন্তু বেচারার গভীর নিদ্রা দেখিয়া তাহাকে জাগাইতে ইচ্ছা হইল না, কারণ জানি, পথে বাহির হইলে বেচারাদের শয়ন ভোজনের কোন নিয়ম বা পারিপাট্য থাকে না, পরিশ্রান্ত দেহে প্রায় অনাহারে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রিও আর অধিক নাই, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু আমিই জাগিয়া রহিলাম। প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, তাহাকে না জাগাইবার জন্য সে বড়ই অনুযোগ করিতে লাগিল। আমি চা আনিবার জন্য তাহাকে হোটেলের ভৃত্যের নিকট পাঠাইয়া, হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইলাম।

প্রাতে দিবালোকে আমার চাটাই বেষ্টিত কামরার

শোভা সৌন্দর্য্য এবং শ্রী দেখিয়া হোটেলওয়ালাকে মনে মনে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ স্থির করিলাম, সেখান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। স্থান পরিবর্ত্তন করিবার অন্য কারণও ছিল—সেকেন্দ্রাবাদ হইতে হায়দ্রাবাদ সহরের দূরত্ব প্রায় ছয় সাত মাইল, নিত্য দুই বেলা এত দূর পথ গমনাগমন অসুবিধাজনক, ঘোড়ার গাড়ীতে গেলে এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগে, রেলে যাতায়াত করিতে হইলে নির্দ্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়, কোন কারণে একখানি ট্রেণ ধরিতে না পারিলে হয়ত সে বেলা আর যাওয়াই ঘটে না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, হায়দ্রাবাদে অতি উত্তম হোটেল রহিয়াছে এবং অনেক ভদ্রলোক সেই হোটেলেই থাকে; হোটেলটি নূতন খুলিয়াছে বলিয়া মারের গাইডে তাহার কোন সংবাদ নাই। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিয়া আমি এবং সেক্রেটারি বাবু ঘোড়ার গাড়ীতে হায়দ্রাবাদ যাত্রা করিলাম, ডাক্তারবাবু শশিশেখর এবং ভৃত্যকে হোটেলে জিনিষ পত্রের পাহারায় রাখিয়া গেলাম।

সেকেন্দ্রাবাদ সহর ছাড়াইয়া হোসেন সাগরের তীর বাহিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথে গাড়ী চলিল। বিস্তীর্ণ জলাশয়ের শোভা দেখিতে দেখিতে দীর্ঘপথ কেমন করিয়া অতিবাহন করিলাম বুঝিতেও পারিলাম না, একেবারে হায়দ্রাবাদের হোটেলের দ্বারে গাড়ী উপস্থিত হইল।

চাদরঘাট নামক সহরের একটি উৎকৃষ্টতম অংশে পূর্ব্বকালে নিজাম সরকারের কোন পদস্থ লোকের একটি মনোরম গৃহ ছিল, মিঃ বুরি নামক ইটালিয়ান হোটেলওয়ালা সেই গৃহ ক্রয় করিয়া বা ভাড়া লইয়া এই হোটেল খুলিয়াছে। এই হোটেল গৃহের কক্ষগুলি প্রশস্ত, অলিন্দ গৃহকুট্টিম সমস্তই শ্বেত কৃষ্ণ মর্ম্মরে বিনির্ম্মিত, ভোজন গৃহ,—স্নানাগার সমস্তই মর্ম্মরাস্তীর্ণ—এক কথায় এই হোটেলের তুলনায় সেকেন্দ্রাবাদের তদানীন্তন ডিউক হোটেলকে নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গাড়ী বারাণ্ডায় গাড়ী যাইবা মাত্র সস্ত্রীক বুরি সাহেব সহাস্য বদনে গাড়ীর নিকটে 'কণ্টিনেণ্ট্যাল' প্রথায় অভিবাদন করতঃ নামিতে বলিলেন। আমরা নামিয়া আমাদের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবামাত্র বুরি পত্নী হোটেলের কক্ষে কক্ষে আমাদিগকে লইয়া গিয়া সমস্তই দেখাইলেন। সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিব বলিলে, আমাদের ফিরিয়া যাইবার এবং আসিবার জন্য একখানি উৎকৃষ্ট ফেটন গাড়ী এবং শ্বেত বর্ণের আরব জুড়ী দিলেন এবং মালপত্র বহিবার জন্য একখানি বন্ধ লরি গোছের গাড়ীও দিলেন, সঙ্গে হোটেলের একজন ভৃত্য গেল যে মাল পত্রের হেফাজাত করিবে।

সেকেন্দ্রাবাদে অপরাহ্নে ফিরিয়া গিয়া পূর্ব্ব রাত্রি এবং সে দিনের বিল দিতে বলিলে, ম্যানেজার সাহেব আসিয়া ভাল কক্ষ দিবেন এবং আমাদের আরামের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত ব্যবস্থাই হইতে পারিবে বলিয়া অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু এক রাত্রির অভিজ্ঞতাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, আর কথায় "ভবি ভুলিবার নহে।"

আমরা সৌজন্যের সহিত বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমাদিগকে রাখিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টা করিবার কারণ এই যে, হায়দ্রাবাদের বুরি সাহেবের হোটেলে যাহারা থাকিতে পারে তাহারা নিশ্চয়ই অবস্থাপন্ন লোক ইহাই তাঁহার ধারণা। বস্তুতঃ বুরির হোটেলে অবস্থান ব্যয়সাধ্য বটে, কারণ বোম্বাইয়ের তাজ হোটেল থাকিতে বর্ত্তমান ব্যয় বাহুল্যের দিনে যে টাকার প্রয়োজন, সে দিনে বুরির হোটেলে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় লাগিত। শুনিয়াছি সে হোটেল এখন উঠিয়া গিয়াছে। বৈদেশিক ভ্রমণকারী বৎসরে একবার হায়দ্রাবাদ দেখিতে যায়, তাহাও প্রতি বৎসর নহে, সেরূপ অবস্থায় প্রাসাদতুল্য রাজকীয় ব্যবস্থায় হোটেল দীর্ঘকাল চলিতে পারে না; যাহা হউক আমাদের শুভাদৃষ্ট যে সে সময়ে হোটেলটি ছিল, নতুবা ডিউকের গোগৃহে প্রাণান্ত হইত।

আমরা মাল পত্র সহ সেই দিবস সন্ধ্যায় আসিয়া

বুরি এবং তদ্ গৃহিণীর নিরাপদ আশ্রয়ে উপস্থিত হইলাম। তস্করের ভয়ে রাত্রি জাগরণ করিতে হয় নাই; ইহাও এক পরম লাভ।

শুনিয়াছিলাম হায়দ্রাবাদের অভিজাত বংশের ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য যুবজনের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ইটালিয়ান বুরি হোটেল খুলিয়াছিলেন; প্রতি সন্ধ্যায় বহু মুসলমান যুবক হোটেলে আহার করিতে আসিতেন। তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে ইংরাজি, মোগলাই প্রভৃতি নানাবিধ ভোজ্য ও পেয় প্রস্তুত হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ হইতও, তথাপি হোটেলে প্রত্যহ পান ভোজন করিতে আসিবার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

বাঙ্গলা দেশের হিন্দু সমাজস্থ নব্য যুবকগণের হোটেলে আহারের কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। হায়দ্রাবাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে সে সকল হেতু প্রযোজ্য নহে, তবে বোধ করি বাহিরে গিয়া আহার করিবার মধ্যে একটা নূতনত্ব আছে এবং প্রত্যহ বন্ধু বান্ধবের সহিত একত্রে পান ভোজন করিবার একটা আমোদের প্রলোভনও কম নহে, সেই জন্যই হয়ত তাঁহারা এই ইংরাজি ধরণের হোটেল প্রতিষ্ঠিত করাইয়া থাকিবেন। এই হোটেলকেই তাঁহারা ক্লাবের মত ব্যবহার করিতেন; সন্ধ্যা হইতেই সকলে এখানে সমবেত হইয়া হাসি তামাসা গল্প খেলা আরম্ভ করিয়া দিতেন এবং যথা সময়ে খানার ঘণ্টা পড়িলে তাঁহারা সকলে একটি পৃথক কামরায় গিয়া ভোজনে বসিতেন। আহারও যেমন অগ্রসর হইত, হাস্যরবও কণ্ঠস্বর ও তেমনি উচ্চতর গ্রামে গিয়া পহুঁছিত, কক্ষান্তর হইতে আমরা সে সকল স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।

অর্থশালী অভিজাত বংশের সন্তানগণ হোটেলে নিত্য পান ভোজনের জন্য আগমন করেন সেই জন্য বুরি সাহেব প্রত্যহ পুণা হইতে ফল, বোম্বাই হইতে পমফ্রেট মৎস্য এবং আওরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আঙ্গুর ইত্যাদি যেখানে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা আনাইতেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান-হীনা সুন্দরী গৃহিণীর উপরে আগন্তুক অতিথিগণের সৎকারের ভার দিয়াছিলেন। সকল ব্যবসাতেই ইউরোপীয়গণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ হোটেল চালাইবার ব্যাপারে ইহারা অদ্বিতীয় বলিয়া মনে হয়। বুরি এবং বুরিপত্নী হোটেলের সকল অতিথিকে সমান যত্ন আদর করিতেন। পান, ভোজন, শয়ন উপবেশন, যান বাহন, কোন বিষয়ে কোন প্রকার অসুবিধা কোন ব্যক্তিকেই ভোগ করিতে দিতেন না। বুরি দম্পতীর কায়মনের অবিচ্ছেদ যত্নে সেই সুদূর বিদেশেও সকলেই যেন গৃহের আরাম উপভোগ করিতেছি এই রূপই মনে হইত। হায়দ্রাবাদে আমরা তিন সপ্তাহকাল ছিলাম, এক দিনের জন্যও মনে হয় নাই যে অপরিচিত বা অনাত্মীয় লোকের মধ্যে দিন কাটিতেছে। বুরি পত্নীর নিজ ব্যবহারের জন্য যে রবার টায়ারের ভিক্টোরিয়া এবং শ্বেত আরব জুড়ি ছিল, তিনি তাহা আমার ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন; সেজন্য হোটেলের অপরাপর ইংরাজ, ফরাসী, জারমান, রুষ পর্য্যটকগণ যে হিংসায় জ্বলিয়া যাইত তাহা তাহাদিগের কুঞ্চ বক্র দৃষ্টিতেই বুঝা যাইত। আমি তাহাদিগকে ভাল করিয়া জ্বালাইবার জন্য, তাহাদের সম্মুখ দিয়া সাহঙ্কারে গাড়ীতে উঠিতাম এবং সইস কোচম্যানের প্রতি নিজের ভৃত্যের ন্যায় হুকুম জারি করিতাম। কোন দিন বা উহাদের সমক্ষে বুরি এবং তাঁহার পত্নীকে আমার সমভিব্যাহারে সান্ধ্য ভ্রমণে যাইবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিতাম, বলা বাহুল্য সে অনুরোধ উপেক্ষিত হইত না। সেই সকল ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ এরূপ স্পষ্ট ভাবে তাহাদের দ্বেষ প্রকাশ করিত যে, বুরি এবং তাঁহার গৃহিণীও তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন এবং বুঝিয়া আমার মতই তাঁহারাও আমোদ উপভোগ করিতেন। কখন কখন বুরি গৃহিণী একটি বাটন হোল (button hole) আনিয়া আড়ম্বর সহকারে পিন দ্বারা আমার কোটে পরাইয়া দিতেন, সে দিন ইউরোপীয়গণের নেত্র হইতে বিদ্যুদ্বহ্নি বিনির্গত হইয়া আমোদের উভয়কেই ভস্ম করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিত। বোধ করি ভারতবাসীর

প্রতি ইউরোপীয় দম্পতীর এই বন্ধুবৎসলতা অপর ইউরোপীয়ের চক্ষু শূল হইত, নতুবা অন্য কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইতাম না। আমার বয়স তখন অল্প, অপরকে "জ্বালাতন" করিয়া একটু আমোদ হইত, সেইজন্য আড়ম্বরের সহিত ঐ সকল কার্য্য করিতাম, আজি হয়ত বা অবসর উপস্থিত হইলেও অপরকে অকারণ ক্লেশ দিয়া আমোদ উপভোগ করিবার ইচ্ছা হয় না। আমাদের হায়দ্রাবাদে অবস্থান কালের মধ্যেই সেই সকল ইউরোপীয় নরনারীগণ আমার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সে কথা বলিতেছি।

হায়দ্রাবাদের প্রায় যাবতীয় দর্শনীয় পদার্থ-দেখিবার জন্যই পাশ লইবার দরকার হয়। "ফলুক্‌নামা প্রাসাদ," "পুরাণা হাবেলী" ও "গোলকণ্ডা কেল্লা" দেখিবার এবং "হোসেন সাগরে" নৌবিহার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যের জন্যই পাশের প্রয়োজন ছিল। সে সকল বাহির করা বহু সময় সাপেক্ষ, কারণ কোন পাশ স্বয়ং নিজাম বাহাদুর, কোন পাশ বা প্রধান সচিব দিবেন; বিশেষ লোকের দ্বারা বিশেষ-ভাবে ধরাও করিতে না পারিলে শীঘ্র পাশ পাওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। বহু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী সেকালে বহু আক্ষেপ করিয়াও পাশ বাহির করিতে পারে নাই। আমার পাশ বাহির করিবার একটু সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেইজন্য বিলম্বের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় সে সময়ে হায়দ্রাবাদে ছিলেন, এবং সে দিনে তাঁহার কিছু প্রতিপত্তিও সেখানে ছিল। অনেক পদস্থ কর্ম্মচারীকে তিনি জানিতেন। আমি প্রথমে তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইয়াছিলাম। ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন ছুটিতে থাকায় তাঁহার সহিত সে সময়ে পরিচিত হইতে পারি নাই; কিন্তু নিশিকান্ত বাবুর দ্বারাই আমার কার্য্য উদ্ধার হইয়াছিল। তাঁহাকে 'মুরুব্বি' ধরিয়া বলিলাম আমাকে হায়দ্রাবাদের সমস্তই দেখাইতে হইবে; আমি বাঙ্গালী আপনিও বাঙ্গালী, আমার স্বদেশীকে ত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব? তিনি আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলেন; যাহাকে যেমন করিয়া ধরিয়া যখন যে পাশ বাহির করিতে হইবে সে সকল তিনিই করিলেন; আমাকে কিছুই বেগ পাইতে হয় নাই। প্রতিদানের মধ্যে নিশি বাবুকে রাত্রির আহার কালে নিমন্ত্রণ করিতাম। অল্প সময়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার এই সকল হুকুমনামা বা পাশ আমরা সংগ্রহ করিতেছি দেখিয়া, পূর্ব্ব কথিত ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ আমার সহিত আপোষ করিয়া লইল, অর্থাৎ দেখা হইলে আরক্ত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, বরং স্মিতহাস্যে কুশল প্রশ্নাদি করিত এবং দুই এক দিন পরে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল যে তাহারাও আমার সমভিব্যাহারী হইতে পারে কিনা? পাশের উপরে আমার নাম এবং friends লিখিত থাকায় কোন অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং আমি স্বীকৃত হইলাম। সেই সময় হইতে প্রাচীর কৃষ্ণকায়ের প্রতি প্রতীচীর গৌরাঙ্গী যুবতীর পক্ষপাতে ক্রুদ্ধ শ্বেতাঙ্গগণের নয়নের পূর্ব্ব শোণিমা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল, ক্রোধ-গম্ভীর মুখমণ্ডলের বক্র রেখাগুলি সরল হইয়া তাহাদের সহজ শ্রী ধারণ করিল এবং সময়ে অসময়ে তাহাদের সহাস্য কুশল প্রশ্নের জবাব করিতে করিতে আমার বাগ্‌যন্ত্র ক্লান্ত হইয়া উঠিল। বুয়ি গৃহিণী তাঁহার স্বদেশীগণের এই অকস্মাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন। আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা জানিয়া লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "How mean they are, and how very selfish!" অজ্ঞাত কথার ভাবে বোধ হইল তাঁহার ইচ্ছা নয় যে আমি উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কোথাও যাই, অন্ততঃ আরও কিছুকাল উহাদিগকে জ্বালাতন করিয়া একটু আমোদ উপভোগ করা হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আমি পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছি, সুতরাং উহাদিগকে সঙ্গে লইতে হইল। কিন্তু বুয়ি-পত্নী আড়ম্বরের সহিত আমার খাতির যত্ন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক করিতে লাগিলেন। ভোজন স্থানে তাঁহার দৃষ্টি আমার প্রতি সমধিক নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি যথাসম্ভব উহাদিগকে

বিরক্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় রহিলেন এবং সন্ধ্যা-সমীরণ সেবনার্থ নিত্য আমার সহিত ভ্রমণে বাহির হইতেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রোষ দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারিত না—ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন প্রকারের স্বার্থই হউক, মানুষকে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত না করিয়া সে ছাড়ে না।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

বঙ্কিমবাবুর আমগাছ চুরি

তেরো বৎসর হইল হুগলি সহরের অন্তর্গত পিপুলপাতি নামক স্থানে, একটি পুরাতন দ্বিতল গৃহ ও তাহার চারিপাশের ফলের বাগান আমি ক্রয় করিয়াছিলাম। ক্রয়ান্তে, বাড়ীটির জীর্ণ সংস্কার এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করিয়া, সেটির নাম দিয়াছিলাম "আশ্রম"—এবং তদবধি, এই "আশ্রমে" আমি বসবাস করিতেছি। বাগানে অনেক জঙ্গল ছিল; মশক নিবারণার্থ সে সমস্ত আমি সাফ করাইয়া ফেলি, তা ছাড়া ভাল ভাল কয়েকটি ফলবান বৃক্ষ রাখিয়া, বাকী সমস্ত গাছ পালারও উচ্ছেদসাধন করি।

এই বাগানের একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষ ছিল; ক্ষুদ্র বলিয়া, এবং বাড়ী হইতে দূরে বলিয়া, সেটি কাটানো আবশ্যক মনে করি নাই—তাই সেটি রক্ষা পাইয়াছিল। পার্শ্বস্থ অন্যান্য বৃক্ষ সকল অপসারিত হওয়ায়, প্রচুর স্থান ও আলোক লাভ করিয়া, একবৎসর মধ্যেই গাছটি অনেক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরে উহাতে ৫০৬টি ফল ধরিল। পাকিলে, ফলগুলি কামিনীকপোল-কয় রক্তাভ পীতবর্ণ ধারণ করিল; সেগুলির স্বাদ গ্রহণ করিয়া, মুগ্ধ হইলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ গিয়া সেখানে "দশেরী" আম খাইয়াছিলাম, এগুলি সেই "দশেরী" জাতীয় বলিয়াই মনে মনে সন্দেহ হইল। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে দশেরী আম মাঝে মাঝে দেখা যায়, টাকায় ২।৩টি করিয়া বিক্রয় হয়। বাস্তবিক "দশেরী"কে "আম্র-সম্রাট্" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একদিন আমি গৃহের বারান্দায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছি, আমার প্রতিবেশী বৃদ্ধ "—"বাবু আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কি মশায়, দশেরী আম কেমন খাচ্ছেন ?"

আমি বলিলাম, "বাগানের প্রান্তে ঐ যে আম গাছটি, ওটি কি দশেরী আমের গাছ ?—আম খেয়ে, আমার কিন্তু ঠিক সেই সন্দেহই হয়েছে।"

বাবুটি বলিলেন, "হাঁ, ওটি দশেরী আমের গাছই বটে। ও গাছটির চারা, বঙ্কিমবাবু লক্ষ্ণৌ থেকে আনিয়েছিলেন; কাঁঠালপাড়ায়, তাঁর বাড়ীর বাগানে পুঁতেছিলেন। সেইখান থেকে ওটি চুরি করে' আনা।"

শুনিয়া, গড়গড়ার নল আমার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। মহা বিস্ময়ে আমি বলিয়া উঠিলাম, "বঙ্কিম বাবুর গাছ! তাঁর বাগান থেকে চুরি করে' আনা! বলেন কি মশায় ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তাই। সে বড়

মজার কাণ্ড। শুনবেন সে সব? আচ্ছা তবে বলি শুনুন।"

বৃদ্ধ যে কাহিনীটি বিবৃত করিলেন, তাহা বড়ই কৌতুকপ্রদ। বিশেষতঃ ইহার সহিত সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ভুবনবিখ্যাত নাম বিজড়িত; তাই, পাঠকগণের শ্রবণযোগ্য হইবে বিবেচনায়, আমরা নিম্নে ইহা প্রকাশ করিলাম।

প্রত্যক্ষদর্শীর কাহিনী

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—

২৫ বৎসর পূর্ব্বে, এই বাড়ীর অধিকারী ছিলেন ৺ম—। তিনি হুগলী কালেক্টারীতে সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমিও হুগলীর কালেক্টারীতে কার্য্য করিতাম এবং উভয়ে একত্রে বাস করিতাম।

এই ম—বাবুর, বাগান তৈরি করিবার সখ ও আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই সখ ও আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়াই, বঙ্কিমবাবুর বাগান হইতে তিনি ঐ দশেরী আমের কলম চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন।

সেই সময় স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। তিনি আপন কাঁঠালপাড়ার বাটীতেই বাস করিতেন এবং তথা হইতে প্রত্যহ গঙ্গা পার হইয়া হুগলীতে আসিয়া সরকারী কার্য্য করিতেন। পরে তিনি চুঁচুড়ার বাসাবাটী লইয়া বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন তিনি প্রত্যহ কাঁঠালপাড়া হইতে হুগলী আসিতেন এবং কার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় বাটীতে ফিরিয়া যাইতেন।

একদা বাটীতে কোন উৎসব উপলক্ষে বঙ্কিমবাবু কতকগুলি ভদ্রলোককে আহারে আহ্বান করিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকের সহিত আমার ও ম—বাবুরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

যথাসময়ে আমরা কাঁঠালপাড়ায় উপস্থিত হইলাম। আহারের পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ একটি কক্ষে বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবুও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে কোন একটী বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তির নিকট, বঙ্কিমবাবু লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত 'দশেরী' আমের গল্প করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, এই আম দেখিতে যেমন নয়ন-মুগ্ধকর, খাইতেও তেমনই সুস্বাদ। বলিতে গেলে ইহা বাঙ্গালার সকল বিখ্যাত আম্রের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই সঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করিলেন যে, সম্প্রতি তাঁহার কোন লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বন্ধুর নিকট হইতে ঐ আমগাছের একটি কলম আনাইয়া আপন বাগানে রোপণ করিয়াছেন। যদি কখনো ঐ বৃক্ষ ফলবান হয়, তাহা হইলে তিনি নিজে ঐ সুস্বাদ ফল খাইয়া ধন্য হইবেন; এবং বন্ধুবর্গকেও খাওয়াইয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন।

গল্প করিতে করিতে তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত বাটীর সংলগ্ন বাগানে বাহির হইলেন। এবং সকলকে নবরোপিত 'দশেরী' আমের ক্ষুদ্র গাছটি দেখাইলেন।

ম—বাবু, দেশ-বিখ্যাত মহা ঔপন্যাসিকের সরস ভাষায় এই সুরস ফলের বিবরণ শুনিয়া, তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িলেন। সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষটি কোনও রূপে হস্তগত করিবার জন্য তাঁহার মনে বিষম প্রলোভন উপস্থিত হইল; এবং কিরূপে চারাটি হস্তগত করিবেন, তদ্বিষয় আমার সহিত তিনি গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে আহার শেষ হইল। বঙ্কিমবাবু নিমন্ত্রিতগণকে বিদায় দিতে আসিলে, অন্য সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আমি ও ম—বাবু বিদায় লইলাম না। বলিলাম, "মশায় আপনার বাড়ীতে এরকম গুরুভোজনের পরে, আর আমাদের নড়বার শক্তি নেই। এই রাত্রে নৌকায়

আমরা গঙ্গা পার হতে পারবো না। আপনি অনুমতি করলে আমরা এই বৈঠকখানা ঘরেই আজ শুয়ে থাকি; কাল ভোরে উঠে বাড়ী যাব। তখন আর আপনার দেখা পাব না; তাই এখনই আমরা আপনার কাছে বিদায় নিয়ে রাখছি।"

বঙ্কিমবাবু আমাদের গুপ্ত অভিপ্রায়ের বিষয় অনবগত থাকিয়া, এই প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

শয়ন করিয়া আমরা নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন পরামর্শই যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। কারণ প্রভাতে উদ্যানমধ্যে এই অভিনব আম্রবৃক্ষটি যথাস্থানে দেখিতে না পাইলে, বঙ্কিমবাবু আমাদিগকেই সন্দেহ করিবেন। চোর বলিয়া ধরা পড়িলে বিলক্ষণ লজ্জিত হইতে হইবে; তা ছাড়া আমাদের চাকুরীর হানি হইবারও সম্ভাবনা।

অবশেষে মধ্যরাত্রে ম-বাবু এক যুক্তি বাহির করিলেন, এবং তাহাই সদ্‌যুক্তি বলিয়া আমার মনে হইল। সেরূপ করিলে আমাদের প্রতি বঙ্কিমবাবুর কোনও সন্দেহ জন্মিতে পারিবে না।

তখন গভীর রাত্রি। আমরা বিশ্রাম ও শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। বিশ্রাম কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, চন্দ্রালোকে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে; দেখিলাম, সেই চন্দ্রালোকে, উদ্যান মধ্যে, সেই বাঞ্ছনীয় শিশু-বৃক্ষটি বায়ুভরে হেলিতেছে দুলিতেছে।

জ্যোৎস্নালোকে অদূরে কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর দেখা গেল। কুটীর গুলির মধ্যে স্থানে স্থানে কয়েকটি বিচালীস্তূপ দেখিয়া আমরা অনুমান করিলান যে, ঐ সকল কুটীর গো-অধিকারী দিগের বাস গৃহ,—তাঁহারা গরুর আহার জন্য বিচালী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। তখন আমরা সেই জন-মানব শূন্য পথ অতিক্রম করিয়া, ঐ সকল কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখিলাম একটি কুটীরে, বেষ্টন প্রাচীর নাই, তৃণাচ্ছাদিত চালার মধ্যে কয়েকটি গো-বৎস রজ্জুবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

অতঃপর প্রকৃত সুশিক্ষিত চোরের ন্যায় ম-বাবু বাহিরে প্রহরায় আমাকে নিযুক্ত করিয়া, গোহাল হইতে একটি বাছুরকে খুলিয়া আনিলেন। এবং তাঁহার উপদেশানুসারে, খড়ের গাদা হইতে আমি কয়েক আটি বিচালী টানিয়া বাহির করিলাম।

অতঃপর এক নিভৃত স্থানে বসিয়া, আমরা আপন আপন চরণদ্বয় অপহৃত বিচালী দিয়া বাঁধিয়া সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিলাম এবং বাছুরটি লইয়া সুপ্তিমগ্ন সাহিত্যসম্রাটের উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলাম। গোবৎসের গলরজ্জু ধরিয়া তাহাকে উদ্যানমধ্যে বার বার ঘুরানো হইল। নিকটবর্ত্তী অপর একটি আম্রবৃক্ষ হইতে কয়েকটি পত্র আহরণ করিয়া, সেই দশেরী চারার চারিপার্শ্বে ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পরে ম-বাবু সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত চারা গাছকে মৃত্তিকার সহিত উঠাইয়া, আপন শুভ্র উত্তরীয় মধ্যে সযত্নে সংগোপন করিলেন।

পদতল বিচালী জড়িত থাকায় উদ্যান-মৃত্তিকায় মানবের পদচিহ্ন লক্ষিত হইল না; পরন্তু গোবৎসের পদচিহ্নে উদ্যান বক্ষ চিত্রিত হইয়া রহিল। অপহৃত চারার নিকট কতকগুলি আমপাতা ছড়ানো রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই অনুমান করিবে যে, কোনও ছিন্নরজ্জু গোবৎস উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া, চারাটি দন্তদ্বারা উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে; এবং উঠাইবার সময় তাহা হইতে কয়েকটি পত্র ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

অপহৃত বৃক্ষটি লইয়া ম-বাবু ও আমি গঙ্গার ঘাটে আসিয়া তরী ভাসাইয়া, পরপারে হুগলীতে আসিয়া নামিলাম। ম-বাবু তাঁহার এই বাগান বাটীতে আসিয়া, উদ্যানপ্রান্তে বৃক্ষছায়া-সমন্বিত এক নিভৃত স্থানে মহা-যত্নে ঐ বৃক্ষ-শিশুকে রোপণ করিলেন।

পরে এক দিন স্বর্গীয় সাহিত্য সম্রাটের নিকট ঐ বৃক্ষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "ওহে, বাগানে বাছুর ঢুকে গাছটা নষ্ট করে ফেলেছে।"

সেই অসীম মেধাবী লোককে ঠকাইতে পারিয়াছেন জানিয়া ম-বাবু মনে মনে হাসিলেন; এবং তাঁহাকে, ইহার পর, আর কেহ সন্দেহ করিবে না, ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সেই বাহুনীর বৃক্ষের সুস্বাদ ফলের আস্বাদগ্রহণ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

পরবর্ত্তী ইতিহাস।

বৃক্ষের কাহিনী শেষ হইল। এক্ষণে, এই বাড়ীর পরবর্ত্তী ইতিহাসটুকু বিবৃত করিতেছি।

১২৯৯ সালে ম-বাবু তাঁহার বড় সাধের বাগান ও বাগান মধ্যস্থ বাড়ীটি নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় নামক হুগলীর একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

কবিরাজ মহাশয় নিকটবর্ত্তী অপর একটি বাটীতে অবস্থিতি করিয়া এ বাড়ীটি দ্বিতল করিলেন; এবং ইহার অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া, প্রায় দেড় বৎসর পরে এই বাটীতে আসিয়া বাস করিলেন। না জানি, তিনি কত আশা করিয়া এই বাটীর নাম করিয়াছিলেন, "আশা কুটীর"। তাঁহার আশা ফলবতী হইয়াছিল কিনা তাহা জানি না; কিন্তু তিনি সেই মধুর "দশেরী" আম্র বৃক্ষের কোন সংবাদই জানিতে পারেন নাই। তাহা নিভৃতে বাগানের একপার্শ্বে বহু পাদপের অন্তরালে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছু কাল পরে কবিরাজ মহাশয় কঠিন রোগে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী বা পুত্র দুইই বিষাদপূর্ণ বাটীতে আর বাস করিলেন না।

স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর এক ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার নাম, রায় কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর। তিনি ত্রিহুত অঞ্চলে সরকারি পূর্ত্ত বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অবসর লইয়া কাঁঠালপাড়া বাটীতে বাস করিতেছিলেন। যে বাটীতে তিনি বাস করিতেছিলেন তাহার ভূমি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের কুক্ষিগত হওয়ায়, তিনি হুগলিতে আসিয়া ১৩১৪ সালে কবিরাজ মহাশয়ের পুত্রের নিকট হইতে এই বাড়ীটি ক্রয় করিলেন; এবং ক্রীত বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনিও ঐ লুকাইত আম্র বৃক্ষটি আবিষ্কৃত করিতে না পারিয়াই পরলোকগমন করেন।

১৩১৮ সালের ১২ই আষাঢ় তারিখে, পরলোকগত রায় বাহাদুরের পুত্রের নিকট বাড়ীটি আমি খরিদ করি। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি।

এক্ষণে এই বৃক্ষ, শাখা বিস্তার করিয়া বহু ফল প্রসব করিতেছে। আমি, পরিজন সহ, ঐ ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু, স্বর্গীয় সাহিত্য-সম্রাটের উদ্যান হইতে অপহৃত বৃক্ষের অমৃতোপম ফল খাইয়া, আমি কি কখনও তাঁহার চরণরেণু হইবার যোগ্যতাও লাভ করিতে পারিব?

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভূমিকম্পে জাপানের ক্ষতি-বৃদ্ধি

বিগত ভূমিকম্পে জাপানের কতদূর ক্ষতি হইয়াছে এই লইয়া সারা পৃথিবীময় একটা বিষম হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। ভারতের বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত জাপান "The land of the rising sun" সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডের মধ্যে এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন দেশ। এই জাপান শুধু এসিয়াবাসী কিংবা আমাদের প্রতিবেশী নহে। আমরা নাকি একসময় সেখানে উপনিবেশ পর্য্যন্ত গড়িয়াছিলাম। কাযেই জাপানের ধর্ম্ম এবং সভ্যতার ভিতর আমাদেরও একটু গৌরব এবং স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। এজন্যই আরও আমরা জাপানের ভাল-মন্দে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারিতেছি না।

একটা কথা সকলেই জানেন "Brotherhood

of man and fatherhood of God"। এই ছাড়া আমরা বাল্যকাল অবধি পাদ্রীদের মুখে "universal brotherhood," "universal fraternity", "universal federation" প্রভৃতি বড় বড় অনেক কথাই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ আর একটা কথা খুব জোরেই আসিয়া কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে—"The Great Asiatic Federation." এই জন্যই জাপানের কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে এই Federationএর কথাটাই মনের মধ্যে বিশেষ করিয়া জাগিয়া উঠে। কাযেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সবদিক দিয়া ভাবিয়া বিবেচনা করিতে গেলে—জাপানের বিপদে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক।

এই ভূমিকম্পের তুল্য এত বড় ভীষণ এবং ভয়াবহ ভূমিকম্প আর পৃথিবীতে কখনও হয় নাই। ভারতবর্ষের বড় ভূমিকম্পের কথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু জাপানের এই ভূমিকম্পের তুলনায় উহা কিছুই নহে। বড় ভূমিকম্পের মধ্যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে San Fanciscoতে একটি এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মেক্সিকোতেও একটা হইয়াছিল, আর খুব বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে লিসবনে। লিসবনের ভূমিকম্পে প্রায় ৫০,০০০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু জাপানের ভূমিকম্পের তুলনায় ইহারা কিছুই নহে। তাই আর্ত্ত জাপানের জন্য দেশ বিদেশ হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল। আমাদের সম্রাট ৫ম জর্জ্জ স্বয়ং নিজ তহবিল হইতে চাঁদা দিয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড রেডিং ভারতবর্ষের এক সরকারী ও বে—সরকারী বৃহৎ ফণ্ড খুলিয়া বিলক্ষণ চাঁদা তুলিয়াছিলেন।

আমেরিকা, নিপনের (Nippon) অসহায় শিশুদের জন্য সাহায্য করিয়াছেন—পাঁচ "মিলিয়ন ডলার"। "The Literary Digest" নামক বিখ্যাত পত্রিকা এক প্রবন্ধে এই ভূমিকম্পে জাপানের ক্ষতিবৃদ্ধি সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। "Digest" বলেন—

"There are voices, of Editors and newspaper writers, expressing confident hope of the rising of finer, safer cities on the ruins of Yokohama and Tokyo; voices declaring faith in Japan's ability to triumph over disaster, with head bloody but unbowed."

ওসাকার সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে কেবল এক টোকিও সহরেই ১,৫০,০০০ লোক মৃত্যু মুখে পতিত, ১,৫৮,৭৩৯ লোক আহত ও অদৃশ্য, এবং ৩,১৫,৮২৪ খানি গৃহ ভূমিসাৎ হয়। নিউ ইয়র্কের "The Japanese Times" এই দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ ক্ষতি ১২০,০০০০০০০ এক শত বিশকোটী ডলার ধার্য্য করিয়াছেন।

'রেড্ ক্রশ্' এবং সেক্রেটারী হুভার সংবাদ দিয়াছেন ইওকোহামা ও টোকিও সহরে দুই হইতে তিন লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, নগরদ্বয়ে পনর লক্ষ এবং তাহার বাহিরে আরো প্রায় দশ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। মিঃ এচ্ পি মুর (H P. Moore) নামক প্রাচ্যখণ্ডের একজন বড় 'ইন্সিওরেন্স' ব্যবসায়ী,—তিনি উক্ত দুই সহরের ক্ষতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—৮০০০০০০০০ আশি কোটী ডলার। ঐ ক্ষতি নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মুর সাহেব জাপান সম্বন্ধে এই কয়টী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"The credit of Japan is exceptional. The finances of the Empire have been handled with great discretion. The world war left the Empire richer rather than poorer. Wealth was added in forms permitting increased industry and production. Money was not wasted or spent. The wealth of Japan is estimated by one authority at 23,500,000,000 dollars. A later authority gives the national wealth of Japan at 43,000,000,000 dollars. Obviously in any case, the absorption of an economic loss of 1,000,000,000 dollars or less will not take an indomitable people long. Great as the loss of life is supposed to be, it is infinitesimal when compared with the total population of the Empire, nearly 60,000,000 in Japan proper, 18,000,000 in Korea, 4,000,000 in Formosa—a total of nearly 80,000,000

people, who are among the most industrial and productive of any in the world."

'আমেরিকান্' কাগজে Mr. G. W. Hinman বলেন যে, এমন কি যদি এই দুর্ঘটনায় সমুচ্চ ক্ষতি অনুমান ৫০০০০০০০০০ পাঁচশত কোটী ডলার পর্য্যন্তও ধরিয়া লওয়া হয়, তবু এই ক্ষতিটা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়া লইবার জন্য জাপানের মাত্র দশ বার বৎসর সময় লাগিতে পারে। তিনি বলেন জাপান যদি এই পাঁচশত কোটি ডলারকে তার জাতীয় ঋণ হিসাবেও গ্রহণ করিয়া লয়, তবু পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় জাতিদের ঋণ দায়ের তুলনায় ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে। তিনি আরও বলেন :

"The losses of the great war left Japan almost untouched. The great cost of the war was for her less than half a billion. For the United States, Great Britain and France, it was nearly 50,000 000,000 dollars each. If she had paid in proportion to her wealth as did Great Britain, she would have expended, instead of 481,000,000, hardly less than 12,000,000,000 dollars.

"What do these figures indicate? That even now if she suffers 5,000 000,000 dollars loss by her earthquake, she still is infinitely better off financially than either England or France. In other words, Japan is scourged less cruelly by the great earth quake than the most fortunate nations of Europe were scourged by the Great War. Her prospect of recovery is threfore far brighter than theirs."

হিন্‌ম্যান্ সাহেব কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। জাপান কতদিনে তার স্বচ্ছল অবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া তিনি নিজেই তাহার উত্তর দিয়াছেন। এই উত্তরের মধ্য দিয়া চতুর সাহেব জাপানের প্রতি স্বদেশীয় ব্যবসায়ীদের লুব্ধ দৃষ্টি একটু আকর্ষণ করিতেও ছাড়েন নাই। হিন্‌ম্যান্ বলেন :—

"All capital in a country,—that is, industrial capital, business capital world producing capital—is supposed to be renewed every twelve years. How much that period can be shortened, under the present pressure of necessity and with the financial facilities of the world at her command, it remains for Japan to show. Certainly Japanese enterprise will not be lacking. Surely ten or twelve years from this date will find her at least as prosperous as ever. Meantime, she will be re-building, calling for construction materials, and the world business will get the growing benefit of her recovery."

ইংলণ্ডস্থিত জাপানী রাজদূত Baron Hayashi বলেন যে কেবল টোকিও এবং ইওকোহামা ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের শিল্পবাণিজ্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে না। তিনি বলেন :—

"As an asset for restoration of the national strength, we cannot be too thankful that Osaka, the real centre of Japanese industry and business; Nagoya, a commercial and industrial centre of growing importance; the great port of Kobe and the mining districts of Kyushu, all remain intact."

ইওকোহামার বন্দরে সবচেয়ে বেশী কাঁচা রেশম রপ্তানী হয় এবং সেখানে গুদামে রেশমী মাল বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু শস্য ক্ষেত্রের উৎপন্ন কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। হায়াশী বলেন—

"The fields producing raw silk remain undamaged."

নিউইয়র্কের Mr. Adachi Kinnosuke নামক একজন জাপানী এই ভূমিকম্পটাকে একটা দুর্ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করেন না। তিনি "World" কাগজে একটি সন্দর্ভে ইহাকে "Not a Cataclysm at all" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন :—

"It is a price Japan has paid. And for two things.

"First of all, for a new, thorough-going friendly understanding with her neighbor powers, more especially with the United States. For, after this destruction of the capital city, of the greatest seaport of the Empire, and of the naval base at Yokosuka, the oldest as well as the mightiest base the Japanese Navy has, no American jingo can accuse her of sitting up nights to hatch up a suicidal war with the United States—not for twenty-five years to come, anyway.

"And, secondly, for the new capital city and its seaport that are to rise out of the ashes of the old, Tokyo is to be born again. If one is reasonable and thinks it over, it is plain that nothing short of this tremendous destruction could have been enough for the birth pains of a wonder city to rise out of the ashes."

অতএব আমরা চক্ষুর দেখিতে পাইতেছি, যাহাকে আমরা অত্যন্ত ভয়াবহ দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিতেছি, অমিতবিক্রমশালী নব্য জাপান তাহাকে সৌভাগ্যের অগ্রদূত রূপেই সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে।

জাপান এই ভূমিকম্পের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই এক বৃহত্তর টোকিও গড়িবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, এবং ঐ কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য Prof. Charles A. Beard নামক একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞকে আনাইয়া লইয়াছিল। এই সম্পর্কে বষ্টনের "Herald" নামক কাগজ বলিয়াছেন :—

"The cities now overthrown will be rebuilded according to western plans. The steel frame will be adopted as the standard. The old beauty of Japan must go, the aspect which has made it so attractive to tourists will disappear, but human life will be more secure."

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—জাপান কি তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য, তার স্বাতন্ত্র্য, রক্ষা করিতে পারিবে না ?*

শ্রীঅবনীকুমার দে।

* The Calcutta Corporation Outdoor Employees' Association." এর সভায় পঠিত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

কেল্লা-ফতে

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ; ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স (৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত ; মূল্য ॥০

শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি ছেলেদের জন্য অতি মনোজ্ঞ ভাষায় ঐতিহাসিক গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'রাজা-বাদশা' পড়িয়া দেখিলাম, শিশু-সাহিত্যের উন্নতির জন্য এমন করিয়া এমন ভাষায় এমন মনোহর করিয়া ঐতিহাসিক গল্প আর কেহ লেখেন নাই, লিখিবার চেষ্টাও করেন নাই। তাই আমি 'রাজা-বাদশা'র লেখক শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম। তার পর ক্রমে ক্রমে তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প লিখিয়াছেন ; তার কতকগুলি 'রণডঙ্কা' নামে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার 'কেল্লা ফতে' বাহির হইয়াছে। বড় ইতিহাস লিখিয়া তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন, ছেলেদের জন্য ঐতিহাসিক গল্প লিখিয়া তিনি তাহা অপেক্ষা অধিকতর কায করিতেছেন ;—তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠের বাসনা শিশুহৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতেছেন। তাঁহার এই 'কেল্লা-ফতে' অতি সুন্দর বই হইয়াছে ; ইচ্ছা করিতেছে ইহার যে-কোন একটা গল্প এখানে তুলিয়া দিয়া তাঁহার ভাষা-নৈপুণ্য, বর্ণনা-কৌশল ও প্রকাশ ভঙ্গীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিই। কিন্তু তাহাতে অনেকটা স্থানের দরকার, তাই নিবৃত্ত হইলাম। পাঠক পাঠিকাগণ আট আনা পয়সা ব্যয় করিয়া বইখানি কিনিয়া ছেলেমেয়েদের হাতে দিবেন। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার সেনের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটখানিও অতি সুন্দর।

শ্রীজলধর সেন।

স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহপঞ্জিকা

বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকা। কলিকাতা ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৪৩১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵১০

সাধারণ পঞ্জিকায় যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, সে সকল ত ইহাতে আছেই, অধিকন্তু এমন কতকগুলি অত্যাবশ্যক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহা অন্য কোনও পঞ্জিকায় নাই। ইহার প্রধান নূতনত্ব, হরপার্ব্বতী সংবাদ। এই ৫৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী অভিনব হরপার্ব্বতী সংবাদে, দেবী পার্ব্বতীর প্রশ্নে বৈদ্যনাথ স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম, জীবাণু রহস্য, নানা ব্যাধি এবং তাহার প্রতিকার ও প্রতিষেধ

প্রভৃতি বিষয়গুলি এমন সুন্দরভাবে সরল পদ্যে বিবৃত করিয়াছেন যে, সেগুলি পাঠে গৃহস্থলোক বহু উপকার পাইবেন। এই হরপার্ব্বতী সংবাদের জন্যই চৌদ্দটি পয়সা ব্যয় সার্থক হইবে। এতদ্ব্যতীত আদর্শ ব্যায়াম প্রণালী, শারীর গঠন ও ক্রিয়াতত্ত্ব, আকস্মিক বিপদে প্রথম চিকিৎসা, সহজ মুষ্টিযোগ, গো চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় গুলিও প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। "সংবাদ কোষে"ও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় স্থান পাইয়াছে।

আবোল তাবোল

৺সুকুমার রায় বি-এস-সি, এফ-আর-পি এস কর্ত্তৃক লিখিত ও চিত্রিত। ডবল ক্রাউন ৮পেজি ৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য লেখা নাই।

এখানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—ছড়া বা কবিতা ও চিত্রে পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার কৈফিয়তে বলিয়াছেন, "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহা লইয়াই এই পুস্তকের কারবার।" কবিতা ও ছবিগুলিতে অনেক মজা আছে, ছেলেমেয়েরা পড়িয়া খুসী হইবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, লেখক এই সুন্দর বহিখানি প্রকাশের পর, অকালে অনন্তধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর

জীবন কথা। শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী প্রণীত। কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত ও মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৫৮৩ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ৩৲

লেখক মহাশয়, রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট আত্মীয় এবং শৈশবাবধি তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পুস্তকখানি সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহা ছাড়া একটি পরিশিষ্টে বহু মূল্যবান ও জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। স্বতন্ত্রভাবে আর্ট পেপারে মুদ্রিত ১৭খানি চিত্র আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থকার মহাশয় এই পুস্তক খানি প্রণয়নে শুধু যে বিপুল ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাই নহে, বিষয় বিভাগে এবং সেগুলির বিবৃতি ও ব্যঞ্জনায়, বিলক্ষণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভাষাটিও সরল, সরস ও আড়ম্বরবিহীন। এক কথায় বলিতে গেলে, এই জীবনকথা খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানির ছবি, কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই সবই ভাল হইয়াছে, এবং ইহাতে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের নিবেদনে প্রকাশ, লালগোলার স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, মুদ্রণসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। শুধু এই বহিখানির জন্য নহে, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে রাজা বাহাদুর যে বিপুল অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্য-প্রেমিকবর্গের চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন।

—

১৬শ বর্ষ, ১ম খণ্ড সমাপ্ত।

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত আমাদের বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ছয় মাস পূর্ণ হইল। ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ দয়া করিয়া বাকি ছয় মাসের মূল্য ২।০ মনি অর্ডারে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। নচেৎ ভাদ্র সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভি পিতে পাঠাইব, উহা যেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা ২॥০ দিয়া গ্রহণ করেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, "মানসী ও মর্ম্মবাণী" ২৩ বি বেথুন রো, কলিকাতা।

কলিকাতা

১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট মানসী প্রেস হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।